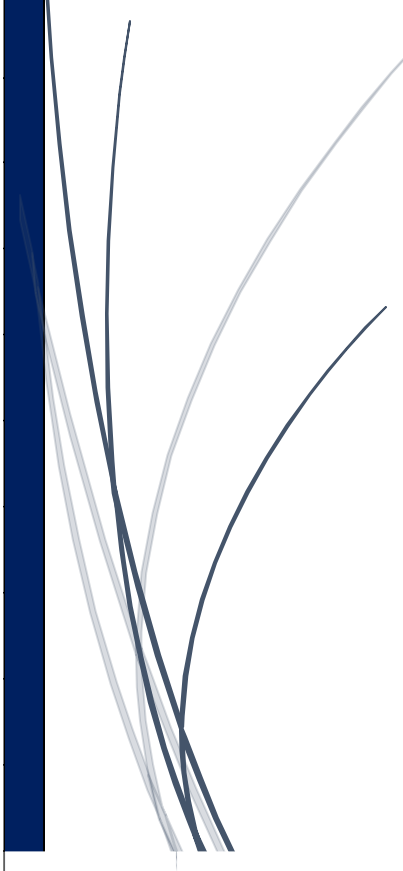
উপন্যাস

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. মাঝে মাঝে মনে হয় 8
২. অমরনাথ যখন বাদলকে নিয়ে 21
৩. ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে 38
৪. ফুলবাড়ি নামের জায়গাটি 52
৫. বয়স মানুষ খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলে 65
৬. রেণুদের বাড়ি গ্রে স্ট্রিটে 74
৭. চিররঞ্জন হেরে যাওয়া মানুষ 84
৮. সূর্যকুমার বছরে একবার কলকাতায় 95
৯. সূর্য পড়াশুনোতে ভালোই ছিল 105
১০. চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর 117
১১. দলের নেতার নাম হরকুমার 125
১২. গরমের ছুটিতে বিষ্ণু 137
১৩. সকালবেলা খবরের কাগজ 148
১৪. রসময় চক্রবর্তীর বাড়িতে 158
১৫. ওদিকে সূর্যদা 176

১৬. মন্দাকিনী খবর পাঠিয়েছেন 189
১৭. এক একটা দিন এমন চমৎকার 197
১৮. সূর্য ঘন্টাখানেক ধরে রাস্তায় 209
১৯. শ্রীলেখার সঙ্গে যে সূর্যর মেলামেশা 218
২০. হাওড়া স্টেশনে সূর্যর সঙ্গে 228
২১. মাঠের মধ্যে একটা মোটরগাড়ি 241
২২. ন্যায়-অন্যায়ের যে সূক্ষ্ম সীমারেখা 252
২৩. ফিটন থেকে একজন 263
২৪. সূর্য প্রকাশ্যে জানিয়ে দিল 274
২৫. একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী 283
২৬. যদু পণ্ডিতের পাঠশালা 295
২৭. বড়দির বিয়ের দিন 312
২৮. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দু-তিনটি বছর 320
২৯. জাপানিরা আসছে 327
৩০. ট্রেনে চেপে খুলনা 335
৩১. নৌকো থেকে যেখানে নামা হল 342
৩২. ব্রজগোপাল সূর্যকে নিয়ে নামলেন 347
৩৩. সূর্যকে শুতে দেওয়া হয়েছিল 354

৩৪. তমোনাশ ডাক্তার একে একে 360
৩৫. এই এলাকায় তমোনাশ 367
৩৬. নীচের তলায় খুটখাট 375
৩৭. বিয়ের পর শ্রীলেখা 382
৩৮. মুর্শিদের চরে কয়েক দিন 390
৩৯. দূর থেকে আসছে একটা মিছিল 406
৪০. সূর্য চলে যাবার পর 425
৪১. সরকারি হিসেব মতনই 436
৪২. যারা লম্বা তালগাছের ওপরে 447
৪৩. যদিও শ্রীলেখা সব সময়ই 468
৪৪. প্রভাসকুমারদের পরিবারটি 481
৪৫. সেবারের দুর্গাপূজোর 495
৪৬. যে-কোনও কারণেই হোক 507
৪৭. শ্রীলেখার সঙ্গে সান্ত্বনার 516
৪৮. মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের গেট 525
৪৯. চিররঞ্জন শিয়ালদা স্টেশনে এসে 537
৫০. কাছাকাছি মানুষের প্রভাব 547
৫১. বেয়াল্লিশ সালের গোড়ায় 557

৫২. আমরা অনেক মৃত্যু দেখেছি 570
৫৩. সকালবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্য 582
৫৪. স্কুল ছাড়ার আগে 597
৫৫. যদিও সুর্যর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 608
৫৬. দু-এক দিনের মধ্যেই সূর্য 617
৫৭. সেই সময় একটা কথা 645
৫৮. আমাদের বাড়ির বাজার করার ভার 669
৫৯. জুন মাসের তিন তারিখে 682
৬০. ও-বাড়িতে আমার টিউশানি 704
৬১. কলেজের সোস্যাল ফাংশান 714
৬২. পর পর অনেকগুলো ট্রাম 733
৬৩. বাদল বাইরের ঘরে 743
৬৪. দুদিনের মধ্যে সান্ত্বনা 766
৬৫. সূর্য আর বাদল 775
৬৬. হিরোসিমাতে যে-দিন অ্যাটম বোমা 784
৬৭. কাটিহারে গিয়ে দীপ্তিদির বাড়ি 794
৬৮. সূর্যর চালচলন ক্রমশ 812
৬৯. রেণুর একটা নিজস্ব জগৎ 831

৭০. হিমানীর বাবা-মা এবং দাদারা 838
৭১. সূর্য অনেকটা উদ্দেশ্যহীন 867
৭২. এলাহাবাদের সেই বাঙালি ছেলেগুলি 874
৭৩. যুবকটি সূর্যর চেয়ে 885
৭৪. অনেক দিন বাদে সূর্যকে 900
৭৫. রেণুর কাছ থেকে অনুমতি 916
৭৬. কলকাতায় ফিরেই শুনলাম 923
৭৭. কিছুক্ষণ ছোটার পর 938
৭৮. বুলবুল চেয়েছিল সূর্যকে নিয়ে 957
৭৯. ভারতের যে-কোনও শহরেই 966
৮০. বাবাকে উত্তেজিত এবং খুশি দেখা গেল 981
৮১. জাহাজ ছাড়বে কোচিন থেকে 992
৮২. মহীশূরে সুব্রতদাদের বাড়িতে 1012
৮৩. সূর্য কলকাতায় এসে পৌঁছোল 1022
৮৪. রেণু এল পরদিন সকালবেলা 1036
৮৫. বরানগর-আলমবাজারের দিকে 1054
৮৬. গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা 1070
৮৭. কৃষ্ণনগর শহরের রাস্তা 1086

৮৮. পাহাড়ে দ্রুত উঠতে নেই..... 1103

১. মাঝে মাঝে মনে হয়

ভূমিকা

এই উপন্যাসের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব ছাড়া সমস্ত চরিত্র ও কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জীবিত কারুর সঙ্গে কোথাও কোনও মিল খুঁজে পাওয়া গেলে তা নিতান্ত কাল্পনিক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকে শুরু করে এ দেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত কয়েক বছর পর পর্যন্ত যে অদ্ভুত মিশ্র সময় আমরা পার হয়ে এসেছি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কাহিনী। দেশ ও সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিকায় আমার এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন আলাদা মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতিই প্রাধান্য পেয়েছে।

উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অনেক কাটাকুটি করেছি এবং বাড়িয়েছি। রচনাকালে অনেক গ্রন্থকার এবং আমার শ্রদ্ধেয় কয়েকজন ব্যক্তি ও বন্ধুদের কাছ থেকে নানারকম সাহায্য পেয়েছি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

–গ্রন্থকার

.

উৎসর্গ

কমলকুমার মজুমদার
শ্রদ্ধাস্পদেষু

.

০১.

মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে মানুষ হয়ে জন্মেছি, এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই। না জন্মাতেও পারতাম এবং তাতে আর কারওর কোনও ক্ষতি হত না। না জন্মালে দেখতে পেতাম না এই ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবী, আমার নিশ্বাসের জন্য বরাদ্দ বাতাসটুকু নেওয়া হত না, মধ্যরাত্রির আকাশের দিকে যারা তাকিয়ে দেখে তাদের মধ্যে একজন মানুষ কম পড়ত। জলের আঙুল দিয়ে একটি শিশু ছবি আঁকত না। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের ওপর উঠে একটি বালকের উল্লাসে ফেটে পড়া-কখনও উপস্থাপিত হত না সেই দৃশ্য। একটি নারীর অনাবৃত ঝকঝকে বুকে মাথা রেখে যে চাঞ্চল্যকর শান্তি পাওয়া যায়-কখনও পেতাম না তার সন্ধান।

আমি না জন্মালে আমার মা, বাবা, কয়েকজন কাকা ও জ্যাঠা, ভাই, বোন, আত্মীয়, কয়েকটি অনাত্মীয়া নারী, চার-পাঁচটি নদী ও দুটি দেশ নিয়ে আমার যে সম্পূর্ণ নিজস্ব জগৎ, এত ব্যাকুলতা ও মমতা-থাকত না এর কোনও অস্তিত্ব। বিশ্বাসই করা যায় না! বিশ্বাস করা যায় না বলেই পুনর্জন্ম, নিয়তি, কর্মফল-এইসব ভালো ভালো মায়াময় বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল একসময়। এখন আবার আকস্মিকতায় ফিরে এসেছি, তাই ভাবতে গেলেও বুক কাঁপে। আমি না জন্মালে এই ক্ষুদ্র জগৎটিতে আমার অনুপস্থিতি কেউ অনুভব করত না, কেউ অপেক্ষা করত না আমার জন্য। যা নেই, তার জন্য আবার অপেক্ষা কী! আর সবাই থাকত, 'আমি' থাকতাম না, এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি আর হয় না মানুষের মৃত্যু চিন্তার চেয়েও মর্মান্তিক। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে আমি তিন-চার বার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। অনেকেই ভাবে। আত্মহত্যারও একটা মর্ম আছে। কখনও কখনও গৌরবও থাকে কিন্তু না-জন্মানো? মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই বুঝতে পারি, না-জন্মানো মানে কী অসীম শূন্যতা। আমি মনুষ্যজন্ম পেয়েছি, আমি ধন্য।

মাঝে মাঝে একথাও মনে হয়, এই জীবনের সার্থকতা কী? এই যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমাকে দেওয়া হল, কী এর শ্রেষ্ঠ ব্যবহার? অবহেলায় ঔদাসীন্যে ধুলো কাদায় ফেলে

রাখার জিনিস তো এ নয়! এই দেহ নিয়ে জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মোমবাতির ওপরে শিখাটুকুর মতন, মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকে আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার অলৌকিক চোখ নিয়ে দুর্দান্ত অবাধ্য বালকের মতন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে চারদিক, সে আরও কিছু চায়। জীবন যেখানে থেমে আছে, তা ছাড়াও আরও কিছু। কী সেটা? যশ, অর্থ, ভোগ বা ভালোবাসাও শেষ কথা নয়।

যৌবন পেরিয়ে গেলে কোনও এক বাদামি সন্ধ্যাবেলা মানুষের মনে হয়, এই জীবন অন্য রকম হবার কথা ছিল। কৈশোরের যে মহিমা-উজ্জ্বল জীবনের ছবি ভেসে উঠত চোখে, কোথায় গেল সেই মহিমা? মেঘলা আকাশের জ্যোৎস্নার মতন চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে স্বপ্নের শব। মনে হয়, যদি আর একবার নতুন করে জীবনটাকে শুরু করা যেত– শৈশব থেকে আবার ফিরে আসা! রাষ্ট্রপতিকেও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। কোটিপতিও শ্বেতশুভ্র বাথটবের ঠান্ডা-গরম জলে শরীর ডুবিয়ে আরাম করতে করতে হঠাৎ ক্ষুর দিয়ে হাতের শিরা কেটে ফেলে। কেন না আমরা তো প্রায়ই ভুলে যাই, যে আমরা কুকুর অথবা পিঁপড়ে হয়ে জন্মাইনি! আমরা মানুষ, এই উত্তরাধিকারের দায়িত্ব কী বিরাট! একটি সিংহ আর একটি সিংহকে কখনও হত্যা করে না, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করার সময় নখ গুটিয়ে রাখে। মানুষই শুধু তার ভাই, বন্ধু, পরিজন ও প্রতিবেশীকে খুন করার জন্য আবিষ্কার করেছে কত রকম অস্ত্র। জন্মসূত্রে যে সে একা, এই কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সে বার বার গোষ্ঠীবদ্ধ হতে গিয়ে গোষ্ঠীকে ভাঙে।

কখনও কখনও যেন একটা বিশাল কঠিন, বন্ধ দরজার গায়ে দুম দুম করে আঘাত করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, বলো, বলল, কার নাম সার্থকতা! বলে দাও! ইতিহাসের কোনও কোনও শতাব্দীতে এক-আধ জন ধর্মগুরু সেই দরজা একটু ফাঁক করে বলতে চেয়েছেন, শোনো, আমি বলছি। এই পথ অনুসরণ করলে মনুষ্যজন্ম তার সম্পূর্ণতা পাবে। আমার কাছে এসো, আমি পথ দেখাচ্ছি...। কিন্তু সব কথা শোনা যায়নি, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, তার আগেই ধূপধুনোর ধোঁয়া আর চাটুকারিতার হট্টগোলে। সব ঢেকে

গেছে। দু'এক শতাব্দীতেই কেটে যায় ঘোর। তারপরও হাজার হাজার অতৃপ্ত মানুষ ধাক্কা মেরে সেই দরজা ভেঙে ফেলতে চায়।

হয়তো এই সার্থকতার সন্ধানও সবার মধ্যে জাগে না সারা জীবনে। কেন না, এই পৃথিবীতে অনেক নেশা আছে। বাদুড়ের ডানায় একবার হাত দিলে সেই তেলতেলে কালো রং সহজে উঠতে চায় না, গন্ধও জড়িয়ে থাকে। অনেকের হাত একবার রুপোর টাকা ছুঁলে রুপোর দাগ লেগে যায়-তারপর সারা জীবন দু'হাতে রুপো ছানাছানি করতে ভালোবাসে। সেই রকমই, নারী। কেউ চায় অন্যের ওপর প্রভুত্ব করতে কিংবা অন্যদের নিজের মতে চালাতে। এই নেশাটাই সবচেয়ে তীব্র। একটা দেশ বা একটা শহর বা একটা দল বা একটা অফিস বা নিছক নিজের পাড়ার পাণ্ডা হবার জন্য কী আকুলিবিকুলি চেষ্টা। যে-পৃথিবীতে সে সত্তর বা আশি, বড়জোর একশো বছরের বেশি থাকবে না-সেই পৃথিবীকেও সে বদলাবার জন্য প্রাণপাত করে। এই শরীর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ-এই কঠোর সত্যটা জেনেও কত মানুষ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের কথা ছড়িয়ে যায়।

অনেকেই অবশ্য মায়ার ঘোরে জগৎটা খুব ছোট করে আনে, নিজের স্ত্রী-পুত্রকন্যা আত্মীয়দের নিয়ে ছোট্ট সংসারের বাইরে আর কিছু দেখতে চায় না-এদের খুশি বা সুখী করার জন্য সারা জীবন ভূতের ব্যাগার দিয়ে যায়। একই মানুষ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে ছেলেকে আদর করে সম্পূর্ণ স্নেহে, বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ভক্তিভরে প্রণাম করে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে এবং অফিসে গিয়ে ঘুষ নেয়-এও তো নেশার ঘোর। এমন নেশাগ্রস্ত মানুষ অনেক দেখেছি।

যাই হোক, আমি আমার ছেলেবেলা থেকেই একজন মানুষকে জানি যিনি জীবন সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন ও সংশয়ে কষ্ট পেতেন। তিনি আমার পিসেমশাই। তখন অবশ্য সব বুঝিনি। সেই লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ, সদাহাস্যময় মানুষটি মাঝে মাঝে দারুণ বিষণ্ণ হয়ে যেতেন। তিন-চার দিন ধরে কারওর সঙ্গে কথা বলতেন না, তিনতলার ঘরে একা শুয়ে থাকতেন। বাড়ির কেউ বিরক্ত করতে সাহস করত না ওঁকে। শুধু আমার জ্যাঠামশাই

খড়ম ঠকঠকিয়ে ওপরে উঠে জিজ্ঞেস করতেন, কী হে অমরনাথ, কী হল আবার তোমার? চলো, শিশিরবাবু আবার ষোড়শী বই নামিয়েছেন, দেখে আসি।

জ্যাঠামশাইকে দেখে পিসেমশাই উঠে বসতেন। ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বলতেন, জানো পি আর, ইচ্ছে করে আবার সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে বেরিয়ে পড়ি!

জ্যাঠামশাই উত্তর দিতেন, এখন বয়স হয়েছে, এখন আর ওসব পাগলামি কোরো না। শরীরে সইবে না।

ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে আমরা এইসব কথা টুকরো টুকরো ভাবে শুনতাম। তখন পিসেমশাইয়ের বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার জ্যাঠামশাইও ওঁর থেকে পাঁচ-ছ' বছরের ছোট।

আমার পিসেমশাইকে আমরা সবাই ডাকতাম বড়বাবু। আমার বাবা-কাকারাও তাই বলতেন। ছেলেবেলায় এ-ডাকটা আমরা স্বাভাবিক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম, কারণ জানতাম না। পরে জেনেছি। পিসেমশাইয়ের আসল নাম অমরনাথ ভাদুড়ী, কিন্তু ওঁর চেহারার সঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর খুব মিল ছিল। যদিও শিশির ভাদুড়ীর পরিবারের সঙ্গে পিসেমশাইদের কোনও রকম আত্মীয়তা ছিল না। তখন রঙ্গমঞ্চে শিশির ভাদুড়ীর দেশজোড়া নাম। তার ডাকনাম অনুসারেই পিসেমশাইকে বাড়ির সবাই বড়বাবু বলত। অবশ্য ওঁর আসল নাম অমরনাথেরও একটা ইতিহাস আছে।

আমার যখন ছ'-সাত বছর বয়স, তখন একদিন বিকেলবেলা পিসেমশাই আমাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন এক জায়গায়। সেদিন আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আমরা কলকাতায় পিসেমশাইয়ের বাড়িতেই থাকতাম। পিসেমশাই সেই সময় গোয়ালিয়ার থেকে ব্যবসা গুটিয়ে কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে একটা বাড়ি কিনেছেন। বিবেকানন্দ রোড তখন প্রায় নতুন রাস্তা, পাড়াটার ইজ্জত ছিল। তিনতলা বাড়ি,

অনেকগুলি ঘর। তখন বসতবাড়ি ভাড়া দেবার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না-আমরা গ্রাম থেকে এসে পিসেমশাইয়ের বাড়িতেই উঠতাম, বিসদৃশ কিছু দেখাত না তাতে। আমার জ্যাঠামশাই বয়সে ছোট হলেও তার ভগ্নীপতির সঙ্গে কথা বলতেন ভারিক্কি চালে। পারিবারিক সম্পর্কের মূল্য তখন ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার চেয়েও একটু বেশি।

আমার পিসেমশাই বিধবা বিবাহ করেছিলেন। অর্থাৎ, আমার পূর্ণিমা পিসিমা বিধবা হয়েছিলেন এগারো বছর বয়সে। সতেরো বছর বয়সে অমরনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তখন আমার পিসিমা গর্ভবতী। এর এক বছর আগেই অমরনাথ ভাদুড়ী আমার ঠাকুরদার কাছে পূর্ণিমা পিসিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানান। আমার ঠাকুরদা ওই অমরনাথ ভাদুড়ী নামক উদ্ধত ছোকরাকে রুপো বাঁধানো লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন। কেন না বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহের তত্ত্বটি অনেকেই কাগজ-কলমে সমর্থন করলেও নিজ পরিবারে চালাতে দেননি। তারপর পূর্ণিমা পিসিমার ওই অবস্থাটা জানার পর আমার ঠাকুরদা দেওয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে রক্ত বার করে ফেলেছিলেন। হায় হায় করেছিলেন অন্তত এক হাজার বার। কারণ, তখনকার দিনে ভদ্রঘরের বিধবারা যাতে দুশ্চরিত্রা না হয়ে যায় সেজন্য নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল তাদের কাশী পাঠিয়ে দিয়ে দশ-পনেরো টাকা করে মাসোহারা পাঠানো। তারপর সেখানে তারা বাঁচুক, মরুক বা চরিত্র নষ্ট করুক সে-খবর এত দূরে এসে পৌঁছোবে না। আমার ঠাকুরদা নেহাত কন্যার প্রতি মায়াবশত এ-ব্যবস্থা না নিয়ে ওই ভুলটি করেছিলেন।

পূর্ব বাংলার ছোট শহরে ওই ঘটনায় কী রকম হইহল্লা হয়েছিল তা বোঝাই যায়। তা ছাড়া অমরনাথ ভাদুড়ী ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল। তখনকার দিনে একটা চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। জমিদার বাড়িতে বা অনেক অবস্থাপন্ন বাড়িতেই পাঁচ-দশটি দুঃস্থ ছেলেকে থাকতে খেতে দিয়ে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হত। আমাদের পাড়াতেই রায়চৌধুরী বাড়িতে ওই রকম দুটি ছেলে থাকত, অমরনাথ ভাদুড়ী তাদের মধ্যে একজন, তিনি তখন কলেজের ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে বিরাট বিরাট শূন্য দুপুর, রায়চৌধুরীদের বাড়িতে কত ফঁকা জায়গা,

কত বড় বাগান! পূর্ণিমা পিসিমা ওই বাগানে জামরুল কিংবা কামরাঙা ফল পাড়তে যেতেন।

যাই হোক, অমরনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে পূর্ণিমা পিসিমার নমো নমো করে বিয়ে দিয়ে রাতারাতি তাঁদের দেশছাড়া করে দেওয়া হল। কলকাতাতেও না, কারণ সেখানেও অনেক চেনাশুনা লোক আছে, ওঁরা গিয়ে ঘর বাঁধলেন পাটনায়। তারপর ওঁদের ভুলে গেল সবাই। পূর্ণিমা পিসিমা মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন, কেউ কোনও দিন তাকে বাপেরবাড়ি আনার কথা বলেনি। এমনকী, পূর্ণিমা পিসিমার দু'বছরের মেয়েটি যখন স্মল পক্সে মারা গেল, তখনও কেউ দেখতে যায়নি আমাদের বাড়ি থেকে।

আমার ঠাকুরদা মারা যাবার পর, আমার বাবা-জ্যাঠামশাইরা হঠাৎ যেন উদার হয়ে উঠলেন। ততদিন পিসেমশাইরা পাটনা থেকে এলাহাবাদে চলে গিয়ে ব্যবসা করে বেশ বড়লোক হয়েছেন। আমার বাবা দিল্লিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ফেরার সময়। এলাহাবাদে পূর্ণিমা পিসিমাদের বাড়িতে থেকে এলেন। কয়েকদিন পর ফিরে এসে গল্পের আর শেষ হয় না। পিসেমশাইদের এলাহাবাদের বাড়িতে তিনজন ঝি-চাকর, একজন দারোয়ান, বাগানের জন্য একজন মালি–এবং সবচেয়ে বড় কথা, একজন। জমাদার রোজ সকালে এসে বাথরুম পরিষ্কার করে যায়। দোতলার বাথরুমে জমাদারের আসা-যাওয়ার জন্য বাড়ির পেছনে আলাদা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। পাড়াগাঁর মানুষের চোখে এসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

তার পরের বছর পুজোর সময় পূর্ণিমা পিসিমারা বেড়াতে এলেন আমাদের দেশের বাড়িতে। গাঁঠরি বাঁধা বাঁধা সব ধুতি-শাড়ি কম্বল এনেছিলেন গাঁয়ের মানুষের মধ্যে বেলাবার জন্য। বাড়ির প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা উপহার। পূর্ণিমা পিসিমা আমার মাকে দিয়েছিলেন জারমান সিলভারে বাঁধানো বড় আয়না। পিসেমশাইয়ের সুন্দর চেহারা। অঙ্গে পুরোপুরি সাহেবি পোশাক–তবু তিনি তার ছেলেবেলার পরিচিত মানুষজনের বাড়িতে গিয়ে দাওয়ায় বসে হুঁকোয় তামাক খেতেন–এইজন্য তার খাতিরের সীমা ছিল না। একদিন এই জায়গা থেকে তিনি অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন–

আজ সেখানেই ফিরে এসেছেন প্রবল প্রতাপে। সব মানুষই বোধহয় এ রকম ভাবে ফিরে আসতে চায়। কাউন্ট অফ মন্টোক্রিস্টো গল্পের মতন। পূর্ণিমা পিসিমার বয়সি বিধবা কিংবা স্বামী না-নেওয়া অবজ্ঞাত বউ আমাদের সেই ছোট শহরে তখন অনেক ছিল।

এক বারও শ্বশুরবাড়িতে যায়নি কিংবা সারা জীবনে তিন-চার বারের বেশি স্বামীকে চোখে দেখেনি–ব্রাহ্মণ পরিবারের এমন মেয়েমানুষের সংখ্যা তখন অজস্র। তিন-চার বছরের মেয়েকে থালার ওপর বসিয়ে বৃদ্ধ জরাবের সঙ্গে সাতপাক ফেরানো কিংবা রক্তমাংসের স্বামীর অভাবে কলাগাছের সঙ্গে সোমখ মেয়েদের বিয়ে দেওয়াও বেশি দিনের ঘটনা নয়। সেই রকম কোনও বিয়ের অনুষ্ঠান আমি চোখে দেখিনি বটে, তবে সেই সব বৃদ্ধাদের আমি দেখেছি। কচি বয়সের বিধবাকে সেই সময় চলতি কথায় বলা। হত, কড়ে রাঢ়ী। তারা পূর্ণিমা পিসিমার সৌভাগ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। পূর্ণিমা পিসিমারও তো ওই রকম অবস্থাই হওয়ার কথা ছিল। এখনও সবাই গল্প করে যে পূর্ণিমা পিসিমার স্বভাব খুব নরম, কারওর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। কিন্তু প্রতিবেশিনী কড়ে রাঢ়ীরা পূর্ণিমা পিসিমা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ওই জাত-খোয়ানো মাগির দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না! অত সুখ কপালে সইলে হয়!

সত্যিই সহ্য হয়নি। সেবার এলাহাবাদে ফিরে যাবার পর কিছুদিন বাদেই পূর্ণিমা পিসিমার চিঠিতে অন্য সুর দেখা দিতে লাগল। প্রায়ই পিসেমশাই সম্পর্কে নানা রকম অভিযোগ। পিসেমশাইয়ের ব্যবসায়ে মন নেই, হঠাৎ হঠাৎ কোথায় চলে যান তিন চার দিনের জন্য, বাড়িতে কিছু বলা কওয়া নেই। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে খুব মেশেন, মানুষটা বুঝি এবার সন্ন্যাসীই হয়ে যাবেন! এক বছর বাদে আবার অন্য রকম অভিযোগ, এবার আরও গুরুতর। পিসেমশাই একটি মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছেন। জ্যাঠামশাই এলাহাবাদ ছুটে গেলেন তার বোনকে বাঁচাতে। ফিরে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পূর্ণিমার কপালে দুঃখু আছে। অমরনাথকে ফেরানো যাবে না সে বড় আত্মম্ভরী মানুষ, অন্য কারওর কথা শোনে না। তা ছাড়া, সেই মুসলমান মেয়েটির মতন সুন্দর নারী এ-

দুনিয়ায় দুর্লভ, তাকে দেখলে মাথা ঠিক রাখা অনেক পুরুষের পক্ষেই শক্ত। পাঁচখানা মোহর দিয়ে তার নাচ দেখতে হয় নিরালায়। অমরনাথ এবার সর্বস্বান্ত হবে।

আমার ঠাকুমা তখনও বেঁচে, তিনি ঝঝের সঙ্গে বলেছিলেন, পূর্ণিমাকে তুই নিয়ে চলে এলি না কেন? ও-জামাইয়ের সঙ্গে আমরা আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। আগেই জানতাম

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, পূর্ণিমা আসতে চেয়েছিল। আমি ইচ্ছে করে আনিনি। পূর্ণিমা একবার চলে এলে বিষয়সম্পত্তির আর কিছুই কি ও পাবে? সব জলাঞ্জলি যাবে। তবু ও যেটুকু সামলে রাখতে পারে–

এরপর দু'-চার বছরের ইতিহাস একটু অস্পষ্ট। পিসেমশাই এলাহাবাদের বাড়ি বিক্রি করে চলে গেলেন গোয়ালিয়ার–পূর্ণিমা পিসিমাও সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং নর্তকীটিও। পূর্ণিমা পিসিমার একটি মেয়ে হয়ে মারা গিয়েছিল, আর কোনও ছেলেপুলে হয়নি। সেই নর্তকীর একটি ছেলে হয়, তার নাম সূর্য। এই ছেলেটি তার তিন বছর বয়স থেকে পূর্ণিমা পিসিমার কাছেই বেশি থাকত। পূর্ণিমা পিসিমা তখন তার আইন বহির্ভূত সতীনের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিলেন। সতীন থাকা তো তখনকার দিনে খুব অস্বাভাবিক ছিল না। আমার ঠাকুরদাই তিনটি বিয়ে করেছিলেন।

এলাহাবাদের সেই নর্তকীর নাম ছিল বুলবুল। পোশাকি নাম নাসিম-আরা বানু। এলাহাবাদ থেকে গোয়ালিয়ারে আসবার পর তার ভক্তসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই নিয়ে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে মন কষাকষি দেখা দেয়। তার ছেলে সূর্যর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন বুলবুল হঠাৎ আত্মহত্যা করেন বিষ খেয়ে। বুলবুল সেই সময় গোয়ালিয়ার রাজবাড়িতে মুজরো পেতে শুরু করেছিলেন–অনায়াসেই অমরনাথ ভাদুড়ীর মতন একজন মানুষকে পরিত্যাগ করতে পারতেন, তার বদলে আত্মহত্যা করার কোনও মানেই হয় না। সূর্য সেই থেকে পুরোপুরি পূর্ণিমা পিসিমারই ছেলে হয়ে গেল।

পূর্ণিমা পিসিমার শেষ জীবনটা মোটামুটি সুখেই কেটেছিল। স্বামীকে আবার সম্পূর্ণ ভাবে ফিরে পেয়েছিলেন এবং শেষ বার অসুখের সময় পেয়েছিলেন স্বামীর হাতের সেবা। বাবা আর মা গিয়েছিলেন সেবার, ফিরে এসে বললেন, পুরুষমানুষ যে ও ভাবে সেবা করতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অমরনাথের মনটা ভীষণ নরম–

পূর্ণিমা পিসিমার মৃত্যুর পর সূর্যকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে পিসেমশাই দু'বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেউ আর তার কোনও পাত্তা পায়নি। ওঁর গোয়ালিয়ারের বিষয়সম্পত্তি এবং ব্যবসা অরক্ষিত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন একমুখ চুলদাড়ি নিয়ে এসে উদয় হলেন। সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় এই বাড়ি কিনলেন।

এসবই আমার জন্মের আগেকার কথা। পূর্ণিমা পিসিমাকে আমি চোখেও দেখিনি কখনও।

একেবারে বাল্যকালের স্মৃতি মাঝে মাঝে দু-এক ঝলক মনে পড়ে, কিন্তু তার সত্যতা যাচাই করা যায় না। যে-পুকুরপাড়ে তিন বছর বয়সে খেলা করেছি মনে হয়, আসলে সে। পুকুরটা ঠিক সেই রকম দেখতে নয়। একটা শিউলি গাছের তলায় ফুল কুড়োতে যেতাম, প্রত্যেকটি শিউলি ফুলই কি শিশির-মাখা থাকত? স্মৃতি কেন সেই ছবি দেখায়? দুর্গাপুজোর এক মাস আগে কালো রঙের নিখুঁত পাঁঠা কিনে রাখা হত বলিদানের জন্য। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা ঘাসপাতা খাইয়ে মোটা করত সেই পাঁঠাগুলোকে। পাঁঠাকে খাওয়াবার জন্য ধানখেত থেকে ধানের ডগা ছিঁড়তে গেছি, ধারালো ধানপাতায় আমার। আঙুল কেটে গেল, ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। শৈশবের শুধু এই দৃশ্যটাই বা আমার মনে গেঁথে আছে কেন? আঙুলে দাগ পর্যন্ত নেই।

এমন অনেক জায়গার স্মৃতির ছবি হুবহু দেখতে পাই, আসলে যে-সব জায়গায় আমি কখনও যাইনি। যেমন, মানুষের জন্মদিনটির কথা তো মনে রাখা অসম্ভব, তবু যেন মনে হয়, আমার মনে আছে। ভীষণ বৃষ্টির দিনে জন্মেছিলাম বলে আমার নাম রাখা হয় বাদল। নার্সিং হোমে জন্মাইনি, মামাবাড়িতে, পাড়াগাঁর আঁতুড়ঘরে। উঠোনের মধ্যে সাময়িক

ভাবে বানানো। তিন দিন ধরে অশ্রান্ত বৃষ্টি-সেই সময় জন্মগ্রহণ করে আমি বাড়ির সবাইকে খুব বিপদে ফেলেছিলাম। একজন প্রৌঢ়া ধাইয়ের কৃতিত্বেই বেঁচে গেছি কোনওক্রমে। মা-মাসিদের কাছে পরে এতবার শুনেছি সেই গল্প যে, স্মৃতিতে যেন হুবহু দেখতে পাই সেই দৃশ্য-অঝোর বর্ষার মধ্যে একটি সদ্যোজাত শিশুর পায়ের পাতায় টোকা মারা হচ্ছে আর সে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে।

পাঁচ কি ছ'বছর বয়স থেকে পিসেমশাইয়ের কথা আমার মোটামুটি স্পষ্ট মনে আছে। একদিন ওঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

যে-সময়কার কথা বলছি তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগেনি। তার দু-এক বছর আগের কথা। তখন চাল কিনতে হত মুদির দোকানে, অনেক রকমের চাল সাজানো থাকত, তিন টাকা মণের খুব সরু চালের অর্ডার দিলে মুদির দোকানের লোকই বাড়ি পৌঁছে দিত। সেলুনে চুল কাটতে গেলে চুলকাটার ডিজাইন পছন্দ করার জন্য বাঁধানো ছবি থাকত সাহেবদের। অনেক সাহেবও তখন সিঁথি কেটে পাশে চুল আঁচড়াত। শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনের কাছে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত ঘোড়ারগাড়ি। যে চটের থলিকে এখন র‍্যাশন ব্যাগ বলে-সে-জিনিসের প্রচলন ছিল না। পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা কেউ শোনেনি। মিষ্টির দোকানে এক টাকার মিষ্টি কেনা হলে এক আনা পয়সা ফেরত দিত। এক পয়সা ও আধলার প্রচলন ছিল। ধুতির সঙ্গে শুমোজা পরা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কলকাতায় অনেক রাস্তাতেই গ্যাসের আলো জ্বলত। গান্ধীজি, সুভাষ বোস, ফজলুল হকেরও প্রচুর নিন্দুক ছিল। গলিতে গলিতে ক্রিকেটের বদলে ড্যাংগুলি বা চু-কিতকিতের খেলা চলত। ইস্কুলে ভরতি হবার আগে যেতে হত পাঠশালায়। নাপিতকে বলা হত পরামানিক।

কলকাতায় তখন বাঙালরা ছিল প্রকৃতপক্ষেই সংখ্যালঘু। নাটক নভেলে হাস্যকর চরিত্র উপস্থাপিত করার জন্য অবধারিত ভাবে ব্যবহার করা হত বাঙাল ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যার শুরু। বাঙালরা কলকাতায় এসে অতি দ্রুত কলকাত্তাই ভাষা শিখে নেবার চেষ্টা করে

জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলত। বাঙালদের মুখে অতি মিহি গলায় কলকাতার ভাষা বলতে শুনলেই হাসি পেত।

বাঙালদের সম্পর্কে তখন চিত্তাকর্ষক কয়েকটি ছড়াও প্রচলিত ছিল, সেগুলির রচয়িতার নাম জানা যায় না। পথে-ঘাটে প্রায়ই ছোটদের মুখে শোনা যেত :

বাঙাল মনুষ্য নয়
অদ্ভুত জন্তু
লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে
ল্যাজ নাই কিন্তু!

আসলে ‘ অদ্ভুত’ কথাটার বদলে অন্য কিছু ছিল, সেটা এক ঢিলে দু’পাখি মারার ব্যাপার। সে-শব্দটা এখন ব্যবহার না করাই ভালো। ছড়াটির মধ্যে কিন্তু বেশ কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে। আরও শোনা যেত :

বাঙাল
চিংড়িমাছের কাঙাল!

এটার ঠিক মানে বোঝা যায় না। কেন না বাঙালদের সঙ্গে ইলিশ মাছই বেশি জড়িত। চিংড়িমাছও বাংলাদেশে কম পাওয়া যায় না। সুতরাং তারা বেছে বেছে চিংড়িমাছের কাঙাল হবে কেন কে জানে।

বাঙালদের বোধহয় ছড়া বানাবার ক্ষমতা কম কিংবা সংখ্যালঘু বলে ভয় পেত। কারণ বাঙালরা কোনও ছড়া বানিয়ে কলকাতার লোকদের যোগ্য উত্তর দিতে পারেনি। কলকাতার লোকদের কোনও দুর্বোধ্য কারণে তারা ঘটি আখ্যা দিয়েছিল, এবং বড়জোর কখনও চেঁচিয়ে বলত, ঘটি, ফুটো ঘটি!

বাঙালদের সম্পর্কে আর একটি ছড়া নিশ্চয়ই কোনও ঘটনা উপলক্ষে রচিত। কিন্তু এটিও বেশ জনপ্রিয় ছিল :

বাঙালো
রস খাইলো
ভাড় ভাঙিলো
পয়সা দি–লো–না!

শেষের দিলো না'টা খুব টেনে টেনে বলেই ছুটে ছুটে যাওয়া নিয়ম ছিল। কারণ, এটাতেই বেশি রেগে যেত বাঙালরা। বাঙালরা সাধারণত গোঁয়ার এবং তাদের হাতের টিপ অব্যর্থ, তারা ইট ছুঁড়ে মারতে যায়।

সব পাড়ার মধ্যেই একটি বাড়ি 'বাঙালদের বাড়ি' বলে পরিচিত হত তখন সে বাড়ির ছেলে বাঙালদের ছেলে, সে বাড়ির বউ বাঙালবাড়ির বউ। বাঙাল ও ঘটিদের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে প্রায় নিষিদ্ধই ছিল বলা যায়। কলকাতায় আমি এই রকমই একটা বাঙাল বাড়িতে থাকতাম।

একদিন বিকেলবেলা পিসেমশাই আমাকে বললেন, বাদলা, তোর মা-কে গিয়ে বল, তোকে ভালো জামা-প্যান্ট পরিয়ে দিতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বড়বাবু, আমি কোথায় যাব?

পিসেমশাই বললেন, চল, তোকে এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

তাই শুনে বাড়ির অন্যান্য বাচ্চারা আমিও যাব, আমিও যাব বলে চাঁচামেচি শুরু করে দিল। বড়বাবু বললেন, না, আর কেউ না! শুধু ও একলা যাবে।

বড়বাবু সাধারণত বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন না। আমাদের বাড়িতে বাচ্চাও তখন ছ'সাত জন। বড়বাবু হঠাৎ সেদিন আমাকে কেন বেছে নিয়েছিলেন জানি না। ভাগ্যিস নিয়েছিলেন।

২. অমরনাথ যখন বাদলকে নিয়ে

অমরনাথ যখন বাদলকে নিয়ে বেরোলেন, তখন বিকেল পাঁচটা। গ্রীষ্মের শুরু। বঙ্গোপসাগরের বিখ্যাত বাতাস এসে কলকাতাকে ভাসিয়ে দেয়। আকাশে ধোঁয়া নেই। বাড়ির ছাদে ছাদে ছেলেদের ঘুড়ি ওড়াবার খুব হুল্লোড়। মহাত্মা গান্ধী তখন কলকাতায় এসেছেন।

অমরনাথ পরেছেন ফিনফিনে কোঁচানো ধুতি ও কলিদার পাঞ্জাবি, কাঁধে উড়ুনি, পায়ে নিউকাট পাম্পশু, হাতে বেতের ছড়ি। চুল এখনও কালো, তবে গোঁফে পাক ধরেছে। শিশিরবাবুর মতনই মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত থাকে নামানো। জামার ঘড়ি-পকেটে মস্ত বড় গোল সোনার ঘড়ি। বাদলকে তার মা হাফপ্যান্ট ও সাটিনের জামা পরিয়ে দিয়েছেন, মাথার চুল পাতা কেটে আঁচড়ানো। সে মহা উৎসাহে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে অমরনাথের পাশে পাশে। অমরনাথ বললেন, উঁহু, ও রকম করবে না, সব সময় আমার হাতের এই আঙুলটা ধরে থাকবে।

বড় রাস্তার ওপর বাদলের বাবা চিররঞ্জন কথা বলছিলেন আর একটি লোকের সঙ্গে। অমরনাথের সঙ্গে ছেলেকে দেখে একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বড়বাবু, কোথায় চললেন! গুরুদাসে নাকি?

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের দোকানে প্রায়ই বিকেলের দিকে গল্প করতে যেতেন বড়বাবু। ওখানে জীবিতকালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসতেন প্রায়ই।

অমরনাথ বললেন, না হে, একটু দক্ষিণে যাব। তোমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আবার রাত্তিরে ভালো চোখে দেখতে পাই না তো! একটু দেরি হলে চিন্তাটিন্তা কোরো না।

অমরনাথের দৃষ্টিশক্তি খুবই ভালো, বইপড়ার সময় একটা রিমলেস চশমা ব্যবহার করেন মাত্র, কিন্তু তিনি সামান্য রাতকানা।

মোড়ের মাথায় এসে বড়বাবু প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি সিগারেটের একটা টিন কিনলেন। ধপধপে সাদা এই সিগারেটের টিন খালি হয়ে যাবার পর বাড়ির মেয়েদের কাছে খুব প্রিয় ছিল তখন। ঢাকনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরের টিন ফয়েল কেটে অমরনাথ প্রথমে পুরো টিনটার গন্ধ নিলেন নাকে, তারপর একটা সিগারেট বার করে ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ উদাস ভাবে তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। অমরনাথ আজ বেশ অন্যমনস্ক।

বাদলের ইচ্ছে ছিল ঘোড়ারগাড়ি চড়ার, কিন্তু বড়বাবু তা নিলেন না। বাসের জন্য দাঁড়ালেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। বৃষ্টি না হলে বিকেলের দিকে হুডখোলা দোতলা প্রাইভেট বাসে ভ্রমণ করা তখন চমৎকার বিলাসিতা। সেই রকম একটা বাসেই ওপরে জায়গা পাওয়া গেল। বাদলের উত্তেজনার শেষ নেই। এ রকম ভাবে এর আগে আর সে কলকাতায় বেড়ায়নি। শহরটাকে মনে হয় যেন মায়াপুরী। দু'পাশের বিরাট বিরাট বাড়ির মাঝখান দিয়ে রাস্তা-চলন্ত বাসের ওপর দিয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, এ-সবই যেন ছবির বইতে দেখা জগৎ। সদ্য গ্রাম থেকে আসা বাদলের চোখে ট্রামগুলোকে মনে হয় ছোট ছোট স্টিম লঞ্চের মতন।

চৌরঙ্গিতে সাহেব-মেমের ভিড়ই বেশি। ময়দানে দেখা যায় অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ নর। ইলেকট্রিক অফিসের মাথায় উজ্জল গ্লোব বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। মেট্রো সিনেমায় আলো জ্বলছে, চওড়া থেকে শুরু হয়ে যাওয়া লম্বাটে কয়েক থাক আলো রয়েছে হলের মাথায়, তখনকার দিনে এর নামই ছিল মেট্রো প্যাটার্ন, লোকে আংটি তৈরি করত এই ডিজাইনে। পাশেই হোয়াইটওয়ে লেড ল'র বিশাল দোকান। কার্জন পার্কের দিকে সার

বেঁধে দাঁড়ানো গাড়ি। বালকের বিস্মিত চোখে এইসব দৃশ্যের ছাপ বুকে এঁকে নেয়। অমরনাথ চুপচাপ বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন।

বাড়িটার সামনে লোহার গেট, সেখানে নোটিস ঝোলানো, কুকুর হইতে সাবধান! কিন্তু গেটের ওপাশের বাগানে কুকুর কিংবা মানুষজনের কোনও চিহ্ন নেই। বাদল বানান। করে বাংলা পড়তে পারে। অমরনাথ দু বার চেঁচিয়ে ডাকলেন, সুরেশ্বর, সুরেশ্বর! কোনও সাড়া নেই। অমরনাথ তখন হাতের ছড়িটা দিয়ে লোহার গেটে ঠং ঠং করে আওয়াজ করতে লাগলেন। একটু বাদেই একজন বৃদ্ধ চাকর এসে উঁকি মেরে বলল, পঁড়ান, কুকুর বেঁধে আসি। এই প্রথম একটি কুকুরের গম্ভীর হিংস্র ডাক শোনা গেল, বাদল গুটিসুটি মেরে দাঁড়াল বড়বাবুর পেছনে।

লোহার গেট পেরিয়ে একটি ছোট বাগান। তার ঠিক মাঝখানে খানিকটা ঘেরা জায়গায় জল, সেখানে খেলা করছে লাল-নীল মাছ। জলের ওপরে একটা সাদা পাথরের পরি ডানা মেলে আছে, যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে। বাদল সে-দিকে ছুটে যাচ্ছিল, অমরনাথ বললেন, উঁহু ও-দিকে নয়, ভেতরে এসো!

বসবার ঘরটা মস্ত হলঘরের মতন। দেওয়ালে দেওয়ালে অনেক ছবি। অধিকাংশই ফ্যামিলি পোর্ট্রেট। এ ছাড়া পঞ্চম জর্জ, এক হাতে সীতাকে ধরে রেখে অন্য হাতে রাবণ জটায়ু বধ করছেন এবং কনস্টেবলের আঁকা প্রকৃতিদৃশ্যের কপি। ছাদ থেকে ঝুলছে মস্ত বড় ঝাড়লণ্ঠন, কিন্তু সদ্য-স্থাপিত ইলেকট্রিক বালবই আলো দিচ্ছে। কল টিপলেই জল পড়ে এবং সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে–এই বিস্ময়ের ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি।

একজন মাঝবয়সি লোক ঘরে ঢুকলেন। সিল্কের লুঙ্গি ও সিল্কের ফতুয়া পরে আছেন, মাথায় সম্পূর্ণ টাক। মাথায় একটাও চুল নেই, এ রকম মানুষ বাদল আগে কখনও দেখেনি। বাদল বড়বাবুর চোখের দিকে তাকাল, বড়বাবু ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ইনিও ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম করতে হবে। অব্রাহ্মণ বয়স্ক ব্যক্তিদেরও তখন ব্রাহ্মণ শিশুরা প্রণাম

করে না। বড়বাবু বললেন, ইটি আমার মেজ শালার ছেলে। সুরেশ্বর, ব্যস্ত ছিলে নাকি? হঠাৎ এসে পড়লাম।

টাকমাথা ব্যক্তিটি অমরনাথকে প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে না না, কিচ্ছু ব্যস্ত ছিলাম না। আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য! তবে একটু আগে থেকে যদি খবর দিয়ে আসতেন, তা হলে জাফর আলি খাঁ সাহেবকে বলে রাখতাম, একটু গানবাজনা করা যেত। আপনি এখনও চর্চা রেখেছেন তো?

অমরনাথ উদাসীন ভাবে বললেন, না, ও-সব চুকে গেছে।

সুরেশ্বর বললেন, সে কী! গোয়ালিয়ারে সেই সেবার আপনার মুখে যে আলাহিয়া বিলাবল শুনেছিলাম, এখনও কানে লেগে আছে।

সে নেশা আমার কেটে গেছে! সুরের চর্চা করে কেন মানুষ, আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য তো? আমার সে-সব কিছু হল না। সুরের চর্চা করেছিলুম শুধু গলা দিয়ে, আর কিছু না শুধু কণ্ঠস্বরের খেলা!

ও কথা বলছেন কেন! আনন্দ পাওয়াটাই বড় কথা। যে আনন্দ-

সুরেশ্বর হঠাৎ বাদলের দিকে ফিরে বললেন, খোকা, তুমি এখানে চুপটি করে বসে আছ কেন? তুমি ওপরে চলে যাও না! তোমার বয়সি আরও ছেলেপুলে আছে-খেলা করবে না?

বাদল লাজুক, সে একা একা ওপরে যাবে না। সে তার ছোট্ট শরীরে একটু মোড়ামুড়ি দিল।

অমরনাথ বললেন, সুরেশ্বর, আমিও একটু উপরে যাব। তোমার মা এখন কেমন আছেন?

সুরেশ্বরের মুখে সামান্য একটু বিস্ময়ের ছায়া খেলেই লুকিয়ে গেল। বললেন, মা? এই এক রকমই, মানে-

এখন এখানেই আছেন? এই সপ্তাহে তোমার এখানে আনানো হবে শুনেছিলাম।

হ্যাঁ, কাল এসেছেন!

আমি একটু দেখা করব। দেখা করা যাবে? আমি সেই জন্যই এসেছি।

দেখা করবেন। তা বেশ তো! দেখছি, ঘুমিয়ে আছেন কিনা।

শোনো! উনি বাইরের লোক দেখলে বিরক্ত হন না তো?

আপনি তো বাইরের লোক নন! অন্তত মার কাছে আপনি...

সেটা যদি আমাকে চিনতে পারেন-চিনতে পারেন এখন সবাইকে? স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে?

মা'র স্মৃতিশক্তি এত ভালো যে, বিশ্বাসই করা যায় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মা'র অনেক সময় কাছাকাছি সময়ের ঘটনা মনে থাকে না-অথচ বহু পুরনো ঘটনা এমন মনে আছে...কিন্তু কখন কথা বলবেন, কখন চুপ করে থাকবেন, তার কোনও ঠিক নেই! দাদা মারা যাবার পর সেই যে মাথাটা কী রকম হয়ে গেল-

চলো, একবার যাই-

দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরেই বিরাট পালঙ্কে শুয়ে আছেন মন্দাকিনী। ঠিক শোয়া নয়, তিন-চারটে বালিশে হেলান দিয়ে বসা, চাদর দিয়ে শরীর ঢাকা। ঘরের সব জানলা। বন্ধ, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল একটা আলো জ্বালানো রয়েছে। ঘরের সব আসবাবপত্রে ঐশ্বর্যের ঝকঝকে চিহ্ন। একটা কাঁচের আলমারি-ভরতি দামি দামি জার্মান পুতুল। কালো মেহগনি কাঠের তৈরি আর একটি আলমারির মাথায় একটি অপরূপ ঘড়ি, প্রতি পনেরো মিনিট

অন্তর তার ভেতর থেকে একটা কোকিল বেরিয়ে এসে ডেকে যায়। ইংল্যান্ডের ডার্বি লটারির ফাস্ট প্রাইজ সাড়ে সাত লাখ টাকা একবার পেয়েছিলেন। মন্দাকিনী।

বিছানার ওপর আধাশোয়া তার চেহারা দেখে ঠিক মানুষ বলে মনে হয় না। মাথা-ভরতি ধপধপে সাদা চুল। অতিরিক্ত ফরসা ও বিবর্ণ মুখখানা মনে হয় মোমের তৈরি, ঠোঁটদুটি অস্বাভাবিক রকমের লাল। সব মিলিয়ে, যেন একটা অপ্রাকৃত পুতুল। অবিশ্বাস্য শীর্ণ একখানা হাত বুকের ওপর রাখা, সেই হাতে চারখানা আংটি, বহুমূল্য পাথর বসানো। মন্দাকিনী চোখ বুজে আছেন।

অমরনাথ সুরেশ্বরের সঙ্গে সেই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মানুষজনে ঘর ভরে গেল। বেশ কয়েক জন মহিলা, কয়েকটি শিশু। সবাই প্রণাম করল অমরনাথকে। বাদল প্রণাম করল তাদের। একজন রূপসি মহিলা বাদলের হাত ধরে বললেন, বাঃ, কী সুন্দর ছেলেটি! এই, এই, মুখ নিচু করে আছ কেন? তাকাও আমার দিকে, তোমার নাম কী?

সেই ঘরের মধ্যে সবাই বেশ স্বচ্ছন্দে গোলমাল করছে।

অমরনাথ সুরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘুমোচ্ছন নাকি? তা হলে এখন যাই বরং–

সুরেশ্বর বললেন, আপনার বিব্রত হবার কিছু নেই। মা আজকাল প্রায় একদমই কানে শুনতে পান না! জেগেই আছেন বোধহয়।

অমরনাথের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খুব নিরাশ হয়ে গেলেন মনে হয়। আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু, আমি যে ওঁর কাছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

কী কথা? আমাকে বলুন না!

তুমি পারবে না। সেসব শুধু উনিই জানেন।

ঠিক আছে, মাকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শান্তি, তুমি মার পাশে একটু বসো তো!

সেই রূপসি মহিলা বসলেন মন্দাকিনীর মাথার কাছে একটা চেয়ার নিয়ে। অমরনাথ চাঁদরের ওপর দিয়েই মন্দাকিনীর পাদুটি স্পর্শ করলেন। চোখ না মেলেই মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করলেন, কে?

ওঁর গলার স্বর কিন্তু আশ্চর্য রকম পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ। বয়সের কোনও জড়তা নেই।

অমরনাথ বললেন, বড়মা, আমি অমর!

মন্দাকিনীর চোখ বোজাই রইল। মাথার কাছে বসা সেই মহিলা মন্দাকিনীর একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে কু দেবার মতন করে বললেন, মা, অমরদাদা এসেছেন। অমরদাদা!

মন্দাকিনী এবার চোখ খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, একটুও মুখ ফেরালেন না। তারপর হাত দিয়ে পাশে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। শান্তিলতা তাড়াতাড়ি যে জিনিসটা মন্দাকিনীর হাতে তুলে দিলেন, সেটা দেখে বাদলের মনে হয়েছিল, হাতল লাগানো গোল আয়না, কিন্তু আসলে সেটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। সেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মন্দাকিনী অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন অমরনাথকে। তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে। উঠলেন, অমর, তুই বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিসনি কেন? আঁ, তোর চোখের চামড়া নেই? নিমকহারাম!

অমরনাথ লাজুক ভাবে ঘরের সবার দিকে চকিতে তাকালেন। মন্দাকিনীর পায়ের কাছে বসে-থাকা ওই বিশাল চেহারার পুরুষটিকে তখন শিশুর মতন লাগছিল। পঁয়তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। অমরনাথ বিয়ে করেছিলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে-সেই সময়কার ব্যাপার নিয়ে কেউ এখন অভিযোগ করতে পারে, তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তার বিয়ে হয়েছিল অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে-সেকথা এখন বলা যায় না। তা

ছাড়া এই প্রশ্ন মন্দাকিনী তার আগেও কয়েক বার জিজ্ঞেস করেছেন। অমরনাথ কোনও উত্তর দিলেন না।

মন্দাকিনী আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ বউকে সঙ্গে এনেছিস? কোথায় সে? পেন্নাম করেছে?

অমরনাথ মৃদু গলায় বললেন, পূর্ণিমা মারা গেছে।

কাকাতুয়া পাখি যে রকম চিৎকার করে ওঠে, সেই রকম ভাবে মন্দাকিনী চেঁচিয়ে উঠলেন, কী? কী বললি?

তখনও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস চোখের সামনে রাখা। সোজা তাকিয়ে আছেন অমরনাথের মুখের দিকে। খুব সম্ভব ঠোঁট নাড়া দেখে তিনি কথা বোঝার চেষ্টা করেন, এখন পারছেন না।

শান্তিলতা আবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, উনি বললেন, ওঁর স্ত্রীর নাম পূর্ণিমা, তিনি বেঁচে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারা গেছেন! পাঁচ-ছ' বছর আগে।

মন্দাকিনী আবার চুপ। কথাটা তার মগজে ঢুকতে কিছুক্ষণ সময় লাগল যেন। তারপর আবার সেই রকম তীক্ষ্ণ গলায় জানালেন, ভালোই হয়েছে! বেঁচে গেছে। মেয়েটা! ওর মতো একটা বাউন্ডুলে, অলপ্পেয়ে, লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়েছিল–

ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বাদল। তার অমন গম্ভীর রাশভারী পিসেমশাইকে কেউ অমন ভাবে ধমকাতে পারে, সে কখনও কল্পনাই করতে পারেনি।

পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ব্যাপার আছে!

ছেলেপুলে কিছু হয়েছিল? না বংশনাশ করবি?

একটু ইতস্তত করে অমরনাথ উত্তর দিলেন, আমার একটি ছেলে আছে। হাজারীবাগের বোর্ডিং ইস্কুলে পড়ে।

চাঁদরের তলা থেকে আর একটি হাত বার করে মন্দাকিনী অন্য কী যেন খুঁজছেন। শান্তিলতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন একটা পিকদানি। মন্দাকিনী নিঃশব্দে কী ফেললেন তাতে, মনে হয় টুকটুকে লাল রক্ত, অথবা পানের পিকও হতে পারে। কেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর এক খিলি পান মুখে দিলেন। তারপর আর একটু উঁচু হয়ে বসে বললেন, তুই কাকে যেন বিয়ে করেছিলি?

তার নাম ছিল পূর্ণিমা।

না-না, কাকে বিয়ে করেছিলি যেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

পূর্ণিমা ফুলবাড়ির মুখুজ্যের মেয়ে!

চুপ! মনে পড়েছে। তুই বিধবা বিয়ে করেছিলি! ঠিক?

হ্যাঁ।

শান্তিলতাকে আর বলে দিতে হল না, মন্দাকিনী ঠোঁট নাড়া দেখে নিজেই প্রায় সব বুঝতে পারছেন। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে তিনি কঠোর ভাবে বললেন, তুই আমার বিছানা ছুঁয়েছিস কেন? যা চলে যা! বিদায় হ!

অমরনাথ এই প্রথম হাসলেন। প্রফুল্ল মুখে বললেন, বড়মা, আমি একটি মুসলমান মেয়েকেও বিয়ে করেছিলাম।

মন্দাকিনী শান্তিলতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী? কী বলল?

শান্তিলতা অবনত মুখে বসে রইলেন। বলতে পারলেন না। মন্দাকিনী আবার তাড়া দিলেন, বউমা, কী বলল ওই নচ্ছারটা? এই, তুই কাছে এগিয়ে আয়, নিজে বল আমার কানের কাছে!

অমরনাথ দ্বিতীয় বার কথাটা উচ্চারণ করার পর মন্দাকিনী বুঝতে পেরে চোখ বুজলেন। আস্তে আস্তে বললেন, বেরিয়ে যা! দূর হয়ে যা! এক্ষুনি যা!

অমরনাথ বললেন, না, আমি যাব না।

এই সন্টু! একে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় কর! এই আপদটাকে কেন ঘরে ঢুকতে দিয়েছিস!

বড়মা, আমি যাব না!

সন্টু! রামপিয়ারীকে ডাক! একে দূর করে দে বাড়ি থেকে!

বড়মা, আমি যাব না!

সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। তারও মুখে একটু একটু হাসির চিহ্ন। এইসব কথাবার্তা তিনি আগেও শুনেছেন, দেখেছেন এই দৃশ্য।

তুই কেন এসেছিস? টাকা! টাকা চাস আমার কাছে? আমি কারোকে এক পয়সা দেব না। আমি আরও অনেক দিন বাঁচব। কম্পানির কাগজ সব উইল করে রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে যাব-গয়নাগাঁটিগুলো হামানদিস্তে দিয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তার ধুলোয় মিশিয়ে দেব।

বুঝলি! আমার কাছ থেকে একটা পয়সাও পাবে না।

আমি টাকা চাইতে আসিনি! বড়মা, আমি তোমার কাছ থেকে কি কোনও দিন টাকাপয়সা চেয়েছি? ভগবানের ইচ্ছেয় সে রকম অবস্থা আমার কখনও হয়নি।

কিছু পাবি না! দূর হয়ে যা!

আমি যাব না!

মন্দাকিনী আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন অমরনাথকে। তারপর হঠাৎ খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই কেন এসেছিস?

আমি তোমার কাছে আমার মায়ের কথা শুনতে চাই।

কী?

আমাকে আমার মায়ের কথা বলো।

মা? তোর আবার মা কে? আমিই তো তোর মা! অকৃতজ্ঞ, কুলাঙ্গার! তুই আমার বুকের দুধ খাসনি? তিন তিনটে বছর ধরে আমি তোকে ঘুম পাড়াইনি প্রত্যেক রাত্তিরে! গু-মুত পরিষ্কার করেছি পর্যন্ত। তারপর ডানা গজাতেই পাখি উড়ে গেল। আমার আর খোঁজ করেছিলি? সেবার যখ আমি মরতে বসেছিলুম, একবার এসেছিলি? এখন আসা হয়েছে মায়ের জন্য দরদ দেখাতে।

বড়মা, তোমার কাছে আমি আমার নিজের মায়ের কথা শুনতে এসেছি।

কী বলছিস, কী? আমি কানে শুনতে পাই না, জানিস না? শুয়োরের মতন গাঁক গাঁক করে চাঁচাতে হবে না তাই বলে-মুলুক সুদ্ধ লোককে জাগিয়ে! আরও কাছে আয়, আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বল

ক'দিন ধরে আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। মাকে কখনও দেখিনি, তুমি ছাড়া আমার মায়ের কথা এখন আর কেউ জানেও না! তুমি বলো তো, কী রকম দেখতে ছিল তাকে? খুব রাগী ছিল? কিংবা খুব জেদি ছিল?

হাত দিয়ে বিছানার একটা অংশ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বোস এখানে! তোকে দেখলে আমার গা জ্বলে! কেন আসিস?

মন্দাকিনী তার শীর্ণ হাতখানা রাখলেন অমরনাথের গায়ে। আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, জন্মরাত্তিরেই মা মারা গেলে, সেই ছেলে কখনও বাঁচে? লাখে একটা বাঁচে কিনা সন্দেহ। তোকে বাঁচিয়েছিল এই বামনি, বুঝলি? আমার বাবা বলতেন, ও ছেলেকে জলে ডোবালে কিংবা আগুনে পোড়ালেও মরবে না! ও অমর! তা স্বাস্থ্যটি তো এখনও দিব্যি আছে দেখছি, কত বয়স হল?

ঊনষাট!

আমার রত্নেশ্বর বেঁচে থাকলে এই বয়স হত। সে তো দিব্যি আমার আগেই ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল! একটু চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত নেই! তা সে মরল কেন, তার বদলে তুই যেতে পারলি না?

আমার ও রকম নাম রেখেছিলে কেন?

রত্নেশ্বর আর তুই একবয়সি। দেড় মাস আগে পরে জন্ম। তোর মা চোখ বোজার আগে আমার হাত ধরে বলেছিল-মন্দা, তোর ছেলে যদি বাঁচে, তা হলে আমার ছেলেও যেন বাঁচে-

বড়মা, ও-সব জানি। তুমি আমার জন্মের আগের কথা বলো।

কতকাল আগের কথা, সেকি আমার মনে থাকে?

যেটুকু মনে পড়ে।

কেন, হঠাৎ শুনতে চাইছিস কেন?

কদিন ধরে খুব মনে পড়ছে। আচ্ছা, আমার মাকে দেখতে কেমন ছিল?

সরো আমার থেকেও লম্বা ছিল। তবে তোর গায়ের রং পেয়েছিস বাপের কাছ থেকে। সরোর রং ছিল একটু চাপা। তোর বাপ তো তোদের খোঁজও নিত না। সরো মারা যাবার খবরও পায়নি। আমার মনে আছে, তোর যখন দেড় বছর বয়স, তখন তোর হতচ্ছাড়া বাপ এল একদিন। তুই তখন আমার কোলে, তোর বাপ বলল, ইটি আপনার পুত্তুর বুঝি! সে আবার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলত তো! মরে যাই, মরে যাই! ঝাটা মারি ও রকম পুরুষমানুষের মুখে!

আমার বাবার কথা আমি জানি! তুমি আমার মায়ের কথা বলো। চোখদুটি কী রকম ছিল?

কী আর বলব! মুখপোড়ারা একটা ছবিও তুলে রাখেনি তার! একটা চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

১৪.

অমরনাথ পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভেলভেট-মোড়া বাক্স বার করলেন। তার মধ্যে থেকে অনেকগুলো কাগজের পরত খোলার পর বেরিয়ে এল একটা বহুকালের পুরনো বিবর্ণ কাগজ। সেটার ওপরে একটি নারীর পায়ের ছাপ আঁকা। অমরনাথ সেটা সাবধানে তুলে ধরে বললেন, এই যে, আমার মায়ের শুধু এইটুকু চিহ্ন আছে আমার কাছে। তুমিই দিয়েছিলে। আচ্ছা বড়মা, ছাপটা কি বিয়ের দিন তোলা হয়েছিল, না অন্য কোনও সময়ে?

দলিল পরীক্ষা করার মতন মন্দাকিনী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কাগজটা দেখলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার মনে নেই। আমি জানি না।

তুমিই তো এটা আমাকে দিয়েছিলে। তুমি জানো না?

মন্দাকিনী খুব জোরে কাশতে কাশতে পিকদানিটা তুলে নিলেন। আবার তাতে ফেললেন রক্তের মতন কিছু। যখন মুখ তুললেন, দেখা গেল তার চোখে জল।

অমরনাথ একটু অপেক্ষা করলেন। চোখের জল তখনও থামছে না দেখে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছিয়ে দিলেন মন্দাকিনীর মুখ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাঁপানি কি বেড়েছে?

চুপ কর তো হতচ্ছাড়া! দরদ দেখাতে হবে না।

বড়মা, বলো, এই ছাপটি নিশ্চয়ই-

হ্যাঁ, যা ভাবছিস তাই। সরোজিনীকে চিতায় তোলার পর তার পায়ে আলতা লাগিয়ে এই ছাপ তোলা হয়েছিল। আমার ভাই বিষ্টু বুদ্ধি করে তুলেছিল। তুই তখন একরত্তি ছেলে; আমি তোর গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছি, বাঁচানো যাবে কিনা ঠিক নেই, বিষ্ণু শ্মশান থেকে ফিরে বলল, দিদি, এর মাথায় এই কাগজটা ছুঁইয়ে দেও!

আমার মায়ের সঙ্গে তোমার এত ভাব ছিল কী করে? আমার মা তো গরিবের মেয়ে ছিলেন-মামাবাড়িতে মানুষ।

তুই তখন একরত্তি ছেলে, এইটুকু-এখন লম্বা চওড়া জোয়ান হয়ে মুখে খই ফুটছে।

অমরনাথ হাসতে হাসতে বললেন, এখনও জোয়ান বলছ? এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি! তুমি অনেক দিন পরে দেখছ।

মন্দাকিনী রেগে উঠে বললেন, বুড়ো? সেদিনের ছেলে! এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দুপদাপ করে হামাগুড়ি দিতিস! বড্ড নোলা ছিল তোর, খেজুরের গুড় খেতে ভালোবাসতিস খুব। গুড় খেয়ে পেটে এত বড় বড় কিরমি হল-

বড়মা, তোমার এসব কথাও মনে আছে?

আমার সব মনে আছে। আমি কিছু ভুলি না।

তা হলে, আর একটা কথা বলো তো! আমার জন্যই কি আমার মা মারা যায়?

কথার ছিরি দেখো ছেলের? এতদিনেও ঘটে একটু বুদ্ধি হল না? ছেলে কখনও মাকে মারে! তুই তোর মাকে মারবি কেন, তুই সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিস!

মন্দাকিনী অতিকষ্টে পাশ ফিরলেন। রোগা হাতখানি ছোঁয়ালেন অমরনাথের গালে। খুব নরম ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হারে, হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন?

জানি না! এমনিই–

শোন, রোজ রাত্তিরে ইসবগুলের ভুসি জলে ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা খাবি। তাতে শরীর ঠান্ডা থাকবে।

আমার মা কি খুব কষ্ট পেয়েছিল?

কখন?

আমার জন্মের সময়? না হলে, আমার জীবনটা এ রকম হয়ে গেল কেন?

দোতলার চওড়া বারান্দায় বাচ্চারা তখন খেলা শুরু করে দিয়েছে। বাদলকেও টেনে নিয়ে গেছে। চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা। কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছে- ছুঁয়েই নাম বলতে হবে। বাদল ওদের কারওর নাম জানে না-ওরাও বাদলের নাম জানে না। বাদলের চেয়ে বছর তিনেক বয়সে বড় একটি ছেলে বলল, এই, তোর নাম কী রে? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?

মাই নেম ইজ বাদলরঞ্জন মুখার্জি। আই রিড ইন ক্লাস টু।

কী নাম বললি? বা-দ-অল! না বাদোল! তুই বুঝি বাঙাল?

অমনি আর সব ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল, বাঙাল! বাঙাল!

বড় ছেলেটি বলল, এই চুপ! জ্যাঠাইমা বকবে! বাদল আবার কী নাম? ও রকম নাম তো চাকরদের হয়।

বাদলের মনে খুব আঘাত লাগল। অনেক কিছু প্রতিবাদ করবে ভেবেও সে শুধু বলল, মোটেই না!

যাকগে, বুঝেছি, বাঙালদের ও রকম নাম হয়। তোর ভালো নাম কী? তোর ভালো নাম নেই?

বাদলের একটাই নাম। ডাকার সময় বাড়ির লোক বলে বাদলা! কিন্তু সেটা তো ওদের জানানো যায় না। সে মাথা নাড়ল দু'দিকে!

এ মা, ডাক নাম আর ভালো নাম এক? আমাদের সক্কলের দুটো করে নাম। এই তো, ওর নাম গগনেন্দ্র আর ডাক নাম হেবো, ওর নাম শঙ্করী আর ডাক নাম চুটকি, এর নাম পার্থসারথি আর ডাক নাম পলতা, আর এই যে, রেণু, তোর ভালো নাম কী রে?

একটা তিন-সাড়ে তিন বছরের পুঁচকে মেয়ে আঙুল চুষতে চুষতে বলল, ইন্দ্রাণী!

সেই ছেলেটি বলল, ও তো আমার আপন বোন নয়, তাই ভালো নাম আমি জানি না। রেণু আমার মামাতো বোন! ওরা হাতিবাগানে থাকে, বেড়াতে এসেছে। তুই হাতিবাগান চিনিস?

বাদল বলল, হ্যাঁ, চিনি।

ঠিক বলছিস? হাতিবাগানে ক'টা হাতি আছে বল তো!

একটাও না! ইল্লি:আর টকের আলু! রোজ সন্ধেবেলা ওখানে হাতি বেরোয় কিছু জানে না!

রেণু নামের মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলল, হ্যাঁ, দুটো হাতি আছে, আমাদের বাড়ির সামনে।

বাদল তার কথায় কান না দিয়ে সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, আর তোমার নাম বললে না?

ছেলেটি গর্বিত ভাবে বলল, আমার নাম জীমূতবাহন। ডাকনাম ছুটকু।

নাম বলেই ছেলেটি সন্দিগ্ধ ভাবে তাকিয়ে ছিল বাদলের দিকে। বাদলের ঠোঁটে সামান্য হাসির আভা দেখেই ধমকে জিজ্ঞেস করল, হাসছিস যে? হাসির কী আছে?

বাদল ফিক করে হেসে বলল, এ রকম আবার কারওর নাম হয় নাকি? বাহন মানে তো ঘোড়া!

ছেলেটি এবার বাদলের জুলপি টেনে ধরে বলল, তোকে বুঝি লেখাপড়া শেখায় না! বাহন মানে ঘোড়া? যার পিঠে চড়ে, তাকে বলে বাহন। কার্তিকের বাহন কী, বল বল, ওয়ান, টু

ময়ুর?

সরস্বতীর বাহন কী?

হাঁস!

শিবের বাহন কী?

গোরু!

মোটেই না। ষাঁড়।

জুলপি ছেড়ে দিয়ে ছেলেটি এবার বিজ্ঞের মতন বলল, জীমূত মানে মেঘ। মেঘ কার বাহন জানিস? গাঁট্টা খেলেও তো বলতে পারবি না। ইন্দ্র। আমার নামের মানে ইন্দ্র।

পরবর্তী জীবনে এই জীমূতবাহন নামের ছেলেটির সঙ্গে বাদলের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যৌবনে এরা দুজনে একসঙ্গে একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল।

৩. ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে

ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মের পেছনে একটা করে রোমহর্ষক গল্প আছে। যে উৎকণ্ঠা, উদবেগ, অনিশ্চয়তা প্রতিটি জন্মকে ঘিরে থাকে- তার সঙ্গে তুলনা চলে আর কীসের?

একজন নারীর সারা জীবনে মোট চারশো বার মাসিক হয় অর্থাৎ সেই নারী তার জীবনে চারশো বার সন্তান জন্ম দেবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। একটি পুরুষ তো প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ স্পার্ম উৎপাদন করতে পারে। সেই লক্ষ অযুতের মধ্যে কখন একটিমাত্র গিয়ে ঠিক মিশ খাবে একটি নারীর গর্ভের ডিমে, তারপর শুরু হবে আর একটি নতুন প্রাণের ইতিহাস। এই মিলন কখনও ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে। অনেক দম্পতি বিনষ্ট হয়ে যায়। সে-সব বাধা পেরিয়ে গেলেও, তার পরেও চলবে ন'-দশ মাস প্রতীক্ষা, আঁতুড়ঘর বা হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের দরজার বাইরে শঙ্কাতুর পিতার পায়চারি, একটি সম্ভাবনাকে গর্ভে ধারণ করে করে সহ্যের শেষ সীমায় আসা ভাবী-মাতার মুখ। তখনও কেউ বলতে পারে না, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানও সঠিক ভাবে বলতে পারেনি, এর পরের মুহূর্তেই যে জন্ম নিতে যাচ্ছে, সে একটি ছেলে না মেয়ে। আমাদের মনে পড়ে না যে আমাদেরও জন্ম এই ভাবে। এই নানা আস্ফালনময় জীবনের মাঝখানে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়লে, হাসি পাবেই।

এই বায়োলজিক্যাল জন্মের আগে থেকেই কাহিনী দানা বাঁধে। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিয়ের সব ঠিকঠাক। হঠাৎ জানা গেল, পাত্রীপক্ষের বংশে একটু খুঁত

আছে। অমনি ভেস্তে গেল বিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু'জনের মিলিত ভাবে যে এক সেট ছেলেমেয়ে জন্মাবার কথা ছিল, সেই সম্ভাবনাটি নিহত হয়ে গেল, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল আর এক সেট ছেলেমেয়ের নিয়তি। এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে শেষ মুহূর্তে নিরাশ করে বিয়ে করল বাপ-মায়ের কথামতন এক গোলগাল পাত্রকে, একটি বাপের সুপুত্তুর ছেলে টাকাপয়সা কিংবা রূপের দরকষাকষিতে শেষ পর্যন্ত বনল না বলে বিয়ে করল না প্রতিবেশিনী মেয়েটিকে–এরা কেউ জানে না, এরা এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্র নিয়ে কী রকম ছিনিমিনি খেলছে। এই ধোঁয়াটে অবস্থাকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য আগেকার দিনে মাসিপিসিরা বলতেন, যার যেখানে কপালে লেখা আছে, সেখানে বিয়ে হবেই। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

আমি অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি, বিয়ের আগে আমার মাকেও অন্তত আট-দশ বার পাত্রপক্ষের সামনে দর্শন দিতে হয়েছে। ঘরজোড়া শতরঞ্চির একপাশে বসে আছেন গুটিকতক সুসজ্জিত গাঁট্টাগোট্টা লোক, প্রত্যেকের সামনে প্লেটে সাজানো সন্দেশ-সিঙাড়া, আর শতরঞ্চির ওপাশে লাজুক, নতমুখী–আমার মায়ের কিশোরী বয়সের শরীর। তখন পাত্রের স্বয়ং আসার রেওয়াজ ছিল না, পাত্রের বাবা-কাকারাই আসতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে রূপ গুণের পরিমাণ। পরে খবর দেব বলে চলে যাওয়া মানেই কোনও আশা নেই।

শেষ পর্যন্ত বরিশালের এক পাত্রের সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, পাত্রের চেহারাও ভালো এবং বিশেষ দাবিদাওয়া নেই। বিয়ের তারিখ ও লগ্নও যখন ঠিক হয়ে গেল, তারপর কে যেন একজন এসে খবর দিল যে, পাত্রের নিজের কাকা পাগল। যে বংশে পাগলামির ধারা আছে, সে-বংশে বিয়ে দেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তক্ষুনি সেই সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেওয়া হল আগে বাতিল করা এক পাত্রের সঙ্গে। সেই বাতিল করা পাত্রই আমার বাবা।

বরিশালের সেই ভদ্রলোক যথাসময়ে অন্য একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন, এবং তারও দুটি ছেলে হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রলোক পরিণত বয়সে সত্যিই পাগল হয়ে

গিয়েছিলেন তার ছেলেদুটিও পাগল কিনা খোঁজ পাইনি। আমাদের যে আত্মীয়টি শেষ মুহূর্তে খবর এনে আমার মাকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি যদি না আসতেন বা ওই খবরটা না পেতেন, তা হলে আমার হওয়ার কথা ছিল ওই পাগল পিতার সন্তান, এবং হয়তো এতদিনে আমিও পাগলামির পথে...। একা ঘরে এইসব ভাবতে ভাবতে আমি হেসে ফেলি।

আমাদের গোটা 'রঞ্জন' বংশের জন্মই একটা হাস্যকর ঘটনা থেকে। আমাদের বাড়ির পুরুষদের সকলেরই নামের মাঝখানে রঞ্জন শব্দটা আছে। যেমন, আমার বাবার নাম চিররঞ্জন, আমার জ্যাঠামশাইয়ের নাম প্রিয়রঞ্জন ইত্যাদি। আমার ঠাকুরদার নাম সারদারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই সারদারঞ্জন নামের মানুষটির জীবন কাহিনী কী রকম আলোচনা করা যাক।

সারদারঞ্জন পণ্ডিত ছিলেন না, বিশেষ লেখাপড়া করেননি–পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে তা জানা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিছু সংস্কৃত শ্লোক ছেলেবেলা। থেকেই শুনে শুনে শিখেছিলেন–সেইগুলিই স্থানে-অস্থানে আউড়ে পণ্ডিতির ভান করতেন। সারদারঞ্জন মূলত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী নন। পূর্ববঙ্গে একসময় ব্রাহ্মণের আমদানি করা হত। স্থানীয় কায়স্থ ও বৈশ্য সম্প্রদায় নিজেদের ধনাঢ্যতা ও আর্যয়ানা জাহির করার জন্য স্বগ্রামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বাইরে থেকে পুরুত আনাতেন।

আমাদের কুল-গোত্র পরিচয়ে দেখা যায়, আমাদের খড়দা মেল। অর্থাৎ কলকাতার কাছাকাছি খড়দা অঞ্চলে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল। অনেকে যেমন দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে একজন নেপালি চাকর সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে, সেই রকম ভাবেই বিক্রমপুরের রায়েরা কলকাতা থেকে সারদারঞ্জনের বাবা অঘোরনাথকে পূর্ববঙ্গে নিয়ে যান। খড়দা থাকার সময় অঘোরনাথের জীবিকা কী ছিল আমি জানি না, তবে পূর্ববঙ্গে এসে তার প্রধান জীবিকা হয় বিয়ে করা। মোটমাট সাঁইতিরিশটি বিয়ে তিনি করে উঠতে পেরেছিলেন। আরও বেশি যে পারেননি–তার কারণ অঘোরনাথ দীর্ঘজীবী হননি। সাঁইতিরিশটি বিবাহের ফলে মোট আশি-নব্বইটি ছেলেমেয়ের একটি বিশাল বংশ তিনি

গোটা পুব বাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র একশো দশ বছর আগেকার ঘটনা। এদিকে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন সদ্য জন্মেছেন এবং বিদ্যাসাগর মশাই বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন, এই কথা বলে দেওয়ায় নানান শত্রুর হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন।

কোন সন্তানটি পুত্র হবে, কোনটি কন্যা তা আগে থেকে ঠিক করার কোনও উপায় নেই। তবুও, সব দেশেই নারী-পুরুষের সংখ্যায় একটা মোটামুটি সমতা থাকে, খুব একটা হেরফের হয় না। কোনও কারণে কোনও দেশে পুরুষের সংখ্যা অকস্মাৎ কমে যেতে পারে-যেমন হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী জার্মানিতে। সেই রকম কোনও কারণেই কি গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে পুরুষের সংখ্যা কমে গিয়ে বহু বিবাহের এমন পসার জমেছিল? হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই অরক্ষণীয়া মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। সাধারণ ভাবে যে-সব মেয়ের বিয়ে হবার কোনও উপায় ছিল না- সেই সব মেয়েকে ব্যবসায়ীরা নৌকো ভরে নিয়ে গিয়ে চালান দিত অন্যত্র। গ্রামের নদীর ঘাটে নিয়মিত এসে ভিড়ত সেই সব নৌকো-প্রকাশ্যে মেয়ে চালান হত। ওই সব মেয়েদের বলা হত ভরার মেয়ে। তাদের কোনও জাত নেই। ওই উপায়ের মুসলমান মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে হয়ে গেছে, এবং বিপরীত। হিন্দু বাড়ির নতুন বউ লাউকে কদু বলায় হুলুস্থুলু পড়ে গেছে-এ রকম গল্প আছে।

অথচ, রাজামহারাজা কিংবা নবাব বাদশা ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন কোনও কালেই ছিল না আমাদের দেশে। ইতিহাস পুরাণে সে রকম বিশেষ নজির নেই। এমনকী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ভোগবিলাসী ঋষিরাও এক-দার। একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্যেরই দুই স্ত্রী দেখতে পাচ্ছি।

মুসলমান সমাজের মধ্যে জাতিভেদ নেই বলে তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও শ্রেণি গত শতাব্দীতে বিবাহ ব্যাপারে একাধিপত্য করতে পারেনি। কিন্তু হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথার বীভৎসতম দিকটা তখন প্রকট। জাতির পাতি মানতে গিয়ে জ্ঞান, ধর্ম, ন্যায় সব ভেসে গেছে। এবং ব্রাহ্মণ সমাজ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই প্রথাকেও আরও জোরদার করছে। জ্ঞানচর্চা চুলোয় গেছে বিনা পরিশ্রমে লোকের কাছ

থেকে কাটা মুলোটা আদায় করা, সংবৎসর খাদ্যের বাঁধা ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং ফাউ হিসেবে শ্রদ্ধা-ভক্তি পাওয়া–এর জন্য তারা যে-কোনও নীচতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল। কত রমণীর চোখের জল যে তখন এদেশের মাটি ভিজিয়েছে, এখন তা আর জানার উপায় নেই। এবং যেহেতু বংশমর্যাদা এবং কৌলিন্যের গৌরবই ছিল তখনকার ব্রাহ্মণদের একমাত্র ক্যাপিটাল–সেই জন্যই সেটাকে ফুলিয়ে ফঁপিয়ে দেখবার সহস্র চেষ্টা। নানা রকম বিধিনিষেধ ও ছুঁৎমার্গের প্রচলন হয় সেই সময় থেকে। বিশ্বামিত্র চণ্ডালের বাড়িতে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন কিন্তু গত শতাব্দীর ব্রাহ্মণদের অন্য যে-কোনও অব্রাহ্মণের ছোঁয়া খেতেই আপত্তি। অধিকাংশ উপাধ্যায়রাই যে সেন-আমলে এফিডেবিট করা ব্রাহ্মণ, সে-তথ্য গোপন ছিল। ছুঁৎমার্গের জন্যই সেই সময় থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

যাই হোক, সারদারঞ্জনের বাবা অঘোরনাথ বিয়ে করতে করতে হাঁপিয়ে গিয়েই বোধহয় মারা যান। কুলীনদের তখন খুব রবরবা। ‘স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি’ হলেও আপত্তি নেই, পুরুষদের বংশমর্যাদার কোনও দোষ থাকলে চলবে না। সেই সুবাদে একটার-পর-একটা বিয়ে করা ও সারা বছর ধরেই শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্ন খাওয়া। ছেলেমেয়ে মানুষ করারও কোনও দায়িত্ব নেই। কুলীনদের ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারটা কী, তা আমি এখনও স্পষ্ট বুঝি না, তবে শুনেছি, বিয়ের ব্যাপারে ভঙ্গ কুলীনরাই ছিলেন বেশি তালেবর। বিদ্যাসাগর এদেরই বলেছিলেন, ‘পাষণ্ড ও পাতকী’। এই রকমই এক ভঙ্গ কুলীনকে একসময় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার তো এতগুলো শ্বশুরবাড়ি, সব জায়গায় যাওয়া হয়? তিনি বলেছিলেন, যেখানে ভিজিটের টাকা পাই, সেখানেই যাই।

অঘোরনাথের বহু সংখ্যক ছেলেমেয়ের মধ্যে অন্যতম সারদারঞ্জন নিজেই নিজের পথ দেখে নেন। ষোলো বছর বয়সেই তিনি ফরিদপুরের ফুলবাড়ি নামের ছোট শহরের এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করেন ও যৌতুক বাবদ সেখানে একখণ্ড জমি আদায় করেন। ছোট্ট বাড়ি তুলে তিনি নিজের বংশ স্থাপন করলেন!

সারদারঞ্জনও পর পর বিয়ে করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন সম্ভবত, কারণ, তার আর কোনও জীবিকা ছিল না। কিন্তু তিনটি মাত্র বিয়ে করেই তিনি হঠাৎ থেমে যেতে বাধ্য হলেন। ততদিনে যুগের হাওয়া পালটাতে আরম্ভ করেছে। এবং আমার বাবা যে মাত্র একটি বিয়ে করেছিলেন–এটা একটি বৈপ্লবিক ঘটনার মতন। অঘোরনাথের কাল থেকে আমার বাবা চিররঞ্জনের কাল–মাত্র ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে এই রীতির পরিবর্তন। একে ইংরেজি শিক্ষার কুফল ছাড়া আর কী বলা যায়। তা ছাড়া, বীরসিংহ গ্রামের সেই খর্বকায় ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করার পর বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্যও উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক এক জন কীর্তিমান পুরুষের এক ডজন দু' ডজন স্ত্রীর সংখ্যাও তিনি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এবং বৃদ্ধ বয়সে একটি কিশোরী কন্যার পাণিগ্রহণের অপরাধের জন্য তিনি তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরও মুখ দর্শন করতে চাননি–এই গল্প একসময় সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বরিশাল জেলায় কলমকাটি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজ্যের পঞ্চান্ন বছর বয়সেই স্ত্রীর সংখ্যা ছিল একশো সাত। সেই তুলনায় সারদারঞ্জনের বাবা অঘোরনাথ তো ছেলেখেলা করেছেন মাত্র।

লোকে বলে, দুটি বিয়ে করেই সারদারঞ্জনের আশ মিটে গিয়েছিল। তাঁর দুই স্ত্রী তখন একই বাড়িতে। তখন বিয়ে করে বউকে বাপেরবাড়ি ফেলে রাখার নিয়মটি আস্তে আস্তে অপসৃত হচ্ছে। নেহাত ধনীরা ছাড়া, অন্য সাধারণ গৃহস্থ মেয়ের বিয়ে দেবার পর সাধ্যমতন বস্ত্র-অলংকার দিয়ে তাকে শ্বশুরের ভিটেয় পৌঁছে দিয়ে যায়। তারপর তার ভাগ্য সে বুঝুক।

১২৭৭ সালে আর একটা ব্যাপার হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ সমাজে প্রায় বজ্রপাতের মতন ঘটনা বলা যেতে পারে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুজ্যে নামে এক কুলীন মাত্র ছ'টি বিয়ে করেছিলেন, তার এক স্ত্রী কৃষ্ণমণি ভারী দুঃসাহসিনী। স্বামী তাঁকে নেয় না–এই জন্য খোরপোষের দাবিতে তিনি আদালতে মামলা করে দিলেন। এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি। আদালতে সাহেব হাকিমের সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুজ্যে বলল, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বউদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কুলীনদের থাকে না। তা ছাড়া, আমার এতগুলো বউ,

সবাইকে আমি খাওয়াব কী করে? জজ নর্মান সাহেব বললেন, খাওয়াতে পারবে না তো বিয়ে করেছিলে কেন? এখন জেলে যাও!

বাড়িতে একই সঙ্গে দুই স্ত্রীকে নিয়ে সারদারঞ্জন বেশ মুশকিলে পড়েছিলেন। ঝগড়াঝাটির চোটে বাড়িতে কাকচিল বসতে পারে না! মাঝে মাঝে বৈরাগ্যেরও উদয় হয় সারদারঞ্জনের মনে। টাকাপয়সারও খুব টানাটানি, ফুলবাড়িতে তার প্রথম শ্বশুর মারা গেছেন। শ্যালকরা উপুড়হস্ত হয় না। স্বল্প বিদ্যা সম্বল করে সারদারঞ্জন একটি পাঠশালা খুলেছেন, তাতেও বিশেষ আয় নেই।

সারদারঞ্জনের প্রথম পক্ষের বিয়েতে কোনও সন্তান হয়নি, সেই স্ত্রী বাঁজা ও সাঙ্ঘাতিক ভালো স্বাস্থ্য এবং দারুণ মুখরা। দ্বিতীয় বিয়েতে দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এই ছেলেটি ছিল সারদারঞ্জনের নয়নের মণি। সারদারঞ্জন ছেলেটিকে এক মুহূর্তও। চোখের আড়াল করতেন না, তার নাম ছিল বিশ্বরঞ্জন, ডাকনাম বিশু, চেহারাটাও খুব ফুটফুটে। এই ছেলেটির একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল। বিবরণ শুনে মনে হয় টাইফয়েড। তার সোনার বর্ণ কালি হয়ে যায়। শরীর মিশে যায় বিছানার সঙ্গে, শ্রবণশক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বিশু বিশু বলে ডাকলেও সাড়া দিত না।

প্রথম দিকে স্বাভাবিক নিয়ম মতন কবিরাজি চিকিৎসাই চলছিল। তাতে কোনও ফল দেখা যাচ্ছিল না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তখন সদ্য গ্রামাঞ্চলে ঢুকছে, ম্যাজিকের মতন সন্দেহ ও বিস্ময় নিয়ে লোকে গ্রহণ করছে এই পদ্ধতিটিকে। আট-দশ মাইল দূরে একজন এল এম এফ পাশ ডাক্তার আছেন, তাঁকে কল দিয়ে আনা হল এবং তাঁর ওষুধে দু-এক দিনের মধ্যেই রোগীর কিছুটা উন্নতি প্রত্যক্ষ করা গেল। কিন্তু অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়তেই ডাক্তারকে আবার ডাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারটি চশমখোর, ভিজিটের টাকা অগ্রিম না দিলে তাকে কিছুতেই আনা যাবে না এবং কলকাতা থেকে বিলিতি ওষুধ আনাবার অজুহাতে আরও একগাদা টাকা চেয়ে বসলেন। সারদারঞ্জনের হাতে তখন একটা পয়সা নেই। ঘটিবাটি বন্ধক দেওয়াও হয়ে গেছে। সারদারঞ্জন ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার ছেলেকে আপনি বাঁচিয়ে দিন

এবারের মতন! আমি যেমন করে পারি, আপনার দেনা একদিন-না-একদিন শোধ করে দেব।

ডাক্তারটি নিষ্ঠুরের মতন উত্তর দিয়েছিলেন, ওষুধ কোম্পানি কি আপনার এ কথা শুনবে? ওষুধ চাই, আসল বিলিতি ওষুধ, বুঝলেন? না হয় তো এক কাজ করুন। কল। দ্যাট কবিরাজ এগেন। মকরধ্বজ ফজ খাওয়াক। এসব পাড়াগাঁর জায়গায় এতকাল ওই সব কবিরাজি ওষুধ খেয়েই তো লোকে মরেছে। আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না। বিনা। ওষুধ আমি চিকিচ্ছে করতে শিখিনি।

চিন্তায় ভাবনায় দুঃখে সারদারঞ্জন প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠেছিলেন। আর সহ্য করতে পারছিলেন না। নতুন বৈশ্য যুগ এসেছে, কিন্তু সারদারঞ্জন টাকা রোজগারের। কোনও উপায় শেখেননি। শেষ পর্যন্ত কোনও রকম দিশা না পেয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। রুগ্ন ছেলে, অনূঢ়া দুই কন্যা ও দুই স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সারদারঞ্জন।

ফিরে এলেন আট দিন বাদে। নদীর ঘাটে সারদারঞ্জনের নৌকো লাগতেই পাড়া সুদ্ধ লোক সেখানে ছুটে গিয়েছিল মজা দেখতে। কেন না, সারদারঞ্জন নৌকো থেকে নামলেন বরের বেশে, পেছনে লাল চেলি-পরা একটি তেরো বছরের মেয়ে। মস্ত বড় ঘোমটায় তার মুখ দেখা যায় না। বিস্তর পোঁটলাপুটলি সঙ্গে নিয়ে আরও দুটি লোকও এসেছে।

উপায়ান্তর না দেখে অর্থ সংগ্রহের একমাত্র রাস্তা হিসেবে সারদারঞ্জন ঝটিতি আর একটি বিয়ে করে এসেছেন। সম্ভবত কথাবার্তা আগে থেকেই চলছিল। এতদিন সারদারঞ্জন রাজি হননি, হঠাৎ মনস্থির করেই নিকটতম লগ্নে বিয়ে করে ফেলেছেন শুধু পণের টাকাটা পাবার জন্য। শোভাযাত্রা সহকারে নদীর ঘাট থেকে এসে সারদারঞ্জন। যখন নিজের বাড়ির চৌহদ্দিতে পা দিলেন, তার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রতিবেশীরা তার ছেলেকে পুড়িয়ে এসেছে। সারদারঞ্জনকে দেখেই দুই স্ত্রী আর্তনাদ ও গালাগালি করতে করতে আছড়ে পড়ে মাটিতে। নতুন বউ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল উঠোনের মাঝখানে। ওই

উটকো এবং মোটেই প্রকৃষ্ট ভাবে আনয়ন করা হয়নি যাকে, সেই নব পরিণীতা মেয়েটিই আমার আপন ঠাকুমা।

তৃতীয় বিবাহের পর সারদারঞ্জনের ভাগ্য অনেকটা ফিরে যায়। ছেলের শোক ভুলতে কিছুটা সময় লেগেছিল। তবে নতুন বউ এসেই অতি দ্রুত দুটি পুত্রসন্তান উপহার দিলেন। তারপর একটি মেয়ে, আবার দুটি ছেলে। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির মুখ-চোখ অবিকল সারদারঞ্জনের সেই প্রথম মরা-ছেলের মতন, যার চিকিৎসার কারণে এই বিয়ে। লোকে বলাবলি করতে লাগল, সেই ছেলেই আবার তার বাবার কাছে ফিরে এসেছে। একেই বলে মহামায়ার খেলা। সেই ছেলেরও নাম রাখা হল বিশ্বরঞ্জন, কিন্তু ডাক নাম বিশুর বদলে রঞ্জু। ডাক্তারের খরচ জোটাতে না পারার জন্যই প্রথম বিশ্বরঞ্জন মারা গিয়েছিল, তাই সারদারঞ্জন ঘোষণা করলেন, এই কনিষ্ঠ ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। ঢাকায় তখন মেডিক্যাল কলেজ হয়ে গেছে, সেখান থেকে পাশ করিয়ে এনে দেশের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত করাবেন ডাক্তার ছেলেকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোকেরা এসে তার বাড়িতে ধরনা দেবে।

তৃতীয় বিবাহের টাকা থেকেই সারদারঞ্জন কিছু ধানজমি কিনেছিলেন। রায়তদের দিয়ে চাষ করাচ্ছিলেন। হঠাৎ কে যেন একজন বুদ্ধি দিল, ওই নাবাল জমিতে ধান চাষ করে তেমন লাভ নেই, বিঘে প্রতি পাঁচ-ছয় মণ ধান হয় মাত্র, বরং ওখানে পাট লাগানো হোক। পাটের দাম ক্রমশ চড়ছে, জাপানিরা নাকি পাট দিয়ে জামাকাপড় পর্যন্ত বানাবে। পাট কাটা হয়ে গেলে সেই সময়টা খেসারির ডাল। অলস ব্রাহ্মণ হলেও সারদারঞ্জনের কিছু পাটোয়ারি বুদ্ধি ছিল নিশ্চয়ই, কেন না ধান চাষের চিরাচরিত ব্যবস্থা ছেড়ে তিনি। পাটের দিকেই ঝুঁকলেন এবং অবিলম্বে সচ্ছলতার মুখ দেখলেন। তার পাঠশালাটিও ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম হয়ে। উঠলেন এবং স্থানে-অস্থানে ভুল সংস্কৃত শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে নানা সামাজিক বিষয়ে ফতোয়া জারি করতে লাগলেন।

আমার তিন ঠাকুমার মধ্যে অপুত্রক বড়ঠাকুমা বেঁচেছিলেন অনেক দিন। মেজোঠাকুমা তার প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুর কিছু দিন পরেই মারা যান। ছোটঠাকুমা বা আমার আপন ঠাকুমার নাম ছিল মেঘমালা। ছোট্টখাট্টো চেহারা, কথা বলতেন কম, সারা বাড়িতে তুর তুর করে ঘুরে বেড়াতেন। এক সংকটজনক অবস্থায় তিনি এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন। বুঝেছিলেন, তার একমাত্র কাজ হচ্ছে মুখ বুজে বাড়ির সকলের সেবা করে যাওয়া। তার বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন অনেক ছোট বয়সে, ভাইদের সংসারে মানুষ, বউদিদের লাথিঝাটা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে শ্বাশুড়ির হাতে বউরা যে রকম অত্যাচারিত হতেন বউরাও তেমনই তার শোধ তুলে নিতেন। ননদের ওপর অত্যাচার করে। পুরুষদের বিরুদ্ধে মেয়েরা তো কখনও একজোট হয়ে দাঁড়াতে পারে না–অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েমানুষই হয় মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। ভাইরা তাই তাড়াতাড়ি করে কোনওক্রমে মেঘমালার বিয়ে দিয়ে পার করে দেয়।

বড়ঠাকুমা ও মেজোর মধ্যে খুব ঝগড়াঝাটি হলেও বড়ঠাকুমার সঙ্গে ছোটঠাকুমার কখনও সে রকম কিছু হয়নি। পুত্রহীনা অসহায় বড়ঠাকুমা মনে মনে জানতেন, এ-সংসারে তার কোনও অধিকারই নেই। সেই জন্যই জোর করে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। চিৎকার করে, ধমকে, ভয় দেখিয়ে তিনি মাথায় করে রাখতেন। সারা বাড়ি। বাসনপত্র আছড়ে আছড়ে ফেলতেন মাটিতে, রান্নাঘর থেকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মারতেন উঠোনে। বাড়িসুদ্ধ সবাই সব সময় তটস্থ। ছোটঠাকুমা একদিনও গলা উঁচু করে একটাও কথা বলেননি। বরং পোষা বেড়ালটির মতন সব সময় ঘুরঘুর করতেন বড় জায়ের পায়ে পায়ে-সুযোগ পেলেই এটা সেটা খাবার জিনিস এগিয়ে দিতেন তার। মুখের সামনে। এবং নিজের সন্তানদেরও এক এক করে তুলে দিয়েছিলেন বড় জায়ের। হাতে।

বড়ঠাকুমা সতিনের ছেলেদের উঠোনে শুইয়ে জবজবে করে সরষের তেল মাখাতেন সারা শরীরে। পুকুরে নিয়ে ঠান্ডা জলেও চান করাতেন জোর করে। গামছা দিয়ে গা ঘষে ঘষে ছালচামড়া তুলে দিতেন প্রায়। খাবার খেতে বসে কেউ এক কণা খাবার ফেললেও তিনি কান ধরে থাপ্পড় কষাতেন ঠাস ঠাস করে। ইস্কুল থেকে ফিরতে যদি কেউ একটুও দেরি

করত, তিনি সদর দরজার কাছে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। তাদের ঘুম পাড়াবার সময় পিঠে এত জোর চাপড় মারতেন যে ধুপধাপ শব্দ শোনা যেত অনেক দূর থেকে।

মেঘমালা কোনও দিন এসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাননি। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা। কেউ কোনও দিন যদি বলে ফেলত, ওবাড়ির বড়বউ সতিনের ছেলেমেয়েগুলোকে কষ্ট দেয়, তা হলেই ঝগড়া করার বদলে কেঁদে ফেলতেন বড়ঠাকুমা।

ওঃ, সে কী কান্না! আমার বড়ঠাকুমার কান্না প্রবাদ-প্রসিদ্ধ ছিল ওই অঞ্চলে। একবার শুরু করলে তিন-চার ঘণ্টার আগে থামতেন না। চিৎকার করে, আদিবাসীদের ধর্মীয় প্রার্থনার চেয়েও তীব্র স্বরে তিনি যেন তার ভেতরের কোনও শারীরিক কষ্টের কথা জানাতেন। চাচাতে চাচাতে দম বন্ধ হয়ে আসত প্রায়। তিনি নদীর পারে গিয়ে একলা একলা চিৎকার করে কাঁদতেন–যেন ওই নদীর মধ্য থেকে কোনও দেবতা এসে তার। দুঃখ দূর করবেন। আমাদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে গিয়ে কাঁদতেন–যেন অরণ্য থেকে আসবে তার উদ্ধারকারী। সেই সময় সারদারঞ্জন তার ধারে কাছে গেলে বড়ঠাকুমা বোধহয় রাগের চোটে ছিঁড়েখুঁটে ফেলতেন তাঁকে। শুধু মেঘমালাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভোলাতে পারতেন। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গিয়ে পড়তেন তার পায়ে। তার কিছুক্ষণ পর আলুথালু চুল, উদ্ভ্রান্ত মুখ বড়ঠাকুমাকে সবাই টানতে টানতে নিয়ে আসত বাড়িতে।

আবার বাবা-জ্যাঠামশাইরা এখনও যখন তাদের বড়মায়ের কথা বলেন, তাদের চোখে জল এসে যায়। মাতৃস্নেহের যে একটা আদিম হিংস্র রূপ আছে, ওঁরা শৈশবে তার স্পর্শ পেয়েছিলেন।

সারদারঞ্জনের তখন বেশ সুসময় চলছে। আর্থিক দুরবস্থা ঘুচেছে। বাড়ি-ভরতি ছেলেমেয়ে, তারা পড়াশুনোতেও মোটামুটি ভালো। আমার জ্যাঠামশাই প্রিয়রঞ্জন জেলায় মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। জেলাবোর্ডের হাইস্কুলে তার ফ্রি স্টুডেন্টশিপ জুটে গেল। আমার বাবা চিররঞ্জন ছিলেন শিশু প্রতিভাবিশেষ। ভালো করে

অক্ষরজ্ঞানের আগেই তিনি লম্বা লম্বা পদ্য গড়গড় করে নির্ভুল মুখস্ত বলতে পারতেন। শুভঙ্করের আর্যাগুলো সব ঠোঁটের ডগায়। অবশ্য অধিকাংশ শিশু প্রতিভারই পরিণতি যা, আমার বাবারও তাই হয়েছিল। চিররঞ্জন বড় হয়ে লেখাপড়ায় খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। মোটামুটি পরীক্ষা পাশ করেছেন।

মেজোঠাকুমার দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম মেয়ের বিয়ে হয়েছিল দোজবরের সঙ্গে। বিয়ের পরদিনই তিনি পাঁচটি সন্তানের মা হয়ে যান। তার মধ্যে দুটি সন্তান তার চেয়ে বয়সে বড়। আর এক মেয়ে বিয়ের পরেই পশ্চিমে চলে যান। পশ্চিম অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ-তখন যার নাম ছিল যুক্ত প্রদেশ! তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা হয়নি।

যাই হোক, এবাড়িতে কন্যাসন্তান বলতে তখন একমাত্র পূর্ণিমা পিসিমা। সাত-আট বছর বয়সে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে ফুরফুর করে দৌড়োদৌড়ি করতেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সারদারঞ্জন। তবু দাদাদের কাছাকাছি বসে থেকে পূর্ণিমা কিছু পড়তে লিখতে শিখেছিলেন। এমনকী, আশ্চর্যের বিষয়, তিনি নাকি পদ্য লিখতে পারতেন। দশ-এগারো বছর বয়সেই তিনি বেশ কিছু রচনা করেছিলেন শিবমন্দির, শ্মশান ও নদী বিষয়ে। সেসব পদ্য রচনার কোনও নিদর্শন অবশ্য কেউ রেখে দেয়নি সংগ্রহ করে। তবে জ্যাঠামশাইয়ের কিছু কিছু মনে আছে এখনও। সম্ভবত কবি চন্দ্রাবতী বা তরু দত্তের মতন সুপ্ত কবিপ্রতিভা ছিল পূর্ণিমার মধ্যে, কিন্তু তার বিকাশের কোনও সুযোগ ঘটেনি। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা হওয়ার পরই এই কবিত্ব শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পর একেবারে চাপা পড়ে যায়।

পূর্ণিমার পরের ভাইয়ের নাম নিখিলরঞ্জন। অপূর্ব সুন্দর তাঁর মুখশ্রী, ধপধপে ফরসা রং। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই খুব গম্ভীর ও বোকা বোকা ধরনের। সবাই বলত, এই ছেলেটা জড়ভরত হবে। পরে অবশ্য তাকে ততটা বোকা মনে হয়নি, বরং ভাবুক স্বভাবটিই প্রকট হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমার এই কাকা যে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবেন, তার চিহ্ন বাল্যকালেই সূচিত হয়েছিল। যদিও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবার আগে

একটি বিবাহিতা নারীর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে একটি ঘোরতর সামাজিক কেলেঙ্কারি প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

একেবারে ছোট ছেলে বিশ্বরঞ্জন সম্পর্কে লোকের ধারণা যে-এই বাড়িরই এক ছেলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে এ বাড়িতে আবার জন্মেছে। চোখ-মুখ একেবারে যেন হুবহু বসানো, গলার আওয়াজটিও আগের বিশ্বরঞ্জনের মতন। এই কুসংস্কারটি ক্রমশ বাড়ছিল এবং লোকের মুখে মুখে বেশ ছড়িয়েছিল। এই ছেলের সম্পর্কে লোকের অনেক আশা। সারদারঞ্জন কনিষ্ঠ সন্তানটিকে সগর্বে লোকের বাড়ি দেখাতে নিয়ে যান।

সারদারঞ্জনের তখন প্রধান কাজ সকালে বিকেলে রুপো বাঁধানো ছড়িটি হাতে নিয়ে পাড়া বেড়ানো। পরনিন্দা পরচর্চায় দিব্যি সময় কেটে যায়। ঠোঁটের ওপর পুরুষ্টু সাদা গোঁফ, ভুরুতেও দু-একটি পাকা চুল। দেখলে বেশ একটা শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয় ভাব আসে। নানা বিষয়ে তিনি ভারিক্কি চালে মতামত দেন, লোকে মানেও। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তিনি সব সময় সচেতন। ব্রাহ্ম সমাজের কিছু লোক ওখানে বক্তৃতা দিতে এসেছিল, স্থানীয় লোকরা তাদের তাড়া করে নদী পার করে দেয়। সারদারঞ্জন তাতে খুব খুশি। শিবতলার সান্ধ্য আসরে বহুক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করলেন। তার কিছু দিন পরেই দুর্গাপূজার ভাসানের সময় মসজিদের সামনে ঢাক বাজানো নিয়ে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। উত্তেজনা ক্রোধে বিস্তারিত হবার আগেই স্থানীয় লোকেরা একটা সালিশি সভা ডাকল। প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদিন সাহেবকে করা হল সভাপতি। জমিদারের নায়েব তখন অনুপস্থিত বলে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হল সারদারঞ্জনকে। সারদারঞ্জন সেই সভায় রীতিমতন বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেললেন। লোকজনের কথাবার্তা শুনেই বুঝেছিলেন হাওয়া কোন দিকে। জয়নাল আবেদিন দাপটে বক্তৃতা দিয়ে সারদারঞ্জনের দিকে ফিরে বললেন, মুখুজ্যেমশাই জ্ঞানী গুণী লোক, তিনি যা বিধান দেবেন, তাই আমরা মানব। তিনি ভুল বিধান দিতেই পারেন না!

সারদারঞ্জন কিছু বলার আগেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পাকা অভিনেতার মতন কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আজকাল কি আর কেউ শাস্ত্র ধর্ম মানে? বিসর্জনের সময়

বাজনা বাজাতে হবে, শাস্ত্রের কোন জায়গায় একথা লেখা আছে আমাকে দেখাও তো! মাকে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছি, তখন তো কাঁদতে কাঁদতে যাব। তখন কি নেচেকুঁদে ঢাকঢোল বাজিয়ে আনন্দ করা যায়? তুমিই কওঁ জয়নালভাই, তাই পারা যায়? যতক্ষণ পূজা, ততক্ষণ বাজনা-দধিমঙ্গলের পরই কান্না, এই হল নিয়ম! ঠিক কিনা!

সবাই খুব খুশি। সারদারঞ্জন নির্দেশ দিয়ে দিলেন পূজামণ্ডপে যত খুশি বাজনা হবে-প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কোনও বাজনা নয়। তবে হ্যাঁ, একেবারে বিসর্জনের সময়, নদীর ওপরে নৌকোয় নৌকোয় ঢাকের প্রতিযোগিতা হতে পারে বটে! সে প্রতিযোগিতা প্রতি বারই হয়-সেটা চট করে বন্ধ করার সাধ্য সারদারঞ্জনেরও নেই!

সেই মিটিংয়ের পর সারদারঞ্জনের সুনাম আরও বেড়ে গেল। লোকজন আরও বেশি খাতির করে। সারদারঞ্জনের মুখে-চোখে বেশ একটা গর্বের ভাব, সাধারণ ছোটখাটো মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখের দিকে তাকান না পর্যন্ত-একমনে হুঁকোয় টান দিতে থাকেন। সব মিলিয়ে মনে হয় সারদারঞ্জন একজন সুখী মানুষ।

কিন্তু সারদারঞ্জনের জীবনে সবচেয়ে কঠিন আঘাত এল সবচেয়ে বেশি যার ওপর নির্ভর করেছিলেন, তার কাছ থেকেই। ছোটছেলের ওপর সারদারঞ্জনের এত আশা-ভরসা ছিল, সেই বিশ্বরঞ্জন তাকে পদে পদে নিরাশ করতে লাগল। বিশ্বরঞ্জন বাল্যকাল থেকেই বিষম দুরন্ত, ক্রমে ক্রমে তার অত্যাচারে সবাই সন্ত্রস্ত। অন্য লোকের বাড়ির বাগান তছনছ করা শুধু নয়, সমবয়সি ছেলেদের মারধর করা ও নালিশ লেগেই আছে। দুরন্ত ছেলে, বাড়ির কারওর কথা সে গ্রাহ্য করে না-বড় ঠাকুরমার বয়স হয়ে গেছে, তিনিও আর শাসন করতে পারেন না। ইস্কুলের একজন মাস্টারমশাই বিশ্বরঞ্জনকে বেত দিয়ে মারতে এসেছিলেন, দু ঘা মারার পরই বিশ্বরঞ্জন বেত কেড়ে নিয়ে সেই মাস্টারের নাকে এমন ঘুষি মারল যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। তারপর সবাই মিলে বিশ্বরঞ্জনকে প্রচণ্ড মেরে প্রায় আধমরা করে ফেলে। এই ঘটনার পর বিশ্বরঞ্জন একটু শান্ত হয়েছিল, কিন্তু আবার অন্য রকম বিপদ ডেকে আনল।

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পূর্ণিমার বিয়ে দিয়েছিলেন সারদারঞ্জন, কিন্তু মাত্র সাত মাসের মধ্যেই সে বিধবা হওয়ায় প্রথম আঘাত পেয়েছিলেন। শ্বশুরের ঘর করা বা স্বামী-সম্ভোগ কিছুই ঘটেনি পূর্ণিমার কপালে। তার স্বামী নতুন চাকরি পেয়ে চলে গেল চট্টগ্রামে, সেখানে হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। বিধবা পূর্ণিমার দ্বিতীয় বিয়েতে আরও বেশি আঘাত পেয়েছিলেন সারদারঞ্জন কিন্তু তার বুকে মৃত্যুশেল বিধিয়ে দেয় তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ওই বিশ্বরঞ্জন।

৪. ফুলবাড়ি নামের জায়গাটি

ফুলবাড়ি নামের জায়গাটিকে শহর না বলে গঞ্জই বলা ভালো। নদীর ধারে হাটখোলা, আশেপাশের কয়েকখানি গাঁয়ের মানুষ আসে সওদা করতে। সপ্তাহে দু'দিন এখানে স্টিমার আসে, সেই জন্যই জায়গাটার যা কিছু গুরুত্ব। কার অ্যান্ড টেগোর কোম্পানির আমল থেকেই এখানে স্টিমারঘাটা স্থাপিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে গোটা তিনেক পাইস হোটেলও আছে। সকাল ন'টায় স্টিমার থামে, তার মধ্যেই গরম গরম ডাল-ভাত ও মাছের ঝোল তৈরি হয়ে যায় হোটেলগুলোতে। পূর্ববঙ্গে মাছ সস্তা, তবু তিন পয়সা পিস রান্না মাছ খাবার লোক যাত্রীদের মধ্যে বেশি থাকে না। শুধু ডাল-ভাত খেলেও 'ছয় পয়সার কম খাওয়া নাই'–এই নোটিস বাইরে ঝোলানো।

হাটখোলার পেছনে মাটির বাড়িতে তিন ঘর বেবুশ্যের বাস। হাটবারেই তাদের পশার জমে, অন্য অন্য দিন তারা নদীর ধারে চুল মেলে, পা ছড়িয়ে বসে চাটাই বোনে কিংবা ধামা কুলো বানায়। অনেক হাটুরের সঙ্গেই তাদের দিদি কিংবা মাসির সম্পর্ক। রেট আট আনা।

এ ছাড়া ফুলবাড়িতে আছে একটি পোস্ট অফিস, তিনটি পাঠশালা, একটি বোর্ড। স্কুল–সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ানো হয়, একটি হাই স্কুলও সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশেই গ্রাম হাসানবাড়ির হাইস্কুলটি সুপ্রাচীন। কোর্টকাছারির জন্য এলাকার মানুষকে যেতে হয়

ফরিদপুর জেলা সদরে। ফুলবাড়িতে পাকা রাস্তা একটিও নেই–একটি সুরকির রাস্তা তিন-চার মাইল গিয়ে বড়খালে ডুব দিয়ে আবার ও-পারে উঠেছে। খালে কোনও সেতু নেই। এশহরে পাকাবাড়ির সংখ্যা দশ-বারোখানার বেশি নয়। ব্রাহ্মণ আছে পাঁচ ঘর, কায়স্থ ও বৈদ্য বেশ কিছু, নমোশুদ্রের সংখ্যা অনেক। পাশের গ্রামটি মুসলমান প্রধান। ফুলবাড়ির প্রধান মাতব্বর জয়নাল আবেদিন–তার ছিট কাপড় ও বেনেতি মশলার বিরাট ব্যবসা। যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে বাঁশবন, তার মধ্যে ডাউক। বা ডাহুক আর কুবোপাখির ডাক শোনা যায় সব সময়। সন্ধ্যার পরই প্রান্তর ভরিয়ে ভেসে ওঠে শেয়ালের ডাক, দিনেরবেলা কিন্তু তাদের টিকিটিও দেখতে পাওয়া যায় না। সুন্দরবন থেকে দু-একটা কেঁদো বাঘ কচিৎ কখনও ছটকে এ-দিকে আসে। একবার একটা বুনো হাতিও এসেছিল, কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। লোকে বলে আসামের বন্যায় ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছিল হাসানবাড়িতে। সাপ আছে প্রচুর। এবং ভূত, প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যর তখনও অপ্রতিহত রাজত্ব চলেছে। ইলেকট্রিক আলো কেউ চোখে দেখেনি। হ্যাঁজাক বাতি জ্বালানো হয় শুধু উৎসবের সময়। ডিগবয়ে পেট্রোল ও। কেরোসিন আবিষ্কারের পর থেকেই মাত্র হ্যারিকেনের যুগ শুরু হয়েছে, তার আগে পর্যন্ত তেলের সেজবাতি।

সারদারঞ্জনের বাড়ি বলতে এতদিন পর্যন্ত ছিল দুখানি টিনের চালা দেওয়া মাটির দেওয়ালের ঘর ও একটি খড়ের চালার রান্নাঘর। সম্প্রতি তিনি একটা একতলা পাকা দালান তুলেছেন। তার সামনের দিকে বৈঠকখানা, পেছনে ছোট ছোট ঘরে ছেলেদের পড়াশুনো ও শোবার জায়গা। কাঠের সিন্দুকটাও দালানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কিন্তু সারদারঞ্জন দুই স্ত্রীকে নিয়ে এখনও মাটির ঘরেই থাকেন।

ছেলেরা ধাঁ ধাঁ করে বড় হয়ে যাচ্ছে। প্রিয়রঞ্জন ম্যাট্রিক পাশ করেই সরকারি কালেকটারিতে চাকরি পেয়ে গেল, থাকতে হয় বরিশালে মাসে একবার করে বাড়িতে আসে। ঝালেকাঠির এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়েও দেওয়া হল। পূর্ণিমা বিধবা হয়ে ফিরে এসে বাপের সেবা করে। চিররঞ্জন ম্যাট্রিক পাশ করে পড়তে চলে গেল কলকাতার কলেজে। খবরের কাগজ দেখে নিজেই চিঠিপত্র লিখে চিররঞ্জন কলকাতার

একটি বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়াবার বিনিময়ে থাকা-খাওয়া জোগাড় করে নিয়েছে। নিখিলরঞ্জনের মনের গতি টের পাওয়া যায় না, চুপচাপ গম্ভীর ভাবে থাকে ও স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে। একবার ম্যাট্রিকে সে ফেল করেছে। ছোটছেলে বিশ্বরঞ্জনের পড়াশুনোয় বেশ মাথা আছে, কিন্তু একদম মন নেই। এক দণ্ড তাকে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসিয়ে রাখার উপায় নেই। গ্রামের ইস্কুলে মারামারি করার পর তাকে হাসানবাড়ির হাইস্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল। গোঁয়ারের মতন রোজ চার মাইল হেঁটে সে সেই স্কুলে যায়, কোনও দিন এক বারও আপত্তি তোলেনি। কিন্তু ইস্কুল থেকে ফেরে অনেক দেরি করে সে। দাদারা কখনও এ রকম সাহস পেত না।

সারদারঞ্জনের বাড়ির পাশেই একটা বড় পুকুর-দিঘি বলা হত তাকে–তার ও-পাশে রায়চৌধুরীদের বাড়ি। বাড়িতে দুর্গাপুজো কালীপুজো হত খুব ধূমধাম করে। মস্ত বড় বাড়ি, উঠোনে বিরাট ধানের গোলা, রায়চৌধুরীদের বন্দুকও ছিল। বাড়ির কর্তারা অবশ্য প্রায় কেউই থাকতেন না কলকাতায় ব্যবসা করতেন–উৎসবের সময়। আসতেন দলবল নিয়ে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির দু'খানা ঘরে থাকত আট-দশটি ছেলে অনাথ, দরিদ্র বা বাড়ি-পালানো ছেলেরা দরখাস্ত করে এখানে জায়গা পেত–তাদের খাওয়া, থাকা ও পড়ার খরচ লাগত না। ঘরদুটো জুড়ে তক্তপোশ পাতা, তার ওপর। ঢালাও বিছানা-সে বিছানা গোটানো হত না কখনও। সকালে মুড়ি ও গুড় দু'বেলা পেটভরা ভাত, মাসে দু'টাকা হাতখরচ এবং দুর্গাপুজোর সময় দু'খানা করে ধুতি ও জামা–এই ছিল বরাদ্দ। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে ওই সব আশ্রিত ছেলেদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী হয়েছিলেন, একজন হয়েছিলেন কলকাতায় বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ও একজন চলচ্চিত্র পরিচালক।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর ওই সব ছেলেরা চলে যেত, আসত নতুন ছেলেরা। কিন্তু পুরনো ছেলেদের মধ্যে অনেকেই বাড়ির মায়া কাটাতে পারত না–ফিরে ফিরে আসত বার বার এবং বাড়ির ছেলের মতনই তাদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। তারা ওই শহরে নিয়ে আসত বাইরের জগতের হাওয়া–তারা ফুটবল ক্লাব, যাত্রাপার্টি গঠন করত,

তারা একটা ছোটখাটো পাবলিক লাইব্রেরিও তৈরি করেছিল। ওই রকম একজন প্রাক্তন ছাত্র ছিল অমরনাথ ভাদুড়ি। বরিশাল বি এম কলেজে বি এ পড়তে পড়তেও প্রায়ই ছুটিছাটায় সে আসত ফুলবাড়িতে। স্থানীয় ছেলেদের মধ্যে তার খুব প্রভাব-যাত্রা থিয়েটার সংগঠনে অমরনাথ খুব ওস্তাদ-অমরনাথের গানের গলাও ছিল খুব সুরেলা। অমরনাথের পূর্ব পরিচয় কেউ জানত না। কোনও দিন সে কারোকে নিজের বাবা-মায়ের কথা ঘুণাক্ষরেও বলেনি। সারদারঞ্জনের ছেলেরা রায়চৌধুরীবাড়ির ওই ছাত্রাবাসে আড্ডা দিতে যেত নিয়মিত। কয়েক বছর পর পুলিশ এসে ওই ছাত্রাবাসটি ভেঙে দেয়-কারণ আস্তে আস্তে সেটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত বিপ্লবীদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

অমরনাথ এসে পূর্ণিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবার পর সারদারঞ্জন যখন তাকে মারতে উঠেছিলেন, তখন সারদারঞ্জনের ছোটছেলে বিশ্বরঞ্জন মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে বাপের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়। বিশ্বরঞ্জনের বয়স তখন সবে চোদ্দো, কিন্তু সবল চেহারা। লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে হাঁটুর জোর দিয়ে মট করে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবার মুখোমুখি চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ায়। তার সেই অদ্ভুত ধরনের ঘৃণা আর ক্রোধ। সেই দিনই সবাই বুঝেছিল, এই ছেলে বিপজ্জনক। এই গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলেকে ঘাঁটানো সহজ হবে না। ‘ পড়াশুনোয় মন ছিল না বিশ্বরঞ্জনের-কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করল। এবং তারপরই ঘোষণা করল, সে আর পড়াশুনো করবে না। বই পড়তে তার ভালো লাগে না।

ছেলের সাফল্যে সারদারঞ্জন যেমন গর্বিত হয়েছিলেন, তেমনই নিরাশ হলেন এই ঘোষণায়। কত সাধ ছিল, এই ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। এখন তার সেই সামর্থ্যও হয়েছে। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, পড়াশুনো করবি না, তা হলে তুই কী করতে চাস!

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বরঞ্জন উত্তর দিল, কিচ্ছু না!

কিচ্ছু না মানে? এ কথার মানে কী?

বিশ্বরঞ্জন নীরবে সোজা চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। চোখের পলক পড়ে না। অর্থাৎ সব কথার মানে সে সবাইকে বুঝিয়ে বলতে প্রস্তুত নয়। নিজের বাবাকেও নয়।

ক্রমশ আবিষ্কৃত হল, বিশ্বরঞ্জন একজন শিল্পী। বাড়ির পেছনের আমবাগানে বহুকালের পরিত্যক্ত একটা গোয়ালঘর ছিল। সেখানে বিশ্বরঞ্জন মাটি দিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরি করে। সরস্বতী, মহাদেব, লাঙলকাঁধে কৃষক, সম্রাট শাহজাহান, গাছের নীচে গৌতম বুদ্ধ। একটি মূর্তি খুব বিরাট, বাঙালি চেহারার সিন্ধুবাদ নাবিকের কাঁধের ওপর ব্রিটিশরূপী দৈত্য। সেই গোয়ালঘরে সাপখোপের বাসা-কিন্তু বিশ্বরঞ্জন ও-সব কিছু গ্রাহ্য করে না। তার সেই শিল্পকলা চর্চার স্থানটি বিশ্বরঞ্জন বহুদিন গোপন রেখেছিল, আস্তে আস্তে সেটি পাড়া-প্রতিবেশীর গোচরে আসে।

শিল্পী বলতে যে রকম মানুষের কথা মনে হয়, বিশ্বরঞ্জন মোটেই সে রকম ছিল না। তার গুন্ডার মতন চেহারা, লোকের সঙ্গে মারধর করে, শাসায়-আবার কখনও কখনও সে আমবাগানের গোয়ালঘরে একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মাটি দিয়ে মূর্তি বানায়। তখন নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকে না তার। অথচ তার চরিত্রে একটা নিষ্ঠুরতা ছিল সব সময়েই। তার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না, প্রায় কৈশোর থেকেই তাকে কেউ কাঁদতে দেখেনি-হালকা রসিকতা বা আমোদপ্রমোদে তার কখনও রুচি দেখা যায়নি। পাশের গ্রামের শেয়ালমারা পার্টিতে বিশ্বরঞ্জন অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। শেয়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাসানবাড়ির লোকেরা একদিন দল বেঁধে শেয়াল মারতে বেরোয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বল্লম হাতে বিশ্বরঞ্জন। দিনেরবেলা শেয়ালগুলো লুকিয়ে থাকে মাটির তলায়-ওপরে অনেকগুলো গর্ত। একটা দিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে আর একটা দিয়ে পালায়। খুঁজে খুঁজে সব ক'টা গর্তের মুখ বন্ধ করে, শেষ গর্তটায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া। হয়, ধোঁয়ায় আর আগুনের আঁচে শেষ পর্যন্ত শেয়াল বেরোবেই। দূরে লোকজন লাঠি হাতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে-বেরোলেই লাঠিপেটা করে মারা। কিন্তু অসীমসাহসী বিশ্বরঞ্জন একটা শেয়ালকে বল্লম দিয়ে গেঁথে সেই গগনভেদী চিৎকাররত প্রাণীটিকে পুনর্বার আগুনে নিক্ষেপ করল। দগ্ধ শরীরে শেয়ালটা যত বার ছুটে আসছে, বিশ্বরঞ্জন সেটাকে আবার

আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই শিয়াল বিশ্বরঞ্জনের উরু কামড়ে ধরেছিল–ইফতিকার নামে একটি ছেলে কোনওক্রমে ছাড়িয়ে না দিলে বিশ্বরঞ্জনের প্রাণ বাঁচানো শক্ত হত। এই বিশ্বরঞ্জনই আবার তন্ময় হয়ে বসে বসে নিজে-গড়া মূর্তির চোখের পাতা আঁকে।

একদিন সারদারঞ্জন এসে হাজির হলেন সেই আমবাগানের স্টুডিয়োতে। বহুক্ষণ ধরে বিশ্বরঞ্জনকে খেতে ডাকা হচ্ছিল, তার কোনও সাড়া নেই, সারদারঞ্জন নিজেই চলে গেলেন সেই গোয়ালঘরে। সেই সব মূর্তিটুর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কী?

বিশ্বরঞ্জন কোনও উত্তর দিল না। দু হাতেই কাদা মাখা, কী যেন একটা অতিকায় প্রাণী তৈরি করছিল সে।

সারদারঞ্জন আবার জিজ্ঞেস করলেন, এসব কী হচ্ছে কী? শেষ পর্যন্ত কি তুই কুমোর হবি নাকি? না পটো হবি? এইসব লক্ষ্মী, সরস্বতী–এসব বানিয়েছিস কেন? বিক্রি করবি?

না।

তা হলে? জানিস না, এসব ঠাকুর দেবতার মূর্তি বানালে পুজো করতে হয়? এমনি এমনি কেউ রাখে? পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এইসব? ছি ছি ছি!

আমি মেজদাকে চিঠি লিখেছি। আমি কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভরতি হব।

আর্ট ইস্কুল? সে আবার কী? কোনও ভদ্রবংশের ছেলে সেখানে যায়? আর্টের আবার ইস্কুল! ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তুই কি আবার ইস্কুলে ভরতি হবি?

আপনি সব খবর রাখেন না...

পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিশ্বরঞ্জন বাবাকে আপনি সম্বোধন করে কথা বলত বটে, কিন্তু কথাবার্তায় বিনয় বা শ্রদ্ধা দেখানোর ভাব তার ধাতে ছিল না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই

সারদারঞ্জন হঠাৎ রাগে দপ করে জ্বলে উঠলেন। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য হুংকার দিয়ে বললেন, এসব চলবে না! এসব চলবে না বলে দিলাম!

বিশ্বরঞ্জন একটুও ভয় পায় না। ক্রোধে অন্ধ হয়ে সারদারঞ্জন হাতের লাঠি দিয়ে সিন্ধুবাদ মূর্তির ওপর জোরে আঘাত করলেন। মূর্তিটার অনেকখানি ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভেতরের অন্ধকার।

এতটা বাড়াবাড়ি করে সারদারঞ্জন বোধহয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের প্রতিক্রিয়া হল অন্য রকম। নিজেই সে লাথি মেরে মেরে অন্য মূর্তিগুলো ভাঙতে লাগল। সরস্বতী, শিবমূর্তি তার সবল পদাঘাতে ছিটকে পড়তে লাগল চতুর্দিকে।

সারদারঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ-ছেলেকে তিনি চেনেন না। বাবা-মায়ের মনে সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগে যখন কোনও সন্তানের আচরণ তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। যে-সন্তানকে চোখের সামনে এইটুকু থেকে বড় হতে দেখলেন, সেই-ই যখন একদিন স্নেহ-মমতায় ঘেরা বোধের সীমানা ভেঙে দিয়ে বাইরে দাঁড়ায় তখন এই পৃথিবী রসশূন্য হয়ে যায়।

পূর্ণিমার বিয়ের পর ফুলবাড়িতে আর একটি আলোড়ন ঘটালেন গঙ্গাধর দত্ত। লোকের মুখে মুখে এঁর নাম হয়ে গিয়েছিল, মরা-গোরু কি ঘাস খায় দত্ত! এ রকম নামের উৎস এই, গঙ্গাধর তার বাবা মারা যাবার পর শ্রাদ্ধ করেননি, মাথা ন্যাড়া করেননি। স্থানীয় হিন্দু সমাজকে চমকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, মরা মানুষের আত্মা আবার পিন্ডি। খাবে কী? মরা গোর কি ঘাস খায়? এর উত্তরে দত্তবংশের কুলপুরোহিত মন্তব্য করেছিলেন, বৎস গঙ্গাধর, তোমার ব্যবহারটা কিয়ৎ পরিমাণে গোবৎসের মতন, কিন্তু তোমার বাপও যে গোরু ছিলেন, তা তো আমরা জানতাম না!

গঙ্গাধর বেশ কিছুকাল দেশ-ছাড়া ছিলেন। তাঁর বিধবা দিদি ও বুড়োবুড়ি বাবা-মা থাকতেন শহরের একটেরে বাড়িতে। বুড়ি আগেই মরলেন সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখে সতীলক্ষ্মীর মতন। কিন্তু বুড়ো মরার কিছু দিন আগে ফিরে এলেন গঙ্গাধর। মুখে একমুখ

দাড়ি ও অনর্গল হিন্দি ও ইংরিজি বুলি! লম্বা-চওড়া চেহারা, ব্যবহারে একটা বেপরোয়া ভাব। মফসল শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এইসব মানুষ এক একটা ঝড়ের মতন। গঙ্গাধর তার বাবার শ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করায় সকলের মনে হল, এ রকম কাণ্ড ইতিহাসে কোনও দিন ঘটেনি। শুধু পারলৌকিক কাজ করতে অস্বীকারই নয়, 'মরা গোরু কি ঘাস খায়' কিংবা 'বামুন নেবে টাকা সিকি আর স্বগ্যে আমার বাপ বগল বাজাবে, ফুঃ ফুঃ–' এই ধরনের অশ্রদ্ধেয় উক্তি। যদিও এর বহু আগেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর ডাক নাম ছিল মহর্ষি, তিনিও যে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, সে-খবর ওখানে কেউ রাখে না।

গঙ্গাধর দত্তকে শাস্তি দেবার জন্য স্থানীয় হিন্দুসমাজ রে রে করে উঠল। কিন্তু শেষ। পর্যন্ত দেখা গেল, শাস্ত্র বহির্ভূত নিছক লোকাঁচার-নির্ভর হিন্দু সমাজের নিয়মকানুন খুব কড়া হলেও ভেতরে ফক্কা, শাস্তি দেবার বিশেষ কোনও অস্ত্র তাদের হাতে নেই। বিশেষত গঙ্গাধরের মতন শক্ত সবল গোঁয়ার মানুষকে। যত জারিজুরি মেয়েদের ওপর। সামাজিক অনুশাসন অসহায় বিধবাদের একাদশীর দিন জলও খেতে না দিয়ে মাটি চাটিয়েছে, কিন্তু পুরুষের রাশ আলগাতে পারেনি। গঙ্গাধর দত্ত চণ্ডীমণ্ডপের বৃদ্ধমণ্ডলীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। গঙ্গাধরের ধোপা-নাপিত বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হল। গঙ্গাধরের মুখ-ভরতি দাড়ি আর মাথায় লম্বা লম্বা চুল–তার নাপিতের দরকার নেই। বাড়িতে বিধবা বোনটা রয়েছে, জামাকাপড় সে-ই কেচে দেয়। গঙ্গাধর হা-হা করে হেসে বলল, আউর কেয়া হ্যাঁয়, বোলো! আউর ক্যা? সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তার নেমন্তন্ন বন্ধ–তাতেও কিছু যায় আসে না, কারণ ইতিমধ্যেই আশেপাশের কয়েকখানা গাঁয়ের ছেলেছোকরারা গঙ্গাধরের অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল।

তখন চারদিকে রটে গেল যে, গঙ্গাধর দত্তের বাবার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ রাত্তিরে এসে শ্মশানতলার পাশে বাঁশবাগানের মধ্যে কাঁদে। অনেকেই সেই কান্না শুনেছে। এক রাত্তিরে দলবল নিয়ে গঙ্গাধর নিজে গেলেন শ্মশানতলায়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সত্যিই শুনতে পেলেন সেই কান্না। একটা প্রকান্ড কাঁপা কাঁপা অতিপ্রাকৃত আওয়াজ

সাইরেনের মতো উঁচুতে উঠে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। কোনও মানুষ বা জীবজন্তুর গলা থেকে এ রকম শব্দ বেরোতে পারে না। এরপর একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। অত সাহসী ও প্রচণ্ড নাস্তিক গঙ্গাধর দত্তের ভূতের ভয় ছিল খুব। রাত্তিরবেলা তার ভূতের ভয়ের কাছে কোনও যুক্তিতর্ক টিকত না। ভয় পেয়ে পাশের সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরে গঙ্গাধর কাতর ভাবে বলতে লাগলেন, টু অর ফলস? টু অর ফলস? ভোলা, শিগগির বল, আমি একাই শুনতে পাচ্ছি, না তোরাও শুনেছিস?

সে রাত্তিরে ভয় পেয়ে তারা সদলবলে পালিয়ে আসে। তারপর গঙ্গাধর তিন-চার দিন জ্বরে ভুগলেন। কিন্তু হার মানলেন না। সেরে উঠে আবার একদিন গেলেন শ্মশানে। সে দিনও শোনা গেল, সেই দুর্বোধ্য আর্তনাদ। গঙ্গাধর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আপনি কিছু বললেন? শব্দটা একবার হয়েই থেমে যায়। তারপরই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ও বাঁশবনে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। ওদের সঙ্গে একটা টর্চ পর্যন্ত নেই-দুটি হ্যারিকেন। সে দিন ওই দলে আর একজন যুবক ছিল। একটি হ্যারিকেন নিয়ে সে একা এগিয়ে গেল বাঁশবনের দিকে। বলাই বাহুল্য, সেই যুবকটি বিশ্বরঞ্জন।

কিন্তু তারপরই আর একটা কাণ্ড হল। হঠাৎ হাওয়ায় নিভে গেল গঙ্গাধরদের সঙ্গের হ্যারিকেনটা। তখন অলৌকিক বিশ্বাসের হাওয়া বইছে চার দিকে। হ্যারিকেন নিভে যাওয়া তো ভয়ের ব্যাপারই। সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, রঞ্জ, রঞ্জু ফিরে আয়! শিগগির!

বাঁশবনের সেই শব্দ কিছু দিন পর আপনা-আপনি থেমে যায়। কিন্তু রহস্যের মীমাংসা হল না। গঙ্গাধরের বাবার প্রেতাত্মার কান্নার গল্প স্থায়ী হয়ে গেল ফুলবাড়িতে।

একদিন জয়নাল আবেদিন সারদারঞ্জনকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, পণ্ডিতমশাই আপনার ছেলেকে সামলান।

ছোটছেলের সম্পর্কে নিত্যনতুন অভিযোগ শোনা গা-সহা হয়ে গিয়েছিল সারদারঞ্জনের। কিন্তু জয়নাল আবেদিনের মতন গণ্যমান্য বক্তির সঙ্গে তার ছেলে কী করতে পারে?

বিবর্ণ মুখে সারদারঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, কেন, সে কী করেছে? আপনার কোনও ক্ষতি করেছে সে হারামজাদা?

জয়নাল আবেদিন অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওরা দল বেঁধে গুন্ডামি করতে আসে। আমার দোকানের সামনে। কিন্তু সেটুকু সামাল দেবার ক্ষমতা আমার আছে। সে-সব আমি পরোয়া করি না। তবে, আপনি মানী লোক, আপনাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য। আপনার ছেলে অস্থানে কুস্থানে যায়! ছেলের এবার তাড়াতাড়ি বিয়ে শাদি দিন!

কোথায় যায়? কোথায় যায় বললে?

স্টিমারঘাটায় কসবিদের ঘরের সামনে রোজ সন্ধ্যাবেলা সে ঘোরাঘুরি করে। আমার লোক দেখেছে।

সারদারঞ্জনের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। তার ভাগ্যে এমন ছিল, এ রকম কথাও শুনতে হল তাঁকে? তার ছেলে বেশ্যাপল্লিতে যায়!

তক্ষুনি ছেলের খোঁজে ছুটলেন সারদারঞ্জন। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? সে তো বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে না। আমবাগানের গোয়ালঘরেও আজকাল যায় না। পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতেও নেই। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যাবেলা সারদারঞ্জন নিজেই। গেলেন স্টিমারঘাটায়।

সেদিন হাটবার, বেশ ভিড়। সবে একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। নদীর ওপর পাতলা আস্তরণের মতন জমে আছে কুয়াশা। টাটকা সতেজ তরিতরকারি এসেছে দোকানে। চাষিদের হাতে আউসধান বিক্রির কাঁচা টাকা। বেশ্যাদের ঘরগুলোর সামনে আট-দশ জন মানুষ হাতে হাত ধরাধরি করে শিকল বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে গঙ্গাধর এবং বিশ্বরঞ্জন। তারা কোনও খদ্দেরকে ঢুকতে দেবে না। আর ঘরের ভেতর থেকে মেয়েগুলো ওদের উদ্দেশে বর্ষণ করছে পৃথিবীর কুৎসিততম গালাগাল। গঙ্গাধরের

দলবল একটু আগে জয়নাল আবেদিনের দোকানের সামনে বিলিতি বস্ত্র বর্জনের আবেদন জানিয়ে পিকেটিং করে এসেছে।

ভিড় ঠেলে সারদারঞ্জন সামনে এসে দাঁড়ালেন। অপমানে তার মাথা কাটা যাচ্ছে। চিৎকার করে বললেন, রঞ্জু, এক্ষুনি চলে আয়।

বিশ্বরঞ্জন শুনেও শুনতে পেল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। গঙ্গাধর এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বললেন, মুখুজ্যে কাকা, আপনি বাধা দেবেন না। আমরা এদের ভালোর জন্যই...

সারদারঞ্জন কুঁকড়ে উঠে বললেন, ছুঁয়ো না, তুমি এত কাছে এসো না-নিজে কুলাঙ্গার, এখন আমার ছেলেকেও–

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সারদারঞ্জন বড় দুই ছেলেকে বাড়িতে আনালেন। তিনি তাদের বললেন, ফুলবাড়িতে থেকে বিশ্বরঞ্জন যদি এসব কীর্তি করে বেড়ায়, তা হলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

দাদারা অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিশ্বরঞ্জনকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে কলেজে ভরতি করে দিল। বাবার ইচ্ছে মতন তাকে ডাক্তারি পড়াবার পরিকল্পনাই বহাল রইল।

ঢাকায় যাবার পর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকেই গেল বিশ্বরঞ্জনের। মেজদা চিত্তরঞ্জনের বিয়ের সময় একবার মাত্র বাড়িতে এসেছিল, তারপর আর এক বছরের মধ্যে ছুটিছাটাতেও তার দেখা পাওয়া যায় না। কদাচিৎ মাসে দু-এক লাইন চিঠি লেখে।

এক বছর পরেও বিশ্বরঞ্জন বাড়ি ফিরল না, কিন্তু তার খোঁজে এল পুলিশ।

ফুলবাড়ির মানুষ জলজ্যান্ত সাহেব বেশি চোখে দেখেনি। কদাচিৎ স্টিমারের রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ানো সাহেব-মেমদের দেখা গেছে দূর থেকে। কচিৎ কখনও জেলার কালেক্টর সাহেব কয়েক ঘন্টার জন্য থেকেছেন ফুলবাড়িতে। তাঁকেও সকলের চোখে দেখবার

সৌভাগ্য হয় না। কর্মোপলক্ষে যেসব গ্রাম্য মানুষ কখনও বরিশাল বা ঢাকায় যায়, তারাই বাড়ি ফিরে এসে স্বচক্ষে সাহেব দেখার গল্প বলে। সাহেবরা তখনও রূপকথার মানুষ। এদের গায়ের রং দেবতাদের মতন। এই টুপিওয়ালারা অসাধ্যসাধন করতে পারে, ভয়ডর বলে কোনও বস্তু এদের শরীরে নেই। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে এসে এরা এত বড় দেশটাকে হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে।

ফুলবাড়ির রাস্তা দিয়ে প্রথম একজন সাহেব, স্থানীয় দারোগা আর তিনজন সিপাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে হেঁটে এসে সারদারঞ্জনের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। সারদারঞ্জনের নাকের সামনে ব্যাটন তুলে বলল, হোয়ার ইজ ইয়োর সান? টুম ব্রাহমিন, ঝুট বাত মাৎ বোলো! হোয়ার ইজ হি হাইডিং?

সারদারঞ্জন এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না। দারোগা তর্জনগর্জন করে অনুবাদ করে দিল। তোমার ছেলে বিশ্বরঞ্জন কোথায় লুকিয়ে আছে, বলো! মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। ব্রিটিশ শাসনের লম্বা হাত তাকে ঠিক খুঁজে বার করবে!

অত ছোঁয়াছানির বাতিক সারদারঞ্জনের, কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ সাহেব ও যবন সেপাইরা জুতো পরেই ঢুকে গেল ঘরে ঘরে। সমস্ত জিনিসপত্র উলটেপালটে তছনছ করে দেখল।

বড় শহরের খবর এখানে তিন-চার দিনের আগে পৌঁছোয় না। তবু পুলিশপক্ষ ধারণা করতেই পারেনি যে, সারদারঞ্জন কিছুই জানেন না। দুদিন আগে সারদারঞ্জনের ছেলে। বিশ্বরঞ্জন ঢাকায় পুরনো পলটনে সাহেব পুলিশকমিশনারকে গুলি করে মেরে ফেলে পালিয়েছে। হিউবার্ট সাহেব তখন যুব সমাজের ত্রাস। বিশ্বরঞ্জন তিনটি গুলিতে তার মস্তক ভেদ করে দেয়। সারা দেশে তাই নিয়ে হইচই, শুধু জানে না আসামির বাবা-মা।

বিশ্বরঞ্জন আর ধরা পড়েনি। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এরপর পঁচিশ বছরের মধ্যেও তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। লোকের ধারণা সে সাধু হয়ে হিমালয়ে আছে কিংবা জাভা-সুমাত্রার দিকে পালিয়ে গেছে।

প্রথম পুলিশ আসার দিন দশেক বাদে আবার পুলিশ এসে সারদারঞ্জনকে ঢাকা শহরে নিয়ে যায়। মর্গে তিনটে পচা-গলা শব দেখিয়ে তার ছেলেকে শনাক্ত করতে বলে। কয়েক দিন আগে নদীর ওপর পলাতক অবস্থায় এই তিন জনকে পুলিশ গুলি করে মারে। সারদারঞ্জন দু' দিকে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন, এর মধ্যে তার ছেলে নেই।

বাড়ি ফিরে আসার কয়েক ঘণ্টা বাদেই সারদারঞ্জনের পক্ষাঘাত হয়। সেই অবস্থায় বেঁচে ছিলেন দেড় মাস। বাকশক্তিও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে মাঝে মাঝে কিছু বলতে চাইতেন, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন শুধু, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ত। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে হঠাৎ যেন অপ্রাকৃত শক্তিতে তিনি বিছানার ওপর ওঠে বসলেন, গলা দিয়ে অদ্ভুত কাতর শব্দ বার করতে লাগলেন। উপস্থিত আত্মীয়স্বজনদের ধারণা, বিশ্বরঞ্জনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতেই তিনি মারা গেছেন।

পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে বিশ্বরঞ্জনের নিরুদ্দেশ থাকাটা সম্ভবত গুজব। নানাসাহেব কিংবা সুভাষ বসু সম্পর্কে যে রকম গুজব প্রচলিত আছে, ও রকম সাধারণত হয় না। এমনও হতে পারে, মর্গের মৃতদেহগুলির মধ্যে সারদারঞ্জন তাঁর ছেলেকে চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেননি সে কথা। নইলে তার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন? বিশ্বরঞ্জনের পক্ষে কোথাও অপঘাতে এবং অজ্ঞাতনামা হিসেবে মৃত্যুবরণ করাই সম্ভব। কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের আত্মা মরেনি।

এই পরিবারে প্রথম বিশ্বরঞ্জন মারা যায় অতি অল্প বয়সে তাকে বাঁচানোর কত চেষ্টা হয়েছিল। তোক বিশ্বাস অনুসারে সে-ই আবার ফিরে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বরঞ্জনের মধ্যে। সেই বিশ্বরঞ্জনও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পূর্ণ যৌবনের আগে। বহু বছর বাদে বিশ্বরঞ্জনের আত্মা আর একবার ফিরে এসেছিল এই পরিবারে সম্পূর্ণ অন্য চেহারায়, অন্য চরিত্রে।

৫. বয়স মানুষ খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলে

সেই বয়স মানুষ খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলে, যে বয়সে প্রত্যেকটি সকালকেই মনে হয় নতুন। ঘুম ভাঙার পর চোখে খানিকটা বিস্ময়ের ঘোর লেগে থাকে। শরীরে ভর করে না পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বসবাসের অবসাদ। বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে বাইরে ছুটে যাওয়া যায়।

বাদল তার মায়ের থেকেও আগে ওঠে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু একটু পিচুটি লেগে থাকা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে তাদের বাড়ির সামনের চওড়া রাস্তার দিকে। কিছু কিছু দৃশ্য, কিছু মানুষকে সে প্রত্যেক দিন দেখে। যেন এদের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, দেখা না করলে চলবে না। প্রথমেই সে দেখে দু'জন মানুষকে, তারা রাস্তার চাপাকলের সঙ্গে লম্বা হোসপাইপ লাগিয়ে জল ছড়ায়। হোসপাইপটা নেতিয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যে জল ঢুকলেই সেটি আস্তে আস্তে সাপের মতন জীবন্ত হয়ে ওঠে, নিজে নিজেই নড়েচড়ে। একজন লোক সেটা হাতে তুলে নিয়ে জল ছড়ায়- তখন ফট ফট করে আওয়াজ হয় কত দূর পর্যন্ত যায় জল, হঠাৎ মনে হয় রাস্তার সব.. পথিককে ভিজিয়ে দেবে কিন্তু কারওর গায়ে কোনও দিন জল লাগেনি, ঠিক পায়ের কাছে এসে থেমে যায়। বাদলের মনে হয়, এটা একটা খেলা।

সাতসক্কালেই পথে অনেক মানুষ থাকে। অধিকাংশই গঙ্গাস্নান যাত্রী, কেউ কেউ শীতের জড়তা কাটাবার জন্য গান গাইতে গাইতে যায়। মহিলারা যান রিকশায়-অনেক ঠুং ঠুং শব্দ পরস্পরকে পাল্লা দেয়। একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারি গিরিশ পার্কের সামনে রোজ পায়রাদের গম খাওয়ান। ছড়িয়ে দেন মুঠো মুঠো গম-ঝক ঝক পায়রা এসে বসে রাস্তার মাঝখানে দূর থেকে তাদের মনে হয় চঞ্চল ফুলের মতন। একটু বাদেই একটা বিশাল

চেহারার ষাঁড় এসে ঢুকে পড়ে পায়রার ঝাকের মধ্যে। পায়রাদের খাবারে সে। ভাগ বসাতে যায়। বৃদ্ধ মাড়োয়ারিটি পরম স্নেহে ষাঁড়টির গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন, আয়, বেটা চুঃ চুঃ-

একটা লোক কলাপাতায় মুড়ে মাখন বিক্রি করে। সাদা ও হলদে দু'রকম মাখন- নুন ছাড়া ও নুন মেশানো-ছোট ছোট কলাপাতার প্যাকেট দাম দু পয়সা। লোকটি বাদলদের বারান্দার তলায় এসে রোজ মুখ তুলে বলে, মাখন চাই নাকি, খখাকাবাবু? মাখন?

বাদল ঘাড় নেড়ে না' জানায়। লোকটি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দু-চার বার যেন বাদলকেই শোনাবার জন্য দু'-তিন রকম সুরে মাখন, মাখন, মাখন হাঁক ছাড়ে। বাদল কোনও দিন কেনেনি, তবু লোকটা বিরক্ত হয় না।

পর পর ধামা মাথায় করে আসে আর একটি লোক, সে ঠোঁটদুটোকে গোল করে বলে, মুড়ির চাক, ছোলার চাক, চিঁড়ের চাক চাই-ই! বাদল বেশ কিছুদিন, এই লোকটি কী বলে যে চাঁচায়, তা বুঝতেই পারেনি! সেই জন্যই মায়ের কাছে ঝুলোঝুলি করে এই লোকটিকে একদিন ডেকেছিল। ওমা, এই লোকটি মোয়া বিক্রি করে। তবে চিড়ের মোয়াগুলো গোল নয় চ্যাপটা। আর ভোলার মোয়া বাদল আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু মুড়ির মোয়াকে এ কেন মুড়ির চাক বলে, বাদল তা বুঝতে পারে না।

হঠাৎ ঝনঝন আর কপ কপ শব্দে চতুর্দিক সচকিত হয়ে যায়। রাস্তা ছেড়ে দেয় লোকজন। সেই ঘোড়ার গাড়িটি আসছে। দুটি বিশাল অশ্ব টেনে আনছে একটা কালো রঙের চকচকে গাড়ি, কী সুন্দর তার পালিশ-ঝকমক করে। গাড়ির ওপরে উর্দি-পরা কোচোয়ান বসে থাকে চাবুক হাতে নিয়ে-পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে আর একজন উর্দি-পরা লোক, সে একটা পেতলের জিনিসে ঝনঝন আওয়াজ করে। গাড়িখানা দেখলেই সম্ভ্রম হয় কিন্তু গাড়িটার দুটি দরজাই বন্ধ, ভেতরে কে আছে বোঝা যায় না। বাদল কোনও দিনই জানতে পারেনি, ওই সুদৃশ্য গাড়ির রহস্যময় অতিথি প্রতিদিন ভোরে কোথায় যায়।

আর একটু পরেই মা হাতে খানিকটা ছাই নিয়ে এসে বলেন, এই নে। সড়ে ছ'টা বেজে গেছে কখন, আর তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস!

ছাই দিয়ে দাঁত মেজে ফেলে বাদল, মুখ নিজেই ঘোয়, কিন্তু চোখ ধুইয়ে দেন মা নিজে। মা চোখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে দেন। একবার জ্বরে ভোগার পর বাদলকে সরষের তেল আর নুন দিয়ে দাঁত মাজতে হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে ছাই দিয়ে মাজাই তার পছন্দ হয়।

মুখ ধুয়ে এসে চট করে দুধ মুড়ি খেয়ে নেয়, তার পরেই জামা-প্যান্ট বদলে মাথা আঁচড়ানো। বাদলকে পড়তে হয় সকালের ইস্কুলে। বাদলের দুই দিদি সান্ত্বনা আর। শ্রীলেখার ইস্কুলও সকালে, বাদল তাদের সঙ্গে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাদল দেখতে পায় একতলায় বসবার ঘরে খবরের কাগজ সামনে মেলে বসে আছেন বড়বাবু, হাতে সিগারেট। বড়বাবু কখনও চোখ তুলে তাকান ওদের দিকে, কোনও কোনও দিন একটাও কথা বলেন না। আবার কোনও কোনওদিন বাদলকে হাতছানি দিয়ে কাছে। ডেকেই দু'হাতে তাকে শূন্যে উঁচু করে তোলেন, কী রকম লেখাপড়া শিখছিস, দেখি! বল তো, পিপীলিকা বানান কী?

বাড়ির চাকর সঙ্গে সঙ্গে আসে, কিন্তু বাদল দিদিদের হাত ধরে যায়। শ্রীলেখাদির কাছে পয়সা থাকে, বাদল এক এক দিন আবদার বায়না করে শ্রীলেখাদিকে দিয়ে লাঠি লজেঞ্চুস কেনায়। তারপর দিদিরা তাকে ইস্কুলের দরজায় পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ইস্কুলে চলে যায়।

বাদলদের ইস্কুলের নাম যদু পণ্ডিত বিদ্যালয় কিন্তু লোকের মুখে মুখে এর নাম যদু পণ্ডিতের পাঠশালা। এই ইস্কুল ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, সুতরাং ছাত্ররা সবাই শিশু। সকালবেলার গাছ-ভরতি পাখির মতন গোটা স্কুল বাড়িটা জুড়ে শিশু কণ্ঠের রিনিরিনি আওয়াজ। ঠিক সাতটার সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলেই সব আওয়াজ থেমে যায়। সবাই ক্লাসঘর ছেড়ে

বারান্দায় দাঁড়ায়। দোতলায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড টাকওয়ালা হেডমাস্টারমশাই দু'হাত উঁচু করে বলেন, রেডি! ওয়ান টু থ্রি–

সবাই একসঙ্গে গান শুরু করে:

জয় ভগবান
সর্ব শক্তিমান
জয় জয় ভবপতি...ইত্যাদি।

গান শেষ হওয়া মাত্রই ছেলেরা দৌড়োয় যে-যার ক্লাসঘরের দিকে। যে আগে যাবে সে সামনে বসবে।

ইস্কুলে বাদলের মন ভালো থাকে না। তখনও অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তার ভাব হয়নি। একেই সে লাজুক, তার ওপরে বাঙাল উচ্চারণের জন্য সে কথাই বলতে চায় না। সহজে। অন্যান্য ছেলেরা মাস্টারমশাইকে লুকিয়ে কাটাকুটি খেলে স্লেটে, ছুরি দিয়ে কাঠের ডেস্কে নাম খোদাই করে বাদল আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। পরিতোষ বলে একটা ছেলে মাঝে মাঝেই নিজের পকেটে হাত ঢোকায়, তারপর সেই হাতটা মুখের কাছে এনে ভেতরে একটা কিছু পুরে দেয়, খুট খুট করে চিবোয়। বাদল সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বলে একদিন সে বাদলকে বলল, খাবি?

বাদল কিছু উত্তর দেবার আগেই পরিতোষ তার মুঠোকরা হাতটা এনে বাদলের মুখের কাছে চেপে ধরল। খেয়েও বাদল বুঝতে পারছে না, জিজ্ঞেস করল, কী? পরিতোষ বলল, মশলা!

দুপুরে ভাত খাবার পর বাদল তার বাবা-জ্যাঠাকে মশলা চিবোতে দেখেছে বটে। কিন্তু এমনি এমনি কেউ বসে বসে মশলা খায়–এটা তার ধারণাই ছিল না। তাও ওইটুকু ছেলে।

দিদিদের ছুটি হবার আধ ঘণ্টা আগেই বাদলের ছুটি হয়ে যায়। সেই সময়টা তাকে একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গেটের কাছে। অন্য ছেলেরা দল বেঁধে চলে যায়, কেউ কেউ তাকে ডাকে–তবু বাদল যেতে পারে না। বাদলের ওপর কড়া হুকুম, কক্ষনও সে একলা একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না। কলকাতায় ছেলেধরা আছে, তারা একলা বাচ্চা ছেলে পেলেই ছালায় (বস্তায়) ভরে নিয়ে চলে যায় তারপর তাদের হাত-পা কেটে ভিখিরি বানিয়ে দেয়। বাদল বাড়ির রাস্তা চেনে, তার ইচ্ছে করে এক ছুটে বাড়ি চলে যেতে–কিন্তু হুকুম অমান্য করার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না।

স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা আলুকাবলি কিংবা হজমি কিনে খায়, কিন্তু বাদলের হাতে পয়সা দেওয়া হয় না। সবচেয়ে লোভনীয় হচ্ছে 'বুড়ির মাথায় পাকা চুল'–লাল তুলোর মতন মিষ্টি জিনিস–এই জিনিসটা বাদলের বাড়ির কাছে কেন যে পাওয়া যায় না!

লাল পাগড়ি মাথায় একজন জমকালো চেহারার পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে বাদলদের ইস্কুলের কাছেই। কলকাতার রাস্তার পুলিশ সে-সময় বেশ একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার। ছেলেরা পুলিশটিকে দেখলেই চেঁচিয়ে বলে, পুলিশ, সেলাম! পুলিশ, সেলাম!

পুলিশটি উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসে। কয়েকটা দুষ্টু ছেলে অবশ্য একটু দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে,

বন্দে মাতরম
পুলিশের মাথা গরম!

বলেই তারা দৌড়োয়।

এ রকম ভাবেই ছেলেরা পাগলা হাবু'কে খ্যাপায়। পাগলা হাবু অত্যন্ত ভালোমানুষ পাগল। মোটাসোটা চেহারা, খালি গা। সারা পিঠ জুড়ে কালসিটে পড়ে গেছে। সে একখানা মোটা লাঠি নিয়ে নিজের পিঠে নিজেই মারে–আর কী যেন চাচায়। আগে বাদলের মনে

হত, ও বলছে বাংলা কাবু। পরে মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝেছে, ও বলে, পাগলা হাবু। যেন নিজের পাগলামির জন্য নিজেকেই শাস্তি দেয় সে।

কিন্তু কৈশোরে অধিকাংশ মানুষই নিষ্ঠুর। অমন যে নিরীহ পাগলা হাবু তাকেও ছেলেরা নিষ্কৃতি দেয় না। যেহেতু পাগলা হাবু নিজেকে ছাড়া আর কারওকে কখনও মারে না–তাই ছেলেরা নির্ভয়ে তার কাছে গিয়ে চিলুবিলু করে তাকে খোঁচায়, চিমটি কাটে, কেউ কেউ ইটের টুকরো ছুঁড়ে মারে। পাগলা হাবু তখন কাঁদে ভেউ ভেউ করে। . সপ্তাহে একদিন বাদল মাকে নিয়ে গঙ্গায় যায়। আগে মা আর জ্যাঠামশাই দু'জনে মিলে যেতেন–ইদানীং জ্যাঠামশাই বাতে শয্যাশায়ী হওয়াতে মাকে একাই যেতে হয়, তিনি বাদলকে সঙ্গে নেন।

রিকশা করে গিয়ে ঘাট থেকে একটু দূরে নামতে হয়। পথের দু পাশে বসে থাকে। অসংখ্য ভিখিরি। পুণ্য অর্জনের জন্য লোকেরা তাদের একপয়সা বা আধলা দেয়। কেউ কেউ বাড়ি থেকে চাল নিয়ে আসে। কেউ কেউ আবার অধিকতর পুণ্য অর্জনের জন্য ভিখিরিদের পয়সা না দিয়ে সেই পয়সা গঙ্গায় ছুঁড়ে দেয়। বাদল শুনেছে, গঙ্গার জলে ডুব দিলেই সব পাপ চলে যায়। জলে ডুব দিয়ে থাকলে পাপগুলো শরীর ছেড়ে অদৃশ্য ফড়িঙের মতন জলের ওপর অপেক্ষা করে, মাথা তুললেই আবার চেপে বসে। বার বার ডুব দিলে, পাপগুলো হয়তো বিরক্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। সেই জন্যই অনেককে মরার একটু আগে গঙ্গার কিনারায় নিয়ে আসা হয়–গঙ্গার জল ছুঁয়ে থেকে মরতে পারলে তার আর কোনও পাপ সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না। এইসব শোনার পর বাদল একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলের মধ্যেই পেচ্ছাপ করে ফেলেছিল তখন তার কী ভয়! কিন্তু বাদলের যে কোনও উপায় ছিল না–ঠান্ডা জলে নামামাত্রই তার এমন পেচ্ছাপ পেল কিছুতেই সে আটকাতে পারেনি–কেউ দেখেনি অবশ্য, মা-ও কিছু জানতে পারেননি কিন্তু ঠাকুর দেবতারা যে সব টের পেয়ে যান।

বেশির ভাগ দিনই অবশ্য বাদল স্নান করে না। বাদলের কাজ হল মায়ের কাপড়চোপড় পাহারা দেওয়া। এখানে খুব চোরের উপদ্রব। গঙ্গায় শুধু লোক পুণ্য করতেই আসে না, এখানে পাপ করতেও অনেকে আসে। মায়ের কাপড়জামা বুকে চেপে ধরে বাদল দাঁড়িয়ে

থাকে। একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না অবশ্য। এখন তার আট বছর বয়স, এখন আস্তে আস্তে তার সাহস বাড়ছে। মায়ের স্নান সেরে আসার মোটামুটি সময়টা তার জানা। সেই সময়টুকু সে এদিক-ওদিক ঘুরে আসে।

মানুষ গিসগিস করছে চার দিকে। গঙ্গায় বুকজলে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ স্তোত্র পাঠ করে। কোনও কোনও দুঃসাহসী সাঁতরে ভাসমান বয়ার কাছে চলে যায়। দুরন্ত স্রোত। এক একটা স্টিমার চলে গেলে বড় বড় ঢেউ এসে বাঁধানো ঘাটে আছড়ায়। স্টিমারের গম্ভীর বিষণ্ণ ভোঁ অনেকক্ষণ কানে লেগে থাকে।

ঘাটলায় ছোট ছোট কাঠের চৌকি পাতা। সেইখানে উপুড় হয়ে শুয়ে মোটাসোটা লোকেরা সারা শরীরে তেল মাখায় পয়সা দিয়ে। তাদের ঘাড়ের ওপর, পিঠের ওপর চড়ে তৈলমর্দনকারীরা প্রচণ্ড শব্দে চপেটাঘাত করে, গুম গুম করে কিল মারে–আর নীচের লোকটি মহানন্দে পড়ে আছে। বাদল হাঁ করে এই দৃশ্য দেখে।

পাশেই শ্মশান। বাদল একবার মাত্র মায়ের সঙ্গে শ্মশানে ঢুকেছিল, তারপর থেকে একা একা প্রত্যেক দিন যায়। মা জানতে পেরে বারণ করেছিলেন, বাদল তবু যায়। এটা তার নেশার মতন। সবসময় দু-তিনটে চিতা জ্বলে, মানুষ আছড়ে-পিছড়ে কাঁদে বাদল চুপটি করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে তার ধারণা ছিল, কোনও যুক্তি নেই এ ধারণার, যে মানুষ বুঝি শুধু রাত্তিরবেলাই মরে, রাত্তির বেলাই তাদের পোড়ানো হয়। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে এসে সে কোনওদিন সবকটা নেবানো চুল্লি দেখেনি।

সেদিন কী যেন একটা বিশেষ তিথি। ভিড়ে ভিড়াক্কার। কিন্তু বাদল এখানে অনেক বার এসেছে বলে এখন সবাকছু চেনে। তার ভয় করে না। মেয়েদের কাপড় ছাড়ার জায়গাটার পাশেই সে দাঁড়িয়ে ছিল মায়ের অপেক্ষায়। এত ভিড় যে ভলানটিয়াররা অনেক চেষ্টা করেও সামলাতে পারছে না। বিভিন্ন গেটে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। এত ভিড়ের মধ্যেই আবার কোনও একজন গণ্যমান্য লোকের মৃতদেহ নিয়ে এসেছে একটি দল। মস্ত বড় পালঙ্ক, ফুলে ফুলে ছয়লাপ, মৃতদেহ দেখাই যায় না, সেটা বয়ে নিয়ে আসছে যারা তারা

এই ভিড়ের মধ্যে.হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে একজন আবার খইয়ের সঙ্গে পয়সা ছড়াচ্ছে তার ফলে কাঙালিদের হুটোপুটি।

মা এসে কাপড় ছেড়ে নিলেন, তারপর বাদলকে বললেন, শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে থাকবি। বড়রাস্তা পর্যন্ত না গেলে রিকশা পাওয়া যাবে না।

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে ওরা। একটা জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক, তাদের এড়িয়ে এগোনো যায় না। চুক চুক আওয়াজ করছে-বাইরে থেকে কৌতূহলী মানুষরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছে? এখানে কী হয়েছে?

একটি বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে সে এখানে দাঁড়িয়ে একা একা কাঁদছে। চেহারা ও পোশাক দেখলে মনে হয় সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়ে। ফুটফুটে রং, মাথাভরতি কঁকড়া চুল।

একজন মাতব্বর ধরনের লোক হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করছে, ও খুকি, তোমার নাম কী? নাম জানো না?

মেয়েটি কিছুই বলছে না, শুধু কাঁদছে ফুলে ফুলে। এত মানুষ দেখে তার মাথার ঠিক নেই।

তোমার বাবার নাম জানো না?

তুমি কোথায় থাকো?

কার সঙ্গে এসেছ?

মেয়েটি একটা কথাও বলতে পারছে না। কয়েকজন সখেদে মন্তব্য করল, এ মেয়েকে তো এখানে ফেলেও যাওয়া যায় না। কোন চোর-জোচ্চোরের খপ্পরে পড়বে! কলকাতা শহর যা জায়গা–

বাদলের মা বললেন, আহা রে, ওই মেয়েটার মা-বাবার মন এখন কী রকম আকুলিবিকুলি করছে। ওইটুকু মেয়ে–

সেই সময় ভিড়ের ফ্লাক দিয়ে বাদল একঝলক দেখতে পেল মেয়েটিকে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলল, মা, ওকে আমি চিনি!

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিনিস? কী করে চিনলি? কে?

বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলে বাদলের দম বন্ধ হয়ে আসে, কথা বলতে পারে না। কোনওক্রমে বলল, বড়বাবুর সঙ্গে সেই যে গিয়েছিলাম,...ভবানীপুরে...সেই বাড়িতে।

মা বললেন, যাঃ, সেই ভবানীপুর থেকে এত দূর আসবে কী করে? যাঃ!

ভবানীপুর নয়, ওরা হাতিবাগানে থাকে।

কী নাম ওর?

ওর নাম রেণু।

মা তার পার্শ্ববর্তী একজন স্থূলকায় মহিলাকে বললেন, আমাকে একটু মেয়েটির কাছে যেতে দেবেন? আমি ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

ভিড় সরিয়ে মাকে কাছে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। মা জিজ্ঞেস করলেন, খুকি, তোমার নাম কি রেণু? তুমি কি হাতিবাগানে থাকো?

মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর ছুটে এসে মায়ের হাত চেপে ধরল শক্ত করে।

৬. রেণুদের বাড়ি গ্রে স্ট্রিটে

রেণুদের বাড়ি গ্রে স্ট্রিটে, স্টার থিয়েটারের কাছাকাছি। এরই কাছাকাছি আর একটি বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন কিছু দিন। লোকে বলে, সেই বাড়ি থেকেই শ্রীঅরবিন্দ গোপনে শেষ বারের মতন ব্রিটিশ রাজত্ব ছেড়ে চলে যান।

রাস্তা থেকে রেণুদের বাড়ির ভেতরটা কিছুই দেখা যায় না। এই ধরনের বসতবাড়ি পরবর্তীকালে কলকাতা শহর থেকে লোপ পেয়ে যায়। মস্ত বড় কাঠের গেট দিয়ে সামনেটা সম্পূর্ণ ঢাকা, পাল্লার মাঝখানটা কেটে একটা হাফ দরজা-সেখান দিয়ে ঢোকা যায়। ঢুকলেই একটা ছাতঢাকা চওড়া গলি, গলির দু পাশে শ্বেতপাথরের রক তারপর একটা গোল উঠোন, উঠোনের এক দিকে ঠাকুরদালান, অন্য তিন দিকে এলোমলো ঘর-একতলায় অবশ্য কেউ থাকে না। দোতলায় তিনতলায় কত যে ঘর, কত যে মানুষজন তার ইয়ত্তা নেই। গোটা বাড়িটা একটা উপনিবেশের মতন, কে কখন আসছে। যাচ্ছে, তার কোনও হিসেব রাখা অসম্ভব।

ঠাকুরদালানের স্তম্ভের দু পাশে দুটি কালো পাথরের হাতি। ছেলেমেয়েরা ওদের পিঠে চড়ে খেলা করে বলে পিঠগুলো মসৃণ হয়ে গেছে। দালানের ভেতরে শূন্য বেদি, কোনও দেবতার মূর্তি নেই।

এ-বাড়ির ভেতরে পা দিলেই বোঝা যায়, এককালে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যে বাড়িটা গমগম করত, কিন্তু কোনও এক মধ্যরাত্রে কুললক্ষ্মী চুপি চুপি এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আর ফিরবেন না। দেওয়ালের নোনাধরা দাগের মতন দারিদ্র্যের শাখাপ্রশাখাবহুল হাত চতুর্দিকে ছাপ লাগিয়ে দিচ্ছে। এ বাড়ি রং করা হয়নি অনেকদিন। দোতলা-তিনতলার কার্নিশ থেকে বেরোনো বট ও অশ্বত্থ গাছের চারা মহীরূহ হবার স্বপ্ন। দেখছে। তিন তলার একটি ব্যালকনি দেখলে মনে হবে যে-কোনও মুহূর্তে সবসুন্ধু ভেঙে পড়তে পারে-সেখানে কারওর যাওয়া নিষেধ, তবু ছোট ছেলেমেয়েরা খেলার ঝোঁকে সেখানে কখনও কখনও

চলে যায়। শিশুদের তো মৃত্যুভয় থাকে না! মেরামত করার বদলে সেই ব্যালকনিটা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়াই নিরাপদ, কিন্তু কারওর সেটা খেয়াল হয় না।

এই ধরনের একদাধনী বাড়িতে দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ঔদাসীন্যও এসে জেঁকে বসে। পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই 'যে রকম চলছে, যতদিন চলছে চলুক,-এই রকম। মনোভাব নিয়ে আছেন, আর দু' - এক জন আবার বিনা উদ্যমে, ফাঁকতালে হঠাৎ বড়লোক। হয়ে যাবার চিন্তায় মশগুল। তখন পর্যন্ত হঠাৎ বড়লোক হবার একমাত্র মরীচিকা ছিল রেস খেলা। কয়েক বছর বাদেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেলে অবশ্য হঠাৎ বড়লোক হবার আরও অনেক সুযোগ এসে যায়। তবে, অনভিজাত মধ্যবিত্ত এবং বানিয়া সম্প্রদায়ই সে সুযোগ গ্রহণ করেছে বেশি।

গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে রেণুকে পৌঁছে দিতে বড়বাবুই এসেছিলেন এ বাড়িতে। বাদলও সঙ্গে এসেছিল। ওরা ভেবেছিল, এবাড়িতে পা দেওয়ামাত্রই একটা হইচই পড়ে যাবে। কিন্তু ঢুকেই যার সঙ্গে দেখা হল, রেণুর সেই কাকা কিছুই খবর জানেন না। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে বড়বাবু রেণুকে কোলে করে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন, রেণু তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। চোখের জলে তার জার্মান সিল্কের ফ্রকের বুকের কাছটা ভিজে গেছে। রেণুর বয়স তখন পাঁচের কাছাকাছি-মাথাভরতি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

রেণুর কাকা বিস্মিত ভাবে বললেন, কী ব্যাপার? আবার বুঝি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলি। এই মেয়েটা যখন তখন বাইরে চলে যায়–

বড়বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, যাক, তা হলে আপনাদের বাড়ির মেয়ে? ওকে গঙ্গার। ঘাটে পাওয়া গেছে। হারিয়ে গিয়েছিল।

রেণুর কাকা ভুরু তুলে বললেন, গঙ্গার ঘাটে? হোয়াট, দ্যাট ইজ নেক্সট টু ইমপসিবল! এই মেয়েটা, তুই কার সঙ্গে গিয়েছিলি, অ্যাঁ?

রেণুর কাকা চালিয়াত ধরনের মানুষ। চুলে টেরি কাটার খুব বাহার, কানের ডগা পর্যন্ত লম্বা জুলপি, বুকের বাঁ পাশের দিকে বোম লাগানে বড়ুয়া কায়দার পাঞ্জাবি পরা। বড়বাবুকে তিনি একটিও ধনবাদ-বাক্য জানাননি বা বসতে বলেননি। কথাবার্তা হচ্ছিল উঠোনে দাঁড়িয়েই।

বড়বাবু খানিকটা শাসনের সুরে ওকে বললেন, আপনি মেয়েটির বাবা কিংবা মায়ের কাছে খবর পাঠান। আমি এবাড়িতে একেবারে অপরিচিত নই, অনেককাল আগে একবার এসেছি-একটি গানবাজনার আসর হয়েছিল ওই দরদালানে। সুরেশ্বর আমাকে নিয়ে এসেছিল।

কোন সুরেশ্বর?

সুরেশ্বর রায়। ভবানীপুরে থাকে। সে আমার সহোদর ভাইয়ের মতন।

ও, মেজো জামাইবাবু!

একটু বাদেই জানা গেল রেণুর মা ভেতরে অজ্ঞান হয়ে আছেন। বাড়ির এক অংশে কান্নাকাটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। আর একটা অংশে কোনও খবরই এসে পৌঁছোয়নি। রেণুর মা, ওই বাড়ির আরও তিন জন মহিলা ও দু'জন দাসী ও একটি দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই রেণু কী করে যেন হারিয়ে যায়। সবার ধারণা, সে চুরি হয়ে গেছে। তখন ছেলেধরা মেয়েধরার গল্প আকছার শোনা যায়-ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভিখিরি বানানো হয়, আর বাঙালি মেয়েদের নাকি বিক্রি করা হয় আরব দেশে। কয়েক দিন আগে এ বাড়ির সামনে নিশির ডাক শোন্মু গিয়েছিল, সেই জন্য আরও ভয়।

তিনমহলা বাড়ির একেবারে ভেতর মহলে নিয়ে বসানো হল ওদের। রেণুর মা হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠলেন। কতবার যে বাদলের কাছে গল্পটা শুনতে চাইলেন, তার শেষ নেই। তিনি কক্ষনও বাইরের পুরুষমানুষদের সামনে এসে কথা বলেন না, কিন্তু তখন

বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে একটুও লজ্জা নেই। রেণুর বাবা বাড়িতে ছিলেন না তখন, রেণুর জ্যাঠামশাই এসে বড়বাবুর সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। তখন দেশের শিক্ষিত মানুষ মাত্রই কংগ্রেস ও লিগ মিনিস্ট্রির ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত।

সেই থেকে বাদল এবাড়িতে প্রায়ই আসে। বাদলের তখনও কোনও ভাই ছিল না। তার নিজের দিদি ছাড়াও জ্যাঠামশাইয়ের সবকটিই মেয়ে। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে বাদলও পুতুলের বিয়ে ও রান্নাবাড়ি খেলা শিখছিল। মা বলতেন, আমার যা-ও একটা ছেলে হল, তারও মেয়েলি স্বভাব। এরপর ওকে শাড়ি পরিয়ে রাখতে হবে দেখছি!

দিদিদের সঙ্গে মিশে মিশে বাদল ব্রতকথার ছড়া মুখস্থ করে, ফুলের মালা গাঁথে, এমনকী কাটা দিয়ে উল বোনারও চেষ্টা করে। বাড়ি থেকে তার বেরোবার হুকুম নেই, সে আর খেলার সঙ্গী পাবে কোথায়? রেণুদের বাড়িতে একগাদা ছেলেমেয়ে, সারা বিকেল তারা ঠাকুরদালানের সামনের উঠোনে হুটোপুটি করে কিংবা সারা বাড়ি ঝাঁপিয়ে চোর চোর খেলে। দুই বাড়ির মহিলাদের মধ্যে আরও দু-একবার যাতায়াত হবার পর ঠিক হল, বাদল বিকেলবেলা এ বাড়িতে খেলতে আসবে। বাদলদের বাড়ির চাকর তাকে রেখে যায়, এবাড়ির দারোয়ান তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে।

এ বাড়িতে রেণুই বয়সে সবচেয়ে ছোট। রেণুর খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো এগারো ভাইবোন তাকে যতটা না ভালোবাসে, তার থেকেও বেশি জ্বালাতন করে। রেণুও বড্ড ছিচকাঁদুনে, কথায় কথায় ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে ফেলে। তখন সবাই মিলে সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু দিয়ে অথবা চুল টেনে তাকে আরও রাগিয়ে দেয়। অবিলম্বেই বাদল এই খেলাটায় বেশ মজা পেয়ে গেল, এবং অন্য সবার সঙ্গে যোগ দিয়ে রেণুকে কাদাতে লাগল।

এই এগারো জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কখনও কখনও ভবানীপুরের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও এসে যোগ দেয়, তখন চেঁচামেচি আর দুপদাপ শব্দে সারা বাড়িতে আর কান পাতা যায় না। জীমূতবাহন এসেই সব ছেলেমেয়েদের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। তার মধ্যে নেতা হবার একটা সহজাত গুণ আছে। লুকোচুরি খেলার জন্য এত বড় বাড়িতে প্রচুর লুকোবার

জায়গা-তাও ছেলেমেয়েদের ঠেলাঠেলিতে কখনও শোবার ঘরের আলনা উলটে পড়ে, জলের কলসি ভাঙে, কাঠের সিঁড়ির ওপর পাতা জরাজীর্ণ কার্পেট ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যায়।

বাড়ির ছাদখানা ফুটবল গ্রাউন্ডের মতন প্রকাণ্ড। রেণুর চার ভাইবোনের মধ্যে বড়দাদা থাকে দিল্লিতে। সদ্য কলেজে ভরতি হওয়া দাদা সুপ্রকাশ বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে কৃপার দৃষ্টিতে। বিশেষত তার কলেজি বন্ধুদের সঙ্গে সে যখন আড্ডা দেয়, তখন ছেলেমেয়েদের গোলমাল করা একেবারে বারণ। কলেজি বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দাড়ি রাখে এবং মোহিতলাল মজুমদারের চেয়ে নজরুল ইসলাম যে অনেক বড় কবি, এ সম্পর্কে তারস্বরে আলোচনা জুড়ে দেয়। দু'-এক জন আবার তৎকালীন ফ্যাশান অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গজদন্ত মিনারবাসী আখ্যা দিয়ে খুব একচোট নিন্দে করে।

সুপ্রকাশের আর একটি শখ হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানো। এই ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারটাকে সে আর্টের পর্যায়ে এনে ফেলেছে। বিশেষ ভাবে অর্ডার দেওয়া শুধু কড়ি টানা দেড়-তে কালো চাদিয়াল ঘুড়িই সে ওড়ায় পাড়ায় অন্য ঘুড়িরসিকরা বলে, ওটা হচ্ছে কালো চাদিয়ালের বাড়ি। তখন বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকের ঘুড়ি ওড়াবার বাতিক ছিল, বাগবাজারে বোসদের বাড়ির মাঠে কিংবা ধর্মতলার ময়দানে সাড়ম্বরে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হত। সুপ্রকাশ যখন ঘুড়ি ওড়াত, তখন চুপ করে থাকত বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা। দুর্ধর্ষ বাজপাখির মতন সুপ্রকাশের কালো চাদিয়াল ঘুড়ি টহল মারত ওই এলাকার আকাশে। কখনও কখনও বাজপাখির মতন ছোঁ মেরে নেমে এসে সেই ঘুড়ি পড়ত অন্য ঘুড়ির ঘাড়ে-সুপ্রকাশের দু'হাত চলত বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের মতন, বাচ্চারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠত ভো-মারা!

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে আসত দলের, কিন্তু সর্বক্ষণ উত্তেজনায় শরীর টং হয়ে থাকত। সুপ্রকাশের ঘুড়ি অন্যরা কেটে দিয়েছে, এমন ঘটনা কচিৎ ঘটেছে। যদি বা কখনও কাটত, সুপ্রকাশের সুতোর হাত্তা ধরতে সচরাচর সাহস করত না কেউ, কোনও হটকারী দৈবাৎ ধরে ফেললেও সুপ্রকাশ বাজখাই গলায় পেঁচিয়ে

উঠত, এই এই! মাথা ভেঙে দেব!বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা ইট-পাটকেল হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে থাকত ছুঁড়ে মারার জন্য।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলে, আকাশ থেকে পক্ষীরাও ফিরে গেছে বাসায়-সুপ্রকাশ তখন অনবরত সুতো ছেড়ে ছেড়ে ঘুড়ি আরও বাড়িয়ে যেত। কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি একটু অন্ধকার হলেই আকাশের সঙ্গে মিশে যায়-অতি কষ্টে দেখা যায় শুধু ভেতরের সাদা চাঁদটুকু-অনবরত উঁচুতে উঠে উঠে সুপ্রকাশের চাঁদমাকা ঘুড়ি যেন আকাশের চাঁদ ধরতে যাচ্ছে। ঘুড়িটা সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে হাতের কাছ থেকে সুতো ছিঁড়ে দিয়ে সুপ্রকাশ সেটাকে পাঠিয়ে দিত নিরুদ্দেশে। একবার আকাশে উড়িয়ে সেই ঘুড়িকে আর মাটিতে নামিয়ে আনত না সুপ্রকাশ। তারপর সে লাটাই গুটিয়ে দলবল নিয়ে ছাদ থেকে নামতে নামতে গুনগুন করে গান গাইত পরম তৃপ্তির সঙ্গে। তার গলায় একেবারেই সুর ছিল না অবশ্য।

মাঝে মাঝে দু-এক দিন বাদল সকালেই এ-বাড়িতে চলে এসে সারা দিন থেকে যেত। তার স্বভাবের মধ্যে মেয়েলিপনা তখনও একটু থেকে গেছে। কিন্তু এ-বাড়িতে এসে সে মেয়েদের বদলে ছেলেদের সঙ্গেই বেশি মেশে। এ-বাড়িতে ছ'টি মেয়ে ও পাঁচটি ছেলে-তারা বিকেলবেলা সবাই একসঙ্গে খেলাধুলো করলেও সকালে দুপুরে তারা আলাদা আলাদা। স্কুল ছুটি থাকলে দুপুরে ছেলেরা ক্যারাম খেলে কিংবা হুটোপুটি করে, মেয়েরা পুতুলের ঘর সাজায়। বাদলের বেশি ভাব রেণুর খুড়তুতো। ভাই বিষ্ণুর সঙ্গে। বিষ্ণু আবার গল্পের বইয়ের পোকা, কত বই সে পড়েছে-বাদল তার নামও জানে না।

এই প্রথম বাদল তার নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য একটি পরিবারের মানুষজনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেল। নিজের বাড়িতে সে কনিষ্ঠ সন্তান, সবাইকেই জন্ম থেকে দেখছে-সুতরাং তাদের অস্তিত্ব আকাশ জল ও হাওয়ার মতন অবধারিত। কিন্তু এ-বাড়ির সকলেই তার চোখে নতুন মানুষ, এদের কথাবার্তা রীতিনীতিও আলাদা। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাদল টের পেয়ে গেল, এখানে সবাই এক বাড়িতে থাকলেও সকলের মধ্যেই কেমন যেন একটা আলাদা আলাদা ভাব। এমনকী ছোট ছেলেমেয়েরাও কখনও কখনও

এটা আমাদের জিনিস, এটা তোমাদের জিনিস-এই রকম বলে। বাড়ির বউরা চেঁচিয়ে ঝগড়া করে পাড়া মাত করে দেয়। রেণুর বাবারা পাঁচ ভাই তিন বোন, তার মধ্যে বড়ভাই মারা গেছেন, তার বড় দুই ছেলে বিবাহিত, এ-বাড়িতেই আছেন। এক বোন বিধবা হয়ে দুটি সন্তান নিয়ে ফিরে এসেছেন এ-বাড়িতে। তা ছাড়া মাসিমা পিসিমা শ্রেণিরও আছে বেশ কয়েক জন-সবার আলাদা আলাদা ঘর। তিন জন ঠাকুর সারা দিন ধরে রান্না করে যাচ্ছে, বাড়ির যার যখন খুশি খেয়ে নেয়।

রেণুর মা খুব ভালোবাসেন বাদলকে। ইতিমধ্যে বাদলের মা'র সঙ্গেও তার খুব ভাব হয়ে গেছে। রত্নপ্রভা বাদলকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে, তোর মাকে নিয়ে এলি না কেন? কালকে ঠিক মাকে নিয়ে আসবি, কেমন? রত্নপ্রভা মানুষটি ছোটখাটো, এবং অসম্ভব ভুলো মন। হা রে, চাবিটা কোথায় ফেললুম দেখ তো! কিংবা, এই যা, দুলটা বোধহয় ফেলে এসেছি কলঘরে-এই করতে করতেই তার সারা দিন কেটে যায়। দুপুরবেলা বারান্দায় শীতলপাটি পেতে বাড়ির অন্যান্য কয়েকটি নারীকে ডেকে খুব মন দিয়ে টুয়েন্টি নাইন খেলতে বসেন-অন্য খেলুড়েরা যে তাঁকে বার বার ঠকাচ্ছে, তিনি বুঝতেও পারেন না। রেণুর বাবা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, সারা দিন তাঁকে দেখা যায় না বাড়িতে।

বস্তুত এ বাড়ির বয়স্ক পুরুষদের প্রায় সকলকেই খুব কম সময় বাড়িতে দেখা যায়। বাড়িটিতে মহিলা ও শিশুদেরই রাজত্ব। রেণুর পরের ভাই অংশুর সঙ্গে বাদলের তেমন ভাব হল না কোনও দিনই। অংশু তার থেকে মাত্র দু' বছরের বড় হলেও হাবভাব পাকা পাকা। তা ছাড়া অংশু সারা বছরই আমাশয় রোগে ভোগে বলে তার মেজাজটাও খিটখিটে।

কোনও দিন সকালবেলা এসে পড়লে বাদল আগে রত্নপ্রভার কাছেই আসে। রত্নপ্রভা যত্ন করে তাকে খাবার খাইয়ে দেন-তারপর বাদল একছুট্টে চলে যায় বিষ্ণুদের ঘরে। রেণুরা থাকে দোতলায় উত্তরের দিকের ঘরে, আর বিষ্ণুরা থাকে তিনতলায় একেবারে দক্ষিণে। সুতরাং বাদলকে সারা বাড়িটাই পেরিয়ে যেতে হয়- এ-বাড়ির সবকিছুই তার জানা।

বিষ্ণু তার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে এবং এ-বাড়িতে ভাইদের মধ্যে বিষ্ণুর বাবার অবস্থাই খানিকটা স্বচ্ছল। এক ছেলে বলে বিষ্ণুর আদরের শেষ নেই-কত তার খেলনা, কত রকম তার পোশাক। বিষ্ণুর জন্য নিজস্ব একটি চাকর রাখা আছে, বিষ্ণু একটু হোঁচট খেলেই তার মা হা-হা করে ছুটে আসেন। এত আদরেও কিন্তু বিষ্ণুর মাথা। খারাপ হয়নি-সে ন্যাকা কিংবা আবদারে ছেলে হয়নি। প্রায় শিশুকাল থেকেই সে স্বপ্নদেখা মানুষের দলের অন্তর্গত হয়েছে। সে নানান বই পড়ে এবং মনে মনে সংকল্প করে-একদিন সে সমুদ্রের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে ম্যাগেলানের মতন ভূপ্রদক্ষিণ করবে। কিংবা, যে এভারেস্টের চূড়ায় এ-পর্যন্ত কোনও মানুষ উঠতে পারেনি, একদিন বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেখানে উঠবে। সে বাদলকে জিজ্ঞেস করে, তুই আমার সঙ্গে যাবি?

বাদলের চোখে এ-বাড়ির সবচেয়ে বিস্ময়কর মানুষ ছিলেন হৈমন্তী। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। হৈমন্তীর মতন লম্বা চেহারার মহিলা বাদল আগে কখনও দেখেনি, পরেও দেখেনি। শুধু লম্বা নয়, হৈমন্তীর স্বাস্থ্যও ছিল সেই রকম ভালো, সব মিলিয়ে বিশাল নারী। ওই শারীরিক বিরাটত্বের জন্য মনে মনে হৈমন্তীর নিশ্চয়ই খুব লজ্জা ছিল, কেন না তার মুখখানা ছিল লাজুক শিশুর মতন। অন্য যে কোনও নারীর চেয়ে হৈমন্তী ছিলেন লম্বায় অন্তত আধ হাত উঁচু। ছেলেবেলায় সবকিছুই বড় মনে হয়, বাদলের মনে হত হৈমন্তীর মতো আকারের কোনও মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই, থাকতে পারে না। কিছুদিন আগেই সে স্কুলে জ্যাক অ্যান্ড দ্য বিন স্টকের গল্পটা পড়েছিল। একটা সিম গাছ বেয়ে বেয়ে মেঘের মধ্যে উঠে গেলে সেখানে থাকে এক কৃপণ দৈত্য আর তার বউ। হৈমন্তীকে দেখলেই বাদলের মনে পড়ত সেই দৈত্যের বউয়ের কথা। সেই দৈত্যের বউয়েরই মতন দয়াবতী ছিলেন হৈমন্তী।

তিনতলায় বিষ্ণুদের ঘরের কাছেই হৈমন্তীর ঘর। ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো। কেন কে জানে, হৈমন্তীর ঘরে বাড়ির অন্য কেউ বিশেষ আসে না। সমস্ত দিন, বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত্রি হৈমন্তীর অসীম নিঃসঙ্গতা ভরা। কোনও কোনও সন্ধ্যাবেলা তার ঘর থেকে ভেসে আসত অর্গানের আওয়াজ, রিডগুলোর ওপর যেন আক্রোশভরে জোরে জোরে চাপ

দিচ্ছেন হৈমন্তী। একথা জানতে বাদলের বহু দিন লেগে গিয়েছিল যে হৈমন্তীর স্বামী শঙ্করনাথ এক থিয়েটারের অভিনেত্রীকে নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকেন রামবাগানে। মাসে একবার কি দু'বার তিনি এ-বাড়িতে আসেন। তখন তার অসম্ভব তিরিক্ষে মেজাজ, টাকাপয়সার হিসেব ছাড়া আর কোনও বিষয়ে কারওর সঙ্গে কথা বলেন না।

একদিন সকালবেলা বাদল যাচ্ছিল বিষ্ণুদের ঘরে, হৈমন্তী তখন উলটো দিকের কলঘর থেকে স্নান সেরে নিজের ঘরে আসছিলেন। গায়ে ভিজে শাড়িটা জড়ানো, সমস্ত শরীরটা স্পষ্ট। বাদলের বুকের ভেতর ছমছম করে উঠল। বাদলের তখন সবে ন' বছর পূর্ণ হয়েছে, কোনও নারীকে দেখে বুকের ভেতর ছমছমানি জাগার সেই শুরু। লজ্জায় মুখ নিচু করার বদলে সে বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল হৈমন্তীর দিকে। মায়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যে বিস্ময় নিয়ে সে মড়া পোড়ানো দেখে, সেই জাতীয় বিস্ময় নিয়েই সে দেখতে লাগল এই অতি-জীবিত শরীর। মর্মর মূর্তির মতন সুগঠিত হৈমন্তীর দেহে পাতলা ভিজে শাড়িটি জড়ানো–স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার তাজা বাতাবি লেবুর মতন দুই স্তন, তাদের চূড়ায় গোলাপি আভা। থুতনি থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে। পিঠখানা সোনার ঢালের মতন। অত বড় শরীরের তুলনায় আশ্চর্য রকমের সরু কোমর। অনাবৃত পেটে ছোট্ট নাভি। নিতম্বের ওপর শাড়িটা কুঁকড়ে আছে, জঙ্ঘার খাঁজ স্পষ্ট। এইসব রমণীর শরীরে একটা অসম্ভব তেজী আহ্বান থাকে। ইহকাল পরকাল, লুপ্ত করা ডাক শোনা যায়। মসৃণ উরুর কাছে হৈমন্তীর একটা হাত রাখা, অন্য হাতে ভিজে সেমিজ ও ব্লাউজ। সেই দেবদুর্লভ রূপ এক মিনিটের মধ্যে বাদলের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। হৈমন্তী বাদলকে দেখতে পাননি। আশেপাশে কোনও পুরুষের উপস্থিতি মেয়েরা ঘুমন্ত অবস্থাতেও বুঝতে পারে। এমনকী পিঠের দিকে তাদের দৃশ্য-অনুভূতি থাকে। বাদল নেহাত ছেলেমানুষ, তাই খেয়াল করেননি হৈমন্তী।

বাদল এর আগে এই একই রকম অবস্থায় কত বার নিজের মাকে দেখেছে, তার দিদিদেরও দেখেছে। কিংবা আসলে দেখেনি। এই প্রথম সে দেখল, কাকে বলে নারী।

কিন্তু ওইটুকু ছেলে তো, প্রথম দেখার ঝাঁপটায় অবসন্ন বোধ করল সে, বেশ কিছুক্ষণ তারপর কথা বলতে পারেনি। তার বোঝার কোনও ক্ষমতাই ছিল না যে তার মধ্যে কী ব্যাপার ঘটে গেল। এর পরেও আরও বেশ কয়েক বছর সে এ ব্যাপারে আবার ঘুমন্ত ছিল। কিন্তু এই দৃশ্যটা তার মনে চিরস্থায়ী হয়ে এঁকে যায়।

বিষ্ণুর সঙ্গে হৈমন্তীর কাছে বাদল তারপর কয়েক বার গেছে। ওদের দেখলে হৈমন্তী খুব খুশি হয়ে উঠতেন, অনর্গল গল্প জুড়ে দিয়ে আর ছাড়তেই চাইতেন না। চাকরকে দিয়ে তেলেভাজা বেগুনি, ফুলুরি আর আলুকাবলি আনতে দিতেন। এইসব খাবারই তার পছন্দ ছিল, বেশি ভালোবাসতেন টক খেতে। আলুকাবলি খেতে খেতে টক আর ঝালের রমণীর সুস্বাদে জিভ দিয়ে টকাস টকাস শব্দ করেন, অবিকল ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে–এমনকী খাটে বসে পা দোলানোও সেই রকম। এত বড় চেহারার একটি শিশু, তার জীবনে এই রকম কষ্ট প্রাপ্য ছিল না।

হৈমন্তী যখন বাদলের মাথার চুলে হাত দিয়ে আদর করতেন, বাদল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে যেত। এত লজ্জা তার কোথা থেকে আসে, সে বুঝতে পারে না। হৈমন্তী ঠিক দিদির মতন স্নেহে বাদলের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, প্রত্যেক দিনই একটা-না-একটা কিছু উপহার দেন। হৈমন্তী বাদলকে একটা চমৎকার মাউথ অর্গান দিয়েছিলেন।

হৈমন্তী সম্পর্কে আর একটি দৃশ্যও বাদলের খুব মনে আছে। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে একেবারে চলে যাবার আগে হৈমন্তী এ-বাড়ির নৈতিকতায় বেশ একটা ঘা দিয়েছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে ওঠার পর তিনি সুপ্রকাশের কলেজে-পড়া বন্ধুদের নিজের ঘরে ডেকে নিলেন। একতলার বৈঠকখানা থেকে কী উপায়ে তারা তিনতলায় উঠে এল, সেটা একটা রহস্য বটে, কিন্তু এই ছেলেরা সকাল-বিকেল নিয়মিত আসতে লাগল এখানে। সুপ্রকাশও হঠাৎ খুব ভক্ত হয়ে গেল তার কাকিমার। ওই ঘর থেকে তখন প্রায়ই শোনা যায় হাসির আওয়াজ ও হইহই করে গল্পগুজব, কখনও কখনও কোরাস গান ভেসে আসে। শোনা গেল, হৈমন্তীর ঘরে থিয়েটারের রিহার্সাল চলছে।

বলাই বাহুল্য, বাড়ির সকলে এই ব্যাপার মোটেই ভালো চোখে দেখল না। কিন্তু যেহেতু এ-পরিবারের একজন কেউ সর্বময় কর্তা নেই, ভাইরা সবাই স্বাবলম্বী ও সম্পত্তির অংশ পেয়ে গেছে তাই কেউ কারওর শাসন মানে না। আড়ালে নিন্দা করা ছাড়া আর কোনও শাসনের উপায় নেই। পরনিন্দার ভ্রুক্ষেপ নেই হৈমন্তীর।

একদিন শেষ বিকেলে বাদল ওই বাড়ির সব বাচ্চাদের সঙ্গে নীচের উঠোনে খেলা করছিল, হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখল, তিনতলার সেই ভাঙা ব্যালকনিতে এসে হৈমন্তী দাঁড়িয়েছেন, হাসতে হাসতে দুলে পড়ছেন। যে-ব্যালকনিতে শিশুদের যাওয়া নিষেধ, সেখানে হৈমন্তীর মতন বিশাল চেহারার একজন–সবাই ভয়ে আঁতকে উঠল। কয়েক জন যুবক দূর থেকে আতঙ্কিত হয়ে বলছে, এ কী করছেন, এ কী করছেন, চলে আসুন! হৈমন্তী তত বেশি হাসছেন।

কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি অবশ্য। কয়েকটি চাপড়া ঝুপ ঝুপ করে ভেঙে পড়ল নীচে। হাস্যমুখে হৈমন্তী পা ঠুকে ঠুকে আরও ভাঙতে লাগলেন।

বেশ কিছু বছর পর হৈমন্তীর সঙ্গে আবার দেখা হলে বাদল এই দৃশ্যটার কথা উল্লেখ করেছিল। হৈমন্তী তখনও হেসেছিলেন।

৭. চিররঞ্জন হেরে যাওয়া মানুষ

চিররঞ্জন এই পৃথিবীর একজন হেরে যাওয়া মানুষ। প্রথম যৌবনে যখন শরীর সোজা থাকে, স্নায়ু সবসময় সজাগ, আনন্দের উপকরণ আপনা থেকে চলে আসে কাছে, একা একা হেঁটে যাবার সময় গোপনে মনে হয় এই পৃথিবীটা আমার সেই সময়েই তিনি পর পর দুটি আঘাত পেয়েছিলেন, তাতে তার মন ভেঙে যায়। আর রুখে দাঁড়াতে পারেননি, বরং নিরাসক্ত হয়ে যান। পৃথিবীতে দাপটের সঙ্গে বেঁচে থাকার বদলে আরও কিছু দিন

কাটিয়ে যাবার মনোভাব দেখা দেয়। কোনও জায়গায় চিররঞ্জন উপস্থিত থাকলেও তাঁর উপস্থিতি সহজে বোঝা যায় না।

যদিও প্রথম জীবনটা চিররঞ্জন ভালোই শুরু করেছিলেন। গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে পেরেছিলেন নিজের চেষ্টায়। তার বাবা সারদারঞ্জনের কাছে ম্যাট্রিক পরীক্ষাই ছিল শিক্ষার চূড়ান্ত মান। সদরের হাইস্কুলে প্রতি বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় দশ বারোটি ছেলে, তার মধ্যে পাশ করে দুটি বা তিনটি, তারাই বংশের মুখ উজ্জ্বল করা সন্তান। অত খেটেখুটে পরীক্ষা পাশ করার পর ছেলেরা চাকরিবাকরি জোগাড় করবে গভর্নমেন্টের চাকরি হলে তো কথাই নেই। সারদারঞ্জনের ইচ্ছে তারপর ছেলেদের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনবেন, নাতি-নাতনিতে সংসার ভরে যাবে। সুখ তো এরই নাম। বড়ছেলে প্রিয়রঞ্জন একবারেই ম্যাট্রিক পাশ করে অল্প দিনের মধ্যেই চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলেন, বিয়েও দেওয়া হয়েছিল যথারীতি। কিন্তু চিররঞ্জনের শখ হল কলেজে পড়ায়।

খরচ চালাবার জন্য নিজেরই চেষ্টায় চিররঞ্জন কলকাতার একটি বাড়িতে থাকা-খাওয়ার টিউশানি জোগাড় করে নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই পরিবারটি খুব ভালো, সকলের ব্যবহার বেশ আন্তরিক। আমহার্স্ট স্ট্রিটের রায়বাড়িতে চিররঞ্জন দুটি ছেলের গৃহশিক্ষক, একতলায় একটি ঘর পেয়েছেন–সকালবেলার জলখাবার আসে ওপরতলা থেকে, তবে দুপুর আর রাত্তিরের খাবারটা খেয়ে নিতে হয় বারোয়ারি রান্নাঘরে গিয়ে। রান্নার ঠাকুররা বাড়ির মাস্টারকে একটু অবজ্ঞা করে, মাছের টুকরো প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু চিররঞ্জন তা নিয়ে কখনও অভিযোগ করেননি। ছাত্রদের বিধবা পিসিমা মলিনা তাকে খুব স্নেহ করেন, প্রায়ই খোঁজখবর নেন। বাড়িতে নারায়ণের পুজো হয় নিত্য তিরিশ দিন, যদি কোনও দিন পুরুতঠাকুর আসতে না পারেন, তখন চিররঞ্জনকেই নমো নমো করে ঘণ্টা নাড়তে হয়।

চিররঞ্জন আই-এ পাশ করার পর সারদারঞ্জন ছেলেকে আর একবার তাড়া দিলেন দেশে ফেরার জন্য। তিনি তখন ছেলের জন্য চারদিকে পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছেন–তার এই ছেলে

দুটো পাশ দিয়েছে, এখন তার বাজারদর অনেক বেশি। তা ছাড়া কলকাতা শহরে কত রকম ডাকিনী-যোগিনী ঘুরে বেড়ায় বয়েসকালের ছেলেকে কি সেখানে একা ফেলে রাখতে আছে! সিনেমা-থিয়েটারে যোগ দিয়েই বেশ্যাপল্লির মেয়েগুলো এক একজন দেবী হয়ে উঠছেন। ঘরের বউরাও ওই স্লেচ্ছ শহরে ফিটন চেপে বরের সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যায়!

কিন্তু চিররঞ্জন গ্র্যাজুয়েট না হয়ে ছাড়বেন না। তার আগে বিয়েও করবেন না। এদিকে মলিনার সঙ্গে তাঁর স্নেহ-মমতার সম্পর্ক আস্তে আস্তে প্লেটনিক প্রেমের দিকে মোড় নিচ্ছে।

বি.এ. পরীক্ষা দেবার পর চিররঞ্জন দেশে ফেরার জন্য তৈরি হলেন। তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। ততদিনে সারদারঞ্জন অনেক দেখাদেখি করে তিন জায়গায় ছেলের বিয়ের সম্পর্ক প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন, এখন দর কষাকষি চলছে। সেই সময় পরীক্ষা দিয়েই ছাত্ররা এগজামিনারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত রেজাল্ট জানার জন্য। তখন ছাত্রসংখ্যা এত বিপুল ছিল না–এগজামিনারও ছিল বাঁধাধরা। তাদের বাড়ির সামনে লম্বা লাইন পড়ত সকাল থেকে–এগজামিনারের কোনও দয়ালু-হৃদয় আত্মীয় এক এক জনের রোল। নাম্বার দেখে নিয়ে নাম্বার বলে দিতেন।

চিররঞ্জন পরীক্ষা মোটামুটি ভালোই দিয়েছিলেন, মনে কোনও আশঙ্কা ছিল না–তবু হঠাৎ খবর পেলেন তিনি অঙ্কে ফেল করেছেন! নিজেই গরজ করে তিনি অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্ক কম্বিনেশান নিয়েছিলেন। খবর শুনে চিররঞ্জনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল! পরের বাড়িতে আশ্রিত থেকে যারা লেখাপড়া করে, তাদের পক্ষে ফেল করা যে কতখানি গ্লানির ব্যাপার, তা অন্য কেউ বুঝবে না। এখন কী উপায়? এরপর আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের রায়বাড়িতেও সম্মানের সঙ্গে থাকা যাবে না!

চিররঞ্জনের এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন স্যার আশুতোষ নাকি গরিব ছাত্রদের অবস্থা শুনলে দু'-এক সাবজেক্টে ফেল হলেও পাশ করিয়ে দেন। বন্ধু ভবশঙ্করের সঙ্গে চিররঞ্জন একদিন গেলেন রসা রোডে স্যার আশুতোষের বাড়িতে। সকালবেলা লোকজনের ভিড়ে

দেখা করাই যায় না। একটু দুপুর দুপুরে দুই বন্ধু সট করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। বাংলার বাঘ তখন স্নানের আগে তেল মাখছেন। মস্ত বড় গোঁফসমেত বিরাট মুখখানা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আবার কী হল? কী চাই তোদের, আঁ?

লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে চিররঞ্জন কী বললেন তা শোনাই গেল না। নগ্নগাত্র স্যার আশুতোষ হুংকার দিলেন, পেন্নাম করলিনে?

দুই যুবা তখনই বসে পড়ে ঝুপঝাঁপ করে প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। চাকরকে দিয়ে তেল মাখাতে মাখাতে স্যার আশুতোষ সব শুনলেন, খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চিররঞ্জনের পরিবারের খবর, গ্রামের খবর। কিন্তু পাশ করিয়ে দিতে রাজি হলেন না। ধমকে বললেন, ফেল করেছ, আবার পড়ো ইউনিভার্সিটিতে; কি আমি দানছত্তর খুলেছি? খরচ চালাতে না পারো, কলেজের ফি মকুব করে দেবার ব্যবস্থা করব। তোমার থেকে আরও অনেক গরিব ছেলে ভালো রেজাল্ট করে।

চিররঞ্জন নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। দুঃখে-লজ্জায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের রায়বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। ভেসে বেড়াচ্ছেন এখানে-সেখানে। এই সময় হঠাৎ তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এক লগ্নছাড়া পাত্রীর সঙ্গে। এই পাত্রীপক্ষ ফেল করার খবর শুনে চিরঞ্জনকে একবার বাতিল করেছিল, পরে তারাই আবার সাধাসাধি করতে এল নিজেদের গরজে। নববধূ বেশ সুন্দরী, শ্বশুর বড়লোক-চিররঞ্জন কিছু দিন কাটালেন আমোদ আহ্লাদে। শ্বশুরবাড়িরই উদ্যোগে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে (হোম) পুলিশ বিভাগে একটা চাকরিও জুটে গেল তার। পাকা চাকরি, কম কাজ, উপরি আছে। সরকারি চাকরি সে-আমলে ছিল স্বর্ণপ্রসূ হাঁসের মতন। কাজ না করলেও চাকরি যাবার সম্ভাবনা নেই। করপোরেশন অফিসে চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে সরে পড়া কিংবা সরকারি অফিসে সাহেবের গতিবিধি অনুযায়ী টিফিন করা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ঘুষের সুযোগ প্রায় সব বিভাগেই। বিয়ের বাজারে সরকারি চাকুরে পাত্রকে প্রকাশ্যেই জিজ্ঞেস করা হত-মাইনে কত, আর উপরি কত? মাইনে খুব কম, উপরি তার তিন-চার গুণ। ব্রিটিশ শাসকরাই খুব সযত্নে এই ব্যবস্থাটি পাকা করে রেখেছিল। দেশের একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণিকে কিছু বেশি সুবিধা

দিলে বাকি লোকদের শোষণ করার অনেক সুবিধে হয়। দেশের মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে, লাভ হয় বিদেশিদের। তবে দেশ স্বাধীন হবার পরও যে এই ব্যবস্থা টিকে থাকবে-তা বোধহয় ব্রিটিশরাও কল্পনা করতে পারেনি।

এমন ভালো চাকরি থেকেও চিররঞ্জন হঠাৎ একদিন বরখাস্ত হয়ে গেলেন। হোম পুলিশ বিভাগে কাজ করে যে ব্যক্তি, তারই ভাই খুন করেছে সাহেব পুলিশ কমিশনারকে, এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! শুধু যে এই চাকরিটাই গেল, তা নয়, সমস্ত রকম সরকারি চাকরির দরজা চিরকালের মতন বন্ধ হয়ে গেল। এর পরেও নিস্তার নেই, চিররঞ্জন লক্ষ করলেন, তিনি যেখানেই যান সব সময় দু'জন লোক ছায়ার মতন তাঁর পেছনে পেছনে ঘোরে। নিদারুণ ত্রাসে চিররঞ্জনের সারাটা দিন কাটে। কোথাও চাকরি খুঁজতে যাওয়ারও উৎসাহ পান না। তার ছোটভাই ও রকম একটা কাণ্ড করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এ জন্য শোক করারও অবকাশ নেই, নিজের চিন্তাই তখন প্রবল।

চাকরি পাবার পর স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে সবেমাত্র সংসার পেতেছিলেন কলকাতায়, সে-সংসার ভেঙে দিতে হল। ততদিনে সারদারঞ্জন মারা গেছেন, দেশের বাড়িতে থাকাও নিরাপদ নয়। বড়ভাই প্রিয়রঞ্জন বরিশাল শহরে বাসা করেছেন, সেখানে থাকার জন্য আহ্বান জানালেন ওঁদের। কিন্তু দাদার সংসারে বোঝা বাড়ানোর বদলে অনেক ভেবেচিন্তে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই আশ্রয় নিলেন তাদের বিরাট বড় সংসার, এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

শুরু হয়ে গেল চিররঞ্জনের আশ্রিত জীবন। ছাত্র বয়সেও তিনি পরের বাড়িতে থেকেছেন, তারপর থেকে সারাটা জীবনই প্রায় তাঁকে পরের বাড়িতে কাটিয়ে যেতে হল। বাকি জীবনটা চিররঞ্জন আর বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি, সেই উদম্যই হারিয়ে ফেলেছিলেন। মাঝে মাঝে আরও কয়েকটা চাকরি করেছেন, একবার ব্যবসা করতেও গিয়েছিলেন, কোনওটাই ঠিকমতন দানা বাঁধল না। চিররঞ্জনের শ্বশুর একজন নামকরা পণ্ডিত লোক, আবার সাংসারিক ব্যাপারেও খুব অভিজ্ঞ, এই জামাইটিকে তিনি জীবনে দাঁড় করিয়ে দেবার অনেক রকম চেষ্টা করছেন, কিন্তু যার নিজের পায়েই জোর নেই, সে

দাঁড়াবে কী করে! শ্বশুরের সুপারিশে পাওয়া দিল্লিতে একটা ভালো চাকরিতেও চিররঞ্জনের মন বসল না।

শুভার্থীদের পরামর্শে কিছু দিন নিজের গ্রামে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সেজেও বসেছিলেন। গ্রামে তখনও ডাক্তারের অভাব। মেটিরিয়া মেডিকা একখানা কিনে আর কিছু ওষুধপত্তর নিয়েই হোমিওপ্যাথি শুরু করা যায়। কিন্তু যে-লোক সত্যিই ডাক্তারি বিদ্যে জানে না, তাকে ডাক্তার সাজতে হলে মিথ্যে কথা বলায় খুব ধুরন্ধর হতে হয়। চিররঞ্জনের সে গুণও ছিল না। তার ফলে, কেশো রুগি, চোর কিংবা মুখচোরা বারবণিতাদের যা অবস্থা হয়, চিররঞ্জনেরও তাই হল। কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে ডাক্তারখানার ঝাঁপ ফেলে দিলেন।

স্ত্রী কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে চিররঞ্জন মাঝে মাঝে চলে আসেন কলকাতায় কাজের খোঁজে। এই বিরাট শহরের ভিড়ে মিশে থাকতে তাঁর ভালো লাগে। চিররঞ্জনের। চেহারাটা খুব রোগা পাতলা, এখন অল্প বয়সেই তাঁকে খানিকটা বুড়োটে দেখায়। মাঝে মাঝে যান আমহার্স্ট স্ট্রিটের সেই রায়বাড়িতে। তাঁর ছাত্র দু'জনের মধ্যে একজন ব্যারিস্টারি পড়তে গেছে বিলেতে, একজন পৈতৃক ব্যবসা দেখছে-সে বেশ খাতির করে মাস্টারমশাইকে। প্রায়ই সে মাস্টারমশাইকে একটানা-একটা চাকরির প্রস্তাব দেয়, চিররঞ্জন প্রত্যেকটিই প্রত্যাখ্যান করেন হাসিমুখে। স্যার আশুতোষ মারা গেছেন। এবাড়িতে মলিনারও বয়স বেড়েছে বোঝা যায়, চুলে সাদা ছোপ ধরেছে একটু। নিয়মিত সন্ধ্যাবেলা এসে চিররঞ্জন মলিনার থেকে তিন-চার হাত দূরত্ব রেখে বসে গল্প করে যান ঘন্টার পর ঘণ্টা। কখনও কখনও দুজনের কেউই একটাও কথা বলেন না, দুই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এঁদের দু'জনের মধ্যে কোনও একটা জায়গায় খুব মিল আছে।

চিররঞ্জন তখন কলকাতায় একটা কোঅপারেটিভ মেসের ম্যানেজার। চাকুরে বাবুদের মেস, একমাত্র চিররঞ্জনকেই নির্দিষ্ট হিসেবে অফিসে যেতে হয় না বলে তাকে ম্যানেজার করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর চার্জ অর্ধেক। এই সময় টেলিগ্রাম পেলেন শ্বশুরবাড়িতে

তার স্ত্রী আর একটি সন্তান প্রসব করেছেন, এবার পুত্র। খবরটা পেয়ে চিররঞ্জন প্রথম দু'দিন বিষণ্ণ হয়ে রইলেন। অনুভব করলেন, সংসার তাকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াচ্ছে। যার স্ত্রীকে চিরকাল বাপেরবাড়ি ফেলে রাখতে হয়, তার পুত্র কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আনন্দিত হবার কথা নয়। টেলিগ্রাম পেয়েও চিররঞ্জন গেলেন না। কয়েক দিন পর চিঠিতে বিস্তারিত খবর এল। বর্ষাকাল, সেবার ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ অত্যন্ত বেশি, আঁতুড়ঘরের চাল উড়ে গিয়েছিল, কয়েকটি দিন খুব সংকটজনক : অবস্থায় কেটেছে জননী ও নবজাতকের। ছেলের নাম রাখা হয়েছে বাদল।

এই চিঠি পেয়ে চিররঞ্জন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যেন তার মনে হল এই ছেলেই তার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। নিজের জীবনে তিনি যা পারেননি, এই ছেলে সার্থক করবে সেই স্বপ্ন। পুন্নাম নরকের ভয় ছিল না চিররঞ্জনের, কিন্তু পুত্রই পিতাকে ভরসা দেয়। খেয়ালের মাথায় এক রাশ টাকা ধার করে তিনি স্ত্রীর জন্য শাড়ি এবং ছেলের জন্য বিলিতি খেলনা পাঠালেন পার্সেল করে।

বড়ভাই প্রিয়রঞ্জন বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন বরিশালে। ফরিদপুরে নিজেদের বাড়িতে বিশ্বরঞ্জনের খোঁজে তখনও ঘন ঘন পুলিশ আসে, তাই দেশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায়। চুকিয়েই দিয়েছিলেন একরকম। ছোটভাই নিখিলরঞ্জন তাঁর কাছেই থাকে, পড়াশুনোয় মাথা নেই, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। বি এম কলেজের উলটোদিকে প্রিয়রঞ্জন একটা কাগজ কলম-পেনসিলের দোকান খুলে ছোটভাইকে বসিয়ে দিলেন সেখানে। দোকানটা দেখতে দেখতে বেড়ে উঠল।

প্রিয়রঞ্জন একটু রগচটা ধরনের মানুষ। ছোটভাইয়ের সামান্য দোষ-ত্রুটি দেখলেই মারধর করতেন। নিখিলরঞ্জন যখন বড় রকমের একটা কেলেঙ্কারি করে ফেললেন, তখন প্রিয়রঞ্জন এমন মার দিতে লাগলেন, যে, পাড়াপ্রতিবেশীরা এসে না আটকালে একটা কিছু অঘটন ঘটে যেত। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রিয়রঞ্জন বলেছিলেন, মারব না তো কী করব? নিজের ভাইকে তো পুলিশে দিতে পারি না? আহত নিখিলরঞ্জন ধুঁকতে ধুঁকতেই সে রাত্রে বাড়ি থেকে সরে পড়লেন। একমাস বাদে চিঠি এল আসাম থেকে, দাদা আমি ভালো

আছি। আমার জন্য চিন্তা করিয়ো না। আমি ঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছি। সেই থেকে নিখিলরঞ্জন রামকৃষ্ণ মিশনে-সাদা কাপড় থেকে আস্তে আস্তে গেরুয়া পেয়েছেন।

চাকরির থেকেও কাগজের দোকানের ব্যবসাতেই প্রিয়রঞ্জনের বেশি উন্নতি হতে লাগল। অমরনাথ যখন কলকাতায় এসে বাড়ি কিনলেন, তখন প্রিয়রঞ্জন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে সেইসঙ্গে কলকাতার ব্যবসার বাজারটিও পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখে বড় শহরের বিস্তৃত সুযোগটা ঠিক ধরা পড়ল। চাকরি ছেড়ে প্রিয়রঞ্জন কলকাতাতেই ব্যবসা করবেন ঠিক করে ফেললেন। অমরনাথের অত বড় বাড়ি, থাকারও কোনও অসুবিধে নেই। উদাসীন প্রকৃতির অমরনাথ এ-প্রস্তাবে এককথাতেই রাজি, এমনকী প্রিয়রঞ্জনের পীড়াপীড়িতে তিনি ওঁর কাগজের ব্যবসায় লগ্নিও করলেন কিছু টাকা। এক বছরের মধ্যে প্রিয়রঞ্জনের দোকানের দুটি শাখা স্থাপিত হল কলকাতায় তিনি চিররঞ্জনকে সপরিবারে টেনে আনলেন এ বাড়িতে এবং প্রায় জোর করেই ছোটভাইকে পার্টনার করে নিলেন ব্যবসায়। যদিও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, এ ভাইটির কাছ থেকে বিশেষ কিছু কাজ পাওয়া যাবে না।

এ-বাড়িতে অমরনাথ কর্তা হলেও দেখাশুনোর সব ভার প্রিয়রঞ্জনের। বাড়ির চুনকাম থেকে বাথরুমের দরজা সারানোর তদারকি তিনিই করেন। কোথায় কলের মিস্ত্রি পাওয়া যায়, সিমেন্ট কোথায় সস্তা-এ সব তাঁর নখদর্পণে। প্রিয়রঞ্জনের স্ত্রী সুপ্রভাই বাড়ির গৃহিণী। সুপ্রভা একটু বেশি মুখরা-এ ছাড়া সংসার সামলাবার সব গুণই তাঁর আছে। ঝি অনুপস্থিত হলে বাড়ির তিনতলা থেকে একতলা তিনি নিজেই ধুয়ে মুছে ফেলতে পারেন। কার পাতে ক'টুকরো মাছ পড়বে সেদিকেও তাঁর সমান দৃষ্টি। ঝি-চাকরদের ওপর তিনি একটু বেশি অত্যাচার করেন বটে, কিন্তু চিররঞ্জনের স্ত্রী হিমানীকে কখনও ঘাঁটান না। হিমানী বড়লোকের মেয়ে-এজন্য তাঁর মনে একটু সমীহের ভাব আছে। যদিও সুপ্রভার স্বামীর অবস্থা এখন যথেষ্ট সচ্ছল-কিন্তু তিনি সাধারণ গরিব ঘরের মেয়ে-এই মানসিক বৈষম্য কখনও ঘোচেনি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রী ও সন্তানদের নিজের কাছে এনে রেখেছেন বটে, তবু চিররঞ্জনের মনে সুখ নেই তেমন। এটাও তো পরেরই বাড়ি। তিনি পরবাসী হয়েই রইলেন। মাঝে মাঝে কাগজের দোকানে গিয়ে বসেন। কখনও সখনও আলাদা ভাবে তিনি নিজেও কিছু রোজগার করে ফেলেন কোনও উপায়ে–তখন বাড়ির সকলকে কিছু না কিছু উপহার কিনে দেন। মোটমাট তিনি সারা জীবন বেকার হয়েই রইলেন। আগেও কম কথা বলতেন, এখন প্রতাপশালী দাদার ছত্রছায়ায় আরও চুপচাপ হয়ে যেতে লাগলেন ক্রমশ। সাংসারিক কোনও ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামান না।

যে-কোনও কারণেই তোক প্রিয়রঞ্জনের চেয়ে চিররঞ্জনকেই বেশি পছন্দ করে ফেললেন অমরনাথ। এই নিরাসক্ত মানুষটির প্রতি তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে কাজের কথা, দরকারি কথা সেরে নিতেন চট করে, আর চিররঞ্জনের সঙ্গে প্রাণের কথা বলতেন। অমরনাথ একটু ভালো করেই বুঝতেন যে ব্যবহারিক সুবিধের জন্য প্রিয়রঞ্জন তাঁকে খাতির করলেও মনে মনে তাঁকে পছন্দ করেন না। অমরনাথ একসময় প্রিয়রঞ্জনের নিজের বোনকে কষ্ট দিয়েছিলেন, মুসলমান নর্তকীর সঙ্গে বসবাস করেছেন, এসব প্রিয়রঞ্জন কখনওই পুরো ক্ষমা করতে পারবেন না। নেহাত বাইরে বাইরে মানিয়ে চলছেন। চিররঞ্জন ওসব পুরনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। অমরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, চিররঞ্জন চুপচাপ থাকলেও আশেপাশের সবকিছুই খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করার একটা প্রবণতা আছে তাঁর মধ্যে। এই এক ধরনের মানুষ, যারা ইচ্ছে করে ঠকে। অর্থাৎ যে ঠকাচ্ছে, তাকেও বুঝতে দেয় না যে সে তো বুঝেসুঝেই ঠকছে। অন্যদের মুখতা দেখে যে মনে মনে হাসে, অথচ নিজে কখনও তার ওপর টেক্কা দেবার জন্য বেশি চালাকের মতন ব্যবহার করে না। এই নেশায় যারা মজে যায়, তারা সুখী হয় কি না সেটা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু তারা জীবনে উন্নতি করার চেষ্টায় মাতে না কখনও।

অমরনাথ ক্রমশ জানতে পেরেছিলেন, চিররঞ্জন কয়েকটি নিজস্ব ধারণা মিলিয়ে এক ধরনের দর্শন গড়ে তুলেছেন। সেই দর্শনের মধ্যে খানিকটা সিনিসিজম আছে, তবু শুনলে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়।

প্রিয়রঞ্জন একদিন বাড়িতে ঢুকলেন চিৎকার করতে করতে। সদর দরজার সামনেই পাশের বস্তির ছেলেরা হেগে রেখে গেছে, প্রিয়রঞ্জন অন্যমনস্ক ভাবে তাতে পা দিয়ে ফেলেছেন। ঘেন্নায় ছটফট করছেন একেবারে। বালতি বালতি জল ঢেলে পা ধোওয়া। হল, তবু ঘেন্না যায় না। সুপ্রভা মাথায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেন। প্রিয়রঞ্জন তবু ওপরে উঠতে পারছেন না, বালতি সুদ্ধ সাবানগোলা জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

দোতলার বারান্দায় অমরনাথ আর চিররঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। একটু পরে চিররঞ্জন আপন মনেই বললেন, সবই মন। একবার ধুলেও যা, দশবার ধুলেও তা। সবাই। জানে। তবু মনে থাকে না।

অমরনাথ শুনতে পেয়ে বললেন, তা তো বটেই, মনই তো সব। চিররঞ্জন বললেন, অপরের টুথব্রাশও ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যায় অনায়াসে, তবু আমরা করতে পারি না। কিন্তু জল খাবার গেলাস ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি।

অমরনাথ এবার শুধু হাসলেন। চিররঞ্জন আবার বললেন, আমরা ভুলে যাই, আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে খানিকটা গু আছে। সারাদিন শরীরের মধ্যে গু নিয়ে ঘুরছি! অথচ নিজের শরীরটাকে অপবিত্র মনে হয় না।

অমরনাথ এবার বললেন, কিন্তু এটা তো ভুলে থাকাই ভালো। তাই না?

চিররঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে বললেন, তা ঠিক!

কিন্তু একটা কথা চিররঞ্জনের মাথায় ঢুকলে আর সহজে ছাড়ে না। সারা দিন সেইটাই বোধহয় ভাবতে থাকেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি অমরনাথকে নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বড়বাবু, এমন কোনও সাবালক মেয়ে-পুরুষ আছে এ-পৃথিবীতে, যারা প্রতিদিন সকালে পায়খানা ঠিক মতন হল কি না এই নিয়ে ভাবে না?

বড়বাবু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, বলা শক্ত।

সন্ন্যাসীদের কি এইরকম হয়? মহাত্মা গান্ধীর ও হয়?

হঠাৎ এসব কথা মনে এল কেন?

মানুষের মনে বেশির ভাগ চিন্তাই তো হঠাৎ আসে। তার কোনও ঠিকঠিকানা আছে?

সন্ন্যাসীদের তো এই জন্যই জিতেন্দ্রিয় বলে। তাঁরা নিশ্চয়ই এসবের ঊর্ধ্বে। আমি কিছুদিন ওঁদের সঙ্গে মিশেছিলাম, তখন অবশ্য আমার মনে এ-প্রশ্ন আসেনি। তা হলে জেনে নিতুম।

জিতেন্দ্রিয় বলতে তো কামনা-বাসনা জয় করাই বোঝায়। নিছক যেগুলো শারীরিক প্রয়োজন, যেমন খাওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় খাদ্য শরীর থেকে বার করে দেওয়া– এগুলো কি এড়ানো যায়?

কামনা বাসনাও শারীরিক প্রয়োজন। তুমি মানো কি না জানি না, আমি মানি। কামনা বাসনাকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের শরীর সেটা সহজে মেনে নেয় না, অনেকে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। অধিকাংশ সাধু-সন্ন্যাসীই এক ধরনের উন্মাদ, আমি লক্ষ করেছি। ভাবোদও বলতে পারো। লোকে তাই বলে।

কিন্তু সব মানুষের সব ইন্দ্রিয় তো সমান শক্তিশালী নয়। কারওর স্পর্শে বেশি আনন্দ, কারওর দর্শনে। পরনারীকে স্পর্শ করা অন্যায়, দর্শনে তো কেউ দোষ দেয় না। অথচ এমন মানুষও তো আছে, যাদের রূপ দেখার চোখ আছে, যারা বিভিন্ন ফুলের রং চিনতে পারে–তারা কোনও নারীর রূপের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে যে আনন্দ পায়...

বড়বাবু টেবিলে টোকা মারতে মারতে বললেন, বুঝতে পারছি, তোমারও বয়স হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেই এইসব মনে পড়ে। অল্প বয়সে শুধু চোখে মন মানে না। ছুঁয়ে দেখতেই হয়!

বুড়ো হয়ে গেলেও আমার দুঃখ নেই। অভিজ্ঞতা না হলে উপভোগ গাঢ় হয় না। ছোকরা বয়সে তো ছটফট করেই সময় কেটে যায়!

অমরনাথ যে-দিন সূর্যকে খুব শাস্তি দিচ্ছিলেন, সেদিন চিররঞ্জন পেছন থেকে এসে আস্তে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, কেন শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন?

৮. সূর্যকুমার বছরে একবার কলকাতায়

সূর্যকুমার বছরে একবার কলকাতায় আসে। হাজারিবাগের সাহেবি স্কুলে সে পড়ে, সেখানে বছরে দু'বার লম্বা ছুটি। গ্রীষ্মে পাহাড়ি জায়গায় এক্সকারশানে যায়, বড়দিনের ছুটি কাটায় কলকাতায় বড়দিনের সময়ও চার-পাঁচ সপ্তাহ ছুটি থাকে।

সূর্যকুমারের কলকাতায় আসবার সময় হলে আমি ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজনা ও চাপা আনন্দ বোধ করতাম। এই সময় সারা বাড়িতেই বেশ একটা উৎসাহের সঞ্চার হত। এ বাড়িতে আমিই একমাত্র ছেলে, আর একজন ছেলে এলে আমি তবু একজন সঙ্গী পেতাম। আমার দিদিরাও খুশি হত। আমার দিদিরা তো আমাকে পুরুষমানুষ হিসেবে গ্রাহ্যই করত না–একমাত্র মা-জ্যাঠাইমার সঙ্গে হাসাহাসির গল্পের সময় আমাকে তাড়া দিত, এই তুই এখানে কেন রে? তুই তো ছেলে-তোর এসব গল্প শুনতে নেই। আমাদের পাশের বাড়িতে একটা নতুন বাচ্চা হওয়ায় হিজড়েরা এসে নেচেছিল সেটাও আমাকে দেখতে দেওয়া হয়নি, কারণ ছেলেদের নাকি ওসব দেখতে নেই।

সূর্যকুমার বয়সে আমার থেকে ছ' বছরের বড়, আমি দাদা বলতাম, কিন্তু বন্ধুর মতন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে সূর্যকুমারের একটা ঘর রাখা ছিল আলাদা, বছরের অন্য সময় আমার দুই দিদি রাত্তিরে শুত ওই ঘরে, কিন্তু বড়দিনের সময় তাদের আবার চলে

আসতে হত মায়ের ঘরে। বড়দিন যত কাছে এগিয়ে আসত, আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করতাম। তারপর একদিন বড়বাবু স্কুল কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়ে আমাদের জানাতেন, পরশুদিন সূয্যি আসছে, তোমরা যাবে নাকি হাওড়া স্টেশনে?

প্রথম বার সূর্যকুমারকে দেখে আমরা অবশ্য খুব নিরাশ হয়েছিলাম। যদিও তাকে আনতে গিয়েছিলাম কত উৎসাহের সঙ্গে। তখন আমরা নতুন কলকাতায় এসেছি, কলকাতার সবকিছুই বিস্ময়কর লাগে। বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বড়বাবুর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি চেপে স্ক্র্যান্ড রোড ধরে গিয়েছিলাম চাঁদপাল ঘাটে। যাবার পথে মাঝ রাস্তায় দুটো ষাঁড় মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল সব গাড়ি, আমাদের গাড়ির ঘোড়াদুটোও ভয় পেয়ে পা তুলে চিহিহি করে চ্যাঁচাচ্ছিল। আমি জানলার ধারে বসতে পাইনি বলে ভালো করে দেখতে পাইনি অবশ্য। চাঁদপাল ঘাটে আমরা বেশ খানিকক্ষণ আগেই এসেছিলাম, তখন জাহাজ চলাচল করছে বলে ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। জাহাজগুলো অবিকল ছবির বইতে জাহাজের মতন। জাহাজের ভোঁ শুনলে সব সময়ই আমার মন খারাপ লাগে।

হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমরা সবাই সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন আর আসে না! সওয়া ঘণ্টা লেট। মা আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে একটু এদিক-ওদিক গেলেই আমি হারিয়ে যাব, আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড়দি আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে শ্রীলেখা আমাদের সবার বড়দি। আমাদের কাছেই কয়েক জন চিনেম্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখে দেখেই সময় কেটে যাচ্ছিল বেশ। তখন আমরা পথেঘাটে কোনও চিনেকে দেখলেই বলতাম, চিনেম্যান চ্যাং চুং মালাই কা ভ্যাট! অবশ্য একজন মাত্র চিনেম্যানকেই আমরা দেখেছি তখন, যে একসঙ্গে ছটা বল নিয়ে লোফালুফির খেলা দেখাত পাড়ায় পাড়ায়।

শেষ পর্যন্ত ট্রেন এল, অনেক লোকজন নামল, কিন্তু সুকুমারের দেখা নেই। বড়বাবু সুস্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন পর্যন্ত সুর্যদাদাকে দেখিইনি, সুতরাং যে-কোনও কিশোরের দিকে উৎসুক ভাবে তাকাচ্ছি। বেশ খানিকটা বাদে দেখলাম, একজন আলখাল্লা পরা বুড়ো সাহেব তিন-চারটি ছেলেকে নিয়ে দূর থেকে আসছেন। বড়বাবুর

সামনে এসে থেমে গিয়ে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, হ্যালো, মিঃ ভাদুড়ি! গড় ব্লেস ইউ!

সাহেবটি একটি ছেলের কাঁধে হাত রেখে বড়বাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কী সব যেন বললেন ইংরেজিতে। আমরা ভেবেছিলাম, সে ওই সাহেবেরই ছেলে। আমাদের চমকে দিয়ে বড়বাবু তাকেই বললেন, এই যে সূর্য, মিট ইয়োর কাজিনস।

ছেলেটি আমাদের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হেসে শুধু মাথা নোয়াল।

নাবিকদের মতন নীল রঙের প্যান্ট ও কোট পরে আছে সূর্য, কোটের বুকের কাছে সোনালি সুতোয় কী যেন আঁকা। গলায় টাই, বুটজুতোয় ঝকঝকে পালিশ। তার গায়ের রং সাহেবদের মতন ফরসা, চোখের তারাদুটোও খয়েরি। এসবের জন্যও কিছু না, কিন্তু সে আমাদের নিরাশ করে দিল একটা ব্যাপারে। সূর্য এক বর্ণও বাংলা জানে না। আমি তখন প্যারি সরকারের ফাস্ট বুক পর্যন্ত পৌঁছেছি, ওয়ান মর্নিং আই মেট আ লেম ম্যান-এর পাতা পড়তে পারি। আমি হাঁ করে আমার এই নতুন দাদার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বড়দি ক্লাস এইটে পড়ে তিনখানা ইংরেজি বই-কিন্তু নিজের মন থেকে এক লাইনও বানিয়ে বলতে গেলে কান লাল হয়ে যায়।

সূর্যকুমারের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল-তার মুখখানা অদ্ভুত ধরনের বিষণ্ণ আর ম্লান। প্রথম যখন তাকে দেখি, তখন তার বয়স তেরো বছর-অথচ তার মুখে হাসি দেখা যেত কদাচিৎ। কারওর সঙ্গে কথা বলার সময় চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত, সেই খয়েরি রঙের অচেনা চোখ।

সূর্যকে মনে হত আমাদের মধ্যে যেন একটা অন্য জগতের মানুষ। ভুল করে এখানে এসে পড়েছে। তার চেহারা, ব্যবহার সবই আলাদা। সে প্রত্যেক রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মোজা আর গেঞ্জি নিজের হাতে কেচে নেয়। বাড়িতেও কক্ষনও সে খালি পায়ে থাকে না। প্রথম দু-একদিন সে চামচে দিয়ে ভাত খেয়েছিল, তারপর যখন হাত দিয়ে খেতে শুরু করল, তখনও সব কটা আঙুল উঁচু করে এমন ভাবে ভাত তোলে যে দেখলেই হাসি পায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সে খেতে বসেও বাঁহাত দিয়ে জলের গেলাস ধরে এবং সেই হাত আবার জামায় লাগায়। দু' হাত দিয়ে মাছের কাঁটা বাছে। কেউ তার এসব দেখে হাসলে সে স্থির চোখ তুলে তাকায়, হাসে না, কথা বলে না।

সূর্যদাদার দেখা পাবার জন্য আমি এত উদগ্রীব হয়ে ছিলাম, কিন্তু সে আসার পর আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম, তার সামনেই যেতাম না। একদিন আমি ছেলেমানুষি অভিমান নিয়ে বড়বাবুর কাছে নালিশ করেছিলাম, বড়বাবু, সূর্যদাদা কেন বাংলায় কথা বলে না? আমরা কিছু বুঝতে পারি না।

বড়বাবু হেসে বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ওকে শেখাও! ও তো বিহারের স্কুলে পড়ে, সেখানে কেউ বাংলা জানে না তাই সব ভুলে গেছে। খুব ছোটবেলায় কিন্তু বাংলা শিখেছিল তোমার পিসির কাছে।

আমি অবশ্য পরে সূর্যদার কাছে জেনেছিলাম, ওদের স্কুলে বেশ কিছু বাঙালি ছেলে আছে, কিন্তু তারাও বাংলা বলে না। শিক্ষকদের কড়া নির্দেশ ছিল, হস্টেলেও পরস্পরের সঙ্গে সবসময় ইংরেজিতে কথা বলতে হবে।

শুরু হয়ে গেল সূর্যকুমারকে বাংলা শেখানো। শ্রীলেখা আর সান্ত্বনাবড়দি আর মেজদি পাখি-পড়ানোর মতন সূর্যকুমারকে বাংলা শব্দ মুখস্থ করাতে লাগল। কিন্তু উচ্চারণ কিছুতেই শুধরোয় না–সূর্যদা মাছের ঝোলকে বলে মাচ্ছের জোল, পোকাকে বলে পকা। আমাদের রান্নার ঠাকুর মহাজনকে বলবে মৌজন। গেলাস কিংবা টেবিল কিছুতেই বলবে না, বলবে গ্লাস আর টে। সেবারে ছুটির শেষে ফিরে যাবার সময়। সূর্যদা এইরকম বাংলা শিখেছিল : বড় মামিমা, তোমার আচার খুব বিউটিফুল, বাট এত জাল না দাও (এত ঝাল দিয়ো না), আমি সুটকেস-ভরতি আচার নিয়ে যাব একশিশি। ...মৌজন খুব ডার্টি, নুনের ভেতরে পকার পা, নট ওনলি ওয়ান বাট টু!

একবার নুনের ভেতরে আরশোলার ঠ্যাং বেরিয়েছিল ঠিকই। সূর্যদার মুখে এরকম আধো আধো বাংলা খুব মিষ্টি শোনাত।

সূর্যকুমার এলে আমাদের অনেক জায়গায় বেড়ানো হত। শীতের কলকাতায় অনেক রকম উৎসব আর আকর্ষণ। বড়বাবু কিংবা বাবার সঙ্গে আমরা যেতাম ইডেন গার্ডনসে ব্যান্ড শুনতে। গার্ডনসের গোল উঁচু জায়গাটায় ঝলমলে পোশাক-পরা সাহেব সিপাহিরা ব্যান্ড বাজাত। আমরা প্যাগোডার নীচে বসে কমলালেবু আর চিনেবাদাম খেতে খেতে বিভোর হয়ে সেই বাজনা শুনতাম। ক্রিসমাস উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনেও এই রকম বাজনা শুনেছি সবাই সেটাকে বলত গড়ের বাদ্যি।

কিংবা আমরা গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়া যেতাম সার্কাস দেখতে। সার্কাসের খেলোয়াড়রা অধিকাংশই মাদ্রাজি, কয়েকজন সাহেব এবং জাপানি। বিরাট উঁচু উঁচু ট্রাপিজে ফ্রক-পরা মেয়েরা একটা থেকে লাফিয়ে চলে যেত অন্য একটায়নীচে জাল পাতা থাকত না। তখন। বাঘ আর হাতির খেলাতেই সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত হতাম-আগাগোড়া সোনালি পোশাক-পরা একজন বেঁটে লোক মস্ত লম্বা চাবুক নিয়ে বাঘদের হুকুম করত। অদ্ভুত ধরনের সট সট শব্দ হত সেই চাবুক থেকে সবাই বলত ইলেকট্রিকের চাবুক।

একটা সিনেমাও দেখেছিলাম সূর্যদার দৌলতে। তখন ছোটদের সিনেমা দেখা মহাপাপ। ইস্কুলের ছেলেদের পক্ষে সিনেমা দেখা মানেই চূড়ান্ত বখে যাওয়া। সূর্যকুমারের বায়নাতেই আমাদের একবার একটি মাত্র ছবি দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিনেমাকে আমরা বলতাম বাইসকোপ, সূর্যদা বলত মুভি। মনে আছে। বাইসকোপটার নাম, মার্ক অব জোরো-তরোয়াল হাতে মুখোশ-পরা একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সব জায়গায় ক্রস এঁকে দিয়ে যেত। সেইসঙ্গে ছিল আর একটা ছোট ছবি, সেটাই বেশি ভালো লেগেছিল। ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া টুপি, হাতে ছড়ি ও ছোট গোপওয়ালা চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সূর্যকুমার এইসব নানা জায়গায় বেড়ানো উপভোগ করত ঠিকই কিন্তু কথা খুব কম বলত। তা ছাড়া তার মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব লেগে থাকত সবসময়। সূর্যদার ছেলেবেলার

চেহারাটা আমি যখনই ভাবি–তার সেই বিমর্ষ মুখের ছবিটাই চোখে ভেসে ওঠে। ওইটুকু বয়সে অতখানি গাম্ভীর্য আমি আর কোনও ছেলের দেখিনি।

তখন আমরা মনে মনে ভাবতাম সূর্যদার মা নেই তো, তাই অত কষ্ট। মা না-থাকার ব্যাপারটা ভাবাই যায় না। মা থাকা তো একটা অবধারিত সত্যের মতন, আর সবারই মা আছে, শুধু সূর্যদার নেই। সূর্যদার মুখে ছেলেবেলায় কখনও তার মায়ের নাম শুনিনি।

সূর্যদা বদলে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। পরের বছর ছুটিতে এসে আমাদের সঙ্গে অনেক খোলামেলা ভাবে মিশেছিল, বাংলাও শিখে গিয়েছিল বেশ ভালোই, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া কিংবা মুখের সেই বিষণ্ণ ভাবটি যায়নি অনেকদিন।

দু-তিন বছরের মধ্যেই আমি সূর্যদার ভক্ত চ্যালা হয়ে উঠলাম। যে কদিন সূর্যদা কলকাতায় থাকত, আমি সব সময় ছায়ার মতন ওর পেছন পেছন ঘুরতাম, ওর হুকুম তামিল করার জন্য আগে থেকেই তৈরি। সূর্যদা অবশ্য কোনও হুকুমই করত না। সাহেবি কায়দায় রপ্ত হলেও হস্টেলে থাকার জন্য কয়েকটি অন্যরকম গুণও ছিল। নিজের কাজ অন্যকে করতে দিত না কক্ষনও–এমনকী খাওয়ার পর নিজের এঁটো থালাও নিজেই তুলে নিয়ে যেত। মা-জ্যাঠাইমার আপত্তি কিছুতেই মানেনি। নিজের জামাকাপড় তো নিজে কাঁচতই। কখনও এক গেলাস জলও অন্যকে দিতে বলেনি। আমরা তো কিছুতেই নিজে জল গড়িয়ে খেতাম না–মনে হত, ওটা বিশুদ্ধ মেয়েদের কাজ। দিদিরা কখনও জল আনতে আপত্তি করলে নালিশ করতাম মায়ের কাছে। সূর্যকুমারের দেখাদেখি আমি নিজে এঁটো থালা তুলতে শুরু করলেও জল খাওয়ার ব্যাপারে দিদিদের হুকুম করতে ছাড়িনি।

রোজ সকালবেলা সূর্যদা নিজেই বিছানা ছেড়ে ছাদে চলে যেত। শীতের মধ্যেও হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরে ব্যায়াম করত একা একা। আবার রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার আগে বাইবেল খুলে প্রেয়ার করত কয়েক মিনিট। অত কম বয়সি একটি ছেলের এ রকম নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধ দেখে আমাদের খুব চমক লাগত। আমি তো অন্ধের মতন নকল করতে শুরু করলাম সূর্যদাকে, দিদিরা তাই নিয়ে আমাকে খ্যাপাত। সূর্যদা অবশ্য কয়েক বছরের

মধ্যে বাইবেল পড়া ছেড়ে দিয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে ঘোরতর ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল।

সূর্যদা ছিল বাড়ির সকলের নয়নের মণি। সবাই সূর্যদাকে খাতির করার জন্য শশব্যস্ত। একে তো তার অমন সুন্দর চেহারা, সেইসঙ্গে ভদ্র বিনীত ব্যবহার, পড়াশুনোতেও ভালো। তা ছাড়া যে-ছেলে সাহেবদের মতন ইংরেজিতে কথা বলতে পারে-তার প্রতি বিশেষত বাড়ির মেয়েদের একটা সমীহের ভাব থাকবেই। একমাত্র জ্যাঠামশাই মনে মনে পছন্দ করতেন না সূর্যদাকে-গোড়া থেকেই একটা বিরূপ ভাব নিয়েছিলেন। সূর্যদার সঙ্গে কথা বলার সময় জ্যাঠামশাই এমন একটা কাষ্ঠহাসি ও শুকনো স্নেহের ভাব দেখাতেন-যা আমাদের ছেলেমানুষি চোখেও ধরা পড়ত।

জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহের অভাব পুষিয়ে দিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠাইমার পর পর তিন মেয়ে হবার পর একটি ছেলে জন্মেও কয়েক মাস বাদে মারা যায়। জ্যাঠাইমা আমাকেও খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু সূর্যদাকে ভালোবাসতেন অনেক অনেক বেশি। সে জন্য আমার কোনও দিন হিংসে হয়নি। আমি সবদিক থেকেই সূর্যদাকে আমার চেয়ে অনেক বড় মনে করতাম। এবং মনে হত, এ সবকিছুই সূর্যদার প্রাপ্য। কিন্তু যারা যারা ওকে ভালোবেসেছে, তাদের প্রত্যেকের মনে একটা করে গভীর আঘাত দেবার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল সূর্যকুমারের।

স্কুলজীবনের শেষদিকে সূর্যদা বছরে দু'বার করে কলকাতায় আসতে লাগল। তখন সূর্যদা বেশ বড় হয়েছে বলে ওর একাই রাস্তায় বেরোবার অনুমতি মিলেছিল, আমি অনেক সময় থাকতাম সঙ্গে। সূর্যদাকে আমি গ্রে স্ট্রিটে রেণুদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিষ্ণু কিংবা জীমূত ওরা অবিলম্বেই সূর্যদার ভক্ত হয়ে গেল। এমনকী সুপ্রকাশদা পর্যন্ত একদিন সূর্যকুমারের ইংরেজি জ্ঞান পরীক্ষা করে মুগ্ধ হলেন, তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এই প্রতিভাবান কিশোরের।

রেণুদের বাড়ির কাছেই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। আমি আর সূর্যদা দাঁড়িয়ে ছিলাম হাতিবাগানের বাজারের সামনে, ট্রামে ওঠবার জন্য। শ্যামবাজারের দিক থেকে কীসের যেন একটা মিছিল আসছিল, তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে একদল লোক খুব চিৎকার করছে। আমরা সেদিকেই তাকিয়েছিলাম। মিছিলটা যখন আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন দুটো পুলিশের গাড়ি এসে থামল টপাটপ পুলিশরা নেমেই তাড়া করে গেল মিছিলকে, মুহূর্তে সব ছত্রভঙ্গ রাস্তার সব লোকজন যে দৌড়োচ্ছ আর পালাচ্ছে আমরা সেটা খেয়ালই করিনি। তা ছাড়া পালাবার কথা আমরা জানতামই না-তখনকার কলকাতার ছেলেরা পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় এখনকার মতন দক্ষ ছিল না। আচমকা একটি গোরা পুলিশ আমাদের দিকে তেড়ে এল-আমাকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিল রাস্তায়-সূর্যদার মাথায় ব্যাটন দিয়ে মারল। সেই আমি বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেলাম।

পুলিশ আমাদের ছোট ছেলে বলে বুঝতে পারেনি-এলোপাথাড়ি মারতে মারতে আমাদের গায়ে লেগেছে তা কিন্তু মোটেই নয়। স্পষ্ট মনে আছে সেই ঘটনা। একজন পুলিশ সার্জেন্ট প্রথমে তাকাল আমাদের দিকে, তার প্রকাণ্ড মুখখানা তখন লালচে রঙের, আমাদের দেখে তার চোখে যেন বেশি করে রাগ জ্বলে উঠল-এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার মুখের দিকে। হাত না বলে থাবাই বলা যায়-পাঁচটা আঙুলের বিস্তারে ঢেকে যায় আমার গোটা মুখ-সেই আঙুলগুলো আমার মুখখানা চেপে ধরে একটা ধাক্কা মারল। একটি ছোট ছেলেকে মারার জন্যই মারা।

মাথায় ব্যাটনের ঘা খেয়ে সূর্যদা প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর ইংরেজিতে অনর্গল বকতে বকতে ছুটে গেল সেই পুলিশ সার্জেন্টেরই দিকে। তার বিষণ্ণ ধরনের মুখখানায় তখন অসম্ভব রাগ। সার্জেন্টের সামনে দাঁড়িয়েই কী যেন বলতে লাগল। সার্জেন্টটি সূর্যদার ঘাড়ে আর এক ঘা মেরে উঠে গেল গাড়িতে। আমি ধূলো ঝেড়ে উঠে এসে দেখলাম, সূর্যদার মাথা থেকে রক্ত পড়ছে।

সূর্যদাকে নিয়ে আবার রেণুদের বাড়িতে চলে এলাম। রেণু আর দীপ্তি নীচের তলাতেই ছিল, আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, রেণু, শিগগির যা, সুপ্রকাশদাকে ডাক, ওর মাথা ফেটে গেছে।

রেণু বলল, মাথা ফেটেছে? কই? কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো!

এই যে রক্ত দেখতে পাচ্ছিস না!

রেণু কাছে এসে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে সূর্যদার মাথাটা দেখে বলল, একটু তো মোটে রক্ত বেরিয়েছে, মাথা তো ফাটেনি!

রেণু তখন খুব ছোট, ও ভেবেছিল মাথা ফেটে যাওয়া মানে নারকোলের মালার মতন মাথার খুলিটা ফাঁক হয়ে যাওয়া।

দীপ্তি গিয়ে সুপ্রকাশদাকে ডেকে আনল। সুপ্রকাশদা বললেন, একী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! তোমরা মিছিলে গিয়েছিলে! যাওনি! এমনি এমনি মারল? যাক গে মেরেছে। মেরেছে-ভাগ্যিস ধরে নিয়ে যায়নি-তা হলে আর জীবনে কখনও গভর্নমেন্টের চাকরি পেতে না। সূর্য নিশ্চয়ই আই সি এস হবে।

সুপ্রকাশদা যত্ন করে বেঞ্জিন আর তুলো দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তারপর আমরা রিকশা করে চলে এলাম বাড়িতে।

এরপর দু-তিন দিন সূর্যদা খুবই বিমর্ষ হয়ে রইল। কারওর সঙ্গেই প্রায় কথা বলেনি। ওর মনে নিশ্চয়ই একটা আঘাত লেগেছিল। স্কুলের সাহেব শিক্ষকরা কত ভালো, কী চমৎকার তাদের ব্যবহার-ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে কতটা উন্নত সে কথাও সূর্যদাকে পড়তে হয়েছে তার সঙ্গে এই ঘটনাটা যে একদম মেলে না।

বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদার চরিত্রে দুটি ব্যাপার খুব প্রকট হয়ে ওঠে। একটি হচ্ছে, ইচ্ছে করে বিপদে পড়ার ঝোঁক, অন্যদিকে বলা যায় বেশি রকমের নারী-প্রীতি। পৃথিবীতে

যে কয়েক জন বিখ্যাত প্রেমিক তাদের অসম্ভব নারী-লিপ্সার জন্য অমর হয়ে আছেন, সূর্যকুমারের নাম তাদের পাশে অনায়াসে লিখে রাখা যায়। আমরা সব মিলিয়ে যাকে প্রেম বলি, এটা ঠিক তাও নয়, সম্ভোগ বাসনাই বলা উচিত। যৌবনে একমাত্র নারীদের সান্নিধ্যেই সূর্যদার বিষণ্ণ ভাবটা খানিকটা কেটে যেত। সূর্যদার প্রথম এই ধরনের প্রেম হয় আমার বড়দির সঙ্গে।

বিপদে পড়ার ঝোঁক কী রকম ছিল তার একটা উদাহরণ দিই। সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা দেবার পর সূর্যদা যখন কলকাতায় এসে রয়েছে, তখন আমরা কয়েক জন মিলে ইডেন গার্ডেনসে একদিন বেড়াতে এসেছিলাম। বড়রা কেউ সঙ্গে আসেননি, সূর্যদাই আমাদের গার্জেন। ওখানকার ঝিলে কয়েকটা নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়-তাতে চড়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা খুব হইহল্লা করছিল।

আমার মেজদি সান্ত্বনা হঠাৎ বলল, আঃ, আমরাও যদি নৌকো চড়ে বেড়াতে পারতাম, কী মজাই না হত!

সূর্যদা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, চলো, নৌকোতেই চড়ব।

আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বড়দি সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নৌকো চালাতে জানো?

সূর্যদা এবারও গম্ভীর ভাবে বলল, জানি না। তবে শিখে নিতে কতক্ষণ?

প্রথম তো নৌকো পাওয়ার ব্যাপারেই অসুবিধে দেখা দিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেদের প্রতাপ বেশি-তারা তখন নিজেদের শাসক-সমাজের প্রতিচ্ছায়া মনে করে খুব তেজ দেখাত। তারা দু'ঘণ্টার আগে কোনও নৌকো ছাড়বে না। সূর্যদা নেবেই। শেষ পর্যন্ত সূর্যদার চোস্ত ইংরেজি শুনে অ্যাংলো ছেলেরা পিছু হটল।

নৌকো ঝিলের মাঝামাঝি যেতেই ভীষণ দুলতে লাগল আর ঘুরতে লাগল এদিক-ওদিক। সূর্যদা একদম চালাতে জানে না, আনাড়ির মতন তো বইঠা চালাতে গিয়ে আরও মুশকিল। দিদিরা ভয় পেয়ে চ্যাঁচামেচি করতে লাগল, পার থেকে লোকেরা দেখে হাসছে। আমরা অবশ্য সাঁতার জানতাম, আমি হেদোতে দিদিদের সঙ্গে চান করতে করতে সাঁতার শিখে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত এমন হল, নৌকো আর পারে এনে ভেড়ানোও যায় না–অ্যাংলো ছেলেদের অসহ্য টিটকিরিতে কান পাতা যায় না, কিন্তু সূর্যদার ভ্রুক্ষেপ নেই।

ভয় পেয়ে দিদিরা উঠে দাঁড়াতেই কাণ্ডটা ঘটল, নৌকো উলটে গেল। আমরা সাঁতরে পারে পৌঁছে দেখলাম সূর্যদা ডুবে যাচ্ছে। বাগানের দু'জন মালি তক্ষুনি জলে ঝাঁপিয়ে না পড়লে সূর্যদার কপালে কী ছিল সে-দিন কে জানে। তখন আমরা টের পেলাম, সূর্যদা সাঁতারই জানে না। সাঁতার না জেনে, নৌকো চালাতে না জেনে, আর কে ঝিলের মাঝখানে নৌকো নিয়ে যায়, সূর্যদা ছাড়া?

৯. সূর্য পড়াশুনোতে ভালোই ছিল

সূর্য পড়াশুনোতে ভালোই ছিল। কিন্তু পাদরি স্কুলের কড়া শাসন সত্ত্বেও সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষার আগের দু' বছর সে বেশি অমনোযোগী হয়ে ওঠে। স্কুল থেকে বড়বাবুর কাছে মাঝে মাঝে অভিযোগের চিঠি আসতে লাগল। যে বুড়ো পাদরি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলেই তার ছেলের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, তিনিই চিঠি লিখে জানালেন যে, সূর্য এমন অবাধ্য হয়ে উঠছে যে তাকে আর স্কুলে রাখা সম্ভব হবে না। সূর্যর মতন শান্ত, ভদ্র ছেলের নামে অবাধ্যপনার অভিযোগ কল্পনাই করা যায় না। চিঠি পেয়ে বড়বাবু অবিলম্বে চলে গেলেন হাজারিবাগে। কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। সূর্যর পরীক্ষার তখন আট মাস বাকি।

ফিরে আসার পর বড়বাবুকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল। তার প্রশান্ত সুন্দর কপালে। প্রায়ই সিঁড়ি দেখা যায়। স্থির চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন।

এতখানি বয়স হলেও বড়বাবুর চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই, শরীরে নেই এক ছিটে মেদ, টকটকে গায়ের রং, কয়েকগাছি পাকাচুল এমনি ভাবে লুকিয়ে আছে। যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বড়বাবু একদিন চিররঞ্জনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, চিরু, ছেলেটাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো?

চিররঞ্জন কিছুই খবর রাখতেন না। বললেন, সূয্যি? কেন, তাকে নিয়ে চিন্তার কী হল?

বড়বাবু বললেন, এই ছেলেটাই আমার বন্ধন। ও যদি না থাকত, আমি যেমন খুশি জীবন কাটাতে পারতাম। যা টাকাকড়ি আছে তা নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম দেশ-বিদেশে। কিংবা কোনও যাত্রাদলে ভিড়ে গিয়ে ক্লারিওনেট বাজাতাম। কিন্তু এই ছেলেটার কথা ভেবে কিছুই পারি না। ছেলেটা ওর মায়ের সঙ্গ পায়নি, আমার কাছেই বা কতটুকু থেকেছে! অথচ ওরও তো জীবনে কিছু পাওয়া দরকার!

ছেলেটাকে কোনও একটা লাইনে দিয়ে দিন, তারপর নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াবে। কী পড়াবেন ঠিক করছেন?

সেটাই তো ঠিক করতে পারছি না। দেখো, এ-দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের কোনও রকম শিক্ষা দেবারই সুযোগ পায় না। আমার সব রকম সুযোগ আছে। আমি ওকে ডাক্তারি পড়াতে পারি, এঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে পারি, ব্যারিস্টারি পড়াবার জন্য বিলেত পাঠাতে পারি, কিংবা আই সি এস–কিন্তু বুঝতে পারি না কোন শিক্ষায় ও সত্যিকারের মানুষের মতন মানুষ হবে। দেখো চিরু, আমার এতখানি জীবনে আমি ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরেছি–এমন কয়েক জন মানুষ দেখেছি যাঁরা একবর্ণ লেখাপড়া শেখেননি, কিন্তু তারা দেবতুল্য মানুষ। তাদের মতো উদারতা, তাদের মতো

চরিত্রবল তো বহু শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেখি না। বিহারে রামপ্রসাদ পাণ্ডে, লক্ষ্ণৌয়ে হরিশ মজুমদার, ইমাম বক্স, হরিদ্বারের স্বামী অঘোরানন্দ।

শিক্ষিত লোকের মধ্যেও মহৎ মানুষের অভাব নেই। যেমন আশু মুখুজ্যের কথাই ধরুন না।

তুমি তো দেখছি খুব আশু মুখুজ্যের ভক্ত! ভদ্দরলোক কি তোমায় জামাই করতে চেয়েছিলেন নাকি?

আমাকে? আর তোক খুঁজে পেলেন না?

একবার ভেবেছিলাম, ছেলেটাকে আই সি এস-এর জন্য পাঠাব বিলেতে। কিন্তু মনস্থির করতে পারি না। আই সি এস হয়ে তো ইংরেজদের গোলামি করবে। আজ না হোক, দশ পনেরো কি কুড়ি বছর বাদে তো এ-দেশ স্বাধীন হবেই। তখন কি দেশের মানুষ ইংরেজদের এই গোলামগুলোকে সহ্য করবে? এইসব আই সি এস-দের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না? দেখো অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষবাবু এঁরা আই সি এস পাশ করেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন।

কুড়ি বছরের মধ্যে এ-দেশ স্বাধীন হবে? বড়বাবু, আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন? দেশ স্বাধীন করবে কে, ওই গান্ধী? না বোমা-ছোঁড়া ছেলেগুলো? সূর্য সেন টেনকে যেমন ফাঁসিতে ঝোলাল, তেমনি গান্ধী-সুভাষ বোসকেও ইংরেজ যে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেনি, সেটা ইংরেজদের দয়া। লালা লাজপত রায়ের মতন মানুষকে লাঠিপেটা করে মেরে ফেলল, কী হল তাতে?

সারা পৃথিবীতে একটা ওলটপালট আসছে। আমাদের দেশটাও বাদ পড়বে না। জার্মানিতে দেখছ, হিটলার কী রকম শক্তিশালী হয়ে উঠছে? একটা সামান্য কর্পোরাল আজ সে-দেশের সর্বময় কর্তা। অস্ট্রিয়াকে গ্রাস করেছে, এবার অন্য দিকে হাত বাড়াবে। তোমার মনে আছে নাইনটিন ফোরটিনের কথা? যতীন মুখুজ্যে আর তার দলবল জার্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার তাল করেছিল। সেবার পারেনি, পরিকল্পনা ফাস হয়ে গিয়েছিল। আবার কি কেউ সে রকম চেষ্টা করবে না ভাবছ? জার্মানরা ইংরেজদের ল্যাজে আগুন লাগাবার জন্য ভারতে গণ্ডগোল পাকাবার সুযোগ। ছাড়বে না। রাশিয়ার লেনিন সাহেবও তো প্রথমে জার্মানির সাহায্য নিয়েছিলেন। তারপর ধাঁ ধাঁ করে দেশটাকে কী করে ফেললেন!

বড়বাবু আপনি সূয্যিকে ডাক্তারি পড়ান। আমার বাবার খুব শখ ছিল, আমার ভাইদের মধ্যে কেউ ডাক্তার হোক। তা তো আর হল না। সূয্যিকে ডাক্তারি পড়ান, সেটাই সব। দিক থেকে ভালো হবে। বুড়ো বয়সে আপনাকে দেখতে পারবে।

বুড়ো বয়সে আমার ছেলে আমাকে দেখবে, সে প্রত্যাশা আমি করি না। বুনো জন্তুরা কী করে জানো তো, তারা যখন মৃত্যুর সময়টা টের পায়-তখন সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়ে নির্জন কোনও জায়গায় গিয়ে মরে। আমিও সবার চোখের আড়ালে গিয়ে মরব। দেখো, আমার জন্মরাত্রে আমার মা মারা যান, আমার বাবা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আমার কোনও মাতৃঋণ কিংবা পিতৃঋণ নেই। সূয্যির কপাল ভালো যে আমি ওকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিইনি কিংবা অনাথ আশ্রমে ভরতি করে দিইনি। জীবনে যাদের কাছ থেকে আমি স্নেহমমতা পেয়েছি-তাদের ঋণ শোধ করার জন্যই আমি সূয্যিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। অবশ্য সূয্যির কিছু টাকাকড়ি আছে আমার কাছে ওর মায়ের অনেক মোহর ছিল-যে-দিন চাইবে, সেদিনই দিয়ে দেব।

বড়বাবু, আপনি আবার একটা বিয়ে করুন।

চিররঞ্জনের এই কথা শুনে বড়বাবু একটু চমকে উঠলেন। তারপর বললেন, হঠাৎ এই বদবুদ্ধি দিচ্ছ কেন আমাকে?

আপনার কথাবার্তা একটু যেন কেমন কেমন শোনাচ্ছে। আপনার একটা কিছু টান থাকা দরকার! আপনার বয়সে তো কত লোক আবার বিয়ে করছে।

পাত্রী টাত্রি আছে নাকি তোমার হাতে?

একবার খবর ছড়িয়ে দিলে দেখবেন কত ঘটক এসে চিলুবিলু করবে আপনাকে নিয়ে।

তাই বলো। আমি ভাবলাম, তুমি নিজেই বুঝি ঘটকালির পেশা ধরলে। একটা বয়স এসে গেলে সবকিছু সম্পর্কেই টান কমে যায়। লালসা যাদের বেশি তারা বুড়ো বয়সেও মেয়েদের নিয়ে মজে থাকে। যেমন পেটুকরা বুড়ো বয়সেও বেশি খায়। এই বয়সে ধর্মকর্ম নিয়েও অনেকে মেতে থাকে, আমি তো সেদিকেও তেমন মন বসাতে পারলাম না। কেউ কেউ দেশ উদ্ধার করার জন্যও মাতে। আমার ইচ্ছে করে কী জানো, সারা দিন চুপ করে বসে থাকি-সারা জীবনের সব ঘটনার কথা ভাবি-খুঁজে দেখি, কোথায় আমার ভুল হল। প্রবৃত্তিবেগ মানুষকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে সে যাবেই। মেয়েদের নিয়ে একসময় খুব মেতে ছিলুম, শরীরে যতখানি আগুন জ্বলে সব জ্বলিয়েছি-তৃষ্ণা এখনও মেটেনি, প্রবৃত্তিবেগ তেমন প্রবল নয় বলে বিয়ে করতে চাই না বা রক্ষিতা রাখতে চাই না। যৌবনবতী রূপসি মেয়েছেলে দেখলে চোখ জুড়োয়-কিন্তু মনে মনে ভাবি, এরা আর আমার নয়, এদের জন্য আমার ছেলের বয়সি ছেলেরা বড় হচ্ছে। আমি পয়সা দিয়ে ও রকম দুটো-একটা মেয়েকে কিনতে পারি, কিন্তু ওরা আর আমার হবে না। বুড়োর জন্য একটা বুড়ি দরকার-তা বলে কি আমি বুড়ি বিয়ে করব?

আপনি বুড়ো হননি! তা হলে আমরা তো থুত্থুড়ে–

ও-সব কথা বাদ দাও। তুমি তোমার ছেলেকে কী পড়াচ্ছ?

বাদল? ও তো মাত্তর ক্লাস ফাঁইভে পড়ে। এখন কী ভাবব?

এখন থেকেই ভেবে রাখা ভালো। কম বয়স থেকেই ছেলেদের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঢুকিয়ে দিতে হয়।

আমি ওকে কিছুই পোব না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত চালাব–তখন যদি ওর কিছু জ্ঞানগম্যি হয়, তা হলে নিজেই নিজের লাইন বেছে নেবে। আমার ছোটভাই রঞ্জুর খুব শখ ছিল আর্ট স্কুলে পড়ার–আমার বাবা তাতে রাজি হয়নি–ছেলেটা সেই রাগে অভিমানে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমি আমার ছেলেকে বাধা দেব না, তার যা খুশি পড়বে। পড়ার খরচও নিজেকেই চালাতে হবে–আমি ততদিন বাঁচব কি না ঠিক নেই।

কেন, তোমার ছেলেকেই ডাক্তারি পড়িয়ে।

ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে হলে আমাকে টাকাপয়সা রোজগার করা শুরু করতে হবে। তা কি আর আমি পারব?

.

স্বল্পভাষী সূর্যকুমার স্কুলের ছেলেদের সঙ্গেও বেশি মিশত না। নিঃশব্দে স্বাবলম্বী জীবন যাপন করাই ছিল তার স্বভাব। কিন্তু স্কুলজীবনের শেষ দিকে সে কিছু বকাটে ছেলের পাল্লায় পড়ে।

তার স্কুলে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই বেশি পড়তে আসত। যে-সব সরকারি অফিসারের বদলির চাকরি, তাদের ছেলেরাও যেমন ছিল, তেমনই ছিল বিহারের নানা ছোটখাটো জমিদারের ছেলেরা। এদের মধ্যে অনেকের বংশেই প্রথম লেখাপড়ার প্রচলন। বংশের প্রথম কেউ স্কুলে পড়তে এলে দু'রকম ফল দেখা যায়। হয় সে-ছাত্র তাদের পরিবারের সকলের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত মেধা একা তার মাথায় নিয়ে পড়তে এসে দারুণ ব্রিলিয়ান্ট হয়, অথবা তার মাথায় সমস্ত জ্ঞানের কথাই ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। যেমন, ক্রিশ্চান মিশন বা অনাথ আশ্রমের কয়েকটি ছেলে, তাদের মধ্যে দু-তিন জন সাঁওতাল-পড়াশুনোয় চমকপ্রদ ফল করেছে–আবার কয়েকটি জমিদারের ছেলে একেবারে মগজে কিছু ঢোকায়নি–কোনওক্রমে ইংরেজিতে কথা বলতে শেখাই তাদের একমাত্র লাভ।

সেই রকম কয়েকটি ছেলে কড়া নিষেধ সত্ত্বেও হস্টেল থেকে রাত্তিরবেলা বাইরে বেরিয়ে যেত। তারা সূর্যকুমারকেও প্রলুব্ধ করে। সূর্যকুমার শুধুমাত্র আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের দুঃসাহসিকতায়। হস্টেলের প্রধান দরজা দিয়ে সন্ধ্যাবেলা বেরোবার কোনও উপায় নেই। কম্পাউন্ডের চার পাশে উঁচু দেওয়াল। তিনটি ছেলে অন্ধকার হয়ে গেলে উঠে পড়ত পাঁচিলের পাশে একটা আমগাছে। সেই গাছের একটি ডাল ধরে ঝুলে পড়লে পাঁচিলের ওপর পা রাখা যায়। পাঁচিলের ওপর থেকে লাফ দিলে পা ভাঙা সুনিশ্চিত। সেই পাঁচিল ধরে বাইরের দিকে ঝুলে পড়ে শেষ পর্যন্ত ধুপ করে নেমে পড়া। তারপরই ছুট। ফেরার সময় ব্যাপারটা আরও কঠিন। তখন একজনের কাঁধে একজনকে উঠে দাঁড়াতে হয়–শেষ জনকে তুলতে হয় হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে। প্রথম প্রথম এই নৈশ অভিযানের লক্ষ ছিল বাজারের দোকানগুলিতে গিয়ে পুরী-মেঠাই খাওয়া আর সিনেমা হলে গিয়ে চঁচামেচি করা। ক্রমে ক্রমে অন্য ব্যাপারও এসে যায়।

অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই সূর্যকুমার ওদের দলে ভিড়ে গেল। পাঁচিল টপকে নেমেই ছুটতে ছুটতে ওরা এল বড়রাস্তায়। কাঁচারি পেরিয়ে, ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে গিয়ে ওরা। হাজির

হত একটা একতলা বাড়িতে। সে বাড়িতে ভেতরের ঘরে হ্যারিকেন জ্বেলে কয়েকটি লোক জুয়া খেলে। হরতন-চিড়িতন-রুহিতন-ইস্কাবন আঁকা একটা বোর্ডের ওপর মস্ত বড় একটা ছক্কা উলটে ফেলে জুয়া।

সূর্যকুমারের কিশোর মন এই অনিশ্চিত খেলাটায় বেশ আকর্ষণ পেয়ে গেল। বড়বাবু তাঁর ছেলেকে টাকা পাঠাবার ব্যাপারে অনুদার ছিলেন না সূর্যকুমারের হাতে যথেষ্ট টাকা থাকত। গভীর মনোযোগে সে বসে যেত জুয়া খেলতে। প্রতি রাত্রে সব টাকা। হারত।

জুয়ার পরবর্তী ধাপ নারী। সূর্যকুমারের দুর্দান্ত প্রকৃতির বন্ধুরা মেয়েদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। যতরকম নাম আছে এবং নারী-পুরুষের যত রকম ক্রিয়াকলাপ আছে সেসব আলোচনায় খুবই আনন্দ পেত। পিউবার্টি আসার পর পরই এই ঝোঁকটা বেশি থাকে। এইসব আলোচনা হিন্দিতেই বেশি হত–সূর্যকুমারের বুঝতে অসুবিধে হত না। কারণ ছেলেবেলা থেকেই সে উর্দু জানে। অন্যদের তুলনায় এইসব আলোচনায় সূর্যকুমারের। ওপর প্রতিক্রিয়া হত অন্য রকম। শৈশব থেকেই তার কোনও পারিবারিক জীবন নেই, মা-কে মনে নেই, কোনও নারীকেই কাছাকাছি দেখেনি কখনও, সুতরাং এই বিষয়টি তার অচেনা। শিশু যেমন আগুন জল, খাদ্য এবং লাল, নীল প্রভৃতি রং ক্রমশ আলাদা আলাদা করে চেনে–সূর্যকুমারও তেমনি ভাবে মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কথা শুনতে। লাগল ঘোর বিস্ময় নিয়ে।

সহপাঠীদের এইসব কথাবার্তা সূর্যকুমারের মনের মধ্যে ছাপ ফেলেছিল। কেন না, সেবারই কলকাতায় এসে সে শ্রীলেখার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখনও সেই গম্ভীর স্বভাব থাকলেও মাঝে মাঝে সে শ্রীলেখার বুকের দিকে চেয়ে থাকত একদৃষ্টে। যেন একটা চুম্বক তাকে টানছে। বাদল একদিন দেখেছিল, সূর্যকুমার তার বড়দির কোমর ধরে উঁচু করে তুলেছে। শ্রীলেখা ছটফট করতে করতে বলছে, এই কী হচ্ছে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মা এসে পড়বে। সূর্যকুমার শ্রীলেখাকে মাটিতে নামিয়ে জোর করে তার ঠোঁট চুষতে

শুরু করে। শ্রীলেখা তখন ধরা-পড়া পাখির মতন ছটফট করছিল। শ্রীলেখা তখন ক্লাস নাইনে পড়ে–তার বিয়ের জন্য পাত্র দেখা চলছিল। পরে অবশ্য ব্যাপারটা আরও অনেক দূর গড়ায়।

জুয়া খেলার দলবল একদিন একটি মেয়েকে এনে হাজির করে। জরির চুমকি বসানো কাঁচুলি ও ঘাঘরা-পরা সেই মেয়েটি যারপরনাই নির্লজ্জ। তার পেশা নাচ দেখানো, আসল উদ্দেশ্য হস্টেলে-থাকা এইসব বড়লোকের ছেলেদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব টাকাপয়সা খিচে নেওয়া। সূর্যকুমারের সহপাঠীদের মধ্যে দু'-এক জন বেশ বয়স্ক, দামড়া ধরনের ছেলে, আদিরসে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, নাচনেওয়ালির সঙ্গে সাক্ষাতের দিন কানে আতরমাখা তুলো খুঁজে আসতেও জানে।

হ্যারিকেনের বদলে সে-দিন হ্যাঁজাক জ্বালানো হয়েছিল। নাচ শুরু করার আগে মেয়েটি পায়ের ঘুঙুর ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে আর টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো তীক্ষ্ণ চোখে সকলের দিকে তাকায়। একজন লোক একটা বোতল থেকে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে, আর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে তবলা বাঁধছে। তারপর 'বানাওরে বাতিয়াঁ বলো কাহেকা ঝুঁটি' ধরনের গানের সঙ্গে নাচ শুরু হয়।

অনিন্দ্যকান্তি কিশোর সূর্যকুমার উদগ্র কৌতূহল নিয়ে বসে থাকে। নাচের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাঘরা উড়তে থাকে, হাঁটু থেকে উরু পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়–ফরসা মেয়েটির পা দুখানি পারস্য দেশের বাঁকা ছুরির মতন ঝলসায়। মেয়েটি তার দৃষ্টিতে চতুর্দিকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সূর্যকুমারের বুক কাঁপছে, রক্ত চলাচল অসম্ভব দ্রুত, শরীরের মধ্যে কী যেন একটা ছটফট করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেয়েটির ঘাঘরাকে মনে হচ্ছে। একটা রহস্যের যবনিকা–আরও অনেক অনেক রহস্য চাপা রয়েছে, সময় দুলছে, ঘর দুলছে, যেন পরের মুহূর্তেই পৃথিবীতে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। সূর্যকুমারের মুখখানা সাদা

কাগজের মতন ফ্যাকাশে। যেন সমস্ত অন্তরীক্ষ সাগ্রহে লক্ষ করছে এই কিশোরের সুশিক্ষার দৃশ্য।

সে-দিন ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই ধরা পড়ল সূর্যকুমার। অন্য সঙ্গীরা পালাতে পেরেছিল, কিন্তু সূর্যকুমার সে-দিন এক গেলাস সিদ্ধি পান করার ফলে সুস্থ ছিল না।

তিন জন ফাদার সারা রাত ধরে সূর্যকুমারকে জেরা করেন। কে কে তার সঙ্গে গিয়েছিল? কোথায় গিয়েছিল? সূর্যকুমার একটিও কথা খুলে বলেনি। প্রত্যেক বার বলেছিল, সে একা দোষী, সে যেখানে গিয়েছিল সেখানকার ঠিকানা বলবে না।

পাদরিরা মারধর করেন না। মিষ্টি কথায় অনেক শেখাবার চেষ্টা করছিলেন, পাপের ভয় দেখিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমারের আত্মা পরিশুদ্ধ করার জন্যে পুরো এক দিন অনাহারে এবং তিন দিন তিন রাত একতলার একটি নির্জন ঘরে যিশুর মূর্তির সামনে প্রার্থনা করতে হয়। তারপর প্রধান পাদরি সূর্যকুমারকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এ রকম কাজ আর কখনও করবে?

সূর্যকুমার মাথা হেলিয়ে বলেছিল, না।

পাদরিদের নজর একটু শ্লথ হতেই প্রথম রাত্তিরে সুযোগ পেয়েই সূর্যকুমার পাঁচিল টপকে আবার সেখানে চলে যায়।

ওই জুয়া খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে মেশার সময়েই এমন একটা ঘটনা ঘটে যাতে সূর্যকুমারের জীবনটা বদলে যায়।

একদিন ওই জুয়ার আড্ডায় পুলিশের হামলা হল। পুলিশ সম্পর্কে এমনিতেই তখন ভীতি ছিল যথেষ্ট, তার ওপর হস্টেলের ছাত্রদের পক্ষে পুলিশের হাতে ধরা পড়াই ছিল চরম সর্বনাশের ব্যাপার। পাদরিদের অভিযোগ অভিভাবকরা বিশ্বাস না-ও করতে পারে-কিন্তু পুলিশের সংসর্গে এলে আর রক্ষে নেই।

ছাত্ররা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল। যে-দিকেই যায়, পুলিশের হুইসেলের আওয়াজ শুনতে পায়। মাঠঘাট পেরিয়ে ওরা ছুটছে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

হাজারিবাগে ধনী ব্যক্তিদের অনেকগুলো বাড়ি আছে-সারা বছর সেগুলি প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। সে রকম একটি বাড়ির বাগানে সূর্য আর একটি ছেলে ঢুকে পড়ল। এবং বাড়ির প্রধান দরজা খোলা দেখে আর কোনও কিছু না ভেবে ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।

গোটা বাড়িটা অন্ধকারই ছিল। হঠাৎ টর্চ জ্বলে উঠল। সূর্যকুমার আর তার সঙ্গী দেখল, সিঁড়ির ওপর মালকোঁচা মেরে ধুতি-পরা, গেঞ্জি গায়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার বাঁ হাতে টর্চ, ডান হাতে রিভলভার। লোকটি কর্কশ গলায় বললে, হাত তোলো।

ক্রমশ ওপর থেকে চার-পাঁচ জন লোক নেমে এল। প্রত্যেকেই সবলকান্তি যুবাপুরুষ। ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, ঠিক ডাকাতের মতন চেহারা নয়। দু'জনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। যার চেহারা দলপতির মতন, সে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করল, কী চাও এখানে?

সূর্যকুমারের সঙ্গী হাউমাউ করে হিন্দিতে বলল, আমাদের বাঁচান। আমাদের পুলিশ তাড়া করেছে।

পুলিশের নাম শুনেই লোকগুলোর মুখ অন্য রকম হয়ে গেল। দু'জন চলে গেল বাইরে লক্ষ করতে। আর ক'জন ওদের জেরা করতে লাগল। প্রথমত ওদের বিশ্বাসই করানো যায় না যে, সদর দরজাটা খোলা ছিল। ওদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় ধারণা, দরজা বন্ধ ছিলই। জুয়ার আড্ডার কাহিনী শেষ পর্যন্ত বলে ফেলায় শেষ পর্যন্ত ওদের খানিকটা যেন বিশ্বাস হল। পুলিশের হুইসেল আর শোনা যাচ্ছে না।

দলপতি তখন অন্য লোকদের বললেন, এরা সাধারণ বকাটে ছেলে। এদের ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওরা ফিরে গিয়ে গল্প করবে। এসব ছেলেকে তো চিনি!

সূর্যকুমার কোনও কথা বলেনি। তার সঙ্গীই সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এবার সে বলল, কিসিকো নেহি বোলুঙ্গা। ম্যায় কসম খা রাহা।

দলপতি তখন বললেন, কারোকে যদি এ বাড়ির কথা বলিস, তোদের গলা কেটে নেব। কোনও দিন আর আসবি না, যাঃ!

ওই দলের একজন লোক সূর্যকুমারকে তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ করছিল। এবার সে বলল, হরদা, এই ছেলেটিকে কি ছাড়া ঠিক হবে? এ তো মনে হচ্ছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ওদের বিশ্বাস নেই।

সূর্যকুমারের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে। ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, আই অ্যাম নো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান! মাই ফাদার ইজ বেঙ্গলি ব্রামিন!

সেই লোকটি এগিয়ে এসে সূর্যকুমারের গালে এক চড় মেরে বলল, হারামজাদা, বাঙালি বামুনের ছেলে যদি হও-তা হলে বাংলা বলতেও শেখোনি?

১০. চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরই বাংলার তরুণ সমাজের এক অংশ কংগ্রেসের সংস্রব ছেড়ে আবার বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কথা চিন্তা করে। উনিশশো কুড়ি-একুশ সালের পর থেকে বিপ্লববাদ একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। গান্ধীজির আগমনের পরই ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নতুন রূপ এসেছিল। গান্ধীজি অক্লান্ত ভাবে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়ে বোঝাচ্ছিলেন অহিংসার শক্তির কথা। দু-চারটে বোমা-পিস্তলের চেয়ে দেশজোড়া গণআন্দোলন যে শাসক শক্তিকে বেশি ভয় পাইয়ে দিতে পারে, এটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। সমস্ত দেশকে তিনি করতে চেয়েছিলেন তার সংগ্রামের সাথী।

গান্ধীজিকে বিপ্লবীরা বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখেছে। এই মানুষটির ব্যক্তিগত সততা সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। এমন শান্ত ধরনের সাহসী মানুষ আগে কেউ দেখেনি। অথচ তিনি কী চান, তা সঠিক ভাবে বুঝতে পারেনি যুবসমাজ। তিনি কি চান ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা নামক বস্তুটা ভিক্ষে হিসেবে পেতে? তা কেউ দেয়? ভারতের বিশাল ধনভাণ্ডার ইংরেজ এমনি এমনি ছেড়ে যাবে? সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া সিংহ কখনও পশ্চাদপসরণ করে? এর উত্তরে গান্ধীজি একবার বলেছিলেন,

“Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword-I ask her to adopt non-violent non-cooperation.”

অস্ত্র যখন নেই, তখন অহিংস সত্যাগ্রহই তো শ্রেষ্ঠ উপায়। বিপ্লবীদের তখন প্রধান সম্বল রডা কোম্পানির কাছ থেকে লুট করা পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল। গান্ধীজি বিপ্লববাদকে চাপা দিতে চেয়েছেন, নিন্দে করেছেন, কলকাতা করপোরেশান নিহত শহীদদের নামে শোক প্রস্তাব নিলে চটে গেছেন-অথচ জেলখানা থেকে বিপ্লবী বন্দিদের মুক্ত করার জন্যও চেষ্টা করেছেন।

উনিশশো কুড়ি-একুশ সালে বিপ্লববাদ একটু গা ঢাকা দেয়। অনবরত জেলে যেতে যেতে বিপ্লবী নেতারা ক্লান্ত। পুলিশের কাছে সবাই পরিচিত, কোথাও একটা অ্যাকশন হলেই সব্বাইকে ধরে জেলে পুরে দেয়। এই সময় চিত্তরঞ্জন সবাইকে আহ্বান জানালেন কংগ্রেসের আশ্রয়ে এসে সংগঠন জোরদার করতে। প্রবীণ বিপ্লবীদের কাছে মনে হল, এ ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই তখন। পাঞ্জাব থেকে ভগৎ সিং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছে কয়েকটা বোমা ও পিস্তল চাইতে এলে তিনি বললেন, এখন মাথা গরম কোরো না। দলের সংগঠন সৎ না করে এখানে সেখানে এক-আধটা খুনজখম করলে পুলিশের অত্যাচারে আবার দল ভেঙে যাবে।

কিন্তু অতি তরুণরা এসব সাবধানী নীতি মানতে চায়নি। তারা ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত হচ্ছিল। দেশের জন্য প্রাণ দেবার দুর্দান্ত নেশায় তারা চঞ্চল। ফাঁসিতে মৃত্যুর চেয়ে গর্বের আর কিছু নেই তাদের চোখে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের পর বিপ্লবীরা আবার কংগ্রেস সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এল সারা দেশে তারা আবার আগুন জ্বালাল।

অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, আত্মোন্নতি সমিতি, মুক্তি সঙ্ঘ (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি ভি নামে পরিচিত) প্রভৃতি দলের নবীন বিপ্লবীরা আবার অ্যাকশন শুরু করল। চট্টগ্রামে সূর্য সেন স্থাপন করলেন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, লাহোরে শচীন সান্যালের নেতৃত্বে ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুক দত্ত, যতীন দাসেরা প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি।

দিল্লি অ্যাসেম্বলি হলের মধ্যে বোমা পড়ল, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বারান্দায় তিনটি ছেলে গুলির লড়াই চালিয়ে গেল। সারা দেশ এইসব সংবাদে সরগরম। উনিশশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এসে এইসব কর্মকাণ্ডে আবার একটু চাপ পড়ে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভেঙে যাওয়ায় পুলিশ আবার সবাইকে জেলে ভরেছে- বিপ্লবীদের ফাঁসি দিতে দেরি করেনি।

এইসব কাণ্ডে দেশের স্বাধীনতা কতটা ত্বরান্বিত হয়েছে সে প্রশ্ন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এইসব যুবাপুরুষদের অসম সাহসিকতা, নিষ্কলুষ আত্মত্যাগ ভারতবাসীর মনে একটা সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে দিয়েছিল ঠিকই। এরা দেশকে মা বলে জানত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে মৃত্যু জয় করার সাহস পেয়েছিল, পরজন্মে তীব্র বিশ্বাস ছিল। সবাই বিশ্বাস করত যে, আবার ফিরে আসব। অনেক ক্ষেত্রেই এরা ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছে, কারণ এদের ফাঁসির ঘটনা এবং শেষ বার্তা প্রচারিত হয়ে যেত সারা দেশে–তাতে নতুন ছেলেরা প্রেরণা পেত।

এ-সবই জানা ইতিহাস। তবু তখনকার ছেলেদের রোমান্টিক মনে এই সব মৃত্যুজিৎ যুবকদের জীবন ও কাজ কী রকম উদ্দীপনার সৃষ্টি করত সেটা বোঝাবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করা দরকার।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল লাহোরের মানুষ–পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিপেটা করে হাত-পা ভেঙে দিল অসংখ্য মানুষের। লালা লাজপত রায় তো সেই মার খেয়ে মারাই গেলেন। এই অত্যাচারের নায়ক পুলিশ কমিশনার স্কট। হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি সিদ্ধান্ত নিল স্কটকে খুন করার। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছ থেকে ভগৎ সিং শেষ পর্যন্ত কিছু পিস্তল ও বোমা আদায় করেছিল। পুলিশ দপ্তরের সামনের রাস্তায় উনিশশো আঠাশের ডিসেম্বরের এক বিকেলে দাঁড়িয়ে রইল ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ। সাহেব বেরিয়ে আসতেই তিন জন তিন দিক থেকে গুলি চালাল–রক্তাপ্লুত অত্যাচারীকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল ওরা–কেউ ধরা পড়ল না। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল ওরা স্কটের বদলে স্যান্ডার্স নামে আর একজন অফিসারকে মেরেছিল।

পরের বছর দিল্লিতে অ্যাসেম্বলিতে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটল, তারপরই সমস্ত হল ঘর ভরে উড়তে লাগল লাল ইস্তাহার। সেই ইস্তাহারের প্রথম বাক্য, বধিরকে শোনাবার জন্য এই রকম জোর আওয়াজ দরকার। পুলিশ ধরতে পারেনি, তবু ধরা দিলেন ভগৎ

সিং এবং বটুক দত্ত। গান্ধীজির প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও ফাঁসি হয়ে গেল ভগৎ সিং আর দু'জনের। অন্যদের দ্বীপান্তব।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সময়েই সেখানকার জেলখানায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন কলকাতার যতীন দাস। মানুষের প্রতি মানুষের যা ব্যবহার পাওয়া উচিত জেলখানায় তার চিহ্নমাত্র নেই বলে তেষট্টি দিন না খেয়ে রইলেন। হাজার চেষ্টা করেও তার প্রতিজ্ঞা ভাঙা যায়নি। যতীন দাসের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে তার বৃদ্ধ পিতা হাত তুলে বললেন, ওঁ নারায়ণ। যে-দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশির হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার আদরের যতীনকে তোমার পায়ে দিলাম।

১৯৩০ সালে ইস্টারের ছুটির দিনে শীর্ণকায় প্রাক্তন স্কুলশিক্ষক সূর্য সেনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী চট্টগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে লুঠ করল অস্ত্রাগার। এই বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার হাতে পেয়েও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এঁরা করতে পারলেন না দু'-একটি সামান্য ভুলের জন্য।

অস্ত্রাগার আক্রমণের নিখুঁত পরিকল্পনা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা আগে থেকে খবর রাখেননি যে অস্ত্র আর গোলাবারুদ এক জায়গায় রাখা হয় না। সুতরাং অস্ত্র দখল করেও নষ্ট করে দিতে হল, কারণ রসদ পাননি। তাঁরা আর একটি ভুল করেছিলেন, তারা জানতেন না যে ইস্টারের ছুটিতে সাহেবরা ক্লাবে যায় না বাড়িতে উৎসব করে। তাই ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেও কারোকে পাওয়া গেল না।

তবু সূর্য সেন চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জালালাবাদের যুদ্ধে অন্তত একবার পরাজিত করেছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে। লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিকে সবাই মনে করল মহাকাব্যের বীর পুরুষদের মতন। এবং সূর্য সেন প্রবাদপ্রসিদ্ধ নায়ক।

ওই বছর অগাস্ট মাসে ঢাকার হাসপাতাল পরিদর্শনে গেছেন পুলিশের ইন্সপেক্টার লোম্যান এবং ঢাকা জেলার পুলিশসুপার হাডসন। মেডিক্যাল স্কুলের সুদর্শন ছাত্র বিনয় বসু একলা রিভলভার নিয়ে আক্রমণ করল তাদের চোখের নিমেষে। সবাই দেখল, সব

প্রহরীদের তুচ্ছ করে বেরিয়ে যাচ্ছে এক তরুণ যুবা। লোম্যান নিহত, হাডসন আহত, বিনয় পলাতক। চাষির ছদ্মবেশে কলকাতায় পালিয়ে এল সে। বিনয়ের এই চমকপ্রদ কীর্তিতে সারা দেশ স্তম্ভিত। বিনয়ের মাথার দাম তখন দশ হাজার টাকা। শরৎ বোস, আচার্য পি সি রায় গোপনে পরামর্শ দিলেন বিনয়কে স্মাগল করে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া, হোক, না হলে তাকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু বিনয় বাঁচতে চায়নি। বাদল আর দীনেশকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার গেল রাইটার্স বিল্ডিংয়ে–ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করল। তারপর সারা রাইটার্স বিল্ডিং কাপিয়ে দিল বন্দেমাতরম ধ্বনিতে। বিনয়ের লক্ষ কখনও ব্যর্থ হয়নি, একমাত্র সে ব্যর্থ হয়েছিল আত্মহত্যা করতে গিয়ে। একই সঙ্গে সায়েনাইড খেয়ে মাথায় গুলি চালিয়েছিল ওরা তিন জন বাদল সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়-বিনয় এবং দীনেশ বিষ ও গুলির প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠেছিল। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর বিনয় মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলে সেলাই ছিঁড়ে দেয়-সে জেলখানায় যাবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল, যায়নি।

ফাঁসির আগে দীনেশ গুপ্ত তার বউদির কাছে চিঠিতে লিখেছিল, আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারও নাই। সে আবৃত্তি করত,

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারী–
এ যে তোমার তরবারি।

এই দেশেই সে আবার জন্মাবে, আবার সুখী স্বাধীন ভারতবর্ষে ফিরে আসবে–এ-সম্পর্কে তার কোনও সন্দেহই ছিল না, তার কারণ পরজন্ম তত্ত্বে তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। বউদিকে সে লিখেছিল, দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কী বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তার রু কবজ করিতে

আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, 'অ্যায় রুহ্, নিকাল ইস কালিবসে চল খুদাকা জান্নৎমে।' অর্থাৎ তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল। তাহা হইলে বোঝা গেল মানুষ মরিলেই তার সব শেষ হইয়া যায় না; মুসলমান ধর্মের এই বিশ্বাস আছে। খ্রিস্টান ধর্ম বলে,

'Very quickly there will be an end of thee here; consider what will become of thee in the next world.'

বোঝা গেল খ্রিস্টধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না।...গীতা বলিয়াছেন 'শাস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এ-আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী!' ...এ তিন ধর্মের কোনও একটি মানিলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই।'

কলকাতা থেকে বি এ পাশ করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে চলে এলেন পলাতক সূর্য সেনের খোঁজে। এত বড় ব্রিটিশ শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে সূর্য সেন তখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং দল সংগঠন করে ছেলেদের অ্যাকশানে পাঠাচ্ছেন। প্রীতিলতা সূর্য সেনকে চোখে দেখার আগেই ব্রত নিয়েছিলেন, এই মানুষটির নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দেশের জন্য কোনও একটা কাজ করে যাবেন। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে পাঠালেন পাহাড়তলির ইয়োরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে-যে ইয়োরোপিয়ান ক্লাবের সদস্যরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরই চমকপ্রদ দ্রুত গতিতে এসে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই কঠিন কাজে সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নেত্রী করে পাঠালেন একটি বিশেষ কারণে-যাতে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে যে বাঙালি মেয়েরাও বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যেহেতু ধরা না পড়লে প্রীতিলতার অংশগ্রহণের কথা কেউ জানবে না-তাই ইয়োরোপিয়ান ক্লাবে সার্থক আক্রমণ চালিয়েবহু জনকে রিভলভারের গুলিতে হতাহত করে-পালাবার পথ খোলা থাকলেও প্রীতিলতা বিষ খেলেন। তার শরীর তল্লাস করে পাওয়া গেল, তার

নিজের লেখা ইংরেজি ঘোষণাপত্র। যার প্রথমেই আছে-'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। আমি একজন সৈনিক। আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি।'

এদিকে, পর পর তিন বছরে মেদিনীপুরের তিন জন ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়। ১৯৩১-এ পেডি, ১৯৩২-এ ডগলাস, ১৯৩৩-এ বার্জ। ডগলাসকে খুন করে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল-প্রভাংশু পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কিন্তু পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় প্রদ্যোৎ ধরা পড়ে। তার ফাঁসি হয়। এরা কেউই গুন্ডা বা ডানপিটে ধরনের ছেলে ছিল না-এরা আদর্শব্রতী, স্বপ্ন-দেখা যুবক। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জেলখানা থেকে তার মা-কে লিখেছিল:

'মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনও মরতে পারে? আজ চারি দিকে চেয়ে দেখো, লক্ষ লক্ষ 'প্রদ্যোৎ' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয় অমর হয়ে-বন্দেমাতরম!'

বার্জ হত্যা মামলায় ফাঁসি হয় রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং নির্মজীবন ঘোষের। ফাঁসির আগে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী তাঁর মা-কে লিখেছিলেন, 'এই সব পেয়েছির দেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, তথাপি আমি নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি, আপনার ঘর কখনও অন্ধকার হবে না।...মা, ফিরে আসবার যদি কোনও পথ থাকে, তবে এই সব পেয়েছির দেশে আবার ফিরে আসব-তখন চরণে স্থান দেবেন।'

কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে মেরে এল দুটি মেয়ে, শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী। তখন অনেক মেয়েই অংশ নিয়েছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার-এইসব বীরাঙ্গনার নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কেউ হারমোনিয়ামের মধ্যে রিভলভার লুকিয়ে নিয়ে যায়, কেউ কনভোকেশনের সময় সরাসরি গভর্নরকে গুলি করে।

১৯৩৪-এ দার্জিলিংয়ের রেসকোর্সে কয়েকটি ছেলে আর মেয়ে গুলি ছুঁড়ে মারতে গেল গভর্নর জন এন্ডারসনকে। সেই মামলায় ফঁসি হয় ভবানী ভট্টাচার্যের। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ এই নবীন যুবকটি মৃত্যুর আগে তার ছোটভাইকে পোস্টকার্ড লিখেছিল:

‘অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায় সাধক সেখানে সিদ্ধি লাভ করে। আজ আমি বেশি কথা লিখব না, শুধু ভাবব। মৃত্যু কত সুন্দর!’

সূর্য সেন ধরা পড়ার পর বিপ্লবীরা বেশ খানিকটা দমে গেল। এমন একটা প্রায় অলৌকিক বিশ্বাস লোকের মনে জন্মে যাচ্ছিল যে, সূর্য সেনকে ধরার ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু সূর্য সেনেরও ফাঁসি হয়ে গেল ১৯৩৪ সালে। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ও গভর্নর পর্যায়ে শারীরিক আক্রমণের ফলে পুলিশ খেপে উঠে সারা দেশ তছনছ করে ফেলল, গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল গুপ্তচর। বিপ্লবীরা অধিকাংশই জেলে বাকিরা আত্মগোপন করলেন। সমগ্র দেশে নেমে এল শ্মশানের শান্তি।

কিন্তু যুবকদের অদম্য প্রতিরোধ শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়েছিল। ফাঁসির আগে কারাগার থেকে সূর্য সেন পাঠালেন তার শেষ বাণী:

‘আমার শেষ বাণী–আদর্শ ও একতা।

ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে।...এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? শুধু একটিমাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালি স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথমে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহভরে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম।...বন্ধুগণ, ওঠো, জাগো, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।...

বিদায়!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দে মাতরম।’

সূর্য সেনের এই বাণী ব্যর্থ হয়নি। বস্তুত, প্রতিটি মৃত্যু, প্রতিটি আত্মদানইনতুন প্রেরণা দিয়েছে। কয়েক বছর একটু সুপ্ত থাকার পর সাম্রাজ্য-বিরোধী লড়াইতে আবার অস্ত্রের

ঝঞ্ঝনা শোনা যায়। আবার বুলেট, বিস্ফোরণ, রক্তপাত–এরই পরিণতি বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন।

১৯৩৮ সালের শেষ দিকে কয়েকটি যুবক হাজারিবাগের জেল ভেঙে বন্দিদের মুক্ত করার এক পরিকল্পনা নেয়। হাজারিবাগের দুটি বাগানবাড়িতে ছিল তাদের আস্তানা। তারা দিনেরবেলা কক্ষনও বাইরে বেরোত না, স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও তারা বিশেষ যোগাযোগ রাখেনি।

সূর্যকুমার আর তার বন্ধু ছুটতে ছুটতে এদের গোপন আস্তানায় গিয়ে পড়ে হঠাৎ। ওই বাড়িতে ওঁদের উপস্থিতির কথা ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কায় ওঁরা ছেলেদুটিকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছিলেন। সাহেবি স্কুলে পড়া এইসব বড়লোকের বাচ্চাদের ওঁরা বিশ্বাস করবেনই বা কী করে? শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমারকে ওঁরা ভোররাত্রি পর্যন্ত আটকে রেখে জেরা করলেন–সূর্যকুমারের চেহারায় ও কথাবার্তা শুনে ওঁদের সন্দেহ হয়েছিল।

১১. দলের নেতার নাম হরকুমার

দলের নেতার নাম হরকুমার। মানুষটি অসম্ভব রোগা, গলার অ্যাডমস অ্যাপেল বা কণ্ঠমণিটি অনেকখানি বেরিয়ে আছে, কাঁধদুটো এমন বেখাপ্পা ধরনের উঁচু যে মনে হয়, হাতের বদলে দুটি ডানা লাগানো আছে। কিন্তু হরকুমারের চোখের দৃষ্টি তীব্র, বেশিক্ষণ চোখাচোখি করে থাকা যায় না। হরকুমার কঠোরভাষী নন, বরং কথা বলার মধ্যে একটা ক্লান্ত ভঙ্গি আছে। মাঝে মাঝেই কাশির দমক ওঠে, তখন জলের গেলাসে চুমুক না দিলে আর কথা বলতে পারেন না।

মেঝের ওপর ছেঁড়া শতরঞ্চি পাতা। হরকুমার সূর্যকে বললেন, বোসো ওখানে।

এই দলের আর চারজনের নাম পরেশনাথ, বিষণ সিং, ব্রজগোপাল এবং আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিনকে সবাই মাস্টারসাহেব বলে ডাকে।

আলিমুদ্দিনসাহেব বললেন, হরদা, আপনার মনে আছে, এই রকম একটা ছোঁড়াই মজঃফরপুরে পুলিশের ইনফর্মার ছিল?

হরকুমার ক্লান্ত ভাবে বললেন, হু। এই যে ছেলে, তোমার নাম কী?

সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

বাবার নাম কী? কী করেন তিনি? কোথায় থাকেন?

অনেকক্ষণ ধরে জেরা করা হল সূর্যকুমারকে। সূর্যকুমারের উত্তরগুলো শুনে ওঁরা খুব একটা সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। এ-ছেলেটির ভাবভঙ্গিই একটু বিচিত্র। অনেক কথার উত্তর দেয়, অনেক কথার উত্তর দেয় না। সবকিছুই যেন তার পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করছে। এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় শতরঞ্জির ওপর বসা পাঁচ জন অপরিচিত মানুষ-একজনের কোলের ওপর তখনও পিস্তল রাখা-কিন্তু সূর্যকুমার এতে ভয় পাবার বদলে আকৃষ্ট হয়েছিল বেশি। সে এক একবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলের মুখের দিকে দেখছিল।

হরকুমার বললেন, ছেলেটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ও যখন পাদরিদের ইস্কুলে পড়ে, ওকে কেউ সন্দেহ করবে না। শোনো খোকা, ইংরেজের গোলামি করার জন্য তুমি জন্মাওনি। যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য তোমাকে প্রাণও দিতে হয়-তবুও জানবে তোমার জীবনটা ধন্য। দরকার হলে সে রকম প্রাণ দিতে পারবে?

সূর্যকুমার কোনও উত্তর দিল না।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দীনেশ গুপ্তের নাম শুনেছ? সূর্য সেনের নাম শুনেছ?

সূর্যকুমার ওসব নাম শোনেনি।

আলিমুদ্দিন মাস্টার বললেন, এ দেখছি সূর্য নামের কলঙ্ক। লোকনাথ বলের ছোটভাই ট্যাগরা তোতা তোমারই বয়সি ছিল। সে কী রকম ভাবে লড়াই করতে করতে জান দিয়েছিল জানো?

হরকুমার বললেন, মাস্টারসাহেব, ওকে একটু একটু তালিম দেবেন। এই রকম ভাবেই তো দেশের ছেলে তৈরি করতে হবে। বিষণ সিং, ছুরিটা দাও তো!

বিষণ সিংয়ের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে হরকুমার সেটা এগিয়ে দিলেন সূর্যকুমারের দিকে। তারপর বললেন, নিজের হাতে তোমার একটা আঙুল চিরে একটু রক্ত বার করো তো! পারবে না?

সূর্যকুমার ছুরিটা নিয়ে ধরে পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ খ্যাচ করে বসিয়ে দিল বাঁ হাতের বুড়োআঙুলে। গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। দু-তিনজন চমকে হা হা করে উঠল, অত না, অত না!

হরকুমার শান্ত ভাবেই বললেন, ঠিক আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। একটু রক্ত পড়লে কিছু যায় আসে না। তুমি ওই রক্তের ছাপ দাও নিজের কপালে, তারপর বলল, আমি দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করিলাম। এ-শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি ইংরাজের দাসত্ব কিংবা পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করিব না! বন্দেমাতরম!

হরকুমার তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, না হে মাস্টারসাহেব, ছেলেটার মুরোদ আছে। দিন, এবার ছেলেটার হাতটা একটু ব্যান্ডেজ করে দিন!

এখানে একটা কথা বলা দরকার। সূর্যকুমারের তখনও তেমন বাংলা ভাষার জ্ঞান ছিল না যাতে দেশমাতৃকা, দাসত্ব শৃঙ্খল, সর্বস্বপণ ইত্যাদি শব্দের ঠিক ঠিক মানে বুঝতে পারবে। তা ছাড়া, ওই সব শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবও তার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়- কারণ ছেলেবেলা থেকে সে সে রকম কোনও শিক্ষা পায়নি। মাতৃভূমির কোনও ভাবমূর্তি তার চোখে ছিল না। ওই সব আঙুল কেটে প্রতিজ্ঞা ঐতিজ্ঞার ব্যাপারগুলো সে করেছিল

নিছক নতুনত্বের লোভে-তা ছাড়া নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক কাজ করার প্রতি তার সহজাত ঝোঁক ছিল। আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে ওই রিভলভার ছুঁড়তে দেবেন?

হরকুমার বলেছিলেন, হ্যাঁ দেব। বুকের মধ্যে যে-দিন শত্রুকে আঘাত হানার আগুন সত্যিকারের জ্বলে উঠবে-সে-দিন অস্ত্রও ঠিক পেয়ে যাবে।

একটু গালভারী ধরনের আদর্শবাদী বাক্য বলা স্বভাব হরকুমারের।

তারপর থেকে সূর্যকুমার সহপাঠীদের সঙ্গে জুয়ার আড্ডায় যাবার বদলে একা একা চলে আসতএই বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায়। ব্রজগোপালের কাছে সে কুস্তির প্যাঁচ শিখত। হরকুমার শোনাতেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বিষয়ক কবিতা। এ ছাড়া বিপ্লবীদের সম্পর্কে অসংখ্য গল্প। কার্ল মার্কস, ডি ভ্যালেরা, স্ট্যালিন সম্পর্কেও আলোচনা হত। একদিন হরকুমারের কাছে এমন একটা গল্প শুনল, তার আর তুলনা নেই।

হরকুমার প্রায়ই সূর্যকে দেখে বলতেন, ওই ছেলেটাকে দেখলেই আমার বৈকুণ্ঠ সুকুলের কথা মনে পড়ে। চেহারায় খুব মিল আছে। প্রথম দিন ওকে দেখেই সে কথা মনে পড়েছিল বলে ছেলেটার ওপর আমার মায়া পড়ে যায়।

সূর্যকুমার জানত না বৈকুণ্ঠ সুকুল কে। একদিন জানল।

ওই গোপন আস্তানায় প্রায়ই একজন পাগলা মতন লোক আসত। একজন মাঝবয়সি মুসলমান, মুখ-ভরতি দাড়ি, নোংরা ছেঁড়া খাকি জামা ও প্যান্ট। মাটিতে শুয়ে পড়ে সে হরকুমারের পা জড়িয়ে ধরত আর কাঁদত হাউহাউ করে। পাগল হলেও খুব নিরীহ পাগল। হরকুমার খুব স্নেহের সঙ্গে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, তাকে জোর করে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন। তারপর দুজনে খুব নিকট আত্মীয়ের মতন কথা বলতেন কিছুক্ষণ।

একদিন সূর্যকুমার জিজ্ঞেস করেছিল, হরদা, ওই পাগলটা তোমার কাছে আসে কেন?

হরকুমার বলে ছিলেন, শুনবি ওর কথা? পরেশ, তুমি বলে দাও তো ওর কাহিনীটা।

পরেশ বললেন, না, হরদা, আপনিই বলুন। আপনার মতন কেউ বলতে পারবে না।

হরকুমারের সে-দিন কাশি বেড়েছে। অনবরত কাশছেন আর মুখে রুমাল চাপা দিচ্ছেন। হরকুমারের শরীর যে ভাবে ভেঙে পড়ছে-আর কদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন তার ঠিক নেই। কিন্তু হরকুমার কিছুতেই চিকিৎসা করাবেন না, নিজস্ব টোট। ওষুধ খেয়েই থাকবেন।

একটু কাশি থামিয়ে হরকুমার বললেন, আমি যখন গয়া জেলে ছিলাম, তখন ওই যাকে এখন পাগলা দেখছিস, ও ছিল একজন হাবিলদার। ওর পুরো নাম আমি আজও জানি না, তবে সবাই ওকে বলত হাবিলদার রেজা। ইউ পির লোক, উর্দুতে কথা বলে। প্রথম মহাযুদ্ধে ও ভার্দুনে, মেসোপটেমিয়ায় লড়েছে। লেখাপড়া কিছু জানে না, কিন্তু ঘুরেছে অনেক দেশ। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে নানান ঘাটের জল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত গয়া জেলে রক্ষীর কাজ পেয়েছিল। এটা বছর চারেক আগের কথা। হাবিলদার রেজাকে তখন ভালো করে চিনতাম না-চেনার দরকারও ছিল না। আমরা সব রাজবন্দি, ও একজন বিশাল চেহারার গার্ড, জুতো খটখটিয়ে সেলের বাইরে দিয়ে চলে যায়। ওকে চিনলাম এক রাত্তিরে।

তখন জেলখানা রাজবন্দিতে ভরতি। গান গেয়ে, হইচই করে আমরা সব ভুলে আছি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, সাত ডিগ্রি কনডেন্ড সেলের একজন আসামির ফাঁসি হবে। আমরা তখন আছি পনেরো ডিগ্রিতে। কার ফাঁসি হবে, নাম জানতে পারলাম না- ভীষণ কৌতূহল জেগে রইল।

ফাঁসির আগের দিন আসামিকে পনেরো ডিগ্রির এক নম্বর সেলে আনা হল। সে-দিন বিকেলে আমাদের জেনারেল লক আপ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। আমাদের সবাইকে এনে ঢোকানো হল যার যার নির্দিষ্ট ব্যারাকে আর সেলে। পাশাপাশি কয়েকটি সেলে আছি

আমি, রঘুনাথ পাণ্ডে, ত্রিভুবন আজাদ আর বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। লোহার গরাদ ধরে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে আছি, কখন আনা হবে ফাঁসির আসামিকে।

সন্ধ্যার সময় তাকে আনা হল। অনেকগুলো বুটের শব্দ, জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় জমাদার, সেপাই সান্ত্রী সবাই মিলে নিয়ে আসছে একজনকে-কে এমন মহাপুরুষ? দেখলাম হাত-পায়ে শিকল বাঁধা ফুটফুটে চেহারার এক কিশোর। শিকল ঝনঝনিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে উৎফুল্ল মুখে, ঠিক যেন সিংহের বাচ্চা! ফাঁসির আগে এক নম্বর সেলে। ঢোকাবার সময় আসামির হাত-পায়ের শিকল বেড়ি খুলে দেওয়াই নিয়ম, হারামজাদারা ওর বেলায় তা-ও করেনি। পুলিশের চোখে ও নাকি ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। অথচ কী বলব তোমাদের, কী সরল নিষ্পপ তার মুখ-এই আমাদের সূর্যর থেকে মাত্র দু-তিন বছরের বড় হবে-তাকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, সে নাকি বিপজ্জনক আসামি!

আমাদের সেলগুলোর পাশ দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, তখন বিভূতিদা হঠাৎ অস্ফুট ভাবে বলে উঠলেন, আরে, এ যে বৈকুণ্ঠ সুকুল।

আসামিও বিভূতিদাকে চিনতে পেরে মহা উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল, দাদা, আ গায়া! ফির মুলাকাত

বিভূতিদা কম্পিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, বন্দে মাতরম! তখন অন্য সব সেল থেকেও সবাই গর্জন করে বন্দে মাতরম বলে সেই আসামিকে সংবর্ধনা জানাল!

আমি বিভূতিদাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা, বৈকুণ্ঠ সুকুল কে? আগে তো শুনিনি এর কথা!

বিভূতিদা বিষণ্ণ ভাবে বললেন, ওকে বছর চারেক আগে একবার দেখে ছিলাম পাটনা ক্যাম্প জেলে। একেবারে বাচ্চা! তার কাল ফাঁসি হবে?

পরে আমরা জেনেছিলাম, বৈকুণ্ঠ সুকুল অত্যন্ত দুঃসাহসী অ্যাকশান করেছে। ও মজঃফরপুরের ছেলে-ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকির যোগ্য উত্তরসাধক। ভগৎ সিংদের। ফাঁসির

মামলায় রাজসাক্ষি হয়েছিল যে ফণী ঘোষ সে তখন ওই জেলাতে এসে দোকান খুলেছে, দিন-রাত তাকে পুলিশের লোক পাহারা দেয়। সেই অবস্থাতেই তাকে খতম করে দিয়েছে বৈকুণ্ঠ সুকুল। রাজসাক্ষির প্রতি কোনও দয়া নেই। বৈকুণ্ঠ সুকুল তখন ধরাও পড়েনি, ছদ্মবেশে পালিয়ে ছিল বেশ কিছুদিন, তারপর ধরা পড়ল শোনপুরের মেলায়।

যাই হোক, সে-রাত্রে আমাদের ঘুমোবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সবাই লোহার গরাদ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। সবাই মনে মনে প্রার্থনা করছি, এ রাত্রি যেন ভোর না হয়। সূর্য। ওঠার পর সুকুল আর ইহজগতে থাকবে না।

হঠাৎ এক নম্বর সেল থেকে সুকুলের ডাক শোনা গেল, বিভূতিদা–

বিভূতিদা সাড়া দিলেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দু'জনে কথা হতে লাগল। সুকুল বলছে, দাদা, আপনার পাটনা জেলের কথা মনে আছে? কত গান শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলেন সেই কবিতা, মরণ, হে মোর মরণ!

খট খট করে সেপাইয়ের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আমরা চুপ। বিভূতিদার সেলের সামনে এসে দাঁড়াল হাবিলদার রেজা। চুপ করে একটুক্ষণ কী যেন ভেবে আবার চলে গেল। ফিরে এল খানিকটা বাদে। এবার তার হাতে এক গোছা সাদা ফুল। আমরা অবাক। কোথা থেকে সে এই ফুল জোগাড় করে এনে দিয়েছিল সুকুলকে, সুকুল আবার। তার খানিকটা পাঠিয়েছে বিভূতিদাকে।

বিভূতিদা হাত পেতে ফুলগুলি নিলেন, একটাও কথা বলতে পারলেন না, হাবিলদার তখনও দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে বিভূতিদাকে জিজ্ঞেস করল, ক্যা শোচ রহা হ্যায়, বাবুজি!

বিভূতিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কী আর ভাবব।

হাবিলদার গরাদ ধরে ঝুঁকে এল বিভূতিদার দিকে। তারপর অদ্ভুত আর্ত গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, বাবুজি, এই লেড়কাকে বাঁচানো যায় না? লাটের ওপরে লাট আছে,

তারও ওপরে আছে বিলেতের বাদশা বাঁচানো যায় না! যে-কোনও উপায়ে সুকুলজিকে বাঁচানো যায় না!

সেই রুক্ষ, কঠিনহৃদয় সৈনিকের মুখে একথা শুনব আমরা কেউ আশা করিনি। কথা শুনেই টের পেলাম ওর হৃদয়ে খুব একটা ধাক্কা লেগেছে। হাবিলদার রেজা আরও বলল, সে অনেক মানুষকে মরতে দেখেছে, নিজের হাতেও যুদ্ধের সময় মানুষ মেরেছে। এ-জীবনে বাহাদুর সে কম দেখেনি-কিন্তু সুকুলজির মতন দেখেনি কারওকে। বীরপুরুষের এ রকম চেহারা সে কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল, মরতে যার একটুও ভয় নেই! এ রকম একটা মানুষ যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় তা হলে দুনিয়াটা কি শুধু ডরপুকের জন্য?

সুকুল এমনিতেই খুব রূপবান, তারপরও হাবিলদার বলল, ফঁসির হুকুম পাকা হয়ে যাবার পর তার শরীরটা গোলাপের মতন হয়ে উঠছে! গুলাব জ্যায়সাগুল জ্যায়সা খুল রহা হা বাবুজি! আমার জীবন দিয়েও যদি ওকে বাঁচানো যেত! কিছু একটা হয় না।

প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতেই চলে গেল হাবিলদার। সেই সঙ্গে সে আমাদেরও রুদ্ধবাক করে দিয়ে গেল। রাত গম্ভীর হয়ে উঠেছে, কত রাত জানি না, জানি না ভোরের কত দেরি। হঠাৎ সুকুল আবার বলে উঠল, বিভূতিদা, গান শুনব! সেই যে, হাসি হাসি পরব ফাঁসি?

ক্ষুদিরামের ফসির এই গান বাঙালি-অবাঙালি সবারই প্রিয়। রাজবন্দিরা এ গান শোনে মন্ত্রমুগ্ধের মতন। বিভূতিদা উদাত্ত গলায় গান ধরলেন:

একবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি মা
দেখবে ভারতবাসী...
দশমাস দশদিন পরে

জন্ম নেব মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস, মা,
চিনবি গলায় ফাঁসি..

বিভূতিদা একবার গানটা শেষ করছেন, আর বৈকুণ্ঠ সুকুল চেঁচিয়ে বলছেন, আবার! আবার! কতক্ষণ সে-গান চলেছিল খেয়াল নেই–আমরা সেই গানের মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম।

খানিকক্ষণ বাদে সুকুল বলল, দাদা বাঁশি শুনব! আমরা অবাক। জেলখানার মধ্যে বাঁশি কোথা থেকে আসবে। বিভূতিদা মলিন ভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, একটা দেশলাই যদি পেতাম! হাবিলদার রেজা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, আমরা খেয়াল করিনি, সে সঙ্গে সঙ্গে এসে একটা দেশলাই বাড়িয়ে দিল। সেই দেশলাইয়ের খোলের মধ্যে এক টুকরো পাতলা কাগজ দিয়ে বিভূতিদা একটা জিনিস বানিয়ে ফেলেছেন, সেটা দিয়ে অনেকটা বাঁশির মতনই আওয়াজ হয়। পাটনা জেলে বিভূতিদা এই রকম বাঁশি বানাতেন, সুকুলের ঠিক মনে আছে।

সেই বাঁশিতে একটা তীব্র করুণ সুর ভেসে উঠল। জেলখানার সমস্ত কঠিন পাথরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই সুর। সুকুল বলল, দাদা, এটা কী গান বাজাচ্ছেন? সুরটা যেন চেনা চেনা–

বিভূতিদা বললেন, এটা বিসমিলের সর ফরোশি কি তমান্নার সুর!

সুকুল যেন লাফিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, দাদা গানটার সব পদ মনে আছে? দাদা একবারটি গান!

তখন আমাদের মনে পড়ল কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার রামপ্রসাদ বিসমিল ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে নিজের লেখা এই উর্দু গান গেয়েছিলেন। অপূর্ব তার বাণী।

সর ফরোশি কি তমান্না অহমারে,
দিল মে হ্যায়
দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু এ
কাতি মে হ্যায়!

[মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই ঘাতকের বাহুতে, কত বল আছে!]

এ-গানটা অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হল। শেষ পংক্তিতে এসে সুকুল নিজেও গলা মেলাল। শেষ দিকে বিসমিল বলেছিল:

অব্না অগ্লে ওয়ল্লে হ্যায় আউর
না আর মানোকি ভিড়
সিরফ্ মর্ মিটনেকি হসরৎ আপ
দিলে এ বিসমিল মেঁ হ্যায়।

[এবার থেমে গেছে পূর্বেকার কলগুঞ্জন, মিটে গেছে সব বাসনা। এখন শুধু মৃত্যুকে বরণ করার বাসনা বিসমিলের হৃদয়ে।]

শেষ লাইনে বিসমিলের নাম বদলে দিয়ে সুকুল গাইতে লাগল, দিলে এ সুকুল মে হ্যায়, দিলে এ সুকুল মে হ্যায়, দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়-কত বার যে, তার ঠিক নেই। খানিকটা বাদে থেমে রইল কিছুক্ষণ। আবার বলল, দাদা, আউর একঠো গান-

বিভূতিদা সেদিন কত গান গেয়েছিলেন খেয়াল নেই। আমরা নিস্পন্দ হয়ে শুনেছি। কাছেই ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে আছে হাবিলদার রেজা। সারা পৃথিবী তখন ঘুমন্ত, শুধু জেলখানার কটি প্রাণীই জেগে আছে। তাদের মধ্যে একজন কয়েক ঘণ্টা পরেই অনন্ত ঘুমের মধ্যে চলে যাবে।

একসময় বিভূতিদার গানের স্টক শেষ হয়ে গেল। হাবিলদারকে জিজ্ঞেস করলাম ক'টা বাজে? সে বলল, এক বাজ গয়া।-আর মাত্র চার ঘণ্টা।

বিভূতিদার গানের স্টক শেষ, সুকুল তবুও অনুরোধ করে যাচ্ছে। সে যেন তখন একটা সুরপাগল মানুষ, পৃথিবীতে আর কিছু জানে না। শেষ পর্যন্ত সে বলল, দাদা, সেই গান একবার গাইতে হবে।

কোন গান?

রবীন্দ্রনাথের ওই, মরণ, হে মোর মরণ!

ওটা তো গান নয়, কবিতা!

না, না, ওটাই গাইতে হবে।

ওটা আমার মুখস্থ আছে সুকুল, কিন্তু ওর তো কোনও সুর নেই?

তা জানি না-ওটা গান গেয়ে শোনান!

সেই ভাবে-বিভোর কিশোরকে কে তখন নিরস্ত করবে? ওর কোনও অনুরোধ তখন অগ্রাহ্য করা যায়? রবীন্দ্রনাথের মরণ-মিলন কবিতাটা সুকুলের খুব প্রিয় ছিল- বিভূতিদার কাছ থেকে শুনে শুনে হিন্দি অক্ষরে লিখে নিয়ে মুখস্থ করেছে। বিভূতি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি মানে বুঝতে পারো সব? সে বলেছিল, কেন পারব না! এই তো, 'আমি করব নীরবে তরণ' তরণ তো হিন্দিতে যাকে বলে ত্যায়রনা-মানে সাঁতার দেওয়া, তাই না?

সেই দীর্ঘ কবিতা সুকুল তখন গান হিসেবে শুনতে চাইছে। বিভূতিদা তাকে বিমুখ করতে পারলেন না। তিনি তখন দরবারি কানাডায় সুর লাগিয়ে গোটা কবিতাটা গেয়ে যেতে লাগলেন-অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

ও রকম গান কেউ কখনও গায়নি, ও রকম ভাবে কেউ কখনও গান শোনেনি। শুধু তো সুর নয়, কথা নয়-সমস্ত মন প্রাণ ওই গানের মধ্যে। বিভূতিদা ও রকম গান জীবনে আর কখনও গাইতে পারবেন না!

কখন চারটে বেজে গেছে খেয়ালও করিনি। চমকে উঠলাম জেলের পেটা ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। অমনি জেগে উঠল ভারী ভারী বুটের আওয়াজ। সুকুল তখন হেসে বলল, দাদা, এবার 'তো সময় হইল নিকট' - এবার শেষ গান হোক! বন্দে মাতরম্? সমস্ত জেল কাঁপয়ে, আকাশ বাতাস-পৃথিবী কাপিয়ে আমরা সকলে মিলে গেয়ে উঠলাম, বন্দে মাতরম্সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা-।

ঝনঝন করে শব্দ হতে লাগল গেট খোলার। হাত-পা বাঁধা সুকুলকে বাইরে আনা হল। আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল জেলের দরজা ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে একবার ওকে ছুঁই। কিন্তু তার তো উপায় নেই। সুকুলের মুখখানা কিন্তু প্রফুল্ল-সেই অপরূপ চেহারার কিশোরের মুখে একটু ক্লান্তির ছাপ নেই। চেঁচিয়ে বললে, দাদা, ত তো চল্ না হ্যায়। আমাদের সকলের নাম করে বলল, চলি তবে। আবার আমি আসব, দেশ তো স্বাধীন হয়নি-আবার আস্ব-বন্দে মাতরম্।

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল সুকুলকে। আমরা তখন...

সূর্যকুমার এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিল। এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে।

হরদা কাশতে কাশতে বললেন, হাবিলদার রেজা তার পরদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে একটু পাগলাটে ধরনের হয়। আমরা জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ও আমাদের কাছেই ঘুরে ফিরে আসে-আর অনবরত সুকুলের কথা বলে। সুকুলের জন্য ও এমন আঘাত পেয়েছে যে মানুষ নিজের ছেলে মরলেও বোধহয় এতটা পায় না।

একটুক্ষণ চুপ করে হরকুমার বললেন, ও, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। শেষ সময়ে বৈকুণ্ঠ সুকুল একবার মাত্র একটুক্ষণের জন্য নরম হয়েছিল। যাবার সময় বিভূতিদার সেলের সামনে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর মাথা নিচু করে বলেছিল, দাদা, একটা অনুরোধ শুধু রইল। আপনারা এবার জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে বিহারের বাল্যবিবাহ প্রথাটা তুলে দেবার চেষ্টা করবেন!-তারপর ও চলে গেল গটগট করে।

সূর্য আর নিজেকে সামলাতে পারল না, কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কক্ষনও তার চোখে জল দেখা যায় না, মার খেলেও সে কাঁদে না-তবু ওইটুকু বয়সের মধ্যে কোনও দিন সে ও রকম ভাবে কাঁদেনি।

আলিমুদ্দিন মাস্টার সূর্যকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন হরকুমার হাত তুলে নিষেধ করলেন ইশারায়। আস্তে আস্তে বললেন, কাঁদুক! কান্না ওর পক্ষে ভালোই!

১২. গরমের ছুটিতে বিষ্ণু

গরমের ছুটিতে বিষ্ণু তার বাবা-মায়ের সঙ্গে চলে গেল দার্জিলিং। বাদলকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবেই! বিষ্ণু তার বাবা-মায়ের নয়নের মণি, তার কোনও ইচ্ছেই অপূর্ণ থাকে না। বিষ্ণু তার মাকে বলল, মা, বাদল কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবে। না হলে আমি যাব না।

বিষ্ণুর মা ঠান্ডা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, বেশ তো চলুক না! বাদল, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?

বিষ্ণুর মা বাদলকে যে খুব অপছন্দ করেন, তা নয়। তবে কিছু কিছু রমণী থাকেন এ রকম, যাঁরা নিজের সন্তানের ওপর এত বেশি স্নেহ দিয়ে ফেলেন যে অন্যদের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বেশি বয়সের ওই এক ছেলে বিষ্ণু, তাই অন্নপূর্ণার আর অন্য কোনও দিকে চোখ নেই। অন্নপূর্ণা বাদলকে বললেন, তুই তোর বাবা-মাকে বলে রাখিস,

আমরা আসছে সোমবার যাব। পনেরো দিন থাকব কিন্তু, তোর মা'র জন্য মন কেমন করবে না তো?

বিষ্ণু আর বাদল তখন বসে গেল পরিকল্পনা আঁটতে। বাদল এ-পর্যন্ত কোনও পাহাড় দেখেনি। সমুদ্রও দেখেনি। বড় বড় নদী দেখেছে অতি শৈশবে, মনে আছে অস্পষ্ট। যে কখনও কোনও পাহাড় দেখেনি, তার কল্পনায় যে-কোনও পাহাড়ই হিমালয়ের চেয়েও বিশাল। সেই পাহাড়ের ওপর দার্জিলিং শহর, বাদলের চোখে তা স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। বিষ্ণু প্রত্যেক ছুটিতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে কোথাও-না-কোথাও বেড়াতে যায়, এমনকী দার্জিলিংয়েও আগে একবার গেছে, সেখানে ওদের একটা বাড়ি আছে। বিষ্ণুরা একাই যাবে, রেণুরা বা অন্য কাকা কাকিমারা ছেলে-মেয়েরা যাবে না।

বিষ্ণু তাকে শোনাতে লাগল পথের বর্ণনা। বড় ট্রেনের পর ছোট ট্রেন। সেই ছোট ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে বালি ছড়ায় অনবরত, ট্রেনটা খেলনার মতন এঁকেবেঁকে ওঠে পাহাড়ের গা দিয়ে, জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই পাহাড় ছোঁয়া যায়। দাজিলিংয়ে পৌঁছেই ওরা ঘোড়ায় চড়বে। বাদল ঘোড়ায় চড়তে জানে না তো! তাতে কী হয়েছে, এক দিনেই শিখে যাবে। এবার দার্জিলিংয়ে গিয়ে বিষ্ণু একটা কাজ করবেই, বাদলকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে যাবে দূরে কোনও একটা অচেনা পাহাড়ে। দুজনে মিলে তার চূড়ায় উঠবে। আগে কারোকে কিছু বলবে না-চূড়ায় পৌঁছে একটা ফ্ল্যাগ পুঁতে দিয়ে নেমে এসে সেই কীর্তির কথা বলে সবাইকে অবাক করে দেবে। বিষ্ণুর কল্পনাপ্রবণ মন এইসব চিন্তায় দারুণ আনন্দ পায়।

বাদলকে শীতের জামাকাপড় নিয়ে যেতে হবে অনেক। তার যদি কোট না থাকে সেজন্য কোনও চিন্তা নেই, বিষ্ণুর দুটো অলেস্টার আছে-একটা সে বাদলকে দিয়ে দেবে। বিষ্ণুর দস্তানাও আছে তিন জোড়া। পাহাড়ে উঠতে গেলে দস্তানা তো লাগবেই। বাদল তক্ষুনি বিষ্ণুর দস্তানা হাতে দিয়ে দেখল, ফিট করে কিনা।

শেষ পর্যন্ত বাদলের যাওয়া হল না। বাড়িতে এসে মাকে বলতেই মা বললেন, তুই দার্জিলিং যাবি কী করে? সে তো অনেক দূর! পাঁড়া, তোর বাবা আসুক, জিজ্ঞেস করে দেখ–

বাদল অনুনাসিক আবদারের সঙ্গে বলল, না, বাবাকে তুমি বলবে। আমি ঠিক যাব বিষ্ণু বলেছে কোনও অসুবিধে হবে না!

মা বললেন, তুই অতদিন ধরে ওদের সঙ্গে থাকতে পারবি? তুই কখনও কোথাও একা থেকেছিস?

বাদল অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, থাকতে পারব, খুব থাকতে পারব।

কিন্তু দার্জিলিং যেতে তো অনেক টাকা লাগে। অত টাকা আসবে কোত্থেকে?

ন' বছরের ছেলের পক্ষে টাকার ব্যাপারটা বোঝা অবশ্য কঠিন। সে অবাক হয়ে বলল, বাঃ, টাকা লাগবে কীসে, আমি তো বিষ্ণুদের সঙ্গেই যাব!

সঙ্গে গেলেই বা, ট্রেনের টিকিট কাটাতে হবে না? তা ছাড়া অতদিন বাইরে থাকা–

বাবা বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত জেগে বসে রইল বাদল। ঘুমে চোখ টেনে আসছে, তবু ঘুমোবে না। চিররঞ্জন খেতে বসার পর বাদল সামনে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, বাবা, আমি দার্জিলিং যাব।

চিররঞ্জন মুখ তুলে বললেন, ইস্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি?

না, বিষ্ণুদের সঙ্গে যাব। বিষ্ণুর বাবা-মা যাচ্ছেন।

বিষ্ণু কে?

মা বললেন, ওই যে গো রেণু, সেই যে গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে গিয়েছিল, তার খুড়তুতো ভাই। বেশ ভালো ছেলে!

চিররঞ্জন ভুরু কুঁচকে বললেন, ওদের সঙ্গে যাবে কী করে? ওদের সঙ্গে কি আমাদের খাপ খায়!

মা বললেন, এত করে যেতে চাইছে, যাক না। কোথাও তো বেড়ানো হয় না! ওর বন্ধুরা যায়–

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিকেলবেলা মা বাদলকে দার্জিলিং যাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিচ্ছিলেন, এখন তিনিই স্বামীর সামনে ছেলের পক্ষ নিয়ে নিলেন। বোঝাতে লাগলেন অনেক করে। কিন্তু চিররঞ্জন মানলেন না। বাদলকে বললেন, সময় তো অনেক পড়ে আছে। বড় হও, লেখাপড়া করো, তারপর নিজেই ওই রকম অনেক জায়গায় বেড়াতে পারবে।

হিমানী রেগে উঠে বললেন, আমি যে এত করে বলছি, সেটা বুঝি তোমার কানে যাচ্ছে না? ছেলেটা এত করে বলছে-কী হয় গেলে? তোমার কোনও ক্ষতি হবে! এমনিতে তো সারা দিনে ছেলের একবার খোঁজও নাও না!

চিররঞ্জন ক্লান্ত ভাবে বললেন, কিন্তু আমি এখন ওকে পাঠাব কী করে? আমার হাতে তো একদম টাকা নেই?

ওদের সঙ্গে একসঙ্গে যাচ্ছে। ওরা কি আর টাকা নেবে?

ওরা টাকা না নিলেও আমি টাকা না দিয়ে আমার ছেলেকে পাঠাব কী করে? আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

হিমানী তখন হাত থেকে দু' জোড়া সোনার চুড়ি খুলে মাটিতে ছুঁড়ে মেরে বললেন, তোমার হাতে তো কোনও সময়েই টাকা থাকে না। তা বলে আমার কোনও সাধ আহ্লাদ নেই? তুমি আমার গয়না বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসো!

তখন ঝগড়া লেগে গেল স্বামী-স্ত্রীতে। বাদল আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে। চিররঞ্জন পুরোটা না খেয়েই উঠে পড়েছেন। বাদলের কান্না পেতে লাগল, তার জন্যই এইসব হচ্ছে। এর আগে সে তো কখনও বোঝেনি টাকা জিনিসটা এ রকম জরুরি। বাবা আর মায়ের ঝগড়ার মধ্যে বেশ কয়েক বার টাকা কথাটার উচ্চারণে তার মাথার মধ্যে ঘা মারতে লাগল। এতকাল তার ধারণা ছিল, টাকা জিনিসটা ছোটদের কাছে থাকে না, শুধু বয়স্কদের কাছে থাকে। তার বাবাও তো বয়স্ক লোক, অথচ বাবার কাছে নেই কেন? ছোট ছেলেরা যেমন মার্বেলগুলি নিয়ে ঝগড়া করে, তেমনই তার বাবা-মাও ওই সাহেবের মুন্ডু ছাপ দেওয়া রূপোর গোল গোল জিনিসগুলোর জন্য ঝগড়া করছে। সে একবার ভাবল, বড়বাবুর কাছে চাইলেই হয়, বড়বাবুর তো অনেক টাকা। আবার সে তীব্র অভিমানের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করল, বড় হয়ে সে অনেক অনেক টাকা রোজগার করবে তখন সে প্রত্যেক বছর দার্জিলিং যাবে-তখন তো কেউ কিছু বলতে পারবে না! ·

এদিকে বিষ্ণু বেঁকে বসল, বাদল না গেলে সে কিছুতেই যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বিষ্ণুর মা নিজেই একদিন এলেন এব্রাড়িতে, বাদলের মাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করাতে। তাতেও কোনও ফল হল না। হিমানী কৃত্রিম হেসে অন্নপূর্ণাকে বললেন, না দিদি, বাদল না হয় অন্য কোনও বার তোমাদের সঙ্গে যাবে। এবার কী করে পাঠাই। বটঠাকুর বলছেন, এবার আমাদের সবাইকে নিয়ে কাশী যাবেন-এখনও ঠিক হয়নি অবশ্য, তবু যদি যাওয়া হয়, তা হলে বাদলকে না নিলে...

বাদলের সামনেই এই আলোচনা হচ্ছিল, অথচ বাদল জানে ওকথা সত্যি নয়। প্রিয়রঞ্জনের দেশভ্রমণের বাতিক নেই-তার মতে ওসব নেহাত বাজে খরচ। বড়বাবু মাঝে মাঝেই বেড়াতে যান, কিন্তু একা। একবার বেরোলে কবে ফিরবেন তা-ও বলে যান না। আর চিররঞ্জন ট্রেনে চেপে কোথাও যাবার বদলে কলকাতায় পথে পথে অনির্দিষ্ট ভাবে

ঘুরে বেড়াতেই বেশি ভালোবাসেন। প্রিয়রঞ্জন তাঁর ব্যবসার কোনও সংকটের সময় কাশী বিশ্বনাথের কাছে কিছু একটা মানত করেছিলেন সংকট কেটে যাওয়ায় এখন তিনি বিশ্বনাথকে পুজো দিতে যাবেন। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে যাবার জন্য। বাড়ির কেউ কেউ বায়না তুলেছে কিন্তু প্রিয়রঞ্জন তাতে রাজি নন!

বিষ্ণুরা চলে যাবার পর বাদল কিছু দিন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াল। সবাই মিলে তার কাছ থেকে একটা স্বর্গ কেড়ে নিয়েছে। এতদিন তার কল্পনায় দার্জিলিয়ের কোনও অস্তিত্ব ছিল না-কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যাবার সব পরিকল্পনা করে ফেলার পরও না-যাওয়া যে কী মর্মান্তিক, তা আর কেউ বুঝবে না। বালকের যুক্তিহীন মনের গহন অভ্যন্তরে যে-বেদনা-অভিমানের আলোছায়া ঘোরে তার মর্ম বোঝার সাধ্য আর কারও নেই। বাদল একা একা চিলেকোঠায় গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলে, টবের ফণীমনসার গাছের কাছে তার দুঃখ জানায়, ট্যাঙ্কের জলে হাত ডুবিয়ে খেলা করতে করতে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে বহু দিনের মাটি জমেছে এবং আশ্চর্যের বিষয় দুটি ছোট ছোট কাকড়া সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্য সময় বাদল লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে কাঁকড়াদুটোকে মারার চেষ্টা করে, কিন্তু এখন সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে যেন ওরা ছাড়া তার আর বন্ধু নেই।

ছেলের মনমরা ভাব দেখে চিররঞ্জন একদিন বললেন, দেওঘরে যাবি? ফ্রেস এয়ার ক্যাম্পের সঙ্গে? দেওঘর খুব সুন্দর জায়গা-বৈদ্যনাথের মন্দির, তপোবন, পাহাড়ও আছে ওখানে-। যদি যাস তো অসীমদাকে বলে দেখি-

চিলড্রেন্স ফ্রেস এয়ার অ্যান্ড এক্সকারশান সোসাইটি নামে একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান ছিল তখন। ধনী ব্যক্তিদের দানে ধন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর গরিব ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যেত কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায়। প্রত্যেকের খরচ হত মাত্র পাঁচ টাকা- পড়াশুনোয় যারা ভালো অথচ গরিব, শুধু তাদেরই জন্য। দরখাস্ত পড়ত অনেক, কিন্তু এই ক্যাম্পের যিনি ইনচার্জ থাকতেন সেই স্কাউট মাস্টার অসীম দত্তর সঙ্গে কী সূত্রে যেন চেনা ছিল চিররঞ্জনের।

চিররঞ্জন ছেলেকে দেওঘর পাঠাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কী কারণে যেন সেটাও শেষ পর্যন্ত সার্থক হল না। আসলে, চিররঞ্জন নিজেও চেষ্টা করেছিলেন ওই দলের সঙ্গে কোনও ছুতোয় ভিড়ে পড়তে, সেটাতেই অসুবিধে দেখা দেয়। দুর্বল ধরনের মানুষ চিররঞ্জন, ছেলেকে একলা কোথাও পাঠাবার মতন মনের জোর তাঁর নেই। দেওঘর যাওয়া হল না, চিররঞ্জন বুঝতেও পারলেন না, ছেলের কাছ। থেকে তিনি আর একটি স্বর্গ কেড়ে নিলেন। বাদল এর মধ্যেই দার্জিলিংয়ের কথা অনেকখানি ভুলে মনে মনে দেওঘর নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। বিশেষত দেওঘরে তপোবন আছে শুনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল সে। ওই নাম শুনেই সে মানসচক্ষে দেখতে শুরু করেছিল বাল্মিকীর তপোবন, আহা, বিষ্ণু বেচারা দেখতে পাবে না। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট রামায়ণ' তখন বাদলের পুরো মুখস্থ। সে একা একা আবৃত্তি করত:

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুল-কুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।...

দেওঘর যাওয়া হল না, সেই তপোবন বাদলের কাছে আরও সুদূরসুন্দর হয়ে রইল।

রেণুদের বাড়িতে গেলেও আর বিশেষ খেলা জমে না। বিষ্ণু নেই, সেই কথাটা সব সময় খচখচ করে। অন্য ছেলেমেয়েরাও অনেকেই এ বছর বেড়াতে গেছে তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে। রেণুর অসুখ বলে ওরা যেতে পারেনি, কিন্তু সুপ্রকাশদা বন্ধুদের সঙ্গে গেছেন উটকামন্ড।

হৈমন্তী কাকিমার ঘরটা তালাবন্ধ হয়েই পড়ে থাকে। আগে হৈমন্তী কাকিমার সঙ্গে গল্প করতেও কত ভালো লাগত। বিষ্ণু একদিন ফিসফিস করে বাদলকে বলেছিল, জানিস, হৈমন্তী কাকিমা হারিয়ে গেছে?

বাদল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় হারিয়ে গেছে?

বিষ্ণু বলেছিল, সেটাই তো কেউ জানে না। কাকিমা কারোকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেছেন। বাপেরবাড়িতেও নেই।

এই বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে যাবার কথা শুনলেই কী রকম যেন অসহায় লাগে। বাদলের খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়ে সে আর বিষ্ণু ঠিক হৈমন্তী কাকিমাকে খুঁজে বার করবে।

রেণু প্রায়ই অসুখে ভোগে, ঘুরে ফিরেই তার জ্বর হয়। জ্বরে বিছানায় শুয়ে থাকে কয়েক দিন, একটু সেরে উঠলেই আবার দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। গত কয়েক মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছে রেণু, শীর্ণ মুখে দুটি টলটলে চোখ, মাথায় সিল্কের মতন কোঁকড়া চুল।

এ বাড়িতে এখন ছেলেমেয়ে মাত্র তিন জন। রেণু, তার ওপরের ভাই অংশুমান আর ওদের জ্যাঠতুতো বোন দীপ্তি। এর মধ্যে দীপ্তি বারো ছেড়ে তেরোয় পা দিয়েছে এবং ফ্রক ছেড়ে প্রায়ই শাড়ি পরে। শরীরেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে দীপ্তির। কিন্তু তার মনটা এখনও অপরিণত রয়ে গেছে। তাই এই নতুন রকমের শরীর নিয়ে সে কী করবে বুঝতে পারে না। পড়াশুনোয় তার মন নেই বলে ইস্কুল ছেড়েই দিয়েছে প্রায়, তা ছাড়া সে 'আটক' করা মেয়ে, অর্থাৎ শোভাবাজারের বোসদের বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে অতি শৈশব থেকেই তার বিয়ে ঠিক করা আছে। সেই ছেলে এখন বিলেতে, আগামী বছর বিলেত থেকে ফিরলেই দীপ্তির বিয়ে হয়ে যাবে। দীপ্তি এসব জানে বলেই তার ব্যবহারটা একটু পাকা পাকা। সে এখন বিকেলবেলা গা ধুয়ে ছাদে দাঁড়ায়, আকাশের দিকে তাকায় উদাস চোখে, পাড়ার ছেলেরা তার দিকে ইশারা ইঙ্গিত করে। গত বছর বিষ্ণুর জন্য যে

মাস্টারমশাই রাখা হয়েছিল, সেই মাস্টারটি নাকি দীপ্তির প্রতি রসস্থ হয়ে কী একটা কাণ্ড করে ফেলেছিল, যে জন্য অবিলম্বে তার চাকরি যায়।

আগে দশবারো জন ছেলেমেয়ে মিলে যে খেলা খেলত, তার অধিকাংশই ছিল ছুটোছুটির খেলা। এখন তিন-চার জনে মিলে খেলার ধরনটা বদলে যায়। এখন হয় বসে বসে ক্যারাম-পেটা অথবা দোকান-দোকান খেলা। তারপরই এসে যায় বর-বউ খেলা। এই খেলাটা দীপ্তিই ওদের শেখায়। দীপ্তি বাদলের হাতটা টেনে ধরে বলে, তুই বেশ বর, আমি বেশ তোর বউ, তারপর বর-বউ কী করে জানিস তো? হি-হি-হি! দীপ্তি হেসে লুটোপুটি খায়, বাদল তার মানে বুঝতে পারে না! তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে থাকে, একটি ছেলের সঙ্গে একটি ছেলে, আর একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলে-এর মধ্যে কী যেন একটা তফাত আছে। মেয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় না, ছেলের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয় না-শুধু ছেলে আর মেয়েতেই বিয়ে হয়-এটা একটা ঘোর রহস্যময় ব্যাপার। চড়াক চড়াক করে তার মাথার মধ্যে কয়েকটা দৃশ্য ঘুরে যায়। সূর্যদা একদিন বড়দির ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিল অথচ বড়দি হাসছিল, এর মানে কী? তার বাবা একদিন তার মাকে-।

অংশুর সঙ্গে বাদলের কিছুতেই বনে না। বয়সের তুলনায় বাদল একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে, তাকে অংশুর চেয়ে বড় দেখায়। অংশু একটু স্বার্থপর ধরনের, আর সব সময় খালি নালিশ করে। খেলতে খেলতেই চেঁচিয়ে ওঠে, মা দেখো, বাদল আমার বই নিয়েছে! মা, বাদল আমার লেত্তি ছিঁড়ে দিল! নালিশ শুনে রত্নপ্রভা এসে ছেলেকেই বকুনি দেন, অংশু তবু খেলার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া করে উঠে চলে যায়। তখনই দীপ্তি বলে, ও যায় যাক! আয় রে আমার বর বউ খেলি! তুই আমার এইখানটায় হাত দে! হি-হি-হি-হি-।

বাদল একলা রাস্তায় বেরোয় না, এ-বাড়িতে আসে সে চাকরের সঙ্গে। চাকরটি বড় ফাঁকিবাজ। অনেক দিন সে বেশ খানিকটা দূর থেকেই বলে, এইবার দাদাবাবু তুমি সোজা চলে যাও! যেতে পারবে তো? আমি দাঁড়িয়ে রইছি, আমাকে আবার বাজার যেতে হবে তো! এই পথটুকু বাদল একা একা হেঁটে আসবার সময় খানিকটা স্বাধীনতার স্বাদ পায়।

একদিন দুটো বয়স্ক ছেলে তাকে রেণুদের বাড়ির কাছেই দাঁড় করাল। তারপর বলল, এই খোকা শোন, একটা কাজ করতে পারবি?

বাদলের কাঁধে হাত দিয়ে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ওরা নানা কথা জিজ্ঞেস করল। রেণুদের বাড়িতে এখন কে কে আছে, বাবা-কাকারা কে কখন বাড়িতে থাকে ইত্যাদি। বাদলের কথায় এখনও একটু একটু বাঙাল টান আছে। ছেলেদুটি সেটা অবিলম্বে বুঝে গেল। একজন আর একজনকে বলল, এ রে মাইরি, এ যে বাঙাল দেখছি! বাঙালের বুদ্ধি তো, সবকিছু না গুবলেট করে দেয়। আর একজন বলল, এই ছোঁড়া, তোকে যা বলব, তাই করবি! এই গল্পের বইটা দীপ্তিকে দিবি, খবরদার অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়! কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও কিন্তু কিছু বলবি না। যদি না পারিস, তা হলে কিন্তু কান মুলে দেব!

বাদল বইটা হাতে নিয়েই বুঝল সেটা বড়দের বই। কেন না ছোট ছোট অক্ষর, আর ভেতরে কোনও ছবি নেই, দীপ্তি কি বড়দের বই পড়তে পারে? বইটার মধ্যে একটা আলাদা সাদা কাগজে কী সব হাতে লেখা, বোধহয় চিঠি, বাদল সেটা পড়ার সাহস পেল না। কিন্তু ছেলেদুটির ব্যবহার দেখেই সে বুঝেছিল, এর মধ্যে কিছু অন্যায় আছে। আর কোনও দিন সে চাকরকে না নিয়ে একলা আসবে না।

দীপ্তি বইখানা পেয়েই ঝট করে লুকিয়ে ফেলল। তারপর বাদলের কাছে তার হাজার। প্রশ্ন। বাড়িতে ঢোকার পর বাদলকে কেউ দেখেছে কিনা। বিশেষ করে ছোটকাকা। বইটা বাদলকে কে দিয়েছে, কল্যাণ না সত্যেন? বাদল কারওরই নাম জানে না। দু'জন ছেলে একসঙ্গে ছিল? কী রকম চেহারা বল তো?

যাই হোক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল দীপ্তি। বাদলের ওপর খুব খুশি হয়ে সে বলল, কী ভালো ছেলে রে! তারপর ফটাস করে সে দিয়ে ফেললে বাদলের গালে একটা চুমো। বাদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গালে হাত দিয়ে দেখল, সেখানে থুতু লেগে আছে। তার ঘেন্না করতে লাগল! দীপ্তিটা একটা কী রকম যেন!

রেণু যখন বেশ কয়েক দিন টানা জ্বরে ভোগে, তখন বাদল গেলে রত্নপ্রভা বলেন, বাদল, লক্ষ্মী ছেলে আমার–আজ তোমরা এই ঘরেই বসে খেলো। তোমরা অন্য। কোথাও গেলে রেণুও উঠে যেতে চাইবে! কিংবা রেণুকে তোমরা গল্প শোনাও নাও বেচারি অ্যাদ্দিন ধরে বিছানায় শুয়ে আছে।

দীপ্তি কিংবা অংশু বেশীক্ষণ বসে না, যে-যার ইচ্ছে মতন উঠে চলে যায়। বাদল রেণুর মাথার পাশে বসে বই পড়ে শোনায়। টম কাকার কুটির', 'রবিনহুড', হেমেন্দ্রকুমারের যখের ধন', সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু', অ্যান্ডারসনের 'রূপকথা' ।

রেণু তার জ্বর-ছলছল চোখ মেলে একমনে গল্প শোনে। গোটা একখানা বইনা শুনলে বাদলকে কিছুতেই যেতে দেয় না। কান্নাকাটি করে, ওষুধ খেতে চায় না। রত্নপ্রভা বাদলদের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়ে দুপুরে তাকে সেখানেই খাইয়ে দেন প্রায়ই।

রেণু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে রামায়ণের গল্প শুনতে। বার বার শুনেও তার তৃপ্তি হয় না। বাদল তখন চোখ বুজে আবৃত্তি করে:

দুঃখিনী সীতার কথা শুন তারপর
মায়ের চোখেতে জল ঝরে ঝরঝর
ময়লা কাপড়ে মাতা পড়িয়া ধূলায়
এমন সময় হনু আইল সেথায়।
হনু বলে, 'শুন মাগো, মরিল রাবণ
মুছ মা চোখের জল, উঠগো এখন।'
সুখেতে সীতার মুখে কথা নাহি সরে
পাবেন রামের দেখা এতদিন পরে!
হায় রে দুঃখের কথা কি কহিব আর–
সেই রাম না করিল আদর সীতার!
কুটি করিয়া তিনি কহিলেন তাঁরে,

যেথা ইচ্ছা যাও সীতা, চাহি না তোমারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রত্নপ্রভাও শোনেন। এই অনাত্মীয় বালকটির একমনে কবিতা পাঠ শুনে তার মনের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের মায়া এসে যায়। মনে মনে বলেন, আহা, এ-ছেলেটির ভালো হোক, জীবনে উন্নতি হোক!

১৩. সকালবেলা খবরের কাগজ

সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বড়বাবু হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চিররঞ্জনকে ডেকে বললেন, চিরু, শুনে যাও, দেখে যাও একবার!

বড়বাবু চিররঞ্জনকে খবরের কাগজের সেই বিশেষ খবরটা দেখালেন। মাঝে মাঝেই এ রকম খবর বেরোয়। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর গ্রামে একজন ইস্কুল মাস্টারের সাত বছর বয়সের ছেলে হঠাৎ একদিন এক জায়গায় একজোড়া বায়াতবলা দেখে বাজাতে শুরু করে। নিখুঁত লয়ে অপূর্ব বাজনা। ছেলেটি তার আগে বায়াতবলা কখনও ছুঁয়েও দেখেনি, শেখা তো দূরের কথা। ছেলেটির তখন মনে পড়ে যায়, পূর্ব জন্মে সে তবলা শিখেছিল, তখন সে থাকত মালদা শহরে। পূর্ব জন্মে তার বাবার নাম ছিল এই, তারা তিন ভাই-বোন ছিল, সেই বাড়িটি দোতলা এবং হলদে রঙের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। মালদায় সত্যিই সেই রকম একটি বাড়িতে সেই রকম একটি পরিবার আছে, সেই পরিবারের একটি ছেলে মারা গেছে আট বছর আগে। ছেলেটি তার পূর্ব জন্ম বিষয়ে আরও যা-যা বলে, সবই মিলে যায়! অর্থাৎ ছেলেটি জাতিস্মর। আশেপাশের বহু গ্রামের লোক ভিড় করে দেখতে আসছে ছেলেটিকে।

বড়বাবু বললেন, আমিও দেখতে যাব। চিরু, তুমি যাবে আমার সঙ্গে!

চিররঞ্জন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখন সেই পুরুলিয়া ছুটবেন? আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

তুমি বিশ্বাস করো না?

চিররঞ্জন আমতা আমতা করে বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। তবে খবরের কাগজে যখন লিখেছে, তখন কি আর মিথ্যে লিখেছে?

বড়বাবু হো-হো করে হেসে বললেন, তুমি যে রামকৃষ্ণদেবের মতন বললে হে! সেই যে এক বাবু খবরের কাগজের ওপর এত ভক্তি যে একটা বাড়ি ভেঙে পড়েছে সেটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না, লোকটা বললেন, দেখো তো খবরের কাগজে লিখেছে কি না। খবরের কাগজে সব সত্যি লেখে?

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি এসব বিশ্বাস করেন না-তা হলে যেতে চাইছেন কেন?

আমি প্রমাণ না পেলে বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। তবে এই রকম ঘটনা প্রায়ই দেখি। আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে।

জন্মান্তরবাদের তত্ত্বটা যদি সত্যি নাও হয়, তবু বড় মধুর। কারনা ইচ্ছে করে, আবার এই পৃথিবীতে জন্মাই, আবার নতুন করে জীবন ফিরে পাই।

মানুষ মরে গিয়ে আবার জন্মায় কি না সেটা প্রমাণ করার কোনও রাস্তা নেই। আগের জন্মের কথা তো কারওর মনে থাকে না-আর মনেই যদি না থাকে, তা হলে বার বার জন্মানোর এমন কিছু মূল্য নেই। দুটো জীবন যদি তুলনা করে দেখা না যায় তা হলে আর মজা কী! এইসব জাতিস্মরের ঘটনা যদি সত্যি হয়, তা হলে সেটাই হতে পারে একমাত্র প্রমাণ। তাই না? যে-সব জাতিস্মরের ঘটনা একবার কাগজে ওঠে, দু-চার বছর বাদে তাদের কী অবস্থা হয়, তখনও সব মনে থাকে কি না-সেটা তো আর বেরোয় না!

আমার কী মনে হয় জানেন। সত্যি তোক মিথ্যে হোক, এইসব ঘটনা কাগজে ছাপাবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই যে সব ছেলে দেশের জন্য লড়াই করছে, ফাঁসির

দড়িতে প্রাণ দিচ্ছে–এরা অনেকেই পরজন্মে খুব বিশ্বাস করে। এইসব খবর পড়লে তাদের বিশ্বাসটা অনেক জোরদার হয়।

বড়বাবু দু'-এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন চিররঞ্জনের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোমার কথায় যুক্তি থাকতে পারে। যাই হোক–এ-ছেলেটির তো বাপের নাম, গ্রামের নাম সবই দেওয়া আছে। নিজের চোখে দেখে যাচাই করে আসতে দোষ কী! আমি কাল সকালেই রওনা হচ্ছি।

বড়বাবুর মাথায় প্রায়ই এ রকম বাতিক চাপে। তার মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তিটা প্রবল। এ বাড়িতে একজন ছুতোরমিস্ত্রি আসে প্রায়ই, দরজা-জানলা সারায় কিংবা রান্নাঘরের র‍্যাক বানায়। লোকটি বেশ বুড়ো, মুখ-ভরতি দাড়ি, লুঙ্গি পরে খালি গায়ে আসে, তার বুকের লোমগুলোও সাদা। লোকটির একটি অদ্ভুত স্বভাব হচ্ছে এই, সে প্রায় সব সময়েই নিজের মনে কথা বলে। অনেক সময় বেশ জোরে জোরে। উঠোনের এক কোণে সে কাঠকুটো নিয়ে র‍্যাদা বা তুরপুন চালাতে চালাতে আপন মনে বকবক করে।

বড়বাবু এই লোকটিকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। কাঠের মিস্তিরি যখন কাজ শুরু করত, বড়বাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করতেন ও কী কথা বলে। দু-চার দিন শোনার পর বড়বাবু সেই মিস্তিরিকে তার বন্ধু করে ফেললেন। চিররঞ্জনকে বললেন, আমাদের এই রজ্জব মিস্তিরি খাঁটি কর্মযোগীন। কাজের সময় ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে কথা বলে, যেন ওরা সবাই তার আপনজন। কী বলে জানো, র‍্যাদা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, আরে ব্ল্যাদার পো র‍্যাদা, এ-দিকে যা, ও-দিকে যা! এ-দিক যা, ও-দিক যা! আমি যে-দিকে যাওয়ামু হিদিকে যাবি! এই কম্মেই তোর জন্মো! তোর কি আমোদ আহ্লাদ করার টাইম আছে! যে-দিকে যাওয়ামু, হিদিকে যাবি! ও হাতুড়ি, তোর কাম পেরেকের মাথা পিটানা, তুই আমার আঙুলের মাথা পিটাইতে চাস ক্যান?–লোকটি মাঝে মাঝে আল্লার সঙ্গেও। সরাসরি কথা বলে। যেন কর্মে মগ্ন থাকার সময় আল্লা ওর সামনে এসে দাঁড়ান। আল্লার কাছে ও হাতুড়ির নামে নালিশ জানায়।

সেই মিস্তিরি এরপর থেকে এ বাড়িতে কোনও কাজ না থাকলেও আসে। বড়বাবুর সঙ্গে কী সব গল্প করে বড়বাবুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে লজ্জিত ভাবে ধরায়, পাশ ফিরে ধোঁয়া ছাড়ে। দু'জনের বেশ মনের মিল হয়েছে বোঝা যায়।

বড়বাবু আর একবার একটা ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবেন ঠিক করেছিলেন। কলকাতা শহরে তখন অনেক খালি বাড়ি থাকত, পথে পথে টু-লেট' নোটিশ দেখা যেত। মালিকের অভাবে বা অযত্নে দু-চারটে পোড়ো বাড়িরও অভাব ছিল না। সেইসব বাড়ি ঘিরে আস্তে আস্তে ভুতুড়ে গল্প দানা বাঁধে। দেশ বিভাগের পর রিফিউজিরা এসে কলকাতার সব ফঁকা বাড়ি দখল করে নিয়েই কলকাতায় ভূতদেরও তাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে নিছক বাজে গুজব কিংবা গালগল্প শুনে ছোটার লোক ছিলেন না বড়বাবু। সেই সময় উত্তর কলকাতার রামধন মিত্তির লেনের একটা হানাবাড়িকে কেন্দ্র করে একটি চাঞ্চল্যকর ভূতের গল্প খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। বড়বাৰু সেখানে যেতে চেয়েছিলেন সত্যের সন্ধানে। তিনতলা এই বাড়িটি বহুকাল পরিত্যক্ত, সদর দরজায় ঘাস গজিয়ে গেছে, দেওয়ালে কার্নিসে বড় বড় বট, অশ্বত্থের শিকড়। মধ্য রাত্রে সেই বাড়ি থেকে বাচ্চা ছেলের চিৎকার, নারীকণ্ঠের কান্না শোনা যেত এবং দেখা যেত একটা সবুজ আলো ছাদের ওপর ঘোরাফেরা করছে। যেসব দুঃসাহসী দিনের বেলাতেও সে বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করেছে, তারা নাকি রক্তবমি করতে করতে মারা গেছে। একটি প্রাইভেট ব্যাঙ্কের মালিকের ডাকাবুকো সন্তান নিজস্ব এরোপ্লেনে সেই বাড়ির ছাদের ওপর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেও সেই সবুজ আলো দেখতে পেয়েছে এবং তার কোনও মানে বুঝতে পারেনি।

তখন সেই বাড়ির রহস্য উদঘাটনে যান কালীকিঙ্কর ঘোষাল। এই কালীকিঙ্কর ঘোষাল শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের হেড পণ্ডিত, তান্ত্রিক মানুষ, মুখ-ভরতি দাড়ি, মাথায় জটা। তিনি ভূত-প্রেতে অবিশ্বাস করে যাননি, গিয়েছিলেন ভূত-প্রেতদের বশ মানাতে। বড়বাবু এই কালীকিঙ্কর ঘোষালকে চিনতেন।

বেশ বলশালী, লম্বা-চওড়া পুরুষ ছিলেন কালীকিঙ্কর ঘোষাল। কিন্তু রামধন মিত্তির লেনের ভূত তাকে আচ্ছা রকম জখম করে দেয়! তার গল্পটি এই রকম: হাতে একটা লাঠি এবং হ্যারিকেন নিয়ে সন্ধ্যার পর সে বাড়িতে ঢুকেছিলেন তিনি। সারা বাড়ি ঘুরে এবং ছাদে পায়চারি করেও কিছু দেখতে পাননি। সারা বাড়ি ধুলোয় ভরতি, মানুষের আনাগোনার কোনও চিহ্ন নেই। দোতলার একটি ঘর কোনও রকম বাসযোগ্য, সেটাকেই সাফসুতরো করে তিনি বসলেন মন্ত্র পড়তে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কোথাও কোনও শব্দ নেই, ভুতের টিকিটিরও দেখা নেই। কালীকিঙ্কর ঘোষাল ধৈর্য হারালেন না। ভূত এ বাড়িতে না থাকলেও তিনি মন্ত্রবলে প্রেতাত্মা ডেকে আনবেন। যে-কোনও প্রেতাত্মা এলেই তিনি জেনে নিতে পারবেন এ বাড়ির অশরীরী বাসিন্দাদের সঠিক খবর।

ঠিক মধ্য রাত্রিতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কালীকিঙ্কর আসন ছেড়ে উঠলেন না। গঙ্গাজলে আচমন সেরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। তৎক্ষণাৎ দেখলেন দরজার সামনে একটি দীর্ঘকায় মনুষ্যমূর্তি। তাকে দেখে কালীকিঙ্কর প্রথমে খুবই চমকে উঠেছিলেন। চমকাবারই কথা, কারণ সেই পুরুষ মূর্তিটির চেহারা হুবহু কালীকিঙ্করেরই মতন। ঠিক যেন কালীকিঙ্করের যমজ ভাই। অথচ কালীকিঙ্করের যমজ কেন, কোনও ভাই-ই নেই। দরজার কাছে দাঁড়ানো কালীকিঙ্করের চেহারা একদৃষ্টে চেয়ে রইল ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট কালীকিঙ্করের দিকে।

কালীকিঙ্কর ঘোষাল বিচলিত হলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা মায়া। অবিকল প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা এক প্রকার রাক্ষসী মায়া। কালীকিঙ্কর বসে আছেন, লোকটি দাঁড়ানো, না হলে বলা যেত তিনি যেন আয়নায় নিজের ছায়া দেখছেন।

কালীকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে? কী চাস?

লোকটি উত্তর না দিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল। তারপর ঘরের মধ্যে এক পা বাড়াল। কালীকিঙ্কর গঙ্গাজল ছিটিয়ে বলেন, যাঃ যাঃ! অমনি মূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

এরপর দরজার কাছে এল একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে। কস্তাপেড়ে ধনেখালির শাড়ি পরা, আঁচলটা জড়িয়ে গাছকোমর করে বাঁধা। একে দেখে কালীকিঙ্কর আরও বেশি চমকে উঠলেন। মেয়েটিকে দেখতে অবিকল কালীকিঙ্করের নিজের মেয়ে। লীলার মতন। তার একমাত্র মেয়ে। মেয়েটিকে দেখে কালীকিঙ্কর দুর্বল হয়ে। পড়েছিলেন, কিন্তু আসন ছেড়ে উঠলেন না।

মেয়েটি ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুই কেন এসেছিস?

(ভূত-প্রেতরা সব সময় তুই বলে। তুমি বা আপনি তাদের অভিধানে নেই।)

কালীকিঙ্কর এর দিকে গঙ্গাজল ছেটাতে পারলেন না। কুমারী মেয়ের প্রতি মন্ত্র খাটে। অপাপবিদ্ধা কুমারী অভিশাপের অতীত।

কালীকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে রে বেটি!

মেয়েটি আর এক পা এগিয়ে এসে ফের জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছিস তুই এখানে? তোর মেয়ে বাড়িতে মরতে বসেছে, আর তুই এখানে বসে আছিস?

কালীকিঙ্করের বুক কেঁপে উঠল। তবু তিনি হেসে উঠে বললেন, আমার মেয়েকে জলজ্যান্ত সুস্থ দেখে এসেছি কয়েক ঘণ্টা আগে-আর এর মধ্যেই সে মরতে বসেছে?

মেয়েটি বলল, যা, বাড়ি গিয়ে দেখ!

কালীকিঙ্কর বললেন, আমার সঙ্গে ছলনা করে তোর সুবিধে হবে না! তুই এই মূর্তি ধরেছিস কেন? আমার মেয়ের কথা আমি বুঝব। তুই কে বল!

মেয়েটি তখন হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ল। মনে হল যেন অভিমান করে কঁদবে। ওই বয়সের মেয়েরা যেমন কাঁদে। তা কিন্তু নয়, মাটিতে শুয়ে গড়াতে গড়াতে চলে এল কালীকিঙ্করের

দিকে। কালীকিঙ্কর জোড়াসন করে বসেছিলেন, মেয়েটি কাছে এসেই কালীকিঙ্করের বাঁ পায়ের বুড়োআঙুল কামড়ে ধরল।

কালীকিঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কী ছাড় ছাড়!

মেয়েটি কালীকিঙ্করের বুড়োআঙুল সম্পূর্ণটা মুখে ভরে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধরেছে। কালীকিঙ্কর পাশে রাখা লাঠিখানা তুললেন তাকে মারবার জন্য। কিন্তু তিনি সাধক মানুষ, একটি মেয়েকে মারার জন্য তার হাত উঠল না, বিশেষত যে-মেয়ের চেহারা তাঁর নিজের কন্যার মতন। লাঠি রেখে কালীকিঙ্কর হাত দিয়ে মেয়েটিকে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেয়েটির গায়ে যেন অসীম শক্তি।

যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কালীকিঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। আসন ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জোর কমে গেল, দরজার কাছে ফিরে এল আগের সেই মূর্তি, তার পেছনে আরও কে যেন। কালীকিঙ্করের মানসিক দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে গেল, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চাচাতে লাগল, ওরে, ওরে, ছাড়, ছাড়, আর আসব না, ছেড়ে দে, মরে গেলাম, মরে গেলাম–

পাড়াসুদ্ধু লোক শুনেছিল সেই চিৎকার। আশেপাশের সমস্ত বাড়ির দরজা-জানলা খুলে গিয়েছিল। কালীকিঙ্কর তখন সেই মেয়েটাকে সুষ্ঠু ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে ছুটে এসেছিলেন বারান্দায়, সেখান থেকে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ দিয়েছিলেন নীচে। তার বাঁ পায়ের বুড়োআঙুল ছিঁড়ে উড়ে গেছে।

খবর পেয়ে বড়বাবু ছুটলেন হাসপাতালে কালীকিঙ্করকে দেখবার জন্য। সত্যি কালীকিঙ্করের এক পায়ের বুড়োআঙুল নেই। এবং সে-রাত্রে কালীকিঙ্করের মেয়ে। লীলার সত্যিই কলেরা হয়েছিল।

বড়বাবু বাড়ি ফিরেছিলেন খুব চিন্তিত ভাবে। চিররঞ্জনকে বলেছিলেন, এসব গাঁজাখুরি গল্পে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু কথা হচ্ছে কী, কালীকিঙ্কর পণ্ডিত এ মিথ্যে গল্প

ছড়াবেনই বা কেন? তা ছাড়া, পায়ের ওই আঙুলটা-দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়লেও কি পায়ের আঙুল ওই ভাবে উড়ে যায়? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।

বড়বাবু সেই ভুতুড়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। বাড়ির সবাই তাকে ভীষণ ভাবে বারণ করল, বড়বাবু কিছুতেই কারওর কথা শুনবেন না। বিশেষ ভাবে তাকে আকৃষ্ট করেছিল ওই প্রতিমূর্তি দেখার ব্যাপারটা। তিনি তার প্রতিমূর্তির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন বোধহয় বিশেষ কোনও কথা তার বলার ছিল।

শেষ পর্যন্ত বড়বাবুর যাওয়া হয়নি। কালীকিঙ্কর ঘোষালের ঘটনাটা এমন ভাবে রটে যায় যে, হাজার হাজার মানুষ গিয়ে ভিড় করে সেই বাড়ির সামনে, পুলিশ জায়গাটা ঘিরে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

খবরের কাগজে জাতিস্মরের ঘটনাটা পড়ার পরদিন বড়বাবু চিররঞ্জনকে নিয়ে পুরুলিয়া রওনা হয়ে গেলেন। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে রঘুনাথপুর গ্রামে যেতে হলে গোরুরগাড়ি ছাড়া আর কোনও যানবাহন নেই। কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার পর একখানা। গোরুরগাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা চেপে বসলেন।

প্রায় এক বেলার পথ। রাস্তার অবস্থা কহতব্য নয়। ঝাঁকুনি খেতে খেতে হাড়গোড় ভেঙে যাবার উপক্রম। পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, সেদিন আর ফেরার প্রশ্ন। ওঠে না। সেই গণ্ডগ্রামে কোনও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভরসার কথা এই, গ্রীষ্মকাল, শেষ পর্যন্ত দরকার হলে গোরুরগাড়িতেই শুয়ে থাকতে পারা যাবে। পুরোটাই যাতে মরীচিৎকার পিছে ছোটা হয়ে না যায়, সেই জন্য পুরুলিয়া স্টেশনে তারা খবর নিয়ে এসেছেন। স্টেশনের দু'-চার জন লোকও সেই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনেছে।

বড়বাবু চিররঞ্জনকে বললেন, বুঝলে, গিয়ে যাতে সম্পূর্ণ নিরাশ না হতে হয়, সে জন্য প্রস্তুত থাকা ভালো। যদি গিয়ে দেখি পুরো ব্যাপারটাই বানানো, তা হলেও একটা জিনিস ভাবতে হবে। এই রকম এক গণ্ডগ্রামের একজন ইস্কুল মাস্টারের মাথায় হঠাৎ এ রকম

একটা ঘটনা বানাবার কথা জাগল কী করে? সবার মাথায় তো এ রকম চিন্তা জাগে না। এটাও তো একটা রহস্য।

চিররঞ্জন বললেন, মনে হচ্ছে, হঠাৎ যেন আমাদের বয়স কমে গেছে। ছেলেছোকরারাই এইসব অ্যাডভেঞ্চারে যায়।

বড়বাবু সচকিত হয়ে বললেন, তোমার ভালো লাগছে না? কষ্ট হচ্ছে খুব?

না, না! খুব বেশি ভালো লাগছে বলেই এ কথা বললাম। বয়স কমে যাবার অনুভূতির চেয়ে প্রিয় আর কী আছে এ বয়সে।

তুমি বড্ড বেশি বুড়ো বুড়ো ভাব করো। তোমার কী-ই বা বয়স। তোমার বয়সে আমি লছমনঝোলায় থাকতাম-রোজ একখানা পাহাড় ভেঙে যেতাম গঙ্গায় স্নান করতে।

আপনার গায়ে বয়সের আঁচড় লাগে না। আচ্ছা বড়বাবু, হরিদ্বার-লছমনঝোলায় আপনি যে বছরখানেক কাটিয়েছিলেন, কী পেয়েছিলেন সেখানে। ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন?

ঈশ্বরকে কেউ পায়?

পায় না?

আমি অন্তত ঈশ্বরকে পেতে যাইনি। আমি দেখতে গিয়েছিলাম সত্যিই ঈশ্বরকে কেউ পায় কি না।

সে রকম কারওকে পাননি?

নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। যারা খুব জোর দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শনের কথা বলেছেন, তাদের আমার মনে হয়েছে মানসিক ভাবে অসুস্থ। তবে একথাও ঠিক, ঈশ্বর-চর্চা যারা খুব মন দিয়ে করেন তাদের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তনের চিহ্ন দেখেছি-যা বেশ আনন্দেরই ব্যাপার। ঈশ্বর-সন্ধানী লোকদের আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ধার্মিক

লোকদের আমি পছন্দ করতে পারলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না আমি জানি না, থাকুন তাতে কোনও ক্ষতি নেই কিন্তু ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যে কতগুলি ধর্ম গড়ে উঠেছে-সেগুলো মানুষের বড় ক্ষতি করে।

কেন, একথা বলছেন কেন?

প্রত্যেক ধর্মে আলাদা আলাদা ঈশ্বর বড় হিংসুটে। ওল্ড টেস্টামেন্টে খোলাখুলিই বলা হয়েছে, তিনি জেলাস গড! এক ধর্ম আর এক ধর্মকে সহ্য করে না। আবার এক একটা ধর্মের মধ্যেও ফাটল ধরে বিভিন্ন টুকরো হয় তারা আবার নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। এক একটা ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত মানুষ খুন হয়েছে, প্লেগ, কলেরা বা সাপের কামড়েও অত মানুষ মরেনি।

আমাদের বেদে তো হিংসার কোনও কথা নেই।

তুমি বেদ পড়েছ?

তেমন ভালো করে পড়িনি।

পড়ে দেখো, বেশ মজা পাবে। আমি একসময় ঝোঁকের মাথায় পড়ে ফেলেছি। বেদকে অনেকে বলে হিন্দুদের একটা ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ওটা একটা গাঁজাখুরি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশাই বেদকে বলেছেন পলগ্রেভ সাহেবের গোল্ডেন ট্রেজারির মতন একখানা পদ্যের বইয়ের সংকলন। উনি ভূয়োদর্শী লোক, বলেছেন ঠিক কথাই। যে-সব প্রাচীন আর্যরা হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান, জরাথুষ্ট্রিয়ানসবারই পূর্বপুরুষ, তাদের লেখা কিছু কবিতাই তো বেদ নামে চলে। ওরা ছিল প্যাগন, প্রকৃতি-পূজারী। আগুন, হাওয়া, বৃষ্টি এগুলোকেই দেবতা বানিয়ে পূজা করার তবু একটা মানে বুঝতে পারি, কিন্তু জগৎ সংসারের সৃষ্টিকর্তা একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো দূরে থাক, এ রকম কল্পনার কোনও প্রয়োজন আছে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। বেদেও কোনও ধর্মের কথা নেই, ওটা পুরোপুরি ভোগবিলাসপ্রিয় মানুষদের সাহিত্য। বৈরাগ্য, আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরানুভূতি এসব

ভালো ভালো কথা এসেছে অনেক পরে-উপনিষদের আমলে, অনার্য আর দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পাওয়া। পূজা শব্দটাই তো বৈদিক সংস্কৃত নয়-দ্রাবিড়দের কাছ থেকে এসে সংস্কৃতে ঢুকেছে। আমরা এখন যেটুকু হিন্দুধর্ম বলে জানি, সেটা কোনও ধর্মই নয়, একটা জগাখিচুড়ি ব্যাপার। এরা ভালো ভালো সাহিত্য বানিয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে উপদেশ হিসেবে নেওয়ার কোনও দরকার নেই। দেখো না, এই ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলোতে কোথাও মূর্তিপুজোর কথা নেই, অথচ সারা ভারত জুড়ে কত রকম পুতুলের কত রকম পুজো। আমাদের ব্রাহ্মরা এই ধর্মটা সাফসুফ করে একটা পরিষ্কার। চেহারা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বেম্মদের সেই ধর্ম বাজারে তেমন চলল না। কুসংস্কার ছাড়া ধর্ম টেকে না। প্রত্যেকটা ধর্মই কুসংস্কারের ডিপো।

চিররঞ্জন আস্তে আস্তে বললেন, মানুষ যদি কুসংস্কার মেনেই আনন্দ পায়–

বড়বাবু ঝাঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, আনন্দ পাওয়ার কথা আলাদা। কিন্তু যখন কেউ এর মধ্যে তত্ত্বের কথা বলে, তখনই আমার রাগ ধরে। বললেই পারিস, আমার গায়ে জোর আছে, মানুষ খুন করে আমি আনন্দ পাই-এর মধ্যে আবার ধর্ম টেনে আনা কেন?

গাড়োয়ান বলল, বাবু, হুই যে দেখা যায় রঘুনাথপুরের আলো, আপনারা কার বাড়িতে যাবেন? বালক-ঠাকুর দেখতে যাবেন নাকি?

বড়বাবু মুচকি হেসে চিররঞ্জনকে বললেন, দেখেছ, এর মধ্যেই ঠাকুর বানিয়ে ফেলেছে!

১৪. রসময় চক্রবর্তীর বাড়িতে

রসময় চক্রবর্তীর বাড়িতে মাটির দেওয়াল ওপরে খাপরার ছাদ। প্রাইমারি স্কুলের রসময় চক্রবর্তীর অবস্থা বোধহয় এবার ফিরবে। তার ছেলে পিতু অর্থাৎ সুপতিকে দেখবার জন্য। এত বেশি ভিড় হচ্ছে যে ভিড় সামলাবার জন্য রসময় চক্রবর্তীকে বাড়ির সামনে কাটাতারের বেড়া তুলতে হয়েছে-লোকজন এখন লাইন দিয়ে ভেতরে ঢোকে এবং দর্শনী

এক আনা। পিতুর সঙ্গে কথা বলার জন্য রেট আট আনা, তবলা শুনতে হলে এক টাকা। তাতেও সারা দিন হাজার হাজার মানুষ আসছে। জায়গাটায় ছোটখাটো মেলা বসে গেছে, গজিয়ে উঠেছে চায়ের দোকান, পানের দোকান, মুড়িমশলা, বেলুন। দু-তিনটে হ্যাঁজাক জ্বলছে।

।বড়বাবু আর চিররঞ্জন কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ভিড় থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন নিম্নস্বরে। চিররঞ্জন বললেন, এত লোক যখন আসছে, তখন একটা কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই। লোকে পয়সা দিয়ে দেখছে!

বড়বাবু বললেন, তুমি মাটির মধ্যে একটা গোল ধরনের পাথর পুঁতে রটিয়ে দাও যে সেটা মাটি খুঁড়ে বেরিয়েছে, তুমি স্বপ্নে সেটা জানতে পেরেছ-আর প্রত্যেক দিন একটা গোরু এসে ওই পাথরটার ওপর বাঁট থেকে দুধ দিয়ে যায়-দেখবে তাতেও হাজার হাজার লোক আসবে। পয়সাও দেবে!

কিন্তু লোকজন বলাবলি করছে, জেলার ডি এস পি সাহেবও এসে দেখে গেছেন। বুজরুকি কিছু হলে কি তিনি চলতে দিতেন? ইংরেজ।

ওঃ চিরু, তোমার ইংরেজ-ভক্তির তুলনা নেই! ইংরেজদের মধ্যে বুঝি কুসংস্কার নেই? কত যে আছে, তা ওদের সাহিত্য পড়লেই বোঝা যায়। ইংরেজি ভাষায় ভূতের গল্প নেই? তা ছাড়া আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে কুসংস্কার টিকিয়ে রাখায় ওদের স্বার্থ আছে।

আপনি যে দেখছি পুরোপুরি অবিশ্বাস নিয়েই এসেছেন। তবু এত দূর ছুটে এলেন!

বড়বাবু হঠাৎ লাজুক ভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, একটা জিনিস বুঝতে পারোনি? আমি বিশ্বাস করতে চাই-তাই তো আমার এত অবিশ্বাস।

রাত বাড়তে থাকলে আস্তে আস্তে ভিড় কমতে লাগল। শেষ দর্শকটি চলে যাবার পর ওঁরা দু'জন এগোলেন বাড়ির দরজার দিকে।

রসময় চক্রবর্তী তখন একগাদা খুচরো পয়সা নিয়ে গুণতে ব্যস্ত, ওঁদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, আর হবে না, আর হবে না, এখন বন্ধ! এখন চলে যাও!

তারপর বড়বাবুর রাশভারী চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে একটু থতমত খেয়ে গেলেন। মনে করলেন, বিশেষ কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন বুঝি! রসময় চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পয়সার বাক্সটা উলটে পড়ে গেল। তখন তিনি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে বললেন, আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে সবাই! আমার ছেলে। বাঁচবে না! আমি পয়সাকড়ি কিচ্ছু চাই না। আমার ছেলেকে বাঁচান! এক মিনিট ছুটি নেই– লোকজন কথা শোনে না, এক মিনিট ওকে বিশ্রাম দেয় না-খাবার পর্যন্ত সময়। পায় না ছেলেটাকেন আমার কপালে এই হল!

বড়বাবু তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার কোনও চিন্তা নেই। আপনার ছেলেকে এখন বিরক্ত করতে চাই না, আপনার সঙ্গেই দুটো কথা বলতে চাই।

রসময় চক্রবর্তী একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোথা থেকে। আসছেন?

কলকাতা থেকে।

পুরুলিয়ায় ক্ষুদ্র গ্রামে কলকাতা শহরের নাম তখন ম্যাজিকের মতন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে খাঁটি কলকাতার মানুষ সচরাচর গ্রামে পদার্পণ করেনি, তখন দক্ষিণেশ্বরবরানগর ঘুরে আসাই ছিল পল্লিভ্রমণ। সেই কলকাতা থেকে দু'জন সম্ভ্রান্ত চেহারার ব্যক্তি শুধু তার ছেলেকে দেখার জন্যই এসেছেন, এতে রসময় চক্রবর্তী বেশ অভিভূত হয়ে পড়েন। শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনারা উঠেছেন কোথায়? এই রাত্তিরে ফিরবেন কী করে?

অমরনাথ বললেন, সে জন্য চিন্তা করবেন না, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কীসের ব্যবস্থা করবেন? এ পাড়াগাঁ জায়গা, হোটেল বলে তো কিছু নেই–

আমরা গোরুর গাড়িতেই শুয়ে থাকব।

সেও কি হয়! আপনারা শোবেন গোরুর গাড়িতে? এ-গাঁয়ের তা হলে কোনও ইজ্জত থাকবে? দয়া করে আপনারা যদি আমার বাড়িতেই-

রসময় চক্রবর্তী কিছুতেই ছাড়লেন না! তার অতিথিপরায়ণতাই প্রবল হয়ে উঠল। বাড়ির ভেতরে গিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে আবার ফিরে এলেন ঢাকা বারান্দায়। বললেন, নিন স্যার, আপনারা জামাকাপড় ছেড়ে আরাম করে বসুন! যা গরম এ বছর, মা। বসুমতী একেবারে দগ্ধ হচ্ছেন। পুকুর-নালা সব শুকিয়ে গেল!

পিতু অর্থাৎ সুপতির সঙ্গে তখনও কোনও কথা হয়নি। একবার মাত্র তাকে চোখে। দেখা হয়েছে। মস্তবড় একটা কাঁসার থালায় নানা রকম খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে তাকে খাওয়ানো হচ্ছে মহা সমারোহে। যেন সে এ বাড়ির ছেলে নয়, কোনও একজন গণ্যমান্য অতিথি! কদিন আগেও সে নিশ্চয়ই বাপ-মায়ের কাছ থেকে চড়চাপড় খেয়েছে, খিদে পেলে ঘ্যান ঘ্যান করেছে-আজ সে বাড়ির চোখে সম্পূর্ণ অন্য রকম! তার মায়ের ধারণা, ছেলের ওপর কোনও দেবতা ভর করেছে। অপদেবতা কিংবা ভূতে প্রায়ই মানুষের ওপর ভর করে, এ গ্রামেই দু মাস আগে একজন বিবাহিতা রমণীর ওপর ভূতের ভর হয়েছিল, চওরা এসে সর্ষে চালান দিয়ে সেই ভূতকে ছাড়িয়েছে! রসময় চক্রবর্তীর স্ত্রীর জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য যে তার ছেলের ওপর ভূতের বদলে দেবতার ভর হয়েছে। সে দাঁত কিড়মিড় করে না। অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

ছেলেটার বয়স আট-নয় বছর হবে, অসম্ভব রোগা। তাকে একটি নতুন কোরা ধুতি এবং নতুন মখমলের পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে, কিন্তু চুলে চিরুনি দেওয়া হয়নি! মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, চোখদুটি অসুস্থ মানুষের মতন ছলছলে। তার খাওয়ার ভঙ্গিও অস্বাভাবিক! সে এক এক রকম খাবারে খামচা মেরে মেরে এক খাবলা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে, সবটা না খেয়েই ছিটিয়ে দিচ্ছে থুথু করে! তার মা এক হাতে পাখার হাওয়া করতে করতে অন্য হাতে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছেন, খাও বাবা, মানিক আমার, সোনা

আমার, একটু খাও! পায়েসটা ভালো লাগছে না? একটু দই খাবে? তোমার জন্য মালপোয়া বানিয়েছি।

রসময় চক্রবর্তী দুটি হুঁকো সেজে এনেছিলেন, বড়বাবু একটি নিয়ে টানতে লাগলেন। চিররঞ্জন ধূমপান করেন না। অনেকক্ষণ ধরে তিনি একটাও কথা বলেননি, সবকিছু দেখে যাচ্ছিলেন চুপচাপ করে। এখন বারান্দার তক্তপোশে বসে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। দোকানপাট উঠে গেছে, যতদূর চোখ যায় নিচ্ছিদ্র অন্ধকার! মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে-সে-ডাকও যেন অনেকটা ফেউয়ের মতন! একটু আগেই শুনেছেন, এখানে মাঝে মাঝে চিতাবাঘ বেরোয়!

তক্তপোশের ওপরেই রাখা আছে বায়া-তবলা! সেদিকে তাকিয়ে বড়বাবু রসময় চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজে তবলা বাজাতে জানেন?

রসময় বিনীত ভাবে বললেন, আজ্ঞে, একটু একটু! একসময় গানবাজনায় চর্চা করতাম! কুমিরপোতার রাজবাড়িতে ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেব কিছু দিন এসে ছিলেন-

আপনার ছেলে বোধহয় আপনার শুনে শুনেই তবলা শিখেছে!

আজ্ঞে না, শুনে শুনে কি শেখা যায়? এসব যন্তরে হাত না পড়লে আমি নিজেই তো তাকে শিখিয়েছি!

বড়বাবু চমকে উঠে বললেন, আপনি আপনার ছেলেকে তবলা বাজানো শিখিয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

তবে যে খবরের কাগজে লিখেছে, ও জীবনে কখনও তবলা ছুঁয়ে দেখেইনি! হঠাৎ বাজাতে শুরু করেছে!

ওটা ঠিক নয়। আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলব কেন?

বড়বাবু বিমূঢ় ভাবে তাকালেন চিররঞ্জনের দিকে। দু'জনে চোখাচোখি হল। এতটা রাস্তা বৃথাই আসা হল তা হলে?

রসময় বললেন, আপনাদের কাছে স্যার লুকোছাপা কিছু নেই। সব খোলাখুলি বলছি। এর মধ্যে একটা কিছু ব্যাপার আছেই। মিস্ত্রি যাকে বলে। আপনারা মানী গুণী লোক, আপনারাই বিচার করে আমাকে বলে দিন। আমি নিজের হাতে আমার ছেলেকে তবলা। শিখিয়েছি। এই একটু ধা ধিন না, না তিন না-মানে একটু দাদরা, কাহারবা আর ত্রিতাল-মানে কোনও রকমে ঠেকা দিতে পারা আর কী! আমার ছেলে কতটুকুনি শিখেছে তা তো আমার বেশি আর কেউ জানে না! আমার কাছ থেকেই তো শিখেছে-আর আমিও তো এর বেশি জানি না। তারপর একদিন কী হল, ওরেঃ বাস রে বাস, ভাবতে গেলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়, আমার হাতের নোম কী রকম খাড়া হয়ে গেছে।

বড়বাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল একদিন?

কী বলব স্যার আপনাকে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি শুনতে পেলাম পাশের ঘরে তবলার বোলের যেন খই ফুটছে। কোনও ওস্তাদ যেন বসে লহরা বাজাচ্ছে! তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে দেখি, ঘরে আর কেউ নেই। আমার ছেলে পিতু! এ-দৃশ্য দেখলে গায়ে কাঁটা দেবে না!

আপনার ছেলে হঠাৎ খুব ভালো তবলা বাজাতে শিখে গেছে, এই তো? এতে খুব বেশি আশ্চর্য হবার কী আছে! ওই বয়সি ছেলের পক্ষে ভালো তবলা বাজানো তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আগেও দেখা গেছে!

আপনি কী বলছেন স্যার? আশ্চর্য নয়? তবলার বোল কি গাছে ফলে? গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে কত সাধ্যসাধনা করে তবে শিখতে হয়। আমার ছেলে কোনও দিন এ গাঁ ছেড়ে বাইরে যায়নি, তার শিক্ষা আমার কাছ-আমিও নিজেও জানি অতি সামান্যই আর আমার ছেলে হঠাৎ এতখানি শিখে ফেলবে-এ কি মুখের কথা? এখন তার বাজনা শুনলে কণ্ঠে মহারাজ কিংবা হীরু গাঙ্গুলি পর্যন্ত অবাক হয়ে যাবেন! আর কী দুর্দান্ত লয়! এত দ্রুত

লয়ে বাজাতে পারে যে আঙুল দেখা যায় নাসারা জীবন সাধনা করলেও অনেকে এমনটি পারে না-আপনি নিজের কানে শুনলে, নিজের চোখে দেখলে তবে বুঝতে পারবেন!

আপনি আপনার ছেলেকে সে-দিন কিছু জিজ্ঞেস করেননি!

করেছি বই কী! আমি বললাম, পিতু, তুই বাজাচ্ছিলি এতক্ষণ? আবার বাজা তো দেখি! একী, এ যে অসম্ভব! অসম্ভব! আমার ছেলে কী বলল জানেন? সে বলল, পিতু। কে? আমার নাম বিশ্বেশ্বর! আমি এখানে কেন? ছেলের মুখের ভাবই তখন অন্য রকম। যেন একজন বয়স্ক লোক। আমার গিন্নিও তখন এসে হাজির হয়েছে। সে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বলল, ও পিতু, তুই কী বলছিস কী? ছেলে উত্তর দিল, আমি পিতু নয়, আমি বিশ্বেশ্বর। আমার গিন্নির তখন ধারণা হল, ছেলের ওপর শিবের ভর হয়েছে। গত বছর গাজনের মেলায় ওই ছেলে শিব সেজে নেচেছিল কিনা! শিবের ভর না হলে সে অমন করে তবলা বাজাবে কী করে!

বড়বাবু বললেন, শিবঠাকুর ভালো তবলা বাজাতে জানেন-এমন কথা কখনও শোনা যায়নি। উনি তো ডমরু বাজান-তার সঙ্গে তো বাঁয়া-তবলার মিল নেই। চিরু, তুমি কী বলো?

চিররঞ্জন একাগ্র ভাবে শুনছিলেন। উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলেন।

রসময় বললেন, সে কী বলছেন, ঠাকুরদেবতারা সবই পারেন। ওঁদের কাছে তবলাই বা কী আর বেহালাই বা কী! তবে, আমি অবশ্য ঠাকুরদেবতার কথা ভাবিনি। ঠাকুরদেবতারা আমার মতন অভাগার বাড়িতে আসবেনই বা কেন? আমি ছেলেকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করলুম। ছেলে বলল, তার নাম বিশ্বেশ্বর হালদার। তার বাড়ি মালদা টাউনে, সেখানে তার বাপের দোতলা বাড়ি। বার বার আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আমি এখানে কেন? আমি এখানে কেন? আমি বুঝতে পারলাম, এ ছেলে জাতিস্মর। দৈবাৎ পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেছে। কোটিতে গুটিক এমনটি হয়।

বড়বাবু সন্দিগ্ধ ভাবে বললেন, বিশ্বেশ্বর হালদার নামে কোনও বিখ্যাত তবলচির নাম তো আমি শুনিনি!

মফসসলে কত ভালো ভালো গুণী লোক পড়ে আছে, কলকাতার লোকরা কি সব খবর রাখে!

আচ্ছা বেশ। আপনি মালদায় আপনার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন?

তা এখনও যেতে পারিনি। তবে এ-গাঁয়ের একজন তোক মালদায় গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে-মালদা টাউনে সত্যিই অনন্ত হালদার নামে তেজারতের কারবারি এক ভদ্রলোক আছে। তেনার দোতলা বাড়ি, বিশ্বেশ্বর নামে এক ছেলে মারা গেছে বছর দশেক আগে।

বড়বাবু একটু বিরক্ত হলেন। কোনও কাজ সুষ্ঠু ভাবে না হলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এই লোকটি তার ছেলেকে চিড়িয়াখানার জন্তুর মতন টিকিট কেটে মানুষজনকে দেখাচ্ছে। তার কি উচিত ছিল না-প্রথমেই ছেলেকে মালদায় নিয়ে সত্যাসত্য যাচাই করা!

বড়বাবুর ভাবভঙ্গি দেখে রসময় চক্রবর্তী একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, ছেলেতে ডাকব স্যার? আপনি নিজের চক্ষে দেখবেন?

বড়বাবু বললেন, না, তার দরকার নেই। সে এখন বিশ্রাম করুক। আপনার সঙ্গেই কথা শেষ হয়নি। আমি অকপটে কথাবলা পছন্দ করি। সত্যি কথা বলতে কী, মালদার ব্যাপারটা আমার উড়ো কথা বলে মনে হচ্ছে। তবলা বাজানো কিংবা এ রকম একটা-আধটা উড়ো কথায় কিছুই প্রমাণ হয় না। আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার!

রসময় এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। খানিকটা তোতলাতে তোতলাতে বললেন, আপনি বিশ্বাস করছেন না? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি! এ যে আমারও বুদ্ধির অতীত! ডি এস

পি সাহেব এসেছিলেন, তার সঙ্গে ছেলে আমার গড়গড় করে ইংরেজি বলে গেল! এ-গাঁয়ের একটা লোকও ইংরেজি জানে না, আমি নিজেও জানি না! ভাবতে গেলে আমার নিজেরই মাথা ঘোরে!

দুটো শেয়াল বাড়ির কাছ থেকেই ডেকে উঠল, ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে গেল একটা কুকুর। অনেকক্ষণ বাদে উঠেছে একটা ক্ষীণ মতন চাঁদ। সেই চাঁদ আড়াল করে উড়ে গেল একটা প্যাচা। এক দিকের অন্ধকার দিগন্ত থেকে উড়ে এসে কেন সে অন্য দিকের অন্ধকারে উড়ে যায়, তার মানে বোঝা যায় না।

চিররঞ্জন ধড়ফড় করে খাট থেকে নেমে বললেন, এসো খোকা, তুমি এখানে এসে বোসো!

ঘর থেকে বেরিয়ে কখন সুপতি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অবোধ বালকের মতন তার মুখে একটা আঙুল। একদৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে আগন্তুক দু'জনের দিকে। সারা দিন ধরে অসংখ্য মানুষজন তাকে দেখে গেছে, এখন সে নিজে দেখছে অন্য মানুষদের।

ছেলেটিকে দেখে চিররঞ্জনের হঠাৎ মনে পড়ল তার নিজের ছেলের কথা। বাদলেরই বয়সি হবে-যদিও স্বাস্থ্য এর ভালো না। ছেলেটির দিকে তাকালে একটু অন্য রকম অনুভূতি হয়ই-ঠিক যেন আর পাঁচজনের মতন না।

রসময় বললেন, আয় পিতু, এঁরা কলকেতা থেকে এয়েছেন। প্রণাম কর!

ছেলেটি প্রণাম করল না, গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বড়বাবু বললেন, থাক, থাক। তারপর উঠে গিয়ে বড়বাবু ছেলেটির একেবারে সামনে গিয়ে শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, বিশ্বেশ্বর হালদার! মাই নেম ইজ বিশ্বেশ্বর হালদার! মাই ফাদারস নেম ইজ অনন্ত হালদার!

ছেলেটি এত জোর চেঁচিয়ে উঠল যে শুনে হকচকিয়ে যেতে হয়। কথা বলার সময় সে কারওর চোখের দিকে তাকায় না; মাটির দিকে চেয়ে থাকে। এবং সেই সময় তার শরীর একটু একটু দোলে।

রসময় বললেন, পিতু, বাবা, এনাদের একটু তবলা বাজিয়ে শোনাও তো!

বড়বাবু বললেন, থাক, এখন থাক। এখন দরকার নেই। কিন্তু ছেলেটি পূর্ববৎ চেঁচিয়ে হুকুমের সুরে বলল, মানি! গিভ হিম মানি! আই শ্যাল প্লে তবলা, গিভ হিম মানি!

রসময় বললেন, দেখলেন! দেখলেন? এক অক্ষর ইংরেজি জানার কথা নয়। কোনও দিন পড়েইনি, এ কী করে সম্ভব বলুন!

ছেলেটির ইংরেজি বলার ধরন খুবই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরই মতন। এই ইংরেজি জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায় না। যে-গ্রামে শুধু একটি প্রাইমারি স্কুলই সম্বল সেখানে অধিকাংশ ছেলেই ইংরেজি বলতে পারে না বটে, কিন্তু শিখে নেওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়।

বড়বাবু পকেট থেকে দুটি রুপোর টাকা বের করে রাখলেন তক্তপোশের ওপর। ছেলেটি কাঠের পুতুলের মতন খাড়া ভাবে এগিয়ে এসে খাটে উঠে বসল। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে একটুও দেরি না করে ধাই ধপাধপ করে বাজাতে লাগল তবলা। বড়বাবু সংগীতে অভিজ্ঞ, খানিকটা শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটির তবলায় হাত আছে। ঠিকই, খুব একটা উচ্চাঙ্গের বাজনা নয় অবশ্য-তবে অন্য কারওর কাছে না শেখার ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তা হলে আশ্চর্যই বলতে হবে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির ভাবভঙ্গি। তার হাঁটা, তার কথা বলা, তবলাদুটো টেনে নিয়ে বসা-এর মধ্যে শিশুসুলভ কোনও ভাবই নেই। তার ভেতর থেকে যেন একটা অন্য মানুষ তাকে চালাচ্ছে-এ রকম একটা ধারণা হয়ই।

চিররঞ্জন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, ফিসফিস করে বললেন, সত্যিই বিস্ময়কর, সত্যিই বিস্ময়কর!

বড়বাবু বললেন, খুব সম্ভব ছেলেটির মৃগী রোগ আছে। ছেলেটি যে অসুস্থ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হাত তুলে ছেলেটিকে বাজনা থামাতে বলে বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, খোকা, তুমি কার কাছে বাজানো শিখেছ?

ছেলেটি বলল, ওস্তাদ দীনেশ সিং যাদব। গুরুর নাম উচ্চারণ করেই সে এক হাত কানে হেঁয়াল-অবিকল পেশাদারদের মতন।

কোথায় থাকেন তিনি?

মালদায়।

রসময় তাড়াতাড়ি জানালেন, আমার ছেলে জীবনে কখনও এ-গ্রামের বাইরে যায়নি।

বড়বাবু রসময়ের দিকে ফিরে বললেন, শুনুন মশাই, আপনার ছেলেকে কালই মালদায় নিয়ে যেতে হবে-আমি সব খরচপত্তর দেব, আপনি রাজি আছেন? তারপর এ-ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে আপনারা সবাই গিয়ে আমার বাড়িতে থাকবেন বড় বড় ডাক্তার এনে দেখাতে হবে একে। আর একটা কথা, আপনার ছেলে জাতিস্মর হোক বা না হোক এ যে অসুস্থ তাতে কোনও সন্দেহ নেই! এর চিকিৎসা না করিয়ে আপনি একে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছেন! আপনার লজ্জা করে না!

রসময় চক্রবর্তী এবার ভেঙে পড়লেন! কান্না-আপ্লুত গলায় বললেন, আমি চাইনি, আমি চাইনি-ছেলে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করব-এমন মানুষ আমি না! এই পইতে ছুঁয়ে বলছি, আমার কথা যদি মিথ্যে হয়, আমি মহাপাতকী হব। কী করে যেন ওর কথা রটে গেছে-রোজ হাজার হাজার লোক আসছে দেখতে-ছেলেটাকে এক দণ্ড বিশ্রাম দেয় না।

লোকে দেখছে, তার জন্য পয়সা নিচ্ছেন কেন?

উপায় নেই। পয়সা না নিলে সবাই একসঙ্গে ভিড় করে আসে-আমার বাড়ি ঘরদোর ভেঙে ফেলত! আপনি আমার ছেলেকে বাঁচান। আপনি ওকে যেখানে নিয়ে যেতে বললেন, যাব। আমার ছেলেটা বাঁচুক, আমি একটা পয়সা চাই না!

বড়বাবু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকা, তোমার নাম বিশ্বেশ্বর বলছ কেন? তোমার নাম তো সুপতি!

ছেলেটি কড়া গলায় বলল, না, আমার নাম বিশ্বেশ্বর!

বড়বাবু এরপর যা করলেন, তাতে সবাই আঁতকে উঠল। বড়বাবু হঠাৎ প্রচণ্ড এক চড় কষালেন ছেলেটির গালে। দারুণ ধমক দিয়ে বললেন, ঠিক করে নাম বলো! ছেলেটি তবুও বলল, বিশ্বেশ্বর। এবার অন্য গালে আর এক চড়।

ছেলেটি কেঁদে ফেলল। এতক্ষণ বাদে সে কনুইয়ের ভাঁজে মুখ গুঁজে শিশুর মতন কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অন্যরা স্তব্ধ। বড়বাবুর রুদ্র মূর্তি দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না।

চিররঞ্জন উঠে এসে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলোত লাগলেন। তার কপালে একবার হাত ছুঁইয়ে বললেন, ইস, এর তো দেখছি খুব জ্বর!

রসময় আস্তে আস্তে বললেন, জ্বর নয়, বরাবরই ওর এ রকম-সেই বাচ্চা বয়স থেকেই ওর টেম্পারেচার বেশি থাকে। গায়ে হাত দিলে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কখনও?

এখানে ডাক্তার কোথায় পাব। কবরেজমশাই দেখে বলেছেন, ও কিছু নয়, ওর পিত্তির ধাত আছে।

চিররঞ্জন তখন ছেলেটিকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করছেন, তোমার কী হয়েছে বলে তো!

ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, আমি অন্য বাড়িতে ছিলাম!

কোন অন্য বাড়িতে?

অন্য রকম বাড়িতে। আমার অন্য রকম বাবা-মা। আমার দু'জন দিদি ছিল। আমার জামাইবাবু যাত্রায় অ্যাক্টো করতেন। তারপর আমার মায়ের দয়া হল। এই দেখুন না, আমার গায়ে বসন্তের দাগ।

কই তোমার গায়ে তো কোনও বসন্তের দাগ নেই!

ছিল! আমার আগের জন্মে ছিল!

আগের জন্ম? তোমার আগের জন্মের কথা মনে আছে!

সব মনে আছে!

আর কী কী মনে আছে বলো তো!

কেন বলব? মানি! গিভ মি মানি! গিভ মি মানি!

টাকা নিয়ে তুমি কী করবে?

খাব। লুচি খাব! অনেক লুচি খাব!

চিররঞ্জনের ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে গেল। বড়বাবু পকেট থেকে আরও টাকা বার করে চিররঞ্জনকে চোখের ইশারা করলেন। তারপর ছেলেটিকে বললেন, এই নাও, টাকা নিয়ে যাও।

ছেলেটি আসতে চাইছে না, বড়বাবুকে ভয় পাচ্ছে। বড়বাবু মিষ্টি গলায় বললেন, এসো, কোনও ভয় নেই। আর মারব না।

ছেলেটি টাকার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে এগিয়ে এল এক পা এক পা করে। বড়বাবু খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন। খুব আদর মিশিয়ে বললেন, তুমি আমার বাড়িতে যাবে? তোমাকে লুচি খাওয়াব।

ছেলেটি কোনও উত্তর দিল না। সে যেন খুব লজ্জা পেয়েছে।

আগের জন্মে তুমি বুঝি লুচি খেতে ভালোবাসতে?

হ্যাঁ।

আর কী ভালোবাসতে?

নতুন গুড়ের সন্দেশ।

বাঃ! কলকাতায় খুব ভালো ভালো সন্দেশ পাওয়া যায়। যাবে কলকাতায়?

যাব!

তোমার গায়ে তো জ্বর রয়েছে দেখছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

না।

আগের জন্মে তুমি কার সঙ্গে তবলা বাজাতে!

জামাইবাবুর সঙ্গে। জামাইবাবুর যাত্রা পার্টিতে।

বড়বাবু ঘাড় ঘুরিয়ে রসময়কে জিজ্ঞেস করলেন, এ কখনও যাত্রা দেখেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দু-তিন বার।

বড়বাবু চিররঞ্জনকে বললেন, দিস কুড বি এ ড্রিম! প্রোলন্‌গ্‌ড ড্রিম!

চিররঞ্জন বললেন, এ-জগতের সবকিছু আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। যতই চেষ্টা করুন।

বড়বাবু ছেলেটিকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর কী মনে আছে?

একটা মটরগাড়ি।

মটরগাড়ি?

নীল নীল রং। সামনে দুটো বড় বড় চোখের মতন আলো। ভাপো ভালো করে আওয়াজ হয়!

রসময় বললেন, স্যার স্যার, একথাটা আমিও আগে কখনও ওর মুখে শুনিনি। আমাদের এ-গাঁয়ে কোনও দিন মটরগাড়ি ঢোকেনি।

আপনি একটু চুপ করুন। শোনো খোকা, তুমি সেই গাড়িতে চেপেছিলে?

সেই গাড়িতে চেপেই তো আমি বিয়ে করতে গেলাম।

চিররঞ্জন হো-হো করে হেসে ফেললেন। ওইটুকু ছেলের মুখে বিয়ের কথা শুনলে হাসি পেতে আর দোষ কী! বড়বাবুও হাসি চেপে রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বউটি বেশ সুন্দর ছিল?

ছেলেটির মুখে ঠিক নব-বিবাহিত যুবকের মতন লজ্জা। ঘাড় হেলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

তারপর তুমি যখন মরে গেলে, সেই কথা তোমার মনে আছে?

আমার মায়ের দয়া হল। খুব কষ্ট, চোখ খুলতে পারি না। তারপর কারা যেন নিয়ে গেল আমাকে একটা ভাঙা বাড়িতে। বাড়ি না মন্দির, ঠিক মনে নেই। সেখানে একটা নদী আছে। নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে–

ভাসতে ভাসতে কোথায় গেলে?

মেঘের মধ্যে। অনেক মেঘ, তুলো তুলো মেঘ–তারপর আর মনে নেই।

আচ্ছা শোনো। তোমার কোন জীবনটা বেশি ভালো লাগে! এই যে এখানে আছ, এই বাবা-মা, এই বাড়ি–এটা বেশি ভালো লাগে, না আগেরটা?

আগেরটা!

একথা শুনে বড়বাবু যেন খুবই অবাক হয়ে গেলেন। ব্য-ভাবে ফের জিজ্ঞেস করলেন, আগেরটা? তুমি সেই আগের জীবনে ফিরে যেতে চাও?

হ্যাঁ।

কেন? এখানে সবকিছু নতুন, তাও তোমার ভালো লাগে না?

না!

বড়বাবু চিররঞ্জনের দিকে ফিরে বললেন, আমি নিশ্চিত, এ একটা স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে আছে। স্বপ্নের ফিক্সেশান।

চিররঞ্জন সায় দিতে পারলেন না সে কথায়। তিনি বললেন, আমার কিন্তু সবই বিশ্বাস হচ্ছে। অতীতকালটাই সবার চোখে সুন্দর।

কথাবার্তা আর বেশি দূর এগোল না। ছেলেটি অবিলম্বে মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করে গোঙাতে লাগল। তার চোখদুটি স্থির, মুখ দিয়ে গাজলা বেরোচ্ছে। তার তড়কা কিংবা

মৃগী রোগ আছে ঠিকই। রসময় বললেন, ব্যস্ত হবেন না। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। আমি জল নিয়ে আসছি।

আগেও এ রকম হয়েছে?

প্রায়ই হয়। একটু বাদেই ঠিক হয়ে যায়!

আপনি কি মানুষ? তাও এর চিকিৎসা করাননি, ছেলেটিকে তিলে তিলে মেরে ফেলছেন?

এ-রোগের কি চিকিৎসা হয়?

পরদিন মালদায় যাওয়া হল না। ছেলেটির শরীরের অবস্থা দেখে বড়বাবু তাকে নিয়ে যেতে সাহস পেলেন না। তিনি প্রচুর টাকা দিয়ে সতেরো মাইল দূর থেকে একজন ডাক্তারকে আনতে পাঠালেন। ডাক্তার এসে পুরো একদিন থেকেও কিছুই করতে পারলেন না। ডাক্তারটি সহৃদয়, ছেলেটির প্রতি নিজেও কৌতূহলী হয়েছিলেন, তবু তিনি স্বীকার করলেন যে চিকিৎসা করার ক্ষমতা তার নেই। ছেলেটির রোগ বেশ কঠিন, বিশেষত সর্বক্ষণ তার শরীরে টেম্পারেচার থাকা নাকি সত্যিই ভয়ের ব্যাপার। ওকে শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা দরকার।

এদিকে বাড়ির সামনে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। বহু রকমের গুজবে কানপাতা যায় না। রোগীর প্রতি কারওর কোনও সহানুভূতি নেই। সবাই তাকে একবার অন্তত চোখের দেখা দেখতে চায়। ছেলেটির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এতদিন সে মোটামুটি চলে ফিরে বেড়াতে পারত, ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে তার অবস্থার আরও অবনতি হল। শোনা গেল, এর আগে সে কোনও প্রকার আলোপাথিক, ওষুধ খায়নি। প্রথম ওষুধ খেয়েই তার রোগলক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল, নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল বিছানায়।

বড়বাবু তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন। রসময় তাতে রাজি, কিন্তু রসময়ের স্ত্রীর তাতে ঘোর আপত্তি। তর্কাতর্কি আর ঝগড়া করে যত সময় কাটতে লাগল,

ততই ছেলেটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বড়বাবু একরকম প্রায় জোর করেই বাবা-মা সমেত ছেলেটিকে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

.

সুপতিকে আমি দেখেছিলাম। আমাদের বাড়িতে এসে সে বেঁচেছিল মাত্র দু'দিন। বড়বাবু তার চিকিৎসার সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। কল দিয়েছিলেন বিধান রায় মশাইকে। তখন ডঃ অ্যাটকিনসন সাহেবেরও খুব নামডাক, বিধানবাবুর পরামর্শে তাকেও আনা হয়েছিল আমাদের বাড়ি তখন সর্বক্ষণ সরগরম। তবুও বাঁচানো গেল না তাকে। সুপতি মারা যাবার পর কলকাতার সব কাগজে তার ছবি ও জীবনী ছাপা হয়েছিল। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সদস্যরা রসময় চক্রবর্তীকে আরও একমাস কলকাতায় রেখে নানা রকম প্রশ্নাদি করেছিলেন। সাহেবরাও খুব উৎসাহ দেখিয়ে ছিলেন ঘটনাটি সম্পর্কে।

আমার দেখা সেই প্রথম মৃত্যু। আমারই বয়সি একটি ছেলেকে আমি প্রায় চোখের সামনে মরতে দেখলাম। একজন অজানা, অচেনা, রহস্যময় প্রকৃতির বালক হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়ে গেল। আমার মা বলতেন, আমাদের বাড়িতে জল পাওনা ছিল সুপতির, তাই মরার জন্য তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে সুপতির একবারও জ্ঞান ফেরেনি, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। সর্বক্ষণ সে ভুল বকত। তার বাবা-মায়ের সম্পূর্ণ অচেনা লোকজনের নাম ধরে ডেকে তাদের সঙ্গে কথা বলত। একটা ভাঙা মন্দিরের কথাও ঘুরে ফিরে আসত তার কথায়। সুপতি মারা গিয়েছিল সন্ধ্যাবেলা- আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই সময়ের কথা। তাকে রাখা হয়েছিল সূর্যদার ঘরে। আমাদের সে-ঘরে ঢুকতে দেওয়া হত না-মৃত্যুর দৃশ্যও যেন শুধু বড়দের ব্যাপার তাই বাবা আমাকে ওই ঘরের কাছাকাছি দেখলেই বলতেন, বাদল এখানে না, যাও, এখান থেকে যাও! আমি তবু যেতাম না, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম মৃত্যুকে দেখার। সেই সন্ধ্যাবেলা আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরের বাইরের দিকে, শিয়রের কাছের জানলার শিকের কাছে। মৃত্যুর আগে সে ফিক

ফিক করে হাসছিল আর বলছিল, একটা নদী...মস্ত বড় নদী...ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে...

সেই অজানা অচেনা বালকটির জন্য আমি কেঁদেছিলাম।

১৫. ওদিকে সূর্যদা

ওদিকে সূর্যদা আর এক মৃত্যু দেখছিল।

সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা দেবার পর অত্যন্ত বদলে গিয়েছিল সূর্যদা। খুব বাল্যকাল থেকেই সে গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু এই সময়কার গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ অন্য রকম। তার মনের মধ্যে সব সময় যেন একটা অস্থিরতা রয়েছে, মুখ-চোখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়, অথচ কথায়বার্তায় তার কোনও প্রকাশ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ তাকে তার টেবিলে বসে। থাকতে দেখেছি।

আমি সব সময় সূর্যদার কাছে কাছে ঘুরঘুর করতাম, কিন্তু সূর্যদা সেই সময় আমাকেও বেশি সহ্য করতে পারত না। অনেক সময়েই কথার উত্তর পেতাম না। এককথা বার বার জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হয়ে বলত, এখন যা তো এখান থেকে। তা সত্ত্বেও আমি না গেলে ধমকে উঠত, তোকে যেতে বলছি না! গেট লস্ট!

আমার অভিমান হত, তবু ফিরে আসতাম একটু বাদেই। সূর্যদার প্রতি আমার ভালোবাসায় কোনও খাদ ছিল না।

ওই সময়েই সূর্যদার দাড়িগোঁফ উঠতে শুরু করে। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম সূর্যদার দাড়ির রং সম্পূর্ণ কালো নয়, খানিকটা লালচে রঙের। এবং তখন বুঝতে পারি, সূর্যদার মাথার চুলও ঠিক কুচকুচে কালো বলা যায় না–এটা আগে টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার ফরসা গালের ওপর দাড়ি দেখে আরও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আগেই বলেছি, সূর্যদার চোখের মণিদুটোও খয়েরি ধরনের। যে-কেউ প্রথম দেখে সাহেবের বাচ্চা বলে ভুল

করত। অদ্ভুত সুন্দর দেখাত সূর্যদাকে, শুধু ওই কিশোর বয়সে হাসিখুশি মুখের বদলে তার গাম্ভীর্যটুকুই ছিল বেমানান।

আমার বড়দি শ্রীলেখা তো সূর্যদার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। আমার আপন দিদি সান্ত্বনারও ওই রকম কিছু হয়েছিল কিনা ঠিক জানি না, তবে আমার দুই দিদির মধ্যে ওই সময় থেকে খানিকটা রেষারেষি শুরু হয়।

মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে প্রেম জন্মাবে তখন এমন কিছু অলীক ব্যাপার ছিল না, বন্ধ সমাজের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। কোনও কোনও বন্ধ সমাজে এইসব সম্পর্কের মধ্যে বিয়েথা-ও হয়।

বাঙালি মেয়েরা তখন কিছু কিছু পড়াশুনো শিখতে শুরু করেছে বটে কিন্তু পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় নিষিদ্ধ। বিয়ের আগে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া আর কারওর সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ নেই। কলকাতার যে দুটি-একটি কলেজে কো-এডুকেশন চালু হয়েছে, সেখানেও ছাত্রীরা ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে ক্লাসে যায় না–ঘণ্টা পড়লেও দল বেঁধে ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রফেসারের সঙ্গে ঢোকে, প্রফেসারের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। অথচ মধ্য যুগের অন্ধকার পেরিয়ে এসে মেয়েরা আবার শিক্ষার সুযোগ পাবার ফলে এবং ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা গল্প-উপন্যাস রচিত হওয়ায় বিবাহ সম্পর্ক বিরহিত প্রণয় বেশ প্রসিদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মধুর অভাবে গুড়ের মতন, চঞ্চল স্বভাবের মেয়েরা মামাতো, পিসতুতো দাদা কিংবা জামাইবাবুর ভাইয়ের সঙ্গে খানিকটা হৃদয় সম্পর্ক পাতিয়ে প্রণয়-লিপ্সা মেটায়। আয়েষা জগৎ সিংহকে কখনও দাদা বলেনি, কিন্তু প্রেমিকদের প্রকাশ্যে ওমুক তমুকদা বলে ডাকার রেওয়াজ এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই চালু হয়।

সেই সময়কার সাধারণ গল্প উপন্যাসে প্রেমিকরা অধিকাংশই ব্যর্থ প্রেমিক এবং তারা টিউবারকুলোসিসে ভোগে। প্রেমিকাদের অবধারিত ভাবে পরপুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। কদাচিৎ বাড়ির ড্রাইভার কিংবা লাজুক প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে প্রেম হলেও শেষ।

পর্যন্ত দেখা যায়, তারা আসলে ছদ্মবেশী রাজপুত্র। অর্থাৎ হয় ডবল এম. এ অথবা জমিদার-তনয়, অভিমান করে ওইরূপ পেশা নিয়েছিল। মর্ডান মেয়ে বলতে বোঝায় রায়বাহাদুর-দুহিতা কিংবা স্কুল শিক্ষয়িত্রী। তেজস্বিনী নায়িকা তার লম্বা বেণী চাবুকের মতন ধরে শপাং করে মারে ভিলেনের মুখে। নায়ক-নায়িকার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। সাঁওতাল পরগণায় কিংবা হিমালয়ে সভ্যতার কড়া দৃষ্টির বাইরে।

আমার বড়দি ও সূর্যদার ব্যাপারটা অবশ্য অন্য রকম ছিল। সূর্যদা আমার বড়দির সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন বড়দি তার একটা নিজস্ব পোষা প্রাণী। সূর্যদা যখন তখন যে। কোনও হুকুম করত বড়দিকে। অথচ সূর্যদা অদ্ভুত রকমের স্বাবলম্বী, চিরকাল নিজের জামাকাপড় নিজে কেচেছে, নিজের এঁটো থালাবাসন অন্যকে তুলতে দেয়নি। কিন্তু বড়দির ব্যাপারটা ছিল আলাদা। নরম করে কিংবা মধুর করে কোনও কথা বলার স্বভাব ছিল না সূর্যদার। হঠাৎ গাম্ভীর্য ভেঙে ডাকত, শ্রীলেখা, শুনে যাও! এইখানে এসো, আরও কাছে এসো! বড়দি কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই সূর্যদা খপ করে চেপে ধরত বড়দির হাত, তারপর হিড়হিড় করে টেনে এনে গায়ের সঙ্গে লেপটে ধরত। আমাদের সামনেই।

আমি জানি, এই রকম শুরু হবার প্রথম দিকে বড়দি খুব ভয় পেত সূর্যদাকে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। একদিন সূর্যদার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে পর্যন্ত। সূর্যদা ভুরু কুঁচকে বিরক্ত ভাবে তাকিয়ে থেকেছে বড়দির দিকে। তার কোনও কাজে বাধা-পড়া তার একটুও পছন্দ নয়। এমনও একদিন হয়েছে, সূর্যদা হয়তো টেবিলে বসে খাতায় অঙ্ক কষছে খুব মনোযোগ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আমি মেঝেতে বসে দুলে দুলে পড়া মুখস্ত করছি, হঠাৎ সূর্যদা মুখ তুলে আমাকে বলল, এই বাদল, একবার শ্রীলেখাকে ডাক তো! বলবি এক্ষুনি আসতে। আবার অঙ্ক কষায় মনোযোগ। আমি বড়দিকে ডেকে আনলাম। সূর্যদা খাতা-পেনসিল রেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাম হাম করে কয়েকটা চুমো খেল বড়দিকে। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ফের ফিরে গেল পড়ার টেবিলে।

এই ধরনের ব্যবহার সত্ত্বেও বড়দি সম্পূর্ণ পোষ মেনে গেল সূর্যদার! নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দিল ওর কাছে। তার মানে অবশ্য এই নয় বড়দি সূর্যদার সঙ্গে

ঘোরতর কোনও রকম শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সেদিকটা তখনও সূর্যদার মাথায় আসেনি। সূর্যদা সে রকম কিছু হুকুম করলে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা বড়দির ছিল কি না আমি জানি না। বড়দির প্রেম দেখা দিয়েছিল প্রবল স্নেহের রূপ নিয়ে। বড়দি সূর্যদার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকত যেন পুরুষটির সকল রকম ভালো-মন্দের দায়িত্ব তারই। আমি দেখেছি, বড়দি সূর্যদার মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সূর্যদার মাথায় একটু কেঁকড়া ধরনের খুব ঘন চুল। সূর্যদা বাথরুম থেকে স্নান করে যে-ই নিজের ঘরে। ঢুকেছে, অমনি কোথা থেকে বড়দি এসে হাজির, হাতে চিরুনি। বড়দি ঠিক লক্ষ রেখেছে। সূর্যদা আয়নার সামনে যেতেই বড়দি বলল, দাঁড়াও। এক হাতে সূর্যদার গাল চেপে ধরে অন্য হাতে কী যত্ন করে বড়দি আঁচড়ে দিচ্ছে চুল, শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মতন। আবার কখনও কখনও সূর্যদা হয়তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বড়দি দরজার আড়াল থেকে ডেকে বলল, এই শোনোনা, এই নাও। এটা নিয়ে যাও! সুগন্ধমাখা একটা রুমাল। সূর্যদা অবশ্য এর উত্তরে এক টুকরো হাসিও কখনও উপহার দেয়নি। তবু বড়দি নিঃস্বার্থ ভাবে স্নেহ মমতা-মাখানো ভালোবাসা দিয়ে গেছে সূর্যদাকে।

আমাদের বাড়ির লোক তো অন্ধ কিংবা উদাসীন নয়, এসব তাদের চোখে পড়বেই। বিশেষত জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা এবং আমার মা-এই তিন জনের নৈতিক শুচিবাই কিছু কম ছিল না। তবুও ধরা পড়তে একটু দেরি হয়েছিল। তা ছাড়া বড়দির বিয়ের জন্য তখন পাত্র দেখা চলছে পুরোদমে।

পরীক্ষার পরে ছুটিতে সূর্যদা আমার সঙ্গে রেণুদের বাড়িতে বিশেষ যেতে চাইত না। একা একাই বেরিয়ে পড়ত মাঝে মাঝে। বাড়ির কারোকে কোনও কিছু বলে যাওয়া ধাতে ছিল না তার। বড়বাবু একদিন খেয়াল করলেন, সন্ধ্যার পর অন্য ছেলেমেয়েরা সবাই বাড়িতে থাকলেও সূর্যদা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। ছেলের সঙ্গে তার কথাবার্তা খুবই কম। হত। রাত্তিরবেলা খেতে বসে বড়বাবু হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, সূয্যি এখনও ফেরেনি?

কেউ কিছু উত্তর দেবার আগেই বড়দি টপ করে বলল, এই তো সিংহীদের বাড়ির মাঠে বোধহয় ব্যাডমিন্টন খেলছে বাদল, একটু যা না, ডেকে নিয়ে আয় না!

আমি জানি, সূর্যদা সেখানে নেই। তাই গা করলুম না। সিংহীদের বাড়িতে রাত্রে আলো জ্বেলে ব্যাডমিন্টন চালু হয়েছিল, এখন তা বন্ধ। এখন রোজ সন্ধ্যার পর খুব হাওয়া দেয়- এই হাওয়ায় কেউ ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে?

জ্যাঠামশাই বললেন, প্রায়ই তো তাকে দেখি না, কোথায় থাকে সে?

বড়বাবু আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, চুপচাপ খাওয়া শেষ করলেন। তারপর চটি ফট ফট করে নেমে গেলেন একতলার বসবার ঘরে।

বড়বাবুর নিজস্ব ঘরটি তিনতলায়। সকালে কিছুক্ষণ মাত্র বসবার ঘরে থাকেন, বাকি সময়টা তিনতলায় নিজের ঘরেই কাটান। তিনতলায় আর কোনও ঘর নেই বলে বাড়িতে তার উপস্থিতি সব সময় টের পাওয়াও যায় না। আজ তিনি একতলায় নেমে এলেন নিশ্চিত সূর্যদার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

একটু বাদে নেমে এলেন জ্যাঠামশাই, হাতে কিছু কাগজপত্র। তিনি বড়বাবুর সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করবেন। চাকর নিয়ে এল গড়গড়া। জ্যাঠামশাই গড়গড়ার নল ধরে টান দিয়ে বললেন, অমর, এবার ভাবছি একটা কার্ডবোর্ড কোম্পানির এজেন্সি নেব। আস্তে আস্তে এসব জিনিসের চাহিদা বাড়ছে-

বড়বাবু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন-বেশ তো, নাও না!

আমি তো একা আর সব দিক পেরে উঠছি না। তুমি নিজে কিছু দেখো টেখো।

কেন, চিরুকে লাগিয়ে দাও।

ওর দ্বারা বিশেষ কিছু হবে না। দিনরাত কী যে এত ভাবে। ঢাকুরিয়ার দিকে খানিকটা জমি দেখেছি, বুঝলে, একটা বড় মতন গোডাউন না তৈরি করলে তো আর চলছে না।

ঢাকুরিয়া? ও তো জলা জায়গা। ভিত গাঁথার খরচ পোষাবে না। ইটের হাজার এখন কত করে যাচ্ছে?

গত মাসেও পৌনে আট টাকা ছিল, এ-মাসে বোধহয় আট।

আট টাকা এ যে সাঙ্ঘাতিক কথা! গোয়ালিয়রে কিনেছিলাম সাড়ে তিন টাকা হাজার। জিনিসপত্তরের দাম কী রকম বাড়ছে, তুমি কিছু খবর রাখো? পোনা মাছের সের ন' আনা! গত রোববারেও কিনেছি সাড়ে সাত আনায়, ব্যাটারা এক লাফে ন' আনা করে দিল! দিনকাল সুবিধের না হে! চালের মণও দেখতে দেখতে চার টাকা হয়ে গেল। যুদ্ধ বোধহয় এবার একটা লাগবে। শেয়ার বাজারে দাপাদাপি শুরু হয়েছে।

বড়বাবু সিগারেট নিবিয়ে বললেন, কোথায় আর যুদ্ধ লাগবে। আর লাগবে না বোধহয়! সবাই মিলে হিটলারকে তোয়াজ করছে। চেম্বারলেন যে ভাবে ওই দেশটাকে... কী যেন দেশের নামটা? মনেও থাকে না ছাই।

কোন দেশটা?

ওই যে, যেটার খানিকটা অংশ আগে বোহেমিয়া ছিল। হ্যাঁ, চেকোস্লোভাকিয়া, সে দেশটাকে তো সন্দেশের বাক্সর মতন হিটলারের হাতে তুলে দিল।

আমাদের কাগজের দামও বাড়ছে। এই সময় কিছু স্টক ধরে রাখা যায় যদি।

ব্যবসায়ের আলোচনা আর বেশি দূর এগোল না। এই সময় সূর্য বাড়ি ফিরল। বাইরে কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সূর্যর সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভেজা। ভেতরে যেতে হলে বসবার ঘরের মধ্য দিয়েই যেতে হয়, সূর্য দু'জন গুরুজনকে সেখানে উপবিষ্ট দেখেও কোনও কথা বলল না, জামা থেকে নিংড়ে জল ফেলতে লাগল দরজার বাইরে। মাথার চুল জবজবে।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, এ কী, একেবারে ভিজে গেলে যে! ছাতা নিয়ে বেরোওনি কেন?

এটা নিছক কথার কথা। সূর্য বেরিয়ে ছিল দুপুরে, তখন বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। তা ছাড়া ওই বয়সের ছেলে সচরাচর ছাতা নিয়ে বেরোয় না। সূর্য উত্তর দিল না।

বড়বাবু খুব স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি রে?

সূর্য সংক্ষিপ্ত ভাবে জানাল, বেলেঘাটায়!

সে তো অনেক দূর! এত রাত পর্যন্ত ওখানেই ছিলি?

হ্যাঁ।

কে আছে ওখানে?

সূর্য একটু ইতস্তত করে বলল, আমার এক বন্ধু।

বড়বাবু বললেন, ও। কী, তোর স্কুলের বন্ধু?

হ্যাঁ।

বন্ধুর বাবা কী করেন?

ওর বাবা নেই।

গার্জিয়ান কে?

ওর কাকা।

কী করেন তিনি?

আমি ঠিক জানি না।

কাল আমি তোর সঙ্গে বেলেঘাটায় তোর বন্ধুর বাড়িতে যাব। ওর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে আসব।

সূর্য কোনও কথা না বলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। যে-কেউ সূর্যকে দেখলেই বুঝতে পারবে, সে মিথ্যে কথা বলছে, তার প্রশান্ত সুন্দর মুখে প্রতিটি অভিব্যক্তির ছায়া পড়ে। মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস তার একেবারে নেই, কেন সে এ রকম অসম্ভব চেষ্টা চালাচ্ছে কে জানে। তার বাবা তাকে জব্দ করে দিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়ে সূর্য দু'-এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, ওরা সবাই কাল বেড়াতে যাচ্ছে বাইরে–

কোথায়? কাছাকাছি?

পুরীতে।

ও তা হলে কাল থেকে আর ফিরতে দেরি করিস না। এখন সাড়ে নটা বাজে, এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকা ভালো নয়। কাল থেকে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরিস। মাথাটা ভালো করে মুছে নে!

পরক্ষণেই বড়বাবু প্রিয়রঞ্জনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তুমি গোডাউন তৈরির কথা যা বলছিলে। অর্থাৎ সূর্যর সঙ্গে তাঁর কথা শেষ হয়ে গেছে। সূর্য ঘর থেকে। বেরিয়ে গেল, ভিজে পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নিজের ঘরে গিয়ে দেখল শ্রীলেখা তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরের দিন সূর্য ফিরল আরও অনেক দেরি করে। সমস্ত পাড়া তখন নিঝুম, ঘোড়ারগাড়ির শব্দও শোনা যায় না, কুলপি মালাই বরফওয়ালাদের ডাকও থেমে গেছে।

বড়বাবু সে-দিন খেতে বসে সূর্যর কথা এক বারও জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু বার বার ঘড়ি দেখছেন। তিনি সূর্যর জন্য সেদিন আর নীচে নামলেন না, ওপরে উঠে যাবার সময় বললেন, সূর্য ফিরলে যেন তার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলা হয়।

সূর্য সেদিন দরজা ধাক্কাতেই তরতর করে নেমে গিয়েছিল শ্রীলেখা। দরজা খুলে দারুণ আশঙ্কার সঙ্গে ফিসফিস করে বললে, এই, তুমি আজও দেরি করে ফিরলে? রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে নাকি?

না।

বড়বাবু তোমার ওপর ভীষণ রেগে গেছেন।

হুঁ।

শ্রীলেখা সূর্যর হাত জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কেন এত দেরি করলে? বলো, আমাকে বলবে না?

সূর্য নির্লিপ্ত ভাবে শুধু প্রশ্ন করল, আমার খাবার কি ঢাকা দেওয়া আছে?

বড়বাবু তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। খেয়ে নিয়ে তারপর যাবে? তাই যেয়ো বরং।

না, আগেই দেখা করে আসি।

দোতলার রেলিং থেকে দেখা যায়, বড়বাবুর ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। কাঁচের জানলায় তাঁর বসে থাকা চেহারার সিলুয়েট। হাতে বই। সূর্য সে-ঘরে প্রায় পনেরো মিনিট ছিল। সেদিন দু'জনে কী কথা হয়েছিল তা জানি না। কিন্তু কোনও বকাবকি ধমকানির আওয়াজ শোনা যায়নি।

নীচে নেমে এসে সূর্য বলল, আমি আজ খাব না। আমার খিদে নেই।

পরদিন সকালে সূর্যদা অতি সামান্য কারণে আমার কান মূলে দিয়েছিল। আমি শুধু সূর্যদার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সূর্যদা, তোমার ঘড়িটা কোথায়? সূর্যদার সোনার হাতঘড়ি ছিল, ভারী সুন্দর দেখতে। কোনও কোনও দিন সূর্যদা সেটা আমার হাতে জোর করে পরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তখন সেই সামান্য প্রশ্নেই সূর্যদা রেগে গিয়ে আমার কান মূলে দিয়ে বলল, তোর অত কথায় দরকার কী রে?

সূর্যদা যে ঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে, সে কথা তখন আমি জানব কী করে? সূর্যদা কোনও দিন আমার গায়ে হাত তোলেনি, কোনও দিন একটাও বিসদৃশ ব্যবহার করেনি-সেদিন আমার এমন অভিমান হল যে আমি সূর্যদার সঙ্গে সারা দিন আর কথাই বললাম না।

এর কয়েক দিন পরে এক রাত্রে সূর্যদা বাড়িই ফিরল না। বাবা পুলিশে এবং হাসপাতালে খোঁজ নেবার কথা বলেছিলেন, বড়বাবু বারণ করলেন।

সূর্যদা ফিরল পরদিন সকাল নটায়। নিদ্রাহীন চোখ, পোশাক বিভ্রস্ত, বিষণ্ণ মুখ। বাইরের ঘরে তখন অনেকেই উপস্থিত। সূর্যদাকে দেখেই সবাই চুপ করে রই। বড়বাবু মোটামুটি শান্ত ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, রাত্রে ফিরিসনি যে?

ফিরতে পারিনি। আটকে গিয়েছিলাম।

কোথায় ছিলি?

এক বন্ধুর বাড়িতে।

সেই বেলেঘাটায়? তাদের যে বাইরে বেড়াতে যাবার কথা ছিল।

যেতে পারেনি। আমার বন্ধুর খুব অসুখ।

বড়বাবু চেয়ার ছেড়ে যেন লাফিয়ে উঠলেন। সিংহের মতন হুংকার করে উঠলেন, বললেন, চল, এক্ষুনি আবার চল। আমিও যাব বেলেঘাটায়! আমি তোর বন্ধুকে দেখব।

বড়বাবুর ও রকম ক্রুদ্ধ মূর্তি কেউ কখনও দেখেনি। তার চিৎকারে সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। সূর্যদা আস্তে আস্তে বলল, সেখানে আপনার যাবার অসুবিধে আছে।

বড়বাবু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ঠাস ঠাস করে চড় মারলেন সূর্যদার দু গালে। জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি করে বল কোথায় গিয়েছিলি?

সূর্যদা একটুও নড়ল না, মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন হল না, ফরসা গালদুটি শুধু লাল টকটকে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, বলার অসুবিধে আছে।

বড়বাবু আবার প্রচণ্ড জোর মেরে বললেন, অসুবিধে? কীসের অসুবিধে? বল আগে?

সূর্যদা পুনরাবৃত্তি করল–আমার অসুবিধে আছে।

বড়বাবু কতগুলো চড় মেরেছিলেন তার ঠিক নেই। সূর্যদা আর মুখ খুলল না। দোকানে বেরোবার আগে জ্যাঠামশাই এইসব কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ সূর্যদার দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুট ভাবে বললেন, আশ্চর্য! আশ্চর্য! অবিকল বিশ্বরঞ্জনের মতন!

বাবার দিকে ফিরে জ্যাঠামশাই বললেন, চিরু তোর মনে পড়ে? রঞ্জুও ঠিক এই রকম ছিল! রঞ্জুর সঙ্গে ওর চেহারারও পর্যন্ত একটু একটু মিল আছে না? একই বংশের রক্ত তো!

বাবা কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলেন। বড়বাবু তখন সূর্যদার চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিতে যাচ্ছিলেন, বাবা মাঝখানে বাধা না দিলে রক্তারক্তি ব্যাপার হয়ে যেত।

সারা দিন আমাদের বাড়িটা থমথমে হয়ে রইল। সূর্যদা স্নান করল না, খেল না, ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল। অন্যদের কথা শোনা তো দূরে থাক, বড়দি কত করে

অনুনয়বিনয় করল, সূর্যদা একবারও দরজা খুলল না, কারওর সঙ্গে একটিও কথাও বলল না। ভাগ্যিস জানলাটা খোলা ছিল, সেই জানলা দিয়ে বার বার উঁকি মেরে আমরা দেখতে লাগলাম সূর্যদাকে।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর বাবা গেলেন তিনতলায় বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু অন্যমনস্ক ভাবে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। বাবাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, সূর্যি খেয়েছে?

বাবা বললেন, না।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। বাবা খুব ভালো করেই জানেন, বড়বাবু নিজে কখনও সূর্যদাকে খেতে অনুরোধ করবেন না। বড়বাবুর কাছ থেকে সে রকম ব্যবহার আশাই করা যায় না।

বাবা একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন, কী, খুব কষ্ট পাচ্ছেন তো?

বড়বাবু চমকে উঠে বললেন, আমি? তুমি আমার কথা বলছ?

বাবা একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ আপনার কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

বড়বাবু কাতর ভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ. কিন্তু কেন এমন হয় বলো তো? আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বার বার ইচ্ছে হচ্ছে, সূর্যিকে বুকে জড়িয়ে ধরি। ওর কাছে ক্ষমা চাই। অথচ দেখো, ওকে যে শাস্তি দিয়েছি, অন্যায় তো কিছু করিনি। ওকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম। কথা শুনল না। অবাধ্য সন্তানকে মারব না? শাস্তি দেব না? তবু কেন কষ্ট হয়?

বাবা বললেন, এটাই তো মহা মায়া! আপনারই আত্মার একটা অংশ তো। কষ্ট তো হবেই!

এত মারধর বাধা-নিষেধও সূর্যদাকে আটকাতে পারেনি। সূর্যদা তবু আবার গেছে বেলেঘাটায়। সেখানে কাঠগোলার পিছনে একটা টিনের দোতলা বাড়িতে হরকুমার মুমূর্ষ হয়ে পড়ে আছে।

হাজারিবাগের জেলখানা ভেঙে বন্দিদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। বিপ্লবীদের অধিকাংশ পরিকল্পনার মতন এটিও গুপ্তচরদের উপদ্রবে মাঝপথে ফেঁসে যায়। আলিমুদ্দিন মাস্টার ও আর একজন ধরা পড়ে। হরকুমার পুলিশের হাতে। প্রচণ্ড মার খেয়েও পালিয়ে আসতে সমর্থ হন।

কিন্তু হরকুমার আগে থেকেই যক্ষ্মায় ভুগছিলেন। কোনও দিন চিকিৎসা করাননি, এই মারখাওয়া আর সহ্য হল না। তার নামে তখনও হুলিয়া রয়েছে। কলকাতার বাড়িতে। আত্মগোপন করে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন।

হরকুমারের প্রতি সূর্যদার ভালোবাসা ছিল যেন অনেকটা প্রাণীসুলভ, যারা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যে-কোনও কারণেই হোক, হরকুমারের প্রতি সূর্যদার অদ্ভুত একটা আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিল। সূর্যদার চরিত্রে স্নেহ-দয়া-মায়ার প্রকাশ কখনও তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু হরকুমারের সেবা সে করেছিল প্রাণ দিয়ে। নিজের জিনিসপত্র বিক্রি করে টাকার জোগাড় করেছে। নিজের আস্তানার কথা গোপন করার প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন হরকুমার। সূর্যদার পক্ষে সেইটাই খুব অসুবিধাজনক হয়ে গিয়েছিল। সব মানুষ তো আর অভিনয় করতে পারে না কিংবা মিথ্যে কথা বলতে পারে না!

হরকুমার শেষ পর্যন্ত মরলেন সূর্যদার কোলেই মাথা রেখে। মৃত্যুর কিছু আগে হরকুমারকে সূর্যদা ফিসফিস করে বলল: হরদা, তোমার পিস্তলটা আমাকে দেবে বলেছিলে?

হরকুমার বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা বার করলেন, শেষ কয়েকটি নিশ্বাস বুকে এক সঙ্গে জমা করে অতি কষ্টে বললেন, তোর সঙ্গে আমার আরও কথা আছে। তুই আমার কথা রাখবি তো?

১৬. মন্দাকিনী খবর পাঠিয়েছেন

মন্দাকিনী খবর পাঠিয়েছেন, বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ভবানীপুরে, ভবানীপুর তখন ঠিক কলকাতা নয়, হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডের বাইরে, রীতিমতন মফস্সল।

মন্দাকিনীর এখন উঠে বসার ক্ষমতা নেই, কানে একদম শুনতে পান না। ঘরে কেউ ঢুকলেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখের কাছে এনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেন। মৃত্যু খুবই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু এখনও মন্দাকিনীর চেহারায় এক ধরনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য আছে। মাথায় চুল ধপধপে সাদা, মুখখানা মোমের পুতুলের মতন, ঠোঁটে পান কিংবা রক্তের লাল লাল ছোপ এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর এই, চোখদুটো দেখলেই মনে হয় সব সময় সেখানে যেন কিছু একটা কৌতুক খেলা করছে। ময়লা পোশাক কিংবা কম দামি পোশাক তিনি কখনও ব্যবহার করা পছন্দ করেন না, এখনও তিনি পরে আছেন ঝকঝকে গরদের থান, গলায় হিরে-বসানো সাতনরী হার। বিছানায় আরও অনেক গয়না ছড়ানো মনে হয় মন্দাকিনীর হুকুমে তার গয়নার বাক্সগুলো কেউ খুলে বিছানায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে।

সব গেছে, কিন্তু গলার আওয়াজটা এখনও নষ্ট হয়নি, অনেকটা শিশুর মতন। হাতের ইশারায় বড়বাবুকে কাছে ডাকলেন। ঘর-ভরতি লোকজন, সবাই নিঃশব্দ, সুরেশ্বরের স্ত্রী শান্তিলতা পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মন্দাকিনীর।

বড়বাবু কাছে এগিয়ে গেলেন, মন্দাকিনী পাশে জায়গা দেখিয়ে বললেন, বোস।

বড়মা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

নিষ্ফল এই প্রশ্ন। মন্দাকিনী কিছুই শুনতে পারেন না। বড়বাবুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, অমর, তুই নিমোখারাম, ইতর, তুই ছোটলোক!

বড়বাবু একটু হেসে বললেন, বড়মা, আমি কী দোষ করেছি? তোর মুখে আমি মুড়ো ঝাঁটা মারব। মারো!

তোর গায়ে জলবিছুটি দিয়ে বাঁদর নাচালে তবে ঠিক হয়।

কী দোষ করলুম?

তুই এইখানে চুপটি করে বসে থাকবি, যতদিন না আমি মরি। যদি এক পা কোথাও যাস তো আমার মাথার দিব্যি রইল!

থাকব। কোথাও যাব না। কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি মরবে কেন?

আমার রত্নেশ্বর ঠিক তোর বয়সি ছিল। আজ সে বেঁচে থাকলে সে তার মাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারত? সে মরে গেল, আর তুই বেঁচে রইলি কেন? হারামজাদা, তার বদলে তুই মরতে পারলি না?

বড়মা, এত কথা বলা তোমার পক্ষে উচিত নয় এখন।

তোর মা-টা ডাইনি ছিল। তোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। পরের ছেলে মানুষ করতে গিয়ে আমি নিজেরটাকে বাঁচাতে পারলুম না। মানুষের কপালে এও থাকে! কী পাপ যে করেছিলাম।

আমাকে বাঁচিয়েছিলে বলে এখন তোমার অনুতাপ হচ্ছে?

তোকে আমার বুকের দুধ খাইয়েছি। নিজের হাতে তোর গু-মুত পরিষ্কার করেছি, নাইয়েছি, ঘুম পাড়িয়েছি–নিজেরটাকে যত্ন করতে পারিনি তাই আমার নিজের ছেলেটা অকালে মারা গেল! কী লাভ হল তোকে বাঁচিয়ে?

বড়বাবুর মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মন্দাকিনী এ রকম কথা বলবেন, তিনি প্রত্যাশাই করতে পারেননি। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপশোস করছেন মন্দাকিনী

জীবনের একষট্টি বছর পার হবার পর এই কথা শুনতে হল। এখন তো আর কিছুই ফেরত দেওয়া যায় না! আস্তে আস্তে বললেন-বড়মা, আমিও তো তোমার ছেলের মতন।

মন্দাকিনী কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না বলে তার সমস্ত কথাই একতরফা। অনেক সময় বড়বাবুর কথার মাঝখানেই তিনি কথা বলছেন। তীব্র ভাবে বললেন, কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! বিয়ে করে একবার বউকে নিয়ে পেন্নাম করতেও আসেনি। সেই ছেলেকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি।

সুরেশ্বর কাছে এগিয়ে মন্দাকিনীর দিকে ঝুঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন। কথা বলা এই সময় সত্যিই ক্ষতিকর। সেই ইঙ্গিত দেখে মন্দাকিনী যেন নতুন রকম কৌতুক পেয়ে গেলেন। চারদিক তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ঘরে কতকগুলো শকুন বসে আছে। আমি মরলেই আমার গয়নাগাঁটি, কোম্পানির কাগজ সব ছোঁ মেরে নেবার জন্য রয়েছে। কারোক্কে কিছু দেব না। কাঙালিদের বিলিয়ে দেব!

অত্যন্ত আঘাত লাগার মতন কথা! সুরেশ্বরের মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। দু-এক জন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বড়বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, ছি ছি, বড়মা, এসব কী বলছ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! সুরেশ্বর তোমার নিজের ছেলে, আরএমন ভালো ছেলে–

সত্যি কথাই। সুরেশ্বর মোটেই লোভী প্রকৃতির মানুষ নন এবং তাঁর মাতৃভক্তিতে কোনও খাদ নেই। মায়ের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি ছেলে পাবে–এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

সারা জীবন মন্দাকিনী তার তেজে সবাইকে কাঁপিয়ে রেখেছেন। তাঁর মুখের ওপর কেউ কোনও দিন কথা বলতে পারেনি। ডার্বি লটারিতে ফাস্ট প্রাইজ পাওয়ার পর সেই টাকায় স্বামীর সঙ্গে বিলেতেও বেড়াতে গিয়েছিলেন একবার। সেই সময়কার একটা ছবি টাঙানো আছে দেওয়ালে–লাউঞ্জ সুট-পরা স্বামীর পাশে কালো শাড়ি-পরা চেহারা, কাঁধের কাছে একটা ব্রোচ আঁটা। শুধু রূপসি নয়, কতটা তেজস্বিনী ছিলেন, তাও ছবি দেখলে বোঝা যায়।

এখন মৃত্যুর কাছাকাছি এসে মন্দাকিনী যেন ছটফট করছেন। কিছুতেই হার স্বীকার করতে চান না–অথচ জেনে গেছেন হেরে যেতে হবেই এবার। তাই বুঝি সবাইকে আঘাত করে নিজের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিতে চান।

কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ। সূচ পড়লেও বুঝি শোনা যাবে। এই সময় আলমারির মাথায় রাখা সুদৃশ্য কারুকাজ করা ঘড়িটা টুংটাং করে বেজে উঠল। যেন সময় মনে করিয়ে দিল, সময় নেই।

মন্দাকিনী শান্তিলতার দিকে তাকিয়ে বললেন, বউমা, তোমরা এখন একটু যাও তো। অমরের সঙ্গে আমার কথা আছে।

সবাই বেশ স্বস্তির সঙ্গেই চলে গেল ঘর থেকে। সুরেশ্বর বড়বাবুকে ফিসফিস করে বলে গেলেন, হঠাৎ শ্বাস কষ্ট হলে কোন ওষুধটা কী ভাবে দেওয়া হবে।

ঘরে এখন শুধু দু'জন। উনআশি বছরের একজন রমণীর পাশে একষট্টি বছরের একজন পুরুষ। মন্দাকিনী অবশ্য এমন ভাবে কথা বলছেন যেন অমরনাথ একটি তিন-চার বছরের শিশু।

বিছানার ওপর ছড়িয়ে থাকা অলংকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে মন্দাকিনী একটা হার তুলে নিলেন। চোখের সামনে এনে সেটা পরীক্ষা করলেন ভালো ভাবে। তারপর বড়বাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন নে, এটা তোর বউকে দিবি!

বড়মা, আমার স্ত্রী মারা গেছে অনেক দিন আগে।

এই হারটি দিল্লিতে গড়িয়েছিলুম। তোর বউয়ের পছন্দ হবে। নে!

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পরে সুরেশ্বরকে দিয়ে দিলেই হবে, এই ভেবে বড়বাবু হাত বাড়িয়ে নিলেন হারটা। খুব মুল্যবান জিনিস, হাতে নিলেই বোঝা যায়।

মন্দাকিনী এবার একজোড়া বালা তুলে নিয়ে বললেন, এ দুটো দিবি তোর ছেলের বউকে। নে, ধর!

সে দুটোও বড়বাবুকে নিতে হল।

এবার ষড়যন্ত্র করার মতন ফিসফিসিয়ে বললেন, আরও নে। তোর যা খুশি বেছে নে, যত ইচ্ছে নে!

বড়বাবু হাতের গয়নাগুলো বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে বললেন, আমি কিচ্ছু চাই না! তুমি আমাকে এইজন্য ডেকেছ? আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কিছু নিয়েছি?

তুই আমার বুকের রক্ত শুষে খেয়েছিস।

তা তো আর ফিরিয়ে দেবার উপায় নেই।

তুই আমার বড় ছেলে। আমি মরলে তুই আমার মুখে আগুন দিবি। রত্নেশ্বর নেই, তুই আছিস! কাল রাত্তিরে সরো-কে স্বপ্ন দেখলাম!

বড়বাবুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সরোজিনী বড়বাবুর নিজের মায়ের নাম–যাঁর চেহারাটাও তিনি কল্পনা করতে পারেন না।

মন্দাকিনী বলে চললেন, সরো ঠিক তেমনি ছেলেমানুষটি আছে, আমিই শুধু বুড়ি হয়ে গেছি। সেই রকম শ্যামলা রং, বড় বড় টানা টানা চোখ, নাকছাবি-পরা–আমায় কী বললে জানিস? আমার বললে, গঙ্গাজল, তুই আমার ছেলেকে মানুষ করেছিস–আমিও এখন তোর ছেলে রত্নেশ্বরের দেখাশুনো করি। তার কোনও কষ্ট হয় না। সে পানবসন্তে মরেছিল কিন্তু এখন তার গায়ে কোনও দাগ নেই। সররা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়! আমি বললুম, সরো, আমি কি তোর ছেলেকে মানুষ করতে পেরেছি? সে অমানুষ হয়েছে! সে বিধবা বিয়ে করেছে, সে আমার মুখ দেখতেও আসে না!

মন্দাকিনীকে অনেক রকম প্রশ্ন করবার জন্য বড়বাবুর মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করতে লাগল। অথচ কোনও উপায় নেই। ব্যগ্র ভাবে তাকিয়ে রইলেন ওঁর মুখের দিকে।

সরো বললে, বিধবা বিয়ে করুক, ম্লেচ্ছ বিয়ে করুক, যা খুশি করুক। তবু তো সে বেঁচে আছে। ওকে তুই বাঁচিয়ে রাখিস। ও ছেলে যদি তোর কথার অবাধ্য হয়, তা হলে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনতে পারিস না!

বড়বাবু অদ্ভুত ভাবে হাসলেন। তারপর মাথাটা নুইয়ে এনে মন্দাকিনীকে বললেন, এই তো এখন এসেছি। আমার কান ধরো!

মন্দাকিনী শীর্ণ হাতখানি তুলে বড়বাবুর মুখে বোলাতে লাগলেন। বড়বাবু চোখ বুজে ভোগ করতে লাগলেন সেই আদর। জীবনে তিনি নারীসঙ্গ পেয়েছেন, কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর তিনি তার শরীরে পেলেন স্নেহের স্পর্শ। তার শরীর জুড়িয়ে গেল। মন্দাকিনী বড়বাবুর থুতনিতে হাত রেখে বললেন, তুই রোগা হয়ে গেছিস! আমি যখন থাকব না-।

বড়বাবু গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মাথা ন্যাড়া হলেন। এককোমর জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করলেন মন্দাকিনীর নামে। তখন তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। ধর্মে তার বিশ্বাস নেই, নিজের বাবা-মায়ের পারলৌকিক কাজ তাকে করতেও হয়নি কিন্তু মন্দাকিনীর মৃত্যুর প্রতিটি আচার অনুষ্ঠান তিনি মেনে চললেন অক্ষরে অক্ষরে। সুরেশ্বরের সঙ্গে একসঙ্গে বসে তিনিও শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়লেন-মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ে।

এগারো দিনের দিন খুব ধূমধাম করে নেমন্তন্ন খাওয়ানো হল। ন্যাড়া মাথা, কোরা কাপড়-পরা, মুগার চাদর গায়ে বড়বাবু নিমন্ত্রিতদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। খোয়া ক্ষীর পরিবেশন করার সময় বলতে লাগলেন, এটা একটু চেখে দেখুন। এটা আমার মায়ের খুব প্রিয় ছিল। সুরেশ্বরের অনেক আত্মীয়স্বজন বড়বাবুকে চেনেই না-তারা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

মন্দাকিনীর মৃত্যুতে বড়বাবুর জীবনে একটা ইন্দ্রপতন হয়ে গেল। মন্দাকিনীর সঙ্গে তার দেখা হত খুব কম। মাঝখানে তো বেশ কয়েক বছর কোনও যোগাযোগই ছিল না-তবু মন্দাকিনীর অস্তিত্বই যেন ছিল তার কাছে একটা সান্ত্বনার মতন। এ-পৃথিবীতে বড়বাবুকে দেখা হলেই গালমন্দ করার কিংবা তুই সম্বোধন করার আর কেউ রইল না। প্রথম কয়েক দিন তিনি সর্বক্ষণ গুম হয়ে থাকতেন। চিররঞ্জন কোনও সান্ত্বনা দিতে এলেও অবুঝের মতন বলতেন, আমার কেউ নেই, আমার আর কেউ নেই। বড়বাবু এবার যেন সত্যিই একটু বুড়ো হয়ে গেলেন। তার চরিত্রে দু'-একটা পরিবর্তন দেখা দিল।

যেমন তিনি হঠাৎ তার ছেলের দিকে খুব ঝুঁকে পড়লেন। এর আগে তার সঙ্গে সূর্যর কথাবার্তাই হত খুব কম। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার স্বভাব তার নয়। সূর্যও একাচোরা ধরনের, গম্ভীর প্রকৃতির। কিছুদিন আগে সূর্যকে মারধর করার পর বড়বাবুর সঙ্গে তার কথাবার্তা প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এখন বড়বাবু সূর্যকে বার বার ডেকে পাঠান, তাকে সামনে বসিয়ে নানা রকম কথা বলতে চান। কখনও কখনও নিজ থেকে সূর্যর ঘরে চলে আসেন, তার খাটের ওপর বসে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করেন, ভেবে দেখ, তুই পড়াশুনোই করবি, না ব্যবসায় লেগে যাবি? আমি কিছু জোর করব না। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফর্ম আনিয়ে রেখেছি। সকালে উঠে এক্সারসাইজ করিস? ভোরে যদি উঠতে না-পারিস, আমি তোকে ডেকে দেব। কল-তোলা ছোলা খাবি, পেট ভালো থাকে।

যেন বড়বাবু তার রক্ত সম্পর্কের একমাত্র আত্মীয়টিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। তার কাছাকাছি আসতে চাইছেন। না হলে এ পৃথিবীতে তিনি সত্যিই একা হয়ে যাবেন।

কিন্তু সূর্যর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এর আগেই। কথাবার্তায় সে সহজ হতে পারে না। মুখ গোঁজ করে বসে থাকে, একটা-আধটা উত্তর দেয়।

তা ছাড়া ওইটুকু বয়সে সে বুকের মধ্যে সব সময় একটা গোপন ব্যাপার বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, অন্যের কাছে সে সহজ হবে কী করে? হরকুমারের মৃত্যুর কথা সে কারোকে বলেনি, তার কোলের ওপর মাথা রেখেই মুখে রক্ত তুলতে তুলতে হরকুমারকে সে মরতে দেখেছে। সূর্য হরকুমারের একটা হাত সর্বক্ষণ চেপে ধরেছিল–পুলিশের অত্যাচারে যে হাতের দুটো আঙুল থেঁতলানো। তা ছাড়া হরকুমারের রিভলবারটাও তখন সূর্যর কাছে–সেটার কথাও কারোকে বলা যাবে না। এই গোপনীয়তা পাষাণভার হয়ে তার বুকে চেপে ছিল। মন্দাকিনীর মৃত্যুসংবাদে সূর্যর মনে একটুও দাগ কাটেনি কারণ মন্দাকিনীর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে আগে অবহিত ছিল না। খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দুটি মৃত্যুতে পিতা ও পুত্রের মধ্যে দু'রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

মন্দাকিনীর উইলে বড়বাবুর নামে পঁয়তিরিশ হাজার টাকা ছিল। সে-টাকা বড়বাবু ফেরত দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুরেশ্বর কিছুতেই নিলেন না। তখন বড়বাবু সেই টাকা বাগবাজারের একটি অনাথ আশ্রমে দান করলেন। দানের একটি শর্ত হল এই যে, পিতৃ পরিচয় নেই, এমন অনাথ শিশুকেও যদি কেউ পাঠায়, তা হলেও তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হবে।

শুধু তাই নয়, বড়বাবু নিজেও সেই অনাথ আশ্রম সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আশ্রমের পরিচালনা, কার্যপ্রণালীর খুঁটিনাটি সম্পর্কেও খোঁজ নিতে লাগলেন, রোজ বিকেলবেলা গিয়ে বসতে লাগলেন সেখানে।

ক্রমশ দেখা গেল, সন্ধ্যাবেলা আশ্রমের মাঠে একগাদা ছেলে বড়বাবুকে ঘিরে বসে থাকে বড়বাবু তাদের নানা রকম গল্প শোনান। এই সময়ে বড়বাবুকে বেশ হাসিখুশি দেখা যায়। নিজের ছেলেকেও কাছে টানতে না-পেরে বড়বাবু অনাথ ছেলেদের সঙ্গে মিশে আনন্দ পাবার চেষ্টা করছেন।

১৭. এক একটা দিন এমন চমৎকার

এক একটা দিন এমন চমৎকার ভাবে আসে, সকালবেলা থেকে সবকিছুই মনে হয় অন্য রকম। মেঘ নিচু হয়ে নেমে এসেছে, পৃথিবীময় সেই ছায়া, বৃষ্টি নামেনি। মেঘের ছায়ায় সমস্ত বস্তুর চেহারা বদলে যায়। মনে হয়, পৃথিবীতে কোনও ভারী জিনিস নেই, সবকিছুই হালকা হালকা। ফুরফুর করছে হাওয়া, গায়ে সিল্কের কাপড়ের ছোঁয়া লাগলে যে রকম লাগে, ঠিক সেই রকম।

ইস্কুল ছুটি, সকালবেলা আমরা সুজি দিয়ে লুচি খেলাম। সূর্যদার পাস করার উপলক্ষে বাবা নবীন ময়রার রসগোল্লা এনেছেন। আমরা সবাই খুব আনন্দ করছি, কিন্তু সূর্যদা সেই একই রকম গোমড়ামুখো। কাল রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছে সূর্যদা এ ওয়ান পেয়ে পাস করেছে। পাসের খবর শুনলে অন্য সব ছেলেরা কত লাফালাফি করে, অথচ সূর্যদা এমন ভাব করছে যেন এতে তার কিছু যায় আসে না!

বড়দি ফিসফিস করে সূর্যদাকে বলল, বড়বাবুকে প্রণাম করেছ? পাসের খবর পেলে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়। সূর্যদা এমন ভাবে বড়দির দিকে তাকাল, যেন এ রকম একটা অদ্ভুত কথা সে জীবনে শোনেনি।

ঠিক হয়েছে ম্যাটিনি শো-তে একটি বাইস্কোপ দেখা হবে। বলাই বাহুল্য, তাতে আমাকে নেওয়া হবে না, কারণ বাংলা বই ছোটদের দেখতে নেই। যাকগে, তার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। আমি তো এক পয়সা দিয়ে যখন তখন বাইস্কোপ দেখতে পারি- আমাদের মোড়ের মাথায় আসে পেতলের একটা গোল বাক্স, ফুটোয় চোখ রাখলেই দেখা যায়।

কী যেন একটা যোগ আছে, মা গঙ্গাস্নান করতে যাবেন। আমাকে অবশ্য নিয়ে যেতে হবে না-আমার দুই দিদি যাবে মায়ের সঙ্গে। আমার আর এক জ্যাঠতুতো বোন পান্তর জ্বর

হয়েছে। আমার খেলার সঙ্গী নেই। আমার খুব ইচ্ছে করছিল বিষ্ণুদের বাড়িতে যেতে, কিন্তু আমায় কে নিয়ে যাবে? চাকর দেশে গেছে।

আমি আর দু'মাস বাদেই নয় পেরিয়ে দশে পা দেব, আমি একলা যেতে পারি। কিন্তু মা আমাকে কিছুতেই একলা ছাড়বেন না। অথচ রাস্তা আমার চেনা–এই তো আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা গেলেই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, তারপর বাঁ দিকে বেঁকলেই একটুখানি গিয়েই হেদো। হেদোর পাশ দিয়ে গিয়ে বিডন স্ট্রিট পেরিয়ে কাশি ঘোষের থামওয়ালা বাড়ি। সেখানে অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি থাকে। সেটা পেরিয়ে গেলে, যদি এ-দিকের ফুটপাত দিয়ে যাই তা হলে ও-দিকের ফুটপাতে পড়বে দুটো থিয়েটার, রংমহল আর শ্রীরঙ্গম, তারপর একটা বিরাট উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি, তারপর রূপবাণী বাইস্কোপ। এই বাইস্কোপ বাড়িটার নাম নাকি দিয়েছিলেন রবি ঠাকুর। সবাই বলে রূপবাণী, কিন্তু বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন, এর উচ্চারণ করতে হয় রূপোবাণী। এদিকে আমি কালীদের বাড়ির পাশ দিয়ে আর একটুখানি গেলেই গ্রে স্ট্রিট, উলটো দিকে স্টার থিয়েটার। গ্রে স্ট্রিটের বাঁ দিকে বেঁকলেই বিষ্ণুদের বাড়ি এসে যাবে।

সূর্যদাকে গিয়ে বললাম, তুমি বিষ্ণুদের বাড়ি যাবে? চলো না!

ওবাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে সূর্যদার আজকাল খুব একটা আগ্রহ নেই। তার কারণ, ও-বাড়িতে সূর্যদার সমবয়সি ঠিক কেউ নেই। অন্য ছেলেমেয়েরা সূর্যদার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের ছোট। আবার সুপ্রকাশদা চার-পাঁচ বছরের বড়। সূর্যদার কোনও বন্ধু। নেই। তা ছাড়া ওর যা স্বভাব, পাড়ার কোনও ছেলের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হল না।

সূর্যদা একটা মোটা বই পড়ছিল, মুখ না-তুলেই বলল, উঁহুঃ!

আমি সূর্যদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললাম, তা হলে ক্যারম খেলবে?

আবার–উঁহু!

সূর্যদা, আমাকে একটা গল্প বলো!

আশ্চর্যের ব্যাপার, সূর্যদা তবু রেগে উঠল না। বই মুড়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, আমি এখন বেরোব, চল, তোকে ওবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সূর্যদার ধুতি-পরা দেখলে আমার হাসি পায়। রীতিমতন কসরতের ব্যাপার। আগে কক্ষনও ধুতিটুতি পরেনি সূর্যদা, আচার ব্যবহারে ও ছিল পুরো সাহেব, হঠাৎ দু-তিন মাস ধরে খুব ধুতি পরার ঝোঁক হয়েছে। নিজেই কিনে এনেছে একজোড়া খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি।

রাস্তায় তখন অজস্র এলোমেলো হাওয়া, সূর্যদা ধুতি সামলাতে নাজেহাল। কোমরের কাছে গিঁট দিয়ে তারপর বেল্ট বাঁধা, সুতরাং খুলে যাবার ভয় নেই, কিন্তু কাছা ফুলে উঠছে বেলুনের মতন। একটা ফটোগ্রাফের মতন সেই দৃশ্যটা এত বছর পরেও আমার চোখে ভাসে। সূর্যদার মাথা-ভরতি লালচে রঙের চুল এলোমেলো, সাহেবদের মতন ফরসা রং, থুতনিতে অল্প দাড়ি ও সদ্য-ওঠা সরু গোঁফের রেখা, ব্যায়াম করা সুন্দর স্বাস্থ্য, পাঞ্জাবির হাতা গোটানো, নিচু হয়ে দু হাত দিয়ে ধুতি সামলাচ্ছে। মনে হয়, কোনও ছদ্মবেশী রাজকুমার। আমি রূপকথা পড়তে গেলেই রাজকুমারের মুখ সূর্যদার মতন কল্পনা করতাম।

আমি পরেছিলাম কালো রঙের হাফপ্যান্ট আর চেন-লাগানো তোয়ালের মতন কাপড়ের গেঞ্জি। ওই প্রকার গেঞ্জির ফ্যাশান তখন খুব চালু। পায়ে নটি বয় শু। হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করেছিলাম বলে হাঁটুর তলা থেকে আমার পা দুটো বেখাপ্পা মনে হত।

দু'জন কাবুলিওয়ালা একজন রোগাপটকা লোকের জামা চেপে ধরে বাজখাই গলায় খুব ধমকাচ্ছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা সেই দৃশ্য দেখলাম। রোগা লোকটিকে এই অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় কাবুলিদের কাছ থেকে টাকা ধার করে রেস খেলে।

রাস্তায় বেরোলে যে কত রকম কী দেখা যায়। চেনা দোকান, চেনা রিকশাওয়ালা, চেনা ভিখিরি, এদেরও দেখতে ভালো লাগে। একটি বাচ্চা ভিখিরি রোজ 'ম্যায় বনকে চিঁড়িয়া বনকে বনবন' গানটা গায়। কানাকেষ্টর গান, 'লোকে বলে কালা কালো নয় সে যে আমার চোখের আলো'-এটাও সে জানে, তবে বড় সুর ভুল করে। হেদোর কাছে ভালুকনাচ দেখানো হচ্ছে-এটা আমরা পয়সা না দিয়েও দেখতে পারি। একটু ভিড়ের পেছন দিকে দাঁড়ালে আর পয়সা না দিলেও চলে। আমার কাছে তো একটাও পয়সা থাকে না-আর সূর্যদা কখন কী দিতে হয় তাই-ই জানে না। একবার ইচ্ছে হল সূর্যদাকে বলি আমাকে একটা সিগারেট লজেন্স কিনে দিতে, কিন্তু লজ্জা হল।

ভাল্লুকটা বেশি বড় নয়, অথচ বেশ গাঁট্টাগোট্টা। মনে হয় যেন বামন ভালুক। আমার সেই কথা শুনে সূর্যদা বিজ্ঞের মতন জানাল, মাউন্টেন রিজিয়ানের ভাল্লুক। পাহাড়ি ভালুক বেশি বড় হয় না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,-কোন পাহাড়? হিমালয়?

সূর্যদা বলল,-হতে পারে!

আচ্ছা সূর্যদা, হিমালয় তো অনেক দূর। সেখান থেকে ভাল্লুকটাকে এতদূর নিয়ে এল কী করে? হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে?

কেন, ট্রেনে?

হিমালয় পাহাড়ে কি রেলগাড়ি যায়?

খানিকটা হাঁটিয়ে, খানিকটা ট্রেনে।

রেলগাড়িতে কি ভাল্লুকদের উঠতে দেয়? অন্য লোকেরা ভয় পায় না?

এই ব্যাপারটা সম্পর্কে সূর্যদার জ্ঞান খুব পরিষ্কার নয়। আমতা আমতা করে বলল, ফ্রেটার ট্রেনে বোধহয়, কিংবা হাঁটিয়েও নিয়ে আসতে পারে–

কিছুক্ষণ আমরা এই বিষয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করতে করতেই যাই। সেই দূর হিমালয়ের জঙ্গল থেকে একটা লোক একটা ভাল্লুকের গলায় দড়ি বেঁধে হটিয়ে হটিয়ে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে আসছে। এই কল্পনা বেশ রোমাঞ্চিত করে।

হঠাৎ সূর্যদার হাত টেনে ধরে আমি বললাম, বাঁ দিকে তাকাও, শিগগির বাঁ দিকে তাকাও!

উলটো দিকে থেকে একটা মড়া আসছিল। খাঁটিয়া কাঁধে নিয়ে চারটে লোক মহা উৎসাহে বলো হরি, হরি বোল–বলে চ্যাঁচাচ্ছে!

সূর্যদা অবাক হয়ে বলল, কেন, বাঁ দিকে তাকাব কেন?

ডান দিক থেকে মড়া গেলে সে-দিকে তাকাতে নেই। অকল্যাণ হয়।

হ্যাঁ রে বাদল, তুই এসব কোথা থেকে শিখেছিস রে?

মা বলেছে!

এসব হচ্ছে সুপারস্টিশন! কু..কু...কু...

কুসংস্কার!

হ্যাঁ। একটা ইট, কাঠ, লোহাও যা, একটা ডেডবডিও তাই! ডান দিক বাঁ দিক তাকানোতে কিছু আসে যায় না!

তা হলে মা বলল কেন!

মায়েদের বোঝাতে হয়। ওঁরা তো লেখাপড়া শেখেননি–

হ্যাঁ, আমার মা লেখাপড়া শিখেছে। মা গল্পের বই পড়ে!

বাজে তর্ক করিস না তো! যা বলব তাই শুনবি!

তুমি বুঝি সব জানো?

সূর্যদা আমার দিকে ফিরে বলল, আমি সব জানি। সব। বুঝলি!

সেই যোলো বছরের সদ্য যুবকের মুখে অহংকার ঝলসে উঠল। এই পৃথিবী-বিস্তৃত জ্ঞানের প্রতি যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চায়। কিন্তু সূর্যদা বাংলা বানান জানে না, আমার থেকেও কম জানে–একথাটা আমার মুখে এসে গেলেও বললাম না।

অভয় গুহ রোডের মোড়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক চিৎকার করে ডাকছে, বৈকুণ্ঠবাবু, বৈকুণ্ঠবাবু! কেউ সাড়া দিচ্ছে না, লোকটি ডেকেই যাচ্ছে। বহুক্ষণ কানে সেই ডাকটা লেগে রইল। কেন জানি না, আমার হঠাৎ মনে হল, বৈকুণ্ঠবাবু মারা গেছেন–একটু আগে যে মড়াটিকে নিয়ে গেল, তারই নাম বৈকুণ্ঠবাবু। আমার মাঝে মাঝে এ রকম অদ্ভুত কথা মনে হয়।

বিষ্ণুদের বাড়িতে তখন আতর কেনা হচ্ছে। ঠাকুরদালানে বসেছে আতরওয়ালা, তার কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে প্রায় একশোটা নানা রঙের শিশি। এক একটা শিশির মুখ খুলে একটু করে তুলো ভিজিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে–গন্ধ শুকে যাচাই করছে বাড়ির মেয়েরা। বিষ্ণু, দীপ্তি, রেণু, ছকু, কানাইদের পেয়ে গেলাম।

সূর্যদা আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে। দু-তিন মাস আগে সূর্যদা কলকাতার কোনও রাস্তাই চিনত না–এখন সে একা একা কোথায় কোথায় যায় কারোকে বলে না। সূর্যদাকে দেখলে এবাড়ির ছেলেমেয়েরা খুব খুশি হয়, দীপ্তি তো একেবারে যেন গলে পড়ে! ওরা সূর্যদার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু সূর্যদা আর দাঁড়াল না, চলে গেল। আমরা

কিছুক্ষণ আতরওয়ালার কাছে উঁকিঝুঁকি মারলাম, তারপর বিষ্ণু আর আমি চলে গেলাম ওপরে।

দার্জিলিং থেকে বিষ্ণু কত রকম পাথর এনেছে। এক একটা পাথর দেখলে মনে হয়, কী অসম্ভব দামি! কত রকম রং! অথচ বিষ্ণু বলল, একটাও কেনেনি। সব ও নিজে কুড়িয়েছে। বিষ্ণুরা দার্জিলিং থেকে কালিম্পং, গ্যাংটক পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। আমাকে বিষ্ণু বলল, তুই গেলি না তো! গেলে দেখতিস, কী মজাই যে হত!

আমি লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যে-জায়গায় এমন সুন্দর সুন্দর পাথর পাওয়া যায়-সে তো স্বপ্নের দেশ! বাবা আমাকে যেতে দেননি। ঠিক আছে, বড় হয়ে আমি একশোবার যাব, হাজারবার যাব-তখন তো আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

বিষ্ণু জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে দিল! তারপর দুটো বড় সাদা পাথর আমার হাতে দিয়ে বলল, ঠুকে দেখ! জোরে ঠুকবি!

ঠুকতেই ঝিলিক দিয়ে আগুনের ফুলকি দেখা গেল!

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চকমকি?

চকমকি পাথরের কথা গল্পের বইতে পড়েছি শুধু। পাথরদুটোকে মনে হল, কোনও রূপকথার জিনিস আমার হাতে।

বিষ্ণু বলল, হ্যাঁ। এ রকম কত পাথর আছে ওখানে! তোর জন্যও আনব ভেবেছিলাম, ভুলে গেলাম!

এই সময় রেণু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ছুট্টে কাছে এসে বলল, আমি একবার, আমি একবার আগুন জ্বালব।

আমি পাথরদুটো রেণুকে দিতে যাচ্ছিলাম, বিষ্ণু বলল, না না, রেণু পারবে না! ওর হাত পুড়ে যাবে!

রেণু ঠোঁট উলটে বলল, ইস মোটেই হাত পোড়ে না! আমি এর আগে জ্বালিয়েছি তো!

বিষ্ণু রেগে গিয়ে বলল, তুই আমাকে না বলে আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস? কেন হাত দিয়েছিস?

কাকিমা বলেছে!

মা তোকে আমার জিনিসে হাত দিতে বলেছে?

হ্যাঁ, বলেছেই তো!

মাকে ডাকি?

রেণু আবার এক ছুটে দরজার কাছে গিয়ে বলল, হাত দিয়েছি, বেশ করেছি! আবার দেব, কী হবে?

বিষ্ণু তাড়া করতেই রেণু পালিয়ে গেল। রেণুটা বড্ড দুষ্টু আর দুরন্ত। সবাই জানে। বিষ্ণু নিজের জিনিসপত্রের দারুণ যত্ন নেয়। তবু রেণু তাতে হাত দেবেই!

বিষ্ণু কৃপণ বা স্বার্থপর নয়, তার জিনিসপত্র সে অন্যদেরও ব্যবহার করতে দিতে পারে, কিন্তু নিজের তত্ত্বাবধানে। হঠাৎ ঘাঁটাঘাঁটি করা সে পছন্দ করে না।

বিষ্ণু বলল, দার্জিলিংয়ে আর একটা জিনিস কিনেছি, দেখবি? চামড়ার বাক্স খুলে বিষ্ণু সাবধানে একটা দূরবিন বার করল। নিজের জামা দিয়ে খুব স্নেহের সঙ্গে সেটাকে মুছেটুছে বলল, খুব পাওয়ারফুল! এক সাহেবের ছিল। এটা দিয়ে অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়-আবার যদি উলটো করে ধরে দেখিস, তা হলে কাছের জিনিসও অনেক দূরের মনে হবে।

জিনিসটায় হাত দিয়ে আমার কেমন যেন শিরশিরে অনুভূতি হল। কলম্বাস দূরবিন। চোখে লাগিয়ে দেখলেন...গ্যালিলিও..ক্যাপ্টেন কুক..বইতে পড়া এসব যে সত্যি সত্যি কখনও নিজের হাতে নিয়ে দেখব।

ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিষ্ণু বলল, চল, ছাদে চল!

ছাদে আমার আর বিষ্ণুর একটা চমৎকার আড্ডা দেবার জায়গা আছে। বিষ্ণুদের বাড়ির পেছনে খানিকটা পোড়ড়া জমি, সেখানে তিনটে নারকোল গাছ তিন বন্ধুর মতন কঁধ ধরাধরি করে বেড়ে উঠেছে, বিষ্ণুদের ছাদও ছাড়িয়ে গেছে। ছাদের এক কোণে তারা চমৎকার ছায়া দেয়। সেই কোণটাতে মাঝে মাঝে ঘোর দুপুরেও আমি আর বিষ্ণু এসে বসি, বই পড়ি, দেশ-বিদেশের গল্প করি, কিংবা খাতা-পেনসিল নিয়ে কাটাকুটি খেলি। এক এক দিন ওখানে আমরা ঘুমিয়েও পড়েছি।

আজ রোদ নেই, আকাশে মেঘ। দূরবিন চোখে লাগিয়েও মেঘের মধ্যে আর কিছু দেখা যায় না। বহু দূরের দূরের বাড়ির ছাদ বেশ স্পষ্ট দেখা যায় অবশ্য, তবু আমি একটু নিরাশ হলাম। আমার আকাশ দেখার ইচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মেঘ না থাকলে কি এতে স্বর্গ পর্যন্ত দেখা যায়?

বিষ্ণু আমার চেয়ে অভিজ্ঞ। সে হেসে বলল, ধ্যেত বোকা, স্বর্গ কি চোখে দেখা যায় নাকি? জ্যান্ত অবস্থায় কেউ স্বর্গ দেখতে পায় না-তা হলে তো সবাই দেখে নিত! তা হলে আর যুধিষ্ঠিরকে অত কষ্ট করতে হত না!

তখন তো দূরবিন ছিল না?

হ্যাঁ ছিল! পুষ্পক রথ ছিল, আর দূরবিন ছিল না? তা কখনও হয়?

তা হলে এটা দিয়ে চাঁদের পাহাড়ের চরকা বুড়িকে দেখা যাবে?

বিষ্ণু আমতা আমতা করে বলল, তা যেতেও পারে। তবে, সূর্য চাঁদ এসব দেখতে গেলেও আরও পাওয়ারফুল জিনিস লাগে। তাকে বলে টেলিসকোপ। বাবাকে বলব আমাকে একটা টেলিসকোপ কিনে দিতে!

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, জানিস, আমি ভূগোলের বইতে পড়েছি, এখনও অনেক গ্রহ কিংবা ধূমকেতু আবিষ্কার করা হয়নি। যদি সে রকম একটা হঠাৎ দেখতে পাই?

বিষ্ণু বলল, বাবা টেলিসকোপ কিনে দিলে আমরা রোজ সন্ধেবেলা তাতে চোখ লাগিয়ে বসে থাকব! যদি সে রকম একটা গ্রহ আবিষ্কার করে ফেলি, তা হলে ভূগোলের বইতে তোর আর আমার নাম একসঙ্গে থাকবে। সেই গ্রহটার কী নাম দেব বল তো?

চট করে কোনও নাম আমার মনে এল না। বললাম, তুই বল তো!

যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, এই ভাবে বিষ্ণু বলল, নাম দেব হৈমন্তী। হৈমন্তী কাকিমার নামে। হৈমন্তী কাকিমা তো হারিয়ে গেছে!

এ-নামে আমারও কোনও আপত্তি নেই। তৎক্ষণাৎ রাজি।

কী ভালো লাগছিল ছাদে দূরবিন চোখে লাগিয়ে বসে থাকতে। নারকোল গাছের চিরুনির মতন পাতাগুলো দুলছে, দুটো চিল মেতে উঠেছে ক্রমশ আরও উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতায়। একটু একটু মেঘ সরে যাচ্ছে, আমি আকাশের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে যাবে, ভাবা যায় না এমন এক দৃশ্য। মাঝখানটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক মতন ফোকাস করতে হয়, বিষ্ণু দেখিয়ে দিচ্ছিল।

এই সময় দুপদাপ করে রেণু আবার ছাদে এল। কাছে এসে বলল, দেখি, দেখি, আমাকে একটু দেখতে দাও!

আমরা কেউ রেণুর কথা গ্রাহ্য করলাম না। রেণু নাকি নাকি আবদারের সুর করে বলল, একবারটি দেখতে দাও না বাবা!

তারপর রেণু আর কোনও সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে পাস করে আমার হাত থেকে কেড়ে নিল দূরবিনটা। চলে গেল ছাদের অন্য দিকে।

বিষ্ণু একেবারে আঁতকে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বলল, এই, এই ভেঙে যাবে! শিগগির এদিকে আয়!

রেণু তখন সেটা চোখে লাগিয়ে গভীর মূনোযোগিনী। বলল, ভাঙবে না, বলছি ভাঙব না, আমি আগেও এটাতে দেখেছি!

বিষ্ণু এবার রেগে গেল খুব। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রেণু ভালো হবে না বলছি, শিগগির দিয়ে যা! এক্ষুনি!

দাঁড়াও না বাবা! দেখা হয়নি!

রেণু, ভালো হবে না বলছি।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে রেণু সত্যিই সেটা ফেলে দিল হাত থেকে। ধড়াস করে উঠল। আমার বুক। ভাঙেনি অবশ্য, কিন্তু তাতেই বিষ্ণুকে মনে হল যেন ও শারীরিক ভাবে আঘাত পেয়েছে! ও আর ধৈর্য রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারল রেণুকে।

রেণু একটুক্ষণ ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইল–তারপর ই-ই-ই শব্দ করে বিষ্ণুর ওপর আঁপিয়ে পড়ে ওকে আঁচড়ে কামড়ে দিতে গেল। বিষ্ণুও ওকে মারতে লাগল এলোপাথাড়ি, বড্ড বেশি। একসময় রেণু ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি ওদের কাছে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, বেশ রাগ হয়েছিল রেণুর ওপর। এখন রেণুর কান্না দেখে মায়া হল। রেণু বড্ড অসুখে ভোগে, দুর্বল শরীর–দুষ্টুমি করলেও ওকে বড় জোর মেরেছে বিষ্ণু। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, কঁদিস না রে! তোর বেশি লেগেছে!

কেন ওটা নিতে গেলি! আচ্ছা, আমি বিষ্ণুকে বকে দিচ্ছি! এই বিষ্ণু, তুই কী রে, এত জোরে কেউ মারে?

বিষ্ণুর তখনও রাগ কমেনি। ধমকে উঠে বলল, ওকে আরও মারা উচিত। ও আমার সব জিনিসে হাত দেয়!

রেণু জিভ দেখিয়ে বলল, ই-ই। মারো তো দেখি!

বিষ্ণু সত্যি সত্যি রেণুকে আবার মারতে গেল। আমি ওর হাত মুচড়ে ধরে বললাম, কী হচ্ছে কী?

রেণুটা অদ্ভুত মেয়ে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে আমার হাতটা ঠেলে দিয়ে ঝংকার দিয়ে বলল, আমার দাদা আমাকে মেরেছে, তাতে তোমার কী? বেশ করবে মারবে! তুমি কেন আমার দাদাকে বকবে?

আমিও অবাক, বিষ্ণুও অবাক। বিষ্ণু হো হো করে হেসে উঠে বলল, দেখলি তো!

রেণু তার পরও আমাকে বলল, তুমি আমার দাদাকে খবরদার বকবে না!

বিষ্ণু বলল, এই রেণু, তুই নিজে দুষ্টুমি করেছিস, আবার চোখ রাঙাচ্ছিস!

বেশ করব, আমার যা খুশি করব!

দিন দিন বড্ড অসভ্য হয়ে যাচ্ছিস! জ্যাঠাইমাকে বলে দেব! বাদল তোকে কত গল্পের বই পড়ে শুনিয়েছে।

ও-সব গল্প আমি আগেই জানি!

তুই ক্ষমা চা বাদলের কাছে। দোষ করলে ক্ষমা চাইতে হয়। বল আমি আর এ রকম করব না।

আমি বলব না। আমাকে আরও মারবে? মারো! পরবর্তী জীবনে এইসব ঘটনার উল্লেখ করে কত বার রেণুকে রাগিয়েছি!

১৮. সূর্য ঘন্টাখানেক ধরে রাস্তায়

সূর্য ঘন্টাখানেক ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। যেন তার কোনও কাজ নেই, সে নগর দর্শনে বেরিয়েছে। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, শিয়ালদা, আবার মানিকতলা ঘুরে সে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের কাছে ব্ল্যাক স্কোয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল রেলিংয়ে ভর দিয়ে।

তখন সকাল দশটা। এই সময় পথে বেশ ভিড় থাকে। ধুতির মধ্যে শার্ট গুঁজে, তার ওপর কালো কোট চাপিয়ে কেরানিবাবুরা হুড়োহুড়ি করে অফিস যায়। কারও পায়ে পাম্পশুর সঙ্গে মোজা হাঁটু পর্যন্ত। ফেরিওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালাদের খালি গা। সামনেই একটা দশকর্ম ভাণ্ডারের গুড়ের হাঁড়ির মুখে কয়েক হাজার মাছি।

সূর্য এক পয়সার কড়াইভাজা কিনে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে মুখ দিয়ে লুফে নিয়ে কটর মটর করে চিবোচ্ছে। প্রথমেশ বড়ুয়া মুক্তি' ছবিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মুড়ি খাওয়া দেখানোর ফলে সবাই তখন সেই অনুকরণে মুড়ি ভোলা খায়।

রাস্তা দিয়ে যত মানুষ যাচ্ছে, কারওর প্রতি কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই সূর্যর। শুধু সে মাঝে মাঝে অভ্যেসবশত বাঁ হাতের কবজির দিকে তাকাল ঘড়ি দেখার জন্য, যদিও ঘড়ি নেই সেখানে। পার্কের অন্য দিকে বেশ ভিড় ও হইহল্লা চলছে, একজন পকেটমার ধরা পড়েছে সেখানে সূর্য সে-দিকে যাওয়ার জন্য কোনও উৎসাহ বোধ করল না।

খানিক বাদে একজন রোগা মতন লোক, গায়ে চাদর জড়ানো, সূর্যকে জিজ্ঞেস করল, রাজবল্লভ পাড়াটা কোন দিকে বলতে পারেন?

সূর্য আন্দাজে হাত তুলে বলল, সে অনেক দূরে-ওই দিকে!

এক্ষুনি না গেলে চলবে না। কী করে যে যাই!

আপনার কি সেখানে আর্জেন্ট বিজনেস আছে?

আমার মেজদা মরণাপন্ন!

চলুন আপনার সঙ্গে আমি যাচ্ছি।

সূর্য ও সেই লোকটি পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। আর্জেন্ট বিজনেস ও মেজদা মরণাপন্ন– এগুলো কোড। কিছু দূর যাবার পর সেন্ট্রাল এভিনিউতে এসে রোগা লোকটি বলল, তুমি এখান থেকে সোজা খিদিরপুর চলে যাও। সেখানে বাজারের পাশে সিরাজুল তারিখ-এর ডেকরেটার্সের দোকান আছে। ওখানে গিয়ে তারিখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলবে, মেজদার অসুখ সেরে গেছে। তা হলেই তিনি তোমাকে চিনতে পারবেন। তখন উনি যা করতে বলবেন, সে রকম করবে।

সূর্য বলল, খিদিরপুরে কী ভাবে যেতে হয়, আমি তো জানি না।

রোগা লোকটি এতক্ষণ পরে ভালো করে সূর্যর দিকে তাকাল। তারপর বলল, তুমি কি ব্ল্যাক স্কোয়ার আগে চিনতে?

সূর্য বলল, না।

সেই রকম, খিদিরপুর কোথায়, সেটাও তোমাকে খুঁজে নিতে হবে।

আজকেই যাওয়া দরকার?

হ্যাঁ, ধর্মতলায় চলে যাও, ওখান থেকে খিদিরপুরের ট্রাম ধরবে। এই ধরো, এখান থেকে এক ঘণ্টা পরে পৌঁছেলেই চলবে।

অকস্মাৎ কথা বলা শেষ করে লোকটি বাঁ দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। সূর্য হাঁটতে শুরু করল তার বিপরীত দিকে। এটাই নিয়ম। আর একবারও পিছনে না তাকিয়ে সূর্য হেঁটে গেল অনেক দূর পর্যন্ত। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরল।

খিদিরপুরে একটা মাংসের দোকানের পাশে সিরাজুল তারিখ অ্যান্ড সন্সের ডেকরেটার্সের দোকান। একটা ঠেলাগাড়ি থেকে তেরপল আর চেয়ার নামানো হচ্ছে। দ্বিধা না করে দোকানের ভেতরে ঢুকে গেল সূর্য। একজন ফরসা টুকটুকে চেহারার লোক একমনে খাতায় হিসেব লিখছিলেন, সূর্য তাকে জিজ্ঞেস করল, তারিখ সাহেব আছেন?

লোকটি মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, হুঁ, কী খবর?

সূর্য ফের জিজ্ঞেস করল, তারিখ সাহেব আছেন কি?

লোকটি হিসেব শেষ করে ধীরে-সুস্থে খাতা বন্ধ করলেন। তারপর সূর্যর চেহারার দিকে চোখ রেখে বললেন, ওনার সঙ্গে আপনার কিছু দরকার আছে কি? কী খবর?

সূর্য বলতে যাচ্ছিল যে তারিখ সাহেবের সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই, কিন্তু সেই সময় সে একাধিকবার 'কী খবর' এই প্রশ্নের মানে বুঝতে পারল। এই লোকটিই তারিখ সাহেব। তখন সে তাড়াতাড়ি বলল, মেজদার অসুখ সেরে গেছে!

ফরসা লোকটি উল্লসিত মুখে বললেন, সেরে গেছে? বাঃ!, তা হলে আর চিন্তা কী! আসুন, ভেতরে আসুন!

দোকানের পিছন দিকে পরদা টাঙানো, সেটা সরালে আর একটা ছোট ঘর। দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার। আলো জ্বেলে দিয়ে লোকটি বললেন, এই গরিবেরই নাম সিরাজুল। আপ তসরিফ রাখিয়ে, আরামসে বৈঠিয়ে। আরও আধ ঘণ্টা দেরি আছে। আমি একটু বাদেই আপনার জন্য এসে যাচ্ছি।

সেই ছোট ঘরে চুপচাপ বসে রইল সূর্য। ঘরখানায় কাপ, ডিস, কাঁচের গেলাস- এইসবে ঠাসা। চেয়ারগুলো ভেলভেটে মোড়া সিংহাসনের মতন, সেই রকম একটা চেয়ারে সূর্য বসে আছে। বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। আধ ঘণ্টা দেরি আছে, এর মানে কী? ঘরে একটা কোনও কাগজপত্র নেই যে চোখ বুলোনো যায়।

তারিখ সাহেব একটু বাদে দু'কাপ চা নিয়ে ফিরে এলেন। ঘরে আরও দুটি সিংহাসন টাইপ চেয়ার থাকতেও তিনি টেবিলের তলা থেকে একটা টুল বার করে তাতে বসলেন। চায়ে চুমুক দিলেন বেশ আরাম করে। লোকটিকে দেখলেই মনে হয়, জীবনরসে বেশ মজে আছেন। মুখে কোনও রেখা নেই। যে কটা দিন বেঁচে আছি, হাসিখুশিতে থাকা যাক, এই রকম একটা ভাব।

সূর্য চা খায় না। কিন্তু তারিখ সাহেব তাকে জিজ্ঞেস না করেই চা নিয়ে এসেছেন- এ-ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সূর্য ভদ্রতা করে দু-একটা ছোট চুমুক দিল।

তারিখ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উমর কত্ত হবে? সিক্সটিন? সেভেনটিন!

সিক্সটিন।

দেখুন, ঠিক ধরেছি। আমার একটা হোবি আছে কী জানেন, মানুষ দেখলেই আমি তাকে স্টাডি করি। বহুত জিনিস মিলে যায়। আচ্ছা, আপনার ফাদার কি রেল কোম্পানিতে নোকরি করেন?

সূর্য চুপ করে রইল। এই সমস্ত কন্ট্রাক্টে পরস্পরের কাছে পরিচয় দেওয়া নিষিদ্ধ, হরকুমার তাকে বার বার এই কথা বলে গেছেন। তারিখ সাহেবের আন্তরিক ব্যবহার সত্ত্বেও সে এই নিয়ম ভাঙতে পারে না। তারিখ সাহেবের প্রশ্নে সে অনায়াসেই ঘাড় নেড়ে দিলে ল্যাটা চুকে যেত-কিন্তু সূর্য তাও দিল না।

তারিখ সাহেব ওদিকে আর না গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, হরবাবুর ডেথ হয়ে গেল, এমন মানুষ আর মিলবে না! আপনি তার জন্য যা সেওয়া করেছেন-কোনও ছেলে তার বাপের জন্য এমন করে না!

সূর্যের মুখ ভাবলেশহীন। প্রশংসায় বিচলিত হবার ছেলে সে নয়। লাজুক, বিনীত ভাবও তার মুখে ফোটে না।

হরবাবুর মালপত্তর সব আপন হেপাজতে রেখেছেন তো?

হরদার তো মালপত্তর কিছু ছিল না।

ছিল না?

আমি কখনও দেখিনি কিছু। একটার বেশি দুটো জামা ছিল না, মাদুরে শুতেন।

একটা মাল ছিল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তারিখ সাহেব আবার বললেন, আপনি আমার ছোটা ভাইয়ের মতন। আপনি আমাকে জানেন না-আমি দাদালোকদের সঙ্গে বহুতদিন ধরে কাম করছি। পুলিশ আমায় ছুঁতে পারে না। এই বিজনেসটায় ওদের চোখে ধুলো দিই। আমার টাকাপয়সা সব আংরেজ হটাবার জন্য। আপনাকে আমি এল্ডার ব্রাদার হিসেবে অ্যাডভাইস করছি, আপনি বহুত ছেলেমানুষ, হরবাবুর মালটা আপনার কাছে রাখবেন না!

সূর্য উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় যে ব্যক্তিটি ঢুকল, তাকে দেখে সূর্য অবাক হয়ে গেল আরও বেশি। এই সেই রোগা লোকটি যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই সূর্যর দেখা হয়েছিল পার্কের সামনে।

লোকটি একই জায়গায় আসবে, অথচ সূর্যকে সঙ্গে আনেনি। সূর্য এক ঘণ্টার অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে।

তারিখ সাহেব খাতির করে বসালেন লোকটিকে? বললেন, শংকরবাবু, চা খাবেন?

শংকরবাবু হাতের ইঙ্গিতে বললেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, জিনিস পেয়েছেন?

হ্যাঁ, কিছু কিছু। দেখি! এক্ষুনি দেখবেন? আমার বেশি সময় নেই।

তারিখ সাহেব কাপ-ডিস-ভরতি র‍্যাকটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন। উলটো দিকে আর একটা র‍্যাক। সেখান থেকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স এনে বললেন, এই নিন। তিন ডজন।

শংকরবাবু বাক্সটা খুলে একনজর দেখেই আবার বন্ধ করে দিলেন। বললেন, আর কিছু পেলেন না?

না। বহুত টিকটিকির হুজ্জোত!

কত দাম?

সে আপনাকে ভাবতে হবে না।

না, না, আপনি নিজে কত টাকা খরচ করবেন? আমার কাছে কিছু টাকা আছে–

এখন থাক।

শংকরবাবু এবার ফিরলেন সূর্যের দিকে। এতক্ষণ ওর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। এবার জিজ্ঞেস করলেন, হরদা'র জিনিসটা তোমার সঙ্গে এখন আছে?

সূর্য বললে, না।

কাল এই রকম সময় ওটা এই দোকানে পৌঁছে দিয়ে যেয়ো!

হরদা ওটা আমার কাছেই রাখতে বলেছেন।

তখন রাখার দরকার ছিল, আর নেই। এখন ওটা আমাদের দরকার।

হরদা ওটা তো আমার কাছছাড়া করতে বলেননি।

ও জিনিসটা হরদার নিজের নয়। আমাদের দলের। আমাদের দলের প্রয়োজনে লাগবে।

হরদা আমার ওপর ভর দিয়ে গেছেন ওটা কাজে লাগাতে।

শংকরবাবু এবার খানিকটা বিরক্ত হয়ে তাকালেন সূর্যর দিকে। কড়া গলায় বললেন, হরদা তোমাকে আমার নির্দেশ মেনে চলতে বলেছেন কি না?

দলের নির্দেশ মানতে বলেছেন।

আমিই দলের হয়ে কথা বলছি। আমরা ওই জিনিসটা ফেরত চাই।

কিন্তু হরদা আমাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। অন্য কারওর কথা শুনে আমি তা অগ্রাহ্য করতে পারব না!

তুমি ওটা দেবে না?

না!

সূর্যর দিকে একনজর তাকালেই বোঝা যায়, এ ছেলে কারওর কথায় নতি স্বীকার করবে না। ভয়ডরের চিহ্নমাত্র এর মুখে নেই। এক হিসেবে সূর্যকে খানিকটা নির্বোধও বলা যায়, কারণ পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করার মনোবৃত্তিও তার নেই। গোয়ারের মতন বিপদের ঝুঁকি নেওয়াই তার শখ।

চলে আসার জন্য সূর্য চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতেই অপর দু'জন বললেন, বসো, বসো! ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

সূর্য বসল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারিখ সাহেব ও শংকরবাবু আরও কিছুক্ষণ ধরে নানা ভাবে সূর্যর কাছ থেকে হরকুমারের পিস্তলটা আদায় করার চেষ্টা করলেন। সূর্যকে একটুও বাঁকানো গেল না।

শংকরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শিগগিরই একটা বড় অ্যাকশন শুরু হবে-আমাদের এখন অস্ত্র বিশেষ দরকার!

কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলে সূর্যকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখো, তারিখ সাহেব আমাদের টোটা যোগাড় করে দিয়েছেন। শুধু শুধু জিনিসটা তোমার কাছে আটকে রাখছ। ঠিক আছে, তোমাকেই একটা অ্যাকশানে পাঠাব-তুমি পারবে?

তারিখ সাহেব বললেন, শংকরবাবু, এ তো একদম লেড়কা, একে ছেড়ে দিন! আর একটু বড় হোক।

ও নিজেই তো কারওর কথা শুনতে চাইছে না!

তা হোক, তবু আপনি দুসরা কারোকে পাঠান।

শংকরবাবু স্থির নয়নে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ওকে শেষ বারের মতন বলছি, ও যদি কাল দুপুরের মধ্যে জিনিসটা এখানে দিয়ে যায়-ওকে এবারের মতন ছেড়ে দিতে পারি। কী দেবে?

না!

তা হলে তুমি যেতে রাজি?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, তোমাকে চন্দননগরে যেতে হবে। সেখানে আমাদের বাড়ি ঠিক করা আছে, আপাতত কয়েক দিন সেখানে লুকিয়ে থাকবে। যথাসময়ে আমাদের নির্দেশ। পাবে।

কবে যেতে হবে?

কাল! কিংবা ধরো পরশু?

কালই যাব।

শংকরবাবু তারিখ সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, তারিখ সাহেব, এক গেলাস পানি খাব।

ইঙ্গিত বুঝে তারিখ সাহেব বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। শংকরবাবু তখন বললেন, কাল ঠিক দেড়টার সময় হাওড়া স্টেশনে ঘড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখান থেকেই একজন তোক তোমাকে নিয়ে যাবে চন্দননগরে। কালকে তোমার কোড হবে জিনিস আর দাম। ওদিকে কোড হবে মুলো আর বাঁধাকপি। চন্দননগরে কেউ তোমার নাম জিজ্ঞেস করলে, তুমি বলবে, তোমার নাম অমর! অমর পালিত কিংবা লাহিড়ী। তুমি বেকার, তোমার মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গেছ। ফরাসি চন্দননগর ছাড়া ইংরেজ চন্দননগরে কখনও পা দেবে না! ঠিক আছে?

সূর্যর একবার মনে হল তার বাবার নাম অমর, সুতরাং এই ছদ্মনাম তার পক্ষে নেওয়া ভালো দেখায় না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করল না। নামে কী আসে যায়?

১৯. শ্রীলেখার সঙ্গে যে সূর্যর মেলামেশা

শ্রীলেখার সঙ্গে যে সূর্যর মেলামেশা বারণ হয়ে গেছে, সেটা বুঝতেই সূর্যর দিন সাতেক লেগে গেল। সে অধিকাংশ সময়েই নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকে। কিংবা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ হঠাৎ তার শ্রীলেখার কথা মনে পড়ে।

স্নান করে এসে সূর্য চিরুনি পাচ্ছে না। খানিকটা এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেই সে বিরক্ত হয়ে গেল। তখন মনে পড়ল শ্রীলেখার কথা। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁক দিল, শ্রীলেখা-!

কোনও সাড়া নেই। দুপুরবেলা সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। নীচ তলায় কাঠের মিস্তিরি শুধু ঘ্যাস ঘ্যাস করে র‍্যাদা চালাচ্ছে।

ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বাদল। হাতে ঘুড়ি-লাটাই। রোদ্দুরে মুখ-চোখ লাল।

সূর্য বলল, এই বাদল, তোর বড়দিকে ডাক তো!

বাদল এখন কথার অবাধ্য হতে শুরু করেছে। সে এখন সেই বয়সে এসে পৌঁছেছে, যখন একলা একা কথা বলে বেশ সময় কেটে যায়। দেওয়ালের জলের দাগে সে দেখতে পায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দৃশ্য, বাঁখারির তির-ধনুক নিয়ে সে সেই দেওয়ালের পাশে অর্জুন হয়ে দাঁড়ায়। একতলার নোনাধরা থামটাকে সে হিরণ্যকশিপু মনে করে কোমরের বেল্ট খুলে চাবুক মারে। সিঁড়ির রেলিংয়ে উঠে সরসর করে নামতে নামতে সে পক্ষীরাজ ঘোড়া চালিয়ে উড়ে যায় মায়াবতী রাজকন্যার দেশে। শিগগিরই সে কোনও জাহাজে আলু-পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার চাকরি নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাবে। তারপর একদিন কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস হয়ে ফিরে আসবে। ডক্টর লিভিংস্টোনের মতন সেও আফ্রিকার জঙ্গলে.... ।

সূর্যর কথা শুনে সে হালকা ভাবে ছড়িয়ে দিল, বড়দি, তোমায় ডাকছে-এ-এ-এ! তারপর তরতর করে নেমে গেল একতলায়। তার এখন অনেক কাজ।

সূর্য একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে। আবার ডাকল, শ্রীলেখা! এবারও কোনও সাড়া নেই। তার ভুরু কুঁচকে গেল। শ্রীলেখাকে তো ডাকতে হয় না, তার দরকারের সময় শ্রীলেখাকে সব সময়েই কাছে কাছে পেয়েছে। কিছু যে একটা গোলমাল হয়েছে সূর্য তাও বুঝল না, সে আরও বেশি রেগে যেতে লাগল।

ঘর ছেড়ে সূর্য এগিয়ে গেল বারান্দা দিয়ে, অন্য প্রান্তে শ্রীলেখাদের ঘরের দিকে। ধুতিটা ভাজ করে লুঙ্গির মতন পরা, খালি গা, মাথার ভিজে চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে।

বাড়িতে বয়স্ক পুরুষরা কেউ উপস্থিত নেই, দুপুরের আহারের আগে মেয়েরা এক জায়গায় বসে বিশ্রম্ভালাপ করছে। বাদলের মা, তার জ্যাঠাইমা, শ্রীলেখা, সান্ত্বনা। সান্ত্বনা টেনে টেনে আঁচড়ে দিচ্ছে তার মায়ের চুল। শ্রীলেখার হাতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম। কী। কথা নিয়ে যেন বেশ হাসাহাসি হচ্ছিল, দরজার কাছে সূর্যকে দেখে সবাই হঠাৎ একসঙ্গে থেমে গেল।

সূর্য ডাকল, শ্রীলেখা, শোন!

শ্রীলেখা কোনও উত্তর না দিয়ে তার মায়ের দিকে তাকাল। শ্রীলেখার মা বললেন, সূর্য, তোমার চান হয়ে গেছে? তুমি আগে খেয়ে নেবে নাকি?

সূর্য বলল, একটু পরে।

শ্রীলেখার মা তখন শ্রীলেখা আর সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই, তোরা চান করতে গেলি না! যা, যা! কত বেলা হয়ে গেল।

শ্রীলেখা সেলাইয়ের জিনিসপত্তর রেখে আস্তে আস্তে উঠে পাঁড়াল। আলনা থেকে নিতে গেল টাটকা শাড়ি-সায়া।

সূর্য আবার ডাকল, এই শ্রীলেখা।

শ্রীলেখা উত্তর দিল না, ফিরেও তাকাল না।

সূর্য তখন ঢুকে এল ঘরের মধ্যে। ঘরের অন্য কারওর মুখের ভাব-ভঙ্গি লক্ষ করার অবকাশ তার নেই। শ্রীলেখার হাত চেপে ধরে সূর্য নিষ্ঠুরের মতন বলল, তখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

শ্রীলেখা অন্য দিকে তাকিয়েই আস্তে আস্তে বলল, কী বলবে, বলো না।

আমার ঘরে চল।

আমি এখন চান করতে যাব!

দু' মিনিট পরে গেলে কী হয়?

সূর্য প্রায় হিড়হিড় করেই টানতে টানতে নিয়ে গেল শ্রীলেখাকে। ঘরের অন্য সবাই। প্রায় এক মিনিট নীরবে বসে রইলেন। দুই মা চোখাচোখি করলেন কয়েক বার। সান্ত্বনা আস্তে আস্তে উঠে গেল।

শ্রীলেখার মায়ের মুখে স্পষ্ট একটা বিষাদের রেখা। সূর্যর প্রতি তাঁর মনে বেশ খানিকটা দুর্বলতা ছিল। তাঁর নিজের পুত্রসন্তান নেই। গোড়া থেকেই এই অদ্ভুত স্বভাবের বালকটির প্রতি স্নেহের টান ছিল তাঁর। কিন্তু মাতৃস্নেহের স্বাদ সূর্য কখনও পায়নি বলে সে ও-সব তোয়াক্কাও করে না। এ বাড়িতে দুই মামিমা যখন তাকে আদরযত্ন করেছে, সে মনে করেছে, এ-সবই সামাজিক নিয়ম, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রাপ্য। স্নেহ নিম্নগামী, সহজে

তাতে ভাটা পড়ে না–সূর্যর দু'-একটা রূঢ় ব্যবহার সত্ত্বেও শ্রীলেখার মা তাকে স্নেহচ্ছায়া দিতে চেয়েছেন।

সূর্য ও শ্রীলেখাকে জড়িয়ে কানাঘুষো শুরু হবার পর তিনি প্রথম প্রথম এটাকে প্রবল ভাবে অস্বীকার করেছেন। প্রশ্রয়ের সুরে বলেছেন, ওরা তো ছেলেমানুষ, ওরা কি এসব কিছু বোঝে? সূর্য শ্রীলেখাকে যখন-তখন ডাকে, শ্রীলেখা সূর্যর ঘরেই দিনরাত পড়ে থাকে–এসবেও তিনি কোনও দোষ দেখতে পাননি। পিঠোপিঠি বয়সের ভাইবোন, ওদের মধ্যে যেমন ঝগড়াও বেশি হয়, ভাবও বেশি হয়।

কেউ যখন মনে করিয়ে দিয়েছে যে, সূর্য শ্রীলেখার আপন পিসতুতো ভাই নয়, এই সম্পর্কের মধ্যে অনেক গোলমাল আছে–তখনও তিনি বলেছেন, আহা, ওরা তো সে-সব জানে না। ওরা তো ভাইবোন বলেই জানে?

একদিন তার চোখে পড়েছিল, সূর্য শ্রীলেখাকে পাঁজাকোলে করে তুলে ধরেছে, শূন্যে ছুঁড়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছে–আর শ্রীলেখা পড়ে যাব, পড়ে যাব বলে হাত-পা ছুড়ছে। সুর্য তাকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়ার বদলে আরও কাছে এনে নিজের মুখটা ডুবিয়ে দিলে শ্রীলেখার বুকে।

এই ঘটনা ঘটেছিল একতলা ও দোতলার মাঝখানে সিঁড়িতে। একতলা থেকে উঠতে গিয়েও শ্রীলেখার মা থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখিনি দেখিনি ভাব করে চলে গিয়েছিলেন অন্যদিকে। মনকে বুঝিয়ে ছিলেন, ওরা তো অবোধ, ওরা তো বুঝেসুঝে কিছু করছে না। পাপ মনে করলেই পাপ। ব্যাপারটার মধ্যে গোপনীয়তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছিল না বলেই তাতে পাপের স্পর্শ লাগেনি। তিনি ভেবেছিলেন, চোখে আঙুল দিয়ে ওদের এখন বুঝিয়ে দেওয়াটাই খারাপ হবে। দুদিন বাদে মেয়েটার বিয়ে হয়ে চলে যাবে অন্যের বাড়িতে–।

মা হয়েও তিনি মেয়েকে কখনও শাসন করেননি। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, শ্রীলেখাকে সব সময় অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তার ভয় ছিল না, তার ভয় ছিল অন্যের নিন্দার। বিশেষ করে তার ছোট জা,

অর্থাৎ বাদলের মা, বেশ নীতিবাগিশ! এমনিতে শ্রীলেখার মায়ের বেশ ঝগড়া করার অভ্যেস আছে, কিন্তু বাদলের মা এই প্রসঙ্গ তুললে যে তার ঝগড়া করারও মুখ থাকবে না!

শ্রীলেখার সঙ্গে সূর্যর মেলামেশা বন্ধ হয়েছিল প্রিয়রঞ্জনের হুকুমে। তাঁর চোখে কী পড়েছিল কে জানে, রাত্তিরবেলা তার স্ত্রীকে অত্যন্ত কড়া গলায় বলেছিলেন, তোমার। মেয়ে দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছে, তুমি দেখতে পাও না? সুয্যির সঙ্গে সব সময় ওর অত কী? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, পাঁচজন পাঁচ কথা বললে তোমার ভালো লাগবে? ও-ছেলেকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না! ধরন-ধারণটাই অদ্ভুত!

সুপ্রভা তখন সূর্যর পক্ষ সমর্থন করেই বলেছিলেন, সূর্যর ব্যবহার তো চমৎকার, কোনও দিন মুখ তুলে কথাটি বলে না পর্যন্ত।

ওসব ওর শয়তানি! অজাত কুজাতকে কেউ কখনও বিশ্বাস করে?

সুপ্রভা তবু প্রতিবাদ করে বললেন, নিজের মেয়েকে ঘরে আটকে রাখতে চাও, রাখো, তা বলে সূর্যর দোষ দিয়ো না! ও কী জানে, কী বোঝে? মা-হারা ছেলে

এক একজন নারীর এ রকম বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে যে পুরুষ-ছেলেরা কখনও কোনও দোষ করে না। দোষ করলেও তা তাদের স্পর্শ করে না। যারা কষ্ট করে লেখাপড়া শেখে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে সংসার চালায় তাদের কি এইসব ছোটখাটো দোষ ধরলে হয়!

প্রিয়রঞ্জন সাফ হুকুম দিয়ে রাখলেন, খুকিকে যেন কক্ষনও আর ওর সঙ্গে কথা বলতে না দেখি। এই আমি বলে দিলাম-।

সুপ্রভা বলেছিলেন, এক বাড়িতে থেকে কি আর একেবারে কথা না বলে থাকতে পারে? তুমি বরং তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো। বয়সও তো যোলো হয়ে গেল। আর দেরি করলে লোকে বলবে কী? এরপর কি আর পাত্তর পাওয়া যাবে!

সূর্য শ্রীলেখার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার পর বাদলের মা হিমানী বললেন, দিদি, তুমি বারণ করলে না?

সুপ্রভা উত্তর না দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কী আর বলব! ও ছেলে কি কারওর কথা শুনবে? তোরা যাই বলিস, ছেলেটার ষোলো না সতেরো বছর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মনে মনে ও একেবারে শিশু!

হিমানী ঈষৎ কূটনৈতিক ভাবে বললেন, যাই বলো, ওর মতিগতি সুবিধের নয়। আমি তো আমার মেয়ের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে বারণ করে দিয়েছি!

সুপ্রভা বললেন, আমার মেয়ে আর ক'দিনই বা আছে! পাইকপাড়ার এক পাত্তর পক্ষ মোটামুটি রাজিই হয়ে গেছে। সোনা চাইছে তিরিশ ভরি, নগদ আড়াই হাজারের কম না–

সূর্য শ্রীলেখাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আমার চিরুনি কোথায়?

শ্রীলেখা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝালো ভাবে উত্তর দিল, আমি তার কী জানি?

সূর্য চোখ গরম করে বলল, চিরুনি না থাকলে আমি চুল আঁচড়াব কী করে? খুঁজে দেখ!

শ্রীলেখা একটু খুঁজতেই আলমারির তলা থেকে পেয়ে গেল চিরুনিটা। কোনও কথা বলে সেটা বাড়িয়ে দিল সূর্যর দিকে। সূর্য সেটা নিল না, একদৃষ্টে শ্রীলেখার দিকে তাকিয়ে রইল। সে ধরেই নিয়েছিল, শ্রীলেখা তার চুল আঁচড়ে দেবে!

শ্রীলেখা সূর্যর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, নাও!

সূর্য চিরুনিটা নিয়েই আয়নার দিকে মুখ ফেরাল। পাথরের মূর্তির মতন মুখ। চুল সুবিন্যস্ত করেও সে আয়নার সামনে থেকে সরে এল না।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করল, আমি যেতে পারি?

হ্যাঁ, যেতে পারো। তার আগে আমার জিনিসটা দিয়ে যাও!

কোন জিনিসটা?

যেটা তোমার কাছে রাখা আছে!

শ্রীলেখার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেও পারল না। ছুটে এসে সূর্যর বুকে গুমগুম করে কিল মেরে বলতে লাগল, তুমি কী! তুমি কিছু বোঝে না কেন! কেন বুঝতে পারো না!

সূর্য দেখল শ্রীলেখা কঁদছে। এতক্ষণ বাদে সূর্যর মুখে হাসি ফুটল। হাসবার সময় তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে। থুতনিতে আঙুল দিয়ে সে তুলে ধরল শ্রীলেখার ঘাম ও কান্নায় ভেজা মুখ। সূর্য শুধু ঘাম ও কান্নাই দেখল, দেখল না ভয়, দ্বিধা, অনুরাগ ও ব্রীড়ায় মেশা এক অদ্ভুত বর্ণ ছড়িয়ে আসে সেই মুখে।

স্নানের আগে চুল খুলেছে শ্রীলেখা। আঁচল আলুথালু। ব্রেসিয়ার তখনও তেমন চালু হয়নি বলে ব্লাউজের নীচে একটা কাপড়ের ফালি দিয়ে তার বুক বাঁধা। সেই বন্ধন থেকেও উপচে উঠেছে তার নতুন স্তন। সূর্যর চোখ গেল সেদিকে। হেঁটে ঝরনা পার হবার সময় মানুষ যেমন হঠাৎ রুপালি মাছ দেখতে পায় কিংবা রাস্তায় হঠাৎ কুড়িয়ে পায় সোনার আংটি, সূর্যর চোখে সেই ধরনের বিস্ময়। কোনও দ্বিধা না করে সে এক হাতে কোমর জড়িয়ে অন্য হাত রাখল শ্রীলেখার বুকে।

শ্রীলেখা চকিতে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিটকে সরে এল। তীব্র চাপা গলায় বলল, কী হচ্ছে কী? তুমি–

সদা-গম্ভীর সূর্যর হাসিমাখা মুখখানা এখন সত্যিই শিশুর মতন। জ্ঞানোন্মেষের আগে শিশু যেমন আগুনে হাত দেয়, সেই ভাবে সূর্য এগিয়ে শ্রীলেখাকে আবার ধরল। কোনও রকম বাধা পাবার আগেই সে একটানে ছিঁড়ে ফেললে শ্রীলেখার বুকের জামা। বলল, আমি তোমার সবটা দেখব!

শ্রীলেখার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত। হাত দু'খানা বুকের কাছে জড়ো করে সে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, তার আর কথা বলারও ক্ষমতা নেই। ঘন ঘন শুধু তাকাচ্ছে সে দরজা ও জানলার দিকে। এদিকে কেউ এলে জানলা দিয়ে প্রথমে দেখা যাবে।

অরণ্যপ্রাণীর মতন সূর্য শ্রীলেখার কাঁধ ও বুকের কাছে মুখ এনে গন্ধ শুকতে লাগল। সে এখন খুবই উৎফুল্ল। তার বিমর্ষ গম্ভীর ভাবটি কোথায় মিলিয়ে গেছে। এখন একটা দারুণ খেলা পেয়ে গেছে সে।

একটুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রীলেখা দূরে সরে গেল। আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমি আর তোমার সঙ্গে কোনও দিন কথা বলব, না! তুমি এ রকম?

অবিকল দেড়-দু'বছরের বাচ্চার মতন হি হি করে হেসে সূর্য বলল, কেন, কী করেছি? আমি তো শুধু সবটা দেখতে চেয়েছি!

শ্রীলেখা আর কোনও কথা না বলে চলে যাচ্ছিল, সূর্য দরজা আটকে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, কেন, কী হয়েছে কী? আমারও তো খালি গা!

আমি তোমার সঙ্গে আর একটাও কথা বলতে চাই না।

সূর্য একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, হাসি মুছে গেল মুখ থেকে, আবার ভুরু কুঁচকে গেল। কোনও ব্যাপার সে পুরোপুরি বুঝতে পারলেই এ রকম হয়। দরজা ছেড়ে দিয়ে বলল, শোন, আমি এক্ষুনি খেয়ে নিয়ে বেরোব। আমার জিনিসটা আমাকে দিয়ে যা!

শ্রীলেখা সূর্যর পাশ দিয়ে গলে গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়াল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে? জিনিসটা দিয়ে কী হবে?

দরকার আছে। শিগগির নিয়ে আয়।

ওটা আমি দেব না।

হরকুমারের নির্দেশ ছিল, রিভলবারটা সূর্যর নিজের কাছে রাখা চলবে না। যে-কোনও সময় পুলিশ তাকে সার্চ করতে পারে যদি হরকুমারের সঙ্গে তার যোগাযোগের সন্ধান পায়। সেই জন্যই বিশ্বস্ত কারওর কাছে জমা রাখার কথা। এ-পর্যন্ত শ্রীলেখাই ছিল সূর্যর কাছে একমাত্র বিশ্বস্ত আপনজন।

রিভলবারটা রাখার সময় শ্রীলেখা ভয় পেয়েছিল, নিজের জন্য নয়, সূর্যর জন্য। এ-ধরনের সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে সূর্য নাড়াচাড়া করে–একথা সে ভাবতেই পারেনি। ওইটুকু বয়সের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে, এসব জিনিস যাদের কাছে থাকে তাদের নিজেদের প্রাণই যে-কোনও সময় বিপন্ন হতে পারে। নিরস্ত্র লোকেরাও বিপদে পড়তে পারে কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রাণের ঝুঁকি থাকে সশস্ত্র মানুষের। শ্রীলেখা তখনই ঠিক করেছিল, সূর্যকে ওটা কখনও ফেরত দেবে না।

সূর্য এক ধমক দিয়ে বলল, যা এক্ষুনি, নিয়ে আয়!

শ্রীলেখা স্থির ভাবে উত্তর দিল, ওটা আমার কাছে নেই। আমি ফেলে দিয়েছি।

সূর্য আর দ্বিরুক্তি করল না, খপ করে শ্রীলেখার টুটি চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী? কোথায় ফেলে দিয়েছিস?

শ্রীলেখা এবার ভয় পেল না। আবার দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। সূর্যর গায়ের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বলল, মারবে আমাকে? মারো! আমি দেব না!

ছেঁড়া জামা ও আঁচল ভেদ করে ফুটে উঠেছে শ্রীলেখার নবোদ্ভিন্ন বুক, তার সুকুমারী শরীরখানি এখন সূর্যের আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু সূর্যর আর সেদিকে মনোযোগ নেই। দারুণ উৎকণ্ঠিত ভাবে সে বলল, আমাকে একটু বাদেই যেতে হবে। শ্রীলেখা, কী করছিস কী ছেলেমানুষি?

কোথায় যাবে?

যেখানেই যাই না কেন–

আমাকে বলবেনা! আমি যদি ওটা না দিই, তুমি কী করতে পারো? চাচামেচি করবে? সূর্য এটুকু অন্তত বোঝে, চঁচামেচি করে কোনও সুবিধে হবে না। ওই জিনিসটার কথা সবাইকে জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। সূর্য যেন একটা ফাঁদে পড়েছে-এই রকম অসহায় বোধ করল। এর আগে তার একবারও মনে হয়নি, শ্রীলেখার কাছ থেকে রিভলবারটা আদায় করা এত কঠিন হবে। এ-পর্যন্ত শ্রীলেখাকে সে যা হুকুম করেছে, সবই শুনেছে। হঠাৎ তার ব্যবহার একেবারে অন্য রকম। কিন্তু খানিকটা বাদেই তাকে তৈরি হয়ে যেতে হবে হাওড়া স্টেশনে-সে যদি যেতে না পারে, তাকে কাপুরুষ বলবে সবাই! হরকুমারের আত্মা তাকে অভিশাপ দেবে না?

সূর্য দাতে দাঁত ঘষে বলল, না দিলে তোকে মেরে ফেলব!

মেরে ফ্যালো, তা হলেও ওটা পাবে না!

শ্রীলেখার চুল মুঠো করে ধরে সূর্য বলল, তুই আমাকে চিনিস না! আমি সত্যিই মেরে ফেলতে পারি!

শ্রীলেখা বলল, তুমি ওটা নিয়ে অন্য কারোকে মারতে যাবে তো? তার বদলে আমাকেই মারো।

সূর্য কখনও যা করে না, নরম হয়ে অনুনয় করে বলল, শ্রীলেখা, প্লিজ! গিভ মি ব্যাক মাই গান। এটা ছেলেখেলা না!

সূর্যদা, তুমি কেন মরতে চাইছ?

আমি মরব কেন? মরা অত সহজ নয়!

কিন্তু এতে তোমার কোনও বিপদ নেই?

কিছু না! আমার কিছু হবে না। আমি ঠিক ফিরে আসব।

আমি যদি তোমার ওটা না দিই? সূর্য শ্রীলেখার চুল ছেড়ে দিল। আলনার কাছে জামা পরবার জন্য গিয়ে অত্যন্ত শক্ত গলায় বলল, তা হলে আমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর কোনও দিন ফিরব না। আমাকে তোরা আর কখনও দেখতে পাবি না!

২০. হাওড়া স্টেশনে সূর্যর সঙ্গে

হাওড়া স্টেশনে সূর্যর সঙ্গে সাংকেতিক কথা বলে দেখা করল একজন দাড়ি-গোঁফওয়ালা যুবক। মাথায় বাবরি চুল, সাধু সন্ন্যাসীদের মতন মাঝখান দিয়ে সিঁথিকাটা। মুখ-ভরতি পান। আধময়লা ধুতি ও মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। তাকে দেখলে কোনও মন্দিরের পাণ্ডা মনে হয়।

যাবার কথা চন্দননগরে, যুবকটি তাকে নিয়ে গেল বর্ধমান। ট্রেনে একটি কথাও হল। বর্ধমান স্টেশনে নেমে যুবকটি একখানা মস্তবড় তরমুজের আধখানা কিনে ফেলল। তার এক টুকরো সূর্যকে দিয়ে বলল, খাওনা, বেশ সরেস জিনিস! পেট ঠান্ডা হয়।

যুবকটি তার দাড়ি ও জামা রসে মাখামাখি করে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেল তরমুজ। পথেঘাটে দাঁড়িয়ে কিছু খাওয়ার অভ্যাস সূর্যর নেই। তা ছাড়া হাতে রস লেগে যাওয়া তার পছন্দ নয়। আলতো ভাবে যতটুকু সম্ভব খেয়ে নিল–যেন এটাও তার কর্তব্যের অঙ্গ।

তারপর যুবকটি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দু'খিলি পান কিনে এক খিলি সূর্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও!

সূর্য বলল, আমি পান খাই না।

খাও না? তা বেশ।

বিনা বাক্যব্যয়ে সে দ্বিতীয় খিলিটাও মুখে পুরে দিল। তারপর লাইনের ধারে গিয়ে পিক ফেলে এসে বলল, তোমাকে দিন সাতেক বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। পারবে?

পারব।

তা বেশ! আমার নাম হল গে যোগানন্দ আচার্যি। তোমার নামটি কী ভাই? সূর্য বলল, আমার নাম অমর পালিত।

তা বেশ! তুমি রান্না করতে জানো?

সূর্য একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, রান্না?

যোগানন্দ এবার পান খাওয়া ঠোঁটে একগাল হেসে বলল, তোমার ওপরে ভাই ভার পড়েছে রান্না করার! রান্না না জানলে যে তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে!

সূর্য কোনও উত্তর দিল না। হরকুমার তাকে দেশের কাজ করার জন্য দীক্ষা দিয়েছিলেন–এর সঙ্গে রান্না করার কী সম্পর্ক?

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করল, তুমি বর্ধমান টাউনে আগে এসেছ? আসোনি? চলো, তা হলে টাউনটা একটু ঘুরে দেখা যাক।

ঘণ্টাখানেক ওরা ঘুরল বর্ধমানের রাস্তায়। যোগানন্দ বেশ পেটুক ধরনের। একটু আগে অতখানি তরমুজ খেয়েও তার আশ মেটেনি, রাজবাড়ির গেটের কাছে একটা দোকানে গরম গরম তেলেভাজা হচ্ছে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিনে ফেলল একগাদা বেগুনি, আলুর চপ। খানিকটা বাদেই সে দাঁড়াল আবার একটা শরবতের দোকানের পাশে। এর স্বভাবটা যেন ন্যালাখ্যাপা ধরনের, স্বার্থত্যাগী দেশকর্মী বলে মনেই হয় না।

ফিরতি ট্রেন ধরে ওরা চন্দননগরে পৌঁছোল সন্ধ্যার পর। বোড়াই চণ্ডীতলায় একটা মুদিখানায় ঢুকে যোগানন্দ কী যেন কথা বলল, তারপর হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে চলে এল হলদেডাঙায়। অন্ধকার, ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা মস্ত বড় দোতলা বাড়ি, দেখলে ভূতুড়ে বাড়ি মনে হয়। গাড়িবারান্দার পর চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। যোগানন্দ পকেট থেকে চাবি বার করে সদর দরজার তালা খুলল, তারপর নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দু'জনে ঢুকল ভেতরে। যোগানন্দ দেশলাই জ্বালতে দেখা গেল সরু বারান্দার পর একটা সিমেন্ট-বাঁধানো চাতাল, তার মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। তুলসী মঞ্চের ওপর প্রদীপ বসানোই ছিল, সেটা জ্বালিয়ে দিয়েই যোগানন্দ বলল, এবার হ্যারিকেন খুঁজতে। হবে!

হ্যারিকেন পাওয়া গেল বারান্দাতেই, সেটা নিয়ে ওরা উঠল দোতলায়। বেশ বড় সাইজের পাঁচ-ছ' খানা ঘর-ওরা চলে এল বাড়ির একেবারে পিছন দিকের ঘরটায়-সঙ্গে ব্যালকনি আছে। সেই ঘরের মেঝেতে খানকয়েক মাদুর ছড়ানো, একটা কুঁজো, কিছু হড়িকড়াই বাটি।

হ্যারিকেন নামিয়ে রেখে যোগানন্দ বলল, এখানে তোমাকে থাকতে হবে। ভূতের ভয় নেই তো? পারবে একলা থাকতে?

সূর্য ভয় পায়নি, সে বেশ রোমাঞ্চিতই বোধ করছে। এত বড় একটা বাড়ি তার একার জন্য, এটা কি কম কথা?

যোগানন্দ বলল, এবাড়িটা মানকুন্ডুর বিশ্বাসবাবুদের। তাদের নায়েবের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে ননীমাধব সান্যাল। উনি তোমার মেলোমশাই হন। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবে, তোমার মাসি আর মেলোমশাই পাটনায় বেড়াতে গেছেন-দু-চার দিনের মধ্যেই আসবেন। তুমি জগদ্দল, কঁকিনাড়া, গোঁদলপাড়া-এইসব জায়গায় জুটমিলে চাকরি খুঁজতে এসেছ! বুঝলে? রাত্তিরবেলাটা পারতপক্ষে ফরাসি এলাকার বাইরে থেকো না!

সূর্য জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আমার আসল কাজটা কী?

সেটা আমিও জানি না। জানতে পারবে ঠিক সময়ে। নাও, জামাটামা খুলে ফেলো। আজকের রাতটা আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।

যোগানন্দ তার পাঞ্জাবি-ধুতি খুলে ফেলে শুধু আন্ডারওয়্যার পরে মাদুরে বসল। সূর্য তাকিয়ে দেখল, যোগানন্দর সাঙ্ঘাতিক ভালো স্বাস্থ্য। রীতিমতন ব্যায়াম না করলে এ রকম স্বাস্থ্য হয় না। তবে, যোগানন্দর পিঠে অনেকগুলো লম্বা লম্বা কালসিটে দাগ। যোগানন্দ সম্পর্কে সূর্যর মনে এখন একটু একটু শ্রদ্ধা জাগছে। জিজ্ঞেস করল, পিঠে ওই দাগগুলো কীসের?

যোগানন্দ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, কিছু না! শ্যামনগরে যেবার ধরা পড়লাম, থানার, দারোগা খুব টেটিয়া ছিল।

আপনি জেল খেটেছেন?

বছর চারেক আটকে রেখেছিল।

হরদাকে চিনতেন?

হরদাই আমার গুরু। উনিই আমাকে এ-লাইনে এনেছেন।

আমাকেও।

জানি।

আমারও জেলের ভেতরটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

এত তাড়াতাড়ি কীসের? একদিন-না-একদিন যেতেই হবে।

যোগানন্দ আবার উঠে পড়ে বলল, নাও নাও, রান্নার জোগাড়যন্তর করতে হবে না? দেখি কী আছে! শোনো, তুমি এই পাশের বারান্দাতেই রান্না করে নিয়োনীচে আর যেতে হবে না। সকালের দিকে একজন মালিকে পাবে-কিন্তু সন্ধের পর সেব্যাটা গাঁজার আড্ডায় যায়-তার টিকিরও দেখা পাবে না।

যোগানন্দ হাঁড়িকুড়ি নেড়েচেড়ে দেখে বলল, তুমি নুন ছাড়া খেতে পারবে? নুনও নেই দেখছি! শুধু আছে চাল, আর মুসুরির ডাল। খিচুড়ি হয়ে যাবে।

সূর্যর খিদে নেই, রাত্তিরে তার আর কিছুই খাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যোগানন্দর স্বাস্থ্য দেখে বুঝতে পারল, এই লোকের ঘন ঘন খিদে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বারান্দার তোলা উনুনে যোগানন্দ চটপট আগুন ধরিয়ে ফেলল। চাল-ডাল একসঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে আপশোসের সুরে বলল, একটা কিছু তরকারি না হলে কি ভদ্দরলোকে খেতে পারে! কাল সকালে মালিটাকে দিয়ে কিছু আনিয়ে নিয়ে। কিন্তু এখন কী করা যায়।

একটুখানি থেমে ফের বলল, এক কাজ করা যাক। তুমি ভাই চট করে কয়েকটা ডুমুর পেড়ে আনতে পারবে?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, ডুমুর কী?

যোগানন্দ সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, ডুমুর চেনো না, তুমি কোথাকার সাহেব হে? ডুমুরই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এলাইনে যখন এসেছ, ডুমুর চিনতে হবে, ডুমুরের ফুল চিনতে হবে, সাপের পাঁচ-পা 'চিনতে হবে,

বারো হাত কঁকুড়ের তেরো হাত বিচি চিনতে হবে, বুঝলে? তুমি উনুনে একটু হাওয়া দাও, আমিই নিয়ে আসছি ডুমুর।

হ্যারিকেন না নিয়েই বেরিয়ে গেল যোগানন্দ। খানিকক্ষণের মধ্যেই যখন ফিরে এল, তখন শুধু ডুমুর নয়, তার সঙ্গে নুন, শুকনো লঙ্কা ও পেঁয়াজও নিয়ে এসেছে কোথা থেকে। কী ভাবে জোগাড় করল, সে রহস্য ভাঙল না। মুখ-চোখ তার আনন্দে উদ্ভাসিত। সোনার জিনিসের মতন সাবধানে নুনটুকু একটা পাত্রে রেখে বলল, নুন ছাড়া কোনও ভদ্দরলোকে খেতে পারে? খাওয়াটাই মাঠে মারা যেত!

গরম গরম খিচুড়ি ও ডুমুর-পেঁয়াজের তরকারি হালুম হালুম করে অমৃতের মতন খেয়ে ফেলল যোগানন্দ। সূর্যরও বেশ ভালোই লাগল খেতে। এই প্রথম সে চাল ও ডালের খিচুড়িতে রূপান্তর হওয়া আগাগোড়া দেখল–এবং এতে তারও খানিকটা অংশ আছে বলে রান্নার স্বাদটাই অন্য রকম মনে হল।

তৃপ্তি করে খেয়ে যোগানন্দ বলল, আমি এঁটো বাসনপত্তরগুলো নিচ্ছি, তুমি হ্যারিকেনটা নাও–চলো পুকুরঘাট থেকে সব ধুয়ে নিয়ে আসি।

পুকুর তো নয়, মস্ত বড় দিঘি। বাঁধানো ঘাট। এতক্ষণে জ্যোৎস্না ফুটেছে–দেখা যায় দিঘির মাঝখানে লাল রঙের শালুক ফুটে আছে। দিঘির ওপারে কয়েকটা খোলার ঘর। চার পাশে বড় বড় গাছ। বাড়িটা এককালে বাগানবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হত মনে হয়। বাড়ি থেকে দিঘি পর্যন্ত আসবার পথটুকু দু'পাশে কেয়ারি করা মেহেদির বেড়া। দল বেঁধে বেঁধে হালকা মেঘ ওড়াউড়ি করছে আকাশে।

দোতলায় ফিরে এসেই যোগানন্দ বলল, আর দেরি করে লাভ কী? শুয়ে পড়া যাক।

সত্যি সত্যি তক্ষুনি মাদুর বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নাক ডাকতে লাগল।

খাওয়া এবং ঘুমোবার ব্যাপারেই যেন যোগানন্দের যত কিছু উৎসাহ! এর সঙ্গে, তার পিঠের ওই কালসিটে দাগ ও চার বছর জেল খাটার কোনও মিল নেই। হয়তো এমন হতে পারে-যখন কোনও কাজের দায়িত্ব আসে তখন সে আহার-নিদ্রা ভুলে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার যখন কাজ থাকে না, সে বেশি করে খেয়ে ও ঘুমিয়ে সব উসুল করে নেয়।

সূর্যর সহজে ঘুম আসে না। অচেনা, অন্য রকম জায়গা, কোথাও কোনও শব্দ নেই, হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দেওয়ার পর মনে হয়, সারা দুনিয়াটা এখন যেন জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। কলকাতায় এইসময়ে তাদের বাড়িতে কারওর খাওয়াই হয়নি। বাবা বোধহয় এখনও ফেরেননি অনাথ আশ্রম থেকে। শ্রীলেখা সারাদিন নিশ্চয়ই খুব কেঁদেছে। হঠাৎ শ্রীলেখার কথা ভেবে সুর্যর খুব মনখারাপ লাগল। শ্রীলেখার বিয়ে হয়ে যাবে, সে অন্য বাড়িতে চলে যাবে-তখন সূর্য কী করবে? শ্রীলেখাকে যে তার খুব দরকার।

চন্দননগরের সেই বাগানবাড়ির নির্জনতা সূর্যর চিত্তে খানিকটা কোমল ভাব এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সূর্য তার আগে অন্য কারওর কথা এ রকম ভাবে ভাবেনি। অনেকক্ষণ ধরে শ্রীলেখার কথা তার মাথায় ঘুরতে লাগল। সে ঠিক করল, শ্রীলেখাকে আর কখনও কষ্ট দেবে না।

সকালবেলা যোগানন্দই ডেকে তুলল সূর্যকে। তার ততক্ষণে জামাকাপড় পরা হয়ে গেছে। সূর্যকে বলল, আমি ভাই চলোম। তোমাকে বেশি দিন একা থাকতে হবে না- আজ বা কালই দাদারা এসে পড়বেন। একটু চারদিক দেখে শুনে থেকো-এই আর কি!

সূর্য ওর সঙ্গে একতলা পর্যন্ত এল। ভালো করে ভোর হয়নি তখনও। অসংখ্য পাখির কিচিমিচি শুরু হয়ে গেছে। বাগানের গাছপালায় একটা টাটকা গন্ধ।

বিদায় নেবার সময় যোগানন্দ খুব সাধারণ ভাবে এমন একটা কথা বলল, যা সূর্যর বুকে খুব একটা ধাক্কা মারল। এমন সরল সুন্দর কথা সূর্য আগে কখনও শোনেনি। যোগানন্দ বলল, ভাই অমর, তোমাকে একটা কথা শুধু বলে যাই। এই যে তুমি এ-পথে এসেছ-এটা শুধু নিজের জন্য। যা করবে, শুধু নিজের কাজ ভেবে করবে। পরাধীনতার দুঃখ যদি

তোমার নিজের দুঃখ বলে মনে হয় তা হলেই তুমি সার্থক হবে। অন্যরা যদি ভুল করে, অন্যরা যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, এমনকী আমাকেও যদি ভয় পেয়ে পালাতে দেখো-তুমি পালিয়ো না। তোমার যতটুকু সাধ্য-তুমি করে যাবে।

যোগানন্দ চলে যাবার পর সূর্য একা একা সারা বাড়িটা ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। মালিকে দিয়ে কিছু খাবার আনাল। তার সঙ্গে কিছু টাকা আছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে অতিরিক্ত কোনও জামাকাপড় আনেনি-স্নান করবে কী করে? একটা ঘরে অবশ্য কয়েকটা শাড়ি ও গামছা আছে কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করা উচিত কি না সে বুঝতে পারল না। এমনিতে তার অন্য কোনও অসুবিধে হচ্ছে না-কিন্তু সিঁড়ির মুখটাতেই একটা ভিমরুলের চাক-সেখান দিয়ে যেতে-আসতে তার গা ছমছম করছে। ভিমরুলের হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় সে জানে না। সূর্য সেদিন বাড়ি থেকে একদম বেরোলই না-সারাটা দিন, বিকেল, সন্ধ্যা ঘরে শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার পর খুবই একঘেয়ে লাগার জন্য সে বেশ কিছুক্ষণ ডন-বৈঠক মেরে ক্লান্ত করে ফেলল শরীরটাকে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিনই শঙ্করবাবু আর সিরাজুল তারিখ এসে হাজির। শঙ্করবাবু গোড়া থেকেই সূর্যকে একটু যেন অপছন্দ করেছিলেন-এখানেও অপ্রসন্ন হয়েই রইলেন। সূর্যকে হুকুম করে কথা বলতে লাগলেন। তারিখ সাহেব আগের মতনই অমায়িক। এখানে কী উদ্দেশ্যে যে তারা জমায়েত হয়েছেন-তার কোনও ইঙ্গিতই নেই-যেন বেশ একটা পিকনিক হচ্ছে। সারা দিন ধরেই রান্নার উদ্যোগ আয়োজনে কেটে যায়। সূর্য ভাত রাঁধতে গিয়েছিল, তার আনাড়িপনা দেখে তারিখ সাহেব হেসেই বাঁচেন না। নিজেই সে দায়িত্ব নিয়ে নিলেন, কোথা থেকে একটা মুরগি যোগাড় করে আনলেন-খুব আহ্লাদ করে খাওয়া হল।

বিকেলবেলা সূর্যকে বাড়িতে রেখে ওঁরা দু'জন বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন অনেক রাত্রে। মুখ-চোখ খুব বেশি খুশি। সূর্য একটু মনমরা হয়ে গেল। তাকে কিছুই জানানো হচ্ছে না, সব কিছুই তাকে বাদ দিয়ে হচ্ছে-তা হলে এখানে ডেকে আনা কেন? রান্না করার জন্য?

পরদিন এলেন এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। এই ভদ্রলোকেরই নাম ননীমাধব সান্যাল, এঁরই সূর্যর মেলোমশাই হবার কথা। মহিলার নাম বনলতা। এ কথা বুঝতেও সূর্যর খুব দেরি হল না যে এঁরা স্বামী-স্ত্রী নন। এঁরা পরস্পরকে আপনি বলে কথা বলেন। এই বাড়িটাকে এমন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে, যাতে পলাতক বিপ্লবীরা এখানে এসে গোপন আস্তানা নিতে পারে। তখনও ফরাসি এলাকায় লুকিয়ে থাকার সুযোগ অনেক। এই বাড়িটার আশেপাশে কৌতূহলী মানুষজনও বিশেষ দেখা যায় না।

ননীমাধব ও বনলতা আসবার পর বেশ জমে উঠল। ননীমাধব বেশ মজলিশি ধরনের মানুষ। সূর্যর কাছ থেকে গত কয়েক দিনের বিবরণ শুনে তিনি বললেন, আর সেই জমিদারপুত্তুরটি কোথায় গেল? আমার শালীপুত্রকে এই বাড়িতে একা ফেলে সে চলে গেল?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, জমিদারের ছেলেটি কে?

যখন জানল, যোগানন্দই কোনও এক জমিদারের সন্তান-সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। তার মনে পড়ল, শুকনো খিচুড়ি ও ডুমুরের তরকারি কী উপভোগ করে খেয়েছিল সে। হরকুমারের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার পর কত রকমের মানুষের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে।

একথা ঠিক, মানুষ অনেক রকম। নিজের পরিচিত গণ্ডীর বাইরে না এলে তা বোঝা যায় না।

বনলতার মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা-সব সময় ফিটফাট সেজেগুঁজে থাকেন। দেখে কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারবে না-অথচ এই বনলতাই কিছুদিন আগে হার্মোনিয়ামের মধ্যে রিভলবার ভরে নিয়ে কুমিল্লায় পৌঁছে। দিয়ে এসেছেন।

বড়রা যখন নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করেন, বনলতা তখন গল্পে মেতে ওঠেন সূর্যর সঙ্গে। পা ছড়িয়ে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, এবার বলো, আমার দিদি কেমন আছেন?

সূর্য বুঝতে পারে না। বনলতার দিদির খবর সে কী করে জানবে?

বনলতা বললেন, বাঃ, বুঝতে পারলে না? আমি যদি তোমার মাসি হই, তা হলে তোমার মা আমার দিদি হলেন না? কেমন আছেন তোমার মা? কলকাতায় থাকেন? নিশ্চয়ই তাকে খুব সুন্দর দেখতে!

সূর্য নির্বিকার মুখে জানাল, আমার মা নেই।

বনলতার মুখখানা এক মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সূর্যর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, জানো, আমারও মা নেই। তোমার চেয়ে আমি যখন ছোট, তখন আমার মা মারা গেছেন। তোমার বাবা?

সূর্য চুপ করে রইল।

বনলতা হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, আমার সঙ্গে তোমার অত নিয়ম নিয়ে আদিখ্যেতা করতে হবে না! আমি যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও! পুলিশ যদি ধরে- তখন কি তুমি এক রকম কথা বলবে, আর আমি আর এক রকম কথা বলব? সব মিলিয়ে নিতে হবে না? তোমার মা সত্যিই নেই?

সূর্য দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কত দিন আগে মারা গেছেন?

আমার মনে নেই।

বনলতা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার চোখদুটো সজল হয়ে এল। আস্তে আস্তে বললেন, হরদাকে যখন আমি বলেছিলাম আমার মা নেই-উনি বলেছিলেন, সে জন্য দুঃখ করতে নেই-এই দেশই তো আমাদের সকলের মা। কিন্তু তোমায় আমি সেকথা বলব না। ছোট বয়সে যে নিজের মাকে হারিয়েছে তার মতন দুঃখী আর কেউ নেই। তোমার বাবা আছেন তো?

হ্যাঁ।

আর কে আছেন? ভাই, বোন?

কেউ না।

তুমি এইটুকু ছেলে, সব সময় এমন গম্ভীর থাকো কেন?

কই, না তো!

তুমি আজ স্নান করার সময় দিঘি থেকে কয়েকটা শাপলা তুলে আনতে পারবে? ভালো তরকারি হয়।

আমি সাঁতার জানি না।

সাঁতার জানো না? এ মা, এ কী কথা? এক্ষুণি শিখে নাও। যে-কোনও সময় দরকার লাগতে পারে।

আপনি শিখিয়ে দেবেন?

আমি?

বনলতা একটু যেন লজ্জা পেলেন। আরক্ত মুখে বললেন, আমি কি পারব? তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ। শংকরদাকে বলো।

থাক, পরে শিখে নেব।

আমি কী করে সাঁতার শিখেছিলাম জানো? তখন আমরা কামারহাটিতে থাকতাম বাড়ির সঙ্গেই একটা পুকুর। আমার বউদি আমাকে ইচ্ছে করে করে গভীর জলে ঠেলে দিতেন–আমি যা ভয় পেতাম–আঁকুপাকু করে, হাত-পা ছুঁড়ে–। তোমাকেও স্নান করার সময় যদি আমি ঠেলে দিই জোর করে তবে তোমার সঙ্গে বোধহয় গায়ের জোরে পারব না। তুমি কি আমার থেকেও লম্বা?

হ্যাঁ।

বনলতা উঠে দাঁড়িয়ে সূর্যকে পাশে ডাকলেন। মেয়েদের তুলনায় বনলতা বেশ লম্বা–তবু সূর্যর মাথা তাকে ছাড়িয়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে সূর্য অবলীলাক্রমে বনলতার কাঁধের ওপর একটা হাত তুলে দিল। তারপর চাপ দিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করল একটু।

বনলতা প্রথমটায় বুঝতে পারেননি, রীতিমতন অবাক হয়ে সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, হুঁ, ছেলে এর মধ্যেই পেকে বুনো! আমি তোমার মাসি হই না?

সূর্যর হাতখানা ধরে খুব মিষ্টি করে বললেন, এখন এসব দিকে মন দিতে নেই, বুঝলে? তোমার বয়সে মন বেশি চঞ্চল থাকে নিজের মনকে ঠিক করো! আগে দেশ স্বাধীন হোক–

কোনও উত্তর না দিয়ে সূর্য অদ্ভুত ভাবে হাসল।

ছ'দিনের দিন বেশি রাত্তিরে আরও তিনজন মানুষ এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে সূর্য নিজেকে সামলাতে পারল না, ডেকে উঠল, ব্রজদা!

হাজারিবাগে হরকুমারের আস্তানায় সূর্য এই ব্রজগোপালকে দেখেছিল। এতদিন বাদে সূর্য আর একজন চেনা লোককে পেল। তার ধারণা ছিল ব্রজগোপাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন।

ব্রজগোপাল সূর্যকে জড়িয়ে ধরলেন। খানিকটা আপ্লুত গলায় বললেন, হরদাকে বাঁচাতে পারলি না?

খানিকটা সামলে নিয়ে ব্রজগোপাল বললেন, সূয্যি, শিগগিরই সারা দেশে আগুন জ্বলবে। এবার শেষ ধাক্কা মারব ব্যাটাদের। এই সময়ে যারা এগিয়ে আসবে না। তারা পোকামাকড়, মানুষ না! আমাদের অনেক প্রস্তুতি দরকার। তোকে যা বলব, পারবি তো?

পারব।

আজ রাত্তিরে আমরা বেরোব। একটা কথা শুধু বলে রাখি। কেউ যদি ধরা পড়ে, কেউ যদি মারা যায় তা হলে তাকে সাহায্য করার জন্য অন্য কারওর এগিয়ে যাবার দরকার নেই। প্রত্যেকটা প্রাণের দাম আলাদা-এমনকী আমিও যদি উন্ডেড হই- আমাকে ফেলে রেখে চলে আসবি।

বনলতা বললেন, ওর গিয়ে কাজ নেই। ও তো একেবারে ছেলেমানুষ-ও আমার কাছে থাক।

ব্রজগোপালের সঙ্গে যে দু'জন এসেছিল, তার মধ্যে একজনকে সূর্যর চেনা চেনা লাগছিল। নিখুঁত ভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো, সাহেবি পোশাক- পরা, গম্ভীর ধরনের। এবার সে সূর্যর কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, না, না, ও থাকবে কেন। ও যাবে। ও ঠিক পারবে।

গলার আওয়াজ শুনেই সূর্য চিনতে পারল। এই সেই যোগানন্দবাবরি চুল, দাড়ি গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই। তার সেদিনকার চেহারাটাই ছদ্মবেশ ছিল না আজকেরটা, বোঝা যায় না। সূর্য তার হাত চেপে ধরলে। এই মানুষটিকেও সূর্যর বেশ পছন্দ হয়েছে।

২১. মাঠের মধ্যে একটা মোটরগাড়ি

মাঠের মধ্যে একটা মোটরগাড়ি অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়ি চেপে আধঘণ্টা আন্দাজ যাবার পর আবার নামা হল। চতুর্দিকে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। কোন জায়গায় এসেছে সূর্য। বুঝতে পারল না।

ওরা সবসুদ্ধ সংখ্যায় পাঁচজন। ব্রজগোপাল টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখলেন, রাত প্রায় ।দেড়টা। আকাশের দিকে তাকালেন, জমাট কালো মেঘ। ফিসফিস করে বললেন, তোমরা সবাই আমার পেছন পেছন আসবে। বাড়িটার সামনের বাগানে কাঁটাতারের বেড়া আছে, ঢুকতে হবে সাবধানে। কুকুর নেই। ওবাড়িরই একটি ছেলে দরজা খুলে রাখবে। শংকরবাবু, আপনি দরজায় দাঁড়াবেন। আমরা ভেতরে ঢুকব। নেহাত দরকার না হলে কারোকে প্রাণে মারার দরকার নেই।

বাড়িটা কার?

আঢ্যিদের বাড়ি। প্রাণকৃষ্ণ আঢ্যি একের নম্বরের কঞ্জুষ। সোনাদানা, টাকাপয়সা বাড়িতেই রাখে। বাড়িতে বন্দুক আছে-সেটা আগে দেখা দরকার।

সূর্য অস্ফুট ভাবে বলল, ডাকাতি?

এতক্ষণ তাকে কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু তারা যে দল মিলে ডাকাতি করতে আসছে-এটা কল্পনাও করেনি সে। তার মন বেশ দমে গেল। এত প্রস্তুতি, এত গোপনীয়তা-সে বিরাট কিছু কাজের কথা ভেবেছিল! ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ কিংবা ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া-এই রকমের কিছু।

ব্রজগোপাল সূর্যর দিকে ফিরে বললেন, সামনে আমাদের বিরাট যুদ্ধ। এখন আমাদের হাতে প্রচুর রসদ দরকার। টাকা চাই। যদি কারওর প্রাণের মায়া থাকে এখনও ফিরে যেতে পারো।

কেউ কোনও কথা বলল না।

ব্রজগোপাল আবার ঘড়ি দেখে বললেন, চলো! দশ মিনিটের মধ্যে সব শেষ করতে হবে!

গাড়ি থেকে দুটি শাবল বার করা হল। একটা কাপড়ের থলি। ব্রজগোপাল ও শংকরবাবুর হাতে পিস্তল। সূর্যর পিস্তলটা তার কোমরে গোঁজা-একদিন শোবার সময়েও সে ওটা হাতছাড়া করেনি।

ঘাসের ওপর শিশির ঝরে আছে। হাঁটতে গিয়ে ওদের পা ভিজে যায়। মাঠের এক পাশে দু-একটা মাটির বাড়ি, সেখানে দুটি বিড়ালের খুব ডাকাডাকি চলছে। আরও দূরে কোথাও অবিকল শিশুর কান্নার মতন শকুনির বাচ্চার ডাক শোনা যায়।

বাড়িটা দোতলা ও গোল ধরনের। ব্রজগোপাল একবার টর্চ জ্বেলে সদর দরজাটা দেখে নিলেন। আস্তে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। একজন রুগণ চেহারার মধ্যবয়সি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে-দেখলে মনে হয় বাড়ির বাজার সরকার কিংবা আশ্রিত। ব্রজগোপালের টর্চের আলোয় দেখা গেল, লোকটি থরথর করে কাঁপছে, মুখখানা একেবারে রক্তহীন। এই লোকটিই দরজা খুলে রেখেছে বোঝা যায়। ব্রজগোপালের ইঙ্গিতে যোগানন্দ দড়ি বার করে লোকটির হাত-পা বেঁধে ফেলল। লোকটি স্বেচ্ছায় তাতে রাজি। ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, বন্দুকটা কোথায়? লোকটি কোনওক্রমে বলল, দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে।

সেই ঘরের দরজা খোলা ছিল। ভেতরে বিরাট পালঙ্কের ওপর একজন মোটাসোটা বৃদ্ধ ঘুমোচ্ছে। মেঝেতে আর একটা বিছানা পাতা-সেটা খালি। আলমারির মাথাতেই বন্দুকটা রাখা-খোঁজাখুঁজি করারও দরকার হল না। সিরাজুল বন্দুকটা নিজের কাছে রাখলেন।

ব্রজগোপাল খুব সন্তর্পণে বৃদ্ধের গায়ে হাত রেখে বললেন, এই যে, উঠুন!

বৃদ্ধটি গভীর ঘুমে মগ্ন। ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে। যোগানন্দ ওর পা ধরে নাড়া দিতে যেতেই তিনি ঘুমের ঘোরেই যোগানন্দকে এক লাথি কষালেন। পাশেই টিপয়ে এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া ছিল–সেটা তুলে নিয়ে ব্রজগোপাল সবখানি জল ঢেলে দিলেন বৃদ্ধের চোখে-মুখে।

হতভম্ব বৃদ্ধ চোখ মেলতেই ব্রজগোপাল খুব বিনীত ভাবে বললেন, আদ্যিমশাই, সিন্দুকের চাবি!

এইবার বৃদ্ধের সত্যিকারের ঘুমের ঘোর কাটল। অতবড় শরীর নিয়েও আশ্চর্য রকম দ্রুততায় উঠে বসেই ষাঁড়ের মতন চাঁচাতে লাগলেন, ওরে বাবারে, মেরে ফেলল! গোবিন্দ, রাখহরি–কে কোথায় আছিস, মেরে ফেললে–!

ব্রজগোপালের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সিরাজুল–তিনি খপ করে চেপে ধরলেন বৃদ্ধের মুখ। যোগানন্দ হাতের শাবল তুলে বলল, টু শব্দ করলে খুন করে ফেলব। চাবি কোথায়?

বৃদ্ধের ওই চিৎকারেও কারওর ঘুম ভেঙেছে বলে মনে হল না। তবু সাবধানতার জন্য ওরা কয়েক জন ঘরের বাইরে গিয়ে জায়গা নিয়ে দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের দু'গালে দুটি চড় না মারা পর্যন্ত চাবি আদায় করা গেল না। কিন্তু সে ঘরের সিন্দুকে বেশির ভাগই কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ। আসল সিন্দুক দোতলারই অন্য ঘরে। বৃদ্ধকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। বৃদ্ধ কম্পিত গলায় ডাকলেন, বউমা, দরজা খোলো!

সে-দরজা আর খোলে না। ভেতরের লোক জেগেছে, তবু দরজা খুলবে না। বৃদ্ধকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হল, তবু তাদের গরজ নেই। শেষ পর্যন্ত দুমদাম করে লাথি মারা হতে লাগল দরজায়।

ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী ও দুটি সন্তান। একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে তখনও খাটের ওপরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, বছর পাঁচেকের একটি ছেলে জেগে উঠে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। বধূটি দরজা খুলে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে, স্বামীটিকে দেখলে মনে হয়– তার মতন বীরপুঙ্গব পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

আদ্যিমশাইয়ের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সিন্দুক?

আদ্যিমশাই ছেলের দিকে তাকিয়ে হাউহাউ করে উঠলেন, ওরে গোবিন্দ, সর্বনাশ হয়ে গেল! আজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেলুম।

বধূটি নিজেই আঁচলের চাবি খুলে দিয়ে বললেন, আপনাদের যা খুশি নিয়ে যান। আমার ছেলেমেয়েদের কিছু বলবেন না।

আপনার গায়ের গয়না খুলে দিন!

বধূটির সব গয়না খোলা হল। আদ্যিমশাইয়ের হাতের তিনটি আংটি। সে-ঘরের সিন্দুকে আশাতিরিক্ত জিনিস পাওয়া গেল। হাজার টাকার নোট এক তাড়া। বেশ কিছু গিনি। সোনার গয়না ভরি পঞ্চাশেক। ঘুমন্ত মেয়েটির গলা থেকে সরু হারটা যোগানন্দ খুলে নিল সাবধানে। যোগানন্দের হাতের থলিতেই সবকিছু রাখা হচ্ছে। এই সময় তার চোখ গেল আদ্যিমশাইয়ের ছেলের দিকে। দেওয়ালের সঙ্গে মিশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতের আংটি খুলে দিলেও ডান বাহুতে একটা বড় সোনার তাবিজ রয়েছে তখনও।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বললেন, ওটা খোলো!

এটা নেবেন না। আপনাদের পায়ে পড়ছি!

শিগগির খোলো।

এটাতে আমার মায়ের ছবি আছে।

যোগানন্দ বলল, মার না খেলে চলবে না, না? হাতের শাবলখানা দিয়ে সে সজোরে মারল লোকটির পিঠে। সেই মুহূর্তে সেই পাঁচ বছরের শিশুটি চিৎকার করে উঠল, বাবা! তারপরই সে ককিয়ে কেঁদে উঠল, বাবাকে মেরে ফেললে, বাবাকে মেরে ফেলছে।

ব্রজগোপাল সূর্যর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল ছেলেটির মুখ চেপে ধরতে। সূর্যর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। এতক্ষণ সে সবকিছু দেখে যাচ্ছিল নির্বিকার ভাবে, কিন্তু এখন যেন তার দম আটকে আসছে। ওই শিশুটির চিৎকার সবকিছু অন্য রকম করে দিল। এই সবকিছুর মধ্যেই একটা শিশুর উপস্থিতি যেন বেমানান। ওইটুকু ছেলের সামনে তার বাবাকে মারা-এরচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা যেন আর নেই। যোগানন্দ এত নিষ্ঠুর! ব্রজগোপালের নির্দেশ পেয়ে সূর্য যন্ত্রচালিতের মতন গিয়ে শিশুটির মুখ চেপে ধরল।

বধূটি গিয়ে স্বামীকে আড়াল করে দাঁড়াল। নিজেই মাদুলিটা ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

আদ্যিমশাইয়ের ছেলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। শাবলের ঘা-টা বেশ জোরেই পড়েছিল-সে মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

এই সময় হঠাৎ একজন প্রৌঢ় ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। লোকটির দুঃসাহস অবাক করে দেবার মতন। অন্য কারোকে গ্রাহ্য না করে সে যোগানন্দের সামনে এসে বলল, একী যোগানন্দ, তুমি? তুমি সত্যি যোগানন্দ?

লোকটিকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ দেওয়া হল না। সিরাজুল পেছন থেকে। বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে শুইয়ে ফেললে।

সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাটি অপেক্ষা করছিল নীচের তলায়। ওপরের ঘরগুলোতে মোটামুটি আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওদের খেয়াল হল, সিঁড়ির নীচেই একটা ঘর ভেতর থেকে খিলবন্ধ–সে-ঘরটা দেখা হয়নি।

তিনটি লাথি মারতেই সে-ঘরের দরজার খিল ভেঙে গেল। ভেতরের দৃশ্য দেখলে প্রথমটায় চমকে উঠতেই হয়।

ঘরটায় আসবাবপত্র কিছুই নেই। মেঝের ওপর মাদুর বিছানা পাতা। সেই বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে আছে একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, অসাধারণ সুন্দরী, তার সমস্ত শরীর অলংকারে মোড়া। দু'হাতে অন্তত দশ গাছা করে চুড়ি, তারপর বালা ব্রেসলেট; কানে কানবালা, কপালে টিকলি, গলায় পাথর বসানো হার। ব্রজগোপালের টর্চের আলোয় গয়নাগুলো ঝলমল করে উঠল। দৃশ্যটা হঠাৎ অলৌকিক মনে হয়। রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে এত গয়না পরে বসে থাকার কোনও যুক্তি নেই।

মেয়েটির কোলে একটি পাঁচ-ছ'মাসের বাচ্চা, পাশে একজন বৃদ্ধাশোওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয় অজ্ঞান।

দু'-এক মুহূর্ত সবাই থমকে গিয়েছিল। তারপর ব্রজগোপাল বললেন, মা, তোমার গয়নাগুলো খুলে দাও।

মেয়েটি তীব্র গলায় বলল, না!

আমাদের দেরি করার সময় নেই।

আমি দেব না!

দিতে তোমাকে হবেই, শুধু শুধু ঝামেলা করবে।

কিছুতেই দেব না!

ব্রজগোপাল পিস্তল উঁচিয়ে বললেন, উঠে দাঁড়াও!

মেয়েটি বাচ্চা কোলে নিয়েই উঠে দাঁড়াল। এমন রূপসি সচরাচর চোখে পড়ে না। কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে চুল, মুখোনি প্রতিমার মতন, সর্বাঙ্গ লাবণ্যমাখা। অত অলংকার ছাড়াও তার চেহারা চোখ ধাধিয়ে দেবার মতন। তার চোখে-মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই।

ব্রজগোপাল কর্কশ গলায় বললেন, গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে তারপর তোমার গয়না নিতে হবে?

তাই নিন!

তার আগে আছাড় দিয়ে তোমার ওই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলব!

মেরে ফেলুন!

তবু গয়নার জন্য এত লোভ? ভালো কথা বলছি, এখনও দাও!

আমি দেব না তো বলেছি।

তা হলে দেখো, তোমার বাচ্চাটা আগে মরুক!

ব্রজগোপাল অসম্ভব রাগত মুখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, যা তো, নিয়ে যা তো বাচ্চাটাকে! আছড়ে মেরে ফ্যাল!

সূর্য চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ব্রজগোপাল তাকে এক ধমক দিলেন। সূর্য এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। মেয়েটি দু'-এক পলক তাকাল সূর্যের দিকে। তাকাতেই হবে-কেন না, ডাকাতের দলে এ রকম চেহারার ছেলে কেউ কোনও দিন দেখবে আশা করে না। মেয়েটি বলল, কেড়ে নেবে? নাও!

সূর্য হাত বাড়াল। কিন্তু কেড়ে নিতে হল না-মেয়েটি নিজে থেকেই বাচ্চাটিকে দিয়ে দিল সূর্যর হাতে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে আছে। সূর্য খুব সাবধানে বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে গেল বাইরে। এইটুকু বাচ্চাকে সে কখনও কোলে করেনি, তার গা শিরশির করে। দরজার কাছে পাহারারত শংকরবাবুকে গিয়ে বলল, কী করব একে নিয়ে?

ওদিকে ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে ব্রজগোপাল বললেন, এবার দেবে?

আমাকে আগে মেরে ফেলুন। তার আগে পাবেন না!

গা থেকে একটা একটা করে গয়না টেনে ছিঁড়ে নিতে হয়! লোভী মেয়েছেলে! এই, তাই নে তো!

যোগানন্দ এগিয়ে গিয়ে বলল, এখনও দাও বলছি!

মেয়েটি বলল, জোর করে নিতে হয় নিন।

ব্রজগোপালও এগিয়ে গেলেন, দাতে দাঁত ঘষে বললেন, তোমার মতন মেয়েছেলেকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলে ভালো হবে, না?

মেয়েটি একটুও ভয় না পেয়ে সোজাসুজি ব্রজগোপালের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ব্রজগোপাল তার গায়ে হাত তুলতে গিয়েও পারলেন না।

এই সময় বাচ্চাটা টা টা করে কেঁদে উঠতেই সূর্য ঘাবড়ে গিয়ে তাকে নিয়ে ফিরে এল ঘরে! ওইটুকু বাচ্চার কী গলার জোর-সূর্য ওকে নিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। কারোকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বাচ্চাটাকে তুলে দিল মেয়েটির হাতে। মেয়েটি তাকে বুকে চেপে ধরল। মায়ের বুকের চেনা উত্তাপ পেয়েই বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে চুপ।

ব্রজগোপাল একটা হতাশ ভঙ্গি করলেন। একটু হাসলেন। বললেন, হরদা আমাদের অনেককিছু শিখিয়েছেন, কিন্তু একটা মেয়ের গা থেকে কী করে গয়না কেড়ে নিতে হয় সেটা শিখিয়ে যাননি। কী আর হবে, চলো!

যোগানন্দ বলল, এতগুলো গয়না ছেড়ে দিয়ে যাব?

ব্রজগোপাল বললেন, উপায় কী; মেয়েমানুষের গায়ে কে হাত দেবে? দেরি করে লাভ নেই, চলো সবাই-

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগে ব্রজগোপাল মেয়েটির দিকে ফিরে ঘৃণার দৃষ্টিতে বললেন, ছেড়ে দিলাম! ওই গয়না ধুয়ে জল খেয়ে সারা জীবন।

মেয়েটি এবার বাচ্চাটিকে বিছানায় নামিয়ে রেখে বলল, শুনুন! আমার একটা কথা শুনে যান।

কী?

আমার শ্বশুরবাড়ি বর্ধমান, ঠিকানা বলে দিচ্ছি-সেখানে কোনও দিন যাবেন, আমার যা আছে সব দেব।

নেমন্তন্ন?

আমি জানি, আপনারা স্বদেশি। সাধারণ ডাকাত নন!

কে বললে? আমি দেখেই বুঝেছি। আপনারা আমার ছেলেকে কিছুতেই মারতেন না!

ঠিক আছে, ঠিক আছে!

আমার শ্বশুররা বড়লোক। আমি গরিবের মেয়ে। এটা আমার বাপের বাড়ি নয়। একটু দূরে যে মাটির ঘর আছে, সেখানে আমাদের বাড়ি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে রাত্তিরে এ

বাড়িতে এসে থাকি। আমার যদি সব গয়নাগাঁটি যায়-শ্বশুরবাড়িতে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, আমার মা গরিব-তাই লোভ করে সব গয়না রেখে দিয়েছে। আমার মায়ের নামে অপবাদ হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যুও ভালো। এমনিতেই সব সময় তারা আমার মায়ের নামে খোটা দেয়। ওই দেখুন, আমার মা অজ্ঞান। হয়ে আছেন।

কী করেন তোমার শ্বশুর!

দারোগা।

তাই! দারোগা ছাড়া ছেলের বউকে এত গয়না এখন আর কে দেবে! ঠিক আছে, নেমন্তন্ন রইল, যাব একদিন।

মেয়েটি নির্ভয়ে, সারা গায়ের গয়না ঝলমলিয়ে ওদের এগিয়ে দিল দরজা পর্যন্ত।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক গজ যাওয়ামাত্রই চঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আদ্যিমশাই আর তাঁর ছেলে বোধহয় এতক্ষণ জানলা দিয়ে দেখছিলেন, ডাকাতরা বাড়ি ছাড়া হতেই সাহস ফিরে এসেছে। চিৎকারের মাত্রা এখন এত বেশি যে দূরের মাটির বাড়িগুলোতেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। জ্বলে উঠল দু-একটা হ্যারিকেন।

ব্রজগোপাল নির্দেশ দিলেন, তোমরা সবাই ছড়িয়ে পড়ো! প্রত্যেকে আলাদা ভাবে গাড়ির কাছে পৌঁছোবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কেউ বাধা দিতে এলে বিনা দ্বিধায় গুলি করবে এখন।

সূর্য পিস্তলটা হাতে নিয়ে দৌড়োতে লাগল অন্ধকারের মধ্যে। কাঁটাতারের কথা তার মনে ছিল না-সেখানে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল আছাড় খেয়ে। পিস্তলটা হাত থেকে খসে গিয়েছিল। পাগলের মতন খুঁজতে লাগল সেটাকে। ওদিকে লোকজনের গলার আওয়াজ বাড়ছে। সূর্যর হাঁটুর কাছে কেটে গেছে। হঠাৎ তার মনে হল, আকাশের সব মেঘ নীচে

নেমে আসছে, আশেপাশের বাড়ি ও গাছপালা এগিয়ে আসছে তার দিকে, সে এবার ফঁদে পড়বে। চতুর্দিকের সমস্ত জড় পদার্থ পিষে মেরে ফেলবে তাকে। সূর্য দু-এক মুহূর্তের জন্য নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। পিস্তলটা আবার খুঁজে পেতেই, বিনা প্রয়োজনে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ল এক রাউন্ড। সেই সঙ্গে তার সাহস ফিরে এল। নেকড়ে বাঘের মতন দ্রুত ছুটে পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে।

অন্যরা তার জন্য অপেক্ষা করছিল গাড়ির মধ্যে। সিরাজুল গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছেন। ব্রজগোপাল বললেন, সবাই এসেছে? চলো!

শংকরবাবু ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলেন, যোগানন্দ? যোগানন্দ কোথায়? অমর, তুমি তাকে দেখেছ?

সূর্য বলল, না তো!

যোগানন্দ এখনও এসে পৌঁছোল না!

সে তো এ রকম ভুল করে না!

কিছু কিছু লোকজন হইহই করে এ-দিকে ছুটে আসছে মনে হল। ব্রজগোপাল পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বললেন, আমি হুকুম দিলে সবাই একসঙ্গে গুলি চালাবে!

সিরাজুল বললেন, দাদা, এত লোকের সঙ্গে কনফ্রন্টেশান করা কি ঠিক হবে!

যোগানন্দের জন্য অপেক্ষা করা হবে না তা হলে?

আপনি বলেছিলেন, কেউ কারওর জন্য অপেক্ষা করবে না।

সবার তাই মত?

আর কেউ কোনও সাড়াশব্দ করলে না। ব্রজগোপাল বললেন, ওরা কাছে এসে পড়ছে। তা হলে চলো!

দড়াম করে একটা ইট এসে পড়ল গাড়ির ওপরে। গাড়ি একটু ঝাঁকুনি খেয়েই হুস করে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে গাড়ি বড় রাস্তায় পড়ে যখন নিশ্চিন্তে ছুটছে তখন শংকরবাবু যেন হঠাৎ শারীরিক আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ!

ব্রজগোপাল ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল! আপনারা কেউ একটা ব্যাপার খেয়াল করেননি? গয়নার থলেটা যোগানন্দর কাছে! আঁ?

গয়না টাকাপয়সা, আজকের সবকিছুই তো ওর কাছে!

যোগানন্দই এ বাড়ির সন্ধান দিয়েছিল। সে আটকে পড়বে?

আচমকা গাড়ি ব্রেক কষে থমকে গেল। আজকের রাত্তিরের সবকিছুই পণ্ডশ্রম-এই উপলব্ধি ওদের অসাড় করে দেয়। অথচ আর ফিরে যাওয়াও যায় না।

যোগানন্দ সে-দিন ধরা পড়েনি। আর কোনও দিন ফিরেও আসেনি ওদের কাছে।

২২. ন্যায়-অন্যায়ের যে সূক্ষ্ম সীমারেখা

ন্যায়-অন্যায়ের যে সূক্ষ্ম সীমারেখা রয়েছে, সেটাও কী রকম হঠাৎ হঠাৎ বদলে যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন যুক্তি খাড়া করতে একটুও দেরি হয় না। একটু দূর থেকে, নির্লিপ্ত দর্শক হিসেবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, মানুষের তৈরি করা নিয়মনীতি, বিবেক, আদর্শ-

এগুলো শিশুর অযৌক্তিকতা থেকে বেশি দূরে নয়। এমনকী সত্যও এক ও অবিচল হতে পারে না।

যোগানন্দর রহস্যময় অনুপস্থিতিতে সকলের মুখে একটা অশুভ ছায়া পড়ল। যোগানন্দর অসীম সাহস, শারীরিক শক্তিও প্রচণ্ড, সুখী বিলাসী জীবন ত্যাগ করে সে বেরিয়ে এসেছে–অথচ আজ তার ব্যবহারের তো কোনওই ব্যাখ্যা করা যায় না।

শংকরবাবু জোর দিয়ে বললেন, তিনি যোগানন্দকে ও-বাড়ি থেকে প্রথম বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। দরজা দিয়ে যোগানন্দ যখন বেরিয়ে আসে, তখন শংকরবাবুর সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। সে চাপা গলায় বলেছিল, অ্যাকশন সাকসেসফুল! রিট্রিট! তারপর সে ছুটে বেরিয়ে যায়। তার হাতে থলিটা ছিল। সিরাজুল তারিখও বললেন, তিনি যোগানন্দকে অন্ধকারের মধ্যে থলি হাতে ছুটে যেতে দেখেছেন। তখনও লোকজন তাড়া করেনি। সুতরাং যোগানন্দর ধরা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না!

তা হলে সে গাড়ির কাছে এল না কেন? সে পথভুল করবে, এটাও কল্পনা করা যায় না। আর কেউ করল না, শুধু একা তারই ভুল হবে? তা ছাড়া, ওই অঞ্চলটা যোগানন্দরই বেশি চেনা–সে-ই পুরো ব্যাপারটা পরিকল্পনা করেছিল। বাড়ির ভেতরের লোককে। হাত করে দরজা খোলাবার বন্দোবস্তও সে করেছে। কোথায় গেল যোগানন্দ?

সূর্য সবচেয়ে শেষে গাড়ির কাছে পৌঁছেছিল। সে জন্য ব্রজগোপাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই যোগানন্দকে দেখিসনি?

সূর্য বলল, না। অন্য কোনও দিকে চেয়ে দেখার মতন মনের অবস্থা তার ছিল না।

তোর আসতে দেরি হল কেন?

আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

ফায়ার করলি কাকে দেখে?

ওদের ভয় দেখাবার জন্য। ওপরের দিকে ফায়ার করেছি, কারওর গায়ে লাগেনি।

ব্রজগোপাল দু'-এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, যোগানন্দও আছাড় খেয়ে পড়ে যায়নি তো? হয়তো পা-টা ভেঙে গেছে।

শংকবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, অসম্ভব! যোগানন্দ পা ভেঙে পড়ে থাকার ছেলেই নয়।

জায়গাটায় বড় বড় ঘাস ছিল। যদি সাপেটাপে কামড়ায়।

ব্রজদা, আপনি কী বলছেন কী! এ কখনও হতে পারে?

তা হলে যোগানন্দ কোথায় গেল?

এই প্রশ্নটা বার বার ঘুরেফিরে আসছে সকলের মনে। যোগানন্দ কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে?

কিন্তু এটাও মূল প্রশ্ন নয়। সেই প্রশ্নটা এখনও কেউ উচ্চারণ করছে না। যোগানন্দের চেয়েও বড় তার হাতের টাকার থলি। টাকাপয়সা ও গয়না মিলিয়ে অন্তত তিরিশ হাজার টাকার কম নয়।

গাড়ি এসে থামল চন্দননগরের সেই বাগানবাড়ির সামনে। ননীমাধব ও বনলতা তখনও জেগে আছেন, ব্রজগোপালের সঙ্গে আর একজন এসেছিল, বাণীকণ্ঠ, সেও তৈরি। হয়ে আছে-মালপত্র নিয়ে রাত্তিরেই কলকাতায় রওনা হয়ে যাবার জন্য।

গাড়ি থেকে নেমে শংকরবাবুই প্রথম দু'হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, দূর, দূর! ডাকাতি করার পাপও করলাম, অথচ কিছুই হল না! শুধু শুধু নিরপরাধ লোককে মারা

সিরাজুল বললেন, আমরা দাগী হয়ে রইলাম!

ডাকাতি করা যে একটা পাপ কাজ এটা যাত্রা শুরুর সময় কারওর মনে হয়নি। বরং মহৎ আদর্শের আবরণটাই ছিল প্রধান। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা দরকার। সুতরাং কোনও কঞ্জুষ বৃদ্ধের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা টাকা কেড়ে নেওয়ার মধ্যে কোনও গ্লানি নেই। এবং এ কাজে বেরিয়ে যদি দু-এক জন বাধাদানকারীকে মারতে হয় কিংবা নিজেদের মধ্যে কারওকে মরতে হয়-সেটাও গৌরবের। কিন্তু সেই ডাকাতিই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করেও খালি হাতে ফিরে আসার পর ওরা নিজেদের মনে করতে লাগল সাধারণ ক্রিমিনাল। অদৃশ্য টাকার থলিটা মস্ত বড় ছায়া ফেলে দুলতে লাগল ওদের মাথার ওপর।

শংকরবাবু হতাশ ভাবে বললেন, সব গেল! সব নষ্ট হয়ে গেল!

বাকি তিন জন নেমে এসেছে নীচে। দারুণ ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করল, কী হল? যোগানন্দ কোথায়?

সূর্যর হাঁটু থেকে রক্ত পড়ছে, টনটন করছে বেশ-এখন তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। বনলতা বললেন, কী করে লাগল? ইস, অনেকখানি কেটে গেছে যে!

ওপরে আসবার পর বনলতা শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে সূর্যর হাঁটুর রক্ত মুছে ব্যান্ডেজ করে দিতে গেলেন। সূর্য কিছুতেই রাজি হচ্ছে না-হাত দিয়ে আড়াল করে বার বার বলছে, ও কিছু না-এমনিই সেরে যাবে! অন্যের কাছ থেকে সেবাশুশ্রূষা নেবার অভ্যেস নেই তার। তা ছাড়া, আর কারওর কিছু হয়নি, শুধু তারই পা কেটে গেছে এটা তার পক্ষে একটা লজ্জার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত বনলতা তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, বেশি বাড়াবাড়ি করতে হবে না, চুপ করে বসে থাকো তো! যদি সেপটিক হয়, তখন বুঝবে!

সে রাত্রে কারওর আর ঘুমোনোর প্রশ্ন ওঠে না। রীতিমতন তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। যোগানন্দকে স্পষ্ট করে কেউ বিশ্বাসঘাতক বলছে না, যদিও অনেকেরই মনের কথা তাই। একমাত্র ননীমাধব বলতে লাগলেন, তা কখনও হতে পারে? কামারপুকুর কেসে যোগানন্দ যে রকম নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিল–

ব্রজগোপাল বললেন, তা ছাড়া টাকাপয়সার ওপর ওর কোনও লোভ নেই! ওর বাপ জমিদার, কত সম্পত্তি-সে-সব ছেড়েছুঁড়ে এসে-

শংকরবাবু বললেন, ওর বাপ ওর সম্মায়ের ছেলের নামে সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছে-

তা হলেও, ও নিজে যেটুকু পেত-

একটা কথা বলুন তো। আমাদের যখন টাকাপয়সার এত দরকার-তখন যোগানন্দ তার নিজের বাড়িতে ডাকাতি করার পরামর্শ দিল না কেন? অন্যের বাড়িতে-

সব ব্যাপারেই সুবিধে অসুবিধে আছে তো! ওদের বাড়িতে নেপালি দরওয়ান।

আপনারা একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন কি না জানি না-এদানি ওর মাথায় নিশ্চয়ই একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কথাবার্তা যেন কী রকম কী রকম-

বনলতা বললেন, তা কিন্তু ঠিক। আমারও আজকাল ওকে দেখলে কী রকম পাগল পাগল মনে হত! মুখ-ভরতি গোঁফ-দাড়ি-ওগুলো নাকি ওর মানত করা-হঠাৎ কাল দেখলাম সব কামিয়ে ফেলেছে-

সূর্য অবাক হয়ে সব কথা শুনছিল, কিন্তু কোনও থই পাচ্ছিল না। যোগানন্দকে যতটুক সে দেখেছে, তার ভালোই লেগেছে-ও রকম একটু পাগলা পাগলা ভাব তো অনেক মানুষেরই থাকে কিন্তু সে এ রকম ভাবে সকলকে ঠকিয়ে যাবে-এটা কি বিশ্বাস করা যায়? মানুষ এ রকম হতে পারে? যোগানন্দর পিঠে সেই চাবুকের লম্বা লম্বা দাগের কথা তার মনে পড়ল। অবশ্য যোগানন্দর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যাও সে খুঁজে পায় না।

শংকরবাবুর অনুশোচনাই সবচেয়ে বেশি। বার বার কৃতকর্মের জন্য আপশোস করতে লাগলেন। হঠাৎ সিরাজুল তারিখের দিকে ফিরে তীব্র গলায় বললেন, তারিখ সাহেব, আপনি যে ওই বুড়ো লোকটাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে অত জোরে মারলেন, লোকটা যদি মরে গিয়ে থাকে?

সিরাজুল থতমত খেয়ে বললেন, লোকটা যে যোগানন্দকে আইডেন্টিফাই করে ফেলেছিল!

তা হোক! কিন্তু খুনি কে হবে, আপনি না যোগানন্দ?

মানে, আমি তো ঠিক–

ব্রজগোপাল হাত তুলে বললেন, চুপ! এসব কথা আর না। তারিখ সাহেব মারেননি– আমরা সবাই মিলে মেরেছি। আজকের প্রত্যেকটা কাজের জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে দায়ী।

সামান্য চোরডাকাতের মতন এখন আমাদের পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে! আমি প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে ছিলাম।

শংকর, তুমি তো আগে এ কথা বলেনি!

বলার সুযোগ পাইনি! এখন বলুন, এত সব খরচ চালানো হবে কী করে? এই বাড়িটা রাখার একটা খরচ আছে কলকাতার খরচ, এক ডজন ডিটোনেটার পাওয়া যাচ্ছিল, তার জন্য ছ' হাজার টাকা লাগবে।

মাথা ঠান্ডা করে আবার আমাদের নতুন ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে।

আবার? ব্রজদা, আমাদের দিন শেষ।

কথাটা শুনে ঘরের সবাই এক মিনিট চুপ করে রইল। যদিও বোঝা যায়, সকলের মনের মধ্যে অনেক কথার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একে বলা যায় আসন্নপ্রসবিনী: স্তব্ধতা।

ব্রজগোপাল তার লম্বাটে মুখখানায় বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়ে বললেন, এত সহজেই ভেঙে পড়ছ, শংকর?

শংকরবাবু বললেন, ভেঙে পড়ার কোনও প্রশ্ন নয়। সতেরো বছর বয়স থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখন আমার বয়স ছত্রিশ। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা জেলখানার মধ্যে কিংবা বাইরে থেকেও পালিয়ে পালিয়ে কাটালাম। কত দিন হয়ে গেল নিজের বাড়িতে নিজের বালিশ মাথায় দিয়ে শুইনি। সে জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, কী করলাম? দেশের কোন কাজে লাগলাম? এটা শুধু আমাদের একটা নেশা না আর কিছু? সামান্য কিছু বোমা পিস্তল নিয়ে আমরা ইং, বজকে তাড়াব? ভারতের সব জায়গায় আমাদের সংগঠন নেই বাংলাদেশেও নানা দল-এ আমরা কী করছি? আমরা শুধু চোরডাকাত আর খুনের মতন-

ব্রজগোপাল তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তুমি শুধু নৈরাশ্যের দিকই দেখছ। কিন্তু চরম মুহূর্ত এসে গেছে-এই আমাদের শেষ সুযোগ। ইয়োরোপে যুদ্ধ বেধে গেছে- এবার ইংরেজকে শেষ ধাক্কা দিতে পারলেই-

ননীমাধব যুদ্ধের কথাটা হালকা ভাবে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ব্রজ, তুমি ওই যুদ্ধের ওপর বেশি ভরসা কোরো না। এ যুদ্ধ দু' দিনেই শেষ হয়ে যাবে। পোন্ড নিয়ে ঝগড়া-এ-যুদ্ধ হবে ইংরেজ-ফরাসির বিরুদ্ধে জার্মানির। জার্মানির সাধ্য কী একা ইংরেজ-ফরাসির বিরুদ্ধে লড়ে?

হিটলারকে হেলাফেলা কোরো না! ওনার পাওয়ার আর অ্যামবিশন দুটোই অনেক বেশি। যে ভাবে চেকোস্লোভাকিয়াকে পকেটে পুরল, দেখলে না? নাৎসিদের অভ্যুত্থান যদি লক্ষ করো-

হিটলারের যতই ক্ষমতা থাক-ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন ভেদ করার সামর্থ্য তার হবে না। তা ছাড়া ইংরেজদের নৌশক্তি-তার বিরুদ্ধে জার্মানি? ফুঃ! ইংরেজ রাজত্বে সূর্য ডোবে না-সেই তুলনায় ওইটুকু জার্মানি কী করবে? আর একটা কথাও তোমাকে বলে দিচ্ছি-ঘরের পাশে হিটলারের এত বাড়াবাড়ি স্ট্যালিন সহ্য করবে না।

স্ট্যালিনের কথা ছাড়ো! তুমি ভুলে যাচ্ছ–স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছে। রাশিয়ার যদি মুরোদ থাকত তা হলে নাৎসি জার্মানির সঙ্গে এ রকম ভাবে হাত মেলাত না। হিটলারের দেখাদেখি চুপে চুপে ফিনল্যান্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কিন্তু হিটলার রুশদের ঘৃণা করে। ওর মতে রুশরা খাঁটি আর্য নয়–তা ছাড়া কমুনিজমের সঙ্গে নাৎসিবাদ কখনও পাশাপাশি চলতে পারে?

চলছে তো দেখতে পাচ্ছি। রুশদের যদি ঠেকিয়ে রাখা যায় তা হলে হিটলার দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে, সঙ্গে ওই মুসোলিনি গুন্ডাটা আছে–ইংরেজদের এবার শেষ করবে।

আমেরিকা ইংরেজদের পক্ষে আসবে।

রুজভেল্ট? অসম্ভব! রুজভেল্ট যুদ্ধে যোগ দেবে না কিছুতেই। তার কী দায় পড়েছে সাধ করে ইয়োরোপের যুদ্ধ ঘাড়ে নেবার। আমেরিকার জনমতও যুদ্ধের বিরুদ্ধে তারা বরং এই মওকায় কিছু ব্যবসা করে নেবে।

শংকরবাবু এতক্ষণ ননীমাধব আর ব্রজগোপালের আলোচনা শুনছিলেন। এবার গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ইয়োরোপের যুদ্ধে আমাদের কী সুবিধে হবে?

ব্রজগোপাল বললেন, এই যুদ্ধে ইংরেজ ঘায়েল হলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। আমরা ওদের শেষ আঘাত দেব।

জার্মানি যদি জেতে?

যদিটদি নয়, জার্মানি জিতবেই।

আমার কথাটা শুনুন। জার্মানি যদি জেতে–তখন কি আমরা ইংরেজদের বদলে জার্মানির অধীনে চলে যাব?

জার্মানি এত দূর এসে কলোনি করতে চায় না। তা ছাড়া, জার্মানরা ভারতীয়দের বন্ধু মনে করে-আমরাও বিশুদ্ধ আর্য। আমাদের সাহিত্য, দর্শনকে ওরা শ্রদ্ধা করে। আমার কাছে সিক্রেট খবর আছে, জার্মানি আমাদের সাহায্য করবে। আমেরিকাও ভারতের স্বাধীনতা চায়। প্রথম মহাযুদ্ধে আমরা পুরো সুযোগ নিতে পারিনি-এবারেও যদি না পারিতা হলে স্বাধীনতা আর কোনও দিন আসবে না।

আপনার কথা মতন না হয় ধরেই নিচ্ছি-এবারেই আমাদের বড় সুযোগ। কিন্তু নেতৃত্ব দেবে কে? কংগ্রেস এখন পুরোপুরি কনস্টিটিউশনাল রাজনীতির দিকে চলে গেছে। আমাদের ওরা ঘৃণা করে। ওরা চায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতার ভাগ পেতে। আমাদের দাদারাও অনেকে কংগ্রেসে গিয়ে ভিড়েছে। আমাদের কী আছে এখন? এখানে-ওখানে কয়েক জন ছড়িয়ে আছি-সংগঠন ভেঙে গেছে, অস্ত্র নেই, বিশ্বাসঘাতক ঢুকেছে-এই শক্তি নিয়ে আমরা ইংরেজ তাড়াব?

উত্তেজিত হয়ো না। ঠান্ডা মাথায় বুঝবার চেষ্টা করো। সুভাষবাবু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এখন সুভাষবাবুকে আমরা দলে পাব। সারা ভারতের যুবশক্তি এখন সুভাষবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে মোহনদাস গান্ধীর দিন শেষ! ত্রিপুরি কংগ্রেসেই তিনি কংগ্রেসি ঐক্যের কবর দিয়েছেন।

সুভাষবাবুকে ইংরেজ জেলে পুরেই রাখবে। ইংরেজ কি বোকা যে এই অবস্থায় সুভাষবাবুকে বাইরে ছেড়ে দেবে? ব্রজদা, রাজনীতি এখন অন্য দিকে যাচ্ছে। ইংরেজের সবচেয়ে মারাত্মক চালটা আপনারা এখনও ধরতে পারছেন না। মুসলিম লিগের কথা ভুলে যাচ্ছেন? ইংরেজ এখন মুসলিম লিগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। এখন আর স্বাধীনতা বড় প্রশ্ন নয়-এখন হিন্দুর স্বাধীনতা, মুসলমানের স্বাধীনতা? সারা দেশ জুড়ে এখন চলবে মন কষাকষি, দরকষাকষি-আমরা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাব ক্রমশ।

শংকরবাবু গাঢ় চোখে তারিখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী, ঠিক বলছি না?

তারিখ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, মুসলিম লিগকে অত গুরুত্ব দেবেন না। ও সব জিন্না সাহেবের খেয়াল। নিজের হাতে পাওয়ার রাখবার জন্য।

মুসলিম লিগকে গুরুত্ব না দিয়ে আপনারাই ভুল করছেন। কংগ্রেস এই ভুল করেছে। গোড়া থেকেই জিন্না সাহেবের সঙ্গে আঁতাত করেনি। এখন কংগ্রেস সারা ভারতে একজনের বেশি ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে ভোটে জেতাতে পারল না। মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জেগেছে যে তাঁদের অধিকার আদায় করার জন্য মুসলিম লিগ ছাড়া গতি নেই। কংগ্রেসি স্বাধীনতা এলে হিন্দুদেরই আধিপত্য হবে। আবুল কালাম আজাদ এ বিশ্বাসে একটুও চিড় খাওয়াতে পারলেন না। কংগ্রেস শুধু জোড়াতালি দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছে– গান্ধীজি শুধু কোরান পাঠ করে মুসলমানদের মন জয় করার কথা ভাবছেন।

তারিখ সাহেব বললেন, কংগ্রেস শুধু ফাঁকা আইডিয়ালিজম দেখাচ্ছে। মুসলমান সমাজে বহুত অভাব আর অভিযোগ তো আছেই! গরিব চাষিদের মহাজন আর। জমিদাররা রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে–মুসলমান সমাজে এখনও শিক্ষার সুযোগ নেই, চাকরি-নোকরির সুযোগ নেই–

ব্রজগোপাল অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, এটা সামাজিক সমস্যা! সামাজিক! এর সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নটা জুড়ে দেওয়া বোকামি! হিন্দুদের মধ্যেও অনেক শ্রেণি আছে- যারা খুবই গরিব, খুবই নির্যাতিত, শিক্ষার সুযোগ নেই! গরিবের আবার জাত কী? হিন্দু জমিদার কি হিন্দু প্রজাদের ছেড়ে কথা কয়? মুসলমান মহাজন মুসলমান চাষির কাছে সুদ নেয় না? জাতের ভিত্তিতে সমস্যাটা তুলে ধরাই ব্রিটিশ চক্রান্ত।

শংকরবাবু বললেন, তারিখ সাহেব, এমন দিন আসছে–সে-দিন আপনি আর আমি এ রকম ভাবে পাশাপাশি বসে আর কথা বলতে পারব না। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করবেন, আমি আপনাকে অবিশ্বাস করব!

তারিখ সাহেব বললেন, আপনি কী বলছেন কী? আপনি এত পেসিমিস্ট হয়ে যাচ্ছেন কেন?

আমি বুঝতে পারছি, আমাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমরা ওলড ফ্যাশানড় বিপ্লবী। আমরা এখনও চোরা গোপ্তা আর দু'-একটা খুনজখম করে দেশ স্বাধীন করতে চাইছি! আমি আর আপনাদের দলে নেই। আমার মতে মার্কসবাদই একমাত্র পন্থা। ধর্মের প্রশ্নটা যে হঠাৎ এ রকম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, আমরা কি আগে ভেবেছি? সারাদেশে একটা শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে না তুলতে পারলে এ প্রশ্ন আর এখনও মিটবে না। সে জন্য অনেক ধৈর্য নিয়ে কাজ করতে হবে। সারা দেশব্যাপী একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে না পারলে সে-সমাজ কখনও আসবে না।

ব্রজগোপাল বললেন, শংকর আমি বলছি, বিশ্বাস করো, শিগগিরই একটা দারুণ বড় রকমের ঘটনা ঘটবে। খুবই সাংঘাতিক ঘটনা। তখন আমাদের প্রত্যেককে সৈনিক হতে হবে।

শংকরবাবু পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে মাদুরের ওপর রেখে বললেন, এই নিন। আমাকে আর আপনার দলে পাবেন না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

কোথায় যাবে? তুমি কি এতদিন বাদে নিজের বাড়িতে ফিরবে?

ক্লান্ত বিপ্লবী এবার করুণ ভাবে হাসল। তারপর বলল, না, দেখি! বাড়ি আর ফিরব কী করে! আমি তো এখন ফেরারি ডাকাত! লুঠের বখরা পাইনি, তবু তো ডাকাত!

ব্রজগোপাল কঠোর স্বরে বললেন, শংকর, হুটপাট করে কিছু কোরো না। আমাকে দু'-এক দিন ভেবে দেখতে দাও। আর একটা কথাও আমি বলে রাখছি, যোগানন্দ যদি সত্যিই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তবে তার রক্তদর্শন না করে আমি থামব না। আজ না হোক দু-চার বছর বাদে দেশ স্বাধীন হবেই-ইতিহাসের গতি সেই দিকে-কিন্তু সেই স্বাধীন দেশে বিশ্বাসঘাতকদের কোনও স্থান হবে না। আমার সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ হবে সমস্ত রকম অন্যায়, অবিচার থেকে মুক্ত। আমি সেদিন না বেঁচে থাকলে

ক্ষতি নেই–তবু আমার পরের মানুষরা যেন সত্যিকারের মানুষের অধিকার পায়। সেই জন্যই তো এত বছর ধরে এত কষ্ট সহ্য করলাম।

২৩. ফিটন থেকে একজন

ফিটন থেকে একজন রোগা মতন প্রৌঢ় নামলেন। নেমেই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন,

অনুকূলরা এখনও আসেনি?

বড়বাবু দরজা থেকে এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, আসুন, আসুন! না, ওনারা তো কেউ এখনও এসে পৌঁছোননি!

প্রৌঢ়টির পরনে একটি বড় পাড়ের ধুতি, বেনিয়ান ও সিল্কের উড়নি। ধুতিটি কিন্তু প্রায় হাঁটুর কাছে তোলা। চুল ও ভুরু কঁচা-পাকা। মুখোনি শুকনো নারকোল মালার মতন, সব সময় রাগী রাগী ভাব। জামার ঘড়ি-পকেট থেকে চেনবাঁধা গোল ঘড়ি বার করে দেখে বললেন, আমাকে বলেছিল, সাড়ে পাঁচটার সময় আসবে–এখন পঁয়তিরিশ হয়ে গেল–এরপর আলো পড়ে আসবে–

চিররঞ্জন বড়বাবুর দিকে চোখাচোখি করলেন। অর্থাৎ এই রাগী প্রৌঢ়টির মনোরঞ্জন করা খুব সহজ হবে না।

বসবার ঘরটি আজ অন্য রকম ভাবে সাজানো হয়েছে। টেবিল-চেয়ার সোফা-কৌচ দেওয়ালের দিকে হঠিয়ে দিয়ে মাঝখানে পাতা হয়েছে কার্পেট–সেই কার্পেটের ডিজাইন–একটি সিংহ লাফিয়ে পড়ছে হরিণের ওপর। কার্পেটের ওপর পিতলের বড় ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। জানলার পরদাগুলি সব নতুন।

পাম্পশু খুলে প্রৌঢ়টি বসলেন কার্পেটে-চিররঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে একটি তাকিয়া এগিয়ে দিলেন। তাতে হেলান দিয়ে বসে প্রৌঢ় বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কন্যা আপনার?

বড়বাবু বললেন, আজ্ঞে না। আমিও এ বাড়ির জামাই। চিররঞ্জনকে দেখিয়ে বললেন, ইনি পাত্রীর কাকা। পাত্রীর বাবা একটু বাদেই এসে পড়বেন।

প্রৌঢ় বললেন, পাত্র আমার মেজভাইয়ের বড়ছেলে।

বড়বাবু বললেন, ও হ্যাঁ, আপনার কথা শুনেছি। মহাশয়ের নামই তো রাজীবলোচন হালদার?

হ্যাঁ। কালীঘাটের হালদারদের কেউ নই। আমরা নেবুবাগানের হালদার-আমাদের তিনপুরুষ ধরে আয়না কাঁচের কারবার।

আপনার জন্য একটু চা? কিংবা শরবত?

এখন না, এখন না–

রাজীবলোচন আবার ঘড়ি দেখলেন এবং জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দিনের আলো কমে আসছে-এটা তার একদম পছন্দ নয় মনে হচ্ছে। ইলেকট্রিক আলোয় মেয়ে দেখার ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস নেই। শ্যামলা মেয়েকেও পমেটম পাউডার ঘষে ফরসা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

বড়বাবু ও চিররঞ্জন খানিকটা তটস্থ হয়ে বসে আছেন। একে পাত্রপক্ষ, তাও পাত্রের জ্যাঠামশাই, এঁকে খুশি করার কী কী উপায়-চিন্তা করছেন দু'জনে। ওঁরা আগেই শুনেছেন যে, এই রাজীবনোচন নিঃসন্তান। এঁর বিষয়-সম্পত্তি ওই ভাইপোই পাবে সুতরাং এঁর কথার ওপর কেউ কথা বলবেন না। প্রিয়রঞ্জন জরুরি ব্যবসার কাজে আটকে পড়েছেন-ফিরতে একটু দেরি হবে-পই পই করে বলে গেছেন যেন পাত্রপক্ষের অভ্যর্থনায় পান

থেকে চুন না খসে। ও-বাড়ির মেয়েরা একবার দলবেঁধে দেখে গেছে- মোটামুটি পছন্দও হয়েছে-আজ আসছেন বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা-এঁদের মর্জির ওপরেই সব নির্ভর করছে। পাত্র সুদর্শন, বি. এ. ফেল, পৈতৃক ব্যবসা দেখাশুনা করে, প্রচুর সম্পত্তি।

রাজীবলোচন চিররঞ্জনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মশাইদের আদিবাস কোতায়?

আজ্ঞে, ফরিদপুরে।

কোন মহকুমা?

মাদারিপুর সাব-ডিভিশনে।

কোন গ্রাম? বলুন, বলুন, আমার ও-সব জায়গা ঘোরা আচে।

ফুলবাড়ি, মামুদপুরের পাশেই।

ঘুরিচি, সব জায়গায় ঘুরিচি। বড় এঁদো পচা সব জায়গা। আমরা জানেন তো, বাঙাল বাড়ির সঙ্গে এর আগে কখনও সম্বন্ধ করিনি। আমার মশাই খোলাখুলি কতা। বাঙালদের হালচাল আলাদা-আমাদের আলাদা। তা, এর আগে চোদ্দো-পনেরোটি মেয়ে দেখা হলকারওর সঙ্গেই আমাদের ছেলের কুষ্ঠির মিল হয় না। লগ্ন মেলে তো রাশি মেলে না। এদিকে আমার মায়ের বয়স বিরাশি বছর-তিনি বায়না ধরেছেন যে, নাতির বিয়ে দেখে যাবেন। আপনাদের মেয়ে মানিয়ে চলতে পারবে তো?

চিররঞ্জন বললেন, নিশ্চয়ই! মেয়ে আমাদের ভারী ঠান্ডা। যেমনটি আপনারা শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন।

আমরা কিন্তু বাড়ির বউদের বাপেরবাড়ি পাঠাই না।

তা, মানে, আপনারা যা–

আপনারা শুঁটকি মাছ খান?

বড়বাবু হেসে বললেন, আমি খাই। এ বাড়ির অন্য আর কেউ খায় না। সব বাঙালরা খায় না।

কী পান বলুন তো ওতে? গন্ধে নাড়িভুড়ি উলটে আসে! কুকুর-বেড়ালেও ছোঁয় না। দেশে কি মাছের অভাব আছে যে শুকিয়ে আমসি করে খেতে হবে?

বড়বাবু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। পাত্রের গুরুত্বপূর্ণ জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। কিছু না বলে তাকিয়ে রইলেন হাসি হাসি মুখ করে।

এই সময় আর একটা গাড়িতে আরও পাঁচ জন এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে আছেন পাত্রের বাবা, এক কাকা, ওবাড়ির দুই জামাই ও এক শ্যালক। ভদ্রতা, নমস্কার ও কুশলাদি বিনিময়ের পর খাবার আসতে আরম্ভ করল, প্রথমে সকলের জন্য প্লেটে প্লেটে ফল-বাতাবিলেবু, আম, আনারস, আপেল, খেজুর। তারপর আলাদা প্লেটে লুচি, আলুরদম ও ক্ষীর। আবার আলাদা প্লেটে সন্দেশ, শোনপাপড়ি ও দই। এই বিপুল খাদ্যের অধিকাংশই নষ্ট হল। পাত্রের পেটুক কাকা শুধু নিজের সবকিছু চেটেপুটে খেলেন, বাকিরা নাড়াচাড়া করলেন মাত্র। জ্যাঠামশাইটি শুধু এক টুকরো ফল তুলে মুখে দিলেন। নুচি খেলেই তাঁর অম্বল হয়'- এ কথা জানালেন-এবং অম্বল হলে কী কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়-এসব বিশদ ভাবে আলোচিত হল।

খাবার পর্বের শেষ দিকে উপস্থিত হলেন প্রিয়রঞ্জন। দেরি হবার জন্য ক্ষমা চাইলেন বার বার-এবং সকলকেই আর একটু খাবার মুখে ভোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ভাবে জানিয়ে দিলেন যে-এই সব খাবারই তাঁর মেয়ের তৈরি। কেউ কোনও প্রতিবাদ করলেন না। মেয়ের সুচকর্ম, রন্ধনপটুতা, সেবাপরায়ণতা সম্পর্কে বিস্তারিত বলার পর প্রিয়রঞ্জন অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন, তবে হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানানো দরকার। আমার মেয়ে নাচ-গান জানে না। ওসব শেখাবার চল নেই বাড়িতে।

এ-সংবাদে পাত্রের জ্যাঠামশাই বেশ সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, বাড়ির বউ তো আর থিয়েটারে অ্যাকটো করতে যাবে না! ও-সবের দরকারটা কী?

পান চিবোতে চিবোতে আরও কিছু কথা হল। কিন্তু দেনা-পাওনার বিষয়টা ঘুণাক্ষরেও তুললেন না পাত্রপক্ষ। তাঁরা অত কঁচা নন, ওই আলোচনা তারা করবেন নিজের বাড়িতে বসে-যেখানে পাত্রীর বাবা কৃপাপ্রার্থী হয়ে যাবেন। নিজের বাড়িতে বসে দর কষাকষি অনেক সুবিধে।

কিছুক্ষণ পর রাজীবলোচন বললেন, তা হলে এবার–

প্রিয়রঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ওরে, পাঠিয়ে দে না–

রাজীবলোচন খুঁত খুঁত করে বললেন, বেলা পড়ে গেল একেবারে-

অন্দরমহলে শ্রীলেখাকে সাজানো শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আজ দুপুরে তাকে জোর করে ঘুম পাড়ানো হয়েছে-যাতে চোখদুটি বেশ ভরাট দেখায়। স্নান করেছে ব্যাসন ও কাঁচা হলুদ মেখে। পায়ে আলতা, চোখে কাজল, সারা শরীরে ফেস পাউডার। শ্রীলেখার গায়ের রং তেমন ফরসা নয়-কিন্তু আজ এত প্রসাধন তার সর্বাঙ্গের চামড়ার একটা চিক্কণ ঔজ্জ্বল্য এসেছে। তার চক্ষুদুটির চাপা উদবেগের জন্য তাকে আজ আরও মোহময়ী মনে হয়।

শ্রীলেখা এর আগে আরও চার বার বিভিন্ন পাত্রপক্ষের সামনে হাজির হয়েছে। তবু তার লজ্জা ও শঙ্কা কাটেনি। ডাক আসতেই সে যেন কেঁপে উঠল। চেপে ধরল তার মায়ের হাত। তখন শ্রীলেখাকে দু'দিকে দু'জন ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হল, যেন সে মানুষ নয়, একটা পুতুল।

অন্য মেয়েরা দরজার কাছে এসে থেমে গেল, ভেতরে যেতে হবে শ্রীলেখাকে একা। সে দরজা থেকে দু'পা গিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, চিবুক বুকে ঠেকানো। অন্য কেউ কিছু বলছে না দেখে বড়বাবুই উঠে গিয়ে তার হাত ধরে এনে বসিয়ে দিলেন।

দরজার ওপাশে মেয়েদের ভিড়। সান্ত্বনাকে শুধু নীচে নামতেই দেওয়া হয়নি তার গায়ের রং বেশি ফরসা-যদি তাকে দেখেই পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে যায়। বাদল হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল-চিররঞ্জন তাকে চোখ দিয়ে বকলেন। বাদল তবু গেল না-দরজার চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

পাত্রের পেটুক কাকাই প্রথম প্রশ্নটা করলেন। তোমার নাম কী মা?

শ্রীলেখা চুপ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করাতেও শ্রীলেখা উত্তর না দেওয়ায় প্রিয়রঞ্জন একটু চঞ্চল হলেন। বললেন, বল, নাম বল!

শ্রীলেখা কার্পেটের সিংহের দিকে তাকিয়ে খুবই আস্তে আস্তে নিজের নাম বলল।

অনেকেই শুনতে পেলেন না, তবু কেউ অপ্রসন্ন হলেন না। পাত্রীর লাজুকতা তার গুণেরই পরিচয়।

এর পরের প্রশ্নগুলোও মামুলি ধরনের। কোন ক্লাসে পড়ো, ইতিহাস ভালো লাগে না অঙ্ক ভালো লাগে, যুদ্ধ কোন কোন দেশের সঙ্গে বেধেছে ইত্যাদি। শ্রীলেখা অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারল না কিংবা লজ্জায় দিল না।

তারপর রাজীবলোচন মূল ভূমিকা নিয়ে ফেললেন। রাজীবলোচনের কথায় নম্রতা বা বিনয় নেই। তিনি প্রথমেই ভূমিকা করলেন, ছেলেমেয়ে হলে মায়ের কাছ থেকেই লেখাপড়া শুরু করা দরকার। সেই জন্যই আজকালকার মেয়েদের লেখাপড়া কিছুটা জানা উচিত। এবং লেখাপড়া বলতে ইংরেজিই তো প্রধান। শ্রীলেখা কি এক ডজন ভেড়ার ইংরেজি জানে? এক ডজন জাহাজ?

রাজীবলোচন এমন কড়া গলায় প্রশ্ন করছিলেন যে উত্তর না দিয়ে উপায় নেই। এ যেন ইস্কুলের রাগী মাস্টারমশাই।

এবার বলো তো মা গন্ডার ইংরেজি কী?

রাইনোসেরাস।

রাইনোসেরাস বানান কী?

এটা রাজীবলোচন একটা কাঁচা কাজ করে ফেললেন, কেন না, রাইনোসেরাস, কনসান্স আর হাইজিন-এই বানানগুলো প্রত্যেকেই এসে জিজ্ঞেস করে বলে শ্রীলেখাকে ভালো করে মুখস্ত করিয়ে দেওয়া আছে। এর উত্তর শুনে তৃপ্ত হয়ে রাজীবলোচন বললেন, আচ্ছা বেশ! এবার দু'লাইন বাংলা পদ্য বলছি-পর পর দশবার বলে যাও তো! তাড়াতাড়ি বলো!

জলে চুন তাজা।
তেলে চুল ভাজা!

শ্রীলেখা একবার ঠিকঠাক বলল। তারপর তাড়াতাড়ি বলতে গিয়েই বুঝতে পারল, এটা মোটেই সহজ নয়। জিভ জড়িয়ে যায়। দু-এক বার বলার চেষ্টা করেই শ্রীলেখা মুখ লাল করে চুপ করে বসে রইল।

শ্রীলেখার প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই তার গুণপনা বলে গণ্য হল। সেইটাই আসল পরীক্ষা। কেন না, যে-মেয়ে গুরুজনদের সামনে টরটর করে কথা বলে, তার চরিত্র ভালো হয় না। রাজীবলোচন যখন রীতিমতন নরম সুরে শ্রীলেখার সঙ্গে ঘরোয়া কথা আলোচনা করতে লাগলেন, তখন সকলেরই মনে হল, মেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে। পাত্রপক্ষ যাবার সময় সেই রকম স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। অবশ্য পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী যে একেবারে রাজযোটক-সেটাও খুব বড় কথা।

সূর্য ফিরল সন্ধ্যার পর, যখন বাড়ি থেকে অতিথিরা চলে গেছেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন, চোখ ভেতরে বসা। বাড়ি ফিরে সে কারওর সঙ্গে বিশেষ কথা বলল না, নিজের ঘরে চলে গেল। সূর্য বড়বাবুর হাতে দু-এক দিন মার খাবার পর সবাই তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। সে কখন কোথায় যায়কখন বাড়ি ফেরে-এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। বড়বাবু বাড়ি থেকে তখন বেরিয়ে গেছেন। অন্যরা বেশ একটা আনন্দে গল্পে মশগুল। শ্রীলেখার বিয়ে প্রায় ঠিক-এতে তার বাবা-মায়ের মন খুব উৎফুল্ল। শ্রীলেখা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে-আর সান্ত্বনা তাকে খুঁজে খুঁজে রাগাচ্ছে।

বাদল সূর্যর ঘরে গিয়ে বলল, সূর্যদা তুমি এতদিন আসোনি কেন? পরশু আমাদের পাড়ায় টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সাইকেল রেস হয়ে গেল?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, তুই সবটা দেখেছিলি?

হ্যাঁ। সারা রাত জেগে-কত আলো—

মিথ্যে কথা। সূর্য সেটা বুঝতে পেরে হাসল। বাদল ইদানীং বেশ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। সে দিনেরবেলা ভূত দেখে, রাত্তিরে চাঁদের গায়ে একটা ছায়া নড়তে দেখে, বড়দের গলার আওয়াজ নকল করে অন্যদের চমকে দেয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাদল সূর্যকে এই ক'দিনের যাবতীয় খবর পরিবেশন করে দিল। সূর্য সম্পর্কে বাড়ির কে কী বলেছে, তা-ও বাদ গেল না। মোক্ষম খবরটি জানাল সবার শেষে। জানো সূর্যদা বড়দির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

সূর্য বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। নির্লিপ্ত গলায় বলল, আচ্ছা!

জামাইবাবু না, খুব লম্বা। জ্যাঠামশাই বলেছেন!

হুঁ।

জামাইবাবুদের বাড়িতে তিনটে বড় বড় কুকুর আছে। আমি কিন্তু বরযাত্রী যাব- ছোটরাও যায়। আমি সেদিন কাপড় পরব।

আটটা বাজতে-না বাজতেই সূর্য রান্নাঘরে গিয়ে বলল, ঠাকুর আমার খাবার দাও। একলা একলা খাবার খেয়ে নিয়ে সূর্য আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলল তার ঘরে। একসময় আলো জ্বেলে রেখেই সূর্য বেরিয়ে গেল তার ঘর থেকে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় শ্রীলেখা উঠে এল ছাদে। পাজামা ও গেঞ্জি পরে সূর্য বসে আছে টিনের চেয়ারে রাস্তার দিকে মুখ করে। শ্রীলেখা আস্তে আস্তে তার পেছনে পঁড়াল, সূর্য মুখ ফেরাল না। শ্রীলেখা হাত রাখল সূর্যর কাঁধে, সে তবু নিঃসাড়।

শ্রীলেখা ডাকল, এই?

উঁঃ?

আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

কেন?

কথা বলছ না যে?

কী বলব?

তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

কাজে গিয়েছিলাম।

তোমার সেই জিনিসটা আর আমার কাছে রাখবে না?

তার আর দরকার নেই।

কেন?

তুই তো এ বাড়িতে আর থাকবি না।

বাঃ, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি বুঝি?

কবে যাচ্ছিস?

সে সব এখনও কিছু ঠিক নেই।

সূর্য চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। স্পষ্টত বোঝা যায়, তার মেজাজ ভালো নেই-এমনকী শ্রীলেখার সঙ্গেও সে মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে না। হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে আলগা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া। এত রাত্তিরেও কোন বাড়িতে কলের গান বাজছে।

শ্রীলেখা সূর্যর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমার বিয়ে হচ্ছে বলে তুমি রাগ করেছ?

কেন তোর বিয়ে হবে?

বাঃ হবে না? বাবা, মা–

আমি তোকে বিয়ে করব।

শ্রীলেখার মুখখানা অরুণবর্ণ হয়ে গেল। চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, কী পাগলের মতো যা-তা বকছ?

অন্য কেউ বিয়ে করতে পারে, আর আমি পারি না?

অন্য কেউ আর তুমি বুঝি এক?

কাজি ক্যান অলওয়েজ ম্যারি।

এটা বিলেত পাওনি।

লোকে যেমন বেড়ালছানা আদর করে, সূর্য এক হাতে সেই রকম ভাবে শ্রীলেখার কোমর আঁকড়ে ধরল। তারপর বলল, শ্রীলেখা, তোকে যদি অন্য কেউ বিয়ে করে, তা হলে আমি গুলি করে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!

সূর্যদা, প্লিজ, এ রকম অদ্ভুত কথা বোলো না। আমার ভয় করে। তোমার সেই জিনিসটা আমার কাছে দিয়ে দাও।

সূর্য শ্রীলেখাকে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, আমি সত্যি মেরে ফেলব! বিশ্বাস কর! একটু বানিয়ে বলছি না!

শ্রীলেখা কোনও উত্তর দেবার আগেই সূর্য তার ডান হাতের তর্জনি শ্রীলেখার ঠোঁটে ঠেকাল। তারপর আঙুলটা শ্রীলেখার সারা মুখে বোলাতে লাগল–যেন সে কোনও ছবি আঁকছে। শ্রীলেখা কোনও বাধা দিল না। সে বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইল সূর্যর মুখের দিকে।

সূর্য আঙুল দিয়ে শ্রীলেখার কচি পেয়ারার মতন থুতনিটা উঁচু করে ধরে চেয়ে রইল, দু'-এক মুহূর্ত–তারপর সেখানে নিজের ঠোঁট চেপে চুষতে লাগল। শ্রীলেখা এস্তে তাকাল ছাদের সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির পাশেই বড়বাবুর ঘর। বড়বাবু নিশ্চিত ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণে কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তেই তো জেগে উঠতে পারেন। শ্রীলেখা প্রাণপণে চেষ্টা করল জানলার সীমানা থেকে সরে যাবার। কিন্তু সূর্যর বজ্রমুষ্টি ছাড়াবার সাধ্য কী তার! থুতনি ছেড়ে সূর্য শ্রীলেখার গলায় ঠোঁট নিয়ে এল–তারপর আরও নীচে। শ্রীলেখা জোরে শব্দ করতেও পারছে না। আঁচল সরিয়ে শ্রীলেখার বুকে মুখ গুঁজে সূর্য বলল, তোর বুকে কী সুন্দর গন্ধ!

সূর্যদা ছেড়ে দাও!

তোকে আমি এক্ষুনি বিয়ে করব।

শ্রীলেখার বুকের জামা জোর করে টেনে খুলে ফেলে সূর্য অদ্ভুত ব্যগ্র ভাবে তাকিয়ে রইল সে-দিকে। যেন সে কোনও মানুষের শরীর দেখছে না-দেখছে কোনও অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। এক জোড়া অনাস্বাদিত ফল, অল্প অল্প কম্পমান। যেন নরম' শব্দটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার চোখের সামনে। এর থেকে বেশি কোমলতা আর কোথায় আছে পৃথিবীতে?

খুব আলতো ভাবে সূর্য সেখানে হাত রাখল, আঙুল দিয়ে ছবি আঁকতে লাগল, মধুর উত্তাল তার রং। জিভটা নিয়ে এসে ছোঁয়াল, তাও খুব আলতো ভাবে। ফিসফিস করে বলল, আমি তোকে বিয়ে করব।

দিশেহারা হয়ে শ্রীলেখা বসে পড়ল মাটিতে। ভারী অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলল, সূর্যদা, আমি ঠিক মরে যাব!

সূর্যও বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীলেখাকে নিজের বুকের ওপর টেনে এনে পাগল হয়ে গেল। শ্রীলেখার শাড়ি-সায়া-ব্লাউজের বন্ধন ছাড়াবার জন্য এলোমেলো চেষ্টা করে বার বার বলতে লাগল, আমি তোকে বিয়ে করব! আমি তোকে বিয়ে করব! এক্ষুনি!

২৪. সূর্য প্রকাশ্যে জানিয়ে দিল

সূর্য প্রকাশ্যে জানিয়ে দিল যে সে শ্রীলেখাকে বিয়ে করবে। একথা প্রথম বলল সে। শ্রীলেখার মাকে। বলার সময় সে একটুও লজ্জা পেল না, চোখ নিচু করল না, গলা কাঁপাল না। যেন তার মতামতের ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

এবং পাত্র হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সে সেদিন থেকেই আবার কলেজে যাওয়া শুরু করলে। এর মধ্যে তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি করে দেওয়া হয়েছিল প্রথম দিকে প্রায়ই সে ক্লাস করেনি। বিবাহের ঘোষণাটি জানিয়ে দিয়ে সে গম্ভীর ভাবে বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল কলেজে।

সুপ্রভা প্রথমে কথাটায় গুরুত্ব দেননি, কিন্তু ক্রমশ এই নিয়ে একটা হুলুস্থুলু পড়ে গেল। বাড়িতে। এ রকম অদ্ভুত কথা কেউ কখনও শোনেনি। ষোলো বছরের ছেলে আর। পনেরো বছরের মেয়ে এবং একই পরিবারভুক্ত, তারা বিয়ে করতে চায়। কী মনে করে এরা? বিয়ে মানে কি বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসানো?

শ্রীলেখাকে হাজার কথা জিজ্ঞেস করেও একটাও ঠিক মতন উত্তর পাওয়া যায় না। সে শুধু বার বার বলে, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না! ভয়ে তার মুখ নীলচে বর্ণ ধরেছে, চোখ বসে গেছে কোটরে কান্নার ক্ষমতাও তার নেই। তার মা ও কাকিমা তাকে বার বার জেরা করতে লাগলেন, তুই কিছু বলেছিস? সূর্যর মাথায় এ কথা এল কী করে? কী করে সে এত সাহস পায়?

শ্রীলেখার সেই একই উত্তর–আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানি না।

সন্ধ্যাবেলা সূর্য বাড়ি ফিরে এসেই শ্রীলেখাকে ডাকল। চেঁচিয়ে গলা ফাটাল-তবু শ্রীলেখাকে পাওয়া গেল না। তাকে তার মা কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রিয়রঞ্জনের কাছে ব্যাপারটা দু'-এক দিন গোপন করে রাখার চেষ্টা হল। শেষ পর্যন্ত তার কানে গেলই। শুনেই প্রিয়রঞ্জন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তার চরিত্রে বিস্ময়বোধ নেই, তিনি কোনও কথা শুনে হতবাক হয়ে যান না–অপছন্দের কিছু হলেই তিনি রাগারাগি শুরু করেন। প্রথমেই তিনি বকতে লাগলেন সুপ্রভাকে। মা এত লাই দিয়েছে বলেই তো মেয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। মা যদি মেয়েকে সামলাতে না পারে তা হলে কে পারবে? অতবড় ধিঙ্গি মেয়েকে কেউ চোখের আড়াল করে? আর ওই সূর্যটিকে তো গোড়া থেকেই জানেন, ওটা একটা নচ্ছার, হারামজাদা। অজাত, কুজাত!

শ্রীলেখাকে হাতের কাছে পেলে তিনি নিশ্চিত, সে-দিন মারধর করতেন। প্রধানত বাবার রাগ থেকে বাঁচাবার জন্যই সুপ্রভা শ্রীলেখাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর দূর সম্পর্কের বোনের কাছে।

বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন না করেই প্রিয়রঞ্জন চটি ফটফটিয়ে অমর, অমর বলে ডাকতে ডাকতে উঠে এলেন তিনতলায়। অমরনাথ তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে এমান্ডসেনের ভ্রমণ-বিবরণী পড়ছিলেন। রাত্রে তিনি চোখে কম দেখেন বলে বইখানা একেবারে চোখের সামনে ধরা।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বড়বাবু একথা শুনে স্তম্ভিত বা ক্রুদ্ধ হলেন না। হেসে উঠলেন হো হো করে। হাসতে হাসতেই বললেন, তাই নাকি? ব্যাটা এরই মধ্যে বিয়ে করতে চায়? তা মন্দ কী?

প্রিয়রঞ্জন হাসিঠাট্টার ধার ধারেন না। তিনি কঠোর ভাবে বললেন, তুমি বলছ কী অমর? তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

বড়বাবু উত্তর দিলেন, কেন, তোমার এত অমত কীসে? আমার বিষয়-সম্পত্তি সব তো সূয্যিই পাবে।

বিষয়-সম্পত্তির জন্য আমি মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেব?

আহা, ওরা নিজে থেকেই যদি চায়-

আমার মেয়ে কক্ষনও এ রকম চাইতে পারে না। এ রকম কথা সে উচ্চারণ করলে তার দাঁত ক'খানা খুলে ফেলে দেব না।

ও রকম ভয় দেখালে আর সে বলবে কী করে? বরং সহজ ভাবে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।

সে এখন এ বাড়িতে নেই।

আসবে তো! তখন জিজ্ঞেস করলেই হবে। এত ব্যস্ত হবার তো কিছু নেই।

তুমি বুঝতে পারছ না অমর। তুমি মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ না-কিন্তু মেয়ে আমার। মেয়েসন্তানের গায়ে যদি একটু কলঙ্ক লাগে, তা হলে সারা জীবন সে সুখ পাবে না। বাপ হয়ে মেয়েকে আমি সেই জায়গায় ঠেলে দেব?

আমি হয়তো সত্যিই তোমার মতন বুঝতে পারছি না। তোমার আপত্তিগুলো কী বলো তো! আমি নিজে অবশ্য বাল্যবিবাহে মন্দের কিছু দেখি না। প্রকৃতির যা বিধান, তাকে অমান্য করলে ফল ভালো হয় না। যৌবন আর কদিনের!

তা বলে ষোলো বছরের ছেলের বিয়ে?

তোমার পিতাঠাকুর বোধহয় তার চেয়েও কম বয়সে প্রথম বিবাহ করেছিলেন। অন্তত আমার বাবা তো করেছিলেন। যাকগে সে কথা না তোলাই ভালো কিন্তু বিয়েটা আজই হচ্ছে না। তিন-চার বছর যাক না-সূর্যিটা অন্তত গ্রাজুয়েট হয়ে নিক। এর মধ্যে যদি কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে থাকে।

এ বিয়ে হওয়া অসম্ভব!

ধরে নিলাম অসম্ভব। কিন্তু তোমার এত আপত্তির কারণটাই বা কী?

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ে হয়? লোকে তো জানে, ওরা আত্মীয়। আমাদের বংশে এ রকম বেলেল্লাপানা কেউ কখনও করেনি।

তোমার বংশাভিমান আছে, আমার অবশ্য তা নেই। আমার ছেলে মুচি-মেথরের মেয়েকে বিয়ে করলেও আমার আপত্তি থাকবে না।

তোমার পক্ষে সেটা বলা সহজ। ও-ছেলের কোনও জাতের ঠিক আছে! ও যে তোমার ছেলে তার কোনও ঠিক আছে?

বড়বাবুর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। স্থির চোখে প্রিররঞ্জনের দিকে চেয়ে রইলেন দু'-এক পল। তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন, পি. আর, ছেলের দোষে তার মায়ের নামে কলঙ্ক দেওয়া সুরুচির পরিচয় নয়। তোমাদের চোখে ওর মা ছিলেন একজন নাচনেওয়ালি। আমার চোখে তিনি ছিলেন একজন উঁচু জাতের শিল্পী। সেই রক্ত আছে আমার ছেলের শরীরে। ও সাধারণ মানুষের মতন হবে না।

ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করতে গেলে ওসব শিল্পটিল্প চলে না।

আমি আর সে রকম ভাবে সংসার করলাম কবে?

ওই ছেলেকে নিয়ে তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে।

তুমি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ?

অভিশাপ না, আমার কর্তব্য তোমাকে সাবধান করে দেওয়া। ও-ছেলেকে বিদায় করে। দাও! কলা দিয়ে ওই কালসাপ পুষো না।

নিজের ছেলেকে তাড়িয়ে দিতে বলছ!

তা ছাড়া আর কী করবে! ও-ছেলেকে শাসন করার ক্ষমতাও তোমার নেই। এত তো মারধর করলে-পারলে ওকে আটকাতে? যখন তখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, কুসঙ্গে মিশছে। এখন নিজের বোনের দিকেও কুদৃষ্টি দেয়।

ওকে আমি আবার হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে পারি।

হোস্টেলে থেকেও এখন আর ও-ছেলে বাগ মানবে না!

সূর্য তোমার বোনের ছেলে নয়! তোমাদের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা খুব ক্ষীণ। এত ক্ষীণ সম্পর্কে বিবাহ আটকায় না।

ও কথাটা তুমি দ্বিতীয় বার আর আমার সামনে উচ্চারণ কোরো না। ওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে বিষ খাইয়ে মারব।

আহা, এত বিচলিত হচ্ছ কেন? বেশ তো বিয়ে হবে না। ওদের ও-সব ছেলেমানুষি কথা-নিষেধ করে দিলেই হবে। অল্প বয়সে ও রকম কত কী ইচ্ছে হয়!

শুধু নিষেধ করলে তোমার ছেলে শুনবে? ওই গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে, কারওর কথা শোনে না। এইসব কথা যদি পাঁচকান হয়-আমার মেয়ে খুঁতো হয়ে যাবে না? তার আর বিয়ে হবে?

বড়বাবু হঠাৎ সূর্য সম্পর্কে খুব মায়া অনুভব করলেন। কী-ই বা বয়স, বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু হয়নি এখনওনা হলে মুখফুটে কেউ নিজের বিয়ের কথা বলে? কিশোর বয়সে কত রকম সুখস্বপ্ন থাকে!

বড়বাবুর ইচ্ছে হল একটু চিররঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করার। কিন্তু কাল থেকে চিররঞ্জনের খুব জ্বর-তাকে এখন ডাকা যাবে না। উঠে গিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সূর্যের নাম ধরে ডাকলেন।

সুপ্রভা ও হিমানী একঘর উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। মহিলাদের স্বয়ম্প্রবৃত্ত হয়ে পুরুষদের আলোচনায় যোগ দেবার প্রথা নেই-কিন্তু ওঁদের মন পড়ে আছে তিনতলায় ওই ঘরটিতে। ওঁরা দেখলেন, সূর্য ঘর থেকে বেরিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ওপরে উঠে গেল।

বড়বাবু বিছানার দিকে ইঙ্গিত করে সূর্যকে বললেন, বোস ওখানে।

সূর্য বসল না, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে-কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই তেরিয়া ভাবে বলল, আমি শ্রীলেখাকে বিয়ে করব।

প্রিয়রঞ্জন গনগনে মুখে তাকালেন। বড়বাবুর মুখে হাসি ফিরে এল। জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ বিয়েপাগলা হয়ে গেলি কেন?

সূর্য তার সরল জেদিমুখে বলল, অন্য কারওর সঙ্গে শ্রীলেখার বিয়ে হবে না। ও-এ বাড়িতেই থাকবে।

শ্রীলেখা তোর বোন হয়-বোনের সঙ্গে কি বিয়ে হয়?

আপন বোন তো নয়।

হিন্দু সমাজে মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে হয় না।

আমি কি হিন্দু?

তুমি কী তা হলে?

আমি মানুষ।

মানুষ তো সবাই।

আমি শ্রীলেখাকে বিয়ে করব।

বিয়ে করলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। পারবি? বউকে খাওয়াবি কী?

আপনার কাছে আমার অনেক মোহর আছে। আপনি বললেন–

হুঁ! মোহর বিক্রি করে সংসার চালাবি? কত দিন চলবে? রোজগার করতে হবে না?

আমি পড়াশুনো করছি।

ঠিক আছে, যদি এতই বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠিস–আমি তা হলে মেয়ে দেখছি। এ-দেশে পাত্রীর অভাব নেই।

আমি শ্রীলেখাকে বিয়ে করব।

প্রিয়রঞ্জন আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। এক ধমক দিয়ে বললেন, বাঁদর ছেলে, ওকথা খবরদার আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। নির্লজ্জ কোথাকার!

সূর্য কিছু বলার আগেই বড়বাবু বললেন, বিয়ে করতে হলে, পাত্রীর মা বাবার মত লাগে। ওঁরা এ-বিয়েতে রাজি নয়।

তা হলে শ্রীলেখার অন্য কারওর সঙ্গেও বিয়ে হবে না।

প্রিয়রঞ্জন আর একটাও কথা বললেন না। ঘৃণায় মুখভঙ্গি করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বড়বাবু তাকে আটকাবার চেষ্টা করেও পারলেন না।

দশ দিনের মধ্যে প্রিয়রঞ্জন তালতলায় একটা বাড়ি কিনে উঠে গেলেন। বস্তুত, বাড়ি কেনার ব্যবস্থা গোপনে গোপনে আগেই চলছিল–ইদানীং তার কাগজের ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠেছে। এ-বাড়ি ছেড়ে যাবার ঘটনাও খুব নিঝঞ্ঝাটে ঘটল নাযাবার আগে প্রিয়রঞ্জন বড়বাবুর সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধিয়ে তুললেন–অনর্থক বহু কটুকাটব্য করতে ছাড়লেন না। বড়বাবু প্রাণপণে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন–চাচামেচি করার বদলে প্রায় ধরা গলায় বলেছিলেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমার আর কেউ নেই। ত্রিসংসারে আমার আর কেউ নেই! প্রিয়রঞ্জন উষ্ণ মস্তিষ্কে এই অনুভূতিটা ঠিক ধরতে পারলেন না কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বললেন, তুমি কি আমাদের অন্ন দিয়ে কিনে রেখেছ? ভগবান আমায় সুদিন দিয়েছেন–আমার কারবারে তোমার যা টাকাপয়সা আছে সব তুমি ফেরত পাবে। তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না।

সমস্যা হল চিররঞ্জনকে নিয়ে। চিররঞ্জন এবং তার পরিবার কোথায় থাকবেন? প্রিয়রঞ্জন চাইলেন ওঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। তাঁর সহোদর ভাই তার সঙ্গে থাকবেন না তো কোথায় থাকবেন! কিন্তু বড়বাবুদের সঙ্গে চিররঞ্জনের অন্য রকম সম্পর্ক। তিনি চিররঞ্জনকে কিছুতেই ছাড়বেন না। এই দোটানার মধ্যে চিররঞ্জন মহা ফঁপরে পড়ে গেলেন। তিনি আলগোছে জীবন কাটাতে চান-এসব গণ্ডগোল তার সহ্য হয় না। সমস্যার সমাধান তার মাথায় আসে না। বড়বাবুর সঙ্গে তার কোনও অসদ্ভাবের কারণ। ঘটেনি-কিন্তু প্রিয়রঞ্জন বড়বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে ফেলায়-চিররঞ্জনের পক্ষে আরও কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এখন বড়বাবুর সঙ্গে থাকা মানে তার দাদার বিরোধিতা করা-এবং তার দাদা এতে অপমানিত বোধ করবেন।

চিররঞ্জন তখন অসুস্থ। জ্বর এখন নিউমোনিয়ার দিকে গেছে। এই সময় বাড়ি বদলাবার হাঙ্গামার প্রশ্নই ওঠে না-তাই তিনি আপাতত এ বাড়িতেই থেকে গেলেন।

প্রিয়রঞ্জন তালতলায় বেশ বড় বাড়ি কিনেছেন। বাড়ির সামনে খানিকটা জমি আগাছায় পূর্ণ-এবং লোহার গেট। গেটে উর্দি-পরা দারোয়ান।

সূর্যর দুর্দমনীয় তেজি ভাবটা আর নেই। হঠাৎ সে খুব বিষণ্ণ হয়ে গেছে। শ্রীলেখাকে হারিয়ে সে যেন অনেকখানি মহিমাচ্যুত-তার চোখের মধ্যেও একটা দিশেহারা ভাব ফুটে ওঠে। একটা তীব্র অভিমান তার বুকের মধ্যে বাষ্প হয়ে জমে। সারা পৃথিবীর ওপর অভিমান।

গোঁয়ারের মতন সে তালতলার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেনি। তার কিশোর হৃদয় বুঝেছে-ও বাড়িতে ঢুকলে অপমানিত হতে হবে। এতদিন ছিল না, এখন তার মান-অপমান বোধ জেগেছে-প্রণয়লিপ্সা তার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতিরও জন্ম। দিয়েছে।

কলেজ পালিয়ে দুপুরবেলা এসে সূর্য তালতলার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। একদিনও, একবার এক পলকের জন্যও শ্রীলেখার সঙ্গে দেখা হয় না।

২৫. একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী

একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বসবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, জামাইবাবু, চিনতে পারছেন?

বড়বাবু অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন।

চিনতে পারলেন না?

না তো!

সেই ফুলবাড়িতে আমাকে দেখেছিলেন।

বড়বাবুর তবু মনে পড়ল না। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। সন্ন্যাসীটি বেশ লম্বা, মধ্যবয়স্ক, অসম্ভব সুপুরুষ। গাওয়া ঘিয়ের মতন গায়ের রং, টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ–অক্ষিপল্লবগুলি বড় বড়। ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে চুল, দাড়ি বুক পর্যন্ত–এখনও পাক ধরেনি। তিনি হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন বড়বাবুর দিকে।

পূর্ণিমা আমার দিদি ছিল।

বড়বাবু চমকে উঠলেন। প্রবল উৎসাহে বললেন, ও নিখিল! সেই কত দিন আগে তোমাকে দেখেছিলাম! চিনব কী করে বলো! যে রকম ভোল পালটেছ–

সন্ন্যাসী এবার চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, আপনাকে কিন্তু চেনা যায়। চেহারা বিশেষ পালটায়নি।

আমি তো আর ভেক ধরিনি তোমার মতন। শুনেছিলাম বটে তুমি কোন আশ্রমে আছ। হঠাৎ সংসারীদের কাছে এলে যে!

আশ্রম থেকে একটি কাজে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছে।

কোথায় যেন আশ্রম তোমার?

আসামে। গৌহাটির নিকটবর্তী।

কলকাতায় এসে কোথায় উঠেছ? এখানেই এসে থাকো-অনেক জায়গা আছে।

উঠোনের কল খুলে আমি তখন জল ছিটোবার খেলা খেলছিলাম। বড়বাবু ডেকে বললেন, এই বাদলা, এদিকে আয়। এঁকে প্রণাম কর। তোর কাকা হন।

আমি গিয়ে ঝুপ করে প্রণাম করলাম। সন্ন্যাসী আমার মাথায় আশীর্বাদের হাত ছুঁইয়ে বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ইটি কে?

চিরুর ছেলে, তোমার মেজদার ছেলে।

আমি এর জন্মের কথাই শুনিনি।

তা আর কী করে শুনবে। তুমি তো আমাদের কোনও খোঁজখবর রাখে না।

বছর দশেক আগে বড়দা একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাতেই এ বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলাম। দিদি তো মারা গেছেন, তাই না?

বহুকাল আগে।

আমি সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু উনি ধরে রেখেছিলেন আমাকে। আমায় গায় হাত বুলোচ্ছিলেন। ইনি আমার সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ, যদিও আমার আপন কাকা। পারিবারিক সূত্রে জেনেছিবহু দিন আগে কোনও একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজের জন্য জ্যাঠামশাই এঁকে খুব মেরেছিলেন, সেই অভিমানে ইনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং কোনও একটা আশ্রমে ঢুকে পড়েন। এঁর নাম নিখিলরঞ্জন।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

বাদলরঞ্জন মুখার্জি।

মুখার্জি নয়, মুখোপাধ্যায় বলতে হয়। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

বড়বাবু বললেন, চলো, নিখিল, ওপরে চলো।

বড়দা আছেন বাড়িতে?

প্রিয়রঞ্জন এখন এখানে থাকে না। সে তালতলায় বাড়ি করেছে। ঠিকানা দেব অখন-বিকেলে যেয়ো।

বাবা সদ্য অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। এখনও শরীর দুর্বল, ঘর থেকে বেশি বেরোন না। বাবা কিন্তু নিখিলকাকাকে দেখেই চিনতে পারলেন। একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই এসেছিস? কত দিন তোকে দেখিনি!

দুর্বল শরীর বলেই বোধহয় বাবার চোখে জল এসে গেল। কিংবা তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন।

কাকা মা-কে প্রণাম করে বললেন, বউদি, আপনি অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

আমার দিদি সান্ত্বনাকে বললেন, তোকে বোধহয় আমি দেখেছিলাম, নারে! এইটুকুনি!

বড়বাবু বললেন, আমার চোখে কিন্তু নিখিলের সেই চেহারাটা এখনও ভাসছে। রোগা। পাতলা একটা ছেলে-খুব শান্ত আর লাজুক।

আমাদের চোখে যিনি একজন সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী, বাবা আর বড়বাবু তাকেই দেখেছেন রোগা পাতলা সাধারণ একটি যুবক হিসেবে মাঝখানে সময়ের ব্যবধানে যে অভাবনীয় পরিবর্তন-সেটা তাঁরা ঠিক মেলাতে পারছেন না। অনেকক্ষণ বসে বসে পুরনো কালের

গল্প হল-সেই ফুলবাড়ি, বরিশাল-সেখানকার মানুষজন, পূর্ণিমা পিসিমার বাল্যকাল-আমরা হাঁ করে শুনতে লাগলাম।

নিখিলরঞ্জন এ বাড়িতে কয়েক দিন থেকে গেলেন, তারপর গিয়ে উঠলেন তালতলায় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। এই ক'দিনে বাড়ির ছোটদের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল। নতুন রকমের মানুষ দেখলেই আমার খুব কৌতূহল হয়। এত কাছাকাছি আমি কোনও সন্ন্যাসীকে আগে দেখিনি। আমার কেন যেন ধারণা ছিল সন্ন্যাসীরা বড় গম্ভীর আর রুক্ষ স্বভাবের হয়। আর কথায় কথায় অভিশাপ দেয়। কিন্তু আমাদের এই কাকা আমাদেরই মতন সাধারণ মানুষ-বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন। আমরা তার নাম দিলাম সাধুকাকা।

সূর্যদা গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে, প্রথম প্রথম আমার এই কাকাকে বিশেষ পাত্তা দিতে চায়নি। কিন্তু কাকাই জোর করে ভাব জমিয়ে নিলেন তার সঙ্গে। সূর্যদাকে দেখে প্রথমটায় তিনি যেন একটু অবাক হয়েছিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি ছবি আঁকতে জানো?

সূর্যদা বলেছিল, না।

মূর্তিটুর্তিও বানাও না?

না তো!

কেন জানি না, তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি একজন শিল্পী। তোমার মধ্যে একটা কিছু সম্ভাবনা আছে-তুমি ঠিক সাধারণ মানুষ হবে না।

আমি সোৎসাহে জানালাম, সূর্যদা পড়াশুনোয় দারুণ ভালো। প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়!

সূর্যদা আমাকে এক ধমক দিয়ে বলল, এই বাদল, কেন মিথ্যে কথা বলছিস! জানেন, এইটুকু ছেলে, কিন্তু বড্ড মিথ্যে কথা বলে আজকাল।

সাধুকাকা আমার দিকে ফিরে বললেন, তাই বুঝি?

আমি চুপ করে রইলুম। সূর্যদা বলল, আজকাল ও কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। কদিন আগে ও নাকি রাস্তায় একটা গাধা দেখেছে, তার দুটো শিং আছে। এ রকম কখনও হয়?

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কেন, সেদিন তুমি একটা গোরু দেখলেনা, যেটার পাঁচটা পা? গোরুটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে একটা লোক পয়সা নিচ্ছিল। গোরুর পাঁচ পা হয়?

সাধুবাবা হাসতে হাসতে বললেন, আমি আসামে থাকি জানো তো-সেখানে অনেক জন্তুজানোয়ার আছে? হাতি, গন্ডার এসব তো প্রায়ই দেখা যায়। একদিন আমরা একটা কচ্ছপ দেখলাম-সেটার ঠোঁট ঠিক বকের মতন। নদীর ধারে লম্বা ঠোঁট দিয়ে ধরে ধরে মাছ খাচ্ছিল। আমরা সেটার নাম দিয়েছি বকচ্ছপ!

আমি বুঝতে পারলুম, এটা ডাহা মিথ্যে গল্প। আমি ততদিনে সুকুমার রায় পড়ে ফেলেছি-আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়। সাধুরাও তা হলে মিথ্যে কথা বলে।

আর একদিন সাধুকাকা সূর্যদাকে বললেন, তোমাকে দেখে রোজই আমার কী যেন মনে পড়বে মনে পড়বে ভাব হচ্ছিল-আজ সেটা মনে পড়েছে। তোমার সঙ্গে একজনের চেহারার খুব মিল আছে।

আমি বলে উঠলাম, আমি বলব? চার্লস লিন্ডবার্গ!

সাধুকাকা অবাক হয়ে বললেন, তিনি কে?

লিন্ডবার্গ এর কিছুকাল আগে একলা এরোপ্লেন চালিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে একটা কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। যেমন রূপবান তিনি, তেমনই সাহসী। মৌচাক পত্রিকায় আমি এঁর সম্পর্কে পড়েছি-উনিই তখন আমার হিরো। আমিও একদিন এরোপ্লেন চালিয়ে সমুদ্র পার হব-বিষ্ণুর সঙ্গে সব ঠিক হয়ে আছে।

সাধুকাকা শুনে বললেন, না, উনি নন। ওনার ছবিও আমি দেখিনি। সূর্যর চেহারা আর হাবভাবের সঙ্গে মিল আছে আমার এক ভাইয়ের। তার নাম বিশ্বরঞ্জন।

তিনি এখন কোথায়?

তার যখন সূর্যর মতনই বয়স, কিংবা আর একটু বড়-তখন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আপনার মতন?

আমি তো নিরুদ্দেশ হইনি। আমি তো আশ্রমে থাকি-তোমার বাবা-জ্যাঠামশাই সবাই জানেন। কিন্তু আমাদের সেই ভাই রঞ্জু কোথায় আছে কেউ জানে না। ও একটা সাহেবকে মেরেছিল।

শেষ কথাটা শুনে সূর্যদা খরচোখে তাকাল। তারপর বলল, তার কথা তো কখনও শুনিনি।

আমিও ভালো করে জানি না আমার এই কনিষ্ঠ কাকার কথা। বললাম, সাধুকাকা তার গল্প বলো। কী করে সাহেবকে মারল?

সাধুকাকা সূর্যদার প্রসঙ্গ নিয়ে বড়বাবুর সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। বড়বাবুকে বলেছিলেন, জামাইবাবু, আপনার রঞ্জুকে মনে আছে?

খুব মনে আছে। ও যখন মারা যায় তখন আমি গোয়ালিয়রে।

ও তো মারা যায়নি। ও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

বলো কী? তুমি জানো? তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

না, তা নেই। কিন্তু আমি জানি, সে মরেনি।

এত বছর কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারে?

দেশ থেকে এখনও তো ইংরেজ রাজত্ব যায়নি!

তা বটে। যদি বেঁচে থাকে, খুব আনন্দের কথা। বড় তেজি ছেলে ছিল। ও রকম ছেলে বেশি দিন আত্মগোপন করে থাকতে পারে না।

আপনার ছেলে সূর্যর সঙ্গে কিন্তু রঞ্জুর দারুণ মিল আছে। শুধু চেহারায় না, চরিত্রেও।

হুঁ। একথা আগেও কে যেন বলেছিল আমাকে। অবশ্য সেটা ঠিক চোখে পড়ে না।

যেন মনে হয় সেই রঞ্জুই এ-পরিবারে আবার ফিরে এসেছে।

সে কথা তুমি বলতে পারো না। ও তো তোমাদের পরিবারের কেউ না। আমি তোমাদের পরিবারের বাইরের লোক–আর ও তোমার দিদিরও ছেলে নয়।

তবে কার ছেলে?

আমি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছিলাম। অবশ্য গন্ধর্ব মতে। তোমার দিদির কোলে শুধু একটি মেয়ে এসেছিল–সে বেশি দিন বাঁচেনি। তোমার দিদিই একে মানুষ করেছে ওর মা আত্মহত্যা করেছিল। যাক, সে কথা তোমার শোনার দরকার নেই।

ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ রাখবেন। ও ঠিক সাধারণ ছেলেদের মতন হবে না।

আমার ছেলেটা একটু পাগলাটে ধরনের হয়েছে। ওর নিজের ভালো-মন্দ ওকেই বুঝতে হবে। আমি আর কদিন!

আপনি কি এর মধ্যে মৃত্যুচিন্তা করছেন নাকি?

বয়স তো হল। যাকগে, তোমার নিজের কথা বলো! তুমি শান্তি পেয়েছ?

হ্যাঁ পেয়েছি।

আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য! এ রকম মানুষ খুবই কম দেখেছি যে এককথায় বলতে পারে যে শান্তি পেয়েছে। সত্যিই পেয়েছ তা হলে?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

কী করে পেলে? আমিও কিছুদিন সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরেছি। আমি শান্তি পাইনি। তুমি কী করে পেলে? ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছ?

না। তেমন ভাবে ঈশ্বরের দর্শন পাবার কখনও চেষ্টাও করিনি। আমি যাঁর আশ্রমে আছি-সেই যতীন মহারাজ-তিনিও জপতপ সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহী নন। একটা ইস্কুল, একটা ছোট হাসপাতাল চালাই-সবজি বাগান করি। আসামে যেখানে আছি- তার আশেপাশে মানুষ বড় গরিব হিন্দু, মুসলমান, পার্বত্যজাতি-এদের মধ্যে যেমন অশিক্ষা, তেমনই দারিদ্র। খ্রিস্টান মিশনারিরা কিছু কিছু কাজ করে-আমরাও সাধ্যমতন কিছু করার চেষ্টা করি। এই কাজের মধ্যেই শান্তি আছে।

তোমরা কি খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওই সব গরিব লোকদের সাহায্যের নাম করে ধর্মান্তরিত করো নাকি?

আজ্ঞে না। যার যা ধর্ম আছে থাক। আমরা শুধু সেবা করার চেষ্টা করি। ঈশ্বর দর্শনের চেয়ে এতে আনন্দ কম নয়।

কিন্তু দারিদ্র্য তো সব জায়গায়। এই বাংলাদেশে দারিদ্র্য নেই? আমি বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছি-মধ্যপ্রদেশ আর উড়িষ্যার কোনও কোনও অঞ্চলের মতন এত ভয়ংকর দারিদ্র্য আর কোথাও দেখিনি। কত জনকে তুমি সেবা করতে পারবে? বেছে বেছে শুধু আসামেই কেন?

যার নিয়তি যাকে যেখানে নিযুক্ত করে।

তুমি নিয়তি মানো দেখছি। আচ্ছা নিখিল, আমাকে তুমি একটা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারো? আমার এতটা বয়স হল, এখনও আমার ধর্মেকর্মে রুচি হল না। কীসে শান্তি পাই বলতে পারো? সারাটা জীবন শুধু এর পেছনে ওর পেছনে দৌড়োদৌড়ি করেই মরলাম, কিছুই পেলাম না। আমার মতন মানুষ কীসে শান্তি পাবে?

জামাইবাবু, আপনাকে পথ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই।

তুমি ধর্ম মানে?

মানি। কিন্তু গীতায় যে ধর্ম সংস্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, সেটা বিশেষ কোনও ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম। আমি সেই ধর্ম মানি।

তা হলে তুমি ঈশ্বর মানো?

ঈশ্বর ছাড়া এই সৃষ্টি কার?

তার অনেক উত্তর আছে। সে কথা নয়। গীতা ফিতাও বাদ দাও। সাধারণ মানুষ যে ঈশ্বরকে খোঁজে-সে তো কোনওনা-কোনও ধর্মকে অবলম্বন করেই খোঁজে। সব ধর্মেই তো ঈশ্বরের চেহারা আলাদা। এমনকী ঈশ্বরের চেহারা না-থাকাও একটা ধর্মবিশ্বাস।

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'-আমি এইটাই ভালো বুঝি!

পরোপকার? হু, পরোপকারের মধ্যে খানিকটা অহংকারের তৃপ্তি হয় বটে। সেটাতে ভালোই লাগে। কিন্তু একথাও তো ঠিক-পরোপকারের মধ্যে খানিকটা ক্লান্তিও আছে। যে ডাক্তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে-সে বেশ ভালোই লোক। কিন্তু প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ জন রুগিকে চিকিৎসা করতে হলে তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় না?

আপনি যদি আমাদের যতীন মহারাজকে দেখতেন–

তিনি হয়তো মহাপুরুষ, তার কথা আলাদা। আমি বলছি, সাধারণ মানুষের কথা। তোমাকে আর একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না।

বলুন না।

তুমি তো এখন আর শুধু আমার ছোট শ্যালকটি নও, তুমি একজন সন্ন্যাসী। তোমাকে কি সব কথা বলা যায়?

সন্ন্যাসীর কাছেই বরং সব কথা বলা যায়।

আশ্রমবাসী হয়ে তুমি কি কোনও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছ?

তার মানে?

অর্থাৎ বিশেষ কোনও শক্তি তোমার হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের নেই? যেমন কোনও মানুষের মুখ দেখলেই তার মৃত্যু কবে হবে সে কথা বলে দেওয়া কিংবা দুরারোগ্য রোগ সারিয়ে দেওয়া-অনেক সন্ন্যাসীর তো সে রকম থাকে শুনেছি।

না, আমার সে রকম কোনও শক্তি নেই।

তা হলে তুমি কামনা বাসনা দমন করলে কী করে? সাধারণ মানুষ তো পারে না! তোমার বয়স এখনও বেশি না, চেহারা সুন্দর-তোমার নারীসঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে না? আমি বুড়ো হয়েছি, তবু সত্যি কথা বলতে গেলে কী-সে রকম কোনও সুন্দরী নারী। দেখলে আমার মন আনচান করে-আর তোমাদের করে না? এর রহস্যটা কী?

আমরা মনটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখি। ওসব কথা চিন্তা করারই সময় পাই না।

মন কি তোমার হুকুম মতন চলে? নাকি এখনও মাঝে মাঝে মন উতলা হয়- তোমরা কৃত্রিম ভাবে চেপে রাখো। সেটা কি স্বাভাবিক? সন্ন্যাসীরা প্রেম করে না? এলোইস আর

আবেলার সেই বিখ্যাত কাহিনীর কথা শোনোনি? নাকি তোমরা মেয়েদের দেখলেই চোখ ঢেকে রাখো?

আপনি এ ব্যাপারটা সম্পর্কে এত বেশি কৌতূহলী কেন?

তোমাকে দেখার পরই মনে হচ্ছে। কিছু মনে এলে আমি বলে না ফেলে পারি না। অবশ্য তোমাকে বলতেই ইতস্তত করছিলাম। আমি যতদূর জানি, বরিশালের এক। অধ্যাপকের স্ত্রী তোমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় তোমরা ধরা পড়ে। যাও! আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করে কী করে তোমার মনে এই পরিবর্তন এল–

নিখিলরঞ্জনের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। দুটি হাত তুলে বুকের কাছে রাখলেন। দৃষ্টি। নিবদ্ধ হল মাটিতে। তারপরই নিজেকে সামলে নিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত গলায় বললেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্বাশ্রমের কথা আলোচনা করতে নেই। নইলে আপনাকে এ কথার উত্তর দিতাম।

নিখিলরঞ্জনের মুখের চেহারা দেখে বড়বাবু অনুতপ্ত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে ওঁর হাত ধরে বললেন, আমাকে মাপ করো। আমি তোমার মনে আঘাত দিতে। চাইনি। আমার ঔৎসুক্য বড় বেশি–তাই মাঝে মাঝে অবান্তর কথা বলে ফেলি–।

.

সাধুকাকাকে তালতলার বাড়িতে আমিই নিয়ে গেলাম। এর আগে এ বাড়িতে আমি দু'বার এসেছি–মায়ের সঙ্গে। এ বাড়িতে এখনও একটা এলোমেলো অবস্থাযত বড়। বাড়ি সেই তুলনায় আসবাবপত্র বেশি নেই। বড় বড় ঘর খালি পড়ে আছে। বাড়িটা অত্যধিক ফাঁকা ফাঁকা লাগবে বলে জ্যাঠামশাই তার দোকানের এক কর্মচারীকে সপরিবারে স্থান দিয়েছেন নীচের তলায়।

ছাদটা প্রকাণ্ড। এখানে এসেই আমি ছাদে উঠে যাই। কত দূর দেখা যায়। বাড়িটার খুব কাছেই একটা গির্জা কী অদ্ভুত শান্ত শব্দে সেখানে ঘণ্টা বাজে।

ছাদে একা দাঁড়িয়ে আমি আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখছিলাম–এমন সময় বৃষ্টি নামল। আমি তখনও নীচে নেমে না-গিয়ে দেওয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ঝক পায়রা ডানা ঝটপটিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে ঢুকে গেল গির্জার মধ্যে। কাকগুলো ডাকাডাকি করতে লাগল। বৃষ্টির ঝাঁপটায় একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসে।

বড়দি ছাদে উঠে এসে বলল, এই, তোকে নীচ থেকে এত ডাকাডাকি করছে, তোর। কানে যাচ্ছে না?

শুনতে পাইনি তো!

কানের মাথা খেয়েছিস? দেখি কী হয়েছে কানে।

বড়দি কাছে এসে আদর করে আমার বাঁ কানটা ধরে টানতে লাগল। আমিও কুটুস করে বড়দির পিঠে একটা চিমটি কেটে দিলাম।

বড়দি একটু রোগা হয়ে গেছে। ইস্কুলে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। একদিন ইস্কুল যাবার পথে বড়দির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে লজেঞ্চস কিনতাম। এখন আর তা হয় না। আমি আর বড়দি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। একটু বাদে বড়দি জিজ্ঞেস করল, হারে, সূর্যদা কেমন আছে রে?

ভালো। বেশ ভালো আছে।

আবার অন্য কোথাও যায়নি তো? বাড়িতেই আছে?

হ্যাঁ।

আমার কথাটথা কিছু বলে?

না তো!

বলে না?

একদম না। সূর্যদা তোমাকে একদম ভুলে গেছে।

বড়দির মুখখানা একটু লাল হয়ে গেল। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, ও তো এমনিই গম্ভীর, কারওর সঙ্গে কথা বলে না। আজ তুই এ বাড়িতে আসবার সময় তোকে কিছু বলেনি?

কিছু না।

শোন, সূর্যদাকে বলবি, আমাকে ভুলে যেতে।

বাঃ, এ আবার বলার কী আছে? এমনিতেই তো তোমাকে ভুলে গেছে। একদম ভুলে গেছে, সত্যি!

বড়দি হঠাৎ রেগে গেল। আমাকে একটা চাপড় মারার চেষ্টা করে বললে, তুই সব জানিস, না? পাকা ছেলে!

২৬. যদু পণ্ডিতের পাঠশালা

যদু পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে আমি ভরতি হয়েছিলাম স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুলে বিষ্ণু আমার সহপাঠী। আমাদের আর একজন বন্ধু ছিল মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু ক্লাস পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার আগেই ও দুম করে মরে গেল। ওর কালাজ্বর হয়েছিল। আর একজন, অপূর্ব গুঁই, প্রত্যেক দিন জোর করে আমাদের পাশে বসে-কিন্তু ওকে আমরা পছন্দ করি না। অপূর্ব খুব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলে। ও আমাকে একদিন ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল, ওকে আমরা একদিন খুব মারব ঠিক করেছি।'

বিষ্ণু আর আমি একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলাম। আমরা অন্যদের সঙ্গে বেশি মিশি না, সব সময় একসঙ্গে থাকি, আমাদের গল্প কখনও ফুরোয় না। প্রত্যেক দিন টিফিনের সময় বিষ্ণুর বাড়ি থেকে চাকর খাবার নিয়ে আসে, আমরা দু'জনে ভাগ করে খাই। বিষ্ণুর মা দুজনের জন্যই খাবার পাঠান। আমি মার কাছ থেকে প্রতিদিন দু'পয়সা করে টিফিন পাই। তাই দিয়ে বিষ্ণু আর আমি আধপয়সা করে আলুকাবলি কিনি আর এক পয়সার লটারি। লটারির প্যাকেটে বেশ ঝাল ঝাল চাটনি থাকে- এ ছাড়া পেতলের আংটি কিংবা জলছবি। বিষ্ণুর এইসব খাওয়া একদম বারণ-কিন্তু বাড়ির কেউ তো জানতে পারছে না!

ইস্কুলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার এত প্রিয় ছিল যে ইস্কুল ছুটি থাকলে মনখারাপ লাগত। ইস্কুল মানেই কত রকম আনন্দ, কত গল্প। র‍্যাপিড রিডিং ক্লাসে উকিল মাস্টারমশাই আমাদের অনেক রকম গল্প শোনাতেন। ওঁর পুরো নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ উকিল-আমরা ওঁকে উকিল স্যার বলে বেশ মজা পেতাম। মানুষটি খুব রোগা, মুখোনি বিষণ্ণ, অথচ কত রকম বই পড়েছেন। ইউলিসিস-এর গল্প শুনতে শুনতে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম।

প্রায়ই সেই সময় ইস্কুলে খুব স্ট্রাইক হতে লাগল। স্ট্রাইকের কারণগুলো ঠিক বুঝতাম না। এক এক দিন স্কুলে গিয়ে দেখতাম, আগে থেকেই কয়েকটি অচেনা বড় বড় ছেলে ইস্কুলের গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে। একজন কী যেন সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে। আমি আর বিষ্ণু রাস্তায় ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ে গেলেও কেউ ভেতরে না ঢুকলে বুঝতাম সে-দিনকার মতন ছুটি। তখন বাড়ি ফেরা।

স্ট্রাইক আমাদের পছন্দ হত না। এক একটা দিন স্কুল নষ্ট হলে আপশোস হত, ডাইনির দ্বীপে ইউলিসিস কী করে প্রাণে বাঁচল সেটা সে-দিন শোনা হল না!

একদিন দেখলাম, অন্যান্য কয়েকটি ছেলের সঙ্গে সূর্যদা এসেছে আমাদের স্কুলে ধর্মঘট করাতে। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে হাত উঁচু করে সূর্যদা কী যেন বলছে। সে-দিন বিষ্ণু আর

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। যুদ্ধ উপলক্ষে দেশের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ধর্মঘট।

সূর্যদা আমাদের দেখে বলল, এই বাদল, বাড়ি যাবি না। মিছিলে যেতে হবে।

মিছিলে যাওয়ার কথা শুনে আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করলেও বিষ্ণু রাজি হল না। তার বাড়িতে ভীষণ কড়াকড়ি। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাড়ি না-ফেরা তার পক্ষে অত্যন্ত অপরাধ। বাড়িতে গিয়ে বিষ্ণু বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাও বলতে পারবে না। ও পারে না।

বিষ্ণু মিছিলের পাশে পাশে হাতিবাগান পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি চলে গেল। আমি রয়ে গেলাম সূর্যদার সঙ্গে। সূর্যদা মিছিল পরিচালনা করছে, ও প্রথম বলছে বন্দে মাতরম্–তারপর আমরা সবাই গলা মেলাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য টাউন স্কুল, সরস্বতী স্কুল আর শ্যামবাজার এ ভি-তে স্ট্রাইক করানো।

টাউন স্কুলে বিশেষ কোনও অসুবিধে হল না, সেখানকার ছেলেরা আগে থেকেই ভিড় করে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, ওখানেও সূর্যদার মতন একজন বক্তৃতা দিচ্ছিল। সেখান থেকে দল ভারী করে সরস্বতী স্কুলে এলাম–এখানে স্কুল শুরু হয়ে গিয়েছিল–আমরা বাইরে থেকে চেঁচামেচি করতেই ছাত্ররা বেরিয়ে এল হুড়হুড় করে। শ্যামবাজার এ ভি-তে গিয়েই গোলমাল। এখানেও স্কুল শুরু হয়ে গেছে এবং বাইরে দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে। দিশি সেপাই, সুতরাং তাদের গ্রাহ্য না করে সূর্যদা চেঁচিয়ে উঠল, ছাত্রবন্ধুগণ, বেরিয়ে এসো! ব্রিটিশরাজ নিপাত যাক। ইনকিলাব। আমরা প্রবল ভাবে হইহই করতে লাগলাম।

কিন্তু হঠাৎ আর এক গাড়ি পুলিশ এসে গেল। তার মধ্যে তিন-চার জন লালমুখো। এসে তারা একটুও সময় দিল না, লাঠি চার্জ শুরু করল। চার-পাঁচজন ছেলে লাঠির বাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল রাস্তায়। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। সেই সময় কী করতে হয় কিছুই জানি না। পেছন ফিরে দৌড়োতে শুরু করেছি, একটা সবল হাত আমাকে ধরল। তাকিয়ে দেখি সূর্যদা। সূর্যদা বলল, এই দিকে আয়।

বড়রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা সরু গলির মুখে সূর্যদা আমাকে দাঁড় করাল। তীব্র গলায় বলল, এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। যদি দেখিস পুলিশ এ-দিকে আসছে তা হলে এই গলির মধ্যে যে-কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়বি। ভয় পাবি না।

ওদিকে স্কুলের সামনে কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে। লাঠি খেয়ে একদল ছেলে দৌড়ে পালাচ্ছে। মিছিলের শেষ দিকের ছেলেরা ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে এগিয়ে আসছে, ওই স্কুলের ছেলেরা ক্লাস ভেঙে জানলায় দাঁড়িয়ে চাচাচ্ছে, ঝনঝন করে শব্দ হচ্ছে লোহার গেটে।

সূর্যদা বড় একটা ইটের টুকরো তুলে নিয়ে হুংকার দিল, ব্রিটিশ রাজত্ব নিপাত যাক। তারপর সেটা ছুঁড়ে মারল একজন সার্জেন্টের দিকে।

আমার মনে পড়ল একটা দৃশ্য। কয়েক বছর আগে হাতিবাগানের মোড়ে একজন গোরা সার্জেন্ট সূর্যদাকে মেরেছিলসূর্যদা সেদিন আহত হবার চেয়েও অবাক হয়েছিল বেশি। ইংরেজিতে কী সব বলেছিল বিড়বিড় করে। সেই সূর্যদা কত বদলে গেছে।

দেখতে দেখতে ইট ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেল প্রবল ভাবে। রাস্তায় অনেক লোকও যোগ দিল সেই রণে। সূর্যদার ও রকম উগ্র মূর্তি আমি আগে কখনও দেখিনি। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে এক একবার ইট হাতে নিয়ে পুলিশের অনেক কাছে চলে যাচ্ছে- মেরেই আবার দৌড়ে ফিরে আসছে এঁকেবেঁকে। সূর্যদাকে দেখেই আরও অনেকে উদ্দীপনা পেয়ে গেল। সূর্যদার দলের লোকদের পরিকল্পনা মতন এ সময় থেকেই যে ইচ্ছে করে পুলিশের সঙ্গে গণ্ডগোল পাকিয়ে আগস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে- আমি তখন তা বুঝিনি।

খানিকটা বাদে ফটফট শব্দ ও ধোঁয়া, আমার চোখ জ্বলতে লাগল। আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ির দরজা খুলে আমাকে বললেন, এই ছেলেটা, দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? ভেতরে আয়!

আমি ইতস্তত করছিলাম, মহিলাটি নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন, বাড়িতে তোর মা বাবা নেই? এইটুকু ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে কী আক্কেলে?

এই সময় সূর্যদা এসে উপস্থিত হল ঝড়ের বেগে। মহিলার কাছ থেকে আমাকে একপ্রকার কেড়ে নিয়ে বলল, চল, দৌড়ো-।

সূর্যদার সঙ্গে কি আমি দৌড়ে পারি? হাঁপাতে হাঁপাতে কোনও রকমে পৌঁছোলাম কুমোরটুলির কাছে। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে এসে পৌঁছোলাম গঙ্গার ধারে। একটা অশথ গাছের তলায় এসে সূর্যদা বলল, এখানে চুপ করে বসে থাক।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ি যাবে না?

এখন না। এখন বিপদ আছে।

গঙ্গার ধারে আমরা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটালাম। গঙ্গার ধার আমার চেনা। জায়গা-মাকে নিয়ে অনেক বার এসেছি। কিন্তু এখন কোনও ভিড় নেই। এদিকে ও-দিকে দু-একটা অলস লোক শুয়ে আছে-স্নান করছে কয়েক জন। জলের ওপর মেঘের ছায়া। বিরাট বিস্ময়ের মতন দূরে দেখা যায় নতুন তৈরি হাওড়া ব্রিজ। কয়েকটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আমি জলে টুপটাপ করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম।

অনেক দিন বাদে সূর্যদার সঙ্গে এত ক্ষণ গল্প করা গেল। সূর্যদা আমাকে বোঝাতে লাগল, ব্রিটিশ শাসন কত খারাপ। যে-জাতি পরাধীন সে-জাতি ক্রীতদাসেরও অধম। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে ইংরেজ ভারতের ধনসম্পদ সেই যুদ্ধের জন্য খরচ করছে, ইত্যাদি অনেক কথা। সব আমি বুঝলাম না। কিন্তু শুনতে ভালো লাগছিল।

হঠাৎ আমি বোকার মতন বলে উঠলাম, সূর্যদা, বড়দি কী বলেছে জানো তো? বড়দি বলেছে তোমাকে ভুলে যেতে।

সূর্যদা ভুরু কুঁচকে বলল, কী?

আমি কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম। সূর্যদা শুনে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, জানিস তো শ্রীলেখাকে আমি বিয়ে করব। এখন আমি সময় পাচ্ছি না।

এমন নিশ্চিন্ত ভাবে সূর্যদা কথাটা বলল, যেন সবকিছুর ঠিকঠাক হয়ে আছে-ওর সময়াভাবটাই একমাত্র বাধা। আমি বললাম, কিন্তু বড়দির তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

সূর্যদা কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, তা হোকগে!

সামনের মাসে বড়দির বিয়ে।

ধুত! চল, ওঠ।

হাঁটতে হাঁটতে চিৎপুরে এসে সূর্যদা বলল, তুই এখান থেকে একা একা বাড়ি যেতে পারবি?

আমি ভয় পেয়ে বললাম, না। আমি রাস্তা চিনি না।

তোকে বাসে উঠিয়ে দেব, গিরিশ পার্কে নামবি।

আমি একা কখনও বাসে চাপিনি।

তা হলে চল আমার সঙ্গে। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে কিন্তু।

সূর্যদা, বিষ্ণুদের বাড়িতে যাবে? ওখানে বেশ ক্যারাম খেলা যেত।

আমার এখন অন্য কাজ আছে।

সূর্যদার সঙ্গে আমি শিয়ালদার কাছে এলাম। আমাকে নিয়ে সূর্যদা একটা মেসবাড়ির অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে

গেল। ভেতরে চার জন লোক। এক জনকে দেখে সূর্যদা বলল, ব্রজদা আজ এ ভি স্কুলের সামনে পুলিশ লাঠি আর টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটি কে?

সূর্যদা বলল, আমার ভাই হয়। ও আমার সঙ্গে ছিল।

ব্রজগোপাল বললেন, এইটুকু ছেলেকে নিয়ে না গেলেই পারতে।

সবাইকেই যেতে হবে।

ব্রজগোপাল চৌকির তলা থেকে একটা টিনের কৌটো বার করে ঢাকনা খুলে বললেন, খোকা, তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? খাও।

তাকিয়ে দেখলাম, কৌটোর মধ্যে মুড়ি আর বাতাসা। আমি এক মুঠো তুলে নিলাম। ঘরের অন্যান্যরাও এক মুঠো এক মুঠো নিয়ে মুহূর্তে কৌটোটা ফাঁক হয়ে গেল।

এই ঘটনাটা আমার মনের মধ্যে একটা ছাপ রেখে যায়। তখন ঠিক না বুঝলেও পরে জেনেছিলাম, ওই ঘরে যারা উপস্থিত তারা সবাই দেশ উদ্ধার করার জন্য গৃহের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে এসেছে। যে-কোনও সময় ওদের মৃত্যুও হতে পারে। তবু ওদের নেতা ব্রজগোপাল একটি ছোট ছেলেকে দেখে প্রথমেই কিছু খাবার খেতে দেবার কথা ভেবেছিলেন। সেই মুড়ি ও বাতাসার স্বাদ আমার জিভে লেগে আছে।

আমি খাটের ওপর চুপ করে বসে রইলাম। সূর্যদা ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। সে-দিন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে পাঁচ জায়গায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের গোলমাল হয়েছে। এতে সবাইকে বেশ উৎসাহিত দেখা গেল। বোঝা গেল, ছাত্ররা আপনা-আপনি স্ট্রাইক করেনি–এর পেছনে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

সেই মেস থেকে বেরিয়ে সূর্যদা বলল, এক্ষুনি বাড়ি ফিরবি, না আর কোথাও যাবি?

প্রশ্ন শুনেই আমি বুঝতে পারলাম সূর্যদা কী বলতে চায়। শিয়ালদা স্টেশন দেখেই বুঝেছি কাছেই তালতলা। উৎসাহিত হয়ে বললাম, সূর্যদা বড়দিদের বাড়ি যাবে?

সূর্যদা যেন আমাকে খুশি করার জন্যই বলল, চল তা হলে!

তালতলায় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির খুব কাছে এসে সূর্যদা মত বদলে ফেলল। থমকে দাঁড়িয়ে বলল, থাক, তুই যা। আমি আর যাব না!

আমি সূর্যদার মুখের দিকে তাকালাম। এ তো অন্য রকম মুখ। এই মুখে মিশে আছে খানিকটা ভয় ও অনেকখানি লজ্জা। এই দুটি ব্যাপার সূর্যদার চরিত্রে আগে কখনও দেখিনি। যে-মানুষ কিছুক্ষণ আগে অকুতোভয়ে পুলিশকে ইট মারছিল সে হঠাৎ ভয় পাবে কেন?

আমি বললাম, কেন, চলো না! কী হয়েছে!

সূর্যদা পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে উদাসীন ভাব দেখিয়ে বলল, নাঃ, আমার অন্য কাজ আছে। আজ যাব না।

আমি সূর্যদাকে ছাড়লাম না। হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলাম। সূর্যদা যেন এইটাই চাইছিল। যেন আমিই ওকে জোর করে ধরে নিয়ে এলাম এ বাড়িতে।

দুপুরে সব সময় গেট বন্ধ থাকে। পাশেই দারোয়ানের ঘর। জ্যাঠামশাই তার বাড়িতে ক্রমশই জাঁকজমক বাড়াচ্ছেন–তিনি নানা প্রকারে দেখাতে চান যে তিনি এখন বড়বাবুর চেয়েও অবস্থাপন্ন। আমরা এখন ইস্কুলে বালি কাগজে লিখি–কাগজের দাম সাংঘাতিক।

দুপুরবেলা বাড়িতে বিশেষ কেউই থাকে না। জ্যাঠামশাই তো থাকবেনই না। দারোয়ান আমাকে চেনে। গেট খুলে দিল। সিঁড়ির নীচের ঘরখানাতেই সাধুকাকা থাকেন। সাধুকাকা কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু বেশ কিছু দিন থেকে গেলেন।

সাধুকাকার ঘরের দরজা খোলাই ছিল, খাটের ওপর ঘুমোচ্ছেন। খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, দাড়িগোঁফ ঘামে ভিজে গেছে। এই ঘরখানাই সূর্যদার কাছে নিরাপদ মনে হল।

সন্ন্যাসীদের ঘুম কী ভীষণ পাতলা হয়। আমরা ঘরে ঢোকামাত্র সাধুকাকা চোখ মেলে তাকালেন। অথচ আমরা একটুও শব্দ করিনি। কাঁচা ঘুম ভাঙলে অনেকে রেগে যায়- সাধুকাকা হাসিমুখে উঠে বসে বললেন, কী খবর? সূর্যকুমারের কী খবর?

আমি সাধুকাকাকে প্রণাম করলাম, সূর্যদা জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সূর্যদা কারোকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে না। সাধুকাকা আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, জীব! জীব! তারপর সূর্যদার দিকে তাকিয়ে বললেন, সূর্যকুমার, এ-দিকে এসো তো!

সূর্যদা পায় পায় কাছে এগিয়ে এল, সাধুকাকা তার বাঁ করতল নিজের হাতে তুলে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী রাশি, তুমি জানো?

সূর্যদা ও-সব জানে না।

তোমার কোনও কোষ্ঠি নেই।

আছে কিনা শুনিনি।

তোমার জন্ম তারিখ কবে?

৭ই সেপ্টেম্বর।

তা হলে বাংলা কত তারিখ হল?

সাধুকাকা সূর্যদার হাত দেখতে লাগলেন। কিছুই বললেন না। হাত দেখা শেষ করে। ভারী মায়ার সঙ্গে সূর্যদার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাধুকাকা, সূর্যদার হাতে কী দেখলেন? সাধুকাকা বললেন, আমি ভালো হাত দেখতে জানি না। মনে হল সবই তো ভালো। ওপরে গিয়েছিলে?

না। এখনও যাইনি।

সাধুকাকার বিছানায় তোষক বা চাদর নেই, শুধু একটা কম্বল পাতা। আমরা তার ওপরে বসলাম। এই কুটকুটে কম্বলের ওপর শুয়ে উনি ঘুমোন কী করে?

সাধুকাকা বললেন, চোখ মেলে যখন সূর্যকে দেখলাম, হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি আমার ছোটভাইকে স্বপ্ন দেখছিলাম, ঘুম ভেঙে মনে হল সে-ই যেন দাঁড়িয়েছে। সূর্য, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

কেন?

এই বয়সে তোমার একটা ফাড়াআছে।

সূর্যদা আর কিছু না বলে একটু হাসল। কে জানে সূর্যদা ফাড়াকথাটার মানে বুঝল কিনা। আমি বুঝেছি। আর দু'বছর বাদে আমার আগুনের ফাড়াআছে।

সূর্যদা জিজ্ঞেস করল, আপনি জন্মান্তর মানেন?

এ আবার মানামানির কী আছে? তুমি মানো বা না মানো-পাপ করলে আবার জন্মাতেই হবে।

পাপ কাকে বলে?

পাপ অনেক রকম। যেমন জীব-হিংসা একটা পাপ।

মাছ মাংস খাওয়াও কি পাপ?

এক হিসেবে তো বটেই।

বাইবেলেও পড়েছি, হিংসা করা পাপ। কিন্তু খ্রিস্টানরা তো মাছ-মাংস খাওয়া পাপ। মনে করে না।

তর্ক জমে উঠতেই আমি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। উঠে এলাম ওপরে। সারা বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে। জ্যাঠাইমা ঘুমোচ্ছে ছোড়দিকে নিয়ে। জ্যাঠাইমার এক বোন কিছুদিন ধরে এখানে এসে আছেন, তিনিও পাশের ঘরে ঘুমন্ত। বড়দিকে খুঁজে পেলাম তিনতলায়-একখানা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে একসময়-বইয়ের ওপর তার চুলগুলো ছড়ানো।

গায় হাত দিয়ে ডাকলাম, বড়দি, এই বড়দি!

বড়দি ধড়মড় করে উঠে বসল। যেন ভয় পেয়েছে। বোধহয় কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছিল।

আমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রে, কখন এলি?

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললাম, চুপ!

বড়দি ভুরু কুঁচকে তাকাল। তারপর বলল, ও রকম করছিস কেন? কী হয়েছে কী?

আমি ফিসফিস করে বললাম, সূর্যদা এসেছে।

বড়দি একটু চমকে উঠল। তারপর বলল, কোথায়?

এই বাড়িতে। নীচে সাধুকাকার সঙ্গে গল্প করছে। ডেকে নিয়ে আসব ওপরে?

বড়দি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। মুখ ফেরাল দেওয়ালের দিকে। সেই ভাবেই বলল, সূর্যদা কেন এসেছে? সুর্যদাকে চলে যেতে বল।

বড়দির কাছ থেকে এ রকম কথা আমি আশা করিনি। চট করে বললাম, চলে যাবে কেন? জ্যাঠাইমা তো ঘুমোচ্ছে!

বড়দি এক ধমক দিয়ে বলল, কী আজেবাজে কথা বলছিস! এক্ষুনি যা-ওকে চলে যেতে বল।

বড়দি আমাকে ধমকে ভয় দেখাবে ভেবেছিল। আমি বুঝি ভয় দেখাতে জানি না? চোখ গোল গোল করে বললাম, সূর্যদা কী বলেছে জানো? সূর্যদা বলেছে, ফাঁইভ হান্ড্রেড গোনার মধ্যে যদি তাকে ওপরে ডেকে না আনি-তা হলে সূর্যদা দুম দুম করে গুলি করবে?

কী করবে?

গুলি করবে! সূর্যদার কাছে বন্দুক আছে। সূর্যদা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছে।

কবে? কবে?

এই তো আজকেই। আমি নিজে দেখেছি। সূর্যদা ভীষণ রেগে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, ফাঁইভ হান্ড্রেডের মধ্যে যদি না ডাকি-

বড়দি সরু চোখে তাকাল আমার দিকে। একটু একটু যেন বিশ্বাস করল আমার কথা। মুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। তারপর আঁচল গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে ডাকতে হবে না। সূর্যদাকে গিয়ে বল, আমি নীচে যাচ্ছি।

আমি তরতর করে নীচে নেমে এলাম। সূর্যদা তখন সাধুকাকার সঙ্গে দারুণ তর্কে মেতে উঠেছে। সূর্যদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম একটুক্ষণ, একটুও ভালো লাগছিল না ওই সব তর্ক। একটু ফাঁক পেয়েই বললাম, সূর্যদা, চলো এবার ওপরে যাই।

সাধুকাকা সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে বললেন, ঠিক আছে, যাও ঘুরে এসো।

দোতলা আর একতলার সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বড়দি। পাথরের মূর্তির মতন স্থির। আমি আর সূর্যদা ওপরে উঠে এলাম। সূর্যদা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস?

তুমি কেন এলে?

তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

তুমি আর এসো না।

তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বড়দি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাদল, তুই ওপরে গিয়ে বোস তো।

আমি রাগের সঙ্গে বললাম, কেন?

এখন একটু ওপরে গিয়ে বোস। পরে আসবি।

না, আমি যাব না।

ছেলেমানুষি করিস না। যা বলছি শোন–

বাঃ, আমিই সব ব্যবস্থা করলাম। এখন আমি ছেলেমানুষ? সূর্যদা আর বড়দির ঝগড়া আমি দেখব না? আমি গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সূর্যদা আমার মাথায় হাত দিয়ে নরম ভাবে বলল, বাদল এখন একটু সাধুকাকার সঙ্গে গল্প কর গিয়ে। পরে তোকে ডাকব।

সূর্যদা বকুনি দিলে কিংবা মাথায় গাঁট্টা মারলেও আমি হয়তো যেতাম না। কিন্তু সূর্যদার নরম গলায় অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। বিড়বিড় করতে করতে নেমে এলাম সাধুকাকার ঘরে। সাধুকাকা অবাক হলেন না, কোনও প্রশ্ন করলেন না, বললেন বোস। আজ তোদের ইস্কুল এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল কেন?

.

বাদল চলে যাবার পর সূর্য আর এক সিঁড়ি উঠে এল। এখন সে আর শ্রীলেখা দোতলা ও একতলার সিঁড়ির মাঝখানে।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করল, তুমি আজ পুলিশের সঙ্গে মারামারি করেছ?

কে বলল? ওসব বাজে কথা।

তুমি কি এমনি এমনি মরতে চাও!

শোন শ্রীলেখা। আমার এখন অনেক কাজ। কিন্তু তোর জন্য আমার মনটা স্থির করতে পারি না। তুই আমার সঙ্গে চল।

তুমি আবার এইসব কথা বলছ? তুমি জানো না যে এটা হয় না?

কেন হবে না? তুই আর আমি কেউই কারওর বাড়িতে থাকব না–আমরা ঘুরে বেড়াব।

কোথায়?

কখন কোথায় থাকব কোনও ঠিক নেই। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। তোকেও কাজ করতে হবে।

এসব কী বলছ। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

তোকে আমি হরদার কথা বলেছিলাম। হরদা মৃত্যুর আগে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন করার জন্য হরদার বাকি কাজ আমাকে করতে হবে। সে প্রতিজ্ঞা যদি আমি না রাখি, তবে আমি মানুষ নয়! হরদা কীসের জন্য মরেছেন? কোনও দিন নিজের বাড়িঘরে থাকেননি, পুলিশের মার খেয়ে হাতের আঙুল ভেঙে গিয়েছিল–টি. বি. হয়েছিল, বিনা চিকিৎসায় আমার কোলে মাথা দিয়ে মরেছেন। সে-সব কীসের জন্য? এই দেশের জন্য। সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে না?

সেই জন্য তুমি পুলিশের সঙ্গে লড়াই করবে?

শুধু পুলিশ কেন, দরকার হলে মিলিটারির সঙ্গেও লড়তে হবে-গোটা ব্রিটিশ জাতের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ লেগেছে-এই তো সুযোগ। দেখিস, শিগগিরই ব্রিটিশরা এ-দেশ ছেড়ে পালাবে তার আগে ওদের প্রচণ্ড মার দিতে হবে। সে জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি, বুঝলি। আর বেশি দিন দেরি নেই।

আমাকে এসব কথা বলছ কেন? আমি এর কী বুঝি?

শ্রীলেখা, তোর জন্য আমার মন ছটফট করে। শিগগিরই আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কলকাতা ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে হবে গ্রামে গিয়ে। কিন্তু তোকে ছেড়ে আমি থাকব কী করে?

সূর্যদা আমার বিয়ে ঠিক গেছে।

ধুৎ তেরি বিয়ে! কী হবে বিয়ে করে? বিয়ে করে শুধু বাচ্চা মানুষ করবি আর মোটা হয়ে পান চিবোবি? তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে। আমাদের কোনও বাড়িঘর থাকবে না। আমরা গাছতলায়, নদীর ধারে শুয়ে থাকব। যখন যা জুটবে, তাই খাব। বিপ্লবীদের সাহায্য করব, থানায় আগুন জ্বালব। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকব বনেজঙ্গলে। সেই জীবনটা ভালো নয়? হয়তো তুই কিংবা আমি কিংবা দুজনেই মরে যাব-কিন্তু তাতে কী হবে-মরার আগে একটা শান্তি থাকবে যে আমরা দেশের জন্য কিছু করেছি।

সূর্যদা, আমায় ক্ষমা করো। আমি এসব পারব না।

সূর্য একসঙ্গে এত কথা কখনও বলেনি। তার মুখ লাল হয়ে গেল। চাপা উত্তেজনায় সে কঁপছে। শ্রীলেখার চোখে চোখ রেখে ফিসফিস করে বলল, তুই ভয় পাচ্ছিস? কোনও ভয় নেই। চল আমার সঙ্গে বেরিয়ে চল। দেখবি, আর কোনও ভয় লাগবে না।

আমি পারব না। আমায় ক্ষমা করো।

তোর বিয়ে করতে এত শখ? বিয়ে তো অনেক মেয়েই করে। এর মধ্যে কী আছে?

না, শুধু সে জন্য নয়। আমি বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না। তুমি বুঝতে পারছ না- তোমরা ছেলে, তোমাদের কথা আলাদা। আমি মেয়ে-

কেন, প্রীতিলতা যায়নি? কেউ তার নিন্দে করে?

আমি খুব সাধারণ মেয়ে।

শ্রীলেখা, তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না। অন্য কারওর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, এটা আমি সহ্য করতে পারব না। কিছুতেই পারব না। তোকে আমার চাই।

সূর্যদা, আমাকে ক্ষমা করো।

সূর্যদা একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করল। দ্বিধা বিভক্ত যাতনায় মুখখানা তার কুঁকড়ে গেছে! সে আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

শ্রীলেখার শরীরে একখানা আটপৌরে শাড়ি জড়ানো। সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসার চিহ্ন তার চোখেমুখে। এবং সে ভয় পেয়েছে। তার বিয়ের আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি-এই সময় সূর্যর চলে আসার পরিণাম যে কী সে বুঝতে পারছে না। এর আগে দু'বার তার বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে গেছে। বাবা-মা সব সময় তার নিন্দামন্দ করে। সে আর কত সহ্য করবে।

সূর্যকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্রীলেখা আবার আস্তে আস্তে বলল, সূর্যদা, আমি হয়তো অনেক দোষ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি আমার সত্যি সত্যি দাদার মতন- তুমি ও-সব কথা আমাকে আর বোলো না।

সূর্য বিষণ্ণ ভাবে বলল, শ্রীলেখা তোকে আমার চাই!

আমি মনে মনে তোমারই থাকব। কিন্তু তুমি আর কোনও দিন এ ভাবে এসো না!

মনে মনে নয়-আমি তোকে সব সময় চাই। তুই পাশে থাকলে আমি অনেক কিছু করতে পারব।

ওসব আমার জন্য নয়।

আমি তোকে তৈরি করে নেব। তুই আমাকে বিশ্বাস করতে পারবি না? তোকে কোনও কষ্ট পেতে দেব না-তুই চলে আয় আমার সঙ্গে।

আমি ওপরে যাচ্ছি। তুমি আর এসো না।

সূর্যর মুখ থেকে বিষণ্ণতা মুছে গেল। আর দু' সিঁড়ি উঠে এসে শ্রীলেখাকে বাঘের মতন জড়িয়ে ধরে অদ্ভুত তীব্র গলায় বলল, তোকে আমার চাই!

দিনেরবেলা সিঁড়ির মাথায় এই রকম ঘটনায় শ্রীলেখা এত অসম্ভব ভয় পেয়ে গেল যে ভয় তাকে প্রচণ্ড শক্তি এনে দিল। প্রাণপণে এক ধাক্কা দিল সূর্যকে! সূর্যের মতন বলশালী যুবাও সে ধাক্কা সইতে পারল না। হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে গেল দু-তিন সিঁড়ি। সেই আওয়াজ শুনে বাদল আর নিখিলরঞ্জন বেরিয়ে এলেন বাইরে।

সূর্য ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। শ্রীলেখার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, তুই আমার কথা শুনলি না। তা হলে আমিও তোকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি ফিরে আসি, তারপর তোর জীবনটাও আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।

নিখিলরঞ্জন উঠে এসে সূর্যর পিঠে হাত রেখে বললেন সূর্য, এ কী করছ! শান্ত হও শান্ত হও!

২৭. বড়দির বিয়ের দিন

বড়দির বিয়ের দিন আমি প্রথম ধুতি পরি। মা আমাকে গোলাপি রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি ও জরিপাড় ধুতি পরিয়ে দিয়েছিল, এবং ফুলফুল আঁকা সাদা পাম্পশু। দু-তিন বার আছাড় খেয়ে ধুতিটা আমি মোটামুটি কায়দা করে নিয়েছিলাম কিন্তু নতুন জুতোর জন্যে আমার পায়ে ফোঁসকা হয়ে যায়, ফলে জুতোর মধ্যে তুলো লাগাতে হয়।

খুব আনন্দ হয়েছিল বড়দির বিয়েতে। সাত দিন ধরে আমরা তালতলার বাড়িতেই ছিলাম। বিয়ের দিন সকাল থেকেই গেটের সামনে সানাই বসেছিল। সানাইয়ের বাজনার থেকেও আমার বেশি মজা লেগেছিল যে লোকটি পোঁ করে থাকে, তাকে দেখতে। একজন বেঁটে মতন লোক সারা দিন-রাত ধরে শুধু সানাইতে পোঁ-ও-ও করে যায়।

সারা দিন ধরে তত্ত্ব গেল, তত্ত্ব এল। কী বিরাট বিরাট দু'খানা মাছ এল বরের বাড়ি থেকে। বড়দিকে গায় হলুদ মাখিয়ে চান করানো হল। মা বড়দিকে বলে দিল, দুপুরবেলা ঘুমুবি। আজ একদম ঘোরাফেরা করবি না। বিয়ের কনেকে দুপুরে ঘুমুতে হয়–এই নিয়ম!

আমার খুব ইচ্ছে ছিল নেমন্তন্নর সময় জল কিংবা নুন পরিবেশন করার। কিন্তু আমাকে কিছুতেই তা দেওয়া হল না। আমাকে বলা হল, বরযাত্রীদের কাছে বেলফুলের মালা নিয়ে যেতে, কিন্তু সেটা তো মেয়েদের কাজ তাই আমি নিইনি।

বর এসেছিল একটা হাঁসের পিঠে চড়ে। মানে, একটা মটোরগাড়ি–সেটাতে ফুল দিয়ে হাঁসের মতন সাজানো। সেই মটোরগাড়ির পাদানিতে দু'পাশে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল–তাদের এমন পোশাক, ঠিক যেন ইতিহাস বইয়ের সৈন্য!

জামাইবাবু খুব রোগা আর লম্বা। টকটকে ফরসা রং, চুলগুলো কোঁকড়া। তার দু'হাতে তিনটে আংটি। তিনি গদিমোড়া চেয়ারে বসে খুব ঘামতে লাগলেন, একজন লোক ময়ূরের পালকের পাখা দিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগল। জামাইবাবু দারুণ বিদ্বান, ডবল এম

এ পাস! তিনি কারওর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকান না সব সময় চোখ নিচু করে থাকেন। জামাইবাবুরা থাকেন খঙ্গাপুর। বিয়ের পর বড়দিকে খঙ্গপুরে নিয়ে চলে যাবেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই বাড়িটা লোকে একেবারে ভরে গেল। বড়বাবু গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার করছেন। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বড়বাবুর যে ঝগড়া হয়েছিল-আজ কিন্তু সেটা দেখে কেউ বুঝতে পারবে না। জ্যাঠামশাই একদম সাজপোশাক করেননি-ফতুয়া পরে ঘোরাঘুরি করছেন-মাঝে মাঝে এসে বড়বাবুর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। বাবা আছেন মিষ্টির ঘর পাহারায়। সাধুকাকা অবশ্য বেশির ভাগ সময় নিজের ঘরেই বসে রইলেন। সাধুকাকাকে কেউ চেনে না।

বিষ্ণু, দীপ্তি, অংশু, রেণু-ওরাও এসেছে নেমন্তন্ন খেতে। সুপ্রকাশদা আসতে পারেননি। বিষ্ণুর সঙ্গে কয়েক দিন আমার কথা বন্ধ ছিল, কিন্তু আজ আমি নিজে থেকেই ভাব করে নিলাম। আজকের দিনে কি বিষ্ণুর সঙ্গে কথা না বলে থাকা যায়? ওরা কিন্তু কেউ ধুতি পরেনি। রেণু ফাজলামি করে আমার ধুতি খুলে দেবার চেষ্টা করছিল-কিন্তু আমার কোমরে বেল্ট বাঁধা, অত সহজে খুলবে না! রেণু মাথায় লাল রিবন, সাদা সিল্কের ফ্রক পরে এসেছে। কিছু দিন আগে ওর কান বেঁধানো হয়েছে বলে, দু'কানে এখনও একটু একটু ঘা। ওর কানে ব্যথা দিয়ে দিলে এত লোকজনের মধ্যেই বোধহয় কেঁদে ফেলবে।

আমার কাজ হল সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। একবার ছাদে কিংবা বারান্দায় খাবার জায়গায়, কিংবা একতলায় বর যেখানে বসেছে সেই আসরে কিংবা যে-ঘরে বড়দিকে সাজানো হচ্ছে। কিন্তু সব জায়গাতেই আমরা তাড়া খাই। যেখানেই যাই, কেউ-না-কেউ বলে, এই ছোটরা, এখানে কী করছিস, নীচে যা! আবার নীচে গেলে বলে, ওপরে যা। দীপ্তি অবশ্য শাড়ি পরে এসেছে, ওকে বেশ বড়ই দেখাচ্ছে। ও অনায়াসেই বড়দের দলে ভিড়ে গেল।

আমরা কেউই আগে খাব না ঠিক করেছিলাম, কিন্তু আমাদের জোর করে ফার্স্ট ব্যাচে খাইয়ে দেওয়া হল। কেউ বারণ করার আগেই আমরা একটা করে পান খেয়ে নিলাম,

কিন্তু আমার জামাতেই শুধু পানের পিক লেগে গেল। আগে খাইয়ে দিক আর। নাই দিক, আমরা কেউ ঘুমোব না, বিয়ে দেখব। লগ্ন অনেক দেরিতে। রেণুটা এমন ক্যাবলা, ওরই ঘুমে চোখ ছোট হয়ে এল আগে। আমি ওকে চিমটি কেটে জাগিয়ে রাখতে চাইলাম। রেণু নিজেই নিজের হাতে দু-এক বার চিমটি কাটল। তারপর একটু বাদে দেখি রেণু নেই। আর একটু বাদে দেখলাম, সাধুকাকার ঘরে রেণু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

উঠোনের ছবি-আঁকা পিড়িতে জামাইবাবুকে আগে এনে বসানো হল। তিনজন বাঘা বাঘা পুরুত মন্ত্র পড়তে লাগলেন জোরে জোরে। সেই প্রথম আমরা বুঝতে পারলাম, জামাইবাবু একটু তোতলা। প্রতিটি কথা বলছেন থেমে থেমে, মাঝে মাঝে মধুকে বলছেন—মধু।

আমি একটু আড়ালে এসে বললাম, এ মা, হি-হি-হি, জামাইবাবু তোতলা।

বিষ্ণু গম্ভীর ভাবে আমাকে ধমক দিয়ে বলল, ছিঃ ওকথা বলতে নেই। ডবল এম এ পাশ না!

আমার তখন ভয় হতে লাগল, বড়দি জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলবে না তো? তা হলে কী হবে?

বিষ্ণুকে বললাম, চল, বড়দিকে দেখে আসি।

অংশুর বোধহয় ঘুম পেয়েছে। ওর আর ভালো লাগছে না-ও বিষ্ণুকে বলল, এবার বাড়ি যাবি না?

বিষ্ণু বলল, কী করে যাব? মা'দের তো এখনও খাওয়াই হয়নি। তুই ঘুমোবি!

ঘুমিয়ে পড়লে ওর আত্মসম্মানে লাগবে বলে ও ঘুমোতেও চায় না।

বড়দির ঘরে খুব মেয়েদের ভিড়। ঠেলেঠুলে আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। ইস, কী সুন্দর সাজিয়েছে বড়দিকে! টকটকে লাল রঙের শাড়ি, সারা গায়ে ঝলমল করছে গয়না, মুখময় চন্দনের ফোঁটা, কানে কানপাশা, কপালে ঝুলছে টিকলি। কাছে গিয়ে দেখি বড়দির চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

বড়দিকে সাজাবার ভার নিয়েছে মা। পাউডারের পাফ দিয়ে বড়দির গালে বুলোতে বুলোতে মা ফিসফিস করে বলছে, এই, কী করছিস কী? বোকা মেয়ে! সব সাজ নষ্ট হয়ে যাবে!

বড়দির পেছনেই দাঁড়িয়ে দীপ্তি। বড়দিকে দেখে ওরও চোখ ছলছল করছে দেখলাম।

হঠাৎ দরজার কাছে আওয়াজ শোনা গেল, ভিড় ছাড়ো, ভিড় ছাড়ো!

তাকিয়ে দেখি, জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধু, অনাদি জ্যাঠামশাই। অনাদি জ্যাঠামশাই খুব ভালো ছবি তোলেন, উনি বড়দির ছবি তুলতে এসেছেন।

দরজার কাছ থেকে মেয়েদের ভিড় প্রায় ঠেলেঠুলেই সরানো হল। অনাদিজ্যাঠা স্ট্যান্ডের ওপর বসানো মস্ত বড় ক্যামেরাটা ঠিক করলেন। তারপর মস্ত বড় একখানা কাপড়– যেটার একদিকে লাল আর একদিকে কালো সেই কাপড়খানা দিয়ে অনাদিজ্যাঠা ক্যামেরা ও নিজের মুন্ডু সম্পূর্ণ ঢেকে ফেললেন। বেশি আলোর ব্যবস্থার জন্য দু'খানা হ্যাঁজাক এনে রাখা হল ঘরের মধ্যে। অনাদিজ্যাঠা ছবি তুলবেন, আমরা প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

হঠাৎ অনাদিজ্যাঠা কালো কাপড় থেকে মুন্ডু বার করে হুংকার দিয়ে উঠলেন, এ কী, মেয়ের চোখে জল কেন?

মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ওর চোখে পাউডার লেগে গেছে তো–

আমি কি শুভদিনে কান্নার ছবি তুলব নাকি!

মা নিজের আঁচল দিয়ে বড়দির চোখ মুছিয়ে দিলেন। অনাদিজ্যাঠা আবার কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, সেই অবস্থাতেই হুকুম করলেন, মুখ ভোলো! কনের মুখ। আরও উঠবে!

মা বড়দির থুতনি ধরে মুখ উঁচু করে দিলেন।

হাসো!

বড়দির ঠোঁট কাঁপছে। আবার মুখ নিচু করতে যাচ্ছিল, অনাদিজ্যাঠা বকুনি দিলেন, হাসো! একদম নড়বে না–

বড়দি ঠোঁট খুলে হাসার চেষ্টা করল। ভিজে চোখ তখনও টলটল করছে, ঠোঁটে হাসি হেসে-সেই অবস্থাতেই বড়দির ছবি অবিনশ্বর হয়ে রইল।

ভিড়ের মধ্যে খুব গরম লাগছিল বলে আমরা আবার বাইরে চলে এলাম। বিষ্ণু আমাকে জিজ্ঞেস করল, হা রে বাদল, সূর্যদা কই রে? সূর্যদাকে তো এক বারও দেখিনি।

আমি চুপ করে রইলাম। আজ সারা দিনে এ-বাড়িতে কেউ সূর্যদার কথা এক বারও উচ্চারণ করেনি। তাই থেকেই আমি বুঝেছি, সূর্যদার কথা বলা আজ নিষেধ। সূর্যদা তো হিংসুটে, বড়দির বিয়েতে সবাই আনন্দ করুক এটা চায়নি–তাই সূর্যদাকে কেউ আসতে বলেনি।

কিন্তু আমার প্রাণের বন্ধু বিষ্ণুকে একথাটা না বললে চলে কী করে! অথচ অংশু রয়েছে যে! আমি অংশুকে বললাম, তুই একটু যা তো, বিষ্ণুর সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে।

অংশু বলল, আমাকে বলবি না?

না, শুধু বিষ্ণুর সঙ্গে–

অংশু রেগে গিয়ে বলল, তা হলে আমি মাকে বলে দেব, তোমরা প্রাইভেট কথা বলো।

ঠিক আছে, তা হলে বলব না!

একটু বাদে আমি আর বিষ্ণু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চট করে অংশুকে কাটিয়ে দিয়ে নীচে এসে সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে রইলাম। উঁকি মেরে দেখলাম, অংশু ওপরে উঠে গেল। তখন আমি বললাম, জানিস, সূর্যদা না বড়দিকে বিয়ে করবে বলেছিল।

বিষ্ণু এত জিনিস বোঝে, কিন্তু এই কথায় হতভম্ব হয়ে গেল। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অবিশ্বাসের সুরে বলল, যাঃ, তা কখনও হয়?

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ রে, আমাকে নিজের মুখে বলেছে। গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে- সেই যে যেদিন ধর্মঘট হল-

এক বাড়িতে আবার বিয়ে হয় নাকি?

এখন তো জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি-দুটো বাড়ি-!

তা হলেও! বর আবার কনেকে কখনও আগে থেকে চেনে নাকি?

সূর্যদা আমাকে বলেছিল কেন?

সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো কথাটা। সূর্যদা এখন কোথায়?

কী জানি।

তুই জানিস না?

সূর্যদা তিন-চার দিন আগে বাড়ি থেকে কোথায় যেন চলে গেছে।

বিষ্ণু একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর আপনমনে বলল, সুর্যদার খুব সাহস!

আমি খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বললাম, ঘেচু সাহস! এই তো সূর্যদা বলেছিল, আর কেউ বড়দিকে বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে তো হল সূর্যদা কী করল!

বিষ্ণু হঠাৎ অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁরে বাদল, বিয়ে মানে কী রে?

এর উত্তর আমিও ঠিক জানি না। তবু বললাম, বিয়ে হয়, এই রকম নিয়ম আছে।

কেন হয়? বিয়ে হলে কী হয়?

বিয়ে হলে ছেলেমেয়ে হয়। বড়দির এবার ছেলেমেয়ে হবে।

বিয়ে না হলে কেন হয় না?

আমিও জানি না ভাই। দীপ্তির শিগগিরই বিয়ে হবে-তখন ওকে জিজ্ঞেস করবি?

দীপ্তিটা ভীষণ হিংসুটে। ও বলবে না।

এই সময় একসঙ্গে অনেক উলু ও শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। বিয়ে বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলাম। তখন বড়দিকে পিড়ির ওপর বসিয়ে জামাইবাবুর চারদিকে ঘোরানো হচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম বিয়ে দেখাটা দারুণ কিছু ব্যাপার। কিন্তু একটু পরেই একঘেয়ে লাগল। খালি মন্ত্র পড়া আর মন্ত্র পড়া। বিষ্ণুদেরও বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এল।

রেণু কোথায় সে কথা সবাই ভুলে গেছে। আমার মনে পড়ল। সাধুকাকার ঘরে গিয়ে দেখি রেণু দেওয়ালের ধার ঘেঁষে ঘুমোচ্ছে। আমি গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই ধড়ফড় করে উঠে বসলে। বড় বড় চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল, বিয়ে হয়ে গেছে?

আমি বললাম, প্রায় শেষ হয়ে গেল। তুই তো কিছুই দেখলি না।

রেণু তখন একছুটে চলে গেল বিয়ের আসরে। আর সে সেখান থেকে নড়বে না। ওর ঘুম একদম ছুটে গেছে। অংশু জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেল রেণুকে।

বিষ্ণুদের ঘোড়ারগাড়ি চলে যাবার পর আমি দেখলাম, বাড়ির সামনের রাস্তায় এঁটো কাটার পাহাড় জমেছে কয়েক জন কাঙালি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার ওপর একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে তাদের পাশে। আলো ঝলমল বিয়েবাড়ির পাশে সব সময়েই এক দৃশ্য থাকে–তবু সে-দিন মধ্যরাত্রে ওই দৃশ্য যেন আমি প্রথম দেখলাম মনে হল।

পরদিন আমার ঘুম ভেঙেছিল খুব ভোরে। সারা বাড়ি তখন ঘুমন্ত। খুব হিসি পাওয়ার জন্যই ঘুম ভেঙে যায়–আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। কিংবা হয়তো ঘুমের মধ্যেই আমি শুনেছিলাম লোহার গেটে ঝনঝন শব্দ। কিছু একটা কোলাহল।

তিনতলার বারান্দা থেকে দেখলাম, বাগান পেরিয়ে লোহার গেটের ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যদা। গেট তালাবন্ধ। গেটের এ-পাশে দরওয়ান আর জ্যাঠামশাই। সূর্যদার চুল উসকোখুসকো। কী কথা হয়েছিল আমি কিছুই শুনতে পাইনি। দৃশ্যটা শুধু দেখেছি। সেই অবস্থায় নীচে নেমে যাবারও সাহস পাইনি–তা হলে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে দারুণ বকুনি খেতাম। সূর্যদা নিশ্চয়ই চাচামেচি করেনি, তা হলে তিনতলা থেকেও শোনা যেত–বোধহয় সূর্যদা অনুনয়বিনয় করেই কিছু বলছিল–জ্যাঠামশাই বরং রাগারাগি করছিলেন–তারপর দরোয়ান দৌড়ে গিয়ে বড়বাবুকে ডেকে নিয়ে এল। বড়বাবু রাত্রে নিজের বাড়ি ফেরেননি। সূর্যদা এসে যাতে না কোনও গণ্ডগোল করে, সেই জন্যই বড়বাবু থেকে গিয়েছিলেন সম্ভবত। বড়বাবুও কী সব বলতে লাগলেন, আমি রেলিংয়ে থুতনি ঠেকিয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

গেটের তালা খোলা হল না। সূর্যদা একসময় মুখ ফিরিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেল। সেই ভোরবেলা সূর্যদাকে দেখে আমার ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল। সূর্যদাকে আর কেউ ভালোবাসে না। আমি ভালোবাসি। আমি যদি নিজের প্রাণ দিয়েও সূর্যদার জন্য তখন কিছু করতে পারতাম–তাতেও রাজি ছিলাম। কিন্তু কী করব? সূর্যদা বোধহয় একবার

বড়দির সঙ্গে শুধু দেখা করতে চেয়েছিল। বাসরঘরে বড়দি, আরও অনেকে ঘুমিয়ে রয়েছে। চুপি চুপি বড়দিকে ডেকে আনব? কিন্তু বুঝলাম, তাতেও কোনও লাভ নেই বড়দি সূর্যদাকে চলে যেতে বলেছিল। সূর্যদাকে কেউ নেমন্তন্ন খেতেও দিল না। একবার ইচ্ছে হল, সূর্যদার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকি। তা-ও ডাকা হল না। সূর্যদা সেই যে দারুণ অপমানিত হয়ে চলে গেল এবাড়ি থেকে তারপর আর বেশ কয়েক বছর আমি সূর্যদাকে দেখিনি।

২৮. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দু-তিনটি বছর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দু-তিনটি বছর এ-দেশে একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার মধ্যে কেটেছে। প্রথম সারির নেতারা প্রত্যেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সেটা ঢাকবার জন্য তাদের ছটফটানিও অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। যুদ্ধ যখন লাগবে লাগবে মনে হয়েছিল, তখন সকলেরই মনে আশা জেগেছিল যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। যুদ্ধ যখন সত্যি সত্যি শুরু হল, তখন সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। স্বরাজ এবার আসবেই, কিন্তু কোন পথে আসবে? স্বরাজ কি অর্জন করে নিতে হবে না? দেশের লোক একটা কিছু নির্দেশ পাবার জন্য অধীর-কিন্তু কোনও নির্দেশ নেই।

মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধটাকে নিলেন নৈতিক দিক থেকে। যে পরিচ্ছন্ন নীতি মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ করে, সেই নীতিবোধ তিনি একটি দেশের দিকদিশারি হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেন। যদিও দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে না দেশ কাকে বলে-এবং রাষ্ট্রের কোনও আত্মা নেই। প্রায় পৌনে দুশো বছর ধরে যে ইংরাজ সম্পূর্ণ অমানবিক ভাবে ভারত শাসন ও শোষণ করল-সেই ইংরেজই শক্তিশালী জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বিপন্ন হওয়ায় গান্ধীজি জানালেন, ইংরেজ এখন আক্রান্ত, এই সময় তাকে চাপ দেওয়া সুনীতির

পরিপন্থী। দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনেও তিনি সম্মতি দিলেন না কারণ তার পরিণতি অরাজকতা ও ধ্বংস। তিনি বড়লাটের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করতে লাগলেন। এই যুদ্ধে অগণতান্ত্রিক নাৎসি জার্মানির বিজয় তিনি চান না–আবার অহিংসা নীতির সম্মান রক্ষার জন্য মিত্রপক্ষের যুদ্ধকর্মেও তার দেশ সাহায্য করবে না।

ইংরেজদের সঙ্গে দর কষাকষির আগে ভারতীয় দলগুলির মধ্যে মতৈক্য আনতেও কেউ তখনও সক্ষম হয়নি। জিন্না সাহেবের মুসলিম লিগ ততদিনে কলসি থেকে বেরোনো মস্ত বড় দৈত্যে পরিণত হয়েছে–অথচ গান্ধীজি এবং কংগ্রেস তাকে বাস্তব বলে কিছুতেই স্বীকার করছেন না। ১৯৪০-এ লাহোরে পাকিস্তানের দাবি পর্যন্ত উঠে গেছে কিন্তু কংগ্রেস তা নিয়ে আলোচনা করতেই রাজি নয়। এর আগে, বাংলাদেশে ফজলুল হক যখন লিগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চেয়েছিলেন তখন কংগ্রেস ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা না করে এক চরম ভুল করেছিল। এবারও লিগের সঙ্গে আপোসে মীমাংসা না করে কংগ্রেস লিগকে আরও দূরে সরিয়ে দিল–যে লিগ আগে চেয়েছিল শুধু শাসন ক্ষমতার অংশ, এখন তারা চাইল দেশের অংশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে এই সময়েই সত্যিকারের সার জল পড়ল। জিন্না সাহেব আরও শক্ত হলেন, পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে-কোনও আলোচনা মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এতে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে বিন্দুমাত্র নেই।

কংগ্রেসের নিজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছুতেই আর মেটে না। সুভাষ বোসকে নিয়ে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। মাঝে মাঝেই উত্তেজিত জওহরলালকে সামলাতে হচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষবাবুকে বললেন, “আমাদের উচিত হবে, সরকারকে একটা চরম পত্র দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় দাবি পূরণ করা না হলে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা।...সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ-প্রতিষ্ঠান, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, সকল চরমপন্থী দল মিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর একযোগে চরম আঘাত হানতে হবে।”

সুভাষবাবুর কথাবার্তায় সন্ত্রাসবাদের গন্ধ। এতে কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শে চিড় খায়। গান্ধীজি বলেছিলেন, অহিংসা আমার কাছে একটা আদর্শ, তোমরা যদি আদর্শ। হিসেবে মেনে নিতে না-ও চাও, পন্থা হিসেবে গ্রহণ করো। সুতরাং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে সুভাষকে বেআইনি ভাবে সরিয়ে দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ সুভাষের প্রতি সুবিচারের জন্য গান্ধীজিকে লিখলেন। উত্তরে গান্ধীজি বললেন, সুভাষকে নিয়ম মেনে চলতে বলুন। সুভাষকে তাতেও দমন করা যায় না। বাংলাদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস তিনি তখনও দখল করে আছেন। সেখান থেকেও তাঁকে বাদ দেবার পর তিনি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করলেন। সারা দেশের যুব সমাজ তার কথা শোনার জন্য উদগ্রিব।

যুদ্ধের গোড়ার দিকেই সুভাষ ঘোষণা করলেন, ডালহৌসি স্কোয়ারে হলওয়েলের যে কুখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ আছে বাংলার যুব সমাজ সেটা উপড়ে ফেলে দেবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার নামে মিথ্যে কলঙ্ক লেপন করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ওই স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে রেখেছে। তিনি নিজে প্রথম আঘাত আনবেন ওই মিথ্যার স্তম্ভে।

সারা দেশে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়ে গেল এই আহ্বানে। এবং এ এমনই এক প্রশ্ন, যেখানে হিন্দু মুসলমানে কোনও মতান্তর নেই। এদিকে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সমস্ত মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেও বাংলায় নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে লিগ মন্ত্রিসভা তখনও পুতুল খেলা খেলছে। পাছে হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়-এই ভয়ে লিগ মন্ত্রিসভা তখন সাহেবদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়-যদিও আসল ক্ষমতা কিছুই হাতে নেই-মনোনীত সদস্য এবং ইংরাজ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের ভোটে যে-কোনও প্রস্তাব নাকচ হতে পারে।

সুভাষবাবু আইন অমান্য করে হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙার আহ্বান জানানোর জন্য নাজিমুদ্দিন সরকার তাকে বন্দি করলেন। সমস্ত দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের অন্তত কিছুটা শান্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দিন সরকারকেই সেই স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ করতে হয়।

পরের বছর গৃহবন্দি অবস্থা থেকেই সুভাষবাবু হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলেন। সে-খবর রটে যাওয়ার পর সারা কলকাতা শহরে গুজবে কান পাতা যায় না। কেউ বললে, ব্রিটিশরাজ সুভাষবাবুকে খাবারের সঙ্গে রোজ একটু একটু বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। কেউ বললে, শেষ রাত্রে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে-শিবপুরের কাছে গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেছে তাঁর লাশ-কেউ বলে মন্ত্রবলে তিনি অদৃশ্য-কেন না দুর্ভেদ্য ব্রিটিশ পাহারা ফাঁকি দিয়ে কেউ কি পালাতে পারে? মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বিচলিত হয়ে শরৎ বোসের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন, সুভাষের সঠিক কী হয়েছে আমাকে জানাও। কিছু দিন বাদে রহস্যময় রেডিয়ো থেকে শোনা যেতে লাগল সুভাষের কণ্ঠস্বর।

ব্রিটেন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো জার্মানির সঙ্গে ভারতেরও যুদ্ধাবস্থা বলে ঘোষণা করেছিলেন। ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স জারি হয়ে গেল, বড়লাটের হাতেই তাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। কংগ্রেসি নেতারা মনে বড়ই আঘাত পেলেন। এদিক-ওদিক কিছু মন্ত্রিত্ব এবং আলাপ আলোচনার ভড়ং চলছিল এতদিন-কিন্তু এখন প্রকট হয়ে পড়ল, ভারতের সর্বৈব মালিক এখনও ব্রিটিশ সরকার। ভারত কার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে কি করবে না-সে সম্পর্কে ভারতের কোনও জননেতার সঙ্গে পরামর্শ করার পর্যন্ত দরকার নেই। এখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনে নেমে না পড়লে কংগ্রেসের আর কোনও মান। থাকে না। কংগ্রেস প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছে কিন্তু সেটাকে তো আর সংগ্রাম বলা চলে না।

কংগ্রেসের অনেক বৈঠক আর বড়লাটের সঙ্গে নরম-গরম চিঠি চালাচালির পর গান্ধীজি নির্দেশ দিলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের। কোনও সংগ্রাম নয়, কোনও সঙঘবদ্ধ আন্দোলন নয়। রাজনৈতিক কর্মীরা আইন অমান্য করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যুদ্ধ বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে গ্রেপ্তার বরণ করবেন। যে-সময় দেশের সাধারণ মানুষ। পথনির্দেশ পাবার জন্য উন্মুখ, সেই সময় জননেতারা প্রায় বিলাসিতার সঙ্গে কারাগারের অভ্যন্তরে থাকাই মনস্থ করলেন। দেশব্যাপী একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

কংগ্রেসের এই জেল ভরানোর সিদ্ধান্তে লর্ড লিনলিথগো হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন কি না ইতিহাস তার কোনও দলিল রাখেনি। জিন্না সাহেব নাক কুঁচকে ছিলেন কি না সে সম্পর্কেও কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নেই। তবে, জিন্না সাহেব এই সুযোগে প্রচার করেছিলেন যে, দেখো, কংগ্রেস কত পৌরুষহীন! সে আসলে স্বাধীনতা চায় না, ইংরেজের সঙ্গে একলা একলা একটা সমঝোতা করে মুসলমানদের দমিয়ে। রাখতে চায়। এই প্রচারে বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমানও লিগে যোগ দিয়েছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করবে আর কে? সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলি উনিশশো পঁয়তিরিশের পর থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেকেই এসে আশ্রয় নিয়েছে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়। সবাই এটুকু অন্তত উপলব্ধি করেছিল-একটা বিরাট আয়োজন ছাড়া এই সময় সংগ্রাম সার্থক হতে পারে না। এবং কংগ্রেসের মতন এত বড় একটা দলের নেতৃত্ব ছাড়া সেই বিরাট দায়িত্ব আর কে নিতে পারে? এরা সবাই কংগ্রেসের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল এবং নিরাশ হতে লাগল। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে হাজার হাজার কর্মী যখন কারারুদ্ধ, তখন গান্ধীজি বললেন, "আপাতত আমাদের বাক স্বাধীনতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এ সংগ্রাম খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। যাদের নিজেদের স্বাধীনতাই আজ বিপন্ন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কেমন করে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করব? ইংরেজের কি এখন সে সময় আছে?"

বাকি রইল কমিউনিস্টরা। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির সময় যারা চুপচাপ ছিল, হিটলার রুশ আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সরব হয়ে উঠল। কমিউনিস্টরা জাতীয় স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের বিরোধী নয়-কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটা তাদের কাছে মুলতুবি রইল। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাপানিরা পার্ল হারবার আক্রমণ করায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল যুদ্ধ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে রুশের সমমর্মিতা হওয়ায়-এরাই হল মিত্রপক্ষ, এই যুদ্ধ হল জনযুদ্ধ। তারা দেশের মানুষকে বলল, এই যুদ্ধে ইংরেজকে সমর্থন করে পৃথিবীকে হিটলারের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। গ্রামে গ্রামে শোনা গেল, "কৃষাণ ভাই রে, কাস্তেটারে দিয়ে জোরে শান। এক নিমেষে আসবে স্বরাজ,

পালাবে জাপান...।” অর্থাৎ যে জাপান তখনও আসেনি, সেই জাপান ভারতের স্বাধীনতার শত্রু।

বহু বছর ধরে নিষিদ্ধ ছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি, এবার তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। ব্রিটিশ সরকার বিনা মাইনের এক প্রচারসচিব দল পেয়ে বেশ খুশি।

যুদ্ধের আর একটি দিক হল, যুদ্ধদ্যমে টাটা-বিড়লা প্রভৃতি শিল্পপতিরা ফুলে লাল। হয়ে গেল কংগ্রেসের এরাই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। হাজার হাজার লোক চাকরি। পেতে লাগল যুদ্ধের সুবাদে। কৃত্রিম অর্থের ছড়াছড়িতে ফুলে-ফেঁপে উঠল বাজার। শেষ পর্যন্ত এমন হল, চাকরি খালি রয়েছে, অথচ লোক পাওয়া যায় না। গ্রামে আড়কাঠি। পাঠিয়ে তোক ধরে আনতে হয়। রাশি রাশি খুদে কন্ট্রাক্টর জন্মাল-উৎকোচ ও দুর্নীতি সত্যিকারের কাকে বলে মানুষ বুঝল এই প্রথম।

আসলে যুদ্ধের সময় নৈতিকতার প্রশ্নই দেশের সমস্ত সৎ নেতাদের দিশেহারা করেছিল।

নাৎসি জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট ইটালি ও জাপানকে নীতিগত ভাবে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আবার ইংরেজকে সমর্থন করলে ভারতের স্বাধীনতা কবে আসবে? ইংরেজ বলুক, যুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতা দেবে? কিন্তু বড়লাট ডোমিনিয়ন স্টেটাস ছাড়া আর কিছুই বলছেন না, সেক্ষেত্রে ভারতের কাছে প্রধান শত্রু কে? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, না নাৎসি জার্মানি? এই ব্যাপারে কিছুতেই কেউ মনস্থির করতে পারলেন না। জাপান যখন চিনের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার চালাতে লাগল, তখন মহাত্মাজি বললেন, “আমার সহানুভূতি অবশ্য রুশিয়া ও চিনের দিকে। আজ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, আজ আমার মন আর ব্রিটেনকে নৈতিক সমর্থন দিতে চায় না। ভারতের প্রতি ব্রিটেনের ব্যবহারে আমি আজ মর্মাহত। অবশ্য আমি চাই না যে ব্রিটেন অপমানিত হোক বা যুদ্ধে পরাজিত হোক, কিন্তু আমার মন আর তাকে নৈতিক সমর্থন দিতে চায় না।” ভারতের দারুণ সংকটের সময় এ রকম অদ্ভুত নঞর্থক কথার মানেই অনেকে বুঝতে পারেনি।

তারপর জাপান মালয় সিঙ্গাপুর দখল করে বার্মার দিকে এগোতেই ছবি আবার বদলে গেল। ব্রিটিশ সিংহ দৌড়াচ্ছে পেছন ফিরে-এই দৃশ্যে অনাহার ও ম্যালেরিয়া-জীর্ণ ভারতবাসীরও খানিকটা আরাম হয়-শত্রুর শত্রুকে বন্ধু বলে মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। অনেকের। সংবাদপত্রে নিদারুণ সেনসরশিপ থাকা সত্ত্বেও এ-খবর ছড়িয়ে পড়ল যে। সুভাষবাবু একদিন সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ইংরেজ অবশ্য সুভাষবাবুর মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ ছাপিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টার কসুর করেনি। এবং এ কথাটাও সুকৌশলে রটানো হয়েছিল যে, দেশদ্রোহী সুভাষ জাপানিদের পথ দেখিয়ে আনছে। সুভাষবাবু যে সম্পূর্ণ ভারতবাসীদের নিয়ে গঠিত এক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, সেকথা জানানো হল না। লেনিন জার্মানির সহায়তায় রাশিয়াতে ছুটেছিলেন-আর জাপানিদের সাহায্য নিয়ে সুভাষ দেশ উদ্ধারে এগিয়ে আসার সময়। কংগ্রেস কমিউনিস্টরা একযোগে তার নিন্দে করল। জওহরলাল বললেন, বাইরে থেকে যারাই ভারত আক্রমণ করুক, আমি নিজে তলোয়ার হাতে নিয়ে তাদের বাধা দেব! গান্ধীজি বললেন, জাপানিরা মুক্তিদাতা হিসেবে আসবে না, আসবে লুঠের বখরা নিতে। সুতরাং সুভাষবাবুকে সমর্থন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

যুদ্ধের পুরো চাপটা পড়ল বাংলাদেশে। রেঙ্গুন পতনের পর ব্রিটেনের ঘাঁটি উঠে এল। চট্টগ্রামে। বাংলাদেশ আর বেশি দিন রাখা যাবে না, এই চিন্তাতেই ইস্টার্ন কমান্ডের মূল ঘাঁটি কলকাতা থেকে সরে গেল রাঁচিতে। সেখান থেকেও আবার বোম্বাইতে পালাবার জন্য রাস্তা তৈরি রইল। পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত এসে জাপানি সেনারা যাতে নদীনালা পেরোবার জন্য যানবাহন না পায়-তাই সমস্ত নৌকো সরকারি দখলে চলে গেল, খাবার যাতে না পায় সে জন্য সমস্ত চাল সরিয়ে নেওয়া হল বাজার থেকে। জেলেরা খেতে না পেয়ে ধুকতে লাগল, দুর্ভিক্ষের ধোঁয়া দেখা গেল দিগন্তে। কলকাতাতেও তখন পালাই পালাই রব-হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনে প্রতিদিন ভিড়ের চাপে মাথা ফাটাফাটি।

জাপানিদের ঘৃণা করলেও জাপানিরা যদি সত্যি সত্যি বাংলাদেশে উপস্থিত হয় তা হলে তাদের সঙ্গে যাতে আলাপ-আলোচনায় বসা যায়-সেই মতন তৈরি হতে লাগল কংগ্রেস।

কিন্তু এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজদের চূড়ান্ত ভাবে তাড়াবার কোনও পরিকল্পনা তখনও নেই। গান্ধীজি তখনও কুইট ইন্ডিয়া' স্লোগান তোলেননি।

সর্বভারতীয় নেতৃত্বের যখন এই অবস্থা, তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু ছোট ছোট দল মরণপণ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্রত নিয়েছিল। তাদের না ছিল সংগঠন, না ছিল শক্তি। কিন্তু তারা বহুকাল ঘরছাড়া ঘরে ফেরার টান আর নেই স্বাধীনতার স্বপ্ন একটা দুর্জয় স্নেহের মতন তাদের চোখে লেগে আছে-তারা আর কিছু দেখতে পায় না। নিজেদের ক্ষমতা তারা বোঝে না মনে করে, নিজের প্রাণ দেওয়াই বড় কথা। একটা প্রাণ গেলে আরও দশটা প্রাণ এগিয়ে এসে জায়গা নেবে। এরাই বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খল বেয়াল্লিশের ভারতবর্ষে অকস্মাৎ আগস্ট আন্দোলনের ভূমিকা শুরু করে দেয়।

শিয়ালদার মেসে গভীর রাত্রে মিটিং সেরে ব্রজগোপাল এবং তার দলবল ছড়িয়ে পড়লেন ব্ল্যাক আউটের কলকাতায়। এখন ওঁদের গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ব্রজগোপাল সূর্যর কাঁধে হাত দিয়ে এ আর পি'র দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিসারে হাঁটতে লাগলেন।

২৯. জাপানিরা আসছে

জাপানিরা আসছে, জাপানিরা আসছে এই রব উঠে গিয়েছিল চতুর্দিকে। মালয়, সিঙ্গাপুরে জাপানিরা যে কী বীভৎস অত্যাচার চালাচ্ছে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে তার রগরগে বর্ণনায় সাধারণ মানুষের মনে দারুণ আতঙ্ক। অবশেষে সত্যিই একদিন। জাপানিরা এল। রাতের অন্ধকারে কয়েকখানা জাপ বোমারু বিমান উড়ে এসে দুটো মাঝারি সাইজের বোমা ফেলে চলে গেল। সেই বোমা বর্ষণের মধ্যে কোনও রকম। উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা আছে বলেও মনে হয় না-এমনিই যেন খেলাচ্ছলে একটু রঙ্গ করে যাওয়া।

বোমাদুটো পড়ল হাতিবাগান বাজারে এবং দর্জিপাড়ার ভড় লেনের একটি বাড়িতে। কলকাতার এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে ওই রকম সাদামাটা জায়গায় বোমা ফেলার কী মানে হয় কেউ বুঝল না। অনেকে বলাবলি করতে লাগল, টার্গেট ভুল হয়েছে। কিন্তু

দুর্ধর্ষ জাপ বৈমানিকরা এমন কাঁচা ভুল করবে, তা-ও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। বোমাবর্ষণে হতাহত অতি সামান্য। হাতিবাগান বাজারের কাছাকাছি তখন একটি মোষের খাটাল ছিল। গুটি পঞ্চাশেক মোষের মাঝখানে আচমকা বোমা পড়ায় তাদের অসম্ভব বিমূঢ় চিৎকার শোনা গেছে বহু দূর থেকে। বোমার আওয়াজের চেয়েও অতগুলি মুমূর্ষ মহিষের কাতরানির আওয়াজ স্থানীয় লোকদের মনে গেঁথে গিয়েছিল অনেক দিনের জন্য।

কলকাতায় এর আগে থেকেই সাইরেন বাজে। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়-কোনও সময়-অসময় নেই। সাইরেন বাজলেই বাড়ির সব লোক দুদ্দাড় করে এসে একতলার ঘরে কিংবা সিঁড়ির নীচে এসে জমায়েত হয়। কেউ কেউ গয়নার বাক্স নিয়ে আসে- অল ক্লিয়ার নাবাজা পর্যন্ত প্রাণ ও গয়নার বাক্স হাতের মুঠোয়। রাস্তায় রাস্তায় তৈরি হয়ে গেছে ব্যাফল ওয়াল বা বিফল প্রাচীর। শ্যামপুকুরের মাঠে ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে। এইসব প্রস্তুতিই মানুষের মনে ভীতি জাগায়-যুদ্ধ চলবে এক বিদেশি শক্তির সঙ্গে আর এক বিদেশি শক্তির-ভারতবাসীর পক্ষে এই যুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার মধ্যেও কোনও গৌরব নেই। সত্যি সত্যি বোমা পড়ার পর কলকাতার লোক দলে দলে পালাতে শুরু করল।

সারা দিন ধরে ট্যাক্সি, রিকশা, ঘোড়াগাড়ি, ঠেলাগাড়ি বোঝাই মানুষজন যাচ্ছে। শিয়ালদা আর হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়া স্টেশনের দিকেই বেশি ভিড়। যানবাহনের রেট হল আকাশছোঁয়া। মৃত্যুভয় পাওয়া মানুষ যে কত স্বার্থপর ও নীচ হয়, তা বোঝা যায় এই সময়। ঠেলাঠেলি, মারামারি, রুণ, শিশু, বৃদ্ধ কিংবা মহিলার প্রতি কোনও দাক্ষিণ্য নেই-সবাই আগে যেতে চায়-এ-ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে, এ-ওকে মাড়িয়ে আগে যাবে। প্রতিদিন ভিড়ের চাপে দু-এক জন মারা যায়।

সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমণের পর, জাপানিদের আক্রমণ আশঙ্কায় এই দ্বিতীয় বার কলকাতার নাগরিকদের শহর থেকে পলায়ন। কলকাতায় সাধারণত বাইরে থেকে অনবরত লোকজন আসে, কলকাতার লোক দলবেঁধে কখনও এমন ভাবে শহর ছাড়ে না-তাই এ-দৃশ্য অনেকের কাছেই অভূতপূর্ব। শহর ছেড়ে যারা গেল, তারাও অন্য শহরে আশ্রয় নেবার বদলে ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম দেশে। বিদেশি সৈন্য এসে গেলে শহরের বদলে

গ্রামাঞ্চলই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। বহু গ্রামে এই প্রথম দেখা গেল হাতে ঘড়ি ও পকেটে ফাউন্টেন পেন-গোঁজা বাবুদের। বেণী-ঝোলানো তরুণীরা হিলতোলা জুতো পরে হাঁটে কঁচা রাস্তায়। অনেক গ্রামে এই প্রথম শোনা গেল কলের গান। পেঁয়ো নদীর পাশে বসে সপ্রতিভ চেহারায় শহুরে যুবক গেয়ে ওঠে পঙ্কজ মল্লিকের সুরে মুক্তি সিনেমার গান, দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া ভুলাল রে, ভুলাল মোর প্রাণ!' কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দারা তাদের তিন-চার পুরুষ আগে যে-গ্রাম থেকে এসেছিল, সেই গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিল। বাঙালরা ফিরে গেল বাঙালদের দেশে।

ও-দিকে তখন লন্ডনে প্রতিদিন বোমাবর্ষণে ধ্বংস হচ্ছে পাড়ার পর পাড়া। চার্চিল তবু নাগরিকদের শান্ত থাকতে বলছেন। সেই সময় শোনা গিয়েছিল তার বিখ্যাত সাহসোক্তি, 'উই শ্যাল ফাঁইট ইন দা হাউজেজ, উই শ্যাল ফাঁইট ইন দ্য স্ট্রিটস। জোসেফ স্ট্যালিনের ছেলে নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ে হিটলারের কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে নির্যাতিত হচ্ছে– এই খবর রটে গেল। ছেলেকে মুক্ত করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে স্ট্যালিন বললেন, আমার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে রাশিয়ার জন্য লড়াই করছে–এখন একটা ছেলের জন্য চিন্তা করার সময় নেই। এদিকে আমেরিকার সরকার এবং ব্রিটেনের লেবার পার্টির চাপে ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা কিছু বোঝাঁপড়ার জন্য ক্রিপস মিশন এসেছে দিল্লিতে। ভারতীয় নেতারা দর কষাকষি করছেন যুদ্ধ শেষ হলে কতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। জাপানিদের জয় সম্পর্কে অনেকটা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েই গান্ধীজি ব্রিটিশ মিশনের উদ্দেশে মন্তব্য করলেন, "একটা ফেল পড়া ব্যাঙ্কের পোস্ট ডেটেড চেক নিয়ে কী লাভ?" আর সুভাষবাবু বিদেশে বন্দি ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলছেন।

রেণুদের বাড়ি হাতিবাগানের খুব কাছে। বোমা পড়ার পরদিনই সকালে বাদল সেখানে ছুটে গেল। হাতিবাগানের ধারে কাছে যাওয়া যায় না এত অসংখ্য মানুষের ভিড়–তা ছাড়া পুলিশ ঘিরে আছে সম্পূর্ণ বাজারটা। রেণুদের বাড়ির সবাই ছাদে উঠে দেখছে, বাদলও চলে এল ছাদে। উত্তেজনা আর গল্পের শেষ নেই। বোমা পড়ার সময় সবাই ঘুমিয়ে ছিল,

প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠে প্রথমটায় কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। সারা বাড়ি কেঁপে উঠেছিল, সবাই প্রথমে ভেবেছিল ভূমিকম্প। একমাত্র সুপ্রকাশই দাবি করছে যে সে বোমা পড়া স্বচক্ষে দেখেছে।

সুপ্রকাশ বোধহয় একশো বার বলেছে এই গল্প–তবু তার ক্লান্তি নেই। ঘুম আসছিল না বলে সুপ্রকাশ তখন পঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। অল্প অল্প মেঘলা আকাশ, বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। সুপ্রকাশ গুণ গুণ করে গান গাইছিল–এমন সময় প্লেনের শব্দ পাওয়া গেল। সাইরেন বাজেনি বলে সুপ্রকাশের কোনও সন্দেহ হয়নি। সে মনে করেছে মিত্র। বাহিনীর প্লেন। দু'খানা প্লেন পাশাপাশি, খুব নিচু হয়ে এল, তার পরেই বিদ্যুৎ চমকাবার মতন আকাশে চড়াৎ করে উঠল নীল আলো। সে রকম অসম্ভব উজ্জ্বল নীল আলো কেউ কখনও দেখেনি, ঠিক যেন নীল আগুন। কিছু না বুঝেই সুপ্রকাশ মাটিতে শুয়ে পড়েছে, তার পরেই শব্দ–পর পর দুটো। মোষের চিৎকার শুনে তার মনে হয়েছিল, পৃথিবী ফুটো হয়ে নরকের একটা টুকরো ওপরে উঠে এসেছে।

সুপ্রকাশের কাহিনী বড়রা সকলে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, বিশেষত নীল আলোর ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করল। বোমা নীচে পড়ে ফাটবার আগেই আলো জ্বলবে কী করে? তবে এ ব্যাপারে সকলেরই অভিজ্ঞতা শূন্য বলেই কারওর আপত্তিই তেমন জোরালো নয়।

বিষ্ণু বাদলকে বলল, সপ্লিন্টার দেখেছিস?

বাদল অবাক হয়ে বলল, কী? দেখিনি তো?

বিষ্ণু তাকে সাধারণ ব্লেডের দ্বিগুণ সাইজের দু'খানা চকচকে ইস্পাতের ফলা দেখাল। তাদের ছাদে এসে পড়েছে কাল। আশেপাশের অনেক বাড়িতেই এ রকম পাওয়া গেছে। বোমার মধ্যে এ রকম জিনিস থাকে, বিশ্বাসই করা যায় না।

বিষ্ণু বলল, তুই কামানের মুখে নানকিং' পড়িসনি? তাইতে সপ্লিন্টারের কথা আছে। এই জন্যই তো বমবিংয়ের সময় মাটিতে মুখ চেপে শুয়ে পড়তে হয়-নইলে অনেকেই এইগুলো লেগেই মারা যায়।

বাদলের আপশোস হল, তাদের বাড়িটা বিবেকানন্দ রোডে না হয়ে হাতিবাগানের কাছে কেন হল না। সে কিছুই টের পেল না বোমা পড়ার। তাদের বাড়ির কাছে এ রকম হলে সে নিশ্চয়ই সুপ্রকাশদার মতন জেগে থেকে সবকিছু দেখত।

বড়দের মুখে চিন্তায় ছায়া। বাড়ির বাচ্চারা বোমা পড়ার ঘটনায় দারুণ উৎসাহিত। তারা এরোপ্লেন সেজে সারা বাড়ি ছোটাছুটি করছে আর মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে বুম্ বু। বিষ্ণু বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ডান হাতের তর্জনি দিয়ে আঁকড়ে বন্দুক বানিয়ে গুলি ছুড়ছে ক্র্যাক, ক্র্যাক, ক্র্যাক।

রেণু লাফাতে লাফাতে এসে বাদলকে বলল, এই জানিস, কালকে আমরা চলে যাচ্ছি।

বাদল জিজ্ঞেস করল, কোথায়? মসলানন্দপুরে। সেখানে দিদিমা আছে। বিষ্ণু হেসে ফেলে বলল, এই, আবার মসলানন্দ বলছিস! রেণুটা এখনও ভালো করে কথা বলতে শিখল না। ঠিক করে বল, মছলন্দপুর।

বাদল বলল, সে আবার কোথায়?

ওখানে রেণুদের মামার বাড়ির দেশ। রেণুরা কাল চলে যাবে।

রেণু বলল, ওখানে নদী আছে, পুকুর আছে, দাদা পুকুরে মাছ ধরবে, গোরু আছে–

রেণুর চোখেমুখে দারুণ খুশি। আজকাল আর রেণু অসুখে ভোগে না, স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে, গড়গড় করে বাংলা পড়তে পারে।

বাদল বলল, বিষ্ণু, তোরা ওখানে যাবি না?

আমরা যাব অন্য জায়গায়। আমরা রবিবার দিন চলে যাব ভাগলপুরে-ওখানে আমাদের একটা বাড়ি আছে।

বিষ্ণুদের বাড়ি আছে বিভিন্ন জায়গায়। ওদের কোনও অসুবিধে নেই। এই ভয়ের মধ্যে কলকাতায় থাকতে যাবে কেন। বাদলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। রেণু, বিষ্ণু-এরা সবাই চলে গেলে সে একা একা কী করবে? সূর্যদাও তো নেই।

বিষ্ণু বলল, জীমূতরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। বেশ মজা হবে। ভাগলপুরের কাছেই পাহাড় আছে।

রেণু বলল, মসলানন্দপুর ভাগলপুরের চেয়েও অনেক ভালো। আমরা বেশি ভালো জায়গায় যাচ্ছি।

বাদল বিষ্ণুকে বলল, এই, তোদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবি?

বিষ্ণু রেগে গিয়ে বলল, বাজে কথা বলিস না! নিয়ে গেলেও তো তুই যাবি না। সেবার দার্জিলিং যাবার কথা এত করে বললুম, তোর মা তো যেতে দিলেন না কিছুতেই।

বাদল একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাবাকে রাজি করানো সত্যিই শক্ত। তাকে একলা একলাই এখানে থাকতে হবে। কলকাতায় তার আর কোনও বন্ধু রইল না। জাপানিরা এসে পড়ে তাকে বন্দি করে নিয়ে গেলে বেশ হয়।

মনখারাপ ভাবটা কাটাবার জন্য বাদল বলল, যা না তোরা চলে যা। তোরা তো যুদ্ধ। দেখতে পাবি না। আমি সব দেখব।

রেণু বলল, মাথায় বোমা পড়ে বেশ অক্কা পাবি!

অত সহজ নয়। একতলার ঘরে থাকব। জাপানিরা এসে পড়লে একটু একটু জানলা খুলে-জাপানিদের হাতে যখন সাহেবরা মার খাবে-তখন যা মজা লাগবে!

সাহেবরা তো বড় বড় আর জাপানিরা তো ছোট ছোট-ওরা মারতে পারবে?

কলকাতায় তখন মার্কিন সৈন্যদেরও দেখা যায়। ইংরেজদের থেকে এদের চেহারায় আলাদা বৈশিষ্ট্য চোখ এড়ায় না। এরা প্রত্যেকেই লম্বা-চওড়া জোয়ান, মুখের রং লালচে ধরনের। অনেক সময় এরা খালি গায়েও ঘুরে বেড়ায় কলকাতায় আগে কখনও সাহেবদের এ রকম খালি গায়ে ঘুরতে দেখা যায়নি। ভিখিরি দেখলে এরা দরাজ হাতে ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো খুচরো পয়সা। পঙ্গপালের মতন ভিখিরিরা এদের হেঁকে ধরে 'আমরিকি রাজাসাব, আমরিকি রাজাসাব' বলে চাচায়। কখনও কখনও এইসব আমেরিকান সৈন্যরা কোনও বাচ্চা ভিখিরিকে আদর করে কোলেও তুলে নেয়। আশ্চর্য জাত এরা।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, এই আমেরিকানদের মধ্যে আছে কিছু কিছু নিগ্রো সৈন্য। সেই দৈত্যাকার নিগ্রোদের দেখলে রাস্তার ছেলেমেয়েরা হাঁ করে চেয়ে থাকে। একসময় হাবসি খোঁজারা ভারতবর্ষে রাজত্ব পর্যন্ত করে গেছে কিন্তু তার কোনও স্মৃতি নেই। সবার চোখেই নিগ্রোদের বিচিত্র নতুন মানুষ বলে মনে হয়।

বাদল বাড়ি ফিরে শুনল, তাদের বাড়িতেও কলকাতা-ত্যাগ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। বড়বাবু এর একেবারে বিপক্ষে। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ এ রকম প্যানিক সৃষ্টি করে কিন্তু এখনও সে রকম ভয় পাবার মতন কিছু ঘটেনি।

চিররঞ্জন কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন। তিনি বললেন, কিন্তু কলকাতায় যে ভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তাতে এখানে আর থাকা যাবে কী করে? আজ বাজারে দেখলাম, সাধারণ ভেড়ির ট্যাংরা-তাও একটাকা বারোআনা সের? ট্যাংরামাছও কি যুদ্ধে যাচ্ছে নাকি?

বড়বাবু বললেন, রোসো, রোসো-আরও কিছু লোক কলকাতা ছেড়ে চলে যাক- তারপর জিনিসপত্রের দাম আবার সস্তা হবে। তখন আমরা আরাম করে থাকব।

শিগগিরই নাকি কনসক্রিপশান হবে, সেটা শুনেছেন?

তাতে তোমার আমার ভয়টা কী? আমাদের মতন বুড়োদের তো আর নেবে না। তোমার ছেলেও ছোট।

সূর্য?

সূয্যিকে ওরা পাচ্ছে কোথায়? সূয্যি ইংরেজের হয়ে লড়াই করার বদলে বরং আত্মহত্যা করবে। ও বড় জেদি ছেলে।

চিররঞ্জন একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আপনি টের পেয়েছেন যে সূর্য টেররিস্টদের দলে গিয়ে ভিড়েছে? আমিও একটু একটু আন্দাজ করেছিলাম।

ও নিজে আমাকে বলেছে। ও তো মিথ্যে কথা বলায় তেমন পারদর্শী নয়-একদিন একটু জেরা করতেই বেরিয়ে পড়েছে।

ও কোথায় আছে আপনি জানেন?

না জানাই তো ভালো। পুলিশ আমাকে ধরে বেশি চাপ দিলে যদি বলে ফেলি? না জানলে বলতেও পারব না।

বড়বাবু আপনি এ রকম নিশ্চিন্ত থাকেন কী করে? আপনার একটা মাত্র ছেলে–

আমিও আমার মায়ের একটা মাত্র ছেলে ছিলাম। আমাকে নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামায়নি।

চিররঞ্জন দোনামনা করলেও হিমানী কিন্তু কলকাতা ছাড়তে একেবারে বদ্ধপরিকর। হিমানী অবিলম্বে বাপেরবাড়ি চলে যেতে চান-এবং চিররঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে। তার বাবাও বার বার চিঠি লিখছেন। হিমানীর বাপেরবাড়ি বেশ সঙ্গতিপন্ন, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেবার কোনও অসুবিধে নেই।

চিররঞ্জন আমতা আমতা করে বললেন, বড়বাবু কোথাও যেতে চাইছেন না-ওঁকে ফেলে আমি চলে যাই কী করে?

হিমানী বললেন, উনি একলা মানুষ, ওঁর কোনও চিন্তা নেই। ওঁর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

দাদাও তো থেকে যাচ্ছেন। বউদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন শুধু।

তোমার দাদাকে ব্যবসা দেখতে হবে। তোমার কী দেখার আছে? বাবা লিখছেন, ওখানে গেলে তোমার কাজকর্মের একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তা বলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কদ্দিন থাকব!

এটাই বা তোমার কোন নিজের বাড়ি?

চিররঞ্জন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, আচ্ছা দেখি। আরও দু-চার দিন যাক না।

হিমানী তখন থেকেই জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা শুরু করলেন।

৩০. ট্রেনে চেপে খুলনা

ট্রেনে চেপে খুলনা, তারপর স্টিমার। বাদলটা এমন বোকারাম, ট্রেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুই দেখতে পেল না। ওর দিদি সান্ত্বনা ওকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কত বার জাগানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ছেলের হুশ নেই। স্টিমারে উঠে অবশ্য সে জেগে রইল আগাগোড়া।

খুব কম বয়সে বাদল এই পথ দিয়েই এসেছিল কলকাতায় কিন্তু সে সময়কার কথা তার বিশেষ কিছুই মনে নেই। এখন তার যা বয়স, তা সবকিছু দেখেই অবাক হবার মতন। শব্দ, বর্ণ, ঘ্রাণ এই সবকিছুরই মূল্য আছে। মনের মধ্যে কোনও শূন্যতাবোধ নেই-এখন

নিজেকে পূর্ণ করার সময়। এক একটা দৃশ্য বুকের মধ্যে গাঢ় ছাপ ফেলে দিয়ে যায় কত ছোটখাটো জিনিস মুগ্ধতার বাহন হয়ে আসে।

এই নদীর নাম পদ্মা, এর কাছে এলেই মনটা গম্ভীর হয়ে যায়। অধিকাংশ জায়গাতেই ওপার দেখা যায় না। কোথাও মাঝখানে বিরাট চড়া পড়ে আছে, তবু এই নদী দু চোখ ভরিয়ে দেয়। পালতোলা নৌকো ঠিক যেন ছবির মতন, অর্থাৎ সুন্দর ছবির মতন আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায় আবার অন্যরা আসে।

এক জায়গায় চড়ার ওপর একটা কুমির তার ছানাপোনা নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে–তাই দেখে বাদল দারুণ উত্তেজিত। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে দিদিকে গিয়ে বলতেই সেও এল দেখতে। কিন্তু কুমিরগুলো এর মধ্যেই জলে নেমে পড়েছে। সান্ত্বনা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বাদল ইদানীং বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে, সুতরাং বিশ্বাস না করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সত্যি কথা শুনেও কেউ বিশ্বাস না করলে খুব মনখারাপ হয়ে যায়। বাদল সান্ত্বনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল।

স্টিমারে বেশ ভিড়। মানুষজনের ফাঁক দিয়ে গলে গলে বাদল এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। বাবা-মায়ের নিষেধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাদল একা একা নীচে নেমে যায়, ইঞ্জিনঘরের কাছে উঁকিঝুঁকি মারে–এমনকী ফার্স্ট ক্লাসের কেবিনের কাছেও অবাধ গতি।

সেখানেই বাদল দেখতে পেল হৈমন্তীকে। রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘকায় নারীমূর্তি। চুলগুলো ভোলা, শাড়ির আঁচলখানা উড়ছে পতাকার মতন। দূর থেকে প্রথম দেখে বাদল ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। এ-পাশ থেকে একবার ও-পাশ থেকে আর এক বার দেখল। হৈমন্তী কাকিমা রেণুদের বাড়ি থেকে একদিন কোথায় চলে গিয়েছিলেন, তারপর আর তার খবর কেউ জানে না। বড়রা ওদের কাছে বলতেন, হৈমন্তী হারিয়ে গেছে। বাদল আর বিষ্ণু দারুণ ভালোবাসত হৈমন্তী কাকিমাকে, ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়ে ওরা তাকে খুঁজে বার করবে।

সেই হৈমন্তী কাকিমা, এখানে এই স্টিমারে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছেন? বাদল এক ছুট্টে কাছে গিয়ে ডাকল, হৈমন্তী কাকিমা?

হৈমন্তী ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রথমটায় চিনতে পারলেন না। ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ও তুই? তুই এখানে কী করছিস?

বাবা-মার সঙ্গে মামাবাড়িতে যাচ্ছি।

কত বড় হয়ে গেছিস। চিনতেই পারছিলুম না, তোর নাম কী যেন।

হৈমন্তী কাকিমা তাকে এত ভালোবাসতেন, আর তিনি এখন ওর নামটাই ভুলে গেছেন– এতে বাদলের মনে একটা আঘাত লাগল।

হৈমন্তী বললেন, দাঁড়া, বলিস না, আমি মনে করছি। মনে পড়েছে। তোর নাম তো সূর্য।

সে তো আমার দাদার নাম।

হ্যাঁ তাই তো। তোর নাম তা হলে বাদল। বেশ নাম তোদের দুই ভাইয়ের। সূর্য আর বাদল! রোদ্দুর আর বৃষ্টি।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি ঢাকা যাচ্ছি। তোর মামার বাড়ি কোথায়?

মনিকডাঙা।

সে আবার কোথায়?

হৈমন্তী বিশেষ বদলাননি এই ক' বছরে। বড় বড় দুটি চোখে শিশুর সারল্য। এই রমণীর স্বামী এঁকে অনাদর করে অপর নারীর কাছে বদ্ধ হয়েছিলেন। হৈমন্তীর নিয়তি। ছিল সারা জীবন সেই বনেদি বাড়ির অন্দরমহলে বন্দি থেকে সবকিছু সহ্য করা। হৈমন্তী

তা মানেননি, বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে। হৈমন্তীর কপালে এখনও সিঁদুর।- হৈমন্তী রেণু কিংবা বিষ্ণু বা ও-বাড়ির কারওর কথা জিজ্ঞেস করলেন না। বাদলকে দেখে তিনি খুশিই হয়েছেন বোঝা যায়। বাদলের কাঁধে হাত দিয়ে বন্ধুর মতন গল্প করতে লাগলেন। নদীর হু-হুঁ করা জোলো হাওয়ায় হৈমন্তীর সুন্দর মুখশ্রী আরও অপরূপ। দেখায়। তাঁর বাহুর ডৌল, ভরাট বুক, চিবুকের রেখা–এ-সবকিছুর মধ্যেই একটা মাদকতা আছে। এগারো বছরের ছেলেকেও সেই মাদকতা হাতছানি দেয়। বাদলের মনে হল, হৈমন্তী কাকিমার গায়ে কী সুন্দর গন্ধ। হৈমন্তী কাকিমার চেয়ে চমৎকার পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

হৈমন্তী বললেন, আয়, একটা জিনিস খাবি?

হৈমন্তী বাদলকে নিয়ে গেলেন কেবিনের মধ্যে। সেখানে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে একজন লোক একটা বই পড়ছেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বাদলকে দেখে তিনি কোনও কথা বললেন না, শুধু হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন।

হৈমন্তী বললেন, এ হল বাদল। আমার দ্যাওরের ছেলে বিষ্ণু? তার বন্ধু।

লোকটি চশমাটা টিপে ধরে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, খোকা, তোমার সঙ্গে তোমার মা-বাবা আছেন?

হ্যাঁ।

তিনি এবার হৈমন্তীকে বললেন, তুমি দেখা করবে?

করতে পারি।

লোকটি হৈমন্তীকে ইংরেজিতে খানিকক্ষণ কী যে বললেন, বাদল বুঝতে পারল না। হৈমন্তী উত্তরে বললেন, আমার কিছু যায় আসে না।

লোকটি এবার হেসে বললেন, তুমি যেখানে যাও, তোমার ঠিক একটা করে বাচ্চা ছেলে বন্ধু জুটে যায়।

বাচ্চারাই একমাত্র আমাকে ভালোবাসে। আর কেউ ভালোবাসে না।

লোকটি আবার বইতে চোখ ফেরালেন। সেই দিকে চোখ রেখেই বললেন, আমিও তো বাচ্চা। ভেতরে ভেতরে বাচ্চাই রয়ে গেছি।

ওরা কথা বলছিলেন হাসিমুখেই। কিন্তু বাদলের মনে হয়, এ সব দুঃখের কথা। বড়রা প্রায়ই এ রকম দুঃখের কথা বলে।

লোকটিকে বাদলের মোটামুটি পছন্দই হল। ছোট ছেলেরা অচেনা লোক দেখলেই তাকে পছন্দ-অপছন্দ করার ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ঠিক করে নেয়। কারওর সঙ্গে তারা কথা বলা পছন্দ করে। কারওর সঙ্গে কথা বলতেই চায় না। বাদল নিজে থেকেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, এই ইস্টিমার আর কতক্ষণ চলবে?

লোকটি বলল, কেন খোকা, তোমার খারাপ লাগছে? তা হলে তো তুমি কোনও দিন নাবিক হতে পারবে না?

না, আমার খুব ভালো লাগছে। বাবা বলেছেন, আমাদের সাড়ে দশটার সময় নামতে হবে।

তা হলে আর তোমাদের বেশি দেরি নেই।

হৈমন্তী কাগজের বাক্স থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট কেক বার করে বাদলকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোনটা কোনটা নিবি?

কোনও কেকের ওপর প্রজাপতি, কোনওটার ওপর ফুল বা মাছ আঁকা, নানা রঙের। বাদল লজ্জা পেয়ে বলল, যে-কোনও একটা–তুমি তুলে দাও।

লোকটি বলল, পুরো বাক্সটাই ওকে দিয়ে দাও না। তুমি তো খাচ্ছ না।

হৈমন্তী তার থেকে একটা বার করে বাক্সটা সুতো দিয়ে বেঁধে বললেন, একটা এখন খেয়ে নে, বাক্সটা নিয়ে যাবি।

বাদল পুরো বাক্স কিছুতেই নেবে না, লজ্জায় তার কান লাল হয়ে যাচ্ছে। হৈমন্তী শেষ পর্যন্ত এক ধমক দিয়ে বাক্সটা জোর করে তার হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, আয়, আমরা বাইরে গিয়েই দাঁড়াই। সুরঞ্জন, তুমি আসবে?

তোমরা যাও। আমি বইটা ছাড়তে পারছি না।

কেকের তলার কাগজটা জলে ফেলে দিলে সেটা ভাসতে ভাসতে অনেক দূর যায়। একটা নৌকো থেকে একজন লোক খুব চেঁচিয়ে কী যেন বলছে-কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তার কথা-শুধু শোনা যাচ্ছে, এ-এ এ শব্দ। একটা মাছরাঙা পাখি ঝুপ করে জলে পড়েই আবার উঠে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে স্টিমারের গতি কমে এল। কোথাও থামবে। হৈমন্তী বললেন, এবার মা'র কাছে যা। নইলে চিন্তা করবেন। তোরা আবার কবে ফিরে যাবি?

তা তো জানি না।

আমরা ফিরব এক মাস বাদেই। ফেরার সময় আবার এই স্টিমারে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বেশ হয়, নারে?

তুমি কলকাতায় কোথায় থাকো? তুমি তো হারিয়ে গিয়েছিলে।

দূর পাগল! হারিয়ে যাব কেন? আমি এখন এলাহাবাদে থাকি।

চিররঞ্জন আর হিমানী রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বাদলের জন্য। সান্ত্বনা আর চিররঞ্জন দু' দিকে খুঁজে এসেছেন এর মধ্যে। মূর্তিমানকে ফিরতে দেখে চিররঞ্জন এক ধমক দিলেন।

হিমানী বললেন, তোর হাতে ওটা কী?

কেক। হৈমন্তী কাকিমা দিলেন।

তিনি আবার কিনি?

বাদলের মা বিষ্ণুদের বাড়িতে কয়েক বার গেছেন বটে, তবে রেণুর মা ও বিষ্ণুর মায়ের সঙ্গেই তার বেশি পরিচয়। হৈমন্তীকে তিনি দু'-এক বার দেখেও থাকতে পারেন। কিন্তু কোনও কেলেঙ্কারির ঘটনাই মেয়েদের অজানা থাকে না। হৈমন্তীর গৃহত্যাগের ঘটনা তিনি সবিস্তারেই জানেন। সেই হৈমন্তীর সঙ্গেই বাদলের দেখা হয়েছে বুঝতে পেরে তিনি একই সঙ্গে দারুণ কৌতূহলী এবং ক্রুদ্ধ হলেন। কুলটা রমণীর বর্তমান অবস্থাটা একবার চোখে দেখার কৌতূহল–এবং ওর সঙ্গে বাদল কথা বলেছে বলে রাগ।

চিররঞ্জন বার বার জিজ্ঞাসা করছেন, কে, কে? কিন্তু হিমানী পুরোপুরি সব বলতে পারছেন না। মেয়ে বড় হয়েছে, মেয়ের সামনে এসব কথা বলা যায় না। সুতরাং তিনি আরও বেশি রেগে উঠে বললেন, তুই নিতে গেলি কেন?

আমাকে জোর করে দিয়েছেন। জোর করে কেউ দেয়? তোকে বলেছি না, কেউ কোনও জিনিস দিলে নিবি না? হ্যাংলা ছেলে হয়েছ একটা।

সত্যি আমি নিতে চাইনি। জোর করে–

যা ফেলে দিয়ে আয়।

বাদলের কেঁদে ফেলার অবস্থা। যে-কেকটা খেয়েছে, তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে–এত ভালো। সে ভেবেছিল, দিদিকে দেখিয়ে কৃতিত্ব নেবে। কিন্তু হিমানী না ফেলিয়ে ছাড়লেন না কিছুতেই বাদলকে হুকুম করলেন বাক্স সুদ্ধু জলে ফেলে দিতে। চিররঞ্জন পর্যন্ত সামান্য আপত্তি তুলে বললেন, একেবারে ফেলে দেবার দরকার কী। এক পাশে থাক না–গরিব দুঃখীরা খাবে। হিমানী তাতেও রাজি নন। ভ্রষ্টা রমণীর দেওয়া জিনিস জলে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।

স্টিমার থেকে নামবার সময় বাদল একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। হৈমন্তী তখনও রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই হাওয়ার মধ্যে। বাদল মুখ ফিরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। লজ্জায় তার শরীর অবশ হয়ে যাবার মতন অবস্থা। হৈমন্তী কাকিমা কি বুঝতে পেরেছেন? আর কোনও দিন সে হৈমন্তী কাকিমার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

৩১. নৌকো থেকে যেখানে নামা হল

নৌকো থেকে যেখানে নামা হল, সেখানে অনেক লোক ভিড় করে আছে। খালের পাড়ে উঁচু মতন বাঁধ, পাহাড়ের মতন উঠতে হয়। সেই বাঁধের ওপর বহু লোক উন্মুখ ভাবে কী যেন দেখছে। আমি ভেবেছিলাম, এরা সবাই বুঝি আমাদের নিতে এসেছে। ওপরে উঠে বুঝতে পারলাম, সেখানে একটা সাপ মারা হয়েছে–তাই ও রকম জনতা।

গ্রামের মাটিতে পা দিয়ে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। একটি সাপের মৃত্যু। সাপটা আমার শরীরের চেয়েও লম্বা, তখনও সে মরেনি, একটি বহুমুখী বল্লম–যার নাম ল্যাজা–তাই দিয়ে তার পেটের কাছে গাঁথা রয়েছে মাটিতে–তেজের সঙ্গে সাপটা ফণা তুলে রয়েছে–এক এক বার ক্রুদ্ধ ছোবল মারছে মাটিতে। তখন সবাই হেসে উঠছে হো হো করে।

সাপকে সবাই ভয় পায়, গ্রামের মানুষও ভয় পায়। এখন সেই ভয়ংকর প্রাণী ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছে–এটাই খুব হাসির বিষয়। এ-ওর গা ঠেলাঠেলি করছে, কেউ কেউ হাসির দমকে দুলে দুলে উঠছে–সবাই অবশ্য নিরাপদ দূরত্বে।

ভিড় ঠেলেঠুলে আমি গিয়ে উঁকি মারলাম। সাপটা তখন মাটি থেকে প্রায় দেড় হাত উঁচু ফণা তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে–একসময় তার মাথাটা স্থির হয়ে গেল। আমার মনে হল, সাপটা ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির দৃষ্টি। একটু একটু বেরিয়ে। আসছে জিভ। ভয়ে আমার বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। আমার দিকেই শুধু ও রকম ভাবে তাকাচ্ছে কেন, আমি তো কিছু করিনি!

সাপটা আবার মাটিতে ছোবল মারল। অসম্ভব শক্তি থাকে ওদের–তার টানের চোটে বল্লমটা হেলে গেল, তখন একটা আতঙ্কের চিৎকার পড়ে গেল ভিড়ের মধ্যে ঠ্যালাঠেলি আর হুড়োহুড়ি, আমিও এক দৌড় মেরেছি। জোয়ান লোকেরা হাতের লাঠি সেটা নিয়ে ধপাধপ করে পেটাতে লাগল সাপটাকে। তারপর কী হল, আমি আর দেখিনি। সেদিন রাত্রে আমি ওই সাপটাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম–আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

আমাদের নিতে এসেছিলেন বড়মামা ও বাড়ির দু'জন মুনিশ। তারাও দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই ভিড়ের মধ্যে। বড়মামাকে আমি প্রণাম করার পর তিনি আদর করে আমার কাঁধে এমন একটা চাপড় মারলেন যে আমার হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। বড়মামার চেহারা বিশাল দৈত্যের মতন, কুচকুচে কালো রং। তিনি অতখানি লম্বা ছিলেন বলেই অনেকে তাকে ঠাট্টা করে বলতেন, শম্ভু, ঘরে বড় ঝুল জমেছে, তুমি হাত দিয়ে ঝুল পরিষ্কার করে দাও তো!

বড়মামা আমার বাবাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, কী মশাই, কী চেহারার ছিরি করছেন? কইলকাতা শহরে খাইতে পান না?

বাবা কিছু দিন আগেই অসুখে ভুগে উঠেছেন বলে শরীর দুর্বল। বাবা ফ্যাকাশে ভাবে হাসলেন।

খালের বাঁধের ওপরে ওঠার পর যে-দৃশ্য দেখলাম, সেই আমার স্মৃতিতে আঁকা প্রথম গ্রামের দৃশ্য। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো মাঠ, মাঝে মাঝে ঝুপসি ঝুপসি গাছ। মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে–তার দু'পাশে সবুজ ধানের খেত–ধানগাছের রং তখন খুবই ফিকে সবুজ, এবং এক বিঘাতের বেশি বড় নয়। এ দিকে-ও দিকে ছড়ানো কয়েকটি খড়ের বাড়ি, তারই একটি বাড়ি থেকে নিয়মিত তালে ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে।

অনেক দূরে যেখানে আকাশ নিচু হয়ে নেমে এসেছে মাঠের কাছে সেইখানে একটা দোতলা বাড়ি। আমরা ওইখানে যাব। ওই বাড়ির ছাদে উঠলে আকাশ ছুঁয়ে ফেলতে পারব আমি।

ওই গ্রামে পাকা বাড়ি খুব বেশি ছিল না আমার দাদুদের বাড়িটা রীতিমতন উল্লেখযোগ্যই বলা যায়। লোকে সেটিকে বাঁড়ুজ্যেবাড়ি বলে। চলতি ভাষায় বাঠুইজ্যাবাড়ি। সে বাড়িতে সাতখানা ঘর, কিন্তু লোকসংখ্যা তার পাঁচ গুণেরও বেশি। বাড়ির সামনের দিকে ঠাকুরদালান, দু'পাশে অনেকগুলি মাটির তৈরি টিনের চালাঘর। আমরা প্রথমে এসে পাকা বাড়ির দোতলায় একটি ঘরেই জায়গা পেলাম কিন্তু আমার দাদু বরদাকান্ত বরাবর একটি মাটির ঘরেই থাকেন।

আমার দাদু এ-গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক, পইতে গলায় খালি গায়ে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়ান, পায়ে খড়ম–তবু লোকজন তাকে দেখলেই যেন ভয় পায়। তিনি একজন। পণ্ডিত ব্যক্তি এবং যথেষ্ট বিষয়ী। দিন দিন বিষয়সম্পত্তি বাড়িয়ে চলেছেন কোন মন্ত্রবলে কে জানে।

আমার দাদুর সাত মেয়ে ও চার ছেলে–সবাই বিবাহিত এবং পুত্রকন্যা সমেত অনেকেই দেশের বাড়িতে থাকেন। প্রথম বার চাকরি হারিয়ে আমার বাবাও এ বাড়িতে বেশ কিছু দিন আশ্রিত ছিলেন। তা ছাড়াও দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন, অসহায় বিধবারা এসে

এখানে জায়গা পেয়ে যায়। মনে হয়, এ বাড়িতে প্রত্যেক দিনই নেমন্তন্ন। রান্নাঘরের বারান্দায় সব সময়ই দেখা যায় একদল লোক বসে বসে খাচ্ছে।

আমার জন্ম এ বাড়িতে। পাঁচ বছর বয়সে এই বাড়ি থেকেই, ওই খালপার ধরেই কলকাতা চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব আমার অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে, কিংবা মনে পড়ে না। হঠাৎ একটা শিউলি গাছতলায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, এই জায়গাটা আমার চেনা। আগে দেখেছি। কিন্তু কবে? মনে হয়, যেন আগের জন্মে। আগের জন্মের মতন আবছা রহস্যময়।

পুকুরপাড়ে ঘাটলার একটা ভাঙা অংশ দেখে মনে হয়, আমি জানতাম, এখানে ভাঙা থাকবে। আমি ঠিক জানতাম। অথচ মামাদের মুখে শুনি, ও-জায়গাটা ভেঙেছে মাত্র, দেড় বছর আগে অর্থাৎ আমার জানার কথা নয়।

একটি বেশ বলিষ্ঠ চেহারার বুড়ি প্রথম দিন আমাকে দেখেই আমার দু'গালে হাত রেখে বলেছিলেন, ও মা, সোনা ভাই কত বড় হইয়া গেছে! প্যান্ট পইরা সাহেব হইছে!

সেই বুড়িকে আমি একদম চিনি না-অথচ তাঁকেই আমার সবচেয়ে বেশি চেনা উচিত ছিল। এঁর নাম গণেশের মা, ইনিই প্রথম আমার নাড়ি কেটে আমাকে কাঁদিয়েছেন। ইনি আমার ধাত্রী।

প্রায়ই শুনি সেই গল্প। উঠোনের মধ্যে হয়েছিল আঁতুড়ঘর, আমার জন্মের আগে কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! সকলেরই সে-দিন মনে হয়েছিল, সৃষ্টি একেবারে ভেসে যাবে। সবাইকে। খুব যন্ত্রণা দিয়ে জন্মেছিলাম এই পৃথিবীতে। তার পরেও বেশ কিছু দিন খুব ছিঁচকাঁদুনে ছিলাম। তাই আমাকে বলা হত বাদলা ছেলে।

প্রথম প্রথম কয়েক দিন ইস্কুলে যাবার কোনও ব্যাপার নেই, কোনও শাসন নেই। মামাবাড়ির আদর খাই আর যে-দিকে খুশি ঘুরে বেড়াই। মামাবাড়ির সীমানাটা বেশ বড়-তিনটি পুকুর, তার ও-দিকে বাগান। এক একটা বাগানকে মনে হয় অরণ্যের মতো গভীর।

বাগান শুনলেই ফুলের কথা মনে পড়ে-কিন্তু এইসব বাগান ফলের-আম, জাম, নারকোল, লিচু-আর বাঁশঝাড় তো সব দিকেই।

বড় পুকুরটার ওপারে বাগানটায় শিয়াল আছে। সন্ধ্যার পরই তারা তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়। সবাই ওই বাগানে একা একা আমাকে যেতে বারণ করেছিল। তবু এক দিন গেলাম। তখন ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢ্যালার সময়। বাগানের মধ্যে নিস্তব্ধতা ঝিম ঝিম করছে। মাঝে মাঝে শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে আপন মনে। বাঁশঝাড়ে এমনি খড় খড় শব্দ হয়, কিছুই দেখা যায় না। আমি এক পা করে এগোই। হাতে একটা কঞ্চি। বুকের মধ্যে একটা ছমছমে ভয়। সেই ভয়টাই নেশার মতন-ফিরতে ইচ্ছে করে না। টুপটাপ করে খসে পড়ে পাতা, আর কোথাও হাওয়া নেই তবু নারকোল গাছের ডগাগুলো কাপে।

সেই নির্জন বাগান, সেই একাকিত্ব-এর মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া আছে। একটু একটু মন কেমন করে, একটু একটু ভালোও লাগে। মনে হয়, সেই বাগানটার কোনও শেষ নেই-অনেক অনেক গভীরে চলে যেতে পারি-সেখান থেকে আর কোনও দিন না ফিরতে হলে বেশ হয়। কী জানি কার ওপরে গুচ্ছের অভিমান আসে বুঝতে পারি না। চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়ার শব্দ শুনি।

মনে হয়, এখান থেকে কলকাতা অনেক দূর। আর কোনও দিন সেখানে ফেরা হবে না। বিষ্ণু, জীমূত, রেণু ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না কখনও। সূর্যদা কোথায় হারিয়ে গেল।

প্রথম কয়েক দিন আমার কোনও বন্ধু হয়নি। একমাত্র বন্ধু হয়েছিল নাদের আলি। নাদের আলির বয়সের গাছপাথর নেই। কালো কুচকুচে চেহারা, চেহারা খুব বড়সড় নয়-কিন্তু মনে হয় যেন লোহার তৈরি, মুখখানা দেহের তুলনায় ছোট এবং অমন সুন্দর ভাবে হাসতে আমি আর কারওকে দেখিনি। হাসির কথা উঠলেই সে বাচ্চাদের মতন লজ্জায় মুখ নিচু করে হাসে।

আমার মামাদের কোথায় একটা বিলে খানিকটা জমিদারি আছে। নাদের আলিই সেটা দেখাশোনা করে। অনেক সময় সেখানেই সে মাসের পর মাস থাকে নৌকোর ওপরে।

নাদের আলি বলে, সেই বিলটার নাম তিনপ্রহরের বিল। সেখানে যা সব কাণ্ড ঘটে, সে রকম আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নেই। সেখানকার জলে কুমির আছে, তারা নৌকোর পাশে পাশে ভাসে এঁটোকাটা ভাত পাবার আশায়, কারোকে কামড়ায় না। আদর করে তাদের পিঠের ওপর বৈঠা দিয়ে বাড়ি মারলে তারা মোষের মতন ঘরঘর শব্দ করে। সেখানে এক একটা পদ্মফুল ফোটে–সূর্যের চেয়েও বড় সাইজের। সেই পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে একসঙ্গে।

নাদের আলি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?

নাদের আলি আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা দোলায়। তাতে হাঁ কিংবা না–কোনটা ঠিক বুঝতে পারি না। নাদের আলির সঙ্গে ভর দুপুরবেলা পুকুরঘাটে বসে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখতে যাবার ষড়যন্ত্র করি।

৩২. ব্রজগোপাল সূর্যকে নিয়ে নামলেন

ব্রজগোপাল সূর্যকে নিয়ে নামলেন খড়গপুর স্টেশনে, তখন অনেক রাত। ট্রেন আসার সময় প্ল্যাটফর্মে ক্ষণিক চাঞ্চল্য জেগেছিল, ট্রেন চলে যাবার পরই সব দিক আবার নিঝুম। অন্য যাত্রীরা বেরিয়ে যাবার পরেও ব্রজগোপালরা বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলেন একটা বেঞ্চে। দু'জনে একটাও কথা বলাবলি হল না। ব্রজগোপাল নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন।

তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে ব্রজগোপাল বললেন, চল, হাঁটতে পারবি?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, কত দূর?

খুব বেশি হবে না, পাঁচ-সাত মাইল বড়জোর। চল না, বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

স্টেশনের বাইরে দু'-একখানা ঘোড়ারগাড়ি তখনও রয়েছে। ঘোড়াগুলো ও গাড়োয়ান সবাই ঘুমোচ্ছে। ব্রজগোপাল সে-দিকে গেলেন না। সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। লোকালয় ছাড়িয়ে এসে পড়ল গ্রামের পথ। অন্ধকার। ওদের কাছে টর্চও নেই।

ব্রজগোপাল বললেন, এ-দিকে অনেক টিকটিকি ছড়িয়ে আছে। একজন ধরা পড়লে আর একজনকে পালাতে হবে–এই হচ্ছে কথা। তখন কেউ কারোকে চিনি না, বুঝলি?

সূর্য কোনও সাড়া শব্দ করল না।

ব্রজগোপাল এবার আপশোসের সুরে বললেন, এইসময় হরদা নেই। আমরা এখন সত্যিকারের লড়াই শুরু করছি, হরদা দেখে যেতে পারলেন না। হরদার ওপর সুভাষবাবুর অনেকখানি আস্থা ছিল।

দু'-একখানা গোরুরগাড়ি মাঝে মাঝে দেখা যায়। অনেকক্ষণ বাদে বাদে একজন-দু'জন লোকও চলে যায় পাশ দিয়ে। যে-কোনও রাত্রির রাস্তাতেই এ রকম দু'-এক জন উদাসীন ধরনের লোক চোখে পড়বেই। ওরা ওই সময় কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় কে জানে। হয়তো ওরাও ব্রজগোপাল আর সূর্য সম্পর্কে ওই কথাই ভাবছে।

জোর হেডলাইট জ্বেলে একটা গাড়িকে আসতে দেখে ওরা পুলিশের গাড়ি মনে করে রাস্তা থেকে মাঠে নেমে গেল। গাড়িটা পুলিশের নয়, মিলিটারি। গাদাগাদি করা সোলজার চেঁচিয়ে গান গাইছে।

এখন ওরা ধরল মাঠের ভেতরের কঁচা রাস্তা। পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত, পথ চিনতে তেমন অসুবিধে হয় না।

ব্রজগোপাল সূর্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, সূর্য, তোর মনে আছে, আমাদের হাজারিবাগের আস্তানায় তুই যেদিন প্রথম এসেছিলি? হরদা না আটকালে আমরা।

বোধহয় তোকে মেরেই ফেলতাম। আমি তোকে খুব জোরে একটা চড় মেরেছিলাম না রে?

সূর্য বলল, ভীষণ জোরে মেরেছিলেন।

তখন আমরা স্পাইয়ের ভয়ে খুব সন্ত্রস্ত ছিলাম। তোর বয়সি ছেলেরাও স্পাই হয়।

কেন হয়?

এদের কত রকম কায়দা আছে। কত রকম লোভ দেখায়! মানুষের কি আর লোভের শেষ আছে? পরাধীন দেশ, এই দেশের লোকও রায়বাহাদুর হয়, তাই নিয়ে আবার গর্ব করে। দেখ না, যোগানন্দ আমাদের কতখানি সর্বনাশ করে গেল। শুধু শুধু ডাকাতির বদনাম নিলাম। অতগুলো টাকা-দলও ভেঙে গেল। শংকর তো ভিড়ল জয়প্রকাশ নারায়ণজির সোস্যালিস্টদের দলে।

যোগানন্দ সম্পর্কে কিন্তু আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হয় না।

আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তো ব্যাপার নেই। অতগুলো টাকা নিয়ে স্রেফ উধাও হয়ে গেল। বড়লোকের ছেলে, বাড়িতে অভাব নেই-আমাদের সঙ্গে থেকে কম কষ্ট সহ্য করেনি, আমরা খুব বিশ্বাস করতাম ওকে-তবু টাকার লোভ সামলাতে পারল না। আমি কোনও দিন টাকাপয়সা ভোগ করিনি, ওর যে কী টান তাও জানি না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ব্রজগোপাল বললেন, আমার বাবা ছিলেন পোস্টাফিসের কেরানি-চিরকাল টানাটানির সংসার। সবাই ভেবেছিল, আমি লেখাপড়া শিখে বাড়ির দুঃখু ঘোচাব। দেশের দুঃখু ঘোচাবার কথা আর ক'জন ভাবে বল। সবাই নিজের সংসারের দুঃখই ঘোচাতে চায়। আমি একটা ইস্কুল মাস্টারিও নিয়েছিলাম, বেশি দিন পোষাল না। হেডমাস্টারটি ছিল ইংরেজের মার্কামারা গোলাম। ওকে যদি কোনও দিন বিলেতে নিয়ে যাওয়া হয়, ও তা হলে বোধহয় বিলেতের মাটি চাটবে। সব ছেড়েছুঁড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কত দিন বাড়ির কোনও খবরও রাখি না–আমিও কোনও খবর দিই না, আমার জন্য তারা বিপদে পড়তে পারে। ছোট ভাইটা আছে–

ব্রজদা, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

চল না। ভালো ভাবেই থাকবি। তোর বাবাকে কিছু বলে এসেছিস?

বলেছি বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি।

কোনও আপত্তি করেননি?

সূর্য চুপ করে রইল। বড়বাবুকে সে জানিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু মতামতের জন্য সে অপেক্ষা করেনি। বড়বাবুও আজকাল ওর কোনও কাজে বাধা দেন না। একদিন তিনি সূর্যকে মেরেছিলেন, সেই একদিনই। তিনি বোধহয় বুঝেছিলেন, মারধর বা বকুনি দিয়ে এ-ছেলেকে ঠান্ডা করা যাবে না।

ব্রজগোপাল বললেন, সবারই বাবা-মা আছেন। সব বাবা মা-ই ছেলের জন্য চিন্তিত থাকে। ক্ষুদিরাম কিংবা ভবানীর মা বাবা ছিল না? তোর তো মা নেই–তোর বন্ধন অনেক কম। শোন, তোকে এখানে দুটো কাজ করতে হবে। এখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিশবি, লোককে দেশের কথা বোঝবি। সতীশ সামন্ত মশাই এ-জেলায় অনেক কাজ করেছেন, তার দলের ছেলেদের সঙ্গে পারলে যোগাযোগ করে নিবি–কিন্তু নিজের কথা বিশেষ কিছু ভাবি না। অ্যাকশানের সময় আমি তোকে খবর পাঠাব।

তোর আর একটা কাজ হবে যোগানন্দকে খুঁজে বার করা। আমি খবর পেয়েছি, সে এ-দিকেই কোথাও আছে।

যদি খুঁজে পাই?

প্রথমে ভাব জমাবার চেষ্টা করবি। এমন ভাবে কথা বলবি, যেন তুইও দলটল ছেড়ে দিয়ে এদিকে লুকিয়ে আছিস। আমাদের নামে যত পারিস নিন্দে করবি ওর কাছে। তারপর ওর বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে একদিন সুযোগ বুঝে শেষ করে দিবি। তখন যেন গুলি চালাতে হাত না কাপে একটুও। বিশ্বাসঘাতকদের কোনও ক্ষমা নেই। এদের মেরে দেশের লোকের কাছে একটা দৃষ্টান্ত রাখা দরকার।

মারার আগে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করব না?

ব্রজগোপাল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, শোন সূর্য, কোনও মানুষকে যদি মারতে যাস, তা হলে তার কাছ থেকে যুক্তি বা স্বীকারোক্তি শোনার আশা করিস না। ওসব শুনলে তাকে আর শেষ পর্যন্ত মারতেই পারবি না। সেই হিসেবে একজন ইংরেজকেও মারা যায় না। মানুষ যত দোষই করুক, মৃত্যু কখনও তার শাস্তি হতে পারে না। আমরা ভারতীয়, মানুষের প্রাণ নষ্ট করার ব্যাপারে আমাদের মন কখনও ঠিক সায় দেয় না। ইংরেজ আজ শুধু অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমাদের ওপর প্রভুত্ব করছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, নিষ্ঠা-কোন দিকে ওরা শ্রেষ্ঠ? এই অত্যাচারীকে আঘাত হানবার জন্যই আমাদের অস্ত্র ধরতে হয়েছে। কোনও ব্যক্তিবিশেষের ওপর আমাদের হিংসে নেই।

এককালে স্কুলে পড়াবার জন্যই বোধহয় ব্রজগোপালের আন্তরিক কথাগুলোও বক্তৃতার মতন শোনায়। সূর্য বিনা মন্তব্যে নীরবে শুনে গেল।

দূরে কয়েকটা মিটমিটে আলো দেখে বোঝা যায় সামনে কোনও গ্রাম আসছে। ব্রজগোপাল সে-গ্রামটিও পার হয়ে গেলেন নিঃশব্দে। আর একখানা মাঠ পেরোবার পর আবার একটি গ্রাম। ব্রজগোপাল সেই গ্রামের শেষ প্রান্তের একটি বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন।

বাড়িটিতে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালা দেওয়া পাশাপাশি কয়েকটি ঘর। উঠোনের এক পাশে গোয়ালঘর, সেখানে দুটি গোরুর চোখ অন্ধকারে বৃহৎ মণির মতন ঝকঝক

করছে। গোটা বাড়িটাই ঘুমন্ত মনে হয়েছিল-ব্রজগোপাল দরজায় একটু আঘাত করতেই দরজা খুলে গেল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক মুখ বাড়িয়ে বলল, দাদা নাকি?

ব্রজগোপাল বললেন, উপেন, আমি। খবর পেয়েছিলে?

হ্যাঁ দাদা। আজ বিকেলেই এক ছোকরাবাবু বলে গেল। দাঁড়ান, বাতি জ্বালি।

হারিকেন জ্বেলে লোকটি বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় মাদুর পাতল। আর একজন মহিলাও এলেন, লোকটির স্ত্রী মনে হয়।

আসেন, দাদারা বসেন এসে।

ব্রজগোপাল বারান্দায় উঠে বললেন, উপেন, এই ছেলেটিকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। একে কিছু দিন রাখতে হবে এখানে।

হারিকেনের আলোয় সূর্যর মুখ ভালো করে দেখে চমকে উঠে উপেন বলল দাদা, এ কাকে নিয়ে এসেছেন? এ যে দেখছি সাহেবের ছেলে

না, না।

বলেন কী? এই রং, এই চুল, কটা চোখ!

না হে, এ আমাদের বাঙালি ঘরেরই ছেলে। খুব ভালো ছেলে। একে কি লুকিয়ে রাখতে পারব? আমাদের এসব গাঁয়ের গরিবগুরবোলোক যে এনার দিকে হা করে চেয়ে থাকবে। এ রকম গৌরবর্ণ কি এদিকে কোথাও আছে? এ কি চাপা রাখা যায়।

ব্রজগোপাল হাসতে হাসতে বললেন, আরে, ও-সব ছাড়ো। কাল সকাল থেকে ওকে গামছা পরিয়ে মাঠে নামিয়ে দেবে। ও কি বসে বসে তোমার বাড়ির অন্ন ধ্বংস করবে ভেবেছ? রীতিমতন খাঁটিয়ে নেবে ওকে। দু-চার দিন রোদ-বৃষ্টিতে মাঠের মধ্যে কাজ করলেই ওসব গৌর বটন্ন কালি হয়ে যাবে।

বাড়ির অন্য অনেক লোকে ভিড় করে এসেছে। গুটি পাঁচেক ছেলেমেয়ে, লাজুক মুখ-অবাক ভাবে দেখছে এই দু'জন আগন্তুককে। সূর্য মুখ নিচু করে বসে আছে।

ব্রজগোপাল বললেন, উপেন, বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়াবে?

উপেন কপালে করাঘাত করে বললে, হায়, হায়, এতক্ষণ না খেয়ে আছেন? এখন কী খাওয়াব আপনাদের? ভাত চড়িয়ে দেব?

সেসব খেলে কি পেট ভরে।

হায়, হায়, নিজের মুখে খেতে চাইলেন-আমার এত সৌভাগ্য, কী যে খাওয়াব-

তোমার যা আছে নিয়ে এসো না-

উপেন হাঁকডাক শুরু করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল থালা-ভরতি মুড়ির মোয়া আর বড় বড় মর্তমান কলা। ব্রজগোপাল আর সূর্য তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল সেগুলো।

খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরই ব্রজগোপাল যেতে চান। অনেক জেদাজেদি করেও তাকে আর রাখা গেল না। ভোরবেলাই তাকে কোথায় যেন যেতে হবে।

উপেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রজগোপাল সূর্যকে একটু ডেকে নিয়ে বাইরে গেলেন। ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, সাবধানে থাকবি। এরা লোক ভালো। তোর কোনও অসুবিধে হবে না।

সূর্য তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চুপ করে রইল।

ব্রজগোপাল বললেন, আজকাল আমি একটু দুর্বল হয়ে গেছি। কারওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেই মনে হয়, আর দেখা হবে না। সূর্য, যদি আর দেখা না হয়, যদি আমি মরে যাই-তবু তুই থাকবি তো?

সূর্য বলল, থাকব।

ব্রজগোপাল আর কিছু না বলে হন হন করে মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারে।

৩৩. সূর্যকে শুতে দেওয়া হয়েছিল

সূর্যকে শুতে দেওয়া হয়েছিল একটি ছোট্ট মাটির ঘরে। মাটিতে পরিপাটি করে বিছানা পাতা, তার পায়ের কাছেই কয়েকটা ভূষির বস্তা এবং ঘরটাতে একটু ছাগল ছাগল গন্ধ। কয়েক দিন আগেই এদিকে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই সময় বোধহয় এই ঘরে ছাগলগুলোকে এনে রাখা হয়েছিল।

সারারাত সূর্যর ঘুম এল না, ঠায় জেগে রইল চোখ মেলে। মাথার কাছে একটা লণ্ঠন জ্বালা ছিল, সেটা সে ইচ্ছে করেই নিভিয়ে দিয়েছে। নিস্তব্ধ পল্লিতে শুধু একটানা ঝিঁঝির শব্দ ও মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। পাশের গোয়ালঘরে গোরুদের বড় বড় নিশ্বাস ও স্বপ্ন-দেখা গোঙানির শব্দ শোনা যায়।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সূর্য বিছানা থেকে উঠে বাইরে চলে এল। দেখা গেল, বাড়ির কিছু কিছু লোকজন তারও আগে জেগেছে। রান্নাঘরে আঁচ পড়ে গেছে, একজন বুড়ি গোবরছড়া লেপছে দেওয়ালে।

দিনের আলোয় সূর্য বাড়িটাকে ভালো ভাবে দেখল। একটা উঠোনকে ঘিরে কয়েকটা ঘর। উঠোনের ঠিক মাঝখানেই একটা বেশ বড় নিমগাছ। নিমগাছের নীচে ধান ঝাড়াইয়ের ব্যবস্থা। রান্নাঘরটি উঠোনের এক কোণে। মাটির ঘর হলেও দেওয়ালগুলি বেশ ঝকঝকে তকতকে। মোটামুটি একজন সম্পন্ন চাষির বাড়িই বলা যায়।

মুখ ধোওয়ার জায়গা টায়গা কোথায় সূর্য জানে না, কাকে কী জিজ্ঞেস করবে, তাও বুঝতে পারছে না। সে একটু জড়োসড়ো হয়েই উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এই সময়

চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল উপেন সামন্ত মশাই। বেঁটেখাটো মানুষটি, খালি গায়ে বেশ নাদুসনাদুস চেহারা।

এই যে উঠে পড়েছ দাদা? চলো, পুকুরে যাই একসঙ্গে।

উপেন সামন্তের বয়স সূর্যর প্রায় তিন গুণ, তবু সে সূর্যকে আগাগোড়া দাদা বলেই সম্বোধন করতে লাগল এরপর থেকে। এ রকম অতিথিপরায়ণ মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। সূর্যকে সারাক্ষণ সে এমন খাতির করতে লাগল, যেন স্বয়ং ভগবান এসেছে তার বাড়িতে। তাকে ছাপোষা গৃহস্থই মনে হয়-চাষবাস জমিজমা নিয়েই ব্যস্ত-এর সঙ্গে ব্রজগোপালের দলের কী করে যোগাযোগ হল সূর্য ঠিক বুঝতে পারে না। এ-সম্পর্কে কোনও প্রশ্নও সে করতে পারে না, কারণ সে রকম নিয়ম নেই!

রান্নাঘরের পেছনে একটু দূরেই পুকুর। ঘাটে সিঁড়ি নেই। তালগাছ কেটে ধাপ বানানো হয়েছে। ছোট ছোট পানা ভাসছে পুকুরের জলে। উপেন সামন্ত নিমগাছের ডাল ভেঙে একটি দাঁতন সূর্যর হাতে দিয়ে কথা বলতে বলতেই দাঁত মেজে নিয়েছে। পুকুরের পাড়ে নেমে পানা সরিয়ে সরিয়ে খানিকটা জল পরিষ্কার করে নিল, তারপর বেশ আরাম করে মুখ ধুতে ধুতে কুলকুচো করা জল আবার ছিটিয়ে ফেলতে লাগল পুকুরে। সূর্যকে বলল, নাও দাদা, নাও।

সূর্যর ইংরেজি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত মন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। স্বাস্থ্য বইয়ের নানা উপদেশ মাথার কাছে ঘুরঘুর করে। কিন্তু এখন উপায়ান্তর নেই। উপেনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে ভাবল, স্বাস্থ্যের সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও এর স্বাস্থ্যটি তো বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। তবুমুখের জল কুলকুচো করে পুকুরে ফেলার ব্যাপারটাতেই সূর্যর অস্বস্তি কাটে না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে সে হাত দিয়ে অনেকখানি জল সরিয়ে সরিয়ে তারপর এক আঁচল জল মুখে পুরে দেয়। জলে একটু গন্ধ আছে, কিন্তু খুব বিস্বাদ নয়।

চায়ের পাট নেই এ বাড়িতে, সূর্যকে খেতে দেওয়া হল একথালা পাতলা সুজির হালুয়া। এটা যে সূর্যর খাতিরেই বানানো হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গুড় দেওয়া হালুয়া সূর্য আগে কখনও খায়নি, গরম গরম বেশ খেয়ে ফেলা যায়।

একটু পরেই উপেন সামন্ত চাষের কাজে বেরিয়ে গেল। ব্রজগোপাল বলে যাওয়া সত্ত্বেও এবং সূর্যর অনেক পীড়াপীড়িতেও সে সূর্যকে কিছুতেই সঙ্গে নিল না। একগাল। হেসে বলল, তাও কি হয়? ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে কি হাল চাষ করানো যায়? তরোয়াল দিয়ে কি কেউ দাড়ি কামায়?

সূর্য বলল, আমি তো ভদ্রলোক নই।

তা তুমি যাই বলো দাদা-তোমার এ চেহারা-আমাকে যে শেষে পুলিশে ধরবে। তুমি দাদা কোথাও বেরিয়োনি!

সূর্য কিছুতেই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারল না। সারা দিন সে বাড়ির মধ্যে বন্দি। এ বাড়িতে বিভিন্ন বয়সি পাঁচ জন নারী আছে। উপেন সামন্তর মা এখনও বেঁচে-তার ভাই মারা গেছে, বিধবাটি এ বাড়িতেই থাকে। উপেন সামন্তর এক ছেলে বাবার সঙ্গেই চাষবাস দেখে, আর এক ছেলে খড়গপুরে কলেজে পড়তে গেছে।

বাড়ির মেয়েরা সূর্যর দিকে অবাক ভাবে চেয়ে থাকে-কেউ সামনাসামনি কোনও কথা বলে না। বয়স্ক মেয়েরা ফিসফাস করে বলে, কী সুন্দর, কী সুন্দর। কুমারী মেয়েরা ফিকফিকিয়ে হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সূর্য দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। নিজের চেহারা বিষয়ে সে একেবারেই সচেতন নয়। অন্য কেউ এ-বিষয়ে কথা বললে সে মনে মনে বিরক্তই হয় একটু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রায় জায়গাতেই তাকে এ-বিষয়ে আলোচনা শুনতে হয়। প্রথম বার দেখে কেউই তাকে বাঙালি বলে মনে করে না।

ব্রজগোপাল বলে গিয়েছিলেন, সূর্য গ্রামের লোককে দেশের কথা বোঝাবে। কিন্তু গ্রামের লোককে সে কোথায় পাবে? কী করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাই-ই সে জানে

না। ওরা তো প্রায় সারা দিনই মাঠে থাকে-সন্ধ্যাবেলা ফিরেই খাবার খেয়ে। নেয়-এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রে কেরোসিনের আলো জ্বেলে রাখা রীতিমতন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সূর্য কথা বলার কোনও লোক খুঁজে পায় না।

বাড়ির মেয়েরা সারা দিন রান্নাবান্না করে, গোরুর জন্য খড় কুচোয়, ধান ঝাড়ে-আর। বাড়ির লগু বাগানে কাজ করে। বেগুন ও লঙ্কার গাছ আছে অনেকগুলো, এক ধারে আলুর গাছও লাগানো হয়েছে। প্রথম দু-এক দিন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাগানের কাজ লক্ষ করল, তারপর নিজেই একদিন লেগে গেল সেই কাজে।

গাছগুলোর গোড়া খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জল দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে। বেশ মেতে উঠল সে এই কাজে। নিছক বসে বসে পরের অন্ন ধ্বংস করছে না-এই চিন্তাও তাকে আনন্দ দেয়। পুকুর থেকে সে নিজেই খেতের জন্য ঘড়া ঘড়া জল তুলে আনে।

প্রথম দিন একটি পনেরো-যোলো বছরের মেয়ে তার কাছে এসে লজ্জা ভেঙে বলেছিল, আপনি পারবেননি। আমাকে দিন।

সূর্য গম্ভীর ভাবে বলেছিল, ঠিক পারব।

খানিকক্ষণ মাটি খোঁচাবার পরে সে দেখল তার সামনে মাটিতে একটা ছায়া পড়ে আছে, মেয়েটি তখনও পেছনে দাঁড়িয়ে।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, তোমার নাম কী?

মেয়েটি লজ্জাতেই বাঁচে না। তক্ষুনি দৌড়ে পালিয়ে গেল। বছর দশ-এগারো বছরের আর একটি মেয়ে আছে, সেও আবার দেখতে এল সূর্যকে। সূর্য তার নাম জিজ্ঞেস করলে সেও লাগাল এক দৌড়।

আস্তে আস্তে লজ্জা ভাঙে। মেয়ে দুটির নাম লক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণা। নক্ষী আর অন্নো- এই শুনে সূর্যকে আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। ক্রমশ ওরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজে লেগে

যায়। বেশ একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে যায় ওদের মধ্যে। এ রকম সাহেবের মতন চেহারার কোনও মানুষকে তো ওরা কখনও মাঠে বসে কাজ করতে দেখেনি।

সূর্যকে উপেন একটা কোরা ধুতি কিনে দিয়েছে। সেটা পরে সে এখন খালি গায়েই বাগানের কাজ করে, জল তোলে। অন্য বাড়ির লোকরা দেখতে আসে তাকে।

সূর্যর একটু অসুবিধে হয়েছিল স্নান করা নিয়ে। এখনও সে সাঁতার জানে না তাই পুকুরে নামতে ভয় পায়। দু-চার দিন পর উপেন এটা জানতে পেরে জোর করে তাকে পুকুরে নামাল এবং দিন তিনেক হাত-পা ছুড়িয়ে শিখিয়ে দিল সাঁতার। এটা সূর্যর পক্ষে একটা মস্ত লাভ। এরপর সে মহা উৎসাহে যখন তখন পুকুর দাপিয়ে বেড়ায়।

লক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণা কোনও রকম লেখাপড়া জানে না। অক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত নেই। এসব বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়ার কথা কেউ চিন্তাই করে না কখনও। সূর্য একবার ভাবল, ওদের একটু লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? এবাড়িতে বই বা কাগজপত্রের কোনও পাটই নেই, কী কারণে যেন একটা সাত-আট বছর আগেকার পঞ্জিকা পড়ে আছে শুধু। সেটা দিয়েও কোনও সুবিধে হবে না। বাগানে কাজ করতে করতে সূর্য ঝুরো ঝরো মাটির ওপর কাঠি দিয়ে অ আ লিখে ওদের শেখাবার চেষ্টা করে। ওদের সব কথাতেই হাসি। হেসে গড়াগড়ি যায় মাটিতে। সূর্য রীতিমতন গুরুমশাইয়ের মতন ওদের ধমকায়। উপেনের বউ দূর থেকে দেখে-সেও হাসে, যেন একটা মজার খেলা শুরু হয়েছে এখানে।

এখানে থাকতে থাকতে মনে হয়, পৃথিবীটা বড়ই ছোট। মানুষজনের সুখ-দুঃখ সবই ছোট-ঘোট, কারওর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই বলে অতৃপ্তিও নেই। দু-চারখানা গ্রাম। ছাড়া আর কোনও জায়গার খবর এরা রাখে না। জন্ম-মৃত্যুও নিজস্ব নিয়মে চলে। রাত্তিরবেলা নক্ষত্র-ভরা আকাশের নীচে সূর্য একলা দাঁড়িয়ে থেকে ভাবে, এ-দেশ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। নিজেকে তার খুবই ছোট মনে হয়।

আস্তে আস্তে সূর্য বাড়ির বাইরে বেরোতে শুরু করে। দু-চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। মুদিখানার সামনে গিয়ে বসে-অন্যরা সহজে তার সঙ্গে কথা বলতে চায় না, সেও

নিজে থেকে কিছু বলে না, চুপচাপ শোনে। গ্রামের মানুষ ইতিমধ্যেই এই অদ্ভুত যুবকের কথা জেনে গেছে। সূর্যকে দেখলেই তারা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। একটি দুটি লোক দ্বিধা কাটিয়ে প্রশ্ন করে, সাহেব কি কলকাতা থেকে আসছেন?

সূর্য একদিন ওই রকম মুদিখানার সামনেই বসেছিল, একটি বাচ্চা ছেলে তার সামনে এসে বলল, আপনাকে ডাক্তারবাবু ডাকছে।

সূর্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাকে?

সূর্য উপস্থিত অন্যান্য লোকদের দিকে তাকাল। একজন লোক বলল, পাগল ডাক্তার বোধহয় টের পেইয়েছেন।

সূর্য জিজ্ঞেস করল, আমি যাব?

সবাই একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ যান না। তোক ভালো। ডাক্তার তোক ভালো। গরিব মানুষদের খুব দেখে।

সূর্য একবার ভাবল, এ-বিষয়ে উপেনের সঙ্গে তার একবার পরামর্শ করা দরকার কিনা। পরক্ষণেই মনে হল, ডাকতে যখন পাঠিয়েছে–তখন সূর্য না গেলে এই লোকগুলো ভাববে সে ভয় পেয়েছে। সেটা তার কাজের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

ছেলেটির সঙ্গে সে হাঁটতে হাঁটতে গেল এই গ্রাম ছাড়িয়ে অন্য গ্রামে। সেখানে একটি মাটির বাড়ির সামনে ডাক্তারের নামে বাংলা সাইনবোর্ড ঝোলানো। ডাক্তারের নাম তমোনাশ বিশ্বাস।

ভেতরে ঢুকে দেখল একটি করে নড়বড়ে আলমারি, টেবিল ও চেয়ার এবং দুটি কাঠের বেঞ্চ পাতা। ডাক্তার একজন করা রুগির মুখের মধ্যে টর্চ ফেলে দেখছেন। আরও কয়েক জন লোক নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

কোরা ধুতি-পরা খালি গায়ে সূর্য সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে দাঁড়াতেই ডাক্তার কড়া চোখে তার দিকে তাকালেন। আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বললেন, তুমিই উপেন সামন্তর বাড়িতে এসে রয়েছ? বোসো ওখানে।

সূর্য বেঞ্চির এক কোণে বসল।

৩৪. তমোনাশ ডাক্তার একে একে

তমোনাশ ডাক্তার একে একে চার-পাঁচ জন রোগীকে পরীক্ষা করলেন এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন সূর্যর দিকে। সূর্য লক্ষ করল, ডাক্তারবাবুটি কোনও রোগীর কাছ থেকে ফি নেন না। টেবিলের ওপর একটা টিনের কৌটো রাখা আছে, তাতে যার যা খুশি বা সাধ্য ফেলে যাচ্ছে। অবশ্য ওষুধও সকলেরই প্রায় এক রকম-পাতলা। লাল রঙের মিকশ্চার।

ঘরের মধ্যে দুটি বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, চেহারা মোটেই সুবিধের নয়-সূর্যর পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করতেই সে পা তুলে নেয় বেঞ্চের ওপর। পাশে যে ক'জন লোক বসে আছে তারা একেবারে নির্বাক নিস্পন্দ। মনে হয়, ডাক্তারকে সবাই খুব ভয় পায়। সারা ঘর জুড়ে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ। ডাক্তারের ঠিক পেছনেই দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে-থাকা গান্ধীজির একটা ফটোগ্রাফ বাঁধানো। ভেতর দিকের একটা দরজায় ময়লা পরদা হাওয়ায় ওড়ে। সেখানে দেখা যায় একটা টানা বারান্দা, উঠোনে তুলসী মঞ্চ, চার পাঁচটা বাচ্চা ছেলে হুটোপুটি করছে।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সবাই চমকে ওঠে। ডাক্তার তার সামনে বসা রুগিটিকে এক চড় মেরেছেন। লোকটি মাঝবয়সি, কিংবা বয়স হবার আগেই বুড়িয়ে গেছে, চেয়ারের ওপর ঝুঁকে বসেছিল-মার খেয়ে মুখ দিয়ে একটা গোঙানির মতন শব্দ করল। লোকটির ডান হাতের ওপরের দিকে একটা মস্ত বড় ক্ষত, পুরনো ব্যান্ডেজ খুলে ডাক্তার নতুন ব্যান্ডেজ লাগাচ্ছিলেন-লোকটির কাছাকাছি এসে তিনি ওর মুখে মদের গন্ধ পেয়েছেন।

ডাক্তার গর্জন করে বললেন, হারামজাদা, তুই ফের মদ গিলিছিস! তোর এত বড় সাহস, তুই আমার কাছে আসবার আগেও-হারামজাদা-

ডাক্তার আবার তার দু'গালে দু'ঘা কষালেন, রাগে তিনি রীতিমতন কাঁপছেন। ডাক্তারের রোগাটে লম্বা শরীর, ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু গলায় তেজ আছে।

মার খেয়ে লোকটি মুখ ঢেকে ফেলেছে আর সরু গলায় বলছে, আর করবুনি, আর করবুনি।

যা বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে–

লোকটি ডাক্তারের পা ধরতে যায়। নেশার ঝোঁকে সামলাতে পারে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে পায়ের ওপরে। ডাক্তার পা সরিয়ে নিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এসব কে। বিক্রি করে এ-তল্লাটে? সে-দিন অত করে বললাম-

কেউ প্রথমে উত্তর করে না। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। একজন বলে, কাছেপিঠে তো আজ্ঞে কেউ এমন সাহস করবেনি-আপনি বলেছেন-

ডাক্তারের রাগ একটুও কমে না। তিনি আর রুগি দেখবেন না সে-দিন। চেঁচিয়ে বললেন, বেরিয়ে যা। সব দূর হয়ে যা। তোরা মরতে চাস মর। আমি কী করব।

সব লোকই তখন সরব হয়ে ওঠে। নানা রকম কাকুতিমিনতি। ঘরের মধ্যে একটা হট্টমেলা শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে আবার রুগি দেখতে বসতেই হয়। কিন্তু তার মুখে বেদনার ছায়া। সূর্য চুপ করে বসে নাটকের মতন এই দৃশ্য দেখে।

সব চুকেবুকে গেলে ডাক্তার সূর্যকে ডাকলেন, এবার তুমি এ-দিকে এসো।

সূর্যকে উঠে গিয়ে ডাক্তারের মুখোমুখি রুগিদের টুলেই বসতে হয়। রুগি দেখার মতন চোখেই ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, নাম কী?

সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

তুমি কোন দলের?

সূর্য চুপ করে থাকে। ডাক্তারের চোখ থেকে চোখ সরায় না।

তোমাকে কে পাঠিয়েছে? উপেনের বাড়িতে এসে ঘাপটি মেরে রয়েছ কেন?

কিছু একটা উত্তর দিতে হবেই, তাই সূর্য বলল, আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।

হা হা করে হেসে উঠে ডাক্তার বললেন, বেড়াবার আর জায়গা পেলে না বাপু? এই এঁদো পচা গায়ে তোমার মতন ছেলেরা বেড়াতে আসে? খোলসা করে কও দিকিনি সব কথা!

আমার এক দাদার সঙ্গে উপেন সামন্তর চেনা আছে। তাই তিনি আমাকে এখানে। রেখে গেছেন।

তা তোমার দাদাটি কে? তিনি কোন দলের? দলের তো অন্ত নেই। বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির হাল হয়েছে এ-দেশে। তুমি জেলা কংগ্রেস কমিটির কারোকে চেনো?

না।

শোনো, তোমাকে একটা সাফ কথা বলে দিই। কংগ্রেসের কর্মী ছাড়া এই এলাকায় আমরা আর কারোকে ঢুকতে দেব না।

আপনি কী বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি তো কোনও দলে নেই।

সং সাজার চেষ্টা কোরো না। সেদিনের ছেলে, গাল টিপলে এখনও দুধ বেরোবে- আর তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ? তোমার নামে পুলিশের হুলিয়া আছে?

আমি সত্যিই এখানে বেড়াতে এসেছি।

এখান থেকে দু'ক্রোশ দূরেই থানা। তুমি দু-এক দিনের মধ্যেই ধরা পড়বে। তুমি এখান থেকে সরে পড়ো।

সূর্য এবার একটু তেজ দেখিয়ে বলল, বাঃ, মানুষ কি কোথাও বেড়াতেও আসতে পারবে না?

আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরো না। ওই দাদাটাদা শুনেই বুঝেছি, তুমি বোমা-পিস্তলের দলের ছেলে। দু-চারটে আলপিন ফুটিয়ে তোমরা ব্রিটিশ সিংহকে তাড়াতে চাও। আমাদের এখানে ওসব চলবে না। তুমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাবে।

সূর্য তেড়িয়া ভাবে বলল, আপনার হুকুমে?

হ্যাঁ।

যদি না যাই?

যে-রকম ভাবে বেড়াল পার করে দেখেছ? আমাদের ছেলেরা তোমাকে সেই রকম ভাবে পার করে দিয়ে আসবে।

সূর্যর ঠোঁটে সামান্য ব্যঙ্গের হাসি। সে কটমট করে চেয়ে রইল তমোনাশ ডাক্তারের দিকে। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির টুটি চেপে ধরতে পারে।

ডাক্তারের মুখোনিতে একটা মলিন ছায়া পড়ল। আপন মনেই বললেন, আমরা, এখানে অনেক সহ্য করেছি। আর না। তোমাদের মতন হঠকারীদের জন্য সাধারণ মানুষকে মরতে হয়। পেডি, ডগলাস, বার্জকে যখন পর পর তিন বছরে মারল তারপর মেদিনীপুরের ওপর কী অত্যাচার গেছে, সে-খবর রাখো? প্রদ্যোৎ ভটচাযের নাম শুনেছ? সে ছিল আমার নিজের ছেলের মতন। তোমারই বয়সি হবেফঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছে। হিরের টুকরো ছেলে সব-ভুল পথ দেখিয়ে-তোমার মাথার ওপরেও ফাঁসির দড়ি ঝুলছে

দেখতে পাচ্ছি আমি, কিংবা লোকজনই তোমাদের পিটিয়ে মারবে। সে তোমার যা খুশি করতে চাও করো-কিন্তু এখানে না-আমার এলাকায় সাধারণ মানুষের ওপর আমি অত্যাচার হতে দেব না।

সূর্য বলল, যত বেশি অত্যাচার হবে, ততই দেশের লোক জাগবে।

ডাক্তার চেঁচিয়ে বললেন, ভুল! ভুল! ন্যায়ের পথ ছাড়া সারা দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করা যায় না। শিগগিরই মহাত্মাজির ডাক আসবে, সমস্ত দেশবাসীকে সত্যাগ্রহে নামতে হবে। তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে আসতে চাও

সূর্য প্রকাশ্য ব্যঙ্গে বলল, কী করবেন তখন? অনশন?

দরকার হলে তাও করতে হবে। অনশনের শক্তি জানো? তাতে যে শুধু শত্রু হার মানে তাই-ই নয়, নিজের আত্মা শুদ্ধ হয়। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না। ‘ গণদেবতা যে-দিন জেগে উঠবেন-

ভেতরের দরজার পরদা সরিয়ে একজন মহিলা ডাকলেন ডাক্তারকে। ডাক্তার হাত তুলে বললেন, দাঁড়াও, একটু পরে ডাক্তারকে তখন বক্তৃতায় পেয়ে বসেছে। অনর্গল উপদেশ দিতে লাগলেন সূর্যকে।

সূর্য অবাধ্য ছেলের মতন অমনোযোগী। ইচ্ছে করে পা দোলাচ্ছে। সে তর্ক করতে ভালোবাসে না, কিন্তু এইসব কথা শুনলে তার হাসি পায়।

একবার শুধু সে বলল, আপনি এত অহিংসার কথা বলছেন, কিন্তু আপনাকে দেখলে তো অহিংস মনে হয় না। তখন ওই লোকটিকে অমন ভাবে মারলেন-

ডাক্তার হুংকার দিয়ে বলছেন, বেশ করেছি। বাপ ছেলেকে মারে না? শোনো বাপু, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি কেন এ-পথে এসেছ? তোমাকে দেখলেই মনে হয় তুমি ধনীর ঘরের আদরের দুলাল। দেশ উদ্ধার করা মানে ছেলেখেলা নয়। বন্দুক পিস্তল

ছোঁড়ার নেশায় একবারও কি ভেবে দেখো না, মানুষের প্রাণ কী অমূল্য? অন্যের প্রাণের কথা না হয় নাই-ই ভাবলে, নিজের প্রাণ? দেশের কাজ বড় পবিত্র কাজ, এ জন্য দরকার চরিত্রবল। নিয়মিত ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। মাথাগরম লোকজনের দ্বারা একাজ হয় না। যুগমানব গান্ধীজি–

সূর্য আকস্মিক ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি চলি। সন্ধে হয়ে আসছে।

তমোনাশ গভীর কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলেন ছেলেটিকে। তারপর বললেন, ঠিক আছে। কালকেই চলে যেয়ো এখান থেকে।

সূর্য এবার শান্ত ভাবে বলল, যদি না যাই, জোর করে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না।

আমরা জোর করে না পাঠালেও পুলিশই তোমাকে ধরবে।

সেটা আমি বুঝব।

এই সময়ে লালপাড় শাড়ি-পরা এক কল্যাণময়ী নারীমূর্তি হাতে একটি খাবারের প্লেট নিয়ে ঢুকলেন। চিনি মেশানো চিড়েভাজা এবং একটি কলা। মহিলা প্লেটটি রাখলেন সূর্যর সামনে।

সূর্য চলে আসবার জন্য উদ্যত হয়েছিল, মহিলাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। খাবারের প্লেট অবহেলা করে কি তার চলে যাওয়া উচিত? মানুষজনের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে তার একটুও আটকায় না কিন্তু মহিলাদের সামনে সে নিজের ব্যবহার সম্পর্কে দিশেহারা হয়ে যায়।

মহিলা কোমল গলায় বললেন, নাও বাবা, খেয়ে নাও। তোমার নাম কী? তুমি কাদের ছেলে?

ভেতরের দরজার সামনে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের কৌতূহলী মুখ।

দেওয়ালের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজল। তমোনাশ ডাক্তার চমকে উঠে বললেন, আরে বাপরে, ছটা বাজল। ডাকো, ডাকো সবাইকে ডাকো।

সূর্য খাবারের প্লেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে ঢুকলেন আট-ন'জন মহিলা ও শিশু। সবাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। বাচ্চাদের ভঙ্গিও বেশ বাধ্য। হাতজোড় করে চেয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। সূর্য বুঝল, এবার এখানে একটা প্রার্থনা সভা হবে। প্রতি দিনই হয় বোধহয়।

ডাক্তার তার ভাঙা গলায় শুরু করতেই সবাই একযোগে আরম্ভ করে দিল গান:

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম...।

সবাই দুলে দুলে গান গায়। তমোনাশ ডাক্তার চোখ বুজে তাল দিতে থাকেন। ঘরের মধ্যে সূর্যই একমাত্র চোয়াড়ে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, তার ঠোঁটে সেই হাসিটা লেগেই আছে।

প্রথম গানের পর তমোনাশ ডাক্তার হরিজন পত্রিকা থেকে গান্ধীজির রচনার খানিকটা অংশ অনুবাদ করে শোনালেন। নারী ও শিশুরা তার কতটা বুঝল কে জানে। মনে হয় বিশেষ করে সূর্যকে শোনাবার জন্যই আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান।

পাঠ শেষ হবার পর সবাই নিস্তব্ধ। ডাক্তার বইখানা টেবিলে রাখলেন। সূর্যর দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন, আমাদের যৌবনকালে একটা গান আমরা খুব গাইতাম।

আজও সে গান মনে পড়লে

ডাক্তার শুরু করে দিলেন:

যায় যবে জীবন চলে

জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দে মাতরম বলে।
বেত মেরে কি মা ভোলাবি, আমি কি
মার সেই ছেলে...

সূর্য দেখল বৃদ্ধ ডাক্তারের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

৩৫. এই এলাকায় তমোনাশ

এই এলাকায় তমোনাশ ডাক্তারের বেশ প্রতিপত্তি আছে। লোকে আড়ালে তাঁকে পাগলা ডাক্তার বলে, কিন্তু সামনে বেশ সমীহ করে এবং আড়ালের ডাকটির মধ্যেও রয়েছে অনেকখানি ভালোবাসা। তমোনাশ ডাক্তারের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনের পদ্ধতিটি সূর্য লক্ষ করে। দেখা গেল, ডাক্তারের জীবনের কোনও গোপন অংশ নেই, তার কোনও ব্যক্তিগত জীবন বলেই কিছু নেই। এ রকম মানুষকে বোঝা সকলের পক্ষে সহজ। কোনও রকম আব্রু রাখেননি বাড়িতে, যে যখন ইচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে, সারা দিনই উনুন জ্বলে-কে কখন এসে খেয়ে যায় তার ঠিক নেই। অনেক সময় খেতে বসে দেখা যায় পাতে খাবার নুন নেই, তমোনাশ ডাক্তার সামনের রাস্তা দিয়ে চলন্ত যে-কোনও লোককে ডেকে বলেন, ওহে অমুক, দু'পয়সার নুন কিনে দিয়ে যাও তো। ঝটপট এসো বাবা, খিচুড়ি জুড়িয়ে যাচ্ছে। নুন নিয়ে এসে সেই লোকটিও খেতে বসে যায়, না খেতে চাইলেও ডাক্তার তাকে খাওয়াবেনই, নিজের এঁটো খিচুড়ি তুলে দেবেন অন্য একটি থালায়।

এই ধরনের আন্তরিকতায় সাধারণ লোকে মুগ্ধ হয়। সূর্য বুঝতে পারে, তার পক্ষে এই পদ্ধতিতে মানুষের মন জয় করা সম্ভব নয়।

ডাক্তারের ছেলে-মেয়েরা সকলের ফুটফরমাজ খাটে, ডাক্তারের স্ত্রী সকলেরই মাসিমা। মাঝে মাঝে ডাক্তার সপরিবারে গান গাইতে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়, পাড়া প্রতিবেশীদের যোগ দিতে বলেন। অনেক লোকই আসে। মাঠের মাঝখানে পতাকা তুলে তার নীচে

দাঁড়িয়ে ডাক্তার সকলকে গান্ধীজির বাণী বুঝিয়ে দেন। মাঝে মাঝে হাত তুলে উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করে বলেন, জেলে যেতে হবে! সকলকে জেলে যেতে হবে। ব্রিটিশের জেলখানা ভরিয়ে দেব-তাতেই ভেঙে পড়বে জেলখানার দেওয়াল। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

তারপরেই গান, ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে-'।

সূর্য দিন তিনেক পর পর গিয়েছিল ডাক্তারের বাড়িতে। তারপর সরে পড়ল। অন্য দলে আত্মগোপন করে মিশে থাকার নির্দেশ ছিল সূর্যর ওপর, কিন্তু সূর্য এখানে সুবিধে করতে পারল না। যতক্ষণ সে থাকে, নানা জনে নানা রকম প্রশ্নে তাকে একেবারে অস্থির করে তোলে। ডাক্তারের স্ত্রীর বিশেষ স্নেহ জন্মেছিল সূর্যর ওপর, তিনি এই অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলেটির সমস্ত কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান। কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে হরেক রকম মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা সূর্যর নেই। সে বরং খুব সহজেই রুক্ষ ব্যবহার করতে পারে-কিন্তু একজন বর্ষিয়সী নিরীহ করুণাময়ী মহিলার সামনে সে রুক্ষতা বা মিথ্যাচার কোনওটাতেই সুবিধে করতে পারে না। সুতরাং সে গা-ঢাকা দেয়।

উপেন সামন্তর বাড়িতে সে বরং অনেক স্বস্তি বোধ করে। এখানে সে পরিবারের একজন হয়ে গেছে। সারা দিন মাঠের কাজ করে, পুকুরে দাপাদাপি করে সাঁতরায়, বাড়ির খেত থেকে তুলে আনা বেগুন পুড়িয়ে মোটা চালের ভাত ও ডালের সঙ্গে মেখে

সন্ধ্যাবেলা সে মুদির দোকানটার সামনে এসে বসে বসে গল্প বলে, ইতিহাসের গল্প। সিরাজউদ্দৌল্লার আমল থেকে শুরু করে। বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা তার নেই, টুকরো টুকরো ভাবে গল্প সে বলতে পারে। কয়েক দিন এদের কথা শুনেই বুঝেছে যে সাহেবদের সম্পর্কে এইসব মানুষদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভীতির ভাব রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্পর্কেও কারওর কোনও ধারণা নেই, অনেকে অস্পষ্ট ভাবে শুনেছে যে কোথায় যেন কী একটা যুদ্ধ চলছে-সেটাও সাহেবে সাহেবে লড়াই-সেই যুদ্ধ বেশি ধুন্ধুমার হলেই পৃথিবীতে প্রলয়কাল এসে যাবে। ইতিমধ্যে একবার প্রলয়ের গুজবে এক রাত কেউ ঘুমোয়নি।

সূর্যর গল্প তারা হাঁ করে শোনে। চোখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক ফুটে থাকে। সিরাজউদ্দৌলার তাড়ায় একবার সাহেবরা কলকাতা ছেড়ে জাহাজে করে পালিয়েছিল-এ কাহিনী শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, হুঁকোয় টান দিতে ভুলে যায়। একজন বৃদ্ধ সকলের মুখপাত্র হয়ে বলে, এ কী বলছ তুমি দাদা! শাস্ত্রে আছে কল্কি অবতার হবেন পীত রঙের। সাহেবরা কি পীত রঙের নয়? ওদের মধ্যেই আছেন কল্কি। অবতার-

সূর্য শাস্ত্রের খবর রাখে না। সে আস্তে আস্তে বলে, সাহেবরা এক হয়ে কাজ করতে জানে, আমরা জানি না। নইলে আমরা এ-দেশের তেত্রিশ কোটি লোক যদি সবাই মিলে একটা হাতের ধাক্কা দিই তা হলেই সব ক'টা ইংরেজ সমুদ্রে ডুবে মরতে পারে।

বৃদ্ধটি অদ্ভুত চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে আসর ছেড়ে উঠে চলে যায়। সূর্য তবু হাল ছাড়ে না। অন্যদের আবার বোঝাবার চেষ্টা করে। এই লোকগুলোকে কিছুটা হাতে রাখা দরকার। আসল লড়াইয়ের সময় যে এদের কাছ থেকে খুব একটা সাহায্য পাওয়া যাবে, সূর্য সে রকম আশা করে না। কিন্তু এদের অন্তত নিরপেক্ষ করা দরকার। এর আগে অনেক বার দেখা গেছে যে পুলিশের তাড়া খেয়ে বিপ্লবীরা যখন পালাতে চেষ্টা করে, তখন সাধারণ গ্রামবাসীরাই তাদের ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

মাঝে মাঝে তমোনাশ ডাক্তারের দলের ছেলেরা তাকে ডাকতে আসে। কখনও তাদের সঙ্গে থাকে ডাক্তারের নিজের লেখা চিঠি-সূর্য নানা ছুতো করে কাটিয়ে দেয়।

তার আর একটি কাজ লক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণাকে লেখাপড়া শেখানো। প্রথমে এটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার ছিল, ক্রমশ তারা মনোযোগী হয়। সূর্য দেখে, এদের সহজাত বুদ্ধি অন্য কারওর থেকে কম নয়, লেখাপড়ার সুযোগ পেলে এরা যে-কোনও শহরের মেয়ের মতনই শিখতে পারত।

বড় মেয়েটি, যার নাম লক্ষ্মী, তার গায়ের রং পুকুরের শ্যাওলার মতন। চামড়ায় মসৃণতা আছে। তার টানা টানা বড় বড় দুটি চোখ হঠাৎ শহরে আনলে বোকা বোকাই মনে হবে কিন্তু সেই প্রান্তর-মধ্যবর্তী মাটির বাড়ির আঙিনায় তারাময় আকাশের নীচে সেই চোখ

স্নিগ্ধ সরল মনে হয়। সূর্যর সৌন্দর্যপিপাসু দৃষ্টি ওর মধ্যেই অনেকখানি রূপ আবিষ্কার করে ফেলে এবং রাত্তিরবেলা পুকুরে আঁচাতে যাবার সময় সে যখন লক্ষ্মীর পিঠে হাত রেখে হঠাৎ বলে, তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে–তখন আসলে সে কোনও মিথ্যে কথা বলে না। সেই রাত্রি, ঝিঁঝির ডাক ও নিমপাতার হাওয়ার মধ্যে এক পঞ্চদশ বর্ষীয়া গ্রাম্য কিশোরী মুহূর্তে অপরূপা হয়ে উঠতে পারে। এ-মুহূর্তটির আলাদা কোনও মূল্য অনেকেই দেয় না, কেউ কেউ দেয়। লক্ষ্মীর ছোট্ট জীবনে এ রকম কথা কেউ কখনও বলেনি, বিশেষত তাদের বাড়িতে যে ছদ্মবেশী রাজকুমারটি অতিথি হয়ে আছে, তার মুখে এই কথা শুনে সে কেঁপে ওঠে লজ্জায়, এক ছুটে পালিয়ে যায় পুকুরঘাটে।

সূর্যর আচমকা মনে পড়ে যায় শ্রীলেখার কথা। ক্রুদ্ধ অজগরের মতন সে এদিক-ওদিকে তাকায়, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়, যেন তার পা মাটিতে গেঁথে গেছে। এই নির্জন গ্রাম্য নিশীথে একবার শ্রীলেখার নাম ধরে প্রচণ্ড ভাবে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে তার। শ্রীলেখা তাকে বড় দুঃখ দিয়ে গেছে। সূর্যর হাতে এখন অনেক কাজ, তার মধ্যে হরকুমারের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই অগ্রগণ্য; নইলে সে শ্রীলেখাকে অত সহজে ছেড়ে দিত না।

একদিন সন্ধ্যা থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল, মাঝ রাতে চেপে বৃষ্টি এল। সূর্য যে-ঘরে শোয়, সে-ঘরের চাল দিয়ে টিপটিপ করে জল পড়ে। সূর্য প্রথম কয়েক বার বিছানাটা এদিক-ওদিক টেনে সরিয়ে নেয়। তারপর দেখা গেল, কোনও দিকেই নিষ্কৃতি নেই। তখন সে সমুদ্রে শয্যা পাতার মতন মনোভাব নিয়ে বিছানাটা ঘরের মাঝখানে রেখেই শুয়ে পড়ে হাত-পা ছড়িয়ে। পাশের গোয়ালঘরের গোরুটাও ভিজছে, তার ঘন ঘন গা ঝটপটানির শব্দ শোনা যায়।

এই সময় দরজার ঝাঁপ ঠেলে লক্ষ্মী ঢুকল ঘরে। নিবিড় বিস্ময়ে বলল, আপনি কি এই জলের মধ্যে শুয়ে আছেন?

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোয় ঝলসে উঠল লক্ষ্মীর মুখউদ্বেগ-মাখা দুটি চোখ, চিবুক দিয়ে জল ঝরছে, যেন নদীর স্রোতে ভেসে-আসা একটা নাম না জানা-ফুল। সূর্য একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। এই আর একটি মুহূর্ত।

বিনা বাক্যব্যয়ে সূর্য বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লক্ষ্মীর কাঁধ দুটো চেপে ধরল। জিজ্ঞেস করল, এত রাত্তিরে তুমি এসেছ কেন? ঘুম ভেঙে গেল?

লক্ষ্মীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তার সারা শরীরে লজ্জা। অবনত মুখে বলল, আমি জেগেই ছিলাম, ঘুম আসেনি।

সূর্য লক্ষ্মীর বুকের কাছে শাড়ির আঁচল চেপে ধরে টান মারতে যাচ্ছিল।

এখন পৃথিবীর কোনও শক্তি তাকে থামাতে পারবে না। এই বৃষ্টির নেশাভরা রাত্রে একটি মেয়েকে নিরালায় দেখলে একটি মাত্র চিন্তাই তার মনে আসে। তার রক্তের গতিবেগ বেড়ে যায়। কিন্তু আর একবার বিদ্যুৎ ঝলকে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাতেই সূর্য থমকে গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত সরিয়ে নিল। এও আর একটা মুহূর্ত। সূর্যর মনে হল, মুখটি বড় অসহায়। এই মেয়েটি সূর্যকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে–এই স্বপ্ন ভেঙে যাবার যাতনা যে কত মর্মান্তিক তা ও জানে না।

সূর্য তাকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি ঘরে যাও। আমি ঠিক থাকতে পারব।

সূর্যর সারা জীবনে এই একবার মাত্র সংযমের পরিচয়। সে দিকবিদিক চিন্তা করে না, ভবিষ্যতে কখনও আর সে এ রকম দুর্বলতার পরিচয় দেয়নি। লক্ষ্মীকে কেন সে ছেড়ে দিল তা সে নিজেই জানে না।

লক্ষ্মী তাকে কিছুতেই ওই চালাফুটো ঘরে থাকতে দিল না, জোর করে নিয়ে এল তাদের ঘরের বারান্দায়। এর দু'দিক খোলা হলেও মাথার ওপর দিয়ে জল পড়ে না পাশ দিয়ে ঝাঁপটা আসে শুধু। সেইখানেই বিছানা পেতে দিল সূর্যর জন্য। বার বার বিছানাপত্র নিয়ে

আসার জন্য উঠোন দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নিজেই বেচারা ভিজে গেল একেবারে। কিন্তু সূর্যর জন্য কিছু একটা করতে পারায় তার জীবন যেন ধন্য। সূর্য শুয়ে শুয়ে সারা রাত ভাবতে লাগল শ্রীলেখার কথা। সে শুনেছে, শ্রীলেখার শ্বশুরবাড়ি খড়্গপুরে। সময় পেলে সে সারা খড়্গপুর শহরটা একবার চষে বেড়াবে।

পরদিন তমোনাশ ডাক্তার নিজেই এলেন এ বাড়িতে। সূর্যকে ডেকে চোখগরম করে রাগত সুরে বললেন, আমি আসতে চাইনি। আমার ইস্ত্রি জোর করে পাঠালেন। তেনার ধারণা, তুমি রাগ করে নিজের বাড়ি থেকে চলে এসেছ। এখানে বেঘোরে মরবে, তাই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

উপেন শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, কেন ডাক্তারবাবু, কী হয়েছে? আমার দাদাটি কোনও অপরাধ করেছেন?

তমোনাশ ডাক্তার বললেন, কোথায় কী করে এসেছেন সে জানার আমার দরকার নেই। এদের আমি ভালো করেই চিনি। গোঁয়ার ডোকরা যত সব। এই একজনের জন্য। কি গ্রামসুষ্ঠু লোক বিপদে পড়তে চাও?

কেন? কেন?

পুলিশ একে ধরতে আসছে, পাকা খবর। আজই ও-বেলায় এসে পড়বে। তারপর পুলিশ কি তোমাকে ছাড়বে? বাড়ি সুষ্ঠু সবাইকে চালান করে দেবে বলে দিচ্ছি।

কেন, ইনি কী করেছেন?

জানো না? এ তো খুনে আর ডাকাতের দলের লোক। স্বদেশি করার নাম করে এইসব করে। আমি এত করে বললাম আমাদের পথে আসতে।

সূর্য বলল, আপনি আমাকে এই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে চান-সেটা আলাদা কথা-কিন্তু এইসব মিথ্যে কথা বলছেন কেন এঁদের।

শোনো ছোকরা! এসব আমি বলিনি, পুলিশের রিপোর্ট। পুলিশ তোমাকে শুধু সন্দেহ করে ধরছে নাবড় বাঁকিতে যে ডাকাতি হয়েছিল, তার সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়েছে। মহকুমা থানায় আমাদের ইনফর্মার আছে, সে পাকা খবর এনেছে।

এসব মিথ্যে কথা।

সত্যি মিথ্যে আমি জানি না। তোমার দলের কে নাকি একজন ধরা পড়ে সব নাম ফঁসিয়ে দিয়েছে।

সূর্য দ্রুত চিন্তা করতে লাগল কে ধরা পড়েছে। ঠিক বুঝতে পারল না। ব্রজগোপালের পক্ষে ধরা পড়া অসম্ভব-তার আগে তিনি আত্মহত্যা করবেন। তা হলে কে?

তমোনাশ ডাক্তার এবার সুর নামালেন। সূর্যর মুখের দিকে অবিচল দৃষ্টি ফেলে বললেন, এই বয়স, এর মধ্যেই পুলিশের হাতে পড়লে একেবারে ছিবড়ে করে দেবে। আমার একটা কথা শুনবে?

বলুন।

এক্ষুনি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও। আমার সঙ্গে চলো। আমার এক ভায়রা থাকে রাজগিরে-সেখানে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে বিশেষ জনমনিষ্যি নেই, কেউ তোমার খোঁজ করবে না, তার কোয়ার্টারে থাকবে-বছর খানেক ডুব মেরে থাকো। আমার ভায়রা ভালো লোক-সে যত্ন করে রাখবে।

সূর্য একটুক্ষণ মাত্র চিন্তা করল। ব্রজগোপালকে কোনও খবর না দিয়ে সে কি এখান থেকে চলে যেতে পারে? দলের সবাই রয়েছে গোপনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে-সূর্য যদি হঠাৎ চলে যায় তা হলে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। সবাই কি ভাববে না যে, সে ভয় পেয়ে পালিয়েছে? বরং জেলে যাওয়ার চিন্তা তার মধ্যে খানিকটা উত্তেজনা জাগায়। জেলখানার অনেক গল্প সে শুনেছে-ভেতরটা কখনও দেখেনি।

মুখ তুলে সে বলল, না, আমার যাওয়া হবে না।

তারপর আধঘণ্টা ধরে তাকে বোঝানোর চেষ্টা হল। তমোনাশ আর উপেন তো সূর্যকে বেশি দিন ধরে চেনেন না–সুতরাং বুঝবেন কী করে যে এ-ছেলে একবার না বললে আবার হা বলানো কত শক্ত।

সূর্য জিদ ধরে রইল, সে এখান থেকে যাবে না। সে বরং গাঁয়ের বটতলায় বসে থাকবে; সেখানে পুলিশ এসে তাকে ধরে তো ধরুক। তা হলেও তার দলের লোক তার সন্ধান পাবে।

শেষ পর্যন্ত উপেন বলল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, মুর্শিদের চর? সেখানে ওনাকে রাখা যাবে না?

ডাক্তার একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, সেখানে ও থাকতে পারবে? খুব সাপখোপের উপদ্রব।

তা বলে কি এনাকে পুলিশের হাতে দেওয়া যায়?

ডাক্তার কম্পিত গলায় বললেন, এরা বেঘোরেই মরতে চায়। তুমি আমি কী করব বলো?

একখানা মাঠ ও খানিকটা জঙ্গল পেরিয়ে সূর্যকে তক্ষুনি নিয়ে যাওয়া হল মুর্শিদের চরে। অনেকখানি জলা জায়গার মধ্যে কিছুটা অংশ উঁচু হয়ে আছে, শর আর নলখাগড়ার। ঝাড় চতুর্দিকে। মাঝে মাঝে গর্ত ও কেঁচোর মাটি তোলা। দুটি ছাতিম গাছ পাশাপাশি। দুই বন্ধুর মতন দাঁড়িয়ে। তার নীচে চারটা খুঁটির ওপর খড়ের চালা, কোনও দেওয়াল নেই। মনে হয়, এইখানে আগে কখনও কেউ থেকেছে। সেইখানে একটা শতরঞ্চি ও বালিশ পেতে দেওয়া হল। উপেন বলল, পুলিশের বাপের সাধ্য নেই, আপনাকে এখান থেকে খুঁজে বার করে। থাকতে পারবেন তো দাদা?

সূর্য ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক আছে। আপনি আমাকে মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যাবেন। ব্রজগোপালদা যদি আসেন–

উপেন বলল, মাঝে মাঝে মানে? আমি রোজ আসব। আপনার খাবার নিয়ে আমাকে আসতে হবে না?

উপেন চলে যাবার পর সূর্য কোমর থেকে রিভলবারটা বার করে হাতে নিয়ে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

৩৬. নীচের তলায় খুটখাট

নীচের তলায় খুটখাট করে আওয়াজ হচ্ছে, বড়বাবু তিনতলা থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, রতন, রতন?

কেউ কোনও সাড়া দিল না। গোটা বাড়িটা অন্ধকার। আলো জ্বালার উপায় নেই, বড়বাবু একটা টর্চ নিয়ে নেমে এলেন নীচে। বাড়িতে আর একটিও জনমনুষ্য নেই, পর পর ঘরগুলো তালাবন্ধ। রতনই একমাত্র সঙ্গী, ঠাকুর ও চাকরের কাজ করে– সে-ছোকরারও মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটানোর স্বভাব আছে। কোথায় নাকি সে যাত্রা শুনতে যায়–এই ব্ল্যাক আউটের মধ্যেও কোথায় যাত্রা হয় কে জানে। বড়বাবু দু'-এক বার ধমক দেওয়ায় সে এখন না বলেই যেতে শুরু করেছে। ছাড়িয়েও দেওয়া যায় না– এখন লোক পাওয়া বড় মুশকিল।

বড়বাবু একতলার ঘরগুলো ভাড়া দিয়েছেন সিভিল সাপ্লাই দপ্তরকে। রাত্রে ওদের কেউ থাকে না। বড়বাবু নীচে এসে দেখলেন, সদর দরজাটা ভেজানো–তালা খুলে বেরিয়ে গেছে রতন। এ রকম ভাবে এত রাত্রে দরজা খুলে রাখা যায় না চোর-ডাকাতের উপদ্রব ইদানীং খুব বেড়েছে। রতন বাইরেই থাক–তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এত বড় বাড়িতে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই-অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ বড়বাবু নিজেই নিজের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। দোতলার খুটখাট শব্দটা এখন থেমেছে-তবু একবার দেখা দরকার। মাত্র কয়েক মাস আগেও এ-বাড়ি লোকজনে ভরা ছিল, এই সময়টা আড্ডা হত খাবার ঘরে। এখন গোটা কলকাতাটাকেই মৃত শহর বলে মনে হয়।

চাবির তোড়া নিয়ে বড়বাবু একটার পর একটা ঘর খুলে দেখতে লাগলেন। এটাই ছিল প্রিয়রঞ্জনের ঘর-এখন সম্পূর্ণ খালি, কোনও আসবাবও নেই। চিররঞ্জনের ঘরে তবু কিছু কিছু জিনিসপত্র রয়ে গেছে। দেওয়ালে ঝুলছে বাদলের ঘুড়ি আর লাটাই। এগুলো সঙ্গে নেবার জন্য ছেলেটা অনেক কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু মালপত্র বেশি হয়ে যাওয়ায় তাকে নিতে দেওয়া হয়নি। জানলা-দরজা অনেক দিন বন্ধ বলে ঘরের হাওয়ায় একটা গুমোট গন্ধ। মেঝেতে ধুলো জমেছে, তার ওপর সরু সরু দাগ। বড় বড় ইঁদুরের উপদ্রব হয়েছে খুব। তারাই শব্দ করেফাঁকা বাড়িতে সামান্য শব্দও অনেক বেশি মনে হয়। টর্চের আলো ফেলে ফেলে বড়বাবু প্রত্যেকটা কোনা ঘুপচিও খুঁজে খুঁজে দেখলেন।

সূর্যর ঘরে তার জিনিসপত্র সবই ঠিকঠাক রয়েছে, তার বিছানা, তার বইখাতা, আলনায় ঝুলছে জামা-প্যান্ট-ছেলেটা প্রায় কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি। এত অল্প বয়সেই ছেলেটার এত অনাসক্তি। বড়বাবুর আজকাল প্রায়ই মনে হয়, সূর্যর সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। আগে তিনি ছেলের কথা বিশেষ ভাবতেন না-গত কয়েক মাস ধরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে-ওই বয়সে এসে ছেলেটা খুব উদভ্রান্ত, বড়বাবু নিজেও ঠিক ওই রকম ছিলেন।

একসময় বাড়িটা গমগম করত, এখন সবাই চলে গেছে। বড়বাবুর কোথাও যাবার নেই। জীবনটা যদি ফাঁকা হয়ে যায় তা হলে যেখানেই যাও, সবই তো এক রকম।

কোনও ঘরেই কিছু নেই, সুতরাং ইঁদুরেই শব্দ করছে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়বাবু ঘরগুলোর দরজায় আবার তালা লাগিয়ে উঠে এলেন ওপরে। খানিকটা পরেই আবার শুনতে পেলেন সেই রকম খুটখাট খুটখাট আওয়াজ-ইঁদুর বা বেড়ালের চেয়েও বেশি সবল কোনও প্রাণীর উপস্থিতির মতন। বড়বাবু খানিকক্ষণ কান খাড়া করে শুনলেন, কিন্তু গ্রাহ্য করলেন

না। ফঁকা বাড়িতে এ রকম অনেক শব্দই হয়-হয়তো ভূত-প্রেতই আসে, আসুক, আর তো কিছু করছে না তারা।

এতগুলো ঘর খালি থাকা সত্ত্বেও বড়বাবু তিনতলায় নিজস্ব ঘরটা ছাড়েননি। রতন কখনও সারা রাত বাইরে থাকলে তিনি নিজেই ভোরবেলা এখানে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে চা তৈরি করে নেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত না হলে ঘুম আসতে চায় না-আবার ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরে। বড়বাবু বালিশে আধো-হেলান দিয়ে বই খুলে বসলেন। ঘরের সমস্ত জানলা বন্ধ, আলোয় ঠুলি পরানো সামান্য আলোর রশ্মি বাইরে গেলেই এ আর পি'র ছেলেরা হুইল দেয়, চঁচামেচি করে। হাতিবাগানের পর খিদিরপুরে আর একবার এলোপাথাড়ি বোমা ফেলে জাপানিরা চুপ। করে গেছে।

বড়বাবুর সময় আর কাটতেই চায় না। সারা দিনটা এখন প্রায় তিনি বাগবাজারের অনাথ আশ্রমেই কাটান। তত্ত্বাবধায়করা অনেকেই পালিয়েছে-ছেলেগুলোর খুবই দুরবস্থা। যুদ্ধের বাজারে অজস্র চাকরি, বড়বাবু কিছু কিছু ছেলেকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সন্ধ্যার পর তাকে বাড়ি ফিরে আসতেই হয়-এমনিতেই তিনি একটু রাতকানা, এখন এই অন্ধকারের মধ্যেই একা একা রাস্তায় হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব। তারপর সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত এত বড় ফাঁকা বাড়িতে তাকে একা থাকতে হয়। একে একে সবাই যখন চলে যাচ্ছে-তখন এত বড় বাড়ির আর দরকার কী-যুদ্ধ থেমে গেলে তিনি এ-বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। এখন এ বাড়ি কেনার খদ্দের নেই।

একসময় বিরক্ত হয়ে বড়বাবু হাতের বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এত কম আলোয় তার পড়তে অসুবিধে হচ্ছে-তা ছাড়া মায়া ও ইনকাদের সভ্যতা বিষয়ক যে বইটি তিনি পড়ছিলেন, তার লেখক ইনিয়েবিনিয়ে বার বার প্যাগানদের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানিটির তুলনা না করে পারছেন না।

আলো নিবিয়ে বড়বাবু বেরিয়ে এলেন ছাদে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল, আজও জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে আকাশ। ব্ল্যাক আউটের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বড়বাবু কিছুক্ষণ

পায়চারি করলেন অন্যমনস্ক ভাবে, তারপর ছাদের এক কোণে এসে থেমে গেলেন। কার্নিশ থেকে একটা অশখের চারা উঠেছে। কিছু দিন আগে একবার এখান থেকে একটা অশথ গাছ কেটে দিয়েছিলেন কিন্তু এই গাছ বড় জেদি আবার উঠেছে মাথা ফুড়ে। বাড়িটা এমন কিছু পুরনো নয়-তবু কি এবা টের পেয়ে গেছে যে এটার পোড়ো বাড়ির দশা হতে আর দেরি নেই!বড়বাবু হাত দিয়ে টেনে অশথ গাছটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বয়স অনেক হল, এখন আর হাতে তেমন জোর পান না-তা ছাড়া এ-গাছগুলোর শিকড়ে সাঙ্ঘাতিক জোর।

বয়স অনেক হল, এবার কোনও একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। যেতে হবেই, মায়া বাড়িয়ে তো আর লাভ নেই। দুঃখ করারও কিছু নেই তাতে। অনেকগুলো বছর তো কাটল। জন্মরাত্রেই যে-ছেলের মা মারা যায়, সেই ছেলের তো বেঁচে থাকার কথা ছিল না। তার বদলে সে পেয়েছে বিশাল একখানা জীবন এবং অনেক কিছু। বড়বাবুর মনে হল এই রকম কোনও রাত্রে যদি তিনি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন-তা হলে কী হবে? দেখবার কেউ নেই, মরতে হবে একা একা। সদর দরজা বন্ধ, রতন ঢুকতে পারবে না। তার মৃতদেহটা পড়ে থাকবে-পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াবে তাঁর চোখে, ইঁদুর-আরশোলারা তার শরীর কুরে কুরে খাবে। শেষ পর্যন্ত সিভিল সাপ্লাই অফিসের লোকেরা যদি কোর্টের ইনজাংকশন নিয়ে দরজা খুলে ঢোকে। এই চিন্তায় বড়বাবু মোটেই ভয় পেলেন না বরং একটু মুচকি হাসলেন। হাসপাতালে গিয়ে ভুগে ভুগে মরার চেয়ে, তিনি তাঁর মৃত্যুটাকে একটু নাটকীয় করে দেখতে চাইছেন।

আকস্মিক ভাবে বুলবুলের মৃতদেহটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। বুলবুল, যার পোশাকি নাম ছিল নাসিম আরা বানু, সূর্যর মা। বুলবুল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। মৃত্যুর পরও বুলবুলের চেহারা একটুও বদলায়নি। ঘুমের থেকেও প্রগাঢ় মৃত্যু তার রূপকে যেন একটা মহিমা দিয়েছিল। অসহ্য সুন্দর ছিল বুলবুল, এ যেন ঘঁচে গড়া মানুষ নয়-আলাদা কোনও শিল্পীর বহু যত্নের সৃষ্টি। মৃত বুলবুলকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন গল্পের সেই স্নো হোয়াইটের মতন, কোনও রাজকুমারের স্পর্শে আবার জেগে উঠবে।

অমরনাথ তাকে আর জাগাতে পারেননি। বুলবুলের হাত ধরে বার বার ঝাঁকানি দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বুলবুল, এ কী করলে, এ কী করলে!

কোনও উত্তর দেয়নি বুলবুল, তার মৃত্যুর কোনও কারণ রেখে যায়নি। বুলবুলের মৃত্যুতেও কাঁদতে পারেননি অমরনাথ, কান্নার চেয়েও আরও বেশি কিছু জমে ছিল বুকের মধ্যে, তাই বুকে অসহ্য ব্যথা। সেই অসহ্য ব্যথায় বার বার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জুল পড়েনি। সূর্যর তখন তিন বছর বয়স, মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে তার কোনও বোধই হল না।

পূর্ণিমাকে ছেড়ে বুলবুলকে ভালোবেসে হয়তো সামাজিক ভাবে একটা অপরাধ করে ছিলেন অমরনাথ কিন্তু এ ছাড়া তার উপায় ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তিনি পরের ঘরে মানুষ, পরের দয়ায় স্নেহে প্রতিপালিত হয়েছেন নিজের রক্তের সম্পর্কের কারোকে দেখেননি কখনও। তবু তিনি হেরে যাননি, মিশে যাননি সাধারণ ম্যাটমেটে মানুষের ভিড়ে। প্রথম যৌবনে পূর্ণিমাকে ভালো লেগেছিল, সমাজকে তুচ্ছ করে বিয়ে করেছিলেন পূর্ণিমাকে। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক মানুষের সমাজ অর্থের কাছে। নতজানু। সুতরাং তার অর্থ চাই। প্রথম থেকেই চাকরিবাকরির জন্য লালায়িত না হয়ে ব্যবসায় মন দিয়েছিলেন। একসময় উপার্জন করেছেন অগাধ অর্থ-অমনি সমাজ তাকে। মাথায় তুলে নাচতে চেয়েছে। কেউ তার পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি। বরং উপযাচক হয়ে এসেছে ক্লাবের সভাপতি করতে, শ্রাদ্ধ-বিবাহের অনুষ্ঠানে তার জন্য বিশেষ শ্রদ্ধার আসন।

তবু অমরনাথের মনে হয়েছিল, এরপর কী? মানুষের আর কি কিছু পাওয়ার নেই? তৃপ্তি পাননি কখনও অমরনাথ। পূর্ণিমাও আর তাকে ঠিক সঙ্গ দিতে পারছিল না। প্রথম যৌবনে পূর্ণিমার মনটা ছিল খুব কল্পনাপ্রবণ, অমরনাথকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু অমরনাথের যত অর্থ প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল-ততই সেই মোহে জড়িয়ে পড়ল পূর্ণিমা। বাল্য বয়সে বিধবা হয়ে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছে পূর্ণিমা তাই সামাজিক সম্মান পাবার জন্য একটা কাঙালপনা ছিল তার মধ্যে। একসময় পূর্ণিমা ঘোট ছোট কবিতা রচনা করত-সেসব ছেড়েছুঁড়ে উৎসব নেমন্তন্নে এক-গা গয়না পরে যাওয়াই তার কাছে বেশি

গর্বের ছিল। অমরনাথ পূর্ণিমার এই ছেলেখেলা দেখে তাকে রাশি রাশি গয়না দিয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত আশা মেটে কি না। মেটেনি।

পূর্ণিমার আর একটা দুঃখ ছিল সন্তান সম্পর্কে। একবার একটি মেয়ে হয়ে মারা যায়। আর কোনও সন্তান হয়নি। অমরনাথ ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে বলেছিলেন, পারেনি পূর্ণিমা! পূর্ণিমার সেই দুঃখ ক্রমশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠল-অমরনাথ সরে গেলেন তার কাছ থেকে।

তারপর কিছু দিন সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ করলেন অমরনাথ। নকল সাধু ছেড়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন আসল সাধু। সবাই তাকে বলেছেন, অত প্রশ্ন কোরো না, মেনে নাও। মেনে নেওয়াতেই শান্তি। কিন্তু অমরনাথের প্রশ্ন থামেনি। একসময় বিরক্ত হয়ে ওদের পরিত্যাগ করলেন। গানবাজনার চর্চা করতেন ছেলেবেলা থেকেই, কিছু দিন তাতেই মেতে উঠলেন আবার। সেই সূত্রে বুলবুলের সঙ্গে দেখা।

বুলবুলকে যখন তিনি প্রথম দেখেন, তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ নয়, একটা পুতুল। প্রথম প্রথম বেশি আকৃষ্ট হননি তার দিকে, বরং তার নাচের লয়ে কোথাও কোথাও ভুল হলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। বড়লোকের অশিক্ষিত ছেলেরাই বেশি মাতামাতি করত বুলবুলকে নিয়ে এবং সেই সব হইহল্লাই বেশি ভালোবাসত বুলবুল। একদিন কী কারণে যেন বুলবুলের মনখারাপ ছিল, তার সেই বিষণ্ণ মুখখানা দেখে অমরনাথ যেন একটা ধাক্কা খেলেন। বুলবুলকে এ রকম অবস্থায় কখনও দেখা যেত না-তাই বোঝা যায়নি, বিষণ্ণ হলে তাকে কত সুন্দর দেখায়। অমরনাথের মনে হয়েছিল, যেন রূপের ঝাঁপটা এসে লাগছে তাঁর গায়। তিনি টের পেলেন, রূপেরও একটা পরিশুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে। রূপের সামনে এসে সব সময় যে শুধু রক্ত জ্বলে ওঠে তাই নয়, অনেক সময় মনটা অনেক শান্ত হয়ে যায়, অনুভূতি অনেক সূক্ষ্ম হয়। এই রূপকে নিজের হাতে পাবার একটা তীব্র ইচ্ছে, কারওর কারওর ক্ষেত্রে নিজেকে মানুষ হিসেবে মহত্তর করে তোলার বাসনাও জাগায়। দুবৃত্তরা চায় রূপ কেড়ে নিতে কেউ কেউ চায় তা পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে-যে-যোগ্যতার কোনও মাপকাঠি নেই। অমরনাথ মনস্থির করে ফেললেন।

পূর্ণিমাকে তিনি খোলাখুলিই বলেছিলেন সব। এ-প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে, পূর্ণিমা ইচ্ছে করলে বাপেরবাড়ি গিয়ে থাকতে পারে তাকে তিনি বিষয়সম্পত্তির একটা বড় অংশ দিয়ে দেবেন। পূর্ণিমা রাজি হয়নি। একবার বিধবা ছিল, দ্বিতীয়বার স্বামী-পরিত্যক্তা হতে চায়নি–অন্তঃসারশূন্য সম্পর্ক নিয়েও বাইরের ঠাট বজায় রাখতে চেয়েছিল।

ইয়ারবকশিদের হাত থেকে বুলবুলকে ছাড়িয়ে নিতে কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি অমরনাথকে। সেই কারণেই তাকে এলাহাবাদের বাস তুলে দিয়ে গোয়ালিয়ারে চলে আসতে হয়। কাছাকাছি পাবার পর দেখা গেল, বুলবুল অত্যন্ত জেদি আর অভিমানী, ভেতরটা তার শিশুর মতন অপরিণত। অমরনাথকে পেয়ে সে আর সবকিছু ছাড়ল, নাচের মুজরো নেবার বদলে সে বুঝতে পারল তাকে আরও শিখতে হবে। শেখার শেষ নেই। নিছক নর্তকীর বদলে সে শিল্পী হয়ে উঠল আস্তে আস্তে।

পূর্ণিমা কোনও দিন বুলবুলের মুখ দর্শন করতে চায়নি, কিন্তু বুলবুলের সন্তান হবার পর পূর্ণিমা নিজে থেকে তার বাড়িতে গিয়েছিল ছেলের মুখ দেখতে। তাতে বুলবুল একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। পূর্ণিমা কেনই বা নিজে থেকে গেল, কেনই বা বুলবুল তাতে এত অভিভূত–এটা বুঝতে পারেননি অমরনাথ। সন্তানের ব্যাপারে মেয়েদের মনের এই জটিল গতি কোনও দিন তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। এরপর থেকেই বুলবুল অনেক বদলে গেল–তার সঙ্গে এমন ভাব হয়ে গেল যে, যেন অমরনাথ আর কেউ না। তার সঙ্গে কথা বলারও সময় নেই।

এরপর বুলবুল আবার জেদ ধরল যে অমরনাথ শুধু পূর্ণিমাকে নিয়েই থাকুক, সে অন্য কোথাও চলে যাবে। পূর্ণিমার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে–এতে তার পাপ হবে। অমরনাথ কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না, এককথায় এ রকম ফেরা যায় না। তা ছাড়া, তিনি স্বার্থপর–নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগার মূল্যই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি। বুলবুল তখন ইচ্ছে করে অমরনাথকে আঘাত দেবার জন্য বাড়িতে আসর বসাতে শুরু করল–রাজপরিবার থেকে তার ডাক আসায় সে অমরনাথের কথা অগ্রাহ্য করে সগর্বে চলে গেল

সেখানে নাচতে। অমরনাথ প্রত্যেক দিন তার কাছে যান, বুলবুল তাকে ফিরিয়ে দেয়। নারীর মন বড় বিচিত্র-এ বোঝা সহজ কাণ্ড নয়, অমরনাথ বুঝতে পারলেন না বুলবুলকে। একদিন তিনি সত্যিই বুলবুলের কাছে যাওয়া বন্ধ করলেন, মনস্থির করে ফেললেন যে, এবার বুলবুলকে ভুলে যেতে হবে। আর পাঁচজনের সঙ্গে এক আসরে বসে বুলবুলের নাচ দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এত করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চাইছিল বুলবুল, কিন্তু সত্যিই যে-দিন দেখল অমরনাথ তাকে ছেড়েছে, সে-দিন খুব খানিকটা কাঁদল তারপর ছেলেকে পূর্ণিমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বিষ খেল। যেন একটা ছেলেখেলা। যেন বিষের নাম অভিমান, কেউ এসে তার মান ভাঙাবে। কবরখানার অন্ধকার গহ্বরে চলে গেল বুলবুল।

বড়বাবু সেই নিস্তব্ধ বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। যেন এই মৃতের শহরে তিনি একা জেগে আছেন। সারা জীবন তিনি মানুষের সঙ্গ চেয়েছিলেন, ঈশ্বরকে চেয়ে নিরালা হয়ে যাননি-তবু সবাই একে একে তাকে ছেড়ে চলে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে বললেন-একটা জীবন কেটে গেল, তবু আমি মানুষের। জীবনের মর্ম কী তা বুঝতে পারলাম না। সত্যিই কি কোনও মর্ম আছে, না কোনওক্রমে দিন কাটিয়ে যাওয়াই সব?

৩৭. বিয়ের পর শ্রীলেখা

বিয়ের পর শ্রীলেখা প্রায় একটা অকুল সমুদ্রে এসে পড়ল। এর আগে সে কখনও মা বাবাকে ছেড়ে থাকেনি, বিয়ের পরই তাকে একেবারে কলকাতা ছাড়তে হল। খড়্গপুর শহরের প্রান্তে তার শ্বশুরবাড়িটি বেশ বড় এবং মানুষজনে ভরতি। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ভাসুর, ননদ তাদের ছেলেপুলে, ঝি, চাকর, মালি সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড। নতুন বউ হিসেবে কয়েক দিন সে একটু আলাদা খাতিরত্ন পাবার পর সেই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এ বাড়ির লোকদের স্বভাব সর্বক্ষণ হুকুম করা। নতুন বউ, ভোয়ালেটা নিয়ে এসো তো! বউদি, মশলার কৌটোটা একটু দিন না। কাকিমা, আমার জামাটা একটু ওপর। থেকে এনে দিন-এইসব শুনতে শুনতেই সর্বক্ষণ তাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। শ্রীলেখা সবার হুকুম তামিল করার জন্যই তৈরি-কিন্তু মুশকিল হয় যখন একই সঙ্গে দু'জনের হুকুম হয়। একজন বললে, নীচতলা থেকে শাশুড়িকে ডেকে দিতে, আর একজন বললে, ওপর থেকে বাগানের গেটের চাবিটা এনে দিতে-তখন কোনটা আগে করতে হবে শ্রীলেখা বুঝতে পারে না।

এর ওপর আছে তার স্বামী। শ্রীলেখা তার মা কাকিমার মুখে শুনে শুনে বুঝে নিয়েছে যে, একান্নবর্তী পরিবারের বউরা দিনেরবেলা স্বামীর সঙ্গে দেখা করে না। সেই অনুযায়ী শ্রীলেখা সকালবেলা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পারতপক্ষে আর সেখানে ঢুকতে চায় না। কিন্তু তাকে বার বার আসতে হয়।

শ্রীলেখার স্বামী প্রভাসকুমার মানুষটি বিচিত্র প্রকৃতির। তার শখ হচ্ছে এম এ পরীক্ষা দেওয়া। ইতিমধ্যেই তিনি ইংরেজি ও বাংলায় এম এ পাশ করেছেন, এখন তৈরি হচ্ছেন ঐস্লামিক ইতিহাসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। কী উদ্দেশ্যে এই ডিগ্রি অর্জন, তা কেউ জানে না। না জানুক, তবু প্রভাসকুমারের দারুণ সম্ভম সকলের কাছে। এ বাড়িতে আর কেউ গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত নেই, সেখানে এক ছেলে ডবল এম এ ছাড়িয়ে ট্রিপল এম এ হতে যাচ্ছে। তারপরও প্রভাসকুমার আবার সংস্কৃততে পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে জানিয়ে। রেখেছেন। পড়াশুনোর কারণে প্রভাসকুমারকে বাড়ির কোনও কাজ কখনও করতে বলা হয় না।

প্রভাসকুমারের রোগাটে লম্বা চেহারা, রোগা বলেই তাকে দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি লম্বা দেখায়। গায়ের রং এত ফরসা যে মনে হয় স্বচ্ছ। খাঁটি সোনার ফ্রেমের গোল চশমা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল। মানুষটি শৌখিন, ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি ছাড়া আর কিছু পরেন।। সকালবেলা থেকেই সেজেগুঁজে থাকেন অথচ ঘর থেকে বেরোতে দেখা যায় কদাচিৎ। তার চা-জলখাবার এ-ঘরেই আসে। টেবিলে বহু বইপত্র ছড়িয়ে প্রভাকুমার।

ছিমছাম ভাবে বসে থাকেন, চোখের দৃষ্টি খোলা গ্রন্থের দিকে স্থির নিবদ্ধ। যখন তার ঘন ঘন হাঁটু দোলে, তখন বোঝা যায়, তিনি কবিতা রচনা করছেন।

হ্যাঁ, প্রভাসকুমার একজন কবি। ভারতবর্ষ ও সচিত্র শিশির পত্রিকায় তার একাধিক কবিতাকণা ছাপা হয়েছে প্রবন্ধ ও গল্পের পাদদেশে। কলেজে পড়ার সময়েই তিনি বাতাসে কার ব্যাকুলতানামে একটি পাতলা কাব্যপুস্তক নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আড়াই লাইন শুভেচ্ছাবাণীও তার কাছে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। প্রভাসকুমারের গোপন বাসনা কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করা। ইদানীং অবশ্য কাব্যলক্ষ্মী ও শ্রীলেখা মিলেমিশে গেছে।

পরীক্ষার পড়া করতে করতে প্রভাসকুমারের মন মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায়, চোখ চলে যায় বাইরে। এখান থেকে দেখা যায় রেললাইন, টেলিগ্রাফের তারে বসে ফিঙে ল্যাজ নাড়াচ্ছে, এইটুকু দৃশ্য দেখেই প্রভাসকুমারের হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে যায়। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি ডাকলেন, শ্রীলেখা-!

প্রভাসকুমার কখনও উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন নাতাঁর গলার স্বর একটু দূর থেকে শোনা যায় না-সেই জন্যই কাছাকাছি একজন বাচ্চা চাকর থাকে সব সময়। সে শুধু প্রভাসকুমারের ফুটফরমাজ খাটার জন্যই নিযুক্ত। সে তক্ষুনি ছুটে চলে যায়, শ্রীলেখাকে ডেকে আনে। সারা দিনে এ রকম দশ বারো বার।

প্রভাসকুমারের টেবিলের কাঁচের নীচে একটি লম্বা কাগজে এই কয়েকটি শব্দ পর পর লেখা আছে:

রেখা
শেখা
দেখা
ব্যাঁকা
একা

কেকা
খাঁ খাঁ
জ্বলেখা
ঠেকা
আঁকা

বলাই বাহুল্য, এই শব্দগুলি শ্রীলেখার নামের সঙ্গে মিল দেবার জন্য। কবিতা রচনার সময় যদি হঠাৎ মিল না মনে আসে সেই জন্য আগে থেকেই এই ব্যবস্থা। এই তালিকা ক্রমেই বাড়ে।

শ্রীলেখাকে ডাকার পরেই প্রভাসকুমারের হাঁটুর দোলানি বেড়ে গেল। মোটা বাঁধানো খাতায় তিনি কবিতা রচনায় মগ্ন, এক এক বার তাকাচ্ছেন দরজার দিকে, অত্যন্ত উত্তেজনায় তার কপালে ও ওষ্ঠের ওপরে ঘাম জমে যাচ্ছে।

শ্রীলেখা লজ্জাবনত মুখে দরজার কাছে দাঁড়াল। শাশুড়ি-ননদ-ভাজদের মধ্যে গিয়ে চাকর তাকে বলে যে দাদাবাবু ডাকছেন, তখন লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। অন্যরা মুখ টিপে হাসে আর তাড়া দেয়, শিগগির যাও! দেরি হলে উনি রাগ করবেন!

প্রভাসকুমারের বয়স শ্রীলেখার অন্তত দ্বিগুণ। সেই জন্যই শ্রীলেখা এখনও ওঁর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে না। ব্যবহারের জড়তা কাটে না কিছুতেই।

প্রভাসকুমার মুখ তুলে বললেন, শ্রীলেখা, আজকের সকালটা কী সুন্দর?

শ্রীলেখা চুপ করে রইল। প্রভাসকুমার জানলা দিয়ে আকাশ, রেললাইন ও ভূ-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আবার বললেন, আজকের দিনটা কী সুন্দর!

শ্রীলেখা অস্ফুট গলায় বলল, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ।

কিছু বলবেন?

না।

আমি তা হলে এবার যাই?

তুমি কী করছিলে?

আমি জলখাবারের লুচি বেলছিলাম।

প্রভাসকুমার ভুরু কোঁচকালেন। এমন সুন্দর সকালবেলা খাদ্যদ্রব্যের মতন গদ্যময় ব্যাপারের নাম উচ্চারণ তার পছন্দ হয় না। তিনি বললেন, এদিকে এসো। আমার কাছে। এসে একটু বোসো

মাকে বলে আসি?

বলতে হবে না। পরে যেয়ো। বার বার তোমাকে ডাকি কেন জানো? তোমার নামটা উচ্চারণ করতেই ভালো লাগে। আহা, কী সুন্দর নাম।

লজ্জায় শ্রীলেখার মুখ অরুণবর্ণ হয়ে গেল। চিবুক ঠেকল বুকে। এসব কথায় কী উত্তর দিতে হয় সে জানে না, কখনও তো এ রকম কথা শোনেনি।

প্রভাসকুমার কোঁচার খুট দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললেন, কী সুন্দর তোমার ভুরু দুটি। যেন দুটি পাখির ডানা- কালিদাস কী বলেছেন জানো?

বিয়ের পর এই চার মাসের মধ্যে শ্রীলেখা এইসব কথা কত বার যে শুনেছে তার ইয়ত্তা নেই-এমনকী কালিদাসের সংস্কৃত শ্লোকও তার মুখস্ত। সে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রভাসকুমার উঠে এসে শ্রীলেখার কাছে দাঁড়ালেন। ক্যামেরাম্যানের ভঙ্গিতে বললেন, একটু হাসো, একটু কথা বলল।

কী বলব?

মন যা চায়। এমন সুন্দর সকালবেলা, মনের মধ্যে কি কোনও কলগুঞ্জন হয় না? আহা জয়দেব লিখেছেন

বদসি যদি কিঞ্চিদপি
দন্তরুচি কৌমুদি
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম
ফুরদধরসীধরে
তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্!

শ্রীলেখা আমি চকোর, আমি চকোরের মতন চেয়ে আছি তোমার মুখের দিকে, একটু হাসো।

প্রভাসকুমার শ্রীলেখার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকলেও তার অঙ্গ স্পর্শ করছেন না। দিনেরবেলা ওসব না-এ-সম্পর্কে প্রভাসকুমারের কঠোর নিয়ম আছে। তা ছাড়া, তিনি কবিমানুষ, রূপসুধা দু'চোখ দিয়ে পান করলেই তার মন ভরে যায়।

খানিকটা বাদে শ্রীলেখা বলল, আমি এবার যাই?

প্রভাসকুমার উদাস ভাবে বললেন, আচ্ছা যাও। লুচির সঙ্গে একটু ছানা পাঠিয়ে দিয়ো, আমি বেগুন ভাজাটাজা খাই না।

রাত্তিরেও প্রভাসকুমার শ্রীলেখাকে প্রায় ঘুমোতেই দেন না। তার নিজের ঘুমের প্রয়োজন খুব কম-তা ছাড়া, পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে, কিংবা কাব্যরচনার সময় যখন। তিনি খুবই

ভাবে বিভোর হয়ে যান–তখন খানিকটা করে ঘুমিয়ে নেন। রাতের একটানা ঘুম তার না হলেও চলে। এদিকে, সারা দিন খাটাখাটনি করে রাত্তিরে বিছানায় শুলেই শ্রীলেখার চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। দুপুরেও সে ঘুমোবার একটুও সুযোগ পায় না। কিন্তু প্রভাসকুমার শ্রীলেখার ঘুম দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। এমন জ্যোৎস্না উঠেছে, এই সময় কেউ ঘুমিয়ে নষ্ট করে? শ্রীলেখার হাত ধরে তিনি নিয়ে আসেন বারান্দায়, আকুল ভাবে বলেন, ওঃ, দেখো দেখো, পুকুরের জলে চাঁদের আলো পড়েছে, কী অপূর্ব, কী অপূর্ব!

শ্রীলেখা ঘুমে আঠা হয়ে আসা চোখে তাকিয়ে থাকে সে দিকে। এক এক সময় তার দৃষ্টিভ্রম হয়। মনে হয় যেন মাঠের মধ্যে কে একজন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, তারই দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। কখনও মনে হয়, এগিয়ে আসছে কে যেন। ভালো করে চোখ কচলে দেখে বোঝা যায়, কেউ না। নীরব বৃক্ষের ছায়া, নিথর জল–যা আবহমান কাল ধরে একই রকম।

প্রভাসকুমার আঙুল দিয়ে শ্রীলেখার থুতনিটা উঁচু করে তুলে বলেন, ওই দেখো, দেখো, চাঁদ তোমায় দেখছে। এই এক চাঁদ, ওই এক চাঁদ। শ্রীলেখা, একটু হাসো তোমার হাসিও জ্যোৎস্নার মতন।

হঠাৎ অকারণেই শ্রীলেখার চোখে জল এসে যায়। দৌড়ে সে চলে যায় শয়নঘরে, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। প্রভাসকুমার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন না। পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন। যুবতী মেয়ের কান্নাও সুন্দর লাগে তার চোখে, এ থেকেও তিনি কবিত্বের উপাদান খুঁজে পান। শ্রীলেখার নামের সঙ্গে অশ্রুরেখার মিল। তক্ষুনি তাঁর মাথায় আসে।

বিয়ের চার-পাঁচ মাসের মধ্যেও শ্রীলেখা এক বারও বাপেরবাড়ি যায়নি। প্রভাসকুমার কিছুতেই ছাড়তে চান না। শ্রীলেখা-বিহনে তিনি একটি দিনও থাকতে পারবেন না– একথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। আগামী বছর পরীক্ষা উপলক্ষে তিনি যখন। কলকাতা যাবেন, তখন শ্রীলেখা তার সঙ্গে যাবে, এই রকম সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

কয়েক দিন পর আকস্মিক ভাবে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল। দেওর, ভাসুর, ননদরা দল বেঁধে চলে গেল পশ্চিমে হাওয়া খেতে, প্রভাসকুমারের পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে তিনি গেলেন না। শ্বশুর গেলেন ওড়িশায় বিষয়সম্পত্তির তদারক করতে। বাড়িতে শুধু স্বামী আর শাশুড়ি। তখন আবার শ্রীলেখার হাতে অখণ্ড অবসর। প্রভাসকুমারের ডাক এলে যেতেই হয়, একটু ফাঁক পেলেই পালিয়ে আসে। শ্রীলেখা তার অনুভূতি দিয়ে বুঝেছে যে তার স্বামীটি মোটামুটি ভালোমানুষ, অন্তর দিয়েই তাকে ভালোবাসে, এতখানি ভালোবাসা পেলে মানুষের অভিভূত হয়ে পড়ার কথা-অথচ যেন শ্রীলেখার অস্বস্তি কিছুতেই কাটে না।

প্রভাসকুমার বিশ্বসংসার সম্পর্কে নিরাসক্ত, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে কোনও খবরও রাখেন না, দেশের কোথায় কী ঘটেছে সে সম্পর্কেও আগ্রহ নেই। কোনও দিন উলটে দেখেন না খবরের কাগজ, বাড়িতে রেডিয়ো চললে তার মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটে।

সময় কাটাবার জন্য শ্রীলেখা চুপি চুপি রেডিয়ো শোনে। ছোট দেওরের ঘর এখন ফাঁকা, সেই ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে সে রেডিয়োর কাটা ঘোরায়। রেডিয়োর নানা রকম কণ্ঠস্বর ও সংগীতের মধ্যে সে নিজের সঙ্গী খুঁজে পায়। কেন কে জানে, সব সময় তার একটু একটু মন খারাপ থাকে। এক এক রাত্রে রেডিয়োর কাটা ঘোরাতে ঘোরাতে আচমকা শোনা যায় সুভাষ বসুর গলার আওয়াজ। শ্রীলেখার সমস্ত রোমকূপ শিউরে ওঠে, ঝিমঝিম করে শরীর। মনে হয় যেন বহু বহু দূর থেকে ভেসে আসছে এই গলা, বড় তেজি ও নিশ্চিন্ত-একটাই সুর ফুটে বেরোচ্ছে, আমি আসছি, আমি আসছি, আমি আসছি। অত্যধিক আবেগে শ্রীলেখার কান্না পেয়ে যায়। এইসব সময়ে তার মনে পড়ে সূর্যদার কথা। তার মনের মধ্যে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সুভাষ বসু ও সূর্যদার ছবি এক হয়ে আসে। এর ফলে নিজেই সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সবচেয়ে বেশি। সূর্যদার ছবিটা মুছে দিয়ে সে আবার রেডিয়োতে কান চেপে ধরে শুনতে পায়, আমি আসছি, আমি আসছি, আমি আসছি। সূর্যদা কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি? ওই সব ছেলে বেশি দিন বাঁচে না, অত যাদের জেদ-পৃথিবী সহ্য করে না তাদের।

ইদানীং একটা নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছে শ্রীলেখার। হঠাৎ হঠাৎ সে চমকে উঠে তাকায় পেছন দিকে। কেন যেন তার মনে হয়, কেউ যেন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ যেন তার কাঁধে রাখার জন্য হাত উদ্যত করেছে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখ। সদর দরজায় কোনও আওয়াজ হলেই সে ছুটে যায়। বাগানের গেটে কাঁচ করে একটু শব্দ হলেই সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কোনও দিন ভর দুপুরে সে ছাদে উঠে উদভ্রান্তের মতন চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ আসছে কিনা। কেউ আসে না।

৩৮. মুর্শিদের চরে কয়েক দিন

মুর্শিদের চরে কয়েক দিন থাকার পর সূর্য বিরক্ত হয়ে উঠল। শুধু একঘেয়েমির জন্যই নয়, তার মনে হতে লাগল, সারা দেশে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে-সে সব কিছু থেকে বাদ পড়ে রইল। এই রকম পলাতক জীবন তার কত দিন চলবে? ব্রজগোপাল বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কিন্তু নির্দেশ যদি শেষ পর্যন্ত না আসে? যদি উনি নিজেই ইতিমধ্যে ধরা পড়ে থাকেন? সূর্য কি তবু ক্যাসাব্লাঙ্কার মতন অপেক্ষা করে যাবে?

তমোনাশ ডাক্তারের খবর পাকা ছিল, ইতিমধ্যে একদিন পুলিশ উপেনের বাড়ি হানা দিয়ে গেছে। তছনছ করে দিয়ে গেছে বাড়িঘর, উপেনকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মারধর করে ছেড়ে দিয়েছে একদিন পর। হাসিখুশি মানুষটা চুপসে গেছে খানিকটা, কিন্তু ভেঙে পড়েনি-এখনও সূর্যকে খাবার পাঠায়।

এই ব্যবস্থাটা মোটেই পছন্দ হয় না সূর্যর। অত দূর থেকে তার জন্য কেউ কষ্ট করে খাবার নিয়ে আসবে-এটা ভাবতেও তার অস্বস্তি হয়। অথচ এখানে থাকতে গেলে আর কোনও উপায়ও তো নেই। দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য হ্যাংলার মতন প্রতীক্ষা করে কখন খাবার নিয়ে লোক আসবে। শুধু খাবারের জন্যই নয়, কথা বলার একজন

মানুষের জন্য। যত স্বল্পভাষী মানুষই হোক, সারা দিনে একবার অন্তত কারওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

সারা দিন এই জংলা জলাভূমিতে সূর্য একা একা ঘুরে বেড়ায় আর বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলে। এখানে তার সঙ্গী কিছু পোকামাকড়, ইঁদুর আর হঠাৎ একটা সাপ। সাপটাকে সে বারকয়েক দেখেছে কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছোবার আগেই সেটা পালিয়েছে। সাপটাকে সে যে ঠিক মারতে চায় তাও নয়, তার উদ্দেশ্য সাপটার গতিবিধি লক্ষ রাখা। সময় কাটাবার জন্য সে সারা দিন ধরে সাপটাকে খোঁজে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্তগুলো বড় করে। পিঁপড়ের সারি দেখলে সে ওদের পাশে পাশে হামাগুড়ি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যায়, দুটি গুবরে পোকাকেও সে প্রায়ই অনুসরণ করে।

বৃষ্টি ভিজে, রোদে পুড়ে তার গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। নরম কচি ঘাসের মতন প্রথম বারের দাড়ি গজিয়েছে তার গালে, তার মাথা-ভরতি ঘন চুলে এখন আঠার মতন জট। এর মধ্যে কোনও অসুখবিসুখ হয়নি তার, কিন্তু একটা উপদ্রব দেখা দিয়েছে। সারা গায়ে চুলকুনি। ওঃ, কী অসহ্য চুলকুনি, রোদ লাগলেই চিড়বিড় চিড়বিড় করে, মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে তখন ঘ্যাস ঘ্যাস করে গোটা শরীরটা চুলকোতে হয়। এক এক সময় সূর্য আর সইতে পারে না–তখন শ্যাওলাভরা অগভীর জলে সে শরীর ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। তখন তাকে মনে হয় অদ্ভুত কোনও জলজ প্রাণী। জলের মধ্যে চুলকুনির তেজ কম, খানিকটা সাময়িক আরাম হয়, এবং ওই নোংরা জলের জন্যই গায়ের চুলকুনির রোগটা আরও বেড়ে যায়।

এখানে যে কখনও কোনও লোক আসে না এমন নয়। গোরু ছাগল চরাতে চরাতে দু'-একটি রাখাল মাঝে মাঝে চলে আসে। একদিন তিনটি ছেলে সম্ভবত স্কুল পালানো, এখানে এসেছিল সিগারেট খেতে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, বাইরের খবর জানার জন্য সূর্যর মন আকুলিবিকুলি করেছে। কিন্তু ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে সে বুঝতে পেরেছে, তার এখানে আত্মগোপন করে থাকার ব্যাপারটা কোনক্রমেই বাইরে ছড়িয়ে পড়া সমীচীন নয়। সূর্যকে তখন লুকিয়ে পড়তে হয়। নিঃশব্দে চলাফেরায় সে এখন অভ্যস্ত, পায়ের তলায় শুকনো

পাতা পড়লেও শব্দ হয় না। অনেক সময় এমন হয়েছে, দু'জন রাখাল মাটির ঢিবির ওপর বসে গল্প করেছে, আর খুব কাছেই কোনও গাছের আড়ালে বন্যপ্রাণীর মতন লুকিয়ে আছে সূর্য, ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছে।

উপেনের বাড়িতে পুলিশের হামলা হবার পর দেড়দিন কোনও খাবার আসেনি সূর্যর জন্য। অত ডামাডোলের মধ্যে সূর্যকে খাবার পাঠানো হয়ে ওঠেনি। সেই সময়টা সূর্য যা খিদেয় কষ্ট পেয়েছিল, সে রকম অসম্ভব কষ্ট সে জীবনে আগে কখনও পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। ছত্রিশ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা এমন কিছুই না কিন্তু যেখানে খাওয়াটাই সারা দিনের একমাত্র কাজ, যেখানে প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি আসবে, এই বুঝি আসবে-সেখানে একষ্টের তুলনা নেই। কারাগারের বন্দিজীবনের চেয়েও বেশি, কারণ এখানে দেওয়ালটা নিজের তৈরি করা। বনতুলসী গাছগুলোতে এক রকম ছোট ছোট ফল হয়-খিদের জ্বালায় সূর্য সেইগুলো খেয়েছে, মুঠো মুঠো তেঁতুলপাতা চিবিয়েছে, মাঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা হয়ে গেছে তার।

তারপর একসময় লক্ষ্মী এল খাবারের ঝোলা হাতে নিয়ে। তাকে দেখে আনন্দিত হবার বদলে রেগে আগুন হয়ে উঠল সূর্য। আশা করতে করতে সীমানাটা পার হয়ে যাবার ফলে এই রাগ। সূর্যর ইচ্ছে হল খাবারের ঝোলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, লক্ষ্মীকে খুন করে মাটিতে পুঁতে রাখে। কাছে আসার পর লক্ষ্মীর মলিন মুখখানা দেখে সে থমকে গেল। তখন লক্ষ্মী জানাল যে, তার বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ছেড়ে না-দেওয়া পর্যন্ত তাদের বাড়িতেও কেউ কিছু খায়নি।

তারপর থেকে কোনও দিন লক্ষ্মী এসেছে, কোনও দিন তার ভাই। অতখানি পথ পার হয়ে তারা আসে, লোকের চোখ আড়াল করে-এজন্য সূর্যর মমতা হয়। তার ছটফটানি বাড়ে। একটা কিছু করা দরকার-এ রকম ভাবে আর চলে না।

একদিন লক্ষ্মী একটা বলের মতন গোল সাবান নিয়ে এল সূর্যর জন্য। সাবানের চল নেই তাদের বাড়িতে, এটা জোগাড় করার জন্য লক্ষ্মীকে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে।

চুলকুনির ওষুধ হিসেবে খানিকটা কবিরাজি মলমও এনেছে। সাবানটা দেখে প্রথমে সূর্যর মুখে উপহাসের হাসি এসেছিল, তারপর কী ভেবে সে খুব আগ্রহের সঙ্গে সেটা রেখে দিল।

সূর্যর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মী বসে থাকে, কেন না সে বাসনপত্র নিয়ে যাবে। তার পরেও সে বসে থাকতে চায়। মদির আলস্য খেলা করে তার চোখেমুখে, গাছে হেলান দিয়ে বসে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সূর্যর দিকে। তার কচি কিশোরী হৃদয় কোনও বিপদ বরণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এখানে অদ্ভুত নির্জনতা, শেষ জুলাইয়ের চড়া রোদ, গাছের ছায়ায় বসেও ঘন ঘন ঘাম মুছতে হয়, মাঝে মাঝে পাতার শব্দে ঝিরঝিরে হাওয়া– এই সবকিছুর মধ্যেই যেন কিছু একটা ছমছমানি আছে।

সূর্যর কিন্তু ওসব কোনও দিকে মন নেই। সেই যে একদিন মধ্যরাত্রে সে লক্ষ্মীর কাঁধ চেপে ধরার পরেও ছেড়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে সে আর লক্ষ্মীকে মেয়ে বলেই মনে করে না। সে সহজ সাধারণ ভাবে তার সঙ্গে কথা বলে, বকুনি দেয়, কিন্তু শরীরের কথা মনে স্থান দেয় না।

লক্ষ্মী চলে যাবার পর সূর্য বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খুলে ফেলল ধুতি, গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার সব–এখানে উলঙ্গ হয়ে থাকলেও দেখবার কেউ নেই। তার শার্টটা লুকোনো ছিল একটা ঝোঁপের মধ্যে সেটাকেও বার করে এনে সবকটাকে সাবানকাঁচা করল অনেকক্ষণ ধরে যত্নের সঙ্গে। মাথার চুলে সাবান ঘষে, সারা শরীরে সাবান মেখে স্নান করল। তারপর জামাকাপড়গুলো মেলে দিয়ে নিজের শরীরটাও শুকোতে দিল ঘাসের ওপর শুয়ে। তার নগ্ন শরীর এখন অনেকটা পরিচ্ছন্ন। রিভলবারটা পেটের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সেই অবস্থায়।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর। জামাকাপড় পরে ভদ্রস্থ হল আবার। ঘুমন্ত অবস্থায় কয়েকটা লালপিঁপড়ে কামড়ে গেছে, ফুলে উঠেছে কয়েক জায়গা। জামাকাপড়গুলো দোমড়ানো মোচড়ানো হলেও পরিষ্কার হয়েছে বেশ। যেটুকু সাবান অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু একটা কঞ্চির

মাথায় গেঁথে কঞ্চিটা সোজা করে পুঁতে রাখল মাটিতে। আর একটা কঞ্চি দিয়ে তার সামনে মাটির ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখল, চলে যাচ্ছি। ভোর হবার আগেই সে বেরিয়ে পড়ল।

সূর্যর যাবার ইচ্ছে ছিল খগপুরে, পথ ভুল করে চলে গেল অন্যদিকে। তার ধারণা হয়েছিল, বিপ্লব বা লড়াই থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে-এখন দরকার খগপুরের মতন কোনও বড় জায়গায় যাওয়া। তা ছাড়া খগপুর নামটা তার মাথার মধ্যে গেঁথে আছে। কিন্তু পথ ঠিক করতে না পেরে এসে পড়ল বেলদা-পটাশপুরের দিকে। সঙ্গে তার কিছু টাকাপয়সা গোড়া থেকেই ছিল, এতদিন খরচের সুযোগ হয়নি- এবার সে পটাশপুর বাজারের কাছে একটা ভাতের হোটেলে ঢুকে অনেকদিন বাদে মাংস ভাত খেল।

এখানকার লোকের বাংলা উচ্চারণে একটা আলাদা টান আছে। সূর্য কথা বলতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে যে সে স্থানীয় লোক নয়। সুতরাং সে নিজে কিছু না বলে কান খাড়া করে শুনতে লাগল অন্যদের কথা। যুদ্ধের খবর সম্পর্কে স্থানীয় লোকের যে খুব একটা মাথাব্যথা আছে তা মনে হয় না। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোসের নামও শোনা যায় না- সবাই জিনিসপত্রের দাম বাড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত এবং দেশের সর্বত্র যে টিকটিকি ঘুরছে এবং যাকে তাকে যখন তখন থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে-এটাও একটা বলবার মতন ঘটনা।

এদিকে আবার কলেরার প্রকোপ চলছে। এবং কলেরা ডাকিনি বিতাড়নের জন্য চলছে এক জায়গায় দিবারাত্র অবিরাম হরি সংকীর্তন। দিঘির পারে একটা শামিয়ানা খাঁটিয়ে একদল লোক ঢোল-মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে অবিরাম চেঁচিয়ে যাচ্ছে, তাতে কান ঝালাপালা হলেও রাত কাটাবার পক্ষে জায়গাটা বেশ সুবিধাজনক। শ্রোতাদের মধ্যে কে। কখন উঠে যাচ্ছে, কে ঘুমোচ্ছে, তাতে কারওর কোনও চিন্তা নেই, পুলিশের চোখ থেকেও এটা নিরাপদ। রাতটা সূর্য সেখানেই কাটিয়ে দিল।

সকালবেলা গেল বাসের খোঁজে। তার সঙ্গে কোনও মালপত্তর নেই, থাকার জায়গা নেই- এ অবস্থায় এক জায়গায় বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেই সন্দেহের উদ্রেক করবে। বাসের

খোঁজখবর নিয়ে সে জানল যে, এখান থেকে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ চলে যাওয়া যেতে পারে বেশ সহজেই এবং তার পক্ষে লুকিয়ে থাকতে হলে ওই জায়গাটাই ভালো হবে। খড়গপুরেও যাওয়া যায় বাস বদল করে। সূর্য অনেক ভেবেচিন্তে খড়্গপুরেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল। এই এক একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে তার জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীও বদলে যাচ্ছে তা সে জানে না। পটাশপুর থেকে সকাল সাড়ে ন'টার বাস না নিলে পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটার সম্ভাবনা ছিল না তার জীবনে।

বাস নারায়ণগড়ে এসে থেমেছে, সূর্য জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ছোলা-মুড়ি কিনছিল, এমন সময় একটু দূরের মুদিখানার সামনে দাঁড়ানো একটি লোকের দিকে তার চোখ আটকে গেল। সূর্যর টিকিট কাটা ছিল আরও দূরের, কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে পড়ল সেখানে। মুদিখানার কাছে গিয়ে লোকটির থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে সে দেখতে লাগল তাকে।

লোকটি গরমমশলা, এলাচ, ইত্যাদির দর করছিল, চিনিও তার দরকার। চিনি বাজার থেকে উধাও হবার জন্য তার মেজাজ খুব গরম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে তাকাল সূর্যর দিকে, কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে গৈল, স্থির চোখে তাকিয়ে রইল, তারপরই হাসিমুখে বলল, আরে, অমর না? চিনতেই পারিনি।'

যোগানন্দ সূর্যকে অমর নামেই জানে। সূর্য প্রতিবাদ করল না। গম্ভীর ভাবে বলল, যোগানন্দদা, আপনি এখানে? আমার ধারণা ছিল, আপনি মরে গেছেন!

যোগানন্দ হা হা করে হেসে বলল, বালাই যাট, এরই মধ্যেই মরব কেন? এখনও কত কিছু বাকি।

এতদিন আপনার কোনও খোঁজখবর পেয়ে–

যোগানন্দ সূর্যর কাঁধে এক চাপড় মেরে বলল, চলো ব্রাদার, আমার বাড়ি চলো, সেখানে সব কথা হবে। কী চেহারাই করেছ, খেতেটেতে পাও না নাকি? এ-দিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

সূর্য শুকনো মুখে বলল, আমার কোনও জায়গা নেই। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

এই কয়েক মাসে সূর্যর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিছুটা শিখেছে বুঝেশুনে কথা বলতে। এখন যোগানন্দর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তৈরি করাই তার দরকার।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে এসে ফাঁকা রাস্তায় পড়ে যোগানন্দ জিজ্ঞেস করল, দাদাদের খবর কী?

সূর্য অপ্রসন্ন ভাবে বলল, আমার সঙ্গে আর কারওর কোনও যোগাযোগ নেই। আমাকে ওরা দল থেকে বাদ দিয়েছে।

কেন?

আমি একটা অ্যাকশানে যেতে পারিনি।

কেন, যাওনি কেন, ভয় পেয়েছিলে?

আমার শরীর খারাপ ছিল। আমার জিনিসটাও সেই সময় নিয়ে গেল, আর ফেরত দিল না। হরদা আমার কাছে রাখতে বলেছিলেন

জিনিসটাও নিয়ে গেল? হাঃ হাঃ হাঃ। এখন তুমি তা হলে কী করবে?

বাড়িতেও ফিরতে পারছি না, পুলিশ চোখ রেখেছে।

তোমার কোনও ব্যবস্থাও করেনি দাদারা? ‘অসময়ে হায় হায়, বন্ধু কেউ নয়।আমি তখনই ভেবেছিলাম, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে ওরা ঠকাবে। আমার এখানে থাকো কয়েক দিন, তারপর দেখা যাক, কী করা যায়!

যোগানন্দর বাড়িটি মোটামুটি ছিমছাম সাজানো। বাড়িটির বাইরে থেকে যে রকম সুন্দর, অন্দরমহলের গৃহকত্রীটিও তেমন সুন্দরী। মহিলা প্রায় যোগানন্দর সমান বয়সি, গায়ের রং কালো কিন্তু তার মুখে ও শরীরে এমন এক লাবণ্য আছে যাতে গায়ের রঙের কথা মনেই থাকে না।

যোগানন্দ সেই মহিলাকে দেখিয়ে সূর্যকে বলল, অমর, ইনি তোমার বউদি হন। প্রণাম করো, প্রণাম করো–

একপ্রকার জোর করেই প্রণাম করাল সূর্যকে দিয়ে। তারপর স্ত্রীকে বলল, ভালোমন্দ কিছু খেতে দাও তো, তোমার দেওরটি না খেতে পেয়ে পেয়ে শুকিয়ে গেছে দেখছ না!

যোগানন্দ বাড়ির সংলগ্ন একটা দোকান খুলেছে টিউবওয়েলের যন্ত্রপাতির। তার অবস্থা বেশ সচ্ছল বলে মনে হয়। নিজের থেকেই সে সূর্যকে শোনাল যে তার সংসারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে তার জমিদার পিতার কাছ থেকে নিজের সম্পত্তির অংশ নিয়ে এসে এখানে বাড়ি করেছে। বিপ্লব টিপ্লব নিয়ে সে আর মাথা ঘামাতে চায় না। ওসব পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না। দেশ যখন স্বাধীন হবার আপনিই হবে–দু-চারটে বোমা পিস্তল নিয়ে যারা বিপ্লব করার কথা ভাবে–তারা স্রেফ গোঁয়ার। গোঁয়ারতুমি করে প্রাণ দেবার সাধ তার নেই।

সূর্য একদৃষ্টে যোগানন্দের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবে, এইসব কথা সেই ডাকাতি করার পরেই কেন মনে হল যোগানন্দর, ডাকাতির আগে কেন মনে পড়েনি? তখন তো ওর দারুণ উৎসাহ ছিল। ডাকাতির পরিকল্পনাটাও মোটামুটি ছিল ওরই। এই যোগানন্দকে দেখেই সূর্য একসময় দারুণ মুগ্ধ হয়েছিল। চন্দননগরের সেই পোড়ড়া বাড়িতে সকালবেলা যোগানন্দ তাকে এমন আন্তরিক ভাবে কয়েকটা কথা বলেছিল, যা এখনও

তার বুকে লেগে আছে। যোগানন্দ বলেছিল, ভাই অমর, দেশের কাজকে যদি তোমার নিজের কাজ বলে ভাবতে পারো–তা হলেই এ পথে থেকো। কোনও দিন কোনও প্রতিদান আশা কোরো না। আর সবাই ছেড়ে চলে গেলেও তোমাকে থাকতে হবে–এই কথাটা সবসময় মনে রেখো।

এই কথাগুলো যে বলেছিল, আজ তার এই পরিণতি। কথার গুরুত্ব না বুঝে মানুষ এ রকম ভাবে উপদেশ দিতে পারে? এসব কি শুধু কথা, এর পেছনে আর কিছু নেই?

যোগানন্দ বরাবরই'পেটুক মানুষ। খেতে ভালোবাসে, এখন তার খাওয়াদাওয়া একটা উৎসবের মতন। সারা দিন ধরেই খাওয়াদাওয়ার ধুম লেগে আছে। তার স্ত্রী শ্যামলী রান্নার ব্যাপারে একজন শিল্পী। প্রত্যেক বেলা শুধু মাছই রান্না হয় তিন-চার রকম। যোগানন্দর আগে ছিল শক্ত সবল চেহারা, এখন গায়ে বেশ চর্বি লেগেছে। পায়েসের বাটিতে চুমুক দিয়ে সে যখন তারিয়ে তারিয়ে খায়, তখন সূর্যর মনে পড়ে যায়, একদিন ডুমুর আর পেঁয়াজের বিচিত্র তরকারির সঙ্গে মশলা ছাড়া খিচুড়ি কী অপূর্ব তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিল যোগানন্দ।

যোগানন্দ সূর্যকে খুবই খাতিরযত্ন করে। সবসময় স্ত্রীকে বলে, অমরকে এটা দাও, অমরকে ওটা দাও। দিন তিনেক ভালো করে স্নানটান ও খাওয়াদাওয়া করে সূর্যর চেহারা ফিরে গেল। তখন শ্যামলী অন্য চোখে দেখতে লাগল সূর্যকে।

শ্যামলী কথাবার্তা কম বলে, কিন্তু দু-একটি কথা শুনলেই বোঝা যায়, সে বেশ বুদ্ধিমতী। মাঝে মাঝেই সূর্য দেখতে পায়, শ্যামলী তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সূর্যর অনুপস্থিতিতে সূর্যর ঘরে পরিষ্কার জামাকাপড় রেখে যায়। রাত্তিরবেলা তার মাথার কাছে জল ঢাকা থাকে। প্রথম তিন দিন শ্যামলী সূর্যর সঙ্গে সাধারণ সৌজন্যসূচক দু'-চারটে কথা ছাড়া কিছুই বলেনি, তারপর একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ পানের রসে ঠোঁটদুটি রাঙিয়ে সূর্যর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, কী, এত মনখারাপ কেন?

সূর্য তখন জানলার ধারে গুম মেরে বসেছিল। গম্ভীর হয়ে থাকলেই তার মুখে এক ধরনের গাঢ় বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। তার ফরসা সুন্দর মুখে সেই বিষণ্ণতা কেমন যেন অদ্ভুত দেখায়।

সূর্য মুখ ফিরিয়ে বলল, যোগানন্দদা কোথায়?

ঘুমোচ্ছে।

সূর্য আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। মেয়েদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়, সে জানে না। শ্যামলী একটু বাদে এগিয়ে এসে বলল, আপনি বলব, না তুমি বলব? তুমিই বলি, তোমার বয়স কত?

সূর্য বলল, আঠেরো।

বাবা, এর মধ্যেই এত লম্বা হয়ে গেছ। তুমি তো তোমার এই দাদাটিকেও ছাড়িয়ে গেছ। আচ্ছা ভাই অমর, তুমিও কি এখন তোমার দাদার মতন দল-ছাড়া?

এ বাড়িতে এদের মুখে অমর ডাক শুনে সূর্যর এখনও অস্বস্তি হয়। তার বাবার নাম অমর, বাবার নামে ছেলেকে কেউ ডাকলে ছেলের কানে সেটা অদ্ভুত শোনাবেই। কিন্তু তার দল থেকে তাকে এই ছদ্মনামটা দেওয়া হয়েছিল।

সূর্য বলল, আমি কোনও দিন কোনও দলে ছিলাম না। যোগানন্দদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়।

হুঁ, বুঝেছি। যেই যুদ্ধ লাগল অমনি তোমাদের সব জারিজুরি থেমে গেল? আচ্ছা, এই যুদ্ধ কত দিন চলবে বলতে পারো?

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তোমার দাদা তো বলেন, যত বেশি দিন যুদ্ধ চলে, ততই নাকি ভালো। এখন ওর দোকানে বিক্রি খুব ভালো, যুদ্ধ থেমে গেলে আর এতটা হবে না।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, তোমার দাদাকে আমি দশ বছর ধরে চিনি। যখন ও পুলিশের সঙ্গে লড়াই করত, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত–তখন ওকে আমার অনেক অনেক বেশি ভালো লাগত। তখন ছিল একটা দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। এখন কী রকম যেন সাধারণ, আর পাঁচজনের মতন, আমার এ রকম ভালো লাগে না। আগে ওর সঙ্গে নমাসে-ছ'মাসে দেখা হত–সেও অনেক ভালো। ছিল–

সূর্য একটু অবাক হয়ে তাকাল শ্যামলীর দিকে, কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না। শ্যামলীর মুখে যেন সত্যিই একটা দুঃখের ছায়া। সূর্যর সঙ্গে আরও কথা বলার উদ্দেশ্যে শ্যামলী এসে বসল সূর্যের বিছানার ওপর। মাথার বালিশটা সরাতে যাচ্ছিল সূর্য বিদ্যুৎবেগে এসে বসে পড়ল বালিশটার ওপর। বালিশের তলায় তার গোপন জিনিস আছে, শ্যামলীকে দেখানো যায় না।

সূর্যর এ রকম ব্যবহারে চমৎকৃত হয়ে গেল শ্যামলী। সূর্য প্রায় তার গায়ের ওপরেই এসে বসে পড়েছে। কৌতূহলের চোখে সূর্যর দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?

সূর্য দায়সারা উত্তর দিচ্ছে। শ্যামলীকে এখান থেকে ওঠানো দরকার। কিন্তু সে তো তাকে উঠে যেতে বলতে পারে না। শ্যামলী চেয়ে আছে সূর্যর গেঞ্জি পরা শরীরের দিকে। সূর্যর বাহুতে চাকা চাকা দাগ–সেদিকে আঙুল তুলে শ্যামলী বলল, এসব কী?

সূর্য বলল, আমার গায়ে চুলকুনি আছে, আপনি সরে বসুন।

সরে বসার কোনও লক্ষণ দেখাল না শ্যামলী, হাসতে হাসতে বলল, সে কথা আগে বলোনি কেন? গরম তেলে কাঁচা হলুদ মিশিয়ে দেবকাল মাখবে সারা গায়ে

সূর্যর পিঠে হাত রেখে শ্যামলী বলল, এমন সুন্দর চেহারা, কেউ তার এমন অযত্ন করে।

হঠাৎ রক্তের গন্ধ পেয়ে গেল সূর্য। তীব্র চোখে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর আর সময় নষ্ট না করে শ্যামলীকে জড়িয়ে ধরল।

আর্ত কণ্ঠে, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে শ্যামলী বলল, এই কী হচ্ছে কী-দরজা খোলা...

ধুৎ তেরি, দরজা খোলা। সূর্য কোনও দিন এসব গ্রাহ্য করেছে? ততক্ষণে সে শ্যামলীর ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, কোমর থেকে হাত নিয়ে এসেছে বুকের কাছে।

শ্যামলী কোনওক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। জ্বলন্ত চোখে বলল, ছি ছি ছি, তুমিও এই রকম? কোনও মেয়ে কোনও ছেলের সঙ্গে একটু নির্জনে কথা বলতে এলে তোমরা এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না?

সূর্য রুক্ষ গলায় বলল, আপনি কেন বললেন, দরজা খোলা?

দরজা খোলা থাক বা না থাক, তুমি এত নির্লজ্জ, এই তোমরা বিপ্লবী?

সূর্য তর্কাতর্কি করে পারবে না। সে আর কথা খরচ না করে উঠে দরজা বন্ধ করে এল। শ্যামলীর সব বাধা অগ্রাহ্য করে তার কোমর ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে এল বিছানায়। কয়েক দিন ভালো খাবার ও পরিচর্যা পেয়ে তার শরীরের এই খিদেটা অসম্ভব জেগে উঠেছে। শ্যামলীর দুটো হাত বিছানার ওপর জোর করে চেপে ধরে, শরীরের ভরে পাদুটো আটকে সে চুম্বন করল শ্যামলীকে। এত দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন যে মনে হয় অন্তহীন। শেষের দিকে শ্যামলীর প্রতিরোধ কমে এল, অংশগ্রহণ করতে লাগল তার নিজের ঠোঁট। তখন সূর্য শ্যামলীর হাত ছেড়ে তার বুকের আঁচল সরিয়ে দিল। একটানে ব্লাউজটা ছিঁড়তে যেতেই সে থমকে গেল।

শ্যামলীর গলায় সোনার সরু হার, লকেটটা মস্ত বড়। লকেটের মাঝখানে একটা লাল পাথর। এই হার সূর্য চেনে। ডাকাতির দিন আড্যিবাড়ির যুবতী বধূটির গলা থেকে এই

হার যোগানন্দ নিজে ছিঁড়তে গিয়েছিল। সেই হার যোগানন্দ তার নিজের স্ত্রীর গলায় পরিয়েছে। এ কী ধরনের মানুষ? এ কী ধরনের পৃথিবী? সূর্যর শরীরটা গুলিয়ে উঠল।

শ্যামলীকে ছেড়ে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতন সে উঠে দাঁড়াল। কুঁকড়ে গেছে তার মুখখানা। শ্যামলীর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে, তাই দেখে সূর্য বিকৃত গলায় বলল, যান, মুখ ধুয়ে আসুন। আপনার রক্ত আমি খেয়ে ফেলেছি, তাই আমার বমি পাচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সূর্য যোগানন্দকে বলল, দাদা, একটু বেড়িয়ে আসি, বাড়িতে বসে আর ভালো লাগছে না।

যোগানন্দ সূর্যকে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করেছিল। কিন্তু দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকা কি এ ছেলের পক্ষে সম্ভব? বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তাই দেখে যোগানন্দ বলল, ঠিক আছে যাও, বেশি দেরি কোরো না। কাল তোমাকে নিয়ে আমি মেদিনীপুর টাউনে যাব-ভোরে উঠতে হবে।

আপনিও চলুন না। কাজ তো কিছু নেই।

যোগানন্দ বলল, ঠিক আছে, চলো, তোমাকে বনের ধারটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ও দিকটা বেশ সুন্দর। তুমি একা গেলে কোথায় যেতে কোথায় যাবে আবার!

বাড়ির পেছন দিকে মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা। সূর্য এখন অসম্ভব শান্ত, সে নীরবে হেঁটে যাচ্ছে যোগানন্দের পাশে। যোগানন্দ গুন গুন করে গান ধরেছে, স্বামী বিবেকানন্দর প্রিয় গান, 'যদি কুমড়োর মতো চালে ধরে রত পান্তুয়া শত শত-'।

সন্ধ্যা শুরু হতে না হতেই সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। পরিষ্কার আকাশ। ফুরফুরে হাওয়ায় গান ও কথা উড়ে যায়। মাঠ শেষ হবার পর অল্প অল্প জঙ্গল শুরু হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ। যোগানন্দের মনে কবিত্ব জেগেছে। সে ওপরে তাকিয়ে বলল, কত

তারা দেখেছ? একসঙ্গে এত তারা কলকাতায় বসে কেউ দেখতে পায় না। তারাগুলো ঠিক ফুলের মতন মনে হয়।

সূর্য বলল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দেখা যায়, এক একটা তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে।

যোগানন্দ বলল, তারা নয়, সেগুলো ধূমকেতু।

তর্কের ভঙ্গিতে সূর্য বলল, না তারা।

ওঃ, তা হলে মরা তারা। অনেক সময় দেখা যায় পৃথিবীতে খসে পড়ছে-পড়তে পড়তেই পুড়ে যায়।

না, সেগুলো না। এক একটা তারা স্থান বদলায়। মানুষের জীবনের মতন। আমি দেখেছি।

মুর্শিদের চরে থাকবার সময় সূর্যকে অনেক আকাশ দেখতে হয়েছে-এ-দৃশ্য তার সত্যিই দেখা।

যোগানন্দ বিড়বিড় করে বলল, সত্যিই মানুষের জীবন বদলায়। বড় ঘন ঘন বদলায়। আমি অনেক বদলেছি-আমাকে দেখে তুমি অবাক হচ্ছ, না? কাল থেকে কিন্তু আমার অনুতাপ হচ্ছে। তোমাকে একটা কথা বলব বলব করেও বলিনি। কাল শহরে গিয়ে আমি একটা হ্যাঁন্ডবিল দেখলাম। মহাত্মা গান্ধী থেকে কংগ্রেসের সব নেতাকে ইংরেজ সরকার আবার জেলে ভরেছে। ৯ই অগাস্ট থেকে দেশের অনেক জায়গায় বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। রেললাইন উপড়ে, স্টেশন পুড়িয়ে

সূর্য বিমূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল, আজ কত তারিখ?

এগারো। সত্যি অমর, সারা দেশে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। আর আমরা এখনও বসে আছি? আমার রক্ত আবার চনমন করে উঠছে। একসময় অনেক কিছু করেছি, আর আসল

লড়াইয়ের সময়েই ঘরের কোণে বসে থাকব? আমার বুকটা পুড়ে যাচ্ছে। অনুতাপে। তখন ভেবেছিলাম, আর কোনও আশা নেই-যুদ্ধ না থামলে,-তাই নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার জন্য কেউ কি ভাবতে পেরেছিল, সুভাষবাবু সত্যি সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন। ওঃ, কী ভুল করেছি! বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে

সূর্য থমকে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বলল, সেই ডাকাতির রাত্রে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি গ্রামের লোকের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মালপত্র তো সব কেড়ে নিয়েছেই, এমন মার মেরেছিল যে সে যাত্রা যে প্রাণে

কথা বলতে বলতে যোগানন্দর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সূর্যর হাত দু'খানা চেপে ধরে বলল, তুই আমাকে খুন করতে এসেছিস, তাই না?

হাত ছাড়ুন।

আমাকে খুন করার জন্য তোকে ওরা পাঠিয়েছে, না রে অমর?

সূর্য হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু যোগানন্দের গায়েও প্রচণ্ড জোর। সে দু' হাতে সূর্যকে সপাটে চেপে ধরেছে। সূর্য প্রাণপণেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না, তখন কামড়ে দিল যোগানন্দের হাতে ব্যথার জ্বালায় যোগানন্দ তাকে ছেড়ে দিয়েই প্রচণ্ড এক লাথি মারল পেটে। সূর্য ছিটকে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে রিভলবার বার করে গুলি চালাল।

হাত স্থির ছিল না, গুলি যোগানন্দের গায়ে লাগেনি। যোগানন্দ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গড়াতে শুরু করেছে অন্ধকারের দিকে। সূর্য রিভলবার হাতে এগিয়ে আসতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, অমর, মারিস না, মারিস না, শোন, কথা শোন। আমি ভুল স্বীকার করছি-দাঁড়া, একটা কথা বলতে দে–

লক্ষ্য স্থির নিশ্চিত করা জন্য সূর্য অস্ত্র হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে গিয়ে যেতে লাগল ওর দিকে। যোগানন্দ একটা ঝোঁপের পেছনে লুকিয়েছে। সেখান থেকে বলতে লাগল, অমর, মারিস না, এ রকম ভাবে মারিস না- আমিও অনেক কাজ করেছি-আমাকে আর একটা সুযোগ দেকালই আমি বাড়ি-ঘড় ছেড়ে বেরিয়ে পরবো-যদি পুলিশের গুলিতে মরি, তাও একটা সান্ত্বনা থাকবে।

সূর্য হুকুম করল, ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন।

মারবি না বল? একটা সুযোগ দিবি?

বেরিয়ে আসুন আগে। এতে এখনও পাঁচটা টোটা আছে, এইখান থেকেই আমি আপনাকে শেষ করে দিতে পারি। বেরিয়ে আসুন।

যোগানন্দ বেরিয়েই সূর্যর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সূর্যর মুখখানা পাথরের মতন শক্তি। যোগানন্দর মাথা টিপ করে রিভলবার তুলেছে, যোগানন্দ হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, এ রকম ভাবে মারিস না, আমাকে পুলিশের গুলিতে মরতে দে।

ঠিক?

অমর, তোর কাছে কথা দেওয়ার কিছু নেই। আমার নিজেরই অসম্ভব অনুতাপ হচ্ছে। আমি যা ভুল করেছি, আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই!

সূর্য হিংস্র ভাবে বলল, আমার যদি কোনও ভুল হয়, তা হলে আমি নরকে গিয়েও আপনাকে খুঁজে বার করব।

সেই রাত্রে শ্যামলী সূর্যর ঘরে জল রাখতে এসে সূর্য দরজার সঙ্গে তাকে চেপে ধরে, গলার হারটা একটানে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাইরের অন্ধকারে, ঠাস ঠাস করে তার দু'গালে দুটি চড় মারে। শ্যামলী এতই অবাক হয়ে যায় যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয়

না। সূর্য যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আবার একটা প্রচণ্ড চড় মেরে বলে, লোভের শেষ নেই। না? আর সব গয়না কোথায়?

একটু পরে দেখা যায়, শ্যামলী সূর্যর পায়ের কাছে বসে কাঁদছে।

৩৯. দূর থেকে আসছে একটা মিছিল

দূর থেকে আসছে একটা মিছিল। ঠিক মিছিল নয়, বিশৃঙ্খল জনতা। নদীতে যেমন যাঁড়াষাঁড়ির বান আসে, তেমনি মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে একটা উত্তাল ঢেউ। হ্যাঁ, ছুটেই আসছে মনে হয়, প্রিয়জনের দুঃসংবাদ শুনে মানুষ যে রকম ভাবে ছুটে আসে। এই জনতার কোনও কর্ণধার নেই, যেন মনে হয় চতুর্দিকের মাঠ ঘাট জঙ্গল নদী নালা পেরিয়ে মানুষ ছুটে আসছে এই দিকে, এই মন্তেশ্বর থানার দিকে। গতকাল এই থানার সামনে গুলি চলেছিল, মারা গেছে দু'জন মানুষ, আহত সাতজন, বন্দির সংখ্যা একশো তিন।

জনতা ছুটে আসছে। এর মধ্যে আছে শিশু, বৃদ্ধ ও নারী, ছেঁড়া, ময়লা পোশাক, অনেকেরই শরীরের অর্ধেকের বেশি নগ্ন, অনেকেই রোগা, হাড়-জিরজিরে চেহারা, ম্যালেরিয়া, অনাহার ও বৃটিশ শাসন যাদের ছিবড়ে করে ফেলেছে–আজ তারা ছুটে আসছে ভূতগ্রস্তের মতো। দুর্বল গলায় তারা চাচাচ্ছে, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! বৃটিশ রাজ ভারত ছাড়ো! সমস্ত বন্দিদের মুক্তি চাই! চাই, চাই, চাই-ই-প্রতিধ্বনির মতন শোনায়।

বেলা এগারোটা। এই সময় এইসব মানুষের মধ্যে অনেকেরই খেত-খামারে থাকার কথা, কেউ ইস্কুলে, কেউ ডাক্তারখানায়, রান্নাঘরে, হাটে-বাজারে। আজ সে-সব কাজ ফেলে মানুষ এ-দিকে ছুটে আসছে চিৎকার করতে করতে। মাথার ওপরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, অনাবৃষ্টিতে ফেটে ফেটে গেছে মাটি, গাছগুলোর পাতা বিবর্ণ।

একটা বড় অশত্থগাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে সূর্য আর যোগানন্দ। যোগানন্দ একটা বিড়িতে ঘন ঘন টান দিচ্ছে আর পিচ পিচ শব্দ করে থুতু ফেলছে মাটিতে। সূর্য একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে অগ্রসরমান জনতার দিকে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটু দূরেই রেল লাইন–দু-তিন দিন ধরে ট্রেন বন্ধ।

যোগানন্দ তিক্ত গলায় বলল, এত লোক–এদের হাতে যদি একটা করে যে-কোনও অস্ত্র থাকত তা হলে ওই ক'টা পুলিশ রুখতে পারত ওদের? গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত কুইট ইন্ডিয়া স্লোগান দিলেন আর এটা বুঝলেন না, মেরে না তাড়ালে ইংরেজ যাবে না। লোকজন যে রকম ক্ষেপে উঠেছে, কিছু অস্ত্র থাকলে অনায়াসে এক একটা অঞ্চল স্বাধীন করে ফেলা যেত।

সূর্য বলল, কালকে ইস্তাহারে পড়লাম বিহার ইউ পির কয়েকটা জায়গা স্বাধীন হয়ে গেছে –বৃটিশ শাসনের কোনও চিহ্ন নেই।

কিন্তু কদিনের জন্য?

চিরদিনের জন্য। যুদ্ধে হারতে বসেছে ইংরেজ, আর এ-দেশে ফিরতে পারবে না।

ব্রজগোপালদা, শংকরদাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হল না?

কে কোথায় আছে, কোনও ঠিক নেই।

দাদারা প্রায় সবাই গিয়ে এখন কংগ্রেসে ভিড়েছে। এ বছরই স্বাধীনতা এলে নাম হবে শুধু কংগ্রেসের। আমরা কেউ না। এক সুভাষবাবু যদি সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়তে পারেন, তা হলে উনি অন্তত আমাদের চিনবেন।

সুভাষবাবু আসছেন ঠিকই।

কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একসঙ্গে আরম্ভ হবার কথা ছিল না? ওদিক থেকে সুভাষবাবু আসবেন, আর এদিক থেকে দেশের মধ্যে সব কিছু অচল করে দিয়ে–।

যাকগে, যা থাকে কপালে, আজ আমি মরব।

সূর্য থানার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমিও মরব, কিন্তু মেরে মরব। যোগানন্দ বলল, মরে যাওয়াই ভালো। এরপর নিজেদের মধ্যে কত রকম দলাদলি, কাটাকাটি দেখতে হবে কে জানে। আমি জীবনে একবার শুধু ভুল করেছি, কিন্তু বড় বড় নেতারা আরও অনেক বড় ভুল করেছেন।

সূর্য আর যোগানন্দ এখন দুদিকে ফিরে আছে। সূর্য নজর রেখেছে থানার দিকে। লাল রঙের থানার সামনে খানিকটা ফুলবাগান, গেটের দু পাশে কতকগুলো সাদা রং করা টব উলটে বসানো। গেটের বাইরে একটা জিপ, তার সামনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে আট জন পুলিশ। থানাটা ছোট, কিন্তু গতকাল একটা বড় রকমের কাণ্ড করে ফেলেছে।

জনতার ঢেউ এর মধ্যে এগিয়ে এসেছে অনেক কাছে। চিৎকার ও শোরগোল এখন স্পষ্ট– উত্তেজিত ও আর্ত চিৎকার, কোনও শব্দ বোঝা যায় না। অনেকেরই হাতে তেরঙ্গা ঝান্ডা। যোগানন্দ বলল, অমর, দ্যাখ দ্যাখ একজন বুড়িও পতাকা হাতে নিয়ে এসেছে মিছিলে।

সূর্যর গায়ে গেঞ্জি নেই। জামার মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে সে তার নিজের বুকে হাত বুলোতে লাগল। শরীরটা শিরশির করছে। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে–এই কটা বছর সে এরই প্রতীক্ষায় ছিল। হরকুমারের কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দেশের স্বাধীনতা আসার আগে সে অস্ত্র ছাড়বে না। তার আগে মরতে হয় তো মরবে। আজ কি সেই মৃত্যুদিন?

সূর্য বলল, এবার চলুন। আমরা খানিকটা পেছন দিকে থাকব!

সেই মানুষের জোয়ার অশ্বত্থাগাছটা পেরিয়ে যাবার পর সূর্যা আর যোগানন্দ পেছন দিক থেকে ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে খুব শান্তভাবে হাঁটতে লাগল। ওদের চোখে মুখে কোনও উত্তেজনা নেই, যেন ওরা আগে থেকেই জানে, এরপর কী ঘটবে।

থানার একটু দূরে পুলিশবাহিনী ওদের আটকাল। কিন্তু তরঙ্গে যেমন লাঠি দিয়ে আটকানো যায় না, সেই রকম একদল লোক ঠেলে ঢুকে যেতে চাইছে ভেতরে। ওদের

ভয় ভেঙে গেছে। ওদের কারওর ভাই বা বাবা কাকা গতকালের ঘটনায় নিহত বা আহত বা বন্দি। কোনও পূর্বনির্দিষ্ট স্লোগান নেই, হাজার হাজার গলার চিৎকারে কারওর কথাই বোঝা যায় না। শুধু দেখা গেল, একজন লম্বা চেহারার প্রৌঢ় হাত তুলে পাগলের মতন ভাঙা গলায় চিৎকার করছে, বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আপনারা শুনুন

কেউ শুনছে না। সূর্য চিনতে পারল সেই প্রৌঢ়টিকে, তমোনাশ ডাক্তার। সূর্য আর যোগানন্দ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পেছনে। যেন তারা দর্শক মাত্র।

পুলিশরা লাঠিগুলো আড়াআড়ি করে নিয়ে ভিড় ঠেলছে। কারোকে আহত করার চেষ্টা করছে না। জনতার চেঁচামেচি ক্রমশ বাড়ছে। এই সময় থানার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তিন জন অফিসার, তার মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ। ইনি জেলার এস. পি. কালকের ঘটনার পর দুর্গ রক্ষা করতে এসেছেন। এস. পি. সাহেব দারোগার কানে কানে কী যেন নির্দেশ দিলেন। দারোগাটি ভেতর থেকে একটা চোঙা নিয়ে এসে সেটা মুখে লাগিয়ে বলতে লাগলেন, আপনারা শুনুন, আপনারা শুনুন, থানার সামনে জমায়েত হওয়া বেআইনি।

এক প্রবল হইহইতে ঢেকে গেল দারোগার কথা। পুলিশরা এবার লাঠি উঁচাল মাথার ওপর। দারোগা আবার বললেন, আপনারা শুনুন, মাননীয় এস. পি. সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন-আপনাদের যদি কোনও বক্তব্য থাকে-তা আপনাদের মধ্যে থেকে দু'জন প্রতিনিধি শুধু এসে আপনাদের কথা ওনাকে জানাতে পারেন। উনি সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন! আপনারা-

আবার প্রচণ্ড শোরগোল। মিনিট দুয়েক চিৎকার চ্যাঁচামেচিই চলল। এরই মধ্যে তমোনাশ ডাক্তার সেই জিপ গাড়িটার পাদানিতে উঠে পড়ে মৃগী রোগীর মতন হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেছেন। হাওয়ায় উড়ছে তাঁর সাদা চুল, ঘর্মাক্ত মুখে রোদ পড়ে চকচকে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বন্ধুগণ, বন্ধুগণ বলে অবিশ্রান্ত আওয়াজ করে যাচ্ছিলেন। জনতার শোরগোলের এক মুহূর্ত বিরতি পেতেই তিনি বলে উঠলেন, বন্ধুগণ, আবেদন

নিবেদনের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমরা কোনও আবেদন করতে চাই না। আমরা সমস্ত বন্দিদের মুক্তি চাই। আজই, এই মুহূর্তে। ইংরেজ সরকার যদি বন্দিদের মুক্তি না দেয়–আমরা এখানে আমরণ অনশন করব। আমরা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহী। আমরা এদের দেখিয়ে দিতে চাই, বন্ধুগণ, আমরা এদের দেখিয়ে দিতে চাই যে ন্যায়ের শক্তি লাঠি-গুলির চেয়ে কত বেশি। একবার বলো ভাই, বন্দে মাতরম্।

জনতা গর্জন করে উঠল, বন্দে মাতরম্।

বলল ভাই ইংরেজ সরকার, ভারত ছাড়ো!

ভারত ছা-ড়ো!

তমোনাশ ডাক্তার জনতাকে খানিকটা সঙঘবদ্ধ করে ফেলতে পেরেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের তীব্র আন্তরিকতা সকলকে স্পর্শ করে। তিনি আরও স্লোগান দিতে লাগলেন–জনতা ঠিক ঠিক সাড়া দিল। দু'জন সেপাই এসে হাত ধরে তাঁকে নামিয়ে দিতে এল জিপগাড়ি থেকে তমোনাশ ডাক্তার আবার উদবেল জনতার উদ্দেশে বললেন, ভাইসব, মনে রাখতে হবে, আমরা সত্যাগ্রহী, আমরা হিংসার আশ্রয় নেব না। মহাত্মাজি বলেছেন–

সূর্য আর যোগানন্দ এবার চোখাচোখি করল। তারপর ভিড় ছেড়ে আলাদা বেরিয়ে এসে মাঠ থেকে দুটো বড় বড় ইটের টুকরো তুলে নিয়ে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে দৌড়ে গিয়ে সে-দুটো ছুঁড়ে মারল থানার দরজার সামনে দণ্ডায়মান অফিসারদের দিকে। অব্যর্থ লক্ষ্য, একটা ইট লেগেছে স্বয়ং এস. পি. সাহেবের কপালে। তিনি মাথায় হাত চেপে বসে পড়লেন। যোগানন্দ হিংস্র ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, মার, মার, মার শালাদের!

এর পরই শুরু হয়ে গেল এক অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা। দু-এক মুহূর্ত বিমূঢ় থাকার পর পুলিশ শুরু করে দিল লাঠি চালানো। জনতার মধ্যে বেশির ভাগ লোকই পেছন ফিরে দৌড় দিল–সূর্য আর যোগানন্দ তখন মেশিনের মতন ইট ছুড়ছে। তাদের দেখাদেখি। যোগ

দিয়েছে আরও কয়েকজন যুবক। তমোনাশ ডাক্তার তখনও হাত তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে বন্ধুগণ, বন্ধুগণ-। তাঁর মাথায় এক ঘা লাঠি না-পড়া পর্যন্ত তিনি থামলেন না।

ছত্রভঙ্গ জনতার মধ্যে অনেকেই কিছুদূর পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, এবার কেউ কেউ বাঁশ বা গাছের ডাল ভেঙে এনেছে, ইটপাটকেল ছোঁড়ার দলে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। থানা থেকে বেরিয়ে এসেছে আর একদল পুলিশ। সূর্য আর যোগানন্দ ইট ছোঁড়া বন্ধ করে হাতের ধুলো ঝেড়ে পরস্পর আর একবার চোখাচোখি করে এগিয়ে গেল আরও সামনের দিকে।

দু'-এক মিনিটের মধ্যে সূর্যকে দেখা গেল থানার ছাদে-তার হাতে একটা তেরঙা ঝান্ডা। কী করে সে এত তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছোল, বোঝাই যায় না। আসলে সবকিছুই ভয়ের সীমারেখা দিয়ে বাঁধা-সূর্য সেই সীমারেখাটা অবলীলাক্রমে পার হয়ে গেছে। সুতরাং তার তো আর কোনও অসুবিধে নেই। সূর্য ইউনিয়ন জ্যাকটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে সেখানে লটকে দিল তার হাতের পতাকা। সমস্ত জনতা এক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করে সূর্যকে দেখল। সূর্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ। জনতার উদ্দেশে হাতের ইঙ্গিত করে আবার বলল, ইনকিলাব-।

সে-দিনের প্রথম গুলি চালানো হল সূর্যর দিকে। কোনও নির্দেশ না পেয়েই একজন সেপাই গুলি চালিয়েছে-আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য ছাদের পাঁচিলের ওপাশে পড়ে গেছে তাকে আর দেখা গেল না!

ইতিমধ্যে যোগানন্দ জিপগাড়িটার পেট্রল ট্যাঙ্ক খুলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। যোগানন্দ নিজের গায়ের জামাটা খুলে সেই আগুনে ছুঁইয়ে মশালের মতো হাতে নিয়ে ছুটে গেল। একজন সেপাইয়ের লাঠির বাড়ি তার ঘাড়ে লাগতেই বাঘের মতন ঘুরে দাঁড়াল যোগানন্দ, তার বিশাল থাবা দিয়ে সেপাইটির মুখখানা চেপে ধরল।

যে-কোনও কারণেই তোক পুলিশ সেদিন দু' রাউন্ডের বেশি গুলি চালায়নি। আগের দিন বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার ফলে বোধহয় এই রকমই নির্দেশ ছিল। জনতার একটা বেশ বড় অংশ বেপরোয়া মরিয়া হয়ে লড়ল পুলিশের সঙ্গে, লাঠিধারী পুলিশরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার পর বন্দুকধারী পুলিশরা বেরিয়ে এসে আর কোনও সুযোগ পেল না-তখন জনতা ঢুকে পড়েছে থানার কম্পাউন্ডে-তাদের পায়ের চাপে ফুলবাগান লন্ডভন্ড। এস পি সাহেব রক্তাক্ত মুখে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে উন্মাদের মতন চ্যাঁচাতে লাগলেন, ফায়ার ফায়ার! তাঁর নিজের হাতেও রিভলবার। এইসময় সূর্যকে আবার দেখা গেল থানার ছাদে, তার হাতে খোলা রিভলবার-সে লক্ষ্য ঠিক রেখে অত্যন্ত হিসেব করে গুলি চালাতে লাগল।

গুলিবিদ্ধ এস. পি. সাহেবের মুখে এত অসংখ্য পদাঘাত পড়ল যে মানুষটিকে আর কোনও দিন চেনা যাবে না। কয়েক জন সিপাহি সমেত দারোগাবাবু আত্মসমর্পণ করলেন, তিনজন সিপাহি এবং একজন এস আই মুমূর্ষ। জনতার মধ্যে যোলোসতেরো জনের অবস্থা সংকটজনক। তাদের মধ্যে একজন তমোনাশ ডাক্তার। ডাক্তারকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেবারও কেউ নেই।

কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, খালি গা, যোগানন্দ বিজয়ীর মতন দাঁড়াল থানার সিঁড়িতে। তার এক হাতে একজন সিপাহির রাইফেল। জ্বলন্ত চোখে বলল, ভাইসব, কুত্তার বাচ্চারা হেরে গেছে। ঠিকমতো মুগুর দিয়ে পেটাতে পারলে সব কটা কুত্তাই মরবে কিংবা পালাবে। আমরা কারোকে ছাড়ব না। আজ থেকে আমরা এই অঞ্চলের লোক সবাই স্বাধীন। ইনকিলাব-

সমুদ্র গর্জন শোনা গেল, জিন্দাবাদ!

যোগানন্দ আবার বলল, ভাইসব, শুধু স্বাধীন হলেই হবে না, এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আপনারা জানেন কি না জানি না, সারা ভারত জুড়েই ইংরেজকে পেটানো শুরু হয়েছে অনেক জেলা স্বাধীন হয়ে গেছে। এই বেয়াল্লিশ সালেই ভারতে সব ইংরেজের

কবর খোঁড়া হয়ে যাবে। তবে একথাও ঠিক, ভাইসব, শুনুন আমার কথা, আমরা এক্ষুনি সব বন্দিদের মুক্তি দেব-কিন্তু তার আগে, এক মিনিট ধৈর্য ধরে শুনুন, এই কুত্তার বাচ্চাদের শক্তি কম করে দেখলে চলবে না। যে-কোনও মুহূর্তে সৈন্যবাহিনী এসে পড়তে পারে। সেজন্য আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। রেলে করে যাতে সৈন্যরা না আসতে পারে, সেইজন্য উপড়ে ফেলতে হবে রেললাইন, স্টেশনগুলি পুড়িয়ে দিতে হবে। টেলিগ্রাফে যাতে কোনও খবর না যায়, তাই ধ্বংস করে দিতে হবে সব পোস্ট অফিস। দেরি করার সময় নেই। এক্ষুনি আমাদের দুটো দল যাবে স্টেশন আর পোস্ট অফিসের দিকে। ভয় পেলে চলবে না। স্বাধীনতার জন্য যদি প্রাণও যায়-বলুন একবার, বন্দে মাতরম্-।

সূর্য থানার ভিতর ঢুকে পড়েছে-তার হাতে মস্ত একটা চাবির গোছা। এত কাণ্ডের পরও সে আশ্চর্য রকম অক্ষত রয়েছে-শুধু তার জামাটা ছিঁড়ে গেছে ফালাফালা হয়ে। হাজতঘরে তালা খুলে সে মুক্তি দিচ্ছে বন্দিদের-এত চিৎকার, আনন্দ, কান্নাকাটি- এর মধ্যেও তার মুখ নির্বিকার। একটুও রেখা বদলায়নি তার মুখের, কোনও উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই।

সে যখন বেরিয়ে এল থানার বাইরে-তখনও যোগানন্দ বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। সূর্যকে দেখে যোগানন্দ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জনতাকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল, আপনারা দেখুন এই বীর যোদ্ধাকে-আজকের লড়াইয়ে ইনি-

সূর্য তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রূঢ় গলায় বলল, এখন চলুন!

একটু বাদেই সূর্য আর যোগানন্দের নেতৃত্বে দুটো দল আলাদা ভাবে চলে গেল পোস্ট অফিস আর স্টেশনের দিকে। পোস্ট অফিসে কোনও বাধাই পাওয়া গেল না-ক্রুদ্ধ জনতা সেখানে অগ্নুৎসবে মেতে উঠল। রেল স্টেশনে দু'জন সেপাই ছিল পাহারায় মাত্র আধ ঘণ্টা খণ্ডযুদ্ধেই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল রেল স্টেশনে-কিছু লোক লুটপাটের সুযোগও ছাড়ল না। সূর্যর তখনও অনেক কাজ বাকি কিন্তু জনতা অগ্নিকাণ্ডের সম্পূর্ণ দৃশ্যটা উপভোগ না করে তার সঙ্গে যাবে না। সূর্য তখন স্টেশনের কুলি কামিন ও

বন্দি সেপাইদের বাধ্য করল রেললাইন খুঁড়ে তুলে ফেলতে। কিছুদূর অন্তর অন্তর রেললাইন অচল করে দেওয়া হল। মেদিনীপুরের একটি মহকুমা সত্যিই স্বাধীন হয়ে গেল সে-দিন-সে-তল্লাটে কোথাও আর বৃটিশ শাসনের চিহ্ন রইল না। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় শুধু চিৎকার আর উল্লাস। যে-কোনও বাড়িতেই লোকেরা হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ে খাবার চাইছে। বাড়ির লোকেরাও সানন্দে এনে দিচ্ছে। তাদের যা-কিছু আছে। সূর্যকে কোন বাড়িতে খাওয়ানো হবে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে। গেল লোকের মধ্যে। খবর পাওয়া গেল যোগানন্দ তার দলবল নিয়ে পাশের গ্রামে চলে গেছে আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য।

একটি বাড়ির উঠোনে খেতে বসেছে সূর্য, তাকে ঘিরে রয়েছে একদল মানুষ। অসংখ্য প্রশ্ন, অজস্র উচ্ছ্বাস। সূর্য কারওর কথার উত্তর দিচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে খাওয়া থামিয়ে সে চুপ করে বসে থাকছে, তার দু চোখে জলের পাতলা পরদা। আজ সে একজন মানুষ। খুন করেছে, বিদেশি শত্রু-কিন্তু আনন্দের বদলে তার বুক কাঁপছে। এতক্ষণ চেতনা ছিল না-এখন বার বার চোখে ভাসছে ছবিটা। সূর্য একদিন দেবী সরস্বতীকে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্নের মধ্যে ম্লান ছিল সরস্বতীর মুখ। তার বুক থরথর করে কেঁপেছিল সেই সময়। আজও এই হত্যা ও রক্তের দৃশ্যে তার বুক সেই রকম কেঁপেছে। জীবনে এই শুধু দু'বার।

অনেকেই সূর্যকে বার বার ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। সেসব দিকে মন না দিয়ে সূর্য ওদের বলতে গেল যে রাত্তিরবেলা পাহারা দেবার জন্য একটা দল তৈরি করতে হবে। যে-পাঁচটি রাইফেল পাওয়া গেছে-সেগুলি কার কার হাতে থাকবে-এখন থেকেই ঠিক করা দরকার। গ্রামে আর কারওর কাছে যদি অস্ত্র থাকে-সেগুলোও জড়ো করতে হবে।

কিন্তু এত কথা বলতে পারল না সূর্য। খেতে খেতে হঠাৎ উঠে গিয়ে উঠোনের এক কোণে সে বমি করতে বসল। গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে তার গলা দিয়ে। কোনও এক সময় একটা প্রচণ্ড লাঠির ঘা লেগেছিল তার বুকে-বাইরে থেকে কোনও আঘাত বোঝা যায় না,

কিন্তু ভেতরে কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। থু থু করে মাটিতে রক্ত ছিটিয়ে মুখ ফিরিয়ে সূর্য অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলল, বিশেষ কিছু হয়নি। এটা আমার পুরনো অসুখ।

.

এগারো পেরিয়ে বারোতে পা দেবার পর বাদলের পইতে হয়ে গেল। উপনয়নের পরই সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হল। অর্থাৎ তার দ্বিতীয় জন্ম। ভারতের একটি সুপ্রাচীন, আদর্শবান, বুদ্ধিজীবী, সুচতুর ও স্বার্থপর সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা হল তাকে।

পইতের অনুষ্ঠান বড় কষ্টকর। এ রকম কষ্ট নাকি সহ্য করতেই হয় সবাই তাকে শোনাল, ব্রাহ্মণ হবার জন্য বিশ্বামিত্রকে আরও কতগুণ বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। বেল কাঠের ধোঁয়া চোখে লাগিয়ে প্রায় সারা বেলা ধরে যজ্ঞ করতে হল তাকে, গরম সুচ বিধিয়ে তার দু'কান ফুটো করে সুতো বেঁধে দেওয়া হল, মাথা তো ন্যাড়া হলই। কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল গেরুয়া রঙের একটা ঝোলা, সেটা নিয়ে গুরুজনদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে তিন দিন বন্ধ করে রাখা হল একটা অন্ধকার ঘরে–পাছে সে কোনও অব্রাহ্মণের মুখ দেখে ফেলে।

এর পরেও পুরো এক বছর নাকি সে বাড়ির বাইরে আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও খাদ্যদ্রব্য মুখে দিতে পারবে না। বাড়িতে খাওয়ার সময়েও হঠাৎ একটা কথা বলে ফেললেই তাকে পাত্র ত্যাগ করে উঠে যেতে হবে। গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে হল–প্রতিদিন দু'বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক বাধ্যতামূলক।

কলকাতায় বড়বাবুর আওতায় থেকে ওদের এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। বড়বাবু নাস্তিক, তিনি এসবের ধার ধারতেন না। কিন্তু বাদলের দাদামশাই গোঁড়া পণ্ডিত, সনাতন ধর্মের সবকিছুই তাঁর চোখে পবিত্র। তিনি প্রতিদিন ভোরবেলা তাকে ডেকে তুলে আহ্নিক করতে বসাতে লাগলেন এবং দুপুরে রাত্তিরে খেতে বসে তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন বাদল খাওয়া শুরু করার আগে থালার পাশে পাঁচটি ভাত ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছে কি না। শুধু তাই নয়, ভাতের থালা দেবার আগে নিজের হাতে

মাটিতে জল ছিটিয়ে আঙুলের গাঁট দিয়ে ওঁ লিখতে হবে খাওয়া শেষ করার পর থালায় জল ঢেলে সেই জল এক আঙুলে তুলে জিভে ঠেকিয়ে মন্ত্র পড়তে হবে। এবং যে-আসনে সে বসেছিল-সেটা একটুখানি সরিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদি কোনও বেড়াল দৈবাৎ সেই আসন ডিঙিয়ে ফৈলে তা হলেই তার মহা পাপ।

দু-চার দিনের মধ্যেই বাদল পাকা বামুন ঠাকুরটি হয়ে উঠল। সব নিময়কানুন শিখে এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগল যে বাড়ির সবাই অবাক। বাদলই তখন অন্যদের ভুল ধরে। দাদামশাই খুব খুশি। খুব মজার চেহারা হয়েছে বাদলের। হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করায় হাফ প্যান্টের নীচে পাদুটো ধ্যাড়েঙ্গা দেখায়। কানের ফুটো দুটো একটু একটু পেকে সুতো আটকে গেছে-আর খোলা যায় না-কেউ খোলার চেষ্টা করলেই সে। বাবারে মারে চিৎকার করে। ফলে, তার দু' কানে দুটো সুতোর টুকরো, গলায় মোটা পইতে। ন্যাড়া মাথায় খড়খড়ে চুল উঠেছে-বড়রা সুযোগ পেলেই মাথায় একবার করে হাত বুলিয়ে নেয়। ছোটরা বা সমবয়েসিরা চাঁটি মেরে দৌড়ে পালায় কেউ কেউ একটা ছড়াও বলে, 'নাইড়া মাথা কইড়া থাল, টাক দিলে যায় বরিশাল' ।

এই সময় বাদলের কিছু বিষয় সম্পত্তি হল। উপনয়ন অনুষ্ঠানে এইটুকুই আনন্দের দিক। মুষ্টিভিক্ষার সময় গুরুজনেরা চাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুপোর টাকা দিয়েও ঝুলি ভরিয়েছেন। এ ছাড়া সে পেয়েছে একটা পেন, মাউথ অর্গান, সুটকেস, জ্যামিতির বাক্স, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট এবং অনেকগুলি বই। পেনকে তখন বলা হত ফাউন্টেন পেন, কারওর কারওর মুখে শোনা যেত ঝরনা কলম বাদল সেই প্রথম একটি ফাউন্টেন। পেনের মালিক হল। কলমটির নাম ওয়াটারম্যান প্যাঁচ ঘোরালে নিবটি ভেতরে ঢুকে যায়-একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। বাদল অবশ্য সেটি ব্যবহার করার অধিকার পেল না- কেন না ফাউন্টেন পেন দিয়ে লিখলে হাতের লেখা খারাপ হয়ে যায়-গুরুজনরা এই নির্দেশ দিলেন। টাকা পেয়েছে সে একশো বত্রিশটি-সেগুলি তার মা নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাদল তাতে কিছুতেই রাজি নয়। তার যাবতীয় সম্পত্তি সে নিজের

সুটকেসটিতে ভরে খাটের নীচে রেখে দেয় দিনের মধ্যে সাত-আট বার সেটি খুলে খুলে দেখে; মহাজনের মতন রূপোর টাকাগুলো ঠং ঠং করে গোণে।

নতুন বামুন হবার ফলে বাদলকে প্রায়ই নানা বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে হয়। প্রায়ই লোকের বাড়িতে তিন জন ব্রাহ্মণ বা এগারো জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবার অনুষ্ঠান লেগেই থাকে বাদল তাদের মধ্যে অতি অবশ্য একজন। শুধু পেট পুরে খাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে সে দক্ষিণা পায় পাঁচসিকে পয়সা, একটা নতুন পইতে। কখনও কখনও একটা মাটির কলসি এবং গামছা। এক এক জায়গা থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে খুদে বামুনটি যখন এইসব জিনিসপত্র দু হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে তখন হাসির ধুম পড়ে যায়। সবাই মিলে তার ন্যাড়া মাথায় চাঁটি মেরে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

বাদলের মামাবাড়ির সামনেই একটা দিঘি। দিঘিটা যেমন বড়, তেমনি সুদৃশ্য। দিঘির চার কোণে চারটি ছোট মন্দির, দু' দিকে মস্ত বড় বাঁধানো ঘাট, কচুরিপানা-মুক্ত স্বচ্ছ জল। দিঘির যে দিকে বাদলদের বাড়ি, তার বিপরীত দিকে ফুলের বাগান-দূর থেকে সেটিকে অরণ্য বলেই মনে হয়। দিঘিটিতে অনেক মাছ আছে, তা ছাড়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই যে এটির ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় গহ্বরে একটি রহস্যময় অতিকায় জলজন্তু আছে বছরে একবার মাত্র তাকে জলের ওপরে ঘাই মারতে দেখা যায়। এবং দুপুরের। দিকে, যখন চারদিক সুনসান, ঘাটে কেউ থাকে না-সেইসময় নাকি প্রাণীটি মাঝে মাঝে ভেসে উঠে হাওয়া খায়। একবার ওই দিঘির জলে একটা বেশ বড় গোসাপকে মরা অবস্থায় ভাসতে দেখে সকলেই সিদ্ধান্ত করেছিল-মাঝখানের সেই রহস্যময় প্রাণীটিই একে মেরেছে-কেন না গোসাপের মতন দুর্ধর্ষ প্রাণী এমনি এমনি মরবে কেন? অবশ্য সেই প্রাণীটি মানুষের কোনও দিন কোনও ক্ষতি করেনি-প্রত্যেক দিঘিতেই মাঝে মাঝে কেউ ডুবে মরে-কিন্তু এ-দিঘিতে সে রকম কখনও হয়নি। এমনকী, বহুদিন আগে এ-বাড়ির এক নতুন বউ এই দিঘিতে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ও বেঁচে ওঠে। পরে সেই বউটির মৃতদেহ পাওয়া যায় বাড়ির ছাদে, ভূতে তার ঘাড় মটকে দিয়েছিল।

এই দিঘির পাড়েই বাদলের দিনের অধিকাংশ সময় কাটে। এর মধ্যে তাকে মাছ ধরার নেশায় পেয়ে বসেছে। একটা ছোট ছিপ নিয়ে দিঘির ঘাটলায় এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে এবং একা থাকলেই সে নিজের সঙ্গে কথা বলে। জলের দিকে তাকিয়ে সে কখনও কখনও এত জোরে জোরে কথা বলে যে দূর থেকে শুনলে যে-কেউ ভাববে সে। বুঝি কারওর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করছে। সে নিজের ডান ও বাঁ হাতের সঙ্গে কথা বলে, গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতার সঙ্গেও তার অনেক কথা আছে।

দিঘিতে লোকজন স্নান করতে এলে সে একটু বিরক্ত হয় তখন জলে ঢেউ ওঠে, তার ফাতনা নড়ে যায়। স্নান করতে নেমে সবাই এত গল্প করে যে মাছ আর ধারে কাছে। আসে না। বাদল রোজই কিছু কিছু মাছ পায়-পুঁটি, ট্যাংরা, চাঁদা মাছ সেই জলে অজস্র। একদিন সে একটা মাঝারি সাইজের কাতলাও ধরে ফেলেছিল, সেদিন সে বাড়ি ফিরেছে নাচতে নাচতে। মাছ ধরার আনন্দ যে কী, যে কখনও বঁড়শিতে মাছ ধরেনি, সে বুঝতে পারবে না। বাদলের মামাবাড়ির রান্নাঘরে প্রায় প্রতিদিনই রাজসূয় যজ্ঞ চলে- সেখানে অবশ্য ওই সামান্য মাছের কোনও মূল্যই নেই-ওগুলো বাদলকে আলাদা ভাবে ভাজা করে দেওয়া হয়, সে অমৃত আস্বাদের মতন মুখ করে খায়।

বাদল নিজে যখন স্নান করতে নামে, তখনও সে-ও ঘন্টা খানেকের কমে ওঠে না। সাঁতার সে আগে থেকেই জানত, এখন জলের পোকার মতন সাবলীল। জলের মধ্যে দাপাদাপি করে, অন্যদের সামনে সাঁতারের কায়দা দেখায়বাজি ফেলে এপার-ওপার করে। মা কিংবা মামাদের ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত যখন ওঠে, তখন তার দু চোখ লাল।

দিঘির পাড়টা বাদল সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে দুপুরবেলা। জলের ধারের নির্জনতার মধ্যে একটা আলাদা গাম্ভীর্য আছে। প্রখর রোদ্দুরে ঝকঝক করে জল। অনেক সময় চোখ ধাঁধিয়ে যায়-আবার মেঘ এলেই চরিত্র বদলে যায় জলের। এক এক সময় হাওয়া কতকগুলো ছোট ছোট তরঙ্গকে অনেক দূর টেনে আনে আবার ভেঙে দেয়। নিজের খেয়ালে। বাদল চোখ টান করে চেয়ে থাকে দিঘির মাঝখানে যদি সেই রহস্যময় জন্তুটিকে দেখা যায়। একটা অজানা রহস্যকে জানার আগ্রহে টনটন করে তার বুক। কোথাও একটা

মাছ জলের ঝাঁপটা দিলেই সচকিত হয়ে ওঠে সে, কোনও দিন কিছু দেখা যায় না বটে, কিন্তু সেই নির্জন দুপুর, সেই একা জলের ধারে বসে থাকা, রৌদ্র ও বাতাসের খেলার মধ্যে বারো বছর বয়সটা বড় মোহময় হয়ে ওঠে।

বিকেল শেষ হয়ে আলো কমে এলেও বাদল দিঘির ধার ছাড়তে চায় না, তার দিদি তাকে রোজ ডাকতে আসে। ছিপ গুটিয়ে মাছের খালুই হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরে বাদল। ঠাকুরদালানের পাশে দুটো গাছে ফুটে থাকে এক ঝাঁক সন্ধ্যামালতী ফুল। ফুল না ছিঁড়ে মুখটা অনেক নিচু করে বাদল গন্ধ নেবার চেষ্টা করে। তারপর দৌড়ে গিয়ে বাড়ির মধ্যে হাত-পা ধুয়ে এসেই আবার সে এসে পড়ে ঠাকুরদালানের সিঁড়িতে। প্রতিদিন পুজোর পর পুরুতমশাই ভেজা আতপ চাল আর কলা চটকে মাখা প্রসাদ দেন তাকে, তার অপূর্ব লাগে। খাঁটি বামুন হচ্ছে তো সে-তাই চালকলার ভক্ত হয়ে উঠেছে।

একদিন দুপুরে দিঘিতে স্নান করার সময় বাদলের পইতে হারিয়ে গেল। দিদিদের সে ডুবসাঁতারের খেলা দেখাচ্ছিল, কখন পইতেটা খুলে গেছে। নতুন বামুনের পইতে হারানো তো এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। যতক্ষণ না কোনও সদাবিপ্র নতুন পইতের গ্রন্থী দিয়ে দিচ্ছেন ততক্ষণ বাদল কথা বলতে পারবে না। ফ্যাকাশে মুখ করে সে উঠে এল জল থেকে তাকে দেখেই সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব মজা পেয়ে গেল। মামাতো ভাই-বোনেরা প্রাণের সুখে চাঁটি মারতে লাগল তার ন্যাড়া মাথায়। বাদল ইশারা ইঙ্গিত করছে আর হাত-পা ছুড়ছে-এমনকী তার কাঁদবারও উপায় নেই, তা হলে শব্দ বেরিয়ে যাবে। যেখানেই সে পালাতে যায়-ভাই-বোনেরা ঘিরে ধরে তাকে চাঁটি মারে। বাদলের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে আর সবাই হাসছে হো হো করে। তার মুখ দিয়ে শব্দ বার করার জন্য দু'-তিন জন তাকে চেপে ধরে কাতুকুতু দিতে লাগল। বাদল কোনওক্রমে তাদের হাত ছাড়িয়ে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটে গেল তার মায়ের কাছে।

বাদলের মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাদের আলির সঙ্গে কথা বলছিলেন। ছেলেকে দেখেই বললেন, এই বাদল, তোর নামে একটা চিঠি এসেছে!

বাদল বিস্মিত ভাবে বলল, কী?

মামাতো ভাই-বোনেরা পেছন পেছন এসেছে, তারা চেঁচিয়ে উঠল, এ মা, এ মা, কথা বলে ফেলছে। এ মা-!

বাদল লজ্জা পেয়ে গেল-কিন্তু একবার কথা বলাও যা, দু'বার কথা বলাও তা। সে আবার বলল, আমার চিঠি? কোথায়?

পইতে না-থাকা অবস্থায় কথা বলে ফেলার দোষে বাদলকে খাতার পাতায় একশো আটবার শ্রী শ্রী দুর্গা নাম লিখতে হয়েছিল কিন্তু চিঠি পাওয়ার আনন্দের তুলনায় সে কষ্ট কিছুই না। তার জীবনের প্রথম চিঠি। খামের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে তারই নাম লেখা-শ্রীযুক্ত বাদলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

চিঠিখানা প্রথমে খুলতেই ইচ্ছে করে না। বাদল বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, গন্ধ শোঁকে। মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে, কে লিখেছে? সূর্যদা কি তাকে চিঠি লিখবে? সূর্যদা সবার ওপর রাগ করে চলে গেছে সূর্যদার রাগ বড় সাঙ্ঘাতিক।

এক খামের মধ্যে দুটো চিঠি। ভাগলপুর থেকে লিখেছে বিষ্ণু আর রেণু। মছলন্দপুরের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় রেণুরাও চলে এসেছে ভাগলপুরে। নিশ্চয়ই খুব মজা করছে ওরা।

বিষ্ণুর চিঠি তিন পাতা আর রেণুর চিঠি পৌনে এক পাতা মাত্র। বাদল সারা দিনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠি দুখানি প্রায় দশ বার করে পড়লে-মুখস্থ হয়ে গেলেও তার আশা মেটে না। কত দূরে আছে তার বন্ধুরা-অথচ চিঠি পড়লে মনে হয় কত কাছে।

বিষ্ণু বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে শিখে গেছে এর মধ্যেই। সে তার পাহাড়ে ওঠা ও পাথর সংগ্রহ বিষয়ে লিখেছে অনেকখানি-ইতিমধ্যে ওরা একবার মণিহারিঘাটে বেড়াতে গিয়েছিল, সে-বিবরণও রয়েছে বিস্তৃত ভাবে-আর আছে তার নতুন পড়া বইয়ের কথা।

‘লে মিজারেবল’ বইখানি পড়তে পড়তে তার বার বার কান্না পেয়েছিল একথাও জানিয়েছে। বাদল কি পড়েছে বইখানা? না হলে, বিষ্ণু বইখানা পার্সেল করে পাঠাতে পারে। বাদলরা আর কত দিন থাকবে পাড়াগাঁয়ে? বিষ্ণুরা আর তিন সপ্তাহ বাদেই কলকাতায় ফিরবে?

রেণুর চিঠির অক্ষরগুলো আধ ইঞ্চি মাপের এবং কাটাকুটিতে ভরা। সে লিখেছে, বাদলদা, তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি। আমি অনেক নদী দেখিয়াছি। নদীতে ঢেউ থাকে। আমরা এখানে খুব খেলা করি। মা বাবা ভালো আছেন। দাদা ভালো আছেন। ইলু খুব দুষ্টু। সে আমার কথা শোনে না। পুজ্যপদে প্রণাম। ইতি ইন্দ্রাণী।

পরবর্তীকালে রেণু বাদলকে যে কয়েক হাজার চিঠি লিখেছিল-এখানেই তার সূত্রপাত। রেণু লিখেছে ইল্লু বড় দুষ্ট্র-অথচ ইল্ল যে কে সে কথা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। পরবর্তী কালেও রেণুর সব চিঠিতে এই রকম একটা কিছু রহস্যময় ব্যাপার দেখা গেছে।

বাদল রেণুকে লিখেছে এরও দ্বিগুণ সংখ্যক চিঠি। অধিকাংশ চিঠিই পরস্পরের হাতে হাতে দিয়েছে। কোনও কোনও দিন ওরা এক ঘণ্টা-দু’ঘণ্টা গল্প করার পরেও বাদল রেণুকে বলেছে, তোমার জন্য একটা চিঠি। দাও, বলে রেণু হাত বাড়িয়েছে। কখনও এমনও হয়েছে, বাদল রেণুকে বলেছে, কাল রাত্তিরে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম, ছিঁড়ে ফেলেছি। রেণু দপ করে জ্বলে উঠে বলেছে, কেন? বাদল মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছে, তার মধ্যে অনেক আনসেনসরড কথা ছিল। রেণু তাও ধমকের সুরে বলেছে, আমাকে লেখা চিঠি ছিঁড়ে ফেলার কোনও অধিকার তোমার নেই।

এসব অনেক দিন পরের ব্যাপার। তখন ওরা পরস্পরের জন্য দুঃখ পেতে শুরু করেছে। সে দুঃখবোধ এখন জাগার কথা নয়। এখন বাদল সদ্য দ্বাদশবর্ষীয় বালক, তার জীবনের প্রথম চিঠি পেয়ে আনন্দে উতলা, বাড়ির আনাচেকানাচে একটু নিভৃত স্থান দেখলেই সেই চিঠি খুলে বসছে।

চিঠির উত্তর দেবার জন্য বাদলের পুরো দেড় দিন সময় লাগল। কত যে কাগজ সে ছিঁড়ল, তার ঠিক নেই। একটাও তার পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত চিঠি খামে ভরে হাটতলার ডাকে ফেলবার জন্য দিল নাদের আলির হাতে এবং তার সঞ্চয় থেকে পুরো একটা টাকা দিয়ে ফেলল নাদের আলিকে। বাদলের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল না! শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে তার দুটো চিঠিই মিথ্যে কথায় ভরা। বড় দিঘির রহস্যময় জলজন্তুটিকে সে সচক্ষে দেখার দাবি করেছে এবং তার বঁড়শিতে মাছগুলির আয়তন দু'হাত বিস্তার করে বোঝাতে হয় ইত্যাদি। তার কল্পনাশক্তির এই বহর দেখেই অনুমান করা যেতে পারে যে ভবিষ্যতে সে একজন লেখক হবে।

ইতিমধ্যে এখানেও বাদলের কয়েক জন বন্ধু হয়েছে। নাদের আলির সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব অনেক দানা বেঁধেছে–কিন্তু নাদের আলি শুধু তাকে গল্পই শোনায়–কিছুতেই তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যায় না। সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই শুধু বলে, আর একটু বড় হও দাঠাকুর–আর একটু বড় হও!

বাদল এই নিয়ে কান্নাকাটি করেছে পর্যন্ত। গল্প শুনতে শুনতে তিন প্রহরের বিল তার কাছে স্বপ্নের দেশ হয়ে গেছে–সেখানে সত্যি সত্যি দেখা যায় সূর্যদেব জলে স্নান করতে নামছেন সন্ধ্যাবেলা, জলে গুলে যাচ্ছে তার গায়ের লাল রং, আর সেই মুহূর্তেই ডানা মেলে এক হাজার হাঁস ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই জলে-এ-দৃশ্য বাদল দেখবে না? নাদের। আলি মিথ্যে স্তোকবাক্য দেয়। যখন তার বিলে যাবার কথা থাকে তখন খুব ভোরবেলা বাদলকে কিছু না জানিয়ে চলে যায়।

বাদলের সমবয়সি বন্ধুবান্ধবও হয়েছে। মাস দেড়েক বাদে তাকে পুকুরঘাটের নিভৃত খেলা ছেড়ে স্কুলেও ভরতি হতে হল। এখানকার স্কুলে ক্লাস এইটে ভরতি হয়েও দেখা গেল সে অত্যন্ত ভালো ছাত্র হিসেবে মাস্টারমশাইদের প্রশংসা কুড়োচ্ছ। বাদলের পড়াশুনোর তেমন মনোযোগ কখনও দেখা যায়নি–কিন্তু কলকাতার স্কুলের শিক্ষার মানের তুলনায় এখানকার মান এতই নিচু যে সবাই বলতে লাগল, এ-ছেলে ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হবে। আসলে সে মোটামুটি শুদ্ধ ভাবে ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারে এতেই সবাই মুগ্ধ।

এখানকার অধিকাংশ ছেলে অ্যাসিড-কে বলে এসিড আর গেটকে বলে গ্যাট। আর বার্ড কথাটা তো কেউই উচ্চারণ করতে জানে না–মাস্টারমশাইরাও না। এত প্রশংসা শুনে বাদল খুবই লজ্জা পেত যদিও কিন্তু এতে তার খানিকটা উপকারও হয়েছিল। প্রশংসার যোগ্য হবার জন্য সে সত্যিই পড়াশুনোর দিকে ঝুঁকল এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা হারিকেনের আলোর সামনে বই খুলে বসতে লাগল।

ইস্কুলের সুশিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কুশিক্ষাও হতে লাগল পাড়ার বন্ধুদের কাছে। মামাবাড়ির দিঘির পশ্চিম কোণে চক্রবর্তীদের বাড়ি, সে বাড়িতেও এক গাদা ছেলে-মেয়ে। ও-বাড়ির ছেলে পান্নালাল বাদলের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হলেও পড়ে নিচু ক্লাসে। কিন্তু সে খেলাধুলোয় ওস্তাদ। এবং সে অবিকল বয়স্ক লোকদের মতন গলা করে কুৎসিত গালাগালি দেয়।

পান্না নিত্যনতুন খেলা উদ্ভাবন করে এবং তার খেলায় যোগদান না করে উপায় নেই। বস্তুত শিশু ও কিশোর মহলে সে একটা সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে-তার হুকুম অগ্রাহ্য করার সাহস কারওর নেই। তার গায়ে যে অসম্ভব জোর। পান্নার অধিকাংশ খেলাই শেষ হয় মারামারিতে। সে বাঁড়ুজ্যে ও চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দুটি আলাদা দল করে ফেলে এবং কুরু-পাণ্ডবের মতন এই দলে যুদ্ধ ঘোষণা হয় প্রায়ই। আমবাগানের দু'পাশে দুটো দল জড়ো হয় ইটপাটকেল ও কঞ্চির তির-ধনুক নিয়ে। কিছুক্ষণ এসব ছোঁড়াছুড়ি হয় কিন্তু সবাই জানে শেষ পর্যন্ত পান্নার সঙ্গে কেউ পারবে না–পান্না এক এক জনকে ধরে ধরে সাঙ্ঘাতিক মারে–অল্পবয়স্ক ও দুর্বল ছেলেদের মারধর করে সে অসম্ভব আনন্দ পায়। তার মারার মধ্যে অনেক কায়দাও আছে। পরাজিত শত্রুকে সে প্রথমে বন্দি করে। তারপর বিচার হয়, তারপর শাস্তি। সে একাই সেনাপতি, বিচারক ও জল্লাদ। বাদলের কানের সুতো একটানে খুলে ফেলে সে একদিন রক্ত বার করে দেয়। আর একদিন বাদলকে সে মাটিতে কুড়ি হাত জায়গা নাকে খত দিতে বাধ্য করে। এ-নিয়ে কারওর কাছে নালিশ জানানো যাবে না। কারণ এসবই তো খেলা।

মার খেতে খেতে নাজেহাল হয়ে গিয়ে বাদল শেষ পর্যন্ত একটা ফন্দি বার করে ফেলল। সে পান্নালালের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এবং পান্নালালের প্রিয়পাত্র হওয়া মানেই তার সমস্ত কুকার্য সমর্থন করা। পান্নালালের হুকুমে বিড়ি কিনে আনতে হয় দোকান থেকে–এবং পান্নার এঁটো বিড়িতে টান লাগাতেও হয় তাকে। দু'-এক টান দিয়েই কাশতে কাশতে বাদলের চোখ লাল হয়ে যায়, জল পড়ে–তাই দেখে পান্নালাল হি হি করে হাসে। ভারী খুশি হয় সে। বাড়ি ফেরার আগে মুখের গন্ধ লুকোবার জন্য বাদল লেবুগাছের পাতা ছিঁড়ে চিবোয়।

একদিন আমবাগানের অনেকটা ভেতরে প্রায় জঙ্গলের মধ্যে কয়েক জন ছেলে মিলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল–এই সময় সেখানে চিনু নামে একটি মেয়ে হঠাৎ হাজির হল। চিনুর মা একজন দুঃখী বিধবা বাদলের মামাবাড়িতেই আশ্রিতা। কিছু একটা আত্মীয়তাও আছে–কিন্তু ঝি-চাকরানির বেশি সম্মান নেই। চিনুও ঘর মোছর কাজ করে। চিনুকে দেখেই পান্না হুংকার দিয়ে উঠল, স্পাই! স্পাই! ও এখানে কেন?

মহাযুদ্ধের সুবাদে তখন স্পাই ও ফিফথ কলামিস্ট শব্দ গ্রামে গ্রামেও পৌঁছে গেছে। নানা রকম গুজব সব সময় বাতাসে ভাসে। সুতরাং খেলার যুদ্ধে একজন স্পাইকে পেয়ে ওরা খুব উৎসাহ পেয়ে গেল। স্বয়ং হিটলারের চেয়েও কড়া গলায় পান্না হুকুম করল, ওকে বেঁধে নিয়ে আয়।

চিনু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেরা লতা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলল আষ্টেপৃষ্ঠে। টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল পান্নার সামনে। পান্না জিজ্ঞেস করল, কে তোকে পাঠিয়েছে? বল?

চিনু বেচারা কিছুই বোঝে না। এমনিতেই সে একটু বোকাসোকা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। পান্না বাদলকে হুকুম করল, এই, ওকে মার তো এক থাপ্পড়! ওকে টর্চার করতে হবে। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা সবাই মিলে ধপাধপ করে মারতে লাগল

চিনুকে। চিনু ভ্যা করে কেঁদে উঠতেই পান্না তার চুলের মুঠি ধরে বলল, চুপ। একটা শব্দ শুনতে চাই না। যদি কারোকে কিছু বলবি তো, মেরে খুন করে ফেলব।

মাটিতে ফেলে সবাই মিলে চিনুকে আরও কিছুক্ষণ ধরে মারল। পান্না তার নিষ্ঠুরতার আনন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুত সব বালকই নিষ্ঠুর, পান্না সেটা উসকে দিয়েছে মাত্র।

এরপর চিনু কয়েক দিন মরণাপন্ন অবস্থায় জ্বরে ভুগল। চিনুর মা কাঁদল নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে। আর বাদল চোরের মতন ঘুরতে লাগল সারা বাড়ি। যদি চিনু নাম বলে দেয়! চিনু কিছুই বলেনি। তবু একদিন মধ্যরাত্রে ঘুমের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর থামে না। বাদলের মা তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ব্যাকুল ভাবে, কী হয়েছে? কী হয়েছে? স্বপ্ন দেখেছিস? বাদল মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি আর কোনও দিন করব না, আমি আর কোনও দিন করব না।

৪০. সূর্য চলে যাবার পর

সূর্য চলে যাবার পর বাদলের চোখের সামনে একটা সাময়িক শূন্যতা তৈরি হয়। অতি অল্প বয়স থেকেই সূর্য তার হিরো, সূর্যর হাবভাব চালচলন সব কিছুতেই সে মুগ্ধ-অন্ধ ভাবে অনুকরণ করারও চেষ্টা করেছে। সূর্যর অনুপস্থিতিতে সূর্যর কোনও বিকল্প সে খুঁজে পেল না। অথচ বয়ঃসন্ধিকালের অস্থিরতায় সে একজন কারোকে অবলম্বন করতে চায়। সে রকম কোনও শিক্ষক নেই, সে রকম কোনও আত্মীয় নেই। এই শুন্যতার কথা বাদল বুঝতে পারে না-সে এর-ওর কাছে গিয়ে জীবনের একটা প্রতিভাস পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

তার মামাবাড়িতে অনেক মানুষ। দীর্ঘজীবীদের বংশ, তার দাদামশাইয়ের মা পর্যন্ত এখনও বেঁচে আছেন, একানব্বই বছর বয়স। এখন অনেক মানুষজন আছে যাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র খুঁজতে হলে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হয়। এক থেকে একানব্বই বছর

বয়সি প্রায় চল্লিশ জন মানুষ এবাড়িতে মিলে মিশে আছে। কখনও কখনও বাদলের সেজোমাসির এক বছরের ছেলে দুলালকে বসিয়ে দেওয়া হয় দাদামশাইয়ের মায়ের কোলে। একানব্বই বছরের পুরনো একটি হাত সেই নতুন শিশুকে আদর করে।

বাদলের দাদামশাই বেশ প্রতাপশালী পুরুষ। যদিও চেহারাটি ছোটখাটো-তবু তাকে দেখলেই সবাই সম্ভ্রমে চুপ করে যায়। তিয়াত্তর বছর বয়স, মাথার সব চুল সাদা, কিন্তু শরীরে কোনও রোগ নেই। তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সামান্য অবস্থা থেকে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন-ওদিকে আবার সংস্কৃত কাব্য ও রস শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান আছে যথেষ্ট। সাহেবদের পছন্দ করেন, মেমসাহেবদের ঘৃণা করেন। তার এক ছেলেকে ডাক্তারি পড়তে বিলেতে পাঠিয়ে ছিলেন, সে মেম বিয়ে করে আর ফেরেনি।

দাদামশাইয়ের স্বভাব অনেকটা প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠীর নেতার মতন। নিজ পরিবার বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি প্রাণপাত করতে প্রস্তুত, নিজের জাত-গোত্রের কেউ বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে এলে তিনি তাদের প্রতি উদার ও দয়ালু, তাঁর অনেকগুলি নাতিনাতনির মধ্যে যে-কোনও একজনের সামান্য সর্দি জ্বর হলেও তিনি উতলা হয়ে পড়েন কিন্তু বাইরের কোনও লোক সম্পর্কে তার কোনও দুর্বলতা নেই। নিজের গোষ্ঠীর বাইরে বাদবাকি মানুষ শুধু শোষণ বা অবহেলা করার জন্য। বাড়িতে ভিখিরি এলে তিনি দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেন কিন্তু তার বাবার বাৎসরিক কাজের দিন একশো জনের পাতা পেড়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য যে-কোনও জাতের লোলাকের প্রতি তার একটা আন্তরিক ঘৃণা আছে, কথাবার্তাতেও সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আবার শ্রেণিভেদ আছে-তিনি নিজে রাঢ়ী শ্রেণির বলে অপর ব্রাহ্মণরা তার কাছে উপহাসের পাত্র।

অন্ধ সংস্কারের মধ্যেও এমন একটা জোর আছে, যা চোখ ধাঁধায়। নিকৃষ্ট শ্রেণির প্রচারকদেরও যেমন ভক্তের অভাব হয় না। বাদল ক্রমে ক্রমে তার এই দাদামশাইয়ের ভক্ত হয়ে উঠছিল। মনে মনে সে দাদামশাইকে পুজো করতে লাগল। বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও বাদল? আমি দাদামশাইয়ের মতন রাগী তোক হব।

যে বাড়িতে অনেক মানুষ, সে বাড়িতে কিন্তু আসলে অনেকেই কিছুটা নিঃসঙ্গ অনেকেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে থাকে। বাদলও ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ছিল। বাবার সঙ্গে আজকাল তার প্রায় দেখাই হয় না। চিররঞ্জন শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়ে থেকে এরই মধ্যে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন এবং একটা কিছু কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছেন ইদানীং। এই গ্রামে কিংবা কাছাকাছি কোনও জায়গায় তাঁর পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয়-অত বড় শ্বশুরের জামাই হয়ে সাধারণ চাকরি করলে তার নিন্দে হয়ে যাবে। তা ছাড়া পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হয়ে গেছে-এখন তাকে যেচে চাকরি দেবেই বা কে? যুদ্ধ কত দিন চলবে তার ঠিক নেই-ততদিন কি তাকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে? চিররঞ্জন নিজের দেশের বাড়িঘরের খোঁজ করতে চলে গেলেন।

বাদল তার মাকেও বেশি সময় কাছে পায় না। হিমানী এই বাড়ির কর্মস্রোতের মধ্যে মিশে গেছেন। তার ইচ্ছে, তার মেয়ে সান্ত্বনার বিয়েটা এখানে থাকতে থাকতেই দিয়ে যাবেন। নিজের স্বামীর ওপর ভরসা নেই হিমানীরবাবার আশ্রয়ে থেকে মেয়ের বিয়ে চুকিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যায়। পনেরো বছর হলেও সান্ত্বনাকে বেশ বড়সড় দেখায়।

মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনের সংখ্যা অনেক হলেও বাদলের সমবয়সি ঠিক কেউ নেই। বড়রা তাকে দূরে সরিয়ে রাখে, ছোটদের দলে গিয়ে সর্দারি করতেও তার ভালো লাগে না। সেই জন্যই সে তার দাদামশাইয়ের ন্যাওটা হয়ে পড়ল।

পূর্ববঙ্গের একটি নিস্তরঙ্গ গ্রাম। যুদ্ধের কোনও ঝাঁপটা এখানে এসে পৌঁছোয় না, বিশাল ভারতবর্ষের সঙ্গে এর যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। গান্ধী সুভাষ-নেহরু এগুলো নিছক কয়েকটি নাম মাত্র মাঝে মাঝে অবশ্য পাকিস্তান তৈরির দাবির কথা শোনা যাচ্ছে কানাঘুষোয়-বাদলের দাদামশাইয়ের মতন মানুষরা সেসব তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেন। ঠাকুরদালানে বসে হেসে ওঠেন উঁচু গলায়। সাধারণ মানুষ শুধু ভাবে-এবছর ভালো ফসল হবে, কি হবে না। সেই স্বপ্নের সুদিন কি কোনও দিন আসবে-যে-দিন সোনার

ফসলে মাঠ ভরে যাবে, শোধ হয়ে যাবে সমস্ত ঋণ, জমিদারবাবুর সামনে হেসে কথা বলা যাবে?

বাদল ভোরবেলা দাদামশাইয়ের ডাকে জপতপ করতে বসে। প্রতিদিন উপনিষদের দুটি করে শ্লোক মুখস্থ করে দাদামশাইয়ের কাছে পরীক্ষা দেয়। তারপর দাদামশাই যখন বার বাড়িতে প্রজাদের সঙ্গে কথা বলতে যান, তখন বাদল ইংরেজি-অঙ্ক নিয়ে বসে। ইস্কুলের দিনের কথা আলাদা, কিন্তু প্রতি ছুটির দিনে সে দুপুরবেলা দাদামশাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে। এটা একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। কারণ, দাদামশাইয়ের খেতে বসা মানে এক মস্ত ঘটনা। সারা বাড়িতে একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়-কেউ আসন পাতে, কেউ জল গড়িয়ে দেয়, কেউ পাখা হাতে নিয়ে দাঁড়ায় এবং ঠাকুর-চাকর নয়, খাবার পরিবেশন করে বাড়ির মেয়েরা-যার কোনও কাজ নেই তাকেও কাজের ভান করতে হয়। কার্পেটের আসনে সিধে হয়ে বসে থাকেন দাদামশাই-কোনও দিন কোনও রকম রান্নার প্রশংসা করেননি, কোনও দিন কোনও পদ দ্বিতীয় বার চাননি-কিন্তু একটা কিছু অপছন্দ হলেই থালা সুদ্ধ ঠেলে দিয়ে উঠে যান। তার মস্ত বড় থালা ঘিরে অন্তত দশটি বাটি সাজানো। ঠিক রাজা মহারাজা নয়-আদিবাসী দলনেতার মতনই তার ভঙ্গি। তিনি গম্ভীর, এ-সবই তার প্রাপ্য ও স্বাভাবিক ঘটনা।

তাঁর আহার গ্রহণের ব্যাপারেও বিশেষত্ব আছে। বড় বড় মাছের টুকরো থেকে তিনি খানিকটা মুখে দিয়েই বাটিটা ফেলে রাখেন। অতি সরু ও সৌরভময় চালের ভাত দেওয়া হলেও তিনি খান মাত্র দু' চামচ ভাত। তিনি আসলে স্বল্পাহারী, কিন্তু বহু রকম পদ সাজিয়ে তাকে দেওয়াই রেওয়াজ। তাঁর বন্ধু পীতাম্বর এক দিন তাঁর সঙ্গে খেতে বসে এই ব্যাপার দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি তো কিছুই খাও না হে, তবে গয়নাগাঁটির মতন এত বাটি সাজিয়ে বসো কেন? দাদামশাই তখন উত্তর দেননি, খাওয়ার সময় তিনি কথা বলেন না। পরে তিনি পীতাম্বরকে বলেছিলেন, আমাকে দিতে হয় বলেই বাড়িতে এত পদ রান্না হয় বাড়ির অন্য অন্য লোকরা খেয়ে বাঁচে। আমাকে না দিতে হলে, এরা রান্নার ব্যাপারটা

সংক্ষেপে সেরে ফেলত। মেয়েদের যত বেশিক্ষণ পারবে ততক্ষণ রান্নাঘরে রাখবার চেষ্টা করবে-না হলেই তো ওরা ঝগড়াঝাটি নিয়ে মেতে উঠবে।

বাদল দাদামশাইয়ের সঙ্গে খেতে বসে একটি বিশেষ আকর্ষণে। দাদামশাইকে প্রতিদিন দুটি আস্ত গলদা চিংড়িমাছ ভাজা করে দেওয়া হয়। এক একটা মাছ বাদলের এক হাত মাপের সমান। দাদামশাই একটি মাছ থেকে সামান্য একরত্তি মুখে দিয়ে বাকি মাছটা তুলে দেন বাদলের থালায়। অন্য জায়গায় খেতে বসলে এত বড় একটা চিংড়িমাছ বাদলকে একা কক্ষনও দেওয়া হত না। চিংড়ির মাথায় ঘি খেতে যা ভালোবাসে বাদল। লাল রঙের গরম গরম ঘি! বাদল আজকাল লোভী হচ্ছে।

সকালবেলা যেমন প্রজাদের সঙ্গে দরবারে বসেন দাদামশাই, বিকেলে সেই রকম বসেন বাড়ির লোকের সঙ্গে। খুঁটিনাটি ভাবে প্রত্যেকের খবরাখবর নেন। কারওর কিছু আর্জি থাকলে শোনেন, প্রয়োজন বুঝলে টাকাপয়সার বরাদ্দ করেন। তিনি কথা বলেন। আস্তে আস্তে, অথচ তবু যে কেন সবাই তার সামনে এসে ভয়ে কাপে সেটাই বুঝতে পারে না বাদল! ইস, তাকে যদি সবাই এ রকম ভয় করত!

সন্ধ্যার পর দাদামশাই বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। তার পেছনে পেছনে বর্শা হাতে বাড়ির একজন পাইক যায়। এই ব্যবস্থাটাও তার নিজেরই করা। তিনি সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ান, কখনও পাশের গ্রামে চলে যান। প্রতিদিন অন্তত দশ মাইল পথ হাঁটা তার বরাদ্দ। তিনি রাত্রে ছাড়া হাঁটতে ভালোবাসেন না, অন্ধকারে হ্যারিকেন নেন না, হাতে একটি টর্চ থাকে, তাও জ্বালেন কদাচিৎ। ভ্রমণ শেষে এক এক দিন তিনি যান তার বন্ধু পীতাম্বরের বাড়ি, সেখানে গানবাজনা হয়। পীতাম্বর কীর্তন গায়ক-প্রত্যেক সন্ধ্যাবেলাতেই সাঙ্গোপাঙ্গ খোল করতাল নিয়ে বসেন-দাদামশাই কিছুক্ষণ সেখানে বসে থেকে আবার নিঃশব্দে উঠে আসেন।

এক এক দিন দাদামশাই চলে যান মাঠ পেরিয়ে নদীর ধারে। উঁচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নদীর দৃশ্য দেখেন-বিশেষত জ্যোৎস্না রাতে। নদীর জলে চকচক করে

জ্যোৎস্না-মাঝে মাঝে ঢেউ এসে জিভ বাড়িয়ে বাঁধের মাটি ভেঙে নেয়, ঝুপঝাঁপ শব্দ হয়-আর কোনও শব্দ নেই। আকাশে ইতস্তত তারা, সেই রকমই নদীর অন্ধকারে বহু দূরে দূরে ছড়ানো আলোর বিন্দু। মনে হয় চরাচরময় অদ্ভুত শান্তি।

দাদামশাই অনেকক্ষণ নদীর দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই মানুষটি ঘোর সংসারী ও বিষয়ী, অথচ এঁর সৌন্দর্যবোধ আছে। এঁর রক্তের কোনও ঐতিহ্য নেই, অথচ ধরে আছেন একটি ঐতিহ্যময় শাস্ত্র, ইনি ঘোরতর সংস্কারাচ্ছন্ন অথচ দয়ালু-বাদল তাই এঁর কোনও থই পায় না।

একদিন দাদামশাই নিজেই বাদলকে তার ভ্রমণের সঙ্গী করে নিতে চাইলেন। এ রকম আর কখনও ঘটেনি। সন্ধ্যাবেলার একাকীত্ব তার বহু দিনের অভ্যাস-সঙ্গে যে পাইক যায়, সে ছায়ামাত্র! কিন্তু বাদলকে যে সঙ্গে নিলেন-তার একটা কারণ আছে। দাদামশাই বাড়িতে কারওর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না। রাশভারী হয়ে থাকতে থাকতে সেটাই তাঁর মুখোশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দাদামশাই এখন যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন-প্রত্যেক বৃদ্ধেরই অনেক কিছু কথা বলার জন্য বুকের মধ্যে একটা আকুলিবিকুলি থাকে। অন্যের কাছে হঠাৎ স্বভাব বদলানো যায় না যদিও, তবে একটি বালকের কাছে মুখ খুলতে বাধা নেই।

প্রথম প্রথম ভ্রমণপথে দাদামশাই বাদলকে নানা রকম নীতিশিক্ষা দিতেন। আদর্শ ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবন কী রকম হওয়া উচিত সে বিষয়ে তার নির্দিষ্ট ছক আছে। আকাশের প্রতিটি তারা এবং মাটির প্রতিটি মানুষকে চিনতে হবে। পশু-পক্ষীর স্বভাবও বুঝতে হবে-সেখানেও শিক্ষণীয় আছে অনেক কিছু। ভগবান বিষ্ণু যে মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিহং প্রভৃতি পশুর আকৃতিতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এসবের তাৎপর্য কী? বেদ অতল জলে তলিয়ে গিয়েছিল, মৎস্যরূপী বিষ্ণু তাকে উদ্ধার করেন। তেমনই যে- সাধনার গভীর অতলে থাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-

বাদল জিজ্ঞেস করল, দাদামশাই, বিশুদ্ধ জ্ঞান কী?

দাদামশাই গভীর স্নেহে তাকালেন তার নাতির দিকে। বালকের রিনরিনে কণ্ঠস্বরে বিশুদ্ধ জ্ঞান শব্দ দুটিই কত সুন্দর শোনায়। মনে হয় যেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের বরুণ ও ভৃগুর প্রশ্নোত্তরের মতন নতুন এক অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে। দাদামশাই তার ঠান্ডা হাতখানা বাদলের কাঁধে রাখলেন। এতদিন তার মনে মনে একটু দুঃখ ছিল যে তাঁর মেয়ে হিমানীকে তিনি ভালো ঘরে বিয়ে দিতে পারেননি। জামাইটি একটি অপদার্থ। কিন্তু এই নাতিটি মানুষ হলে বংশের মুখরক্ষা করবে।

বাদলকে নিয়ে এসে তিনি দাঁড়ান নদীর পাড়ে। বাদল দৌড়ে জলের কাছে নেমে যেতে চায়-তিনি তাকে নিবৃত্ত করেন না। তার নিজেরও ইচ্ছে করে শৈশবে ফিরে যেতে, কিন্তু ঢালু পাড় দিয়ে নামার সাধ্য তার নেই। আধ মাইলটাক দূরে নদীর পারেই চিতা-এখান থেকে দেখা যায় চিতার আগুন। যেন অন্ধকারকেই দহন করছে সেই আগুনের শিখা।

একদিন দাদামশাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে বাদলের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। ঘটনাটা ঘটার সময় বাদল শুধু অবাক হয়েছিল, কিন্তু বেশ কয়েক বছর বাদে সে বুঝতে পেরেছিল, তার দাদামশাই আসলে একজন মনোরোগী। ওই ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য, ওই রকম কঠোর সংসারীপনা ও দয়া, কুসংস্কার ও শাস্ত্রজ্ঞানের অহংকার-এর আড়ালে লুকিয়ে আছে একজন অসুস্থ মানুষ। পরবর্তী জীবনে বাদল দেখেছে বাইরে থেকে : যাকে যা মনে হয়, তার আড়ালেও আর একজন মানুষ থাকে। সকলেরই থাকে। একা একজন মানুষ কেউ নয়, প্রত্যেকেই দু'জন বা বহুজন মানুষ। সেই আড়ালের মানুষটিকে সহজে দেখা যায় না। এটা কোনও কবিত্বের কথা নয়। খুব যুক্তিবাদী মানুষের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ একটা যুক্তিহীন স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। তখন চমকে উঠতে হয়। এই যুক্তিহীনতারও একটা সীমা আছে-প্রত্যেক মানুষের আলাদা-সেই সীমা অতিক্রম না-করা পর্যন্ত সংসারে টিকে থাকার কোনও অসুবিধে নেই। কারও কারওর ভেতরের এই চমকপ্রদ সত্তাটি শুধু বিশেষ একজনের চোখেই ধরা পড়ে। বাদল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই আলাদা মানুষকে খুঁজে বার করার নেশায় মেতে উঠেছিল একসময়। উত্তরকালে যখন সে একটি নারীকে বলেছিল, আমি তোমাকে চাই-একটি ফঁকা ঘরের দেওয়ালে হেলান-দেওয়া নারীকে সে

বলেছিল চোখের দিকে চেয়ে–তখন সে এই কথা বলতে পেরেছিল, কারণ সে সেই নারীর ভেতরের আলাদা স্বরূপটিকে চিনতে পেরেছে।

কলকাতা ছেড়ে এসে এই নিভৃত গ্রামে বাদলের অনেক রকম শিক্ষার সুযোগ আসে। সে নানা রকম স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পান্নালাল নামের বকাটে ছেলে কিংবা তার গুরুগম্ভীর দাদামশাইদু'জনে দু'রকম ভাবে বাদলের শিক্ষাকার্যেই সাহায্য করেছে।

সে-দিন নদীর পারে দাঁড়িয়ে দাদামশাই বাদলকে আকাশের তারা চেনাচ্ছিলেন। কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, সন্ধ্যাতারা ইত্যাদি বাদল আগে থেকেই চেনে–কিন্তু দাদামশাই তাকে দেখাচ্ছিলেন রোহিণী, অরুন্ধতি প্রভৃতি।

ঘাটে এসে কয়েকটা নৌকো ভিড়েছে। ইলিশ মাছের ডিঙি। রুপোলি মাছগুলোর শরীর চকচক করছে কুপির আলোয়। কোনও প্রয়োজন নেই, তবু বাদল বলল, দাদামশাই, মাছ কিনবে? কী টাটকা মাছ!

দাদামশাই নিজে কোনও দিন কোনও কিছু কেনাকাটা করেন না। এইসব লোকের সঙ্গে কথা বলাই তার ধাতে নেই। তবু নাতির আবদার ফেলতে পারলেন না আজ। খানিকটা প্রশ্রয়ের সুরেই বললেন, কেন, মাছ কী হবে?

বাড়ি গিয়ে ভাজা খাব টাটকা টাটকা!

দাদামশাই গলা চড়িয়ে জেলেদের উদ্দেশে বললেন, এই, দে তো রে বড় দেখে এক জোড়া মাছ।

জেলেরা দাদামশাইকে চিনতে পারেনি। জালে আজ খুব বড় বড় মাছ পড়েছে, সেই জয়ের আনন্দ, গায়ে এখনও পরিশ্রমের ঘাম শুকোয়নি, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাতেই মত্ত। প্রথম বার তারা কথা শুনলই না। দ্বিতীয় বার বলার পর একজন তরল গলায় বলল, নেন কত্তা, টাকা টাকা জোড়া!

দাদামশাই কঠোর ভাবে বললেন, কত?

টাকা টাকা জোড়ার কম হবে না আইজ!

দামের জন্য নয়, কণ্ঠস্বরের এ তারল্যেই দাদামশাই রেগে আগুন হয়ে গেলেন। নক্ষত্র-বিলাস ছেড়ে হয়ে উঠলেন সামন্ততান্ত্রিক। সে-দিন পাহারাদার পাইক হিসেবে। এসেছিল কেষ্ট ঢালী। দাদামশাই কেষ্টকে বললেন, এক জোড়া মাছ নিয়ে আয়। বলিস, কাল সকালে যেন আমার কাছে দাম আনতে যায়।

কেষ্ট দাদামশাইয়ের ইঙ্গিত বুঝে তরতর করে নেমে গিয়ে সোজা সেই উত্তরদাতা জেলেটির গালে সপাটে এক চড় কষায়।

মাছ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে কেষ্ট পেছন পেছন আসছে, সামনে দাদামশাই আর বাদল পাশাপাশি। কেউ কোনও কথা বলছে না। তার আবদারের জন্যই জেলেটি মার খেল– এ জন্য বাদলের মনে কোনও রকম গ্লানি নেই তার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিকই। মানানসই। তার চেনা ছোট পৃথিবীতে দাদামশাইয়ের মুখের ওপর কথা বলার অধিকার কারওর নেই। সে শুধু এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করছিল।

হঠাৎ দাদামশাই থমকে দাঁড়ালেন। বাদলের হাত চেপে ধরলেন শক্ত করে। একটু চেঁচিয়ে বললেন, যা যা, সরে যা! আবার এসেছিস?

বাদল সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। দু ধারে জমির মাঝখান দিয়ে আলপথ ধরে এতক্ষণ তারা হেঁটে আসছিল। এই পথে এলে রাস্তা সংক্ষেপ হয়। এবার জমি ছেড়ে তাদের উঠতে হবে একটা বাগানে, ডান ধারে একটা ছোট পুকুর, তার পাশে বাঁশঝাড়। বেশ জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখা যায় সবকিছুই।

দাদামশাই হাতের ছড়িটা তুলে ধমকের সুরে বললেন, যা যা, পথ ছাড়!

বাদল জিজ্ঞেস করল, কে দাদামশাই?

বিটি মাছের লোভে এসেছে। তুই চোখ বুজে থাক তো দাদুভাই।

আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

চোখ বুজে থাক। এই পেতনিটা একের নম্বরের শয়তানি।

কেষ্ট একটু পিছিয়ে পড়েছিল, সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিছু কন নাকি বড়কত্তা?

দাদামশাই লাঠি তুলে এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, বিটি, তোর এত সাহস! আমি এখানে রয়েছি–

কেষ্ট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বাদলের হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, কানা ওলা। বড়কত্তারে কানা ওলায় ধরেছে।

কানা ওলা কী?

পেতনিটা মাছ খাইতে আসে। এখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মারবে আমাগো।

আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

চোখ বুইজা থাকো!

কেষ্ট অতিশয় বলশালী পুরুষ। তার শরীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে বাদল আর ভয় পায় না। কেষ্ট কিন্তু ভয় পেয়েছে, সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কত্তা পিছনে চলেন, পিছনে চলেন।

বাদল বিস্ফারিত চোখে দেখল তার দাদামশাই টর্চ জ্বেলে বাঁশ ঝাড়ের ওপর লাঠির ঘা মেরে বললেন, হারামজাদি, মাছ খাওয়ার নোলা! আমার সামনে আসিস, তোর এত সাহস!

বাদল উত্তেজনায় কাঁপছে! সে দেখতে চায়। সে আজ নিজের চোখে পেতনি দেখবে। সে জানে তার দাদামশাইয়ের কাছে ভূত-পেতনি সব হেরে যায়। এ-সম্পর্কে। সে অসংখ্য গল্প শুনেছে! অন্ধকার রাত্রে ঘুরে বেড়ানোর জন্য দাদামশাই বহু বার ভূত-পেতনির সামনে পড়েছেন। কোনও দিন তিনি একটুও বিচলিত হননি, লাঠি উঁচিয়ে ধরেছেন। দাদামশাইয়ের দিকে প্রেতযযানিরা যেন বেশি রকম আকৃষ্ট হয়-গাঁয়ের অন্য মানুষের তুলনায় তারা দাদামশাইয়ের সামনেই আসে বার বার। সাধারণ ভূত-পেতনি তো আছেই-জলাভূমির ধারে দাদামশাই আলেয়ার পাল্লায় পড়েছেন-চৌধুরীচকে একদিন একটা বেলগাছের ডাল নিচু হয়ে নেমে এসেছিল দাদামশাইয়ের সামনে-সেই গাছে ব্রহ্মদৈত্যের বাস-কোনও বার দাদামশাইয়ের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।

এই মাছখেকো পেতনিটাও নাকি দাদামশাইকে অনেক বার বিরক্ত করেছে। বাদল আজ তাকে দেখবে।

কিন্তু দাদামশাই দেখলেন, কেষ্ট ঢালী দেখল, বাদল দেখতে পেল না। সে শুধু দেখল, টর্চের আলো ফেলে দাদামশাই একটা বাঁশের ঝোঁপ পেটাচ্ছেন-সেখানে আর কিছু নেই। দাদামশাই প্রচণ্ড ঝকে গালাগালি দিচ্ছেন, কেষ্টও একসময় বর্শা নিয়ে তেড়ে গেল সেই শূন্যতার দিকে।

তারপর বেশ কিছু দিন ধরে চলেছিল এই গল্প। সবাই বিশ্বাস করেছে। কিছু দেখতে পায়নি বলে মনে মনে নিরাশ হয়েছিল বাদল-কিন্তু সকলকে বলেছে যে সে-ও দেখেছে। এরপর অনেক বছর ধরে বাদল এই ঘটনার কথা ভেবেছে। শেষে একদিন উপলব্ধি হয়েছে যে ওখানে সত্যিই কিছু ছিল না। তার দাদামশাই পাগল ছাড়া কিছু নয়। প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন, বাড়ির লোকদের পদানত করে রেখে তিনি চোখের সামনে ভূত দেখেন। অলৌকিক জগতকেও শাসন করার মানসে তিনি বাঁশ ঝাড়ের ওপর লাঠিপেটা করেন শুধু।

৪১. সরকারি হিসেব মতনই

সরকারি হিসেব মতনই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬০,২২৯ জন; ভারত রক্ষা আইনে অবরুদ্ধ ১৮,০০০; পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ১৪০ এবং আহত ১৬৩০ জন। ষাট জায়গায় সৈন্যবাহিনী মোকাবিলা করেছে বিদ্রোহী জনতার, কোথাও কোথাও বিমান থেকে মেশিনগান চালানো হয়েছে-এ রকম ঘটনা ঘটেছে অন্তত পাঁচ বার। ২৫০টি রেলস্টেশন বিধ্বস্ত হয়েছিল, ৫০০ ডাকঘরের ওপর আক্রমণ হয়, পুড়ে ছাই হয় অন্তত ৫০টি, ১৫০টির বেশি থানা জনতা দখল করতে গিয়েছিল, এ ছাড়া আছে রেললাইন উপড়ে ফেলার ঘটনা।

বলাই বাহুল্য, বেসরকারি হিসেবে এর বহু গুণ বেশি। বেসরকারি হিসেব অবশ্য সে সময় জানার উপায় ছিল না, সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল।

এই ভাবে শেষ হল বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন বা তথাকথিত আগস্ট বিপ্লব। মাসখানেকের বেশি স্থায়ী হয়নি। বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও দেশের কয়েকটি অঞ্চলে জনতা সত্যিকারের খেপে উঠেছিল-মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ বাহিনীকে ধুলিসাৎ করা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু নেতৃত্বের অভাবেই সব ব্যর্থ হয়ে যায়। এত বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঠিক চরিত্রটি যাচাই করে নির্ভীক ভাবে সারা ভারতকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক কেউ দেয়নি। যে-বিপ্লবের সম্ভাবনা শুধু দেখা গিয়েছিল, বিকলাঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু হল। আগা খাঁ প্যালেসে অন্তরীণ অবস্থা থেকে গান্ধীজি বলতে লাগলেন, এইসব হিংসাত্মক ঘটনার জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়। এসবই সরকারের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া।

ইংরেজ জাতির কতগুলি সুসভ্য রীতিনীতি আছে। তাদের শাসন ব্যবস্থা রুল অফ ল-র অধীন এবং অধিকাংশ জায়গাতেই তা মানা হয়। অন্যান্য ইয়োরাপীয় ঔপনিবেশিকদের তুলনায় ইংরেজরা যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচুর সংযমের পরিচয় দিয়েছে-সে কথাও ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করা দরকার। গান্ধী নেহরুর মতন নেতাদের সঙ্গে

দরকষাকষির বদলে যদি তাদের দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে সোজা গুলি করে মেরে ফেলা হত তা হলে তাদের কে আটকাত! গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতি বিশ্বময় ছড়াবার আগেই তাকে খতম করে দেওয়া যেত না? পৃথিবীর দু-চারটে কাগজে বড় জোর প্রতিবাদ বেরোত, তা ছাড়া কোনও সরকার মাথা ঘামাত না।

দর কষাকষির আপোস আলোচনায় ইংরেজ কখনও আপত্তি করেনি কারণ এতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তার। তা ছাড়া দরকষাকষির শিল্প সে নিজে খুব ভালোই জানে। কিন্তু নিজের স্বার্থে সত্যিকারের ঘা পড়লে ইংরেজ চরম নির্মমতা দেখাতেও কুণ্ঠিত হয় না। সারা পৃথিবী জুড়ে ইংরেজ যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত তখন ভারতীয় প্রজাদের এই বেয়াদবি তার একেবারে সহ্য হয়নি। প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতায় সে এই নেতৃত্বহীন আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। নেতাদের বন্দি করে রাখার বদলে তখনই যে খুন করেনি সে তার নিছক নিয়মরীতি রক্ষা বা দয়ামায়ার গুণে নয়। ইংরেজের তকালীন অভিভাবক মার্কিন সরকার ভারতে নিষ্পেষণ নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। সুতরাং প্রকাশ্যে, বড় বড় নেতাদের বন্দি করে রেখে এবং গান্ধীজির সঙ্গে চিঠি চালাচালির ছলে মুখ-রক্ষা করে গ্রাম গ্রামান্তরে সাধারণ মানুষের কাছে ইংরেজ দেখিয়েছে তার রুদ্র রূপ। বিনা বিচারে অসংখ্য হত্যার নজির আছে সেই সময়।

পুরো তেইশ দিন মেদিনীপুরের একটি মহকুমা স্বাধীন করে রেখেছিল সূর্য আর যোগানন্দ। সতীশ সামন্তর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বাকি দেশের কোথায় কী ঘটছে তার কোনও খবরাখবর আসে না। অসহায় সংবাদপত্রগুলি মূক। নাইথ আগস্ট নামে একটি গুপ্ত পত্রিকায় গরম গরম খবর দেখলে মনে হয় সারা দেশই বুঝি স্বাধীন হয়ে গেলঅথচ এক জেলার মানুষ আর এক জেলায় গেলে হকচকিয়ে যায়। সেখানে বিপ্লবের নামগন্ধও নেই। গান্ধীজির ‘ভারত ছাড়ো’ ডাক এবং ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ ধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে স্থানীয় কংগ্রেসি নেতারাও ভেবেছিলেন এ-আন্দোলন একটা চূড়ান্ত রূপ নেবেই। অথচ সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনও নির্দেশ আসে না। প্রথম সারির নেতারা জেলে গেলে দ্বিতীয় সারির

নেতাদের প্রকৃত নেতৃত্ব নেবার জন্য তৈরি করা হয়নি। পদে পদে দ্বিধা ও সংশয়েই আমাদের ইতিহাস আকীর্ণ। অযথা প্রাণ দিয়েছে সাধারণ মানুষ।

সূর্য এবং যোগানন্দ তাদের ব্যক্তিগত বীর্য, সামর্থ ও বুদ্ধি দিয়ে যতখানি করবার করেছে, তারপর তারাও থমকে গেল। দুজনেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করে গেছে বলে নানা রকম অকল্পনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, স্থানীয় লোকরা ওদের দুজনকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত। কিন্তু একসময় দু'জনেই থমকে গিয়ে ভাবল, এর পর কী? খড়গপুর থেকে সৈন্যবাহিনী মার্চ করে আসছে, ওরা শুনতে পাচ্ছে সেই নিশ্চিত পদশব্দ-কী নিয়ে সেই সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াবে? এ রকম তো কথা ছিল না। কেন আর একদল পেছন থেকে আক্রমণ করছে না সৈন্যবাহিনীকে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নামে কিছু দিন ধরে অদ্ভুত সব কাহিনী শোনা যাচ্ছিল, কোথায় তিনি? আসাম সীমান্তে সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোথায় সুভাষবাবু? সুভাষবাবু তখনও অনেক দূরে।

সন্ত্রাসবাদী বা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল-বেয়াল্লিশের আগস্টে তারা শেষ বার মরিয়া হয়ে নেমে পড়েছিল। এই বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। স্বাধীনতার সোনার পাথরবাটি অর্জনের কৃতিত্ব চলে গেল নরমপন্থীদের হাতে। বাটিটা ভেঙে আধখানা করে নিতেও যাদের আপত্তি নেই।

ব্যর্থ বিপ্লবীর মতন করুণ চরিত্র আর হয় না। পরাজিত নৃপতিরও একটা মহিমা থাকে-কিন্তু এরা শুধু অপবাদ নিয়েই চলে যায়। শকুনেরও বাসা থাকে, ইঁদুরেরও গর্ত থাকে, কিন্তু এদের কোনও আশ্রয় নেই।

সামরিক বাহিনী এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিল মেদিনীপুরের বিপ্লবের সাধ। সন্দেহজনক পল্লিগুলোতে জ্বালিয়ে দিতে লাগল আগুন। আগুনের নাম লাল ঘোড়া। সেই লাল ঘোড়া ছুটতে লাগল গ্রাম থেকে গ্রামে। আন্দোলনের পাণ্ডাদের মধ্যে যাদের হাতের কাছে পাওয়া গেল, গুলি করে শেষ করে দেওয়া হল তাদের বাকিদের মাথার মূল্য ধার্য করে লটকে দেওয়া হল নোটিশ।

সূর্য আর যোগানন্দর হাতে একটা পয়সা নেই, কিন্তু ওদের মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা করে। ওরা তখন তাড়াখাওয়া পাগলা কুকুরের মতন পালাচ্ছে। দুজনেই মরতে, রাজি, তবু অকারণে পুলিশের গুলি খেয়ে মরতে চায় না। ইতিমধ্যেই ওরা ব্রজগোপালের মৃত্যুসংবাদ শুনেছে। ব্রজগোপালকে মারবার আগে সামরিক বাহিনীর লোক বুটের ঘা দিয়ে তাঁর চোখ-নাক থেতলে দিয়েছিল।

দু'জন ব্যর্থ বিপ্লবী পালাচ্ছে। মাঠঘাট-জঙ্গল ভেদ করে অবিরাম ছুটে যাচ্ছে দু'জন যুবক– স্পষ্ট দেখা যায় এই দৃশ্য। এরা এখন অতি সাংঘাতিক প্রাণী, এরা না করতে পারে এমন কাজ নেই। যে-কোনও মূহূর্তে এরা মানুষ খুন করতে পারে। এরা এখন পৃথিবীর কারোকে বিশ্বাস করে না। সবাই ওদের শত্রু। এরা লোকের কাছ থেকে খাবার কেড়ে খায়, সামান্য প্রতিরোধেই মারধর করে।

অবিরাম ছুটে যাচ্ছে দুই পলাতক। কোথায় যাবে ওরা জানে না। দেশের জন্য ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, এখন এই দেশের কোথাও ওদের স্থান নেই। ওরা শুধু পালাতে থাকবে।

সূর্যকে নিয়ে যোগানন্দ একটু মুশকিলে পড়েছে। সূর্য প্রায়ই রক্তবমি করে। বলশালী, স্বাস্থ্যবান ছেলে, কোথাও কেটে ছড়ে গেলে কিংবা হাত-পা ভাঙলেও চিন্তার কিছু ছিল না, কিন্তু ভেতর থেকে এত রক্ত পড়া খুব খারাপ লক্ষণ। এখনই চিকিৎসা করাতে না পারলে আর দু-এক দিনের বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

একটা খালের ধারে পড়ন্ত সন্ধ্যাবেলায় ওরা দুজনে বসেছে, যোগানন্দ একটা বিড়ি ধরাল। চিক করে মাটিতে থুতু ফেলে বলল, তুই কখনও নৌকোর ওপর থেকেছিস?

সূর্য একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে, গোড়ার দিকের সাদা নরম অংশটা চিবোতে চিবোতে বলল, না।

যোগানন্দ খালের জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, বেশ লাগে থাকতে। রাত্তিরবেলা ঘুমটা ভালো হয়। আমি একবার ছিলাম প্রায় মাসখানেক, রসুলপুরের নদীর মুখটায়। এত ভালো লাগত, আঃ, টাটকা টাটকা মাছ ধরে নিয়ে ভেজে ফেলা, গরম গরম ভাত আর কাঁচালঙ্কা, ডালফাল লাগত না, শুকনো শুকনো ভাতই মেরে দিতাম এক থালা-মাছ যা খেয়েছি না-এক সের দেড়-সের আমি একাই

কথা বলতে বলতে যোগানন্দ হাসতে লাগল। আপন মনে হাসি, সহজে থামতেই চায়। তারপর উরুতে চাপড় মেরে উল্লাসের সঙ্গে বলল, শালা! সারা দিন কিছু খাইনি, রাত্তিরে কী খাব তার ঠিক নেই-আর মনেও পড়ে যাচ্ছে যতসব খাবার গল্প! তোর বউদি কী রকম রান্না করত বল তো?

সূর্য মৃদু গলায় বলল, একটা নৌকো এ-দিকেই আসছে।

হুঁ। আমি দেখেছি।

উঠে পড়তে হবে?

হুঁ।

একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলে হয় না? যদি পুলিশ ফুলিশ না থাকে-যদি জেলে নৌকো হয়-তা হলে ওদের কাছ থেকে নৌকোটা কেড়ে নিলে হয় না?

আমিও একবার তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ঝঞ্ঝাট আছে। লোকগুলোকে মেরে তাড়ালেও এক্ষুনি গিয়ে পুলিশে খবর দেবে। এই নৌকো নিয়ে তো তাড়াতাড়ি পালানো যাবে না! এই খাল দিয়ে কোথায়ই বা যাওয়া যায়!

তা হলে?

আর এক কাজ করা যায়। যদি একজন বা দু'জন লোক থাকে তা হলে একদম খতম করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু লাশ নিয়ে ঝামেলা হবে–এখানে কারওর না কারওর চোখে পড়ে যাবেই।

তা হলে আর বসে থাকার দরকার নেই।

সূর্য হাতটা উঁচু করল। যোগানন্দ আগে উঠে সূর্যর হাত ধরে টেনে তুলল। সূর্য বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, বসলে সহজে উঠতে পারে না। তবে এখনও সে দৌড়োতে পারে, বেশ জোরেই পারে, কিন্তু দম থাকে না বেশিক্ষণ। প্রয়োজনে সে যে-কোনও লোকের মুখে ঘুষি মেরে এখনও ধরাশায়ী করে দিতে পারবে–তারপর নিজেই অনেকক্ষণ ধরে হাঁপাবে। ওর অসুখ যে কতখানি তা ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না অবশ্য।

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছে তো?

সূর্য বলল, চলুন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার ওরা হাঁটতে লাগল।

চলো মুসাফির, চলো। থেমে থেকে লাভ কী? আরও কত দিন চলতে হবে তার ঠিক কী? পালাও, পলাতক! জীবন থেকে, মৃত্যু থেকে পালাও!

ওরা দৌড়োতে লাগল, থামতে লাগল, আবার দৌড়। কোথাও বিশ্রামের সুযোগ নেই, কোথাও একটু স্বস্তি নেই। তিন-চার মাইলের মধ্যে কোনও খাবারের দোকান বা লোকজনের বাড়ি চোখে পড়ে না কিন্তু–পুলিশের গাড়ি দেখা যায়। সার্চ লাইটের মতন আলো ওদের খোঁজে।

ওরা লোকজনের চোখের সামনে আসতে চায় না। সাধারণ গ্রামবাসীদেরও এখন আর বিশ্বাস করা যায় না। ওদের কোনও জায়গায় দেখা গেলেই সে-গল্প ছড়িয়ে যায় একটু বাদেই, পুলিশের কানে গিয়ে ঠিক পৌঁছোয়। ইনফর্মার আর স্পাইতে ছেয়ে গেছে। গোটা

জেলা। তা ছাড়াও, গ্রামবাসীরা ওদের পছন্দ করে না এখন-পুলিশি অত্যাচারের জন্য দায়ী এই বাবুরাই-এদের জন্যেই আজ তাদের বাড়িঘরের সর্বনাশ। কেউ ওদের আশ্রয় দিতে চায় না, কেউ খাবার দিতে চায় না। কোথাও কারওর বাড়িতে লুকিয়ে থাকার সব পথ এখন ওদের রুদ্ধ।

চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘে, পথঘাট ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। এরই মধ্যে সূর্য একবার বসে পড়ে খানিকটা রক্তবমি করল। মুখ ধোওয়ার জন্য তার জল দরকার। যোগানন্দ তার হাত ধরে টেনে টেনে আন্দাজে নিয়ে এল একটা ডোবার ধারে। ময়লা দুর্গন্ধ জলেই যোগানন্দ জোর করে মুখ ধুইয়ে দিল সূর্যর। তারপর বলল, এখানে এখন একটু শুয়ে থাক। কাছাকাছি লোকজন নেই।

আপনি কিছু খাবেন না?

ধুর শালা! কে আমার জন্য খাবার সাজিয়ে বসে আছে?

আপনার খিদে পায়নি?

পায়নি আবার? আগুন জ্বলছে পেটের মধ্যে। কাছাকাছি কোনও জন্তুজানোয়ার পেলে কাঁচাই খেয়ে ফেলতাম।

যোগানন্দদা আমি এখানে থাকছি। আপনি কিছু খাবারটাবার খেয়ে আসুন। ফাঁকায় কোনও বাড়িটাড়ি দেখলে সোজাসুজি চাইবেন। কাল ভোরের মধ্যেই আমরা এখান থেকে সরে পড়ব। রিস্ক বেশি নেই।

তুই থাকতে পারবি একলা?

হ্যাঁ? খুব পারব।

এই অন্ধকারে রাস্তা চিনব কী করে?

ওই যে তালগাছটা দেখছেন–ও রকম লম্বা তালগাছ এ-দিকে আর একটাও দেখা যাচ্ছে না। এক্ষুনি জ্যোৎস্না উঠবে, আপনি ঠিক দেখতে পাবেন।

তুই যেতে পারবি না আমার সঙ্গে? তোরও তো কিছু খাওয়া দরকার।

আমার খিদে নেই। আমি এখানে বসছি। আপনি ঘুরে আসুন।

সূর্য, তুই ঠিক একলা থাকতে পারবি তো! বুকে বেশি ব্যথা করছে নাকি?

না, না–

তা হলে যাই ঘুরেই আসি। খিদের জ্বালায় স্থির থাকতে পারছি না। যদি কিছু পাই, তোর জন্যও নিয়ে আসব।

আপনি ঘুরে আসুন।

তুই এই গাছটায় হেলান দিয়ে বোস। ঠিক আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।

যোগানন্দ চলে গেল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। সূর্য আকাশের দিকে চেয়ে দেখল–একটা বড় মেঘের চাই ঢেকে আছে চাঁদ–তবে শুক্লপক্ষের রাত, মেঘ ফুঁড়ে চাঁদ বেরোবেই। তালগাছটার ওপরে কোনও বড় জাতের পাখির বাসা আছে, শোনা যায় ডানার ঝটপটানি।

কোনও মানুষের পায়ের শব্দ শুনে সূর্য উৎকর্ণ হয়ে উঠল। রিভলবারটা বার করে ধরতেই চাপা গলায় শোনা গেল, আমি।

যোগানন্দই ফিরে এসেছে। সূর্যর পাশে ধপ করে বসে পড়ে বলল, থাক, আর যাব না।

কেন, গেলেন না কেন?

খিদের জ্বালায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বলেই যাবার কথা ভেবেছিলাম। না হলে, এ ভাবে কেউ যায় না। তোকে এ ভাবে একলা ফেলে কি আমি যেতে পারি?

আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

না হোক। আমি যদি খাবারের সন্ধানে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে যেতাম, তা হলে তোর কী হত? তুই যা শরীরের অবস্থা করেছিস, একলা তো বেশি দূর যেতেই পারবি না।

আমার জন্য আপনার ফিরে আসা উচিত হয়নি।

এখন চুপ করে শুয়ে থাকতো।

হরদা আমাকে বলেছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। কেউ অন্য কারওর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবে না। আমি নিজেকে ঠিক সামলাতে পারব। আমার জন্য আপনার বসে থাকা উচিত নয়।

যোগানন্দ রেগে গিয়ে বলল, ওসব উচিত অনুচিতের গুষ্টির আমি ইয়ে করি। ওসব চুকেবুকে গেছে। এখন আর কোনও নিয়ম নেই। আমার খুশি আমি যাব না!

আমি একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাব।

আজ তিন বার রক্তবমি করেছিস। রোজই বাড়ছে।

ও কিছু নয়। ভেতরে ভেতরে হেমারেজ হয়েছিল-সেই বাজে রক্তটুকু বেরিয়ে যাচ্ছে।

খুব সায়েন্সের জ্ঞান দেখছি তোর।

আপনি কি ভাবছেন আমার টি বি হয়েছে? যে টি বি রুগির মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে তার দৌড়োবার ক্ষমতা থাকে না। অসম্ভব।

টি বি না কী তা আমি জানি না। কিন্তু আর চিকিৎসা না করলে এক দিনও চলবে না। শোন, কাজের কথা বলি। এই মাঠেঘাটে থেকে আর কোনও লাভ নেই। শহরে যেতে হবে। শহরের ভিড়ে মিশে যেতে না পারলে আর নিস্তার নেই।

কোন শহরে যাবেন?

যত বড় শহর হয়, ততই ভালো। তবে কলকাতা নয়। বোম্বের দিকে যেতে পারলে সুবিধে হয়, ওখানে কেউ চিনতে পারবে না।

সূর্য একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তার বুকের মধ্যে অসহ্য ব্যথা-যেন একটা পাথর বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জোরে নিশ্বাস ফেলতে গেলেও কষ্ট হয়। আস্তে আস্তে বলল, বোম্বে অনেক দূর। অত দূর কি পৌঁছোতে পারব?

যোগানন্দ সূর্যর গায়ে হাত রেখে বলল, ঠিক পৌঁছে যাব। আমি নিয়ে যাব তোকে। আমরা খড়্গপুরের খুব কাছেই চলে এসেছি মনে হচ্ছে। খড়্গপুর শহর নিশ্চয়ই খুব গরম হয়ে আছে। দুটো-তিনটে দিন সাবধানে থাকতে হবে। যদি ট্রেন চালু থাকে-

খড়্গপুরে আমরা কোথায় থাকব?

একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে, অত ভাবছিস কেন? ওখানে আমার দু-তিন জন চেনা লোক আছে তাদের বাড়িতে অবশ্য থাকা সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছি না। না-থাকাই বোধহয় ভালো। তবু ওরা অন্তত কিছু সাহায্য তো করতে পারবে! যদি সাহায্য করতে না চায় গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

খড়্গপুরে আমারও চেনা একজন থাকে। আমার এক বোন, ওর শ্বশুরবাড়ি খড়্গপুরে-

কোন পাড়ায়?

সে-সব কিছু জানি না। ওর স্বামীর নামটা শুধু জানি, প্রভাসকুমার লাহিড়ী।

শুধু নাম জেনে কি কারওর ঠিকানা খুঁজে বার করা যায়? কী করেন ভদ্রলোক, উকিল কিংবা ডাক্তার হলেও-

সেসবও জানি না। ভদ্দরলোককে আমি দেখিইনি।

তা হলে আর কী হবে! যদি বা খুঁজে পাওয়া যায়, সে ভদ্দরলোক কি তোকে থাকতে : দেবেন? তোর চিকিৎসা করানো দরকার।

সূর্য চোখ বুজে শ্রীলেখার মুখখানা ভাববার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, শ্রীলেখার মুখ তার কিছুতেই মনে পড়ছে না। এত চেনা মুখও মানুষ এ রকম ভাবে ভুলে যায়! সূর্য যেন দেখতে পাচ্ছে, শ্রীলেখা তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারের মধ্যে, টের পাওয়া যাচ্ছে তার অস্তিত্ব-কিন্তু তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। নিজের মাথার চুল খিমচে এক ঝাঁকুনি দিল সূর্য।

তারপর আস্তে আস্তে দেখতে পেল শ্রীলেখার চোখ, নাক ও মুখের একটু অংশ, শ্রীলেখা পাশ ফিরে আছে। ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে আলো। শ্রীলেখার চেহারা একটুখানি বদলে গেছে। আগে খুব চুল ছিল তার মাথায়-এখন যেন একটু ছোট মনে হচ্ছে, কেটেছে কঁচি দিয়ে? কানের পাশ দিয়ে আলাদা ভাবে সরু চুলের গোছা নেমে এসেছে। তাকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে এখন! সূর্য মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি আর কোনও দিন ওর সামনে দাঁড়াতে পারব?

হঠাৎ যেন সত্যিই শ্রীলেখা তার সামনে এসে দাঁড়াল। অভিমানের সঙ্গে বলল, তুমি তো এক বারও আমার কাছে এলে না? তুমি আসবে বলেছিলে।

সূর্যর উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তার ইচ্ছে হল, শ্রীলেখার কোমর ধরে ওঠে। শ্রীলেখার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আমি বাঁচতে চাই, আমি বেঁচে থাকতে চাই।

যোগানন্দ সূর্যকে আস্তে ঠ্যালা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই, বিড়বিড় করে কী বকছিস কী? ইস, জ্বর হয়ে গেছে দেখছি।

সূর্যর তখন বুকের যন্ত্রণায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। সেই অবস্থাতেই হঠাৎ তার খুব রাগ হয়ে গেল। চোখমুখ জ্বালা করতে লাগল তার। শ্রীলেখার কথা মনে হলেই তার এ রকম রাগ হয়। সেই রাগ তাকে আলাদা শক্তি দেয়।

মাঝখানে বেশ কয়েক দিন ভুলে ছিল। এখন আবার শ্রীলেখার কথা মনে পড়তেই সে ছটফটিয়ে উঠল। শ্রীলেখা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাবে আর সে এখানে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে গাছতলায় পড়ে পড়ে অসুখে ধুকবে? যদি মরতেও হয়, তার আগে শ্রীলেখার সংসারটা সে তছনছ করে দিয়ে যাবে।

সূর্য প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন, খগপুরেই যাওয়া যাক।

যোগানন্দ তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে বলল, রাত্তিরটা কাটুক। রাত্তিরটা বিশ্রাম করে নে এখানে।

সূর্য রুক্ষ গলায় বলল, বিশ্রামের কোনও দরকার নেই। চলুন, সময় নষ্ট করে লাভ কী!

আর কথা না বাড়িয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

৪২. যারা লম্বা তালগাছের ওপরে

যারা লম্বা তালগাছের ওপরে উঠে রসের জন্য হাঁড়ি বেঁধে আসে, শুধু তারাই জানে তালগাছে ওঠার কষ্ট। পায়ে দড়ি বেঁধে, হাত দুখানি টিকটিকির থাবার মতন আঠালো করে উঠতে হয়-প্রথমে বেশ তরতর করেই ওঠা যায়, যত ওপরে ওঠে ততই হাত-পা ধরে আসে, পৃথিবী নীচের দিকে টানে। একেবারে শেষের দিকে, যখন আর মাত্র হাত তিনেক বাকি, তখন মনে হয় আর পারা যাবে না, এবার হাত এলিয়ে সরসর করে নীচে

পড়ে যেতে হবে। মাত্র আর ওইটুকু, যার পরেই ওপরের ডাল ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে-সেই সব জেনেও ওইটুকু পথ পার হওয়া সবচেয়ে শক্ত। চলতি কথায় একেই বলে তালগাছের তিন হাত।

জেদ ও উত্তেজনার বশে অনেকখানি যাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে ক'জন? শেষ মানে তো শুধু সাফল্য নয়, একটা বিশ্বাসের পরিণতিযা শুধু মন নয়। শরীর দিয়েও অনুভব করতে হয়। কত মোক্ষ-পাগল মানুষ চৌরাস্তায় এসে ভুল পথে গেছে। মরুভূমিতে মরুদ্যানের পাশেই অনেক অনেক নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। উত্তপ্ত বালির সমুদ্র পার হয়ে যারা আসে, তারা অনেকেই জলের দৃশ্য দেখে অতিরিক্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে, জলের কাছে আর পৌঁছোতে পারে না। শেষ মানেই সাফল্য নয়, বাস্তবতা নয়, নশ্বরতা-জয়ী এক বিশ্বাস।

সারা রাত ধরে হেঁটে এসে যোগানন্দ আর সূর্য ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেখতে পেল খড়্গপুর শহর। নোংরা, ধুলোয়-ভরতি একটা রেললাইন তো শুধু নয়, যেন ওই অমরাবতী, ওখানে অপেক্ষা করে আছে স্বর্গসুখ। ভোরের নরম আলোয় সত্যিই যেন ওই শহর থেকে দিব্যজ্যোতি বেরোচ্ছে। ওখানে আছে আশ্রয়, ওখানে আছে মানুষ, ওখানে আছে। পরিচিত জীবন। জল যেমন জলের দিকে যায়, মানুষও মানুষকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। গত কয়েক দিন ধরে ওরা দু'জন মানুষজন দেখলেই আত্মগোপন করছিল, এখন মনে হচ্ছে, কতক্ষণে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলবে।

এতক্ষণ সূর্যই যোগানন্দকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছিল, যোগানন্দ ঘুমোতে চাইলেও ঘুমোতে দেয়নি, বিশ্রাম করতে দেয়নি-এখন সূর্য আর নিজেই পারছে না। দু'-তিন বার সে রাস্তায় থুবড়ে পড়েছে, আবার উঠেছে, যোগানন্দর সাহায্য নিতে চায়নি, এখন আর সে সামর্থ্যও নেই। এখন তাকে বাধ্য হয়ে যোগানন্দর কাঁধে ভর দিতে হয়েছে। যোগানন্দ তার বগলের তলায় হাত দিয়ে প্রায় হেঁচড়ে নিয়ে আসছে।

যোগানন্দও দারুণ পরিশ্রান্ত, খিদের জ্বালায় কাতর, সারা রাত ঘুম নেই–তবু যোগানন্দ বেশ উল্লাসের মধ্যে আছে। হাসিঠাট্টা, খিস্তিখেউড় করে নিজের সঙ্গে সে যেন বেশ একটা কৌতুকে মেতে উঠেছে। সূর্যকে উদ্দেশ্য করে সে যা বলছে, সূর্য তার কোনও উত্তর না দিলেও কিছু যায় আসে না। সূর্য হু হা ছাড়া কিছুই বলেনি। একটু বাদেই সূর্যর পা এলিয়ে গেল, হাঁটু দুমড়ে সে পড়ে যেতে লাগল। যোগানন্দ ঘুরে দাঁড়িয়ে শক্ত করে। সূর্যর কাধ চেপে ধরে বলল, এই অমর, ওঠ! কী করছিস কী? আর মোটে একটুখানি!

সূর্য ঘোর-লাগা মানুষের মতন আচ্ছন্ন গলায় বলল, হ্যাঁ, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাচ্ছি আমি।

ওঠ, ওঠ, আর বড় জোর আধ মাইল। রেলওয়ে কোয়ার্টারে আমার একজন চেনা লোক আছে তার বাড়িতে গেলেই নরম বিছানা পাবি, গরম গরম চা–

সূর্য বলল, এই তো উঠছি।

ওঠার বদলে সূর্য মাটিতে শুয়ে পড়ল। যোগানন্দ তাকে একরকম টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে এল কাছাকাছি একটা কালভার্টের ওপর। নিজে সেখানে বসে সূর্যকে ভালো করে শুইয়ে দিল কোলের ওপর মাথা দিয়ে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সূর্য আবার গা ঝাড়া দিয়ে বলল, চলো!

যোগানন্দ বলল, একটুখানি বসা যাক। আর একটু আলো ফুটুক। আমরা যে বাড়িতে উঠব, সে-পাড়াতেই একটা দোকানে দারুণ জিলিপি ভাজে। আর কড়াইশুটির কচুরিও পাওয়া যায়। যা খাব না আজ, জন্মের মতন খেয়ে নেব শালা! কচুরি ও সঙ্গে ম্যাড্রাসি কফি।

সূর্য মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, থাকতে দেবে?

কেন দেবে না। আলবত দেবে। ও না দেয় ওর বাপ দেবে। ওর কাকা আমাদের স্টেটের নায়েব ছিল।

তার মানে?

যোগানন্দ হাসতে হাসতে বলল, ভুলে যাচ্ছিস কেন, আমি একটা জমিদারের ছেলে। এখনও রাস্তায়ঘাটে অনেক লোক আমাকে দেখে প্রণাম করে। পকেটে একটাও পয়সা থাকলে কী হয়–

নরম নীলচে রঙের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সবেমাত্র পূর্ব দিগন্ত লাল হল। সেই সূর্য ওঠার দিকে চোখ রাখলে মনে হয় এরই নাম আবির্ভাব! শ্রান্ত শরীরে এই ভোরের সূর্যকে খুব রমণীয় মনে হয়। অন্তত এই সময় এই সূর্য বিজ্ঞানসম্মত নয়, প্রবাদপুরাণের দেবতা।

সেপ্টেম্বরের শেষে বাতাস ঠান্ডা হয়ে এসেছে। ভোরের হাওয়ায় স্পর্শে গায়ে একটু ছমছমানি লাগে। আকাশ পরিষ্কার, তকতকে নীল, বর্ষায় ধোওয়াধুয়ির পর গাছপালাগুলি সতেজ সবুজ। চারদিকে বেশ টাটকা রঙের সমারোহ।

যোগানন্দ বুক ভরে অনেকখানি নিশ্বাস টেনে নিয়ে আপন মনে বলল, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

সূর্য কোনও উত্তর দিল না। যোগানন্দ তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেশ জোরে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আমরা ভালো ভাবে বাঁচব। চালাকি নাকি?

সূর্য চোখ বুজে নিথর ভাবে বসে আছে। যোগানন্দ তার কাঁধে হাত রেখে বলল, বড় বড় করে কয়েক বার নিশ্বাস টান, দেখবি শরীরটা বেশ ভালো লাগবে।

আমি অনেকটা ঠিক হয়ে গেছি।

যোগানন্দ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পূর্ব আকাশের দিকে। ডান হাত দিয়ে মুখখানা ক'বার কচলে নিল। অকস্মাৎ দেখা গেল যোগানন্দের দু'চোখে জল। এতক্ষণ সে এমন হাসি

ঠাট্টার মধ্যে ছিল যে এখন এই অশ্রু সত্যিই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়! সে আবার হাত দিয়ে চোখমুখ মুছে দূরের দিকে চেয়ে বলল,

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি,
নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি- সম।
তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম
আলোক।

একটু থেমে যোগানন্দ বলল, এরপর কী যেন? মনে পড়ছে না। অমর, তোর মনে আছে?

সূর্য বলল, না।

তুই রবিবাবুর কবিতা পড়িসনি?

তেমন ভাবে পড়ার সুযোগ পাইনি।

যদি কালকেই তুই মরে যাস, তা হলে তুই টেরও পাবি না-জীবনে কী একটা- আনন্দের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলি। এই কবিতাটা আছে সানাই বইতে। আমিও অনেক দিন আর এসব বই পড়িনি। রবিবাবুর এক একটা কবিতা পড়ে মনে হয়, উনি এগুলো নিজের জন্য লেখেননি। আমাদের হয়ে আমাদের সব দুঃখের কথা উনি লিখে দিয়েছেন।

আর একটু বলুন না।

ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় এই রকম:

চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল মিনতি
পরুষ মরুর পথে তোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণ তলে ক্রুর বালুকারে।...
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবান
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

যোগানন্দ আবার থেমে যেতেই সূর্য বলল, আরও একটু বলুন।

আর মনে নেই যে! শুনলে মনে হয় না, এ যেন ঠিক তোর কিংবা আমার মনের কথা?

দু'জনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। যোগানন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল চারদিকে। তার মুখখানা থমথমে। নিজের বুকের ওপর চাপড় মারছে আনমনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বেশ তো ফিরে গিয়েছিলাম, সংসার টংসার সাজিয়ে বসেছিলাম-কেন যে তুই আমাকে বার করে আনলি!

সূর্য ওর মুখের দিকে তাকাতেই যোগানন্দ তাড়াতাড়ি বলল, আমি অনুতাপ করছি না। মোটেই অনুতাপ করছি না। তুই না গেলেও আমাকে বেরিয়ে পড়তে হতই একবার যখন ছোঁয়াচ লেগেছে-তখন কি আর ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে থাকতে পারতাম! যা করেছি সজ্ঞানেই করেছি। বেশ করেছি! এই রকম অবস্থায় আবার পড়লে হয়তো আবার ওই রকমই করতাম। কিন্তু এই রকম একটা শান্ত সকালবেলা মনে হয় না, যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি-এ সবই অর্থহীন? একটা ছোট বাড়িতে নিঝঞ্ঝাটে জীবন কাটিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার! এবার যদি কোনওক্রমে ঘরে ফিরতে পারি, তা হলে আর এ রাস্তায় বেরোব না।

সূর্য বলল, আপনি যদি সেই ডাকাতির সময় না যেতেন–

যোগানন্দ আপশোসের সুরে বলল, ওই তো আমার দোষ! আমার হাতে অনেক। ময়লা। আসলে কী জানিস, আমার মাথার ঠিক নেই। কিছু দিন বাদে বাদেই আমার সব হিসেবের গোলমাল হয়ে যায়।

যোগানন্দদা, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন মানে কী?

তোর তো এখনও জীবন শুরুই হয়নি, ওটা বুঝতে পারবি না।

আমি তো অনেক মানুষ দেখলাম।

নাঃ, কোনও লাভ নেই। তোর আর আমার মাথার ঠিক পেছনেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, এসময় জীবন টিবন নিয়ে আলোচনা করার কোনও মানে হয় না।

দুজনেই চকিত মাথা ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল পেছনে। তারপর পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে শুকনো ভাবে হাসল। যোগানন্দ বলল, চল, যাওয়া যাক। তুই উঠতে পারবি তো?

চলুন।

সূর্য উঠতে যেতেই তার কোমরে গোঁজা রিভলবারটা খুলে বেরিয়ে এসে প্রথমে পড়ল কালভার্টের ওপরে, ঠং করে শব্দ হয়ে গড়িয়ে গেল নীচের নালায়। সূর্য ব্যগ্র ভাবে অত্যন্ত শরীর নুইয়ে সেটা তুলতে যেতেই যোগানন্দ তার ঘাড় ধরে তুলে এক ধমক দিয়ে বলল, কী করছিস কী? মাথা ঘুরে পড়ে যাবি যে!

ওটা তুলতে পারছি না।

যোগানন্দ রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভাবে বলল, কী আর হবে ওটা তুলে। আমারটাও ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখি বরং। এখন তো এগুলো সঙ্গে রাখাই বিপদ।

দুর্বল শরীরে কয়েক বার নিশ্বাস নিয়ে সূর্য বলল, আমাদের লড়াই কি শেষ হয়ে গেছে?

যোগানন্দ এতক্ষণ পরে গলা ভরতি করে হা হা শব্দে হেসে উঠল। তারপর সূর্যর কাঁধ চাপড়ে বলল, তুই কি এর পরেও লড়াই করার স্বপ্ন দেখছিস? তুই যদি এরপর আর সাতটা দিনও বেঁচে থাকিস তা হলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিস!

সূর্য অনুভূতিহীন গলায় বলল, আমি সহজে মরব না!

কেউ কি মরতে চায়? আমি কি মরতে চাই? ভেবেছিলাম তো এবার লড়াইতে পাপ চুকিয়ে দেব। কিন্তু পুলিশের গুলি খেয়ে মরার সাধ আর আমার নেই। আমি এবারেও ঠিক বেঁচে যাব কিন্তু তুই যা শরীরের অবস্থা করেছিস, ক'দিন থাকতে পারবি?

আমি শিগগিরই ভালো হয়ে উঠব।

তোর এত বাঁচার শখ কেন রে?

আমার অনেক কিছু এখনও বাকি আছে।

কী বাকি আছে?

সূর্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে বলল, অনেক কিছুই বাকি আছে। কিন্তু কাল থেকে মনে হচ্ছে, একজনের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু হবে না। আমি তার সামনে গিয়ে বলব, আমি আর জোর করতে চাই না, তোমাকে কেড়ে নিতে চাই না, কিন্তু তুমি তোমার মনের মধ্যে আমার জন্য একটু জায়গা রেখো।

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করল, সে কে?

আপনি চিনবেন না।

তোর এত কাঁচা বয়স, এরই মধ্যে প্রেমে ট্রেমে পড়লি কবে?

সেসব কিছু না। আচ্ছা, আপনি কি মরতে চান?

তোকে এ অবস্থায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

আমার হাতটা একটু ধরুন, রিভলবারটা তুলে আনি।

ওটা আর সঙ্গে না-রাখাই উচিত।

আমি ওটা না-নিয়ে যেতে পারব না।

ঠিক আছে, তুই দাঁড়া–

যোগানন্দ নীচে গিয়ে রিভলবারটা তুলে এনে সূর্যর হাতে ধরিয়ে দিল। এখন যোগানন্দর মুখের ভাব আবার বদলে গেছে। চিন্তার লেশমাত্র নেই। সূর্যর কাধ ধরে বলল, অমর, সোজা হয়ে দাঁড়া তো! এই তো, ঠিক আছে। শোন, আমরা দুজনেই খোলা রিভলবার হাতে নিয়ে শহরে ঢুকব। আমরা ফাঁইটার, শেষ পর্যন্ত আমরা ফাঁইট করে যাব। বখতিয়ার খিলজি নাকি সতেরো জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা জয় করেছিলেন, আর আমরা দুজনে

এই একটা শহর জয় করে ফেলতে পারব না? আমাদের সামনে কে দাঁড়াবে? রাজি আছিস?

উত্তর না দিয়ে সূর্য হাসল।

আমরা কারোকে পরোয়া করব না। তোর কাছে কার্তুজ ক'টা আছে?

ডজন তিনেক।

আমার কাছেও ওই রকমই আছে। লড়ে যাব শেষ পর্যন্ত। শেষ বুলেটটা রেখে দেব নিজের মাথার জন্য। শালা, এই কুকুর-বেড়ালের মতন পালিয়ে পালিয়ে থাকা আর ভালো লাগে না।

আমরা তো শহরেই যাচ্ছি।

হাঁ। কোনও শুয়ারের বাচ্চা ঝঞ্ঝাট করতে এলে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।

যেন এটা একটা রসিকতা, এই ভাবে কথাটা শেষ করে হাসল যোগানন্দ। নিজের রিভলবারটা বার করে চুমু খেল।

কাছেই একটা নিমগাছের পাতার আড়ালে অদৃশ্য থেকে একটা দোয়েলপাখি শিস দিচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। যোগানন্দ পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে এবার একটা পালটা শিস দিল। হালকা গলায় বলল, যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে! চল!

শহরের তখনও ঘুম ভাঙেনি। রাস্তায় কদাচিৎ একটি-দুটি লোক। ম্যাড্রাসি কফির দোকানটা সদ্য খুলেছে বটে কিন্তু ওদের কফি খাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

রেলওয়ে স্টাফ কলোনির মধ্যে একটা কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে যোগানন্দ বেশ খোলা গলাতেই ডাকল, প্রবীরবাবু, প্রবীরবাবু!

দরজাটা একটু খুলতেই কোনও সুযোগ না দিয়ে ভেতরের লোকটিকে ঠেলে যোগানন্দ ঢুকে গেল ভেতরে। তারপর ডাকল, আয় অমর, ভেতরে আয়।

অল্প বয়সেই বুড়োটে হয়ে যাওয়া একজন লোক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দু'জনের চেহারা ও বেশবাসের অবস্থা দেখে ওদের সম্পর্কে কোনও ভুল ধারণা করার অবকাশ নেই। তবু লোকটি বলল, কী হয়েছে?

যোগানন্দ বলল, দরজা বন্ধ করে দাও।

কী হয়েছে কী?

খুব বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি অনেক বার তোমার এখানে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করেছিলে, আগে আসা হয়ে ওঠেনি। এখন এসেছি।

যোগানন্দর পারিবারিক নাম ছোটবাবু। লোকটি সেই নামেই ডেকে বললে, ছোটবাবু, আপনার কথা এখানে সবাই জানে।

কী জানে?

আপনারা দিলনগর থানায়–

কী করে জানল যে আমিই?

আপনার নামে পুলিশের হুলিয়া বেরিয়েছে। পোস্ট অফিসে কাগজ সেঁটে দিয়েছে। আমার এক ভাগ্নে পোস্ট অফিসে কাজ করে, সে দেখেছে।

তাতে কি আমার ছবি আছে?

না।

আমরা এখানে দু'দিন থাকব। এ আমার ছোটভাই।–মায়ের পেটের ভাই না হলেও আপন ভাই।

এখানে ভীষণ ধরপাকড় হচ্ছে। যে-কোনও পাড়া হঠাৎ ঘিরে ফেলে সার্চ হচ্ছে। পরশু দিন আমাদের এখানে সার্চ হয়ে গেছে, ধরে নিয়ে গেছে দু'জনকে।

একবার যখন সার্চ হয়ে গেছে আর হবে না।

তার কোনও মানে নেই। অনেক জায়গায় দু-তিন বার, যখন তখন–

আমরা মাত্র দুদিন থাকব। তোমার কাছে শিবাজল ট্যাবলেট আছে?

আজ্ঞে?

শিবাজল ট্যাবলেট আছে বাড়িতে? এই ছেলেটাকে এক্ষুনি কিছু ওষুধ খাওয়ানো দরকার।

ওষুধ তো নেই।

দোকান খুললেই ওষুধ আনতে হবে। তারপর একজন ডাক্তার।

কী হয়েছে এনার?

সেটা ডাক্তারই বলতে পারবে।

লোকটি হাত জোড় করে বলল, ছোটবাবু, আমি এখানে বউছেলে নিয়ে ঘর করি–

আমরা কোনও অসুবিধের সৃষ্টি করব না।

আপনি বুঝতে পারছেন না–যদি পুলিশের নজরে পড়ি–

যোগানন্দ হঠাৎ দপ করে রেগে উঠল। উত্তপ্ত চোখে বলল, আর যারা দেশের জন্য লড়াই করছে, তাদের কারওর মা নেই, বাবা নেই, বউ-ছেলেপুলে নেই, না? তাদের মায়েদের কষ্ট নেই, তাদের ছেলেমেয়েরা কাঁদে না? স্নেহ দয়া মায়া বুঝি তাদের জন্য নয়!

আমি ছাপোষা মানুষ–

আমাকে বেশি রাগিয়ো না। নেহাত বাধ্য হলে না হলে কি তোমার বাড়িতে আসতাম? এখন কি আমাদের ধুলোপায়ে বিদায় করতে চাও? নিমকহারাম!

ওকথা বলবেন না। আপনাদের বাড়ির নুন খেয়েছি এককালে। আপনারা আমাদের জন্য অনেক করেছেন। কিন্তু যদি পুলিশ টের পায়, আপনাদের তো যা হবার হবেই, আমার চাকরি যাবে। তখন কোথায় দাঁড়াব বলতে পারেন।

পুলিশ টের পাবে কেন! প্রবীর, একটা কথা ঠিক করে বলল তো–পুলিশের সঙ্গে তোমার কোনও যোগাযোগ আছে? ইনফরমারের কাজ নিয়েছ নাকি? তোমাদের রেলের কিছু ওয়ার্কার স্যাবোটাজ করতে গিয়েছিল না?

আমি তখন ছুটিতে ছিলাম। পুলিশ দেখলেই আমি আঠারো হাত দূরে থাকি!

একটা সাত-আট বছরের ছেলে মুখে আঙুল দিয়ে ওদের দেখছিল। সূর্য ছেলেটির কাছে গিয়ে বলল, খোকা, তোমার নাম কী?

ছেলেটি কোনও উত্তর না দিয়ে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তার থেকে একটু ছোট আর একটা ছেলে এসে কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়াল।

যোগানন্দ প্রবীরকে ধমক দিয়ে বলল, যাই হোক, কোনও রকম এদিক-ওদিক করার চেষ্টা কোরো না। তা হলে সুবিধে হবে না। আমরা এখানে থাকতে এসেছি। এখানে থাকব যতক্ষণ–না সুবিধে মতন জায়গা পাই।

যেখানে ওদের থাকতে দেওয়া হল, সেটা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘর। পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তারা দূর থেকে উঁকি মেরে যাচ্ছে, ডাকলেও কাছে আসে না। সূর্য। দরজার কাছে গিয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা করলেও ওরা পালিয়ে যায়।

যোগানন্দ বলল, বাচ্চাদের আমি ভালোই বাসি। কিন্তু এখন এই বাচ্চাদের দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। এখন এরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওরা এক্ষুনি গিয়ে পাড়ার অন্য বাচ্চাদের কাছে আমাদের সম্পর্কে গল্প করবে। তারা আবার তাদের মা বাবার কাছে বলবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের কথা এখানে সবাই জেনে যাবে। এই কলোনির মধ্যে একজন-দু'জন যে পুলিশের ইনফরমার আছে, সে সম্পর্কে আমি বাজি ফেলতে পারি।

সূর্য মাথা নাড়ল। যোগানন্দ ঠিকই বলছে। সেই জন্যই সে এতক্ষণ বাচ্চাগুলোর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করছিল। দিন দশেক আগে তারা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল- সেখানে বাচ্চাদের জন্যই তাদের উপস্থিতির কথা ফাঁস হয়ে যায়।

যোগানন্দ বলল, তুই হাজার চেষ্টা করেও বাচ্চাদের আটকাতে পারবি না। ওদের বারণ করলে ওরা আরও বেশি করে বলবে। আগে জানতাম না এ বাড়িতে এতগুলো বাচ্চা। প্রবীর আমার চেয়েও এক বছরের ছোট-এর মধ্যেই পাঁচটা বাচ্চা পয়দা করে ফেলেছে কী করে জানব।

সূর্য বলল, ছোট মেয়েটাকে দেখতে ভারী সুন্দর। মুখটা সত্যিই সুন্দর। অন্য সময় হলে কত আদর করতাম, লজেঞ্জুস কিনে দিতাম- এখন ইচ্ছে করছে গলা টিপে মেরে ফেলি। হয়তো ওই মেয়েটার জন্যই আমরা ধরা পড়ব।

সূর্য হেসে বলল, সো সুইট ওয়াজ নেভার সো ফেটাল!

এক বাটি করে হালুয়া এবং দু'কাপ অতি বিস্বাদ চা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের জন্য। যোগানন্দ চোখের নিমেষে হালুয়াটুকু শেষ করে লোলুপ ভাবে তাকিয়ে রইল বাটিটার

দিকে। বেচারা! ওর এত বড় শরীর ও প্রচণ্ড খিদের কাছে ওইটুকু হালুয়া কী! অনিচ্ছুক গৃহকর্তার বাড়িতে আতিথ্য নেওয়ার গ্লানি যে কী তা ওরা ভালো ভাবেই জানে। যোগানন্দর আরও মনে লাগছে এই জন্য যে তাদেরই একদা অনুগৃহীত প্রজার বাড়িতে। সে এসেছে-যে এর আগে বহু বার তাকে এ বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্য অনুরোধ করেছে-আজ সে পেট ভরে খেতেও দেবে না? যেন তারা কোনও ঘৃণিত প্রাণী। তারা এত লড়াই করল কার জন্য? এদের জন্য নয়? অপরিচিত লোকের বাড়িতে উঠলে সে হয়তো খাবারের জন্য জোর জুলুম করতে পারত কিন্তু চেনা লোকের কাছে। ভয় দেখিয়ে খাবার চাওয়া যায় না।

যোগানন্দ সবকটা জানলা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে ফেলল। রাগের মাথায় চেয়ারকে লাথি মেরে ফেলে দিল ঘরের কোণে। সূর্য টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে-হ্যাঁত দুখানা বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা। মুখখানা অসম্ভব বিবর্ণ।

যোগানন্দ তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

না।

এখন ঘুমোস না। শরীর আরও খারাপ লাগবে। স্নানটান করে-এরা যদি ভাত খেতে দেয়, সেটা খেয়ে নিয়ে তারপর পালা করে ঘুম দিতে হবে। তুই আগে ঘুমিয়ে নিস। তার আগে কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নেওয়া যাক। তোর এখানে কোন আত্মীয় থাকে বললি, তার বাড়িতে তোকে থাকতে দেবে?

তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে?

যদি পাওয়া যায়। থাকতে দেবে?

মনে তো হয়।

এখানে বেশি দিন থাকা যাবে না, বুঝলি! তা হলে তোকে সেখানে রেখে আমি কেটে পড়তাম।

আপনি কোথায় যাবেন?

বাংলাদেশ থেকে সরে পড়তেই হবে। তোর শরীরের অবস্থা খারাপ, তোর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু আমার তো এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। দিনের-পর-দিন পারব না ঘরে বসে থাকতে বেরোলে ধরা পড়বই। ব্রিটিশদের ইনটেলিজেন্স ব্যবস্থা সাংঘাতিক। গোটা ভারতবর্ষে এতকালের মধ্যে রাসবিহারী বোস ছাড়া আর কেউ গ্রেফতার এড়াতে পেরেছে?

লোকের বাড়িতে এ রকম ভাবে জোর করে থাকার চেয়ে আমার জেলে যেতে খারাপ লাগবে না।

খুব আরামের জায়গা ভেবেছিস, তাই না? তোর যা লালটু চেহারাত শালা হোমো তোর বারোটা বাজিয়ে দেবে।

আমরা কি আজই এখান থেকে চলে যাব?

দেখি! এক হিসেবে পুলিশের হাতে এখন তুই ধরা পড়লে তোর পক্ষে ভালোই হত। জেলের হাসপাতালে চিকিৎসা হতে পারত। কিন্তু তার আগেই যদি পেঁদিয়ে শেষ করে। দেয়? ব্রজদাকে যে ভাবে মারল–

যোগানন্দ প্রবীরকে ডেকে পাঠাল। সে আসতেই জিজ্ঞেস করল, ওষুধ আনিয়েছ? প্রবীর শুকনো মুখে বলল, না, এখনও দোকান খোলেনি। দেখি, একটু পরে–

তোমার চেনা ডাক্তার আছে?

আমাদের তো রেল কোম্পানির ডাক্তার।

কাছাকাছি অন্য কোনও ডাক্তার নেই?

ছোটবাবু, ডাক্তার ডাকলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে না?

এ-ছেলেটি কি বিনা চিকিৎসায় মরবে নাকি?

ছোটবাবু, আপনিই ভেবে দেখুন আমি কী করতে পারি! কোনওক্রমে কথাটা ছড়ালে-

বাচ্চাগুলোকে আটকে রাখতে পারবে?

কী বললেন!

তোমার ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়ি থেকে একদম না বেরোয়, সে ব্যবস্থা করতে পারবে? পারবে না, আমি জানি। অন্য বাড়ির ছেলেমেয়েরা এলে, তাদের তো আটকাতে পারবে না। যাকগে, তোমাদের এখানে ট্রেন ঠিক মতন চালু হয়েছে?

হ্যাঁ।

সব দিকে ট্রেন চলছে?

হ্যাঁ। আপনি কোথায় যাবেন?

একটুও দ্বিধা না করে যোগানন্দ বলল, আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। আমাকে নিরাপদে ট্রেনে তুলে দেবার দায়িত্ব তোমার। আর একটা কথা, তুমি প্রভাস লাহিড়ী বলে কারোকে চেন? খড়্গপুরেরই লোক।

না তো!

এখানকার স্থানীয় লোক, খুঁজে বার করতে পারবে না?

শুধু নাম শুনে কী করেন তিনি?

ও-সব জানি না। তবে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট লোক। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। তোমার যে ভাগনে পোস্ট অফিসে কাজ করে, তাকে জিজ্ঞেস করো-রেডিয়োর লাইসেন্স বা টেলিফোন থাকতে পারে বাড়িতে। স্টেশনমাস্টারকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। খুঁজে বার করো। এ ছাড়া আমার কিছু টাকা ধার চাই। আমি তোমাকে হুন্ডি লিখে দিচ্ছি-তুমি আমার বাবাকে সেটা দেখালে টাকাটা ফেরত পেয়ে যাবে।

কলোনির এইসব বাড়িগুলির মধ্যে খানিকটা গ্রাম গ্রাম ভাব আছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা সবাই সবার বাড়িতে যখন তখন যাওয়া-আসা করে-পরস্পরের খোঁজখবর নেয়। কার বাড়িতে কোন দিন কী রান্না হল তাও গোপন থাকে না।

সারা দিন ধরে প্রবীরের বাড়িতে যে কত লোক এল তার ঠিক নেই। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, শিশু। ঘরের দরজা বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে বেজার মুখে বসে রইল যোগানন্দ। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, এর থেকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানোও ভালো। অমর, চল, পাততাড়ি গুটোতে হবে আজই। এত সুখ কপালে সইছে না।

সন্ধ্যাবেলাতেই প্রবীর ভালো খবর নিয়ে এল। প্রভাস লাহিড়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রভাসকে অনেকে না চিনলেও তার বাবা জগদীশ লাহিড়ী অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন লোক, সবাই চেনে। ওদের মস্ত বড় বাড়ি-থাকার জায়গার কোনও অসুবিধে নেই।

খবরটা আনতে পেরে প্রবীর খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এবং সে ভাবটা লুকোবারও কোনও চেষ্টা নেই। ওরা কবে সেখানে যাবে সে প্রশ্নও করল না, বলল, আপনারা কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবেন না। রান্না চেপে গেছে, বেশিক্ষণ লাগবে না।

যোগানন্দ বলল, আমরা রাত ন'টার আগে বেরোব না। আর প্রবীর, তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়ে বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে আসবে।

প্রবীর রীতিমতন ভয় পেয়ে বলল, রাত নটায়? এখনও এখানে রাত্তিরবেলা কেউ বেরোয় না।

যাদের নাইট ডিউটি থাকে?

তাদের বাধ্য হয়ে যেতেই হয়।

আমরাও বাধ্য হয়েই যাচ্ছি। কারফিউ তো আর নেই।

প্রবীরের বাড়িতে আসার পনেরো ঘণ্টা পরেই সে বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে পড়তে হল ওদের। যোগানন্দ প্রবীরকে জোর করে ধরে এনেছে-তার স্ত্রী পর্যন্ত এসে কাকুতিমিনতি করেছিল, যোগানন্দ ছাড়েনি। বাড়ি খোঁজার জন্য লোকজনকে জিজ্ঞাসা করা কিংবা রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনও কাজের কথা নয়।

প্রবীর একেবারে থরথর কঁপছে যাকে বলে। দু'পা গিয়েই থেমে পড়ে বলছে, এবার আমাকে ছেড়ে দিন, আপনারা যেতে পারবেন।

রাস্তায় রাস্তায় বেশ পুলিশের টহল আছে। ওরা সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারল। ক্রমে শহরের এক প্রান্তে এসে পড়ল ওরা। এখানে বাড়িঘর কম, ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে।

প্রবীর পঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমাকে আর নিয়ে যাবেন না। এবার সহজেই চিনতে পারবেন। এই যে সোজা রাস্তা-প্রথম ডান দিকে বেঁকেই সেই বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি, সামনে বাগান আছে, গেট আছে-ও রকম বাড়ি ওখানে একটাই-চিনতে কোনও ভুল হবে না। বাড়ির সামনে লেখা আছে 'লাহিড়ী লজ' ।

যোগানন্দ বলল ঠিক আছে, তুমি যাও। সাবধানে যেয়ো। তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ। যদি বেঁচে থাকি, ফিরে এসে নিশ্চয়ই তোমার জন্য কিছু একটা করব।

প্রবীর চলে যেতেই যোগানন্দ বলল, আমরা দু'জনে রাস্তার দু'পাশ দিয়ে যাই। বেশ অন্ধকার অন্ধকার আছে। তুই পারবি তো?

সূর্য বলল, আজ আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে যেন অসুখই নেই। ভালো করে চিকিৎসা করাবি। তোর বোনের বাড়িতে আমিও দিন দুয়েক থেকে যাব। ভালো করে একটু খাওয়াদাওয়া করা দরকার। যা শুনলাম, তোর বোনের শ্বশুর বেশ বড়লোক বড়লোকদের পুলিশ সহজে ঘাঁটায় না। তোর আপন বোন?

না।

আমাকে থাকতে দেবে তো?

আমাকে দিলে আপনাকেও নিশ্চয়ই দেবে।

প্রবীরকে ছেড়ে দেবার পর দু মিনিটও সময় যায়নি। হঠাৎ একটা বাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটি সাদাচামড়া, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কিংবা ইংরেজ। খুব সম্ভব লোকটি ওদের দুজনকে দেখতে পায়নি। ওরা রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেই পারত। কিন্তু যোগানন্দ মাথার ঠিক রাখতে পারল না। সে চাপা গলায় বলল, পুলিশ, দৌড়ো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে যোগান মাঠের মধ্যে নেমে দৌড়োতে গেল এবং আচমকা আছাড় খেয়ে পড়ল সশব্দে। তাতেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল লোকটির। সে সাইকেল থামিয়ে মাটিতে এক পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে নিরীহ ভাবেই জিজ্ঞেস করল, হেই, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দেয়ার?

যোগানন্দ আর একটা ভুল করল। সে উত্তর দেবার বদলে গুলি চালাল। অতি ব্যস্ততার জন্য গুলিটা যে শুধু সাহেবটার শরীরের এক হাত দূর দিয়ে চলে গেল তাই-ই নয়, রাস্তার অন্য দিকে দাঁড়ানো সূর্যর গায়েও লাগত আর একটু হলে। সূর্য তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে

রাস্তার পাশে পড়েই গড়াতে শুরু করেছে। সূর্য ফের উঠে দাঁড়াবার আগেই যা হবার হয়ে গেল।

গুলির শব্দ শুনেই সাহেবটিও সাইকেল সমেত রাস্তার ওপরে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠেই দৌড়োতে শুরু করেছে, সাইকেলটা হাতে ধরা, উঠতে পারেনি। যোগানন্দ রিভলবার হাতে তাড়া করে গেল ওকে, না-মেরে ছাড়বে না! হঠাৎ সাহেবটি পেছন ফিরে যোগানন্দর ঠিক মুখের ওপর গুলি করল। একটিমাত্র গুলি, যোগানন্দ পড়ে গেল মাটিতে। সূর্য তখন উঠে বসেছে। তার রিভলবার বার করতে করতেই সাহেবটি সাইকেলে উঠে পড়েছে। সূর্যর গুলিও তার গায়ে লাগল না। সূর্যও রিভলবার হাতে রাস্তার পাশে পাশে দৌড়ে যেতে লাগল, তার পরবর্তী দুটি গুলির মধ্যে একটি লাগল সাহেবের কাঁধে-তবু সে সাইকেল থামাল না-বেরিয়ে গেল বাঁই বাঁই করে। আর কিছুক্ষণ দৌড়ে নিরাশ হয়ে থেমে গেল সূর্য। ফিরে এল যোগানন্দর কাছে।

যোগানন্দ কোনও যন্ত্রণা পায়নি। তার মস্তক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, মৃত্যু তৎক্ষণাৎ। তার ঠোঁটের ভঙ্গিতে তখনও একটা রাগী ভাব। সূর্য যোগানন্দর নাকের কাছে হাত রাখল, বুকে হাত রাখল। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে গেল যে এখনও সে ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছে না। এ সবই যেন অর্থহীন ঘটনা। একটু আগে যোগানন্দ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এখন পড়ে আছে তার লাশ। সূর্য এখন কী করবে? তার থেমে থাকার উপায় নেই।

সূর্যর মাথাটা ঘুলিয়ে গেল, সে আর কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। যোগানন্দর নিশ্চিত মৃত্যু হয়ে গেছে জেনেও সে দেহটাকে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল যোগানন্দদা উঠুন, শিগগির উঠুন! কোনও সাড়া না পেয়ে সে অনবরত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আর কেউ আসছে না তো! অনিচ্ছা সত্ত্বেও সূর্যর মুখ দিয়ে বার বার হেঁচকি উঠছে। তারপর সে একবার যোগানন্দর দেহটা কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করল, পারল না, দু'জনেই একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। তখন সূর্যর মৃত্যুভয় জাগল। যে মৃত্যুভয় অত্যন্ত স্বার্থপর।

সূর্য উঠেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। তাকে পৌঁছোতে হবে, তাকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতেই হবে। শরীরের কথা তার মনে নেই। যত জোরে সে ছুটতে পারে, তার থেকেও জোরে সে ছুটছে। লাহিড়ী লজের প্রধান গেট দিয়ে না-ঢুকে, বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে ফুলগাছ পায়ে মাড়িয়ে সে দরজার কাছে এসে গতির ঝোঁক থামাল। দুম দুম করে দরজায় ঘা দিতে লাগল তারপর। সে আর দেরি করতে পারবে না।

৪৩. যদিও শ্রীলেখা সব সময়ই

যদিও শ্রীলেখা সব সময়ই একজন আগন্তুকের প্রতীক্ষা করত, কিন্তু সূর্য যখন এল, তখন সে টের পায়নি। সে ঘুমিয়ে ছিল।

দরজায় দুম দুম আওয়াজ শুনে বাড়ির একজন বৃদ্ধ চাকর খুলে দিল দরজা। সূর্য হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে দেওয়াল ধরে হাঁপাতে লাগল। তার বুক থেকে তখন হাপরের মতন শব্দ হচ্ছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে–সে ঘর দেখতে পাচ্ছে না, মানুষ দেখতে পাচ্ছে না–সবকিছু ঘুরছে। সবকিছুতে রক্ত ছড়ানো, যোগানন্দের রক্ত। আঃ, কে হাতুড়ি পিটছে তার মাথায়! সূর্য তার মাথা এদিক-ওদিক সরিয়ে নিচ্ছে। আর একটুখানি সময় কেউ তাকে দেবে না?

বৃদ্ধ চাকর ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে গো বাবু? কে?

সূর্য মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও!

পরক্ষণেই আবার মাথা ঘুরে গেল সূর্যর। দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলাতে গিয়েও হাতের জোর পাচ্ছে না। একটু দূরেই একটা লম্বা সোফা–ওই পর্যন্ত সে পৌঁছোতে পারবে না? এ কী, তার হাতে রক্ত এল কোথা থেকে? দেওয়ালে রক্ত লেগে যাচ্ছে– এরা রাগ করবে। কী যেন লোকটির নাম? কার বাড়িতে সে এসেছে! আর একটু সময় কেউ তাকে দেবে না?

চোখ খুলে রক্তবর্ণ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সূর্য বলল, ওকে ডাকো।

কাকে? আপনি কাকে খুঁজছেন?

কী যেন নাম? কার যেন বাড়ি এটা? মাঠ-ঘাট পেরিয়ে কোন দিকে সে ছুটছিল? না, পৃথিবীতে রক্তের ঢেউ ছাড়া আর কিছু নেই।

দেওয়াল ছেড়ে সোফাটার দিকে এগোতে গিয়ে সূর্য ঝুপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। এবার বেশ ভালো লাগছে, ভারী আরাম, মাটি ভেদ করে সে যেন চলে যাচ্ছে অনেক অনেক নীচে, ঠান্ডা অন্ধকারে।

বুড়ো চাকর ভয় পেয়ে ডেকে আনল আর একজন চাকরকে। সে আবার রান্নার ঠাকুরকে ডাকল। তারপর খবর পাঠানো হল সরকারবাবুর কাছে। বাড়ির চাকরবাকর ও কর্মচারীদের একটি ছোটখাটো জনতা কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করল সূর্যর দেহটা-তারপর তার হাতে রক্ত দেখে আঁতকে উঠল। এবার কর্তাদের খবর পাঠানো দরকার।

কর্তাদের মধ্যে প্রভাসকুমারই একমাত্র পুরুষমানুষ তখন বাড়িতে উপস্থিত। প্রভাসকুমারের বাবা তীর্থ থেকে এখনও ফেরেননি। আত্মীয়স্বজনরাও নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছেন-শিগগিরই দুর্গাপূজা উপলক্ষে সবাই আবার এ বাড়িতে এসে জড়ো হবেন।

প্রভাসকুমার তখন নিজের পাঠকক্ষে একখানি বই চোখের সামনে মেলে গভীর চিন্তামগ্ন। সরকারবাবু বাইরে থেকে ভয়ার্ত গলায় ডাকল।

প্রভাসকুমারের ভুরু কুঁচকে গেল। মুখ না-ফিরিয়েই বললেন, কাল সকালে এসো। এখন বিরক্ত কোরো না!

দাদাবাবু একবার নীচে আসতে হবে।

বলছি তো এখন বিরক্ত কোরো না।

সরকারবাবু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে তড়বড় করে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গেল।

প্রভাসকুমার বই মুড়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এত রাত্রে আমাকে বিরক্ত করার মানে কী?

প্রভাসকুমার তখন শোপেনহাওয়ার বিষয়ক মোহিতলাল মজুমদার রচিত কবিতা পাঠ করছিলেন। মাঝখানে এরকম বিঘ্ন ঘটায় তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। চটিটা পায়ে গলিয়ে বললেন, চলো, দেখি!

বারান্দা দিয়ে যাবার সময় শয়নকক্ষের দরজা ঠেলে একবার উঁকি দিলেন। আলো জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রীলেখা। বালিশময় চুল ছড়ানো। মশারির মধ্যে তাকে দেখাচ্ছে সুপ্ত রাজকন্যার মতন। আবার দরজা ভেজিয়ে চটি ফটফটিয়ে নীচে নেমে এলেন প্রভাসকুমার।

মাটিতে পাশ ফিরে শুয়ে আছে সূর্য। পা দু'খানা লম্বা করে ছড়ানো, হাত দু'খানা বুকের ওপর গুটিসুটি করা।

প্রভাসকুমার একনজর তাকে দেখে নিয়ে কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করল, এ কে?

কেউ কিছু জানে না।

এ ভেতরে এল কী করে?

বুড়ো চাকরটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তার কোনও দোষ নেই, সে ভেবেছিল কর্তাবাবুদের কেউ ফিরে এসেছেন।

প্রভাসকুমার বললেন, এ তো অজ্ঞান হয়ে গেছি দেখছি। এর মুখেচোখে জল দাও।

সরকারবাবু বলল, দাদাবাবু, ওর হাতে রক্ত লেগে আছে দেখছি, পুলিশে খবর দেব?

পুলিশের নাম শুনেই প্রভাসকুমার মুখ বিকৃত করলেন। এই সুন্দর শান্ত রাত্রিতে কবিতার বই ফেলে উঠে এসে একটি রক্তাক্ত অপরিচিত মানুষ দেখাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট-এর ওপর পুলিশের দৃশ্য সহ্য করা তার পক্ষে এখন অসহ্য। তিনি পুনরায় মৃদু গলায় বললেন, আগে ওর মুখেচোখে জল দাও।

এক বালতি জল এনে ছিটিয়ে দেওয়া হতে লাগল সূর্যর মুখে। কাপড় বাঁচাবার জন্য প্রভাসকুমার একটু সরে দাঁড়ালেন। প্রভাসকুমার ধপধপে ধুতি ও ফরসা বেনিয়ান পরে আছেন-তাঁকে দেখলে সব সময়ই বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়, পৃথিবীতে এত ধুলোবালি ময়লা বাঁচিয়ে তিনি থাকেন কী করে?

জলের ঝাঁপটায় সূর্য চোখ খুলল একবার, অন্য দিকে পাশ ফিরল। ঠিক যে কাতর ভাবে তা নয়, বিরক্তিসূচক উঃ আঃ শব্দ করল আস্তে আস্তে।

প্রভাসকুমার প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

সূর্যর চোখে এখনও পৃথিবীটার রং লাল, ছলাৎ ছলাৎ করে সে শুনতে পাচ্ছে রক্তের শব্দ। সে কি এখনও দৌড়োচ্ছ? আর যে দৌড়োনো যায় না, পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাবে, বুক ফেটে হাওয়া বেরিয়ে আসবে।

সূর্য ঝাঁপসা গলায় বলল, ওকে ডাকুন।

কাকে? তুমি কাকে খুঁজছ?

সূর্য আবার চোখ বুজে ফেলল। এটা কার বাড়ি? তার কোথায় আসার কথা ছিল। সে যেন একটা গভীর দিঘির জলে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, বার বার ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে জোর করে, পারছে না।

প্রভাসকুমার বললেন, ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে।

একজন চাকর বলল, আবার জল চালাব?

প্রভাসকুমার নিচু হয়ে সূর্যর চোখের পাতা টেনে দেখলেন। কপালে হাত দিয়ে বললেন, গায়ে ভীষণ জ্বর। এত অল্প বয়স–

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একে সোফাটার ওপর শুইয়ে রাখো আজ রাত্তিরটার মতন। দাদাবাবু, যদি চোরডাকাত হয়?

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে।

প্রভাসকুমার ওপরে উঠে এসে আবার কাব্যগ্রন্থ খুলে বসলেন। মনটা চঞ্চল হয়ে গেছে। ঘন ঘন হাঁটু দোলাচ্ছেন। রাত্তিরবেলা তারই বাড়ির বৈঠকখানায় একটি অচেনা যুবকের চেতনাহীন দেহ বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর চিন্তাকে আলোড়িত করে। এসব কী হচ্ছে চারদিকে? এত আগুন, রক্ত, চিৎকার, অত্যাচার। পৃথিবীতে কি কোনও দিন শান্তি আসবে না? ইংরেজরা বড় অদ্ভুত জাতসব সময় এত যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত, তবু ওই জাতের মধ্যে এমন ভালো ভালো কবি জন্মায় কী করে? তবে, বাল্মীকি না জন্মালে পৃথিবীতে আর কোনও কবিই জন্মাত না। লোকে জানতই না, কবিতা কাকে বলে! সবই তো ইন্ডিয়া থেকে শিখেছে! আমাদের পুষ্পক রথ, আমাদের নালিকাস্ত্র–এসব কতকাল আগের। নেহাত আজকের এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে...

বাতি নিভিয়ে এ-ঘরের দরজা টেনে প্রভাসকুমার চলে এলেন শোবার ঘরে। শ্রীলেখাকে জাগালেন না। মশারি তুলে শ্রীলেখার শিয়রের পাশে বসে বিয়ের দিন বাসর ঘরে শ্রীলেখার দিকে যে রকম ভাবে তাকিয়ে ছিলেন ঠিক সেই একই দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। রূপ দেখে দেখে আর আশ মেটে না। এই চোখ, এই ভুরুর রেখা, হরিণীর মতন মসৃণ ত্বক–এসবের মধ্যেই কী এক জাদু আছে–নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকলেও তো ক্লান্তি বোধ হয় না কখনও।

প্রভাসকুমার শ্রীলেখার চুলের গুচ্ছ হাতে তুলে নিয়ে গন্ধ শুকলেন। সব রমণীর চুলেই কী রকম যেন একটা ঐতিহাসিক গন্ধ আছে। অ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রার চুলে নিশ্চয়ই ঠিক এই রকমই গন্ধ পেয়েছিল। আচমকা প্রভাসকুমারের মাথায় দুটি কবিতার লাইন এসে গেল:

এখন কি আমি অতীত কালের ভুলে
নাক ডুবায়েছি ক্লিয়োপেট্রার চুলে?

প্রভাসকুমার খুব খুশি হয়ে উঠলেন। শুধু খুশি নয়, কবিতা রচনার সময় তার মনের মধ্যে একটা দিব্য আনন্দ দেখা দেয়। পরবর্তী লাইনটির কথা তিনি যখন চিন্তা করছেন, তখন শ্রীলেখা চোখ মেলে বলল, এখন ক'টা বাজে?

প্রভাসকুমার প্রসন্ন মুখে বললেন, অনেক রাত।

তুমি ঘুমোবে না?

তুমি ঘুমাও, আমি তোমাকে দেখি।

মশারির ভেতরে বোধহয় মশা ঢুকে গেছে।

কই না তো! তোমায় কামড়েছে?

কী জানি! পিন পিন করে একটা শব্দ হচ্ছিল কানের কাছে, তাই ঘুম ভেঙে গেল।

প্রভাসকুমার সন্তর্পণে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বললেন, তুমি চোখ বোজো, আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা।

শ্রীলেখা, একটু পরে আবার যদি তোমাকে জাগিয়ে তুলি, তুমি রাগ করবে?

ও মা, রাগ করব কেন?

মানে, যদি ইচ্ছে হয়, মানে যদি–

আলো নিভিয়ে দেবে না?

রূপসুধা পান করতে করতে আলো নিভিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব প্রভাসকুমারের পছন্দ হয় না। কিন্তু স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। মশারি থেকে বাইরে এলেন।

আলো নেভাবার সঙ্গে সঙ্গে জানলার বাইরের দৃশ্য দেখা গেল। প্রভাসকুমার দেখলেন তার বাড়ির বাইরের রাস্তা দিয়ে সার সার পুলিশের গাড়ি চলেছে। নিস্তব্ধ নিশীথে সেই মন্থরগতি গাড়ির শব্দ মনে আতঙ্ক জাগায়। প্রভাসকুমার ভয় পেয়ে গেলেন। গত কয়েক দিন ধরে এ-দিকে পুলিশের আনাগোনা কিছু কমেছিল–আজ রাত্তিরে আবার এই চাঞ্চল্যের কারণ বুঝতে তার দেরি হল না। তিনি দুই আর দুই-এ চারের হিসেব করে নিলেন। জানলার একটা পাল্লা ভেজিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ফিসফিস করে বললেন, আজ আমাদের বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে।

শ্রীলেখা শুনতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, কেন?

প্রভাসকুমারের পাতলা মুখোনি এখন বিবর্ণ। জানলার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, কোথা থেকে একটা ছেলে আজ আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

শ্রীলেখা বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি স্বামীর পাশে এসে জিজ্ঞেস করল, কে?

কী জানি! নামটাম বলতে পারছে না।

কী করে ঢুল?

চাকরবাকররা বুঝতে পারেনি।

নাম বলছে না?

বলার ক্ষমতা নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের বাড়িতে এল কেন?

দেখে তো চোরডাকাত মনে হল না। অল্প বয়স, সবে দাড়িগোঁফ উঠেছে।

পুলিশ ওকে খুঁজছে?

তা জানি না। ছেলেটার হাতে রক্ত লেগে ছিল।

শ্রীলেখা মুখ দিয়ে একটা ভয়ের শব্দ করল। প্রভাসকুমার হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, পুলিশ এলে আমি বলব, আমার কোনও দোষ নেই! একজন কেউ যদি আমার বৈঠকখানায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, আমি কি তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে বলব? কেউ তা পারে?

এখন সে আমাদের বাড়িতেই আছে?

নড়বার ক্ষমতা নেই, যাবে কী করে! পৃথিবীর কেউ কি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?

এরপর বেশ কিছুক্ষণ স্বামী-স্ত্রী জানলার পাল্লার আড়াল থেকে তাকিয়ে রইল বাইরে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুলিশের গাড়ি আনাগোনা করল রাস্তা দিয়ে।

শ্রীলেখা একসময় বলল, তোমার পিসেমশাইকে খবর পাঠাবে নাকি?

প্রভাসকুমার বললেন, পুলিশ আসুক আগে!

পুলিশ শেষ পর্যন্ত এল না বাড়ির মধ্যে। ধীর গতিতে গাড়িগুলো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একসময় চলে গেল। পুলিশের মতলব ঠিক বোঝা গেল না।

বিছানায় ফিরে এসে স্বামী-স্ত্রী কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন ভাবে আলোচনা করল। তারপর একসময় প্রভাসকুমার শ্রীলেখাকে শক্ত ভাবে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন। নিজের স্বপ্নের জগতের বাইরে প্রভাসকুমার বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেন না।

শ্রীলেখা জেগে রইল আরও অনেকক্ষণ। তার বুকের মধ্যে মেল ট্রেনের মতন আওয়াজ হচ্ছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। সে কিছু ভাবতেও সাহস পাচ্ছে না। এক এক সময় হয় এ রকম, সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়। কে এসেছে তাদের বাড়িতে? নিজের মনে মনেও নাম উচ্চারণ করতে পারছে না শ্রীলেখা, যদি সে না হয়? এ কি সম্ভব? শ্রীলেখা কি এখন আনন্দ করবে, না কাঁদবে?

একবার শ্রীলেখা ঘুমন্ত স্বামীর বাহুপাশ ছাড়িয়ে মশারির বাইরে বেরিয়ে এল বাথরুমে যাবার জন্য। দরজা খোলার পর তার গা ছমছম করতে লাগল। সারা বাড়ি অন্ধকার। কেউ আর জেগে নেই। নীচের তলায় একজন অজ্ঞাত আগন্তুক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শ্রীলেখা কি একবার নীচে গিয়ে দেখে আসবে?

এক পা দু পা এগিয়েও শ্রীলেখা থমকে গেল। তার ভয় করছে। জীবনে সে কখনও এত ভয় পায়নি। যদি সে না হয়? যদি কোনও চোরডাকাত বা গুন্ডা-। না, শ্রীলেখার অত সাহস নেই। সে এই অন্ধকারে একা একা নীচে নেমে যেতে পারবে না।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীলেখা জেগে উঠল। তক্ষুনি তার মনে পড়ে গেল সবকিছু। দিনের প্রথম আলোয় তার আর কোনও সন্দেহই নেই। সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কে শুয়ে আছে নীচের ঘরে। তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। অন্য কারোকে না-ডেকেই। সে বসবার ঘরের দরজা খুলল।

সূর্য তখনও সোফায় দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। চেহারা অনেক বদলে গেছে তার। মুখে সরু দাড়ির রেখা, মাথার চুলে কতকাল চিরুনি পড়েনি-রোগা হয়ে গেছে অনেক, তবু তাকে চিনতে শ্রীলেখার একমুহূর্ত দেরি হল না। সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সূর্যর সামনে।

এক মিনিট চুপ করে থেকে শুধু দেখল। সূর্যর উঁচু হয়ে ওঠা কণ্ঠার হাড়ে আঙুল বোলাল একবার। তারপর ওকে না জাগিয়ে শ্রীলেখা দ্রুত পায়ে আবার উঠে গেল ওপরে।

স্বামীর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, এই শুনছ! শুনছ!

প্রভাসকুমার চোখ মেলে বললেন, কী?

কাল রাত্তিরে যে এসেছে–

কে এসেছে?

কাল রাত্তিরে! সেই যে তুমি–

হ্যাঁ হ্যাঁ, কী হয়েছে? পালিয়েছে?

না। আছে। ও আমার দাদা।

কী? তোমার আবার দাদা কোথা থেকে এল?

আমার পিসতুতো দাদা। সূর্যদা। তুমি ওকে দেখোনি। আমরা আগে যে পিসেমশাইয়ের বাড়িতে থাকতাম–

প্রভাসকুমার উঠে বসে চোখ কচলে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার কোন পিসেমশাই? বড়বাবু? তাঁর ছেলে?

হ্যাঁ, আমার বিয়ের আগেই–

সেই যে সেই রোমান্টিক ক্যারেকটার? যে প্রায়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়? সে কি বোমা বানাবার দলে ভিড়েছে নাকি?

শ্রীলেখা একটু ইতস্তত করে বলল, জানি না!

প্রভাসকুমার হেসে বললেন, তোমার দাদা, তার মানে আমার শালা হল বড় কুটুম! তা একটু খবরটবর দিয়ে আসবে তো, কাল রাত্তিরে খাতির-যত্ন করতে পারিনি।

শ্রীলেখা ব্যাকুল ভাবে বলল, ওকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। ও এমনিতে খুব ভালো।

প্রভাসকুমার স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বললেন, কাল রাত্তিরে যখন জানতাম না ওকে তোমার দাদা বলে, তখনও তো তাড়িয়ে দিইনি। মানুষের জীবনের দাম আছে আমার কাছে।

শ্রীলেখা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। চোখে জল এসে গেল তার। টলটলে চোখদুটো সে চেপে ধরল স্বামীর গায়ে।

প্রভাসকুমার বিছানা থেকে নেমে বললেন, ওর তো গায়ে খুব জ্বর দেখেছিলাম। দানুকাকাকে খবর পাঠাতে হবে।

ও কি বাইরের ঘরে থাকবে?

পাগল নাকি? ওখান থেকে সরাতে হবে। ছোটকাকার ঘরে রাখবে? ছোটকাকার তো আসতে অনেক দেরি আছে। তা ছাড়া পুলিশ টুলিশ যদি আসে–

প্রভাসকুমারের তদারকিতে তিন জন লোক মিলে সূর্যকে ধরাধরি করে নিয়ে এল তিনতলার একটি ঘরে। সূর্য চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু। তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কথাও বলছে না।

বিছানায় শুইয়ে দেবার পর সূর্য আবার পাশ ফিরে ঘুমোতে চাইল। প্রভাসকুমার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে খুব? কোথাও লেগেছে?

সূর্য উত্তর দিল না, আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু বাদে আর একবার জেগে ঘরখানার চারপাশে দেখে নিল, দেখে নিল দরজা ও জানলার অবস্থান। উঠে বসতে গিয়েও পারল না। সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

একটু বাদেই শ্রীলেখা এক গামলা গরম জল এনে বসল সূর্যর বিছানার পাশে। সেই জলে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে দিতে লাগল সূর্যর শরীর থেকে রক্তের দাগ এবং ধুলো কাদা। সেই আরামদায়ক উষ্ণ স্পর্শে সূর্য আবার চোখ খুলল। সামনেই শ্রীলেখার মুখখানা দেখে দু'এক পলক শুধু স্থির হয়ে রইল সে। তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিল অন্য। দিকে।

শ্রীলেখা ডাকল, এই সূর্যদা–

সূর্য উত্তর দিল না।

শ্রীলেখা আবার বলল, এই সূর্যদা, তোমার কী হয়েছে?

সূর্য তখনও চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। লাল রঙের একটা ঝাঁপসা পরদা-এখন মাকড়সার জালের মতন সূক্ষ্ম হলেও চোখের সামনে দুলছে। শ্রীলেখার ডাক অবশ্য স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে। এই বোধও তার ফিরে এসেছে যে, সে শুয়ে আছে নরম বিছানায়, এটা শ্রীলেখার শ্বশুরবাড়ি-এর নাম নিরাপদ আশ্রয়।

শ্রীলেখা তার মুখখানা সূর্যর মুখের কাছে এনে বলল, তোমার খিদে পায়নি? কিছু খাবে? কী খেতে ইচ্ছে করছে?

হঠাৎ সূর্যর মনে পড়ল, যোগানন্দ বলেছিল, তোর বোনের বাড়িতে গিয়ে পেট ভরে খাব।

কতক্ষণ আগে? ঠিক যেন দু'-এক মিনিট আগেই যোগানন্দ বলেছে এই কথা। খেতে খুব ভালোবাসত মানুষটা।

সূর্য আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রীতিমতন শব্দ করে কান্না, কান্নার ঝেকে তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শ্রীলেখা প্রথম কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সূর্যকে যে সে কখনও কাঁদতে দেখেনি–তাই-ই নয়, সূর্যর যে চরিত্র সে দেখেছে–তাতে এ রকম কান্নার কথা কল্পনাই করা যায় না। একজন তেজি রুক্ষ পুরুষ অসহায়ের মতন কঁদছে। যেন সে তার সারা জীবনের জমানো কান্না একসঙ্গে কেঁদে নিচ্ছে।

শ্রীলেখা জোর করে সূর্যর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে কী? আমাকে বলো তো!

শ্রীলেখার নিজের চোখেও জল এসে গেছে। এত কান্না দেখলে কি কেউ স্থির থাকতে পারে। সূর্য নিজেকে সামলাতে পারছে না। কান্না থামাতে গেলে হেঁচকি উঠে যাচ্ছে তার।

শ্রীলেখা ভিজে তোয়ালে দিয়ে তার চোখ মুছে দিতে লাগল। খানিকটা বাদে সূর্য সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল। চোখ বুজে রইল চিত হয়ে। শ্রীলেখা তখনও প্রশ্ন করছে, কী হয়েছে, আমাকে বলবে না?

সূর্য চোখ না খুলেই বলল, আমি কেন এখানে এলাম? আমার আসা উচিত নয়।

কেন?

আমার আসা উচিত হয়নি।

তুমি আমার দিকে তাকাবে না?

আমি এখানে এসে ভুল করেছি।

আমি জানতাম তুমি আসবেই।

না, আমারই মরে যাওয়ার কথা ছিল। আমি কেন মরলাম না!

তুমি কিছুতেই মরতে পারো না। তুমি টের পাওনি, আমি সব সময় মনে মনে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তুমি যেখানেই থাকো, আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার সঙ্গে আবার দেখা না হলে আমি সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা নিদারুণ অভিমান নিয়ে চলে যেতাম।

শ্রীলেখা আমি কারওর যোগ্য নই।

তুমি আর কথা বোলো না এখন। তোমার গায়ে খুব জ্বর। ডাক্তারকে খবর পাঠানো হয়েছে।

এসব কিছুই পাওয়ার অধিকার আমার নেই।

সূর্যদা, লক্ষ্মীটি, একটু চুপ করে শুয়ে থাকো।

গরম জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে শ্রীলেখা নিঃশব্দে সূর্যর শরীর পরিষ্কার করে দিতে লাগল। সূর্য আর কোনও বাধা দিল না, সূর্যর গায়ের জামাটা তুলতেই শ্রীলেখা দেখতে পেল তার কোমরে গোঁজা রিভলবার। ঝট করে সেটা সে খুলে নিল। একসময় এটা তার কাছেই রাখা ছিল। এখন থেকে আবার তার কাছেই থাকবে। আর কোনও দিন ফেরত দেবে না।

৪৪. প্রভাসকুমারদের পরিবারটি

প্রভাসকুমারদের পরিবারটি খড়গপুরে বেশ প্রতিপত্তিশালী। ওঁরা এখানকার পুরনো বাসিন্দা, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে রয়েছে বড় ডাক্তার, উকিল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং পুলিশের একজন বড় কর্তা। সুতরাং সূর্যকে নিয়ে খুব বেগ পেতে হল না। এ-অঞ্চলের সমস্ত বাড়ি তল্লাশি করার সময় পুলিশ দুবার এসেছে এবাড়িতে, কিন্তু

সারা বাড়ি সার্চ করেনি, বাইরে থেকে কথাবার্তা বলে চলে গেছে। প্রভাসকুমারের এক কাকা খুব গোপনে এসে সূর্যর চিকিৎসা করে যাচ্ছেন।

সূর্য একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। তার ছ' ফিট এক ইঞ্চি দেহটা এখন একেবারে অস্থিসর্বস্ব। কোটরে বসা চোখদুটো জ্বলজ্বল করে। তার জ্বর কমে গেছে, বুকের ব্যথাও অনেক কম, তবু মাঝে মাঝে হেঁচকি ওঠার মতন হয়, তখন মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। ভেতরের কলকবজার যে কী গণ্ডগোল হয়েছে, তা পরীক্ষা করার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল, কিন্তু সে প্রশ্নই আপাতত ওঠে না। নিছক অদম্য জীবনীশক্তির জোরেই সূর্য আস্তে আস্তে সেরে উঠছে।

যতক্ষণ জেগে থাকে, তখনও সূর্য প্রায় কথা বলতেই চায় না। শ্রীলেখার সঙ্গেও একটা-দুটোর বেশি কথা বলে না। হয় চোখ বুজে শুয়ে থাকে, অথবা বই পড়ে। শ্রীলেখা। তাকে কিছু বই দিয়েছিল প্রভাসকুমারের ঘরে বইয়ের অভাব নেই–সূর্য তার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়তে চাইল। সূর্যর শিয়রের কাছে স্তূপ করা বই।

বাংলা বই সূর্য আগে বিশেষ কিছু পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা বুঝতে তার প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়। তবু ধৈর্য ধরে প্রত্যেকটি পাতা দু'বার-তিনবার করে পড়ে। গল্পগুচ্ছের বেশ কয়েকটি গল্প ও 'পূরবী'র কবিতা পড়ে আনন্দ পেল সে। কিন্তু তার রবীন্দ্রচর্চা বেশিদূর এগোল না। প্রভাসকুমার সূর্যর বই পড়ার আগ্রহ দেখে নিজে থেকেই তাকে অন্যান্য কয়েকটি বইয়ের সঙ্গে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বইখানা পড়তে পড়তে সূর্য অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করল এবং ছুঁড়ে ফেলে দিল খাটের নীচে। সে আর এই লেখকের কোনও বই পড়তে চায় না।

প্রভাসকুমার প্রথম থেকেই সূর্য সম্পর্কে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। মানব চরিত্রের রহস্য উদঘাটন ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। এই ছেলেটি তার চোখে রহস্যময়। এত অল্প বয়সি অথচ এ রকম গম্ভীর ও চাপা স্বভাবের ছেলে তিনি কখনও দেখেননি। এর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এর মনের মধ্যে সব সময় নানা রকম চিন্তার প্রবাহ

চলেছে, অথচ সেই সব চিন্তার কথা পৃথিবীর আর কোনও দ্বিতীয় প্রাণীকে জানাতে সে আগ্রহী নয়। মানুষ এমন একাকীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে কী করে? নিজের জন্য ওর কখন কী দরকার সে কথা কক্ষনও জানায় না, কক্ষনও ব্যথার কথা বা অসুখের কথা বলে না, খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনও বাছবিচার বা লোভ নেই। এত কম বয়সে এই সংযম। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শিখল কবে? অথচ মুখোনি কচি ছেলেমানুষিতে ভরা। নিজের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই হয়তো প্রভাসকুমার এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে ফেললেন।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সূর্যর বিছানা থেকে অল্প দূরে চেয়ার নিয়ে বসে প্রভাসকুমার জিজ্ঞেস করলেন, আজ কেমন আছ, বড়কুটুম?

সুর্য মুখ ফিরিয়ে বলল, ভালো।

তোমার চোখদুটো ক'দিন ধরে বড় লালচে ছিল, আজ অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

সূর্য হাতের তালু দিয়ে চোখ কচলাল।

প্রভাসকুমার আবার বললেন, কাল রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, টের পেয়েছিলে?

হুঁ।

আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি কি উঠে বালিশে হেলান দিয়ে বসবে? তুলে দেব?

না, ঠিক আছে।

উঠে বোসো না-বাইরেটা দেখতে পাবে। ভালো লাগবে।

প্রভাসকুমারের সাহায্য না নিয়ে সূর্য নিজেই একটু উঁচু হয়ে উঠে বসল। প্রভাসকুমার জানলাগুলো খুলে দিলেন। জানলার কাছে পঁড়িয়েই বললেন, শহরের অবস্থা এখন অনেক শান্ত। দোকানপাট সব খুলেছে। আচ্ছা, সেদিন যে এখানে একটি ছেলে খুন হয়েছিল, সে কি তোমার চেনা?

সূর্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, আমরা একসঙ্গে ছিলাম।

আঃ, ছি ছি ছি, এই রকম ভাবে কেউ প্রাণ দেয়? পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলে?

না, আমরা দুজনে সাধারণ ভাবেই হেঁটে আসছিলাম। হঠাৎ একটা ভুল হয়ে গেল।

তা হলে তুমিও সে-দিন মরে যেতে পারতে?

হয়তো। একটু হলেই মরে যেতে পারতাম, অথচ মরলাম না-এই ফিলিংটা কী রকম?

আমার শরীর সুস্থ থাকলে সেটা ভালো করে বুঝতে পারতাম।

আমি মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখেছি কিন্তু কখনও মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি দেখিনি- কখনও বড় রকমের অসুখও হয়নি আমার। রবীন্দ্রনাথও যে লিখেছেন, 'মরণ রে উঁহু মম শ্যাম সমান' -সেটা কি নিজের মৃত্যুবোধ নিয়ে, না অন্য কারওর মৃত্যু দেখে? নিজে কি তখন মৃত্যুর সামনাসামনি গিয়েছিলেন? অবশ্য, অনুভূতির জগতে মৃত্যুর একটা উপস্থিতি সব সময়েই টের পাওয়া যায়। মানুষ বাঁচতে ভালোবাসে বলেই মৃত্যুর কথা এত বেশি ভাবে! তাই না?

সূর্য চুপ করে রইল।

প্রভাসকুমার চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর আন্তরিক ভাবে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, সূর্যবাবু, আমাকে একটা কথার উত্তর দিতে পারো? মানুষের প্রাণ তার নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তবু কেন অনেক মানুষ প্রাণ তুচ্ছ করে কোনও কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে?

প্রভাসকুমার সূর্যর চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাকে উত্তর দিতেই হবে। সূর্য আস্তে আস্তে বলল, আমি তো সব মানুষের কথা জানি না। আমি শুধু নিজের কথা জানি।

তোমার নিজের কথাই বলো তো। যে-কোনও সময়েই মরে যেতে পারতে? তা জেনেও...তুমি কি মরতে চাও?

না।

তা হলে?

আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে আমি শেষ পর্যন্ত মরব না।

এ রকম বিশ্বাস থাকার কোনও মানে হয়? এটা তো গোঁয়ারতুমি!

আমি মরে গেলেও কোনও ক্ষতি ছিল না।

অন্য কারওর কোনও ক্ষতি না থাক, তোমার তো ছিল। জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি-

আমি তা ভাবিনি।

আচ্ছা, আর একটা কথা। এটারও আমি কোনও উত্তর খুঁজে পাই না। আমাদের দেশে প্রায় আটত্রিশ কোটি মানুষ। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকশো জন তোমাদের মতন এ রকম প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আটত্রিশ কোটির মধ্যে শুধু এই কয়েকশো জনের মধ্যেই এ রকম প্রেরণা জাগল কী করে? কে এদের মাথার দিব্যি দিয়েছে? এটা একটা বড় প্রশ্ন নয়?

কারোকে না কারোকে তো এগিয়ে আসতেই হবে।

সেটা না হয় মানলাম। কিন্তু আটত্রিশ কোটির মধ্যে তোমাদের মতন শুধু ক'জনের মধ্যেই এই চিন্তাটা জাগল কী করে? এর ব্যাকগ্রাউন্ড কী? তোমার বয়সি তো আরও কত ছেলে আছে, খাচ্ছেদাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে! লক্ষ লক্ষ লোক যে সম্পর্কে কিছু ভাবে না-হঠাৎ এক এক জন আলাদা হয়ে যায়। এর ব্যাখ্যা কী?

আমি জানি না।

তুমিও এদের মধ্যে একজন। তুমি এটা ভেবে দেখোনি?

এ দেশের আটত্রিশ কোটি লোকই তো আর কবিতা লেখে না। শুধু আপনার মতন কয়েকশো জন লোকই লেখে। এর ব্যাখা কী?

প্রভাসকুমার চমকে উঠলেন। চিন্তিত ভাবে বললেন, ঠিক, এ রকম ভাবে তো ভেবে দেখিনি। কবিতা লেখার মতন এটাও একটা ইনসপিরেশান বলতে চাও? এটা একটা মুট পয়েন্ট, আমি স্বীকার করতে বাধ্য। হু, ইনসপিরেশান! ইনসপিরেশান ছাড়া কোনও বড় কাজ হয় না। তবে কবিতা লেখার চেয়েও প্রাণ দেওয়া অনেক শক্তসুতরাং তোমাদের ইনসপিরেশান নিশ্চয়ই খুব তীব্র।

আমি ইনসপিরেশান মানি না।

বিস্মিত হয়ে প্রভাসকুমার বললেন, মানো না! তুমি তো নিজেই বললে, যে চোজেন ফিউ এসব কাজে–

আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম ছিল। আমি হঠাৎ এমন কয়েক জন লোকের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম, যাঁরা এই ধরনের কাজে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের দেখে আমার ভালো লেগেছিল, আমি তাদের শ্রদ্ধা করতাম। সুতরাং তাদের দলে মিশে কাজ করতে আমার ভালো লাগত। আমার কাছে এটা ভালো লাগা না লাগার প্রশ্ন।

তোমার সঙ্গে হঠাৎ ওদের যোগাযোগ হয়েছিল?

হ্যাঁ।

হঠাৎ হঠাৎ অনেকের সঙ্গেই অনেকের দেখা হয়। সবাইকে তো আর ভালো লাগে! তোমার মধ্যে এর বীজ আগে থেকে ছিলই।

হতে পারে?

ডু ইউ রিগ্রেট নাই?

নেভার!

এই ভালো লাগা না লাগার ব্যাপারটাই সবচেয়ে বড়। অনেক মানুষ, অধিকাংশ মানুষই, যা ভালো লাগে, তার জন্য অন্য সবকিছু ছাড়তে পারে না। যত সব মানুষ সমাজ সংসার সব মেনে ঘর গেরস্থালি করছে তাদের সবারই কি এটা ভালো লাগে? তাদের অন্য কিছু করার সাহস নেই। তোমার বা আমার মতো লোক আমরা অন্য সবকিছু ছাড়তে পেরেছি। তুমি লড়াই করতে গেছ, আমি আর কিছু না করে কবিতা লিখছি। অন্যেরা এটা ভালো চোখে দেখে না–আসলে তারা ভয় পায় কিংবা হিংসে করে।

আমি কবিতা বুঝতে পারি না।

আমি বোমা-পিস্তলের লড়াই বুঝতে পারি না। কিন্তু তুমি যে আমার বাড়িতে এসেছ, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি–এটা আমার সৌভাগ্য। আমার বিয়ের সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি–

লেবুর রস ও নুন মেশানো বার্লির বাটি হাতে নিয়ে শ্রীলেখা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সূর্যকে এত কথা বলতে দেখে সে একটু অবাক হয়েছিল, কারণ সে নিজে এ ক'দিনে অনেক চেষ্টা করেও সূর্যর মুখ থেকে কোনও কথা বার করতে পারেনি। কিন্তু সে এখন এগিয়ে এসে স্বামীকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, তুমি ওকে দিয়ে কথা বলাচ্ছ কেন? ডাক্তারকাকা বারণ করেছেন না?

প্রভাসকুমার থতমত খেয়ে বললেন, আহা, দিনের-পর-দিন কথা না বলে কি মানুষ থাকতে পারে?

থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এটা খেয়ে নিয়ে এখন ঘুমোক।

শ্রীলেখা সূর্যর মুখের সামনে বাটিটা ধরল। প্রভাসকুমার ব্যস্ত হয়ে বললেন, বুকের কাছে তোয়ালেটা জড়িয়ে দাও। পড়ে যায় যদি।

নিজেই এসে তোয়ালেটা জড়িয়ে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী যত্ন করে খাওয়াতে লাগল ওকে। সূর্য সুবোধ বালকের মতো তাড়াতাড়ি এক চুমুকে শেষ করে ফেলল বার্লিটুকু। মুখের স্বাদ বদলাবার জন্য শ্রীলেখা এলাচ এনেছে, তার কয়েকটা দানা মুখে দিয়ে সূর্য চোখ বুজল। শ্রীলেখা যত্ন করে চাদর টেনে দিল তার গায়ে। সূর্যর মুখে যাতে রোদ না পড়ে সেই জন্য প্রভাসকুমার ভেজিয়ে দিলেন জানলার একটা পাল্লা। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

আস্তে আস্তে সূর্যর শরীরের জোর ফিরে আসছে, সে এখন নিজে নিজেই বিছানা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে একটু একটু ঘোরে, জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েও সে তার ভবিষ্যত দেখতে পায় না। চারখানা সাদা দেওয়ালের মধ্যে সে বেশ কয়েক দিন আটকে আছে। সাদা দেওয়াল কোনও কথার উত্তর দেয় না। এখন জানলার বাইরে তাকিয়েও সে প্রকৃতি দেখতে চায় না, সে বাইরের জগৎ থেকে কোনও ডাকের জন্য অপেক্ষা করে। সে জানে না, এরপর সে কী করবে। এই ক'মাসে তার ধারণা ছিল, একটা কোথাও পৌঁছোতে হবে। এখন আর তার সামনে কোনও রাস্তা নেই। সূর্য স্থির চোখে রোদে ঝকমক রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকে।

প্রভাসকুমার বড়বাবুকে টেলিগ্রাম করেছিলেন সূর্যকে না জানিয়ে। কোনও উত্তর আসেনি। শ্রীলেখা কিছু দিন আগে তার মায়ের কাছ থেকে চিঠিতে জেনেছিল যে বড়বাবু কয়েক দিনের জন্য কোথায় যেন বেড়াতে গেছেন।

প্রভাসকুমারের ইচ্ছে, সূর্যকে বিদেশে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বিদেশে কোথাও দু-চার বছর থাকলে পুলিশের কোপ কমে যাবে-ইতিমধ্যে সূর্য পড়াশুনোও চালাতে পারবে। সন্দেহজনক কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদের বেঁচে থাকার এইটাই সহজ রাস্তা। যুদ্ধের জন্য প্যাসেঞ্জার লাইনগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে, তবু কোনও রকমে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভারত মহাসাগর এখনও মোটামুটি নিরুপদ্রব আছে।

সূর্য এই প্রস্তাব শুনে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলেনি। শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থেকেছে। সে কোনও কিছুতেই উৎসাহ বোধ করে না। যোগানন্দর মৃত্যু তার বুকের মধ্যে খুব জোর নাড়া দিয়ে গেছে।

সূর্যকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তিনতলার একটা ঘরে। এ-দিন দেখা গেল একতলার সিঁড়ির কাছে সে দেওয়াল ধরে হাঁপাচ্ছে। তখনও সিঁড়িভাঙার সামর্থ্য তার। হয়নি। শ্রীলেখা তাকে দেখতে পেয়ে দারুণ অবাক হয়ে বলল, এ কী, কোথায় যাচ্ছ?

চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখ করে সূর্য বলল, একটু বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলাম।

বাগানে? এই সন্ধেবেলা? বাঃ, আমাকে বলোনি কেন? তুমি একলা একলা এতখানি সিঁড়ি ভেঙে নামলে? চলো, ঘরে চলো, এখন আর তোমাকে বাগানে যেতে হবে না, হিম পড়ছে।

সূর্য আর আপত্তি করল না, শান্ত ছেলের মতন ফিরে গেল শ্রীলেখার সঙ্গে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সূর্য একলা একলা বাগানের গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, একজন চাকর দেখতে পেয়ে খবর দিল প্রভাসকুমারকে। প্রভাসকুমার নিজেই দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরে বলল, এ কী, কোথায় যাচ্ছ সূর্যবাবু?

সূর্য নিষ্প্রাণ গলায় বলল, কোথাও না।

একলা একলা এতদূর চলে এসেছ? ডাক্তার তোমাকে ঘর থেকেই বেরোতে বারণ করেছেন।

এমনিই একটু ঘুরে আসছিলাম।

এই সময়? তোমার কিছু দরকার টরকার আছে? কিছু কিনে আনতে হবে? আমাকে বলোনি কেন? শোনো, যদি সিগারেট টিগারেট খাও তো–

না কিছু না।

আরও দু'বার সূর্য এবাড়ি থেকে কারোকে কিছু না বলে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল, দু'বারই ধরা পড়ে যায়। শ্রীলেখা পাখির মতন তীক্ষ্ণ চোখে তার ওপর নজর রেখেছে। ধরা পড়ার পর সূর্য আর কোনও উচ্চবাচ্য করে না, নিরীহ ভাবে ফিরে আসে। তার এই ব্যবহারের কোনও মানে বোঝা যায় না।

বাড়িতে আস্তে আস্তে মানুষজন আসতে শুরু করেছে। আর দিন দশেক বাদেই দুর্গা পূজা। এ বাড়িতে খুব ধুমধাম করে দুর্গা পূজা হয়। শ্রীলেখা তাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সব সময় সূর্যর কাছে আসতে পারে না-কিন্তু সেবা শুশ্রষার কোনও ত্রুটি নেই।

সে-দিন রাত সাড়ে ন'টার সময় সূর্যর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল শ্রীলেখা। সূর্য চোখ বুজে শুয়ে আছে। শ্রীলেখা তার শিয়রের পাশে বসে চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলল, তুমি ঘুমিয়েছ?

সূর্য চোখ না মেলেই বলল, না।

এর মধ্যেই বাড়ির অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। শহরও এখন প্রায় অর্ধসুপ্ত। ঝমঝমিয়ে একটা মেল ট্রেন চলে গেল এইমাত্র। ট্রেন যাবার সময় মনে হয় যেন এই বাড়িটা কাপে। মনে হয় শুধু, আসলে কঁপে।

শ্রীলেখা আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার শরীর আজ কেমন?

ভালো।

তোমার কী হয়েছে বলো তো?

কিছু হয়নি।

তুমি চলে যেতে চাইছ কেন?

আমার আর ভালো লাগছে না।

কেন ভালো লাগছে না? তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

না, সে-সব কিছু নয়।

শ্রীলেখার চুলগুলো খোলা, কালো রঙের শাড়ি পরে আছে। মুখখানা অনেকটা ঝুঁকিয়ে বলল, সূর্যদা, লক্ষ্মীটি, আমার দিকে একবার তাকাও। আমার সঙ্গে একটু কথাও বলবে না? তোমার কী হয়েছে সত্যি করে বলো তো?

সূর্য মুখ তুলে শ্রীলেখার দিকে তাকাল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চিবুক উঁচু করে শূন্যে চোখ মেলে বলল, আমি এ রকম ভাবে তোর এখানে আসতে চাইনি।

শ্রীলেখা ব্যাকুল ভাবে বলল, সূর্যদা, সত্যি করে বলো তো, তোমাকে এ বাড়িতে কেউ কিছু বলেছে?

না। কে কী বলবে? প্রভাসবাবু খুব ভালো লোক। ওঁকে আমার ভালো লাগে। সেসব কিছু নয়। এই অসুখটা আমাকে বড় কাবু করে ফেলেছিল। এই রকম একা একা শুয়ে থাকা আমার পোষায় না।

সূর্য বিছানায় উঠে বসে বলল, এখন আমি অনায়াসে হাঁটা-চলা করতে পারি।

শ্রীলেখা সূর্যর দু'কঁধ চেপে ধরে বলল, সূর্যদা, তুমি কি আমার ওপর এখনও রেগে আছ?

না তো!

তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে চাও না কেন?

বাঃ রাগ করব কেন, রাগের কী আছে?

এটাও রাগের কথা।

না রে।

সত্যি করে বলল, আমার চোখের দিকে চেয়ে বলো।

সত্যি কথাই বলছি। একসময় ভীষণ একটা রাগ ছিল, ভেবেছিলাম, তোর সংসারের সবকিছু ভেঙেচুরে দেব। তোকে কিছুতেই শান্তি দেব না! কিন্তু অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে এলাম তো। আসতে আসতে রাগ কমে গেছে। এখন বুঝতে পারি, আমি মিথ্যেই রাগ করেছিলাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে মানুষ অনেক কিছুই শেখে। তখন বোঝা যায় বেঁচে থাকা কাকে বলে। আমার এখন গায়ে জোর নেই, তাই বুঝতে পারছি, গায়ের জোরে কিছুই সত্যিকারের পাওয়া যায় না।

তোমার শরীর আবার শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে।

তখন আবার আগের মতন ভুল করব না।

আমি কিন্তু জানতাম, তুমি একদিন না একদিন আমার কাছে আসবেই।

এরকম অসহায় অবস্থায় না-আসাই উচিত ছিল।

তোমাকে কেউ অসহায় মনে করে না। তোমাকে দেখলে সবাই একটু একটু ভয় পায়।

কাল সারা রাত আমার ঘুম আসেনি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, আমার একটা কিছু করা দরকার।

কাল আমারও বার বার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, তুমি জেগে আছ। একবার ভেবেছিলাম তোমার কাছে চলে আসি–

এলি না কেন?

অন্য কেউ হলে হয়তো আসতাম। তুমি বলেই আসতে পারলাম না। কয়েক মাস ওর এক মামাতো ভাই এখানে এসে খুব অসুখে পড়েছিল-আমি সারা রাত ধরে তার পাশে থেকেছি। আর তুমি আমার দাদা, তোমার কাছে তো আসতেই পারি। কিন্তু কেন যে আমার ভীষণ লজ্জা হল।

আজ এখন কত রাত?

খুব বেশি রাত হয়নি।

সূর্য নিজের কাধ থেকে শ্রীলেখার হাত সরিয়ে দিয়ে আস্তে শুয়ে পড়ল আবার। মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে, তুই এখন যা।

শ্রীলেখা গেল না। একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর সূর্যর গালে আঙুল ছুঁইয়ে খুব নরম, প্রায় অশ্রুত গলায় বলল, সূর্যদা, তুমি আর আমাকে একটুও ভালোবাসো না, না?

কী জানি!

আমি জানি, তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না। আমারই দোষ।

কেন?

আমার বিয়ের পর প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হত। সেই সঙ্গে ভয়ও ছিল। আমি ভয় পেতাম, কোনদিন তুমি এখানে এসে হাজির হবে, চাচামেচি করবে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। সে রকম একটা কিছু হলে আমি কোথায় যেতাম, কী যে করতাম- কিছুই ভেবে পাইনি। কিন্তু তুমি এলে না। এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ, এক মাস, দু' মাস- তুমি এলে না, এলে না। তখন আমার কী হল জানো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, ভীষণ ভাবে প্রতীক্ষাসব সময় যেন তোমাকে দেখতে পেতাম। আমি জানতাম তুমি

আসবেই, আমার প্রতীক্ষাই তোমাকে টেনে আনবে। একদিন আমাদের বাগানের আতাগাছে একটা পাখি বসে ইস্টকুটুম, ইস্টকুটুম বলে ডাকতে লাগল। ওই পাখি ডাকলে নাকি বাড়িতে অতিথি আসে। সেদিন আমি সারা দিন আর অনেক রাত পর্যন্ত গেটের দিকে চেয়ে বসে ছিলাম।

শ্রীলেখা সূর্যর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করল, তোমার বুকে আজ একবারও ব্যথা হয়েছিল?

সূর্য বলল, না। এখন খুব ভালো লাগছে।

সত্যি ভালো লাগছে?

ভীষণ, ভীষণ ভালো লাগছে। তোকে বোঝাতে পারব না।

এ কথা বলা সত্ত্বেও সূর্য শ্রীলেখার হাত সরিয়ে দিল। নেমে পড়ল বিছানা থেকে। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে তাকাল বাইরের পৃথিবীর দিকে। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দূরের গাছগুলোকে ধূসর বর্ণ দেখায়, মনে হয় অন্য কোনও গ্রহ।

সূর্য সেই দিকেই মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি অনেক কিছু জানি না, অনেক কিছুই শিখিনি। আগে জানতাম না, পৃথিবীতে কত রকম ভালোলাগা আছে। কিন্তু আমি কি এসব পাবার যোগ্য?

শ্রীলেখা বলল, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা লাগিয়ো না।

তুই, এবার শুতে যা।

যাচ্ছি, তুমি আগে শুয়ে পড়ো। আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দিই– সূর্য জানলার কাছ থেকে সরে গেল। অন্ধকারে তার মুখ এখন আর দেখা যায় না। অদৃশ্য মানুষের মতন সে ধমকের সুরে বলল, তোকে চলে যেতে বলছি না! আমার কি মাথার ঠিক আছে? এত

সুখ কি আমার সহ্য হয়? আমি আর কিছু ভাঙতে চাই না। আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে।

৪৫. সেবারের দূর্গাপূজোর

সেবারের দূর্গাপূজোর কয়েকটি দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তা ছাড়া, সেবারে আমাদের মামাবাড়ির পূজোর বর্ণনা আমি বিষ্ণুকে চিঠিতে লিখে পাঠিয়ে ছিলাম, বেশ কয়েক বছর পর সেই চিঠি ঘুরে ফিরে আবার আমার হাতে চলে এসেছিল।

পূজোর প্রায় এক মাস আগে থেকেই বেশ একটা পূজো পূজো ভাব। আকাশের মেঘ হালকা হালকা সাদা রঙের হয়ে গেছে, শিউলি গাছে এসেছে অজস্র ফুল। আমাদের ঠাকুরদালানে এর মধ্যেই মূর্তি গড়া শুরু হয়ে গেছে। দুর্গা ঠাকুর যে বাইরে থেকে কিনে আনা যায়-এ কথা গ্রামের লোক জানেই না। বাড়িতে মূর্তি তৈরি করারই রেওয়াজ ছিল পূর্ববঙ্গে।

আমাদের মামাবাড়ির মূর্তি বানাত জলধর। হঠাৎ একদিন তার নৌকো এসে ভিড়ত পুকুরঘাটে। বড় রহস্যময় ছিল তার নৌকোটি। ভেতরে কত রকম তুলি আর রঙের পাত্র আর মুখের ছাঁচ। রুপোলি জরির কলকা আর রেশমি কাপড়ও থাকত প্রচুর। মাঝখানে একটা পরদা ফেলা-সে পরদার ও পাশে কী থাকত কে জানে।

জলধর লোকটি বেশ বেঁটেখাটো এবং গম্ভীর। তাকে আমরা কথা বলতে শুনেছি খুব কম। সে যে একজন শিল্পী ছিল, তার গাম্ভীর্যই তার প্রমাণ। তার মতন অবস্থার একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে আমার মামাবাড়ির অহংকারী ধনীদের সঙ্গে হাত কচলে তোষামোদের সুরে কথা বলাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জলধর সেসবের ধার ধারত না, অনেকের কথার সে উত্তরই দিত না-একমাত্র আমার দাদামশাইয়ের সঙ্গেই তাকে দু-চারটে কথা বলতে শুনেছি। তা ছাড়া, কোনও একটা জিনিসের দিকে তার অনেকক্ষণ

একদৃষ্টে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকার ক্ষমতা দেখেও তাকে আমার অসাধারণ মনে হয়েছিল।

কিন্তু শিল্পী হলেও জলধর ছিল নিচু জাত। তাকে সেই জন্য বাড়ির সকলেই তুমি তুমি বলে কথা বলত।

পূজোর এক মাস আগেই প্রতিমার খড়ের কাঠামো তৈরি হয়ে যেত। সে কাজে জলধর নিজে আসত না, পাঠাত তার দু'জন সহকারীকে। কিছুদিন পর সেই দু'জন সহকারীই আবার এসে মাটি লাগিয়ে যেত খড়ের কাঠামোতে। এই ভাবে প্রতিমা একমেটে, দু'মেটে হবে। সব মূর্তিই মুন্ডুহীন এবং ন্যাংটো। দু'দিনেই সেই মাটি শুকিয়ে ফেটে ফেটে কী রকম অদ্ভুত চেহারা হয়-সে-দিকে তাকাতে আমাদের একটু লজ্জা লজ্জা করে। এরপর সেই মূর্তিগুলোতে আবার মাটি লেপে তারপর লাগানো হল সাদা খড়ি রং। তখন সবাই সাদা, দুর্গা, সিংহ, কার্তিক-গণেশ এমনকী ময়ূরটা পর্যন্ত। এরপর জলধর নিজে আসবে আসল প্রতিমা গড়তে।

বাড়ির পেছন দিকের পুকুরপাড়ে আমরা ছোটরা খেলা করছিলাম, এমন সময় পুকুরের উত্তর দিকের জান দিয়ে সেই নৌকোটা ঢুকল। আমার খেলার সাথী অনেকেরই জন্ম থেকে সেই নৌকোটা চেনা। তারা চেঁচিয়ে উঠল, জলধরকাকা এসেছে, জলধরকাকা এসেছে।

নৌকো ঘাটে এসে ভিড়তেই আমরা সবাই জলধরকাকাকে ঘিরে ধরলাম। কেউ একটা ময়ূরের পালক চায়, কেউ জরির টিপ চায়। জলধর কারোকেই নিরাশ করে না।

জলধর বার বাড়ির রোয়াকে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ে দাদামশাইকে প্রণাম করল। দাদামশাই বললেন, কী জলধর, এবার এত দেরি করলে যে? কালই না চতুর্থী?

জলধর জানাল যে সে সারা রাত জেগে কাজ করবে।

দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির সব খবর ভালো?

জলধর সংক্ষিপ্ত ভাবে জানাল তার বড়ছেলেটার খুব অসুখ। ম্যালেরিয়া।

দাদামশাই বললেন, যাবার সময় আমার কাছ থেকে কয়েকটা কুইনিন নিয়ে যেয়ো। মনে করে চেয়ে নিয়ো।

কুইনিনের এক একটা ট্যাবলেট তখন সোনার টুকরোর সমান। কালোবাজারে বিশেষ প্রতিপত্তি না থাকলে ও-ওষুধ জোগাড় করাও যায় না। দাদামশাই যে সেই দুর্লভ জিনিস দিয়ে দিতে চাইলেন, তার মানে জলধরের প্রতি তার সত্যিকারের দুর্বলতা ছিল।

জলধরের মূর্তি তৈরির কাজ দেখবার মতন। সে সাধারণ একজন গ্রাম্য কুমোর–এবং জলে বিসর্জন দেবার জন্যই সে মূর্তি বানায়। তবু তার নিষ্ঠা অদ্ভুত। সে চব্বিশ ঘণ্টা টানা কাজ করে, খায় না, ঘুমোয় না, কারওর সঙ্গে কথা বলে না। প্রতিমার গায়ের রং, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার সজ্জা–সবই নিখুঁত। লক্ষ্মী সরস্বতী আর কার্তিকের মুখ সে ছাঁচে ঢেলে বানায়। গণেশের মুণ্ড তো হাতে বানাতে হবেই। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দুর্গার মুখতার জন্য সে কোনও দিন ছাঁচ ব্যবহার করেনি। একতাল মাটি সে অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে ছানাছানি করে, এদিক-ওদিক ঘোরে, নানা কথা ভাবে। তারপর হঠাৎ একসময় বিদ্যুৎবেগে সে মুখোনি বানিয়ে ফেলে। দেড় মিনিট-দু'মিনিটের বেশি লাগে না। তখন সেই মুখটা প্রতিমার ওপর বসিয়ে সে অনেক দূরে চলে যায়, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। এক একবার ছুটে এসে নাকের পাশটা একটু টিপে দিয়ে যায়, চোখটা একটু বড় করে। পরদিন সে রং তুলি নিয়ে বসে।

আমরা স্নান-খাওয়া ফেলে হাঁ করে সেই মূর্তি তৈরি করা দেখি। সিংহটা কখন তৈরি হবে, তার জন্য আমি ছটফট করছি। সিংহ আর অসুরের সম্পর্কে যেন ওদের কোনও গরজই নেই।

দুর্গাপুজোর এক মাস আগে থেকেই বাড়ির কর্তা থেকে ছোট ছেলেটি পর্যন্ত সবাই কোনওনা-কোনও কাজে জড়িয়ে পড়ে। আমার ওপরেও একটা কাজের ভার পড়েছিল। গোপালগঞ্জের হাট থেকে চারটি কালো রঙের পাঁঠা কিনে আনা হয়েছে কয়েক দিন আগে। চারটে পাঁঠাই ঠিক এক রকম দেখতে। বাড়ির চার জন বাচ্চার ওপর ভার পড়েছিল সেই পাঁঠাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করার। অন্য লোক যে ছিল না তা নয়, তবু বাচ্চাদের ব্যস্ত রাখার এই একটা কৌশল। আমাদের অবশ্য উৎসাহের অন্ত ছিল না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা কয়েক জন পাঁঠাগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। টাটকা শিশিরভেজা ঘাস খাওয়ালে ওদের স্বাস্থ্য ভালো হবে। এক মাসের মধ্যে বেশ নাদুসনুদুস করে তুলতে হবে ওদের। ওরা ফুলগাছ খেয়ে ফেললে বকিনি। কখনও খেতে না চাইলে কত আদর করেছি। ওদের জন্য ধানখেত থেকে নতুন ধানের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে কচাৎ করে আমার আঙুলের অনেকখানি কেটে গেল। কচি ধানপাতায় ব্লেডের। মতন ধার। রক্তমাখা ধানপাতাগুলো আমি হাত থেকে ফেলে দিলাম, পাঁঠাটা দিব্যি সেগুলো খেয়ে নিল। কয়েক দিন পরে আমি ওর মাংস খাব তো, তার আগে আমার রক্ত ওর খাওয়া হয়ে গেল।

পাঁঠাবলির সময় যারা দাঁড়িয়ে থাকবে না, তাদেরকে সবাই ভিতু বলে খুব রাগায়। আমার ধারণা ছিল, আমি ভয় পাব না। তখন মনে মনে কত বাঘ-সিংহ শিকার করি, পাখি দেখলেই গুলতি ছুড়ি, আর সামান্য একটা পাঁঠাবলি দেখে ভয় পাব কেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে পারিনি, বলির খাঁড়া যখন উঠেছে, আমি একছুট্টে পালিয়ে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর আগে পাঁঠাটার ম্যা ম্যা ডাক কতক্ষণ যে আমার কানের কাছে। বেজেছে!

ভোরবেলা উঠে পাঁঠা চরাতে চরাতে আমি চলে যেতাম খালধার পর্যন্ত। পরবর্তী জীবনে আমি রাখাল বা মেষপালকদের সম্পর্কে অনেক কাব্য-গাথা পড়েছি, কিন্তু পাঁঠা-চরানোর ব্যাপারটা সে রকম কবিত্বময় মনে করা যায় না। কিন্তু আমি বেশ আনন্দ পেতাম। তখন আমার আপন মনে কথা বলার স্বভাবটা খুব বেশি ছিল। বাচ্চা পাঁঠাটাকে সঙ্গে পেয়ে

আমার কত কথা যে ওকে শুনিয়েছি! শিশিরভেজা মাঠে ওর সঙ্গে সেই যে ছুটোছুটি করেছিলাম–মনে হয় যেন আজও সেই গ্রামের প্রান্তরে আমার পায়ের ছাপ রয়ে গেছে।

খালধারে ছিল আমার ইস্কুলের বন্ধু মুর্তজার বাড়ি। মুর্তজার বাবা ইফতিকার সাহেব। শহর আদালতে ওকালতি করতেন। মুর্তজা আমার সমবয়সি হলেও ছিল শান্ত গম্ভীর প্রকৃতির, পড়াশুনোয় খুব মনোযোগী। খেলাধুলোর বদলে সে বইপত্রের আলোচনা করতে ভালোবাসত। আমাকে দেখলেই সে বাংলা বানান জিজ্ঞেস করত। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা কলকাতার ছেলে বলে আমাকে বেশি প্রশংসা করলেও আঁক আর বাংলায় মুর্তজা আমার থেকে অনেক ভালো ছেলে। সকালবেলা ওর বাড়ির কাছাকাছি। গেলে মুর্তজা আমাকে দেখেই ওর মাকে ডাক দিয়ে বলত, আম্মা, বাদল আইছে, আমি একটু ঘুইরা আসি।

সেবারের দুর্গাপুজো যে দুটি কারণে আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম মূর্তজার কয়েকটি কথা। পুজোর কয়েকটি দিন আমার মামাবাড়িতে গ্রামসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হত–হিন্দু-মুসলমান কেউ বাদ যেত না। সেই জন্যই আমি মুর্তজাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই অষ্টমীর দিন সারা রাত থাকবি তো? মাঝ রাত্তিরে আরতি হবে, খুব মজা হবে।

মুর্তজা বলেছিল, আমি তো যাব না। বাবা বলেছেন, হিন্দুদের পুজোয় আমাদের যেতে নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম, কেন?

তোরা তো পুতুল পুজো করিস। আমাদের ও-সবে যোগ দিতে নেই।

আমি বলেছিলাম, পুতুল নয়। অনেক বড় বড়। মা দুর্গা তো মস্ত বড়। পুতুল তো পুজো করে ছোট মেয়েরা।

মুর্তজা বলল, তোদের ঠাকুরঘরে যে কেষ্টঠাকুরের পুতুল থাকে, সেটা কত বড়।

এই ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখিনি এবং আগেই একটা ভুল যুক্তি দিয়ে ফেলেছি বলে আমি একটু থতমত খেয়ে যাই। কিন্তু মুর্তজার কাছে হার স্বীকার করব কেন? চোখ গোল গোল করে ওকে ভয় দেখিয়ে বললাম, কেষ্টঠাকুরকে কখনও পুতুল বলতে নেই। তা হলে ঠাকুর তোকে পাপ দেবে।

মুর্তজা বলল, তোদের ঠাকুর আমাকে পাপ দিতে পারবে না। আমাদের খোদাতাল্লা আছেন। খোদাতাল্লা অনেক বড়।

তোদের খোদাতাল্লাকে দেখতে কী রকম?

মুর্তজা বড়দের মতন গলার আওয়াজ করে বলল, আল্লা সর্বশক্তিমান এবং নিরাকার। আল্লার কোনও বর্ণনা হয় না।

আমি বললাম, যা, যা, কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে সবাইকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে, তা জানিস?

তারপর আমরা দুই খুদে ফ্যানাটিক ঝগড়া শুরু করে দিলুম। ঝগড়া আর একটু হলে মারামারিতেও গড়াতে পারত। মুর্তজাদের বাড়িতে রীতিমতন ধর্মশিক্ষা আছে, আমাদের বাড়িতে সেসব কোনও পাট নেই। আমি শুধু রামায়ণ-মহাভারতের গল্প জানি এবং কিছু দিন আগেই পইতে হবার জন্য নিজেকে ব্রাহ্মণ ভেবে বেশ গর্ব অনুভব করি। আমি মুর্তজাদের ধর্ম কিংবা আল্লা সম্পর্কে কিছুই জানি না, কিন্তু মুর্তজা হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক খবর রাখে-সুতরাং সে বেশ যুক্তি ও তুলনা দিয়ে কথা বলতে পারে-আমার সে-সুযোগ ছিল না বলেই আমি চাচাতে লাগলুম। এক ধরনের অভিমানে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি চলে আসবার আগে ওকে বললুম, তুই তোদের আল্লার পুজোয় আমাকে কখনও নেমন্তন্ন করেছিস? আমি দুর্গা ঠাকুরের পুজোয় তোকে নেমন্তন্ন করলুম, আর তুই আমাকে এ রকম বললি?

মুর্তজা তখন ছুটে এসে আমার পিঠে হাত দিয়ে ভাব করতে গেল, আমি তবু কথা না বলে চলে এলাম।

এটা একটা সামান্য ছেলেমানুষি ব্যাপার। কিন্তু খালধারে দুই বালকের সেই অনর্থক ঝগড়ার দৃশ্য যে-কোনও কারণেই হোক আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। পরে ওই ঘটনা মনে করে অনেক হেসেছি।

দ্বিতীয় স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটেছিল আমার সেজোমামার জন্য। আমার এই মামাকে আমি আগে কখনও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না, এইবারই ভালো করে চিনলাম। সেজোমামাকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রংটি মাজা মাজা, সদ্য ঢাকা থেকে ডাক্তারি পাস করেছেন। আমরা তাঁকে অতীনমামা বলে ডাকতাম- মানুষটি খুব আমুদে, সব সময় হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে থাকতেন। অতীনমামা যখন যেখানে থাকতেন, সেখানেই একটা আনন্দের হাওয়া বয়ে যেত।

এই অতীনমামা পুজোর ঠিক দুদিন আগে জলধরকে একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, জলধর, তুমি এই ছবি দেখে ঠিক এ রকম মূর্তি বানাতে পারো?

জলধর মাথা নেড়ে বলল, এ আর কঠিন কী!

তারপর অতীনমামার সঙ্গে জলধরের আর কী কী কথা হয়েছিল আমরা জানি না। তখনই ঠাকুরদালানের চার পাশ ঘিরে দেওয়া হল কাপড় দিয়ে। সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল।

ষষ্ঠীপুজোর দিন যখন পরদা উঠল, ঠাকুরের মূর্তি দেখে আমরা সবাই অবাক। অনেক কিছুই বদলে গেছে।

আর সবই ঠিক আছে, রাংতাজরির ডাকের সাজ রয়েছে, কলকা বসানো বিশাল চালচিত্র পেছনে, সরস্বতী হংসবাহিনী-তাঁর রং দুধেআলতা, লক্ষ্মীর রং কাঁচা হলুদ, লাল রঙের

পেটমোটা গণেশ, দুর্গার মুখও জলধরের নিজস্ব-কিন্তু কার্তিক নেই- সেখানে সুভাষ বসু দাঁড়িয়ে। সুভাষ বসুর মূর্তির গায়ে পুরোপুরি সামরিক পোশাক- দেবসেনাপতির যোগ্য তার বীরত্বব্যঞ্জক ললাট ও চক্ষু, শুধু গোল চশমাটা একটু কেমন কেমন দেখায়। আর নীল রঙা অসুরের বদলে সেখানে রয়েছে একজন ইংরেজ মিলিটারি-সে সিংহের দিকে বেয়োনেট উঁচিয়ে আছে, আর মা দুর্গা সেই মিলিটারির বুকে বর্শা বিধিয়ে দিয়েছেন। খবর পেয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসতে। লাগল সেই মূর্তি দেখবার জন্য।

সেই মূর্তি দেখে আমি কী যে অভিভূত হয়েছিলুম, তা বলে বোঝানো যাবে না। যতক্ষণ তাকিয়ে থাকি, আশ মেটে না। আমি যেখানেই দাঁড়াই, মনে হয় মা দুর্গা আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

রাত্তিরবেলা অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুর সাজানো হল। আমি মায়ের ডাক উপেক্ষা করে সেখানে বসে রইলাম। আমার একটুও ঘুম আসেনি। শেষে, বড়রা যখন খেতে গেল, তখন আমাকে শুতে যেতেই হল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই মনে হল, ঠাকুরদালানে এখনও ঠাকুর সাজানো হচ্ছে। টুপ করে বিছানা থেকে নেমে আমি এক ছুটে চলে গেলাম সেখানে।

গিয়ে দেখি, দু'-তিনটে হ্যাঁজাক আর পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে কিন্তু কোনও লোক নেই। ঠাকুরদালানে আমি একা বাইরে গভীর রাত ঝিমঝিম করছে। আমার ভয় করল না, ভীষণ ভালো লাগল। আমি সব ঠাকুরের পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম, অন্য সময় আমাকে এই সুযোগ কেউ দেবে না।

আমি সরস্বতী ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ আমার মনে হল, মূর্তির যেন চোখের পলক পড়ল। বুক কেঁপে উঠল আমার। এ কি সত্যি? শুনেছি এ রকম সত্যিই হয়। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলাম সেই মূর্তির দিকে, না, আর পলক পড়েনি। তবে, সেই সরস্বতীর মুখ আমি ভুলিনি, বুকের মধ্যে ছাপ পড়ে গিয়েছিল, বহুকাল পরে সেই মুখ আমি আবার দেখতে পেয়েছিলাম।

ষষ্ঠী পেরিয়ে সপ্তমী এসেছে। গ্রামের মেয়েরা কেউ তখনও ফ্রক পরে না–সকলেই শাড়ি পরা এক একটি খুদে গিন্নি। ছোট ছেলেরা পরে ইজেরের ওপর পাঞ্জাবি আর পায়ে পাম্পশু। আমি কলকাতার ছেলে, আমার কথাই আলাদা। আমি তো ঘটি হয়ে গেছি। আমি 'আইছি' 'খাইছি' 'দেখছি'র বদলে তখন এয়েচি, খেয়েচি, দেখেচি, বলি, আমার পোশাকও আলাদা–আমার বেল্ট লাগানো হাফপ্যান্ট, আর চেন বসানো সিল্কের গেঞ্জি আর নটিবয় বুটজুতো। কলকাতা থেকে আনা সাদা লম্বা লম্বা এক রকম লজেন্স তখনও কয়েকটা আমার কাছে ছিল, তার একটা দু আঙুলে ধরে মুখে দিয়ে আমি সমবয়সিদের। বললাম, এই দেখ, আমি সিগ্রেট খাচ্ছি, মেজোমামার মতন। হু-স! সবাই অবাক, শুধু আমার মাসতুতো বোন পান্তি বলল, দাঁড়াও না, দাদামশাইকে বলে দেব। তুমি অঞ্জলি দেবার আগেই খেয়েছ!

আমি ভয় পেয়ে রাগ দেখিয়ে বললাম, ইল্লি! খেয়েছি নাকি! শুধু তো মুখে দিয়েছি।

দালান থেকে ভোগের থালা লাইন করে আসতে লাগল। পুরুতমশাই এক হাতে আরতির ঘণ্টা অন্য হাতে পঞ্চপ্রদীপ–দু হাত একসঙ্গে নাড়াতে লাগলেন, শুরু হল ঢাকের বাজনা। তিন জন ঢাকি, দু'জন ঢুলি, দু'খানা কাসি, ঢাকের আওয়াজ বলছে, ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন? আর কাসি বলছে, তাই দেখ না, তাই দেখ না! অমূল্য ঢাকির নাম সারা তল্লাট জুড়ে, পালকের ফুল বসানো বিচিত্রিত জয়োক নিয়ে সে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, সেই তালে তালে দুলছে আমাদের শরীর। কঁসি যে দু'জন বাজাচ্ছে, ওদের মধ্যে একজনের নাম দুলাইল্যা, ও নাকের ওপর মস্ত বড় আগুন জ্বালা ধুনুচি নিয়ে আরতির সময় দারুণ নাচ নামতে পারে।

দুই ব্যাচে খাওয়ানো হয়–দাদামশায়ের হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যাচ। মুর্তজা না এলেও অনেক মুসলমানই উৎসবে যোগ দিতে এসেছে।

জন পনেরো লোক পরিবেশন করছে আঁকা ঝকা লুচি আসছে আর উড়ে যাচ্ছে। ও এনাতালি, তোমাকে আর একখানা অমৃতি দিই? ও আইনন্দি, তুমি গতবার ছ' গন্ডা

রসগোল্লা খেয়েছিলে, এবার মাত্র সাড়ে চার গন্ডা খেয়েই কাত? ভৈরব কাকা, আপনি নাকি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন? এবার থেকে তা হলে বাঘেও আর মানুষ খাবে না। হা-হা-হা-হা। এই রকম সব কোলাহল।

প্রতিবেশী জমিদার ইমানুল্লা দাদামশায়ের পাশে মখমল মোড়া চেয়ারে বসে আছেন। জঁদরেল ভঙ্গিতে। গড়গড়ায় টান দিয়ে তিনি বললেন, এবার যা পিরতিমা বানাইছেন, সব মাইনষে ধন্য ধন্য করতাছে।

দাদামশাই মৃদু হাস্যে শুধু বললেন, পোলাপানগো খেয়াল!

ইমানুল্লা সাহেব আবার বললেন, এ তো দুর্গাঠাকুর নয়, এ তো ভারতমাতা। জলধররে বেশি কইরা ইনাম দিয়া দেবেন।

এমন সময় একটা শোরগোল উঠল। কিছু লোকের ছুটোছুটি। পুকুরঘাটে নৌকো থেকে উঠে এল আট-দশ জন লালপাগড়ি পুলিশ আর মহকুমার পুলিশ বড়বাবু বিপিন চৌধুরী। গট গট করে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, বড়কর্তা, এসব কী? আপনার মতন একজন মানী লোক এই কাণ্ড করবেন, এ রকম শান্তিপূর্ণ গ্রামে?

কারোকে দেখে বিচলিত হবার লোক নন দাদামশাই। তার মনের ভাব মুখ দেখে। কিছুতেই বোঝা যাবে না। তিনি নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে কী?

বিপিন চৌধুরী বললেন, পেছনের নৌকোয় হারবিনজার সাহেব নিজে আসছেন। আজ সকালেই ওঁর কাছে রিপোর্ট গেছে।

দাদামশাই বললেন, তা কী হবে?

এক্ষুনি এ পুজো বন্ধ করে দিন।

কী?

দাদামশাই ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু তার গলায় তেজ আছে। এমন কঠিন ভাবে তিনি কী' কথাটা উচ্চারণ করলেন যে, সবাই এক নিমেষের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিপিন চৌধুরী দমলেন না। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আপনার ভালোর জন্যই বলছি।

আমার ভালোর কথা, তোমাকে ভাবতে হবে না। আসল কথাটা কী বলো।

এ-প্রতিমা পুজো বন্ধ রাখতে হবে। গভর্নমেন্টের হুকুম।

পুজোআচ্চাও কি এখন থেকে গভর্নমেন্টের হুকুমে চলবে নাকি?

এ-প্রতিমা এক্ষুনি বিসর্জন দিয়ে দিন। ঘট পুজো করুন।

ইমানুল্লা মাঝখানে এসে বললেন, আপনে কন কী চৌধুরী সাহেব। নিজে হিন্দু হইয়া আপনি হিন্দুর পূজা বন্ধ করতে চান। দোষটা হইছে কী?

চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে দোষ বুঝবেন? অসুরকে করেছেন ব্রিটিশ সৈন্য, এই যুদ্ধের সময়-আর সুভাষ বোস একজন রাজদ্রোহী, এ ট্রেইটার...এ-বাড়ির সবকটা। পুরুষমানুষকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পরোয়ানা আছে।

দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, আমাকেও?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। তাও না হয় যাব। আগে পুজো শেষ হোক। বিজয়া দশমীর পর এসো।

হারবিনজার সাহেব একটু বাদেই এসে পড়বেন।

আসুক তা হলে সাহেব।

এক ঘণ্টার মধ্যেই হারবিনজার সাহেব এসে পৌঁছোলেন। তাঁর চোখদুটি নীল, মাথার চুলগুলো সম্পূর্ণ সোনালি–দেখলে যেন মানুষ বলে মনে হয় না।

এক ব্যাচের তখন অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, সাহেব দেখে অনেকেই উঠে দাঁড়াল। ছোটরা পালিয়ে গেল ভয় পেয়ে। শুধু আমি, কলকাতা-ফেরত, অনেক সাহেব দেখেছি কিনা–তাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাহেব ঘুরে ঘুরে দেখলেন সবকিছু। হাতের ছড়িটা ঘঘারাতে লাগলেন আলগা ভাবে। কত দূরে এই সাহেবটির দেশ, এখানে এই এক অচেনা পাড়াগাঁয়েও কত স্বাভাবিক ভাবে ঘুরতে পারেন। তার কারণ কি তার কোমরে গোঁজা পিস্তলটি?

ঢাকি-টুলিরা বাজনা বন্ধ করে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে। ধূপধুনোর গন্ধে আচ্ছন্ন থমথমে পূজামণ্ডপ। সব দেখে শুনে সাহেব বললেন.... .

সাহেব কী বললেন, সে বয়সে আমরা ঠিক বুঝিনি। পরে মামাদের মুখে শুনেছিলুম, সাহেব হাসতে হাসতে বিপিন চৌধুরীকে বলেছিলেন, তুমি তো সব সময়েই ঘাসের মধ্যে সাপ দেখো। আমি তো এখানে সিডিশাস কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শখ করে মূর্তি বানিয়েছে–কোনও ইনস্টিগেশন নেই। আমি তো রিপোর্ট পেয়েছিলুম ওইখানে গ্যান্ডি আর বোসের স্পিচ রিসাইট করা হচ্ছে!না, না, এ রকম সুন্দর আবহাওয়া নষ্ট করা উচিত নয়। সব চলুক। আঃ, কী সুন্দর গন্ধ এখানে।

সাহেব আরও বলেছিলেন, ড্রাম বিটিং শুনতে তার ভালো লাগে। ঢাকের বাজনা থামল কেন? ইঙ্গিত পেয়ে অমূল্য ঢাকি আর তার দলবল দ্বিগুণ উৎসাহে লাফিয়ে লাফিয়ে বাজনা শুরু করল, কাসির আওয়াজ ক্যান ক্যান সুরে বলতে লাগল, তাই দেখো, তাই দেখো না! সবাই ইংরেজ সরকারের মহানুভবতার জন্য ধন্য ধন্য করতে লাগল।

বড়দিদিমা একটা থালায় সব রকম প্রসাদ সাজিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা সাহেবকে দিয়ে আয়।

সাহেব আমার দিকে মৃদু হাস্য করে আগ্রহের সঙ্গে থালাটি নিলেন। আমি লক্ষ করলুম সাহেবরা একদম খেতে জানে না। শাঁকালু আর কলাও পায়েসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছে।

সেবার বিজয়া দশমীর দু'দিন বাদেই বড়বাবুর কাছ থেকে এক চিঠিতে জানতে পারলাম, সূর্যদা খড়গপুর রেল স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

৪৬. যে-কোনও কারণেই হোক

যে-কোনও কারণেই হোক বাবা হঠাৎ এই সময় দাদামশাইয়ের আশ্রয় ছেড়ে নিজের পৈতৃক গ্রামে চলে যাবার জন্য জেদাজেদি করতে লাগলেন। বাবা নিরীহ ও লাজুক ধরনের মানুষ, কারওর মুখের ওপর জোর দিয়ে কথা বলতে পারেন না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ গোঁয়ার। একবার কিছু একটা বলে ফেললে আর অন্যের কথায় মত পরিবর্তন করতেন না।

দাদামশাইয়ের ওখানে আমাদের কোনও অসুবিধেই ছিল না। দিব্যি খেতাম দেতাম, ঘুরে বেড়াতাম। তবু সেই অবস্থা বাবার কেন অসহ্য বোধ হল, তা সেই বয়সে আমার বোঝার কথা নয়। তখনও আমি টের পাইনি যে সমস্ত পৃথিবী একটি বিনিময় ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই বিনিময়ের মাধ্যম মানুষ আবিষ্কৃত টাকা নামক একটি বস্তু। এবং বেঁচে থাকার ব্যাপারটাকে বেশ চমকপ্রদ করার জন্য এই টাকার বণ্টন প্রণালীও বেশ ঘোরালো করে রাখা হয়েছে।

আমার মায়ের একেবারে ইচ্ছে ছিল না বাপেরবাড়ি ছেড়ে যাবার। শ্বশুরের ভিটে সম্পর্কে তার কোনও মোহ নেই। মা চেয়েছিলেন অন্তত আমার দিদির বিয়েটা ওখান থেকেই দিয়ে যেতে। পর পর ক' রাত্তির আমি মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনতাম বাবা ও মায়ের ঝগড়া। বাবা ও মা দুজনেই এত ভালো-অথচ সেই সময় চাপা গলায় বিষাক্ত ভাবে হিসহিস করছেন। দিনেরবেলা ওঁরা যাঁদের সঙ্গে অনেক হেসে কথা বলেন, এখন তাঁদের সম্পর্কেই

কত রাগের খারাপ খারাপ কথা বেরিয়ে আসছে। বড়দের মনের মধ্যে কত রকম গোপন কথা থাকে। আমি ঘুমের ভান করে নির্জীব হয়ে শুয়ে থেকে সব শুনতাম।

ঝগড়ার সময় আমার মায়ের যুক্তি বেশি ছিল না, অভিমানী কান্নাই ছিল প্রধান অস্ত্র। কটু অভিমানের সঙ্গে মা বলতেন, তোমার হাতে পড়ে সারা জীবন শুধু কষ্ট পেলাম! এতই যদি কষ্ট দেবে, তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন?

বাবা তিক্ত গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তা হলে আত্মহত্যা করি। তারপর তুমি তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপেরবাড়িতে সুখে থাকো!

শেষ পর্যন্ত বাবার জেদই বজায় রইল। একদিন আমরা বাক্স-প্যাটরা নিয়ে আবার নৌকোয় চড়ে বসলাম। মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

যে-কোনও নতুন জায়গাতে যাবার ব্যাপারেই একটা উত্তেজনা থাকে সেই বয়সে। আমি নৌকোর গলুইয়ের কাছে উৎসুক হয়ে বসেছিলাম সামনে দিকে চেয়ে। ছইয়ের ভেতরে মা আর বাবা। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর মায়ের মুখখানা থমথমে। বাবা উদাসীন ভাবে একটার-পর-একটা সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছেন। দিদি গোড়া থেকেই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

খাল-বিল-নদী পেরিয়ে চলেছে নৌকো। মনে হচ্ছে, এ-যাত্রার বিরাম নেই। যত দূর দেখা যায়, শুধু জল। মাথার ওপরে শীতকালের পরিষ্কার আকাশ। আমার ঠিক চোখের সামনেই নাদের আলি লগি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তার খালি-গা, নিকষ কালো রং, তেল চকচকে সবল দীর্ঘ দেহ, মনে হয় যেন মাঝে মাঝে তার মাথাটা আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করলেই সে ঝকঝকে সাদা দাতে হাসে। যেন একটা চমৎকার ছবি।

আমি আমার নিজের বাড়িতে যাচ্ছি। নাদের আলি এই কথা বলেছে, বাবাও বলেছেন। এতদিনে এইটুকু বুঝেছি, কলকাতায় বড়বাবুর বাড়ি কিংবা এখানে মামাবাড়ি–আমাদের নিজের বাড়ি নয়। আরও ছেলেবেলায় মাটি কিংবা বালি দিয়ে যে-বাড়ি বানাতাম–তা

ছাড়া আমার আর কোনও নিজের বাড়ি দেখিনি। একটা অদম্য কৌতূহলে ছটফট করছিলাম।

সত্যিকারের নিজের বাড়িতে পৌঁছে একটু চুপসে গেলাম। জরাজীর্ণ নৈরাশ্যময় পরিবেশ। এবাড়ি অনেক দিন পরিত্যক্ত। বাবার এক দূর সম্পর্কের মামার ওপর দেখাশুনোর ভার। তিনি বাড়ির এলাকার গাছের ফলমূল ভোগ করার জন্য যতটা দেখাশুনো করা দরকার, তা করতেন। আমরা খবর না দিয়ে হঠাৎ এসে পড়ায় তিনি বাবাকে বকাবকি করতে লাগলেন। খবর পেলে তিনি ঘরদোর অন্তত পরিষ্কার করে। রাখতেন।

অবস্থা দেখে মা খুব মুষড়ে পড়লেন। দিদি আদুরে মেয়ের মতন নাকেকান্না কঁদতে লাগল। আমি দৌড়োদৌড়ি করে সব জায়গাটা ঘুরে দেখতে লাগলাম একলা একলা। আমাদের দেখবার জন্য গাঁয়ের বেশ কিছু লোক ভিড় করে এসেছিল।

মায়ের প্রধান চিন্তা নাদের আলিকে নিয়ে। নাদের আলি ফিরে গিয়ে যদি এই রকম অবস্থার কথা বলে দেয়, তা হলে মামাবাড়ির সবাই খুব দুশ্চিন্তা করবে, দাদামশাই হয়তো আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য লোক পাঠাবেন। বাবা তখন আবার কী কাণ্ড বাধাবেন কে জানে। মা সেই জন্য নাদের আলিকে খুব খাতিরযত্ন করতে লাগলেন, নগদ পাঁচটা রুপোর টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, নাদের, গিয়ে বলো আমরা সবাই ভালো আছি। আমরা এখন আমাদের এক মামাশ্বশুরের বাড়িতে থাকব-তারপর বাড়িঘর সারিয়ে টারিয়ে-চিন্তার কিছু নেই, তুমি বুঝিয়ে বোলো! কেমন?

নাদের আলিকে আমি আবার নৌকোর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। নৌকোয় ওঠার আগে নাদের আলি দু হাতে আমার কোমর ধরে উঠিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে আদর করল। তারপর বলল, ঠাকুরভাই, আবার আইসো। এবার তোমারে। আমি ঠিক তিন প্রহরের বিলে নিয়া যাব।নাদের আলির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। সে তার কথা রাখেনি। যে-কোনও চেনা মানুষ চলে গেলে আমার চোখে জল আসে।

ফুলপুরে প্রথম কয়েক দিন আমাদের ভালোই কেটেছিল। আমরা নতুন মানুষ, আমাদের গায়ে তখনও কলকাতার ছোঁয়াচ আছে, সুতরাং আমাদের সম্পর্কে অনেকেই আগ্রহী। প্রায়ই নানান বাড়িতে নেমন্তন্ন পাই। আর সে কী খাওয়া! এক থালা-ভরতি ভাত শেষ না করে কেউ উঠতেই দেয় না। কাধ ধরে জোর করে বসিয়ে রাখে। সেই ভাত কোনওক্রমে শেষ করলেও তারপর আবার নতুন গুড়ের পায়েস খেতেই হবে। খাওয়ার পর মনে হয়, না আঁচিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ি।

এক মাস-দেড় মাসের মধ্যেই অবশ্য এইসব কৌতূহল স্তিমিত হয়ে যায়। তখন আমরা শুধু নিজেদের নিয়ে একলা। বাবা, মা, দিদি আর আমি। এর আগে আমরা সব সময়ই বেশ বড় বাড়িতে অনেক লোকের সঙ্গে থেকেছি বলে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। এখন ছোট নিরালা বাড়িতে আমরা সবাই কাছাকাছি, যেন পরস্পরকে নতুন করে চিনে নিচ্ছি। মাকে দেখি সারা দিন রান্না করতে, বাবা গভীর ভাবে বসে থাকেন, দিদি জল তলে, কাপড় কাঁচে আর এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে বেড়ায়।

এখানেই আমি নানা জনের কাছ থেকে টুকরো টুকরো ভাবে শুনি, আমার পূর্বপুরুষদের গল্প। আমার ঠাকুরদা, তিন ঠাকুমা, আর বিশ্বরঞ্জন কাকার চমকপ্রদ জীবনী, পূর্ণিমা পিসিমার বিয়ের কেলেঙ্কারির কথাও অনেকেই এখনও ভোলেনি। ভারী আশ্চর্য লাগে, সেই সব মানুষ সবাই মরে গেছে কবে, তবু তাদের গল্প এখনও বেঁচে আছে। আমি ওঁদের কারোকেই দেখিনি, তবু যেন দেখতে পাই। ওই বাতাবি লেবুর গাছটার তলায় বসে আমার ঠাকুরদা তামাক খেতেনবাগানের মধ্যে ভাঙা ঘরটায় আমার ছোটকাকা মূর্তি বানাতেন–আমি সেই সব জায়গায় দাঁড়াই–আর আমার গা শিরশির করে, শরীরের মধ্যে যেন টের পাই পূর্বপুরুষের রক্তস্রোতযদিও প্রত্যেক মানুষের জন্মই এক একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। মা যখন রাগের মাথায় বাবাকে বলেন, তুমি আমায়। বিয়ে করলে কেন, তখন মায়ের মনে থাকে না যে তা হলে আমি বা দিদি জন্মাতাম না। অথচ সব মা-ই নিজের সন্তানকে সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে ভালোবাসে। মানুষের জীবন এই রকমই অযৌক্তিক।

ঘন ঘন জায়গা বদলাবার ফলে আমি বন্ধুহীন হয়ে পড়ছিলাম। ফুলপুরে আমার তেমন কোনও বন্ধু হল না। বছর শেষ হয়নি বলে স্কুলেও ভরতি হইনি। আমি একা একা ঘুরে ঘুরে এক এক দিন এক একটা বাগান বা পুকুর বা পাটখেত আবিষ্কার করতাম। যা কিছু আমায় কেউ আগে থেকে চিনিয়ে দেয়নি, সেগুলোই আমার নিজস্ব মনে হত। আমার সেই অধিকারের জগতে আমি আপন মনে কথা বলতাম আমার পুরনো বন্ধুদের, সঙ্গে। কলকাতার কথা খুব মনে পড়ত, বিষ্ণু, জীমূত, রেণু ওদের যেন ঠিক চোখের সামনে দেখতে পেতাম। এক একদিন সূর্যদার সঙ্গেও আপন মনে কথা বলেছি। কল্পনায় দেখতাম, জেলখানায় গরাদের ও-পাশে সূর্যদা একটা হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ রাগী থমথমে মুখ। সূর্যদা নিশ্চয়ই কোনও এক সময় জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তার আগেই যদি সূর্যদার ফাঁসি হয়ে যায়?

একদিন একটা বাগানে অনেকগুলো লেবুগাছ দেখলাম। বড় বড় গন্ধরাজ লেবু ফলে আছে। লেবুফুল আমি আগে কখনও দেখিনি। সেই লেবুফুলের গন্ধ শুকতে গিয়ে হঠাৎ আমার হৈমন্তী কাকিমার কথা মনে পড়ল। একরাশ চুলের মধ্যে হৈমন্তী কাকিমার মুখখানা ঠিক গন্ধলেবুর ফুলেরই মতন। বড় লেবুর গায়ের মতন তার থুতনি। হৈমন্তী কাকিমা আমাকে বললেন, বাদল, আমি জীবনে কিছু পাইনি। আমি কথাটার মানে বুঝতে পারলাম। হৈমন্তী কাকিমা আবার বললেন, আমি জীবনে কিছু পাইনি। আমার বুক দুলে উঠল। আমি লেবুফুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার জন্য আমি সবকিছু এনে দেব।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটা খুব পুরনো বড় বাড়ির কাছে চলে গিয়েছিলাম। বাড়িটাতে কোনও মানুষজন নেই। আমি এক পা-দু পা করে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ পাশের বাগান থেকে একটা রোগা চিমসে মতন লোক বেরিয়ে এসে বলল, খোকা, যেয়ো না। ও বাড়িতে ভূত আছে। শুনে আমার মনে হল, ওই লোকটাই ভূত। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালাম।

তা ছাড়া, আর একটা জিনিস এখানে লক্ষ করার মতন। মামাবাড়ির গ্রামের তুলনায় এই গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা কম। নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরিবই বেশি হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য-যে দু-চার বড়লোক আছেন, তারাও মুসলমান। শিক্ষিত

চাকুরিজীবী হিন্দুরা তখন থেকেই কলকাতামুখী। অনেক বনেদি বাড়ি প্রায় খালি পড়ে আছে-কর্তারা দোল দুর্গোৎসবে একবার করে বেড়াতে আসে।

ফুলপুরে এসে আমি খুব তাড়াতাড়ি বয়স্ক হয়ে গেলাম। আমার নানা রকম অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হতে লাগল।

এখানেই প্রথম ভালো ভাবে টের পেলাম, হিন্দু আর মুসলমান দুটো আলাদা জাত-এদের মধ্যে মেলামেশা বারণ। যে-সব মুসলমান আমাদের বাড়িতে আসে, তারা উঠোনে এসে দাঁড়ায়, কক্ষনও বারান্দায় বসে না। অর্থাৎ তাদের বসতে দেওয়া হয় না। কারওর কাছ থেকে কিছু কিনলে পয়সা দেওয়া হয় আলগোছে। তাদের মুখে লেগে থাকে একটা বিগলিত ভাব। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা অনেককে চাচা কিংবা সাহেব বলি, মুখে বেশ মিষ্টি কথা থাকলেও ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে সবকিছু। হিন্দুরা আড়ালে মুসলমানদের সম্পর্কে এমন ভাবে কথা বলে যেন ওরা মানুষের অধম। ওরা চোর, ওরা হিংস্র, ওরা নোংরা। সাপ আর মুসলমানদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও হাজার রকমের জাতবিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি, ব্যবধান-কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে সবাই একমত। যত গরিব বাড়ি, তত বেশি উগ্রতা। আমার মামাবাড়িতে এ রকম দেখিনি, সম্ভবত সেখানে হিন্দু আধিপত্য এত বেশি ছিল যে মুসলমানদের প্রতি দয়া দেখানো সহজ ছিল।

মুসলমানরা আলাদা পাড়ায় থাকে, তাদের জীবনযাত্রা অন্য রকম। কখনও কখনও রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য মুসলমানদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছি-মাথা নিচু করে নিঃশব্দে রাস্তাটুকু পার হতে হয়েছে-সে বাড়ির লোকেরাও নিঃশব্দে চেয়ে থেকেছে, কেউ কোনও কথা বলেনি। আড়চোখে দেখে নিই, তাদের বাড়ির উঠোনে মুরগির পাল দৌড়োদৌড়ি করে, বাচ্চারা ছাইগাদায় গড়ায়, ওদের বাড়ির মেয়েরা খড়ম পায় দেয়, সব জায়গায় কেমন যেন একটা রসুন রসুন গন্ধ।

মুসলমানরা বাড়িতে মুরগি পোষে-এটা বাঙালি হিন্দুর চোখে একটা ঘৃণার ব্যাপার। হিন্দুর বাড়িতে হাঁস থাকে-সেই হাঁসের ডিমও খাওয়া হয়, কিন্তু মুরগির মাংস বা ডিম

একেবারে নিষিদ্ধ। হাঁস আর মুরগির ডিমের মধ্যে দুটি আলাদা ধর্ম কী ভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল-সে-প্রশ্ন কারওর মনে জাগেনি। তখনও হিন্দুরা পোলট্রির ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। কলকাতায় এক ভটচাজ বামুন জুতোর দোকান খুলেছিল বলে সবাই অবাক। আমাদের পাড়ায় একবার একটা শজারু মারা হয়েছিল, সেই শজারুর মাংস রান্না করে খাওয়া হয়েছিল খুব আহ্লাদের সঙ্গে। কিন্তু গ্রামে কোনও হিন্দু বাড়িতে মুরগির মাংস রান্না ছিল অকল্পনীয়।

সাধারণ মুসলমানরা হিন্দুদের সম্পর্কে আড়ালে কী মন্তব্য করত, তা আমার জানার কথা নয়। হিন্দুদের সম্পর্কে তাদেরও একই রকম ঘৃণার ভাব থাকার কথা। তবে পথেঘাটে হিন্দুদের সঙ্গে দেখা হলে তারা কথা বলত একটু বিনীত ভাবে। একবার শুধু একজন মুসলমানের বাড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় একজন মাঝবয়সি লোক আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, এই বামনা, ফের এদিক দিয়ে যাবি তো ঠ্যাং খোঁড়া কইর্যা দেব!

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তো কোনও দোষ করিনি। এ বাড়ির ছাইগাদায় একটা টোপাকুল গাছে অসংখ্য বড় বড় কুল হয়ে আছে-একবার ভেবেছিলাম সেই কুল কয়েকটা লুকিয়ে পেড়ে নেব কিন্তু সরস্বতী পুজোর আগে আমার কুল খাওয়া নিষেধ, তাই লোভ সংবরণ করেছি। তবু এ-লোকটা আমাকে বল কেন?

আমি তেরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, কেন?

লোকটি উঠে এসে চেঁচিয়ে বলল, ভালো চাস তো পালা, নয়তো একখানা চোপড় (থাপ্পড়) দেব!

আমি লোকটির নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকালাম। কয়েক শতাব্দীর ভুল বোঝাবুঝির মাঝখানে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাই আমার মনে হচ্ছিল, লোকটি বিনা কারণে আমাকে অপমান করছে। এবং লোকটি ভাবছিল, আমার ঠাকুরদার বাবার দোষে আমাকেই শাস্তি দেওয়া উচিত। সে-দিন লোকটি আমাকে খুন করে ফেললেও সেটি একটি ইতিহাসসম্মত ব্যাপারই হত।

হিন্দুদের মুখে মুখে তখন কাশেম আলির নাম খুব ঘুরত। কাশেম আলি তখন ওই তল্লাটে মুসলিম লিগের পাণ্ডা-এবং সে পাকিস্তান নামক একটা আজব জিনিস সম্পর্কে আবোলতাবোল বলে যাচ্ছে। ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব পাস হয়ে যাবার পরও অধিকাংশ হিন্দুই পাকিস্তান শব্দটির সঙ্গেও তখন পরিচিত নয়। কিন্তু মুসলমানেরা কাশেম আলির কথা বেশ মনে দিয়ে শুনছে। তার ফলে দু'-একটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটতে লাগল। হাটেবাজারে মাঝে মাঝে হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে মার খায়। হিন্দুরা প্রথম বুঝতে পারল, নাক-উঁচু ভাব নিয়ে থাকলেও তারা সংখ্যায় কম। জমিদারি আমল টলটলায়মান, নতুন যুগ এসেছে, ভোটাভুটির যুগ। এই ভোটাভুটির যুগে যে-দিকে জনসংখ্যা বেশি, সে-দিকেরই জোর।

আমাদের বাড়িতে প্রথম যেবার চুরি হল, আমরা খুব উত্তেজিত বোধ করেছিলাম। সিঁধ কেটে রাত্তিরবেলা চোর ঘরে ঢুকে অনেক কিছু নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে কাছের বাগানে আমাদের খালি বাক্সগুলো পেলাম-টিনের বাক্স চোরেরা নেয় না। এর তিন দিন বাদেই দেখলাম, আমার চেন-লাগানো সিল্কের গেঞ্জি বাজারে একটি মাছওয়ালার গায়ে। সে আমাদের দেখে একটুও অপ্রতিভ বোধ করল না। আমি বাবার চোখের দিকে তাকালাম। বাবা বললেন, থাক, কিছু বলতে হবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তখন থেকেই হারতে শুরু করেছে।

আর একটা জিনিস বুঝেছিলাম, আমরা গরিব। একথা যে শুধু আমরা জানি তাই-ই নয় অন্যরাও জেনে গেছে। আমরা প্রথম প্রথম আসবার পর লোকে ভেবেছিল, আমরা বোধহয় ঐশ্বর্যে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেব কারণ আমাদের ঝলমলে জামাকাপড়ের কায়দাই ছিল অন্য রকম, আমার মা ও দিদি স্নো ও পমেটম মাখে, আমার বাবা হুঁকো বা বিড়ির বদলে সিগারেট খান। আমাদের এসব ছিল, শুধু টাকা ছিল না। বাবা পাশের গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায় কিংবা ইস্কুলে চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, পাননি। আবার হোমিওপ্যাথি ডাক্তারির চেষ্টা করেছিলেন, পশার জমল না। গ্রামে তখন একটা ছন্নছাড়া ভাব। দুর্ভিক্ষের একটা বিরাট ছায়া উঁকি মারছে।

ক্রমশ জমানো টাকা সব শেষ হওয়ায় আমাদের খাওয়া-থাকারও কষ্ট দেখা দিল। এতদিন আমার ধারণা ছিল, টাকা জিনিসটা বড়দের পকেটে থাকে–কোনও কিছু কেনবার সময় পকেট থেকে বার করতে হয়। কিন্তু পকেট থেকে যে টাকা কখনও কখনও ফুরিয়ে যায় এবং সেজন্য বড়দের মনে কষ্ট জমে ওঠে, এই উপলব্ধি আমার নতুন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে আমার পইতের সময় পাওয়া টাকাতেও হাত পড়তে লাগল। মা মাঝে মাঝেই দু'-পাঁচ টাকা চাইতে লাগলেন। আমি প্রথমে দিতে চাইনি কিন্তু মা'র থমথমে মুখ দেখে বেশি কথা বলতে পারিনি। আমার কৃপণের সঞ্চয় দ্রুত ক্ষয় হয়ে এল। যেদিন থেকে বুঝতে পারলাম আমরা গরিব, সেই দিন থেকেই খানিকটা অসহায় বোধ করতে লাগলুম। মনে হল, চোখ মেলে চারপাশের এই যে পৃথিবীকে দেখছি, এর ওপরে আমাদের অধিকার অন্যদের চেয়ে কম।

খাওয়ার সময় আর কোনও আনন্দ নেই। হঠাৎ বাবা আবিষ্কার করেছেন যে ভাতের ফ্যানের মধ্যেও প্রচুর খাদ্যপ্রাণ আছে, সুতরাং ফ্যানটুকু নষ্ট করা উচিত নয়। চালু হল ফ্যানভাত। সকালে-দুপুরে-রাত্তিরে আমরা শুধু ফ্যানাভাত খাই। তারপর রাত্তিরে ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রাত্তিরে আমাদের খাদ্য শুধু আলুসেদ্ধ। অনেকগুলো আলু সেদ্ধ করে চটকে নুন দিয়ে মেখে বড় বড় গোল্লা পাকিয়ে থালায় নিয়ে বসি। খেতে খেতে গলায় আটকে যায়, ঢক ঢক করে জল খাই। আমার পছন্দ হয় না, আমি ভাতের জন্য কান্নাকাটি করি।

তখন আমি সবে লম্বা হতে শুরু করেছি, বালক অবস্থা থেকে আমার মানুষ হবার সময়–শরীরে অসম্ভব খিদে। সকাল থেকেই আমি খাই খাই করে মায়ের পেছনে ঘুরি। খিদের জন্য আমার মনখারাপ থাকে, আমি অবুঝের মতন ঘ্যানঘ্যান করে বাড়ির সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারি। তখন বুঝতে পারিনি, কত দিন দুপুরবেলা আমাকে পেট ভরে ভাত খেতে দিয়ে নিজে না খেয়ে থেকেছেন। সেই সময় থেকেই আমার মায়ের চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে।

দারিদ্র শুধু অশান্তি আনেনি, আমাদের নৈতিক অধঃপতনও এনে দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। এখন আর বাবা-মায়ের ঝগড়া মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনতে হয় না, দিনেরবেলাতেও যখন তখন শোনা যায়। প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে ঝগড়া, আমি হাঁ করে শুনি। দু'জনেই ঝগড়ার সময় এমন বদলে যান যে আমি আমার বাবা ও মাকে ঠিক চিনতে পারি না। ওঁদের কাছ থেকে কয়েকটা গালাগালি আমি শিখে নিচ্ছিলাম-এ ছাড়া বাইরের লোকদের কাছ থেকেও কিছু স্টক বাড়ছিল। একটি বারো বছরের ছেলের পক্ষে সময়টা মোটেই ভালো নয়। শহরের কিছুটা স্বাধীন জগত থেকে যে গ্রামের মধ্যে আমি গিয়ে পড়েছিলাম, সেখানে সামান্য দলাদলি ও সংঘর্ষ, জাতিভেদের নীচতা। সামান্য খাবারদাবার নিয়েও বাড়িতে ঝগড়া হয়, চতুর্দিকে নৈরাশ্য, ভালোবাসার কেউ নেই। সে বড় দুঃসময় ছিল।

একদিন রাত্তিরে পেটভরা খাবার না পেয়ে আমি অবুঝের মতন ঘ্যানঘ্যান করছিলাম, মা হঠাৎ মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে এঁটো হাতেই আমাকে এক চড় মারলেন খুব জোরে। মার খেয়ে ব্যথা পাবার বদলে আমি অবাক হয়েছিলাম বেশি। মা আমাকে কোনও দিন মারেননি। আমি একটু মায়ের আদুরে ছেলেই ছিলাম বলা যায়। চোখদুটি বড় বড় করে মায়ের দিকে তাকিয়েছি-মা রাগ সামলাতে না পেরে পর পর আরও দুই। থাপ্পড় দিলেন। আমি এমন কান্না শুরু করলাম যে কিছুতে আর আমার হেঁচকি থামে না। বাবা আমাকে সামলাতে এসে নিজেই চাচাতে লাগলেন, আমি বিষ খাব! আমি আজই। বিষ খাব!

এই অবস্থায় আর চলে না। এবার আমাদের কলকাতায় না গিয়ে আর উপায় নেই। তা ছাড়া দিদিকে নিয়েও গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। দিদিই তখন হয়ে উঠেছিল বাবা-মা'র অশান্তির প্রধান কারণ।

৪৭. শ্রীলেখার সঙ্গে সান্ত্বনার

শ্রীলেখার সঙ্গে সান্ত্বনার স্বভাবের কোনও মিল নেই। ওরা দুজনে একসঙ্গে বড় হয়ে। উঠেছে, দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও আছে, কিন্তু চরিত্র একেবারে আলাদা। শ্রীলেখা সরল

ও নম্র স্বভাবের মেয়ে তার চোখের চাহনিতে সব সময়ই এই ভাবটা থাকে, কেউ কিছু মনে করছে না তো?

সান্ত্বনার চোখের দিকে তাকালে কিছুই বোঝা যায় না। কোনও অচেনা লোকও তার। চোখের দিকে তাকালে সে চোখ ফিরিয়ে নেয় না কখনও। ছেলেবেলা থেকেই সে খুব চাপা ও গম্ভীর স্বভাবের। এক এক সময় মনে হয় তার শরীরে দয়ামায়াও খুব কম। বাদল। তার নিজের দিদির চেয়ে শ্রীলেখার কাছেই বেশি আবদার করেছে।

শ্রীলেখার বিয়ের আগে সূর্যর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আর যারই চোখে পড়ুক বা না পড়ুক, সান্ত্বনা সবই জানত। কিন্তু কোনও দিন সে এ-সম্পর্কে একটাও কথা উচ্চারণ করেনি, শ্রীলেখাকেও কিছু বলেনি। শেষের দিকে বাড়ির বড়রা যখন এ নিয়ে আলোচনা করতেন, সান্ত্বনা সেখান থেকে উঠে যেত নিঃশব্দে। সূর্যর সঙ্গে সান্ত্বনারও একসময় বেশ ভাব ছিল, অথচ একসময় সে সূর্যর সঙ্গে কথা বলাই প্রায় বন্ধ করে দেয়।

সান্ত্বনার কতকগুলো স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। সেলাই টেলাই বা বোনার কাজ সে অনেক মেয়ের চেয়েই বেশি ভালো পারে। কিন্তু এদিকে তার কোনও ঝোঁক নেই। শখ করে সে কখনও সেলাই নিয়ে বসে না। রান্নাবান্নার দিকেও তার উৎসাহ নেই, কখনও দরকারে পড়ে বাধ্য হলে সে মোটামুটি ভালোই উতরে দেয়। পড়াশুনোতেও সে

শ্রীলেখার চেয়ে ভালো ছিল, কিন্তু সারা বছর বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে পরীক্ষার কয়েক দিন আগে রাত জেগে পড়ে পাশ করবে। বাড়িতে অনেক লোকজন থাকলে সান্ত্বনার উপস্থিতি টেরই পাওয়া যায় না। সেই জন্যই সে এতদিন শ্রীলেখার আড়ালে চাপা পড়ে ছিল। গ্রামের বাড়িতে নিরিবিলি পরিবেশে তাকে আলাদা ভাবে চেনা গেল।

সান্ত্বনা এখন যুবতী। হঠাৎ তাকে দেখলে চমকে যেতে হয়। অল্প বয়সে তার চেহারা ছিল বৈশিষ্ট্যহীন, হঠাৎ সে ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হয়ে উঠেছে, স্বাস্থ্যে এসেছে চাকচিক্য, যেন সান্ত্বনার খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসেছে অন্য একটি মেয়ে। তার মুখের আকৃতির সঙ্গে তার মা, বাবা বা বাদলের কোনও মিল নেই। বাদলকে দেখে সবাই বলবে ঠিক যেন তার

মায়ের মুখখানা বসানো। সেই জন্যই তখনও বাদলের মুখে একটা মেয়েলি ভাব আছে। সে যখন লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে–তাকে কোনও কিশোরীর মতন মনে হয়। সান্ত্বনার মুখটা অনেকটা অবাঙালি ধরনের। চওড়া কপাল, টিকোলো নাক, লম্বাটে চিবুক, ঠোঁটদুটো খুব পাতলা। তার গায়ের রং অবশ্য খুব ফরসা নয়, মাথার চুলে কিছুটা কোকড়া ভাব আছে। তার চাপা স্বভাবের সঙ্গে এখন যেন মিশেছে একটু একটু অহংকার। বয়সের তুলনায় সান্ত্বনাকে আরও বড় দেখায়।

গ্রামদেশে অসচ্ছল পরিবারের মেয়ের যদি স্বাস্থ্য ভালো হয়, তা হলে সে মেয়ে তো গলার কাঁটা। মেয়ের দিকে তাকালেই হিমানীর আজকাল বুক টিপটিপ করে। সব সময় মেয়েকে চোখে চোখে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। হিমানী এমনিতেই একটু নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ত, একটু কিছু অসমীচীন ব্যাপার ঘটলেই তার মনে হয়, পৃথিবী বুঝি রসাতলে গেল। তা ছাড়া মায়ের প্রাণ, সব সময়েই মেয়ের বিপদের আশঙ্কা করে। মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলেই সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন হিমানী। কিন্তু এ পোড়ার দেশে সে রকম ভালো পাত্র কোথায়? বাপের বাড়িতে থাকতে থাকতেই যদি বিয়েটা দিতে পারতেন!

সান্ত্বনাকে তার বাবা-মা কেউই শাসন করতে পারে না। তার গাম্ভীর্যকে তার বাবা মা-ও সমীহ করে। এক একজন থাকে, যাদের দেখলেই মনে হয় এরা কখনও কোনও অন্যায় করতে পারে না-সান্ত্বনা সেই রকম। সান্ত্বনা যদি একা একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে ফেরে–কেউ তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবে না, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? সে রকম জিজ্ঞেস করলে, জানা কথাই যে সান্ত্বনা কোনও উত্তর দেবে না। মিষ্টি গলায় কিংবা কথার কথা হিসেবে প্রশ্ন করলে সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে পারে।

সান্ত্বনা নিঃশব্দে বাড়ির কাজ করে, জল আনে, বাসন ধোয়, কাপড় কাঁচে। কোনও কিছুই তাকে বলতে হয় না। লঘু হাতে সে ঝটপট কাজ সেরে নেয়। খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে তার বাছবিচার বড্ড বেশি। সে বেগুন খায় না, ট্যাংরামাছ খায় না, পুঁইশাক খায় না। ইলিশমাছের তেল দিয়ে ভাত মেখে খেতে বাঙাল মাত্রেরই জিভে জল আসে কিন্তু সান্ত্বনা

তাতে আঁশটে গন্ধ পায়-সে নাক কুঁচকে দূরে সরিয়ে দেয়। কোনও রান্নায় সামান্য ঝাল হলেই সে মুখে তুলতে পারে না। খেতে বসে যখন তখন সে ভাতসুদ্ধ থালা ঠেলে দিয়ে বলে, ভালো লাগছে না। আর খাব না! হিমানী হয়তো ঝঝের সঙ্গে বলে ওঠেন, তোর কোনটা ভালো লাগে বল তো? সান্ত্বনা তা বলবে না। তার নিজস্ব কোনও দাবি নেই। ইদানীং খাবার ঘরে অনটন দেখা দিয়েছে, চাল প্রায় পাওয়াই দুষ্কর, ভাতের অভাবে বাদল কান্নাকাটি করে সান্ত্বনা কোনও অভিযোগ জানায় না। প্রতি দিনের রান্নার পদ পর্যবেক্ষণ করে সে প্রায়ই আগে থেকে বলে দেয়, আজ আমার খিদে নেই, কিছু খাব না!

মা জিজ্ঞেস করেন, কী খেয়েছিস যে খিদে নেই বলছিস?

সান্ত্বনা বলে, বাঃ সন্ধেবেলা যে দুটো পেয়ারা খেলাম!

সত্যিই তাই, সে দুটো পেয়ারা খেয়েছে বলেই রাত্রে আর কিছু খাবে না। প্রায় কিছুই খেয়েও যে তার স্বাস্থ্য দিন দিন কী করে এত ভালো হচ্ছে, সেটাই এক রহস্য।

সান্ত্বনা বেশিক্ষণ বাড়িতে বসে থাকতে চায় না। একটু ফাঁক পেলেই সে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। সকাল দুপুর সন্ধ্যা যে-কোনও সময়েই হোক। সান্ত্বনা যে-কোনও গোপন জায়গায় যায় বা অবৈধ কিছু করে তাও না। হিমানী মেয়েকে সরাসরি নিষেধ না করে নিজে থেকে খোঁজ নিয়েছেন। একদিন শুধু মিষ্টি ভাবে সান্ত্বনাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, তুই যে যখন তখন বেরিয়ে যাস এতে লোকে নিন্দে করবে। এইসব গ্রামদেশে মেয়েরা একা একা বেরোয় না।!

সান্ত্বনা উত্তর দিয়েছিল, আমি ছেলে হলে তোমার খুব ভালো লাগত, তাই না মা? আর দু-এক বছর পরেই আমি বেশ চাকরি করতাম।

সান্ত্বনা তবু বাড়ি থেকে বেরোয়। গ্রাম্য রাস্তায় সে রীতিমতন একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এ রকম পরিচ্ছন্ন সুঠাম স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে একা একা গ্রামের রাস্তায় আগে কেউ দেখেনি। তার নবোদিত স্তনদুটি সত্যিই যেন শব্দ করে যৌবনের বার্তা ঘোষণা করে, তার ভরাট

ঊরুতে একটা যেন ছন্দ আছে। সবাই তাকে দেখে, সান্ত্বনা সে কথা বোঝে না। একমাত্র মল্লিকবাড়ির ফরসা ফরসা মেয়েরা তার মতন সুন্দরী, কিন্তু তারা বেশির ভাগ সময়েই শহরে থাকে। আবদুর রহমানের বাড়ির জেনানারা নাকি পটের বিবির মতন–কিন্তু তাদের কক্ষনও বাইরে দেখা যায় না। সান্ত্বনাকে নিয়ে এক এক সময় গ্রামের প্রায় সমস্ত পুরুষই রসালো গল্পে মেতে ওঠে। বুড়োদের আড্ডাতেই কথা ওঠে বেশি। কে না জানে, ছোকরাদের চেয়ে বুড়োরাই অশ্লীল কথা বেশি পছন্দ করে। বাদল নিজেও দু-এক বার তার দিদি সম্পর্কে খারাপ কথা শুনে ফেলেছে।

সান্ত্বনা সচরাচর বাদলকে সঙ্গে নিতে চায় না। বাদল কখনও সখনও বাগানে কিংবা পাটখেতের ধারে সান্ত্বনাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছে, দিদি, আমি তোর সঙ্গে যাব?

সান্ত্বনা একটুক্ষণ চিন্তা করে বলেছে, আয়।

তারপর বাদলকে সেনানা রকম কঠিন কঠিন কাজ করতে বলেছে। তাকে সে বলেছে কুঁচগাছ থেকে কুঁচফল পেড়ে আনতে, পুকুরের মাঝখান থেকে পদ্মফুলের কুঁড়ি তুলে আনতে কিংবা ফড়িং ধরতে। বাদল কি এসব পারে?

একদিন সে বাদলকে হাসান গাজি দিঘির দক্ষিণ পারের কোণটায় দেখে বলল, এই শোন, এই খেজুর গাছটায় উঠতে পারবি?

খেজুর গাছটা বাঁকা হয়ে উঠে গেছে অনেকখানি, গাছের বেশ খানিকটা অংশ জলের ওপরে। ডগার কাছে একটা হাঁড়ি বাঁধা। গাজিভাই ভোরবেলা একটা হাড়ি খুলে নিয়ে আর একটা হাঁড়ি বেঁধে রেখে যায়। দিনের রসের নাম ঝরা রস।

বাদল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, গাছে উঠে কী করব?

সান্ত্বনা বলল, হাঁড়িটা পেড়ে আনবি।

ওই রস তো খায় না।

তুই আনতে পারবি কি না বল!

খেজুর গাছটা বাকা বলে ওপরে ওঠা খুব শক্ত নয়। বাদল তবু ভয় পাচ্ছে। সান্ত্বনা বলল, তুই পারবি না? আমি পারি, দেখবি?

দিদি গাছে উঠবে-এটা বাদলের পছন্দ হয় না। সে নিজেই উঠতে শুরু করে। বেশ অবলীলাক্রমেই তরতর করে উঠে যায়। উপরে উঠে যেই হাঁড়িটা খুলেছে, তখনই নীচের দিকে চোখ পড়তে তার মাথা ঘুরে গেল। নীচেই জল-আর এই দিঘিতে যা শ্যাওলা, সহজে সাঁতার কাটা যায় না। বাদল হাঁড়িটা গলায় ঝুলিয়ে সন্তর্পণে নামতে লাগল আস্তে আস্তে। একবার তার পা পিছলে যেতেই এমন বুক কাঁপতে লাগল যে তার হাতের জোর কমে গেল একেবারে। এখন সে কী করবে? নীচের দিকে তাকালেই মাথা ঘোরে। হাঁড়ি সুন্ধু যদি জলে পড়ে যায়-

বাদল চেঁচিয়ে বলল, দিদি, আমি নামতে পারছি না!

উৎকণ্ঠিত হবার বদলে সান্ত্বনা হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, নামতে পারছিস? তা হলে কী হবে?

দিদি, আমি সত্যি নামতে পারছি না!

বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে।

তুই তো আমাকে উঠতে বললি!

উঠতে পারিস, আর নামতে পারিস না, বোকা ছেলে!

সত্যি পারছি না। বাবাকে ডাক। কিংবা কার্তিকাকে।

সান্ত্বনা কারোকেই ডাকল না। শাড়ি গাছকোমর করে বেঁধে নিজেই উঠতে শুরু করল। তার দিকে তাকিয়ে বাদলের আরও ভয় করতে লাগল।

উত্তেজনার মাথায় বাদলের হাত থেকে রসের হাঁড়িটা পড়ে গেল জলে। ঝপাং করে শব্দ হল, পুকুরে তাল পড়লে এই রকম শব্দ হয়, অনেকে সেই শব্দে ছুটে আসে। সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি আবার নেমে পড়ল গাছ থেকে। অন্য লোকজন এসে দেখল, বাদল খেজুর গাছের মাঝখানে কাদো কাঁদো মুখে বসে আছে। শুধু শুধু সে বকুনি খেয়ে মরল। সেই থেকে সে আর দিদির সঙ্গে একেবারেই যেতে চায় না।

অন্য পাড়ার দুটি মেয়ে সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই আসে। একজনের নাম নীলি আর একজনের নাম শংকরী। মেয়েদুটি সান্ত্বনার খুব অনুরাগিনী হয়ে পড়েছে। অবশ্য সান্ত্বনা বিশেষ কোনও কথা বলে না-ওরাই সান্ত্বনাকে রাজ্যের কথা শোনায়। নীলা শংকরী কেউ কোনও দিন স্কুলে পড়েনি, সামান্য বাংলা জানে কিন্তু তাদের বলার অনেক কথা আছে। নীলার এখনও বিয়ে হয়নি, শংকরীকে তার স্বামী নেয় না। শংকরী। অবশ্য বলে তার স্বামী বার্মায় গেছে যুদ্ধ করতে, কিন্তু গ্রাম সুষ্ঠু সবাই জানে তার স্বামী ব্রজের একটি মেয়েকে বিয়ে করে গয়াতে থাকে। নীলার রাক্ষস গণ এবং সিংহ রাশি বলে কোনও পাত্রর সঙ্গেই তার কুষ্ঠি মেলে না, সেই জন্য বিয়েও হতে পারছে না।

নীলা আর শংকরীর সঙ্গে সান্ত্বনা মাঝে মাঝে বেরোয়। লিচুবাগানে চড়ুইভাতি করে। কিন্তু এদের সঙ্গেও সান্ত্বনার ঠিক মেলে না। ওই দুটি মেয়ের মধ্যে নীলা মেয়েটি বিশেষ করে সান্ত্বনার খুবই ভক্ত হয়ে পড়েছিল। সে প্রায়ই বলত, ইস, আমি যদি তোর মতন হতাম।

সান্ত্বনা শুধু জিজ্ঞেস করত, কেন?

নীলা বলত, তোকে দেখে মনে হয়, তুই যেন এই পৃথিবীর মেয়ে না। অন্য কোনও জগৎ থেকে এখানে বেড়াতে এসেছিস!

একদিন সান্ত্বনা একলা একলা বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। খালধারের অন্য দিকটায় অন্য গ্রাম। একটা মস্ত বড় অশত্থ গাছের নীচে কখনও কখনও কোনও সাধু-সন্ন্যাসী এসে বসে–এখন সে জায়গাটা ফঁকা, কিছু ভাঙা হড়িকুড়ি ছড়ানো রয়েছে। সান্ত্বনা দেখল, দুটি বয়সে বড় ছেলের সঙ্গে বাদল বসে আছে। একটি ছেলে বাদলের কঁধ জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে একটি জ্বলন্ত সিগারেট আনছে তার মুখের কাছে। বাদল খাবে না, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, অন্য ছেলেটি জোর করে বাদলের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। বাদল শেষ পর্যন্ত সিগারেটে দু' টান দিয়ে খক খক করে কাশতে লাগল।

সান্ত্বনা আড়াল থেকে দেখছিল, অনেকক্ষণ কোনও সাড়া শব্দ করেনি। কাশতে কাশতে যখন বাদলের চোখে প্রায় জল এসে গেছে–তখন সান্ত্বনা ডাকল, এই বাদলা–

বাদল চমকে উঠল, অন্য ছেলেদুটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সান্ত্বনা এগিয়ে এসে বাদলের হাত ধরে বলল, বাড়ি চল।

বয়স্ক একটি ছেলে হুইল দিয়ে উঠল। সান্ত্বনা ছেলেটির দিকে তাকালও না। হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাদলকে।

খানিকটা দূর এসে বাদল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, দিদি, তুই মাকে বলে দিবি?

সান্ত্বনা কোনও উত্তর দিল না। বাবা-মাকে বললও না সেদিন। তার দু দিন বাদে সান্ত্বনা কোথা থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট এনে বাদলকে দিয়ে বলল, এই নে খাবি?

প্যাকেটে দুটো সিগারেট ছিল। বাদল দেখেই চিনতে পারল সেটা তার বাবার প্যাকেট। বাবা ছাড়া এ-গ্রামে সেই সিগারেট কেউ খায় না। কখন রাস্তায় বাবার পকেট থেকে সেটা পড়ে গিয়েছিল, সান্ত্বনা কুড়িয়ে এনে বাবাকে দিল না, বাদলকে দিল। বাদল রেগেমেগে বলল, আমি কি সিগারেট খাই নাকি!

সান্ত্বনা বলল, মিথ্যে কথা বলিস না। কক্ষনও মিথ্যে কথা বলবি না!

সান্ত্বনা কেন একা একা ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি মাত্র কারণ মোটামুটি অনুমান করা যেতে পারে। সান্ত্বনা যখন কোনও নিরালা জায়গায় থাকে, তখন তাকে গুণগুণ করে গান গাইতে শোনা যায়। বাড়িতে কিংবা লোকজনের সামনে সে কখনও মুখ খোলে না। অথচ সে গান গাইতে ভালোবাসে। সান্ত্বনার গলা তেমন সুরেলা নয়, কোনও দিন সে গায়িকা হতে পারবে না, তবু সে মোটামুটি নির্ভুল সুরে গান গাইতে পারে।

গান গাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা পাটখেত। আধ মাইল, এক মাইল ছড়ানো পাটখেতের মধ্যে একবার ঢুকে গেলে আর খোঁজ পাওয়া যায় না। এক মানুষ, দেড় মানুষ উঁচু পাটগাছ, বহুদূর বিস্তৃত একটা আবছা হরিৎ জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। সান্ত্বনা এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেই পাটখেতের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারপর শোনা যায় তার কান্না কান্না মতন গানের আওয়াজ।

সান্ত্বনা সেই রকম গান গাইতে গাইতে আসছে, হঠাৎ পাটখেতের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। এইসব খেতের মধ্যে প্রায়ই শেয়াল লুকিয়ে থাকে, সাপ আর নেউলের যুদ্ধ দেখা যায়। কিন্তু এই আন্দোলন অন্য রকম। সান্ত্বনা সে-দিকে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

একটি দাড়িওয়ালা স্থূলকায় লোকের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে শংকরী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। শংকরীর গায়ে এক টুকরো সুতো পর্যন্ত নেই। অন্য যে-কোনও মেয়ে সেই দৃশ্য দেখলে ছুটে পালাত, কিন্তু সান্ত্বনার সবকিছুই অদ্ভুত। সান্ত্বনা গভীর বিস্ময়ে শংকরীর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, এই শংকরী, কী করছিস রে?

শংকরী কোনও উত্তর দিল না। দাড়িওয়ালা লোকটি লুব্ধ ভাবে হেসে বলল, এ কে?

সান্ত্বনা লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপলক ভাবে কয়েক মুহূর্ত দেখল। তারপর বলল, শংকরী, চলে আয়! এ-লোকটা ভালো নয়?

লোকটি খপ করে সান্ত্বনার হাত চেপে ধরে বলল, তুমিও বোস না!

শংকরী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। লোকটি বেখাপ্পা ভাবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সান্ত্বনা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, শংকরী, তুই এত অসভ্য কেন রে? ছিঃ, তোর লজ্জা করে না?

গ্রামে এইসব ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু সান্ত্বনার চরিত্রের মধ্যে খানিকটা অস্বাভাবিকত্ব আছে। এই রকম আরও দু-একটা ব্যাপারের পর অনেকেই সান্ত্বনাকে পাগল মনে করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই সব কথা এসে পৌঁছোল হিমানীর কাছে, হিমানী প্রথমে কোনও গুরুত্ব দেননি। কিন্তু একদিন মাঝ রাত্তিরে সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসে বলল, মা, আমায় ডাকছে! আমায় ডাকছে!

হিমানী জিজ্ঞেস করলেন, কে? কে?

সান্ত্বনা বলল, সেই দাড়িওয়ালা লোকটা!

সান্ত্বনার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, চামচ দিয়েও তার মুখ ফাঁক করা যায় না। পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে মত প্রকাশ করল, সান্ত্বনাকে ভূতে ভর করেছে।

সেই নিয়ে অনেক কাণ্ড চলল। চিররঞ্জন ভূত প্রেত বিশ্বাস করেন না। তিনি ঠিক করে ফেললেন, মেয়েকে বাঁচাতে হলে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে। তা ছাড়া, এখানে আর সংসার চলছে না। কলকাতায় তবু একটা আশ্রয় আছে। আবার বাক্সবিছানা বাঁধাছাদা শুরু হয়ে গেল।

৪৮. মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের গেট

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের গেট থেকে বড়বাবু আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছেন। আজও সূর্যর সঙ্গে দেখা হল না।

বড়বাবুর দৃষ্টি কোনও দিকে নেই, মুখ নিচু করা। হাতের চুরুটটা অনেকক্ষণ নিভে গেছে, ধরাবার কথা মনে নেই। কিছু দূরে সাইকেল রিকশা স্ট্যান্ডের কাছে আসতেই তিন-চারটে রিকশা এগিয়ে এল তার দিকে। সবাই তাঁকে নিতে চায়। বড়বাবু একটাতে চড়ে বসলেন, কোথায় যাবেন তা বলতে হল না–রিকশা ছুটতে লাগল। এই কয়েক মাসেই বড়বাবু এই শহরে বেশ পরিচিত হয়ে গেছেন। অনেকেই তার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক।

রিকশা এসে থামল একটা সাদা রঙের নতুন একতলা বাড়ির সামনে। এ শহরে ভালো হোটেল নেই বলে বড়বাবু এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। বাড়িটার পেছনেই একটা মস্ত বড় দিঘি, দিঘিতে এক ঝাঁক হাঁস।

একজন মাঝ বয়সি লোক বড়বাবুর জন্য রান্নাবান্না করে। সে এসে বলল, বাবু, বেলা। তো অনেক হয়ে গেল, খাবেন না।

বড়বাবু শুকনো গলায় বললেন, দাও!

দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

বড়বাবু দু' দিকে মাথা নাড়লেন।

দাদাবাবুর খাবার নিয়ে যেতে দেবে?

না।

মেঝেতে আসন পেতে জল ছিটিয়ে বড়বাবুর খাবার জায়গা করে দেওয়া হল। লোকটি রান্নায় একেবারেই পারদর্শী নয়। শুকনো কড়কড়ে ভাত, ছাকরা ছাকরা খেসারির ডাল, কালো রঙের কী একটা তরকারি আর মাছ।

বড়বাবু খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে একটিও মন্তব্য করলেন না। সামান্য কিছু মুখে দিলেন। লোকটি সর্বক্ষণ কাছাকাছি বসে থেকে নানা রকম মন্তব্য করে গেল, বড়বাবু উত্তর দিচ্ছিলেন একটি বা দুটি শব্দে।

খাওয়া শেষ হতেই লোকটি বড়বাবুর সামনে পান এগিয়ে দিল। বড়বাবু পান মুখে দিয়ে বললেন, তুমি এবার যাও, আমার আর কিছু লাগবে না।

লোকটি বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি হাওয়া করি। বড্ড গরম আজ।

বড়বাবু বললেন, তার দরকার নেই। আমি শোব না।

একটা নতুন চৌকির ওপর বিছানা পাতা হয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র অতি সামান্য, কিন্তু সবকিছুই নতুন বলে বেশ একটা পরিচ্ছন্নতার ভাব আছে। গত তিন-চার মাস ধরে বড়বাবু প্রায়ই এসে এখানে থাকছেন।

এর মধ্যে মাত্র দু'বার সূর্যর সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। সরকারের কাছ থেকে আর অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। বড়বাবু তবু প্রতি সপ্তাহে এসে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এখানকার জেলার সুরথ চক্রবর্তীর কাকার এক বন্ধুকে তিনি এলাহাবাদে থাকার সময় চিনতেন। অনেক খুঁজে খুঁজে সেই সূত্র বার করে তিনি জেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। লোকটি খুব মুখ-মিষ্টি এবং ধুরন্ধর। সাধারণ সময়ে তিনি এইসব লোককে কথা বলার যোগ্য বলেও মনে করেন না। অথচ এখন খাতির করে কথা বলতে হচ্ছে। জেলার সুরথ চক্রবর্তী বড়বাবুকে নিরাশ করছে না কিছুতেই, সব সময়ই জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বেইলির নামে দোষ চাপাচ্ছে। বড়বাবু বেইলি সাহেবের সঙ্গেই দেখা করতে চান কিন্তু জেলার কিছুতেই সে ব্যবস্থা করবে না।

জেলার সুরথ চক্রবর্তী অত্যন্ত অর্থলোলুপ। কয়েদিদের বরাদ্দ থেকে বেশ মোটা। অংশ তার নিজের বাড়িতে আসে। বড়বাবু তার সঙ্গে একটা চেনাশুনো সম্পর্ক ধরে। এলেও সে

আকারে ইঙ্গিতে টাকাপয়সা খরচের প্রসঙ্গ তুলছে প্রথম দিন থেকেই। বড়বাবু জলের মতন টাকা খরচ করে যাচ্ছেন।

বড়বাবু জেলারের কোয়ার্টারেই দেখা করতে গিয়েছিলেন। লোকটি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। নিয়ে থাকে, বাগান করার শখ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দিদের সম্পর্কে সামান্যতম। সমবেদনা নেই। বড়বাবুর সামনেই তার ছেলের নামে গালমন্দ করে। এবং মাঝে মাঝে এমন ভাবে তাকায় যেন অধঃপতিত সন্তানের পিতা হিসেবে বড়বাবুও সমান অপরাধী।

এই কয়েক মাসেই বড়বাবু বুঝে গেছেন যে জেলখানায় কী রকম টাকার খেলা চলে। সুরথ চক্রবর্তীকে পুরো বিশ্বাস করতে পারেন না বলে আর একজন ওয়ার্ডারকেও তিনি নিয়মিত টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, যাতে সূর্যর জন্য একটু ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেসব কিছু সূর্যর কাছে পৌঁছেছে কিনা তা জানার কোনও উপায় নেই। মানুষের মধ্যে এমন চতুর শ্রেণির মানুষও তো আছে, যারা ঘুষও নেয় আবার কাজও করে না। চোরডাকাতের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে এদের অনেকেরই হৃদয় বলে কোনও পদার্থ নেই।

বড়বাবু জানলার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে চুরুট ধরালেন। দিঘির হাঁসগুলো জলের ওপর সরল রেখা টেনে টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও এক দিকে তিনটি, আর এক দিকে তিনটি, আবার কখনও এক দিকে পাঁচটা আর একটা অন্য দিকে একলা একলা– এই রকম নানা ডিজাইন তৈরি করে তারা দুপুর কাটায়। হাঁসের গলায় বেশ জোর আছে, কিন্তু সহজে ডাকে না। চারদিক অসম্ভব নিস্তব্ধ।

যে-লোকটি রান্না করে, সে দুটি ডেকচি হাতে নিয়ে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বোঝা যায়, ডেকচিদুটি বেশ ভারী। বড়বাবু তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলেন–লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি না হয়ে যায়। লোকটি এমনিতে ভালো, কিন্তু রোজই কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য চুরি করে। হয়তো ওর সংসারে খুব অভাব, এ ছাড়া আর কী-ই বা করবে। চতুর্দিকে

অন্নের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে। এই যুদ্ধ দেশটাকে একেবারে ছারখার করে দিয়ে যাবে।

বালিশের তলা থেকে বড়বাবু একটা মোটা খাতা টেনে বার করলেন। ওলটাতে লাগলেন কয়েকটি পাতা। তার নিজের হাতের লেখা কিছু কিছু রয়েছে। খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে তিনি একটা নতুন পাতায় লিখতে শুরু করলেন।

.

৭ই জুন, ১৯৪৩

আজও ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। সূর্য আমার সহিত দেখা করিতে চাহে না। মাসের পর মাস চেষ্টা করিতেছি তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য। জেলখানায় অসংখ্য নিয়মের গ্রন্থি শিথিল করিয়া আনিয়াছিলাম প্রায়। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটনার পরিবর্তন হইল। এখন জেল কর্তৃপক্ষই সাগ্রহে আমার সহিত আমার পুত্রের সাক্ষাৎকার করাইয়া দিতে চাহে। কিন্তু সূর্য তাহাতে রাজি নয়।

না, এ জন্য সূর্যকে দোষ দিতে পারি না। দোষ দিতে হইলে আমাকেই দিতে হয়। আমার এই দৌর্বল্যে কাহারও গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। যুক্তিতর্ক সবই জানি। তবু নিজের অন্তরকে বুঝ মানাইতে পারিতেছি না।

সূর্যর জেদ বড় বেশি। সে কাহারও কথা শুনিবে না। আমার অনুরোধেও সে কর্ণপাত করিবে না–এ কথাও আমি ভালোই জানি। জেলার সুরথ চক্রবর্তীর ধারণা আমি আমার ছেলেকে ফিরাইতে পারিব। আমিই বা কেন তাহাতে নাচিয়া উঠিতেছি?

উপবাসী পুত্রের মুখোনি বার বার আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। কতই বা তাহার বয়স, এই কি উপবাসে থাকিবার সময়?

আজ লইয়া নয় দিন হইল, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে সাতান্ন জন বন্দি অনশন করিয়া আছে। সূর্যও তাহাদের মধ্যে একজন। অপর সকলে অনশন না ভাঙিলে সূর্য একলা ভাঙিতে পারে না-তাহা সঙ্গতও নয়। এ অন্যায় অনুরোধ আমি তাহাকে করিবই বা কী রূপে? আমি এই সুযোগে তাহার সঙ্গে শুধু একবার দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম। অনশন ভাঙিবার অনুরোধ করিতাম না, নিজের চক্ষে দেখিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝিতাম। নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে। অধিকাংশ লোকই বড় নীচ শ্রেণির। নিজের চোখে না দেখিলে কিছুই বিশ্বাস নাই।

সূর্য নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। সেই কারণেই আমার সহিত দেখা করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেছে না। সে ভাবিতেছে আমি তাহাকে অন্যায় অনুরোধ করি। সে তাহার দলের লোকদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হইবে।

যে যাহাই বলুক, বাপ হইয়া আমি ছেলের এই অনশনের ব্যাপার কী করিয়া সমর্থন করিতে পারি? নয় দিন সে না খাইয়া আছে। একেই তো জেলখানায় পশুর খাদ্য দেয়। তাহার পর, দিনের পর দিন উপবাসে থাকিলে শরীর যে ভাঙিবে-সে ভাঙা কি আর কোনও দিন জোড়া লাগে? বিপ্লবীরাও মহাত্মা গান্ধীর অনুসৃত পথে অনশনকে একটি অস্ত্র করিতে চায়। লাহোরে যেবার রাজবন্দিরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনশন করিয়াছিল- সেবার সারা দেশে কী বিপুল উত্তেজনা। কার্য উপলক্ষে আমাকেও তখন লাহোরে যাইতে হইয়াছিল। তেষট্টি দিন অনশনের পর যতীন দাস প্রাণত্যাগ করিল, তবু পণত্যাগ করিল না। কলিকাতার যুবক যতীন দাস প্রাণ হারাইল লাহোরে-আমি তাহার মৃতদেহ এক ঝলকের জন্য দেখিয়া ছিলাম। মানুষ বলিয়া চেনাই যায় না। বার বার সেই দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে আর সূর্যর কথা ভাবিয়া বুক কাঁপিতেছে। যতীন দাসের পিতামাতার মনের অবস্থা কী রূপ হইয়াছিল-তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে কি? মহাত্মা গান্ধীকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি-এই অনশনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য। কাগজে এখনও তাহার কোনও বিবৃতি দেখি নাই। গতকল্য ছোটলাটকেও একটি টেলিগ্রাম পাঠাইলাম।

কী করিয়া উহারা দিনের-পর-দিন না খাইয়া থাকিতে পারে? এত মনের জোর কোথা হইতে আসে? সূর্যর অনশনের সংবাদ পাইয়া আমিও খাওয়াদাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। দুই দিন পরই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সব সময় বমি বমি ভাব, পায়ে জোর পাই না। আর দুই-চারি দিন এই ভাবে থাকিলে আমি আর বাঁচিতাম না। আমি এখন মরিলে সূর্যর কী হইবে তাহা জানিয়া যাইতে পারিব না।

কংগ্রেসি সত্যাগ্রহী ছাড়া আর কাহাকেও রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা দেয় নাই। সূর্য এবং তাহার মতন অনেককে আন্ডার ট্রায়াল সি ক্লাস প্রিজনার করিয়া রাখিয়াছে। দস্যু, প্রতারক ও নারী নির্যাতনকারীদের সমপর্যায়ভূক্ত। টুকরা টুকরা যাহা খবর শুনিতে পাই-তাহাতেই বুঝিতে পারি যে অকথ্য অত্যাচার হয় উহাদের উপর। খাওয়ার জন্য সরকারের যাহা সামান্য বরাদ্দ আছে, তাহার সিকিভাগও উহাদের ভাগ্যে জোটে না। রাত্রি বারোটার সময় ঘরের বাহিরে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিতে হয়-সেই সময় একবার সংখ্যা গণনা হয়। ইহার মধ্যেই দুই বার জেলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অজুহাতে লাঠি চার্জ করিয়া কয়েদিদের উত্তম মধ্যম দিয়াছে। কয়েক জনের নাকি হাত-পা ভাঙিয়াছে। তদন্ত কমিশন বসিবে তো শুনিতেছি। বেয়াল্লিশের দাঙ্গায় সরকারের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে-তাই ইহাদের প্রতি সরকার কোনও দয়ামায়া দেখাইতে রাজি নয়। বাধ্য হইয়াই উহারা অনশনে নামিয়াছে।

কিন্তু কে যে ইহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবে, তাহাও তো বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কংগ্রেস ইহাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং প্রকাশ্যে ইহাদের সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। বাংলায় এখন মুসলিম লিগ সরকার- তাহাদের কোনও মাথাব্যথা নাই স্বদেশি যুবকদের জন্য। অনশন ভঙ্গ করাইবার জন্য জোর জুলুমের আশ্রয় লইতেছে। মাটিতে শোওয়াইয়া জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখে খাদ্যদ্রব্য ঢুকাইতে চায়। নাকের মধ্যে নল ভরিয়া দেয়। জলের কলসেও জল না রাখিয়া ঘোল কিংবা দুধ রাখিয়া দেয়-নিদারুণ জল তৃষ্ণা পাইলেও অনশনকারীরা জল পান করিতে পারে না। নিজেরাই সব কলস ভাঙিয়া ফেলিতেছে-এসব ভাবিতে গেলেও বুক কাপে।

বিচার কবে শেষ হইবে, তাহাও জানি না। হাজার বন্দিতে কারাকক্ষগুলি ভরতি- ইহাদের বিচার পর্ব নমো নমো করিয়া শেষ করিতেও দীর্ঘ দিন লাগিয়া যাইবে। আবার শুনিতেছি, ইহাদের অন্য কোনও জেলে স্থানান্তরিত করিবে। সেই স্থানটি যে কোথায় সে সংবাদ এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সূর্যকে যে-দিন আদালতে আনে, সে-দিন একটি অদ্ভুত কথা শুনিয়া ছিলাম। দলীয় কার্যের সময় ইহাদের প্রত্যেকেরই কয়েকটি ছদ্মনাম থাকে। সূর্যর নাম বলিয়াছিল, সূর্যকুমার ভাদুড়ী অ্যালিয়াস অমর অ্যালিয়াস কুইক সিলভার। যখন ঘোষিত হইল যে উহার বাবার নামও অমর, তখন আদালতে একদল লোক উচ্চহাস্য করিয়াছিল। বাবার নামটিই ছেলে নিজের ছদ্মনাম লইয়াছে। আমিও একটু অবাক হইয়া ছিলাম। ছেলের মনের গতি যে কোন দিকে, তাহা বুঝিতে পারি না। অবশ্য বিলাতে অনেক সময় পিতা ও পুত্রের একই নাম হয়-সিনিয়র জুনিয়র হিসাবে পরিচিত থাকে।

জেলার সুরথ চক্রবর্তীর কোন কথাটা সত্য, কোন কথাটা মিথ্যা-তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। সূর্য সম্পর্কে সে আমাকে প্রায়ই অকথা কুকথা শুনায়। সূর্যকে সে ক্রিমিনাল মাইন্ডেড প্রতিপন্ন না করিয়া ছাড়িবে না। সূর্য নাকি কাহারও সহিত কখনও ভালো ভাবে কথা বলে না। ইহার মধ্যেই তাহাকে তিনবার ডান্ডা বেড়ি পরাইয়া সেলে রাখিয়াছে। সেল কাহাকে বলে, জানি না। সুরথ চক্রবর্তীর একটি দশ-এগারো বছরের পুত্র আছে, ভারী সুন্দর চেহারা। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সুরথ চক্রবর্তী তাহার ছেলেকে আদর করিতে করিতেই আমার সম্মুখে সূর্যর নামে গালাগালি করে। সে নিজে পিতা হইয়া অপর একজন পিতার হৃদয়ে আঘাত দিতে দ্বিধা করে না। মানুষ কত প্রকার হয়! সে এক বারও ভাবে না যে সূর্য অনেক আরামে বিলাসবহুল জীবন যাপন করিতে পারিত-এত কষ্ট যে সে স্বীকার করিতেছে, প্রাণের মায়াও তুচ্ছ করিয়াছে তাহা শুধু এই দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য। যে-দেশ আমার এবং সুরথ চক্রবর্তীরও। এক এক বার মনে হয়, গত বছরের হাঙ্গামায় আমিও কেন নিজে জড়াইয়া পড়িলাম না! তাহা হইলে হয়তো জেলখানায় সূর্যর সহিত একসঙ্গে থাকিতে পারিতাম। সে যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা কি আমারও প্রাপ্য ছিল না?

মধ্যে কিছুদিন এক সি আই ডি'র পাল্লায় পড়িয়া ছিলাম। সে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া ছাড়িয়াছিল। সূর্যর সহচরবৃন্দ এবং দলের লোকদের সম্পর্কে খবরাখবর জানাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। আমি তো সত্যই কিছু জানি না। বলিব কী করিয়া। সূর্য সম্পর্কে কোনও প্রকার কলঙ্ক দিতেই সে বাকি রাখে নাই। দেশ সেবার জন্য নয়, দুশ্চরিত্রতা এবং গুন্ডামির প্রবৃত্তিবশেই নাকি সূর্য এইসব কার্য করিয়াছে। সি আই ডি-টি বলিল, সূর্য নাকি। কোন গ্রামের এক চাষির কন্যাকে এবং পরে একজন সহকর্মীর স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে এবং ডাকাতির টাকায় ফুর্তি করিয়াছে। এইরূপ জঘন্য মিথ্যাও মানুষের মুখে আসে। এই বৃদ্ধ বয়সেও শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া ওঠে ইচ্ছা হয় লোকটির মাথা দেওয়ালে ঠুকিয়া ভাঙিয়া দিই।

আমি বেশি দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। এত দুর্বলতায় কোনও দিকেই লাভ নাই। আমার তো একার ছেলে নয়-আরও কত বাপ-মায়ের স্নেহের দুলাল জেল খাঁটিতেছে, ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়াছে। আমি এতটা উতলা হইব কেন? কিংবা অন্য পিতা-মাতাদের মনের অবস্থাও এরূপ হয়? একটা বয়স আসিলে সন্তানের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন একটু একটু আলগা করিয়া দিতে হয়। নহিলে দুঃখের বোঝা বাড়ে। সন্তান দূরে চলিয়া যাইবেই। সূর্য সম্পর্কে আমার যে এতখানি মায়ার বন্ধন ছিল-নিজেও কখনও জানিতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে বোর্ডিংয়ে রাখিয়াছি, নিজে আপন খেয়ালে ঘুরিয়াছি। সূর্যর জন্য ব্যারিস্টার নিয়োগ করিয়াই যদি কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম! কিন্তু রাত্তিরে ঘুমাইতে পারি না। বার বার মনে পড়ে, সারা পৃথিবীতে সূর্য ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আমার কেহ নাই! নিজের পিতাকে দেখি নাই, মাতাকে জন্মের দিনে হারাইয়াছি, পত্নীদ্বয় অকালে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, বড় মা-ও নাই, একে একে সকলে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আর যে কয়দিন বাঁচিব, কাহাকে লইয়া বাঁচিব? আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে সূর্যরও আর কেহই প্রকৃত আপনজন নাই। কিন্তু তাহার বয়স অল্প, যদি জেলখানা হইতে বাহির হইতে পারে সে একা হইয়াও রক্তের তেজে বাঁচিতে পারে। কিন্তু আমি? সি আই ডি-টি আভাস

দিয়াছিল, সূর্যর ফাঁসির দণ্ড হওয়াই অবধারিত-যদি তা নাও হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইবেই। এ-জীবনে সে কিছুই পাইল না।

সূর্য এত জেদি হইল কী করিয়া? আমার চরিত্র তো সে পায় নাই। যুবা বয়সে আমিও কম জেদি ছিলাম না কিন্তু লোকজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার ক্ষমতা আমার ছিল। ব্যবসায়ের সূত্রে নানা লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে-অনেক ক্ষেত্রে আমাকে বাধ্য হইয়া মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। না, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে সূর্যর মায়ের সঙ্গেই তাহার একটা অন্তর্নিহিত মিল আছে। বুলবুল বাহিরে হাসিখুশি ও ছেলেমানুষিতে ভরা থাকিলেও কী অসম্ভব ছিল যে তাহার জেদ-তাহা আমিই শুধু জানি। তাহার ক্রোধ কিংবা অভিমান এত তীব্র ছিল যে বাহিরের কাহাকেও সে বুঝিতে দিত না। আমার উপর কতখানি অভিমান তাহার জন্মাইয়াছিল যে তাহার পরেও সে পূর্ণিমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলিয়াছে এবং বিষ খাইয়া মরিয়াছে। বুলবুল, বুলবুল, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিতে না? নারীচরিত্র আমি বুঝি না, আমি তোমাকেও বুঝিতে পারি নাই। সেই অপরাধে আমাকে এত গুরুতর শাস্তি দান করিলে?

মনে হইতেছে যেন বুলবুল আমার চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতগুলি বছর কাটিয়া গেল, তবু তাহার মুখচ্ছবি এতটুকু মলিন হয় নাই। স্মৃতিপটে সে চিরযুবতী থাকিয়া যাইবে।

বুলবুলের সহিত আমার সম্পর্কের কথা এখন আর বিশেষ কেহ জানে না। জানিলেও কেহ সে-প্রসঙ্গ তোলে না। লোকচক্ষে উহা শুধু আমার জীবনের একটি কলঙ্কজনক। অধ্যায়। আমি কখনও সেরূপ মনে করি নাই। বুলবুলকে ভালো বাসিয়াছিলাম বলিয়া আমি কখনও অনুতাপ করিব না। নিজের স্ত্রীকে সাময়িক কষ্ট দিয়াছি বটে কিন্তু বুলবুলকে ভালো না বাসিয়া আমার উপায় ছিল না। এক এক জন মানুষের জীবনে ধ্রুবতারার মতন একটি নারী আসে। বুলবুল আমার সেই ধ্রুবতারা। বুলবুলকে বলিয়াছিলাম, তোমার হাতের মুঠোয় আমার ভবিষ্যৎ তুলিয়া লও। শুধু রূপমুগ্ধ হইয়া এই কথা বলি নাই-সে আমার হৃদয়সর্বস্ব ছিল। তবু আমার পথ ভুল হইল। বুলবুল, তুমি আমাকে আর একবার সুযোগ

দিলে না কেন? নিজে মরিয়া এ কী নির্মম প্রতিশোধ লইলে? সারা জীবন আমি অপরাধী হইয়া রহিলাম। তোমার সন্তান-আমি তাহার জন্য কিছুই করি নাই। জানি না স্বর্গ কিংবা বেহেস্ত বলিয়া কিছু আছে কিনা-তুমি কি সেথা

হইতে সব দেখিতেছ?

বড়বাবুর হাত থেকে কলম পড়ে গেল। তিনি খাতা বন্ধ করে গুম হয়ে বসে রইলেন।

বড়বাবুর সঙ্গে সূর্যর আর একবার দেখা হল রেল স্টেশনে। সাত জন কয়েদিকে এই জেল থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে বড়বাবু আগে থেকেই রেল স্টেশনে এসে বসেছিলেন।

মাত্র সাত জন কয়েদিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রায় দু'ডজন সেপাই ঘিরে আছে। কয়েদিদের প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি বাঁধা। এদের দেখবার জন্য। স্টেশন কয়েক মুহূর্তেই মানুষের ভিড়ে ছয়লাপ হয়ে গেল। সেপাইরা হঠ যাও হঠ যাও বলে চাঁচালেও লোকে কাছাকাছি গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে, ওদের নানা রকম প্রশ্ন করছে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছে, দাদা আপনাদের নাম কী? জয়প্রকাশ নারায়ণ কি সত্যিই ধরা পড়েছেন? জেলে আপনাদের কী খেতে দেয়? কেউ কেউ আর একটু দুঃসাহসী হয়ে বলছে, দাদা, আপনাদের কারওর বাড়িতে কোনও খবর দেওয়ার থাকলে চেঁচিয়ে বলে। দিন। আমরা খবর পৌঁছে দেব।

অত ভিড় ঠেলে বড়বাবু কাছে যেতে পারবেন না। তিনি অন্য একটি উপায় বার করলেন। কয়েদিদের যখন ওভারব্রিজে ভোলা হল, বড়বাবু দ্রুত লাইনের ওপর দিয়ে

অন্যদিকে গিয়ে ওভার ব্রিজের উলটো দিক থেকে আসতে লাগলেন।

ওই সাতজনের মধ্যে একজন ছাড়া নাকি সবারই বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে। বাকি লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কেউ কোনও কথা বলছে না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল রুক্ষ, চোখ জ্বলজ্বলে। এদের মধ্যে দু'জনের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

সূর্যর ঠিক মুখোমুখি এসে বড়বাবু কোনও কথা বলতে পারলেন না। শব্দ আটকে গেল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

সূর্য মুখ তুলে বাবাকে দেখে শান্ত ভাবে বলল, বাবা, আমি ভালো আছি। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না।

বড়বাবু ভালো করে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, তুই, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

সে কথা আমাদের বলেনি।

তোর হাত...ব্যান্ডেজ...কী হয়েছে?

বিশেষ কিছু না। সামান্য মচকে গেছে-দু-এক দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

সেপাইরা পেছন থেকে গুঁতো দিচ্ছে। সূর্য আবার চলতে লাগল। বড়বাবুও তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তোরা কোনও কিছু স্বীকার করবি না-আমি আরও বড় ব্যারিস্টার লাগাব-

সূর্য মুখ নিচু করে জানাল, আপনি ও-সব কথা নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না।

একজন আই বি'র লোক বড়বাবুর পাশে এসে বলল, এদের সঙ্গে কথা বলা তো বেআইনি। আপনি কি এদের কারওর আত্মীয় হন।

আমি এর বাবা।

তা হলে প্রপার চ্যানেলে অ্যাপ্লাই করুন ইন্টারভিউর জন্য।

বড়বাবু রেগে গিয়ে বললেন, আমাকে আর প্রপার চ্যানেল দেখাবেন না মশাই। ও আমার ঢের জানা আছে।

এখন এখান থেকে সরে যান!

ওভার ব্রিজ দিয়ে হাঁটাও কি বেআইনি?

কথা না বলে বড়বাবু সূর্যর সঙ্গে এলেন কিছু দূরে। হঠাৎ তার দারুণ ইচ্ছে হল ছেলের শরীরটা একবার ছুঁতে। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতেও হাতকড়ি পরিয়েছে-এদের শরীরে কি দয়ামায়া বলে কিছুই নেই।

সূর্য নিজে থেকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না, কারওর খোঁজখবরও জানতে চাইল না। মাঝে মাঝে সে শুধু বাবার চোখের দিকে তাকাচ্ছে। বড়বাবু আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না হাত বাড়িয়ে দিলেন সূর্যকে একবার ছোবার জন্য।

আই বি'র লোকটি এক ঝটকায় বড়বাবুর হাত সরিয়ে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, কী হচ্ছে কী? এ রকম অপমানজনক পরিস্থিতি বড়বাবুর জীবনে কখনও আসেনি। তিনি অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেইখান থেকেই যতক্ষণ দেখা যায়, দেখতে লাগলেন সূর্যকে।

৪৯. চিররঞ্জন শিয়ালদা স্টেশনে এসে

চিররঞ্জন শিয়ালদা স্টেশনে এসে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। আসবার আগে তাঁর দাদা প্রিয়রঞ্জন এবং বড়বাবুকে চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন তাঁর কলকাতায় আসার কথা। তিনি আশা করেছিলেন কলকাতায় কারোকে দেখতে পাবেন। কিন্তু চিররঞ্জন তার স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতায় দুজনের কারওর কাছেই উল্লেখ করেননি যে ঠিক কার বাড়িতে উঠবেন। এর আগে বড়বাবুর কাছে থাকলেও প্রিয়রঞ্জন নিজের বাড়িতে চলে আসবার জন্য ভাইকে অনেক বার বলেছিলেন। চিররঞ্জন মনস্থির করতে পারেন না। বড়বাবুর সঙ্গেই তার মনের মিল-আবার নিজের দাদার ইচ্ছে-অনিচ্ছেও অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

শিয়ালদা স্টেশনে নিজের ছোট্ট পরিবারটি নিয়ে চিররঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এই পরিবারের অধিপতি, কিন্তু এর ভার বহন করার মতন যোগ্যতা তিনি সারা জীবনে অর্জন করতে পারলেন না। সঙ্গে অসুস্থ মেয়ে, মুখভার করা স্ত্রী এবং ছটফটে কিশোর পুত্র এদের জন্য এই পৃথিবীতে একটি যোগ্য স্থান সংগ্রহ করার দায়িত্ব চিররঞ্জনেরই। তিনি অনুভূতিহীন মানুষ নন, এই দায়িত্বের কথা বোঝেন বেশ ভালো ভাবেই-এবং নিজের। অসামর্থ্যের জন্য দুঃখ তারই বেশি।

শিয়ালদা স্টেশনে তিনি নির্দিষ্ট করে কারোকে আসতে লেখেননি, অথচ কেউ আসেনি বলে তিনি দুঃখিত! এই ধরনের মানুষেরা সারা জীবন দুঃখ পেয়ে যায়।

যদিও দাদার বাড়িই স্টেশন থেকে বেশি কাছে, তবু চিররঞ্জন একটা থার্ড ক্লাস ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া নিয়ে চললেন বিবেকানন্দ রোডের দিকে। হিমানীর মুখখানা থমথমে। কলকাতায় আসার একটুও ইচ্ছে ছিল না তার। তিনি বার বার চেয়েছিলেন বাপেরবাড়ি চলে যেতে-চিররঞ্জনের যদি সেখানে থাকতে ইচ্ছে না হয়, তা হলে তিনি একা কলকাতায় আসতে পারতেন! চিররঞ্জন এ-প্রস্তাবে রাজি হননি, মেয়েকে তিনি আর গ্রামে ফেলে রাখতে চান না-মেয়ের চিকিৎসা কলকাতাতেই হওয়া দরকার।

ঘোড়ারগাড়ির জানলা দিয়ে বাদল উৎসুক ভাবে কলকাতা শহর দেখছে। প্রথম যেবার সে কলকাতায় এসেছিল, তখন সে খুবই ছোট-সে কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে না। এবারের কলকাতাকে সে দু চোখ দিয়ে যেন গিলছে। কত চেনা আর কত আপন মনে হয়, এই শহর ছেড়ে সে কত দূরে চলে গিয়েছিল, ভেবেছিল আর বুঝি কোনও দিন ফেরাই হবে না এখানে। রাস্তার পাশে যত দোকানের সাইনবোর্ড সে পড়তে পড়তে যাচ্ছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সাইনবোর্ডগুলোর দিকে তাকালে অক্ষরগুলো পড়তেই হয়। তাকাচ্ছি অথচ পড়ছি না-এ কিছুতেই হবে না। ট্রামের ঠন ঠন আওয়াজ, রিকশার ঠুং ঠাং, ঘোড়ারগাড়ির কপ কপ, সাইকেলের ক্রিং ক্রিং, বাসের পক পক, ফেরিওয়ালার লে লে বাবু ছ আনা, এইসব মিলিয়েই কলকাতা।

বড়বাবুর বাড়ির সামনে গাড়ি থামবার পর ওরা সবাই হকচকিয়ে গেল। বাড়িটা আর চেনাই যায় না। বসবার ঘরের দেওয়াল ভেঙে সেখান থেকে আর একটা দরজা বার করা। হয়েছে-সেখানে সিভিল সাপ্লাই অফিসের নানা লোক কাজে ব্যস্ত। ভাড়ারঘর, রান্নাঘরেও অফিস, উঠোনটা টিন দিয়ে ঢাকা, সেখানে অনেক মালপত্র উঁই করে রাখা। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে আর একটা নতুন লোহার দরজা বসেছে, সেটাতে মস্ত বড় তালা লাগানো।

সিভিল সাপ্লাই অফিসের লোকরা ওদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। জিজ্ঞেস করলেও কেউ কিছু বলতে পারে না। একটু বাদে একজন পুরনো চাকরের সন্ধান পাওয়া গেল, সে জানাল যে বড়বাবু কলকাতায় নেই। তিনি প্রায়ই আজকাল থাকেন না। সিঁড়ির দরজার তালার চাবি তার কাছে নেই, তবে পাশের বাড়িটাও খালি পড়ে আছে, সে বাড়িতে সে বাবুদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

চিররঞ্জন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বড়বাবু কবে আন্দাজ ফিরতে পারেন?

এ-সম্পর্কেও চাকরটি কিছু জানে না। দু'দিন বাদেও ফিরতে পারেন, দশ দিন বাদেও ফিরতে পারেন। আজকাল এই রকমই চলছে।

এ রকম অনির্দিষ্ট অবস্থায় এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। মালপত্র দু'চারটে যা নেমেছিল, আবার সেগুলো তুলে ঘোড়ারগাড়ি চলল তালতলায়। মালপত্র সমেত কোনও বাড়িতে এসে আবার সেখান থেকে ফিরে যাবার মধ্যে একটা দীনতা আছে। ওদের চোখে-মুখে এখন সেই দীনতার চিহ্ন-যা ট্রেন জার্নির ধকল ছাপিয়েও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রিয়রঞ্জনের বাড়িতে এসে দেখা গেল, ওদের জন্য সেদিনকার রান্না পর্যন্ত হয়ে আছে। শিয়ালদা থেকে ওরা সোজা এ বাড়িতেই চলে আসবে-এইটাই তো স্বাভাবিক। চিররঞ্জন যে আগে বড়বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেটা আর উল্লেখ করলেন না।

প্রিয়রঞ্জনের বাড়ি একেবারে জমজমাট। যুদ্ধের বাজারে তার ব্যবসা একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কাগজের অনটনের ফলে লোকে এখন বালিকাগজ ব্যবহার করে। ইস্কুল কলেজে ছেলেমেয়েরা এখন পেনসিলে লেখা কাগজে আবার কলম দিয়ে লেখে। আলপিন পর্যন্ত বাজার থেকে উধাও, তার বদলে বাবলা কাটা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে অফিসে অফিসে। প্রিয়রঞ্জনের ব্যবসায় কর্মচারী বেড়েছে, মৌলালিতে একটা বিরাট গুদাম নিয়েছেন, নিজের বাড়িতেই একটা অফিস খুলেছেন। প্রিয়রঞ্জন আর দোকানে যান না, বাড়িতেই বসেন, টেলিফোন এনেছেন, কর্মচারীরা অনবরত আসছে যাচ্ছে।

প্রিয়রঞ্জন ভাইকে সস্নেহ ধমক দিয়ে বললেন, এতদিন গ্রামে পড়েছিলি কেন? যুদ্ধের বাজারে কত দিকে কত কাজ–এ-সময়ে গ্রামে বসে থেকে কি হাড়ে দুর্বোর চাষ করছিলি? আজ থেকেই আমার অফিসে বসে যা। নিজের লোক থাকতেও আমাকে মাইনে করা লোকের ওপর ভরসা করতে হয়। বিশ্বাসী তোক পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?

প্রিয়রঞ্জনের মেয়ে- জামাই এসেছে খড়গপুর থেকে। সেই জন্য বাড়ির ওপরতলায় সব সময় একটা খুশির আবহাওয়া। কলের গান বাজিয়ে সিরাজদ্দৌল্লা পালা শোনা হচ্ছিল, বাদলদের আসবার খবর শুনে সবাই হইচই করে নেমে এল।

বিয়ের পর বাদল শ্রীলেখাকে এই প্রথম দেখল। একটু যেন বদলে গেছে শ্রীলেখা। আগের তুলনায় তাকে রোগা আর লম্বা দেখায়, সিঁথিতে মোটা করে আঁকা সিঁদুর। আরও কিছু একটা পরিবর্তন ছিল তার শরীরে, বাদল লক্ষ করেনি। শ্রীলেখা নিচু হয়ে প্রণাম করল চিররঞ্জন আর হিমানীকে হিমানী তার থুতনি ধরে বললেন, ওমা, তোর বাচ্চা হবে–একটা খবরও দিসনি? ক' মাস?

শ্রীলেখা সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল এই, তোর কী হয়েছে? মুখখানা এত শুকনো কেন?

সান্ত্বনা খুব পরিষ্কার গলায় বলল, আমি পাগল হয়ে গেছি!

তাই শুনে শ্রীলেখার ছোট দুই বোন মান্তি আর পান্তি হেসে গড়িয়ে পড়ল। শ্রীলেখা হাসতে পারল না। তার মুখে শঙ্কার ছায়া। সে হিমানীকে জিজ্ঞেস করল, কাকিমা, ওর

কী হয়েছে? খুকু ও রকম করছে কেন?

হিমানী ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বললেন, কিছু হয়নি। ও মেয়ের ওই রকম খেয়াল। জানিস তো কী রকম খেয়ালি।

শ্রীলেখা সান্ত্বনাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। খাটে বসিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে করতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল দরজার কাছে বাদল দাঁড়িয়ে আছে। হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট আর কেডসের জুতো পরা, হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠছে বলে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটু বিচিত্র।

শ্রীলেখা বলল, এই বাদলা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়!

বাদল বলল, বড়দি, তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটাও কথা বলোনি?

শ্রীলেখা অবাক হয়েও হেসে ফেলল! তারপর বলল, ওমা, সেই জন্য আবার ছেলের রাগ হয়েছে বুঝি! তুই কেন আমার সঙ্গে আগে কথা বলিসনি? আমাকে প্রণাম করেছিস?

বাদল কাছে আসতেই শ্রীলেখা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ইস, কত দিন তোদের দেখিনি রে!

প্রভাসকুমার এলেন একটু পরে। এমনিতেই তিনি স্বল্পভাষী, তা ছাড়া এ বাড়ির কারওর সঙ্গে তার কথা বলার মতন বিষয় বেশি নেই, তাই তিনি লাজুক মানুষের মতন চুপ করেই থাকেন আর সব সময় মুচকি মুচকি হাসেন। বাচ্চাদের সঙ্গেও তিনি সহজ ভাবে মিশতে পারেন না।

জামাইবাবু সম্পর্কে বাদলের একটু একটু ভয়ের ভাব ছিল। দু-তিন দিন কাটবার পর সে বুঝল, ভয় পাবার মতন কিছু নয়। ডবল এম এ পাশ লোকেরাও সাধারণ মানুষের মতন কথা বলে এবং গরম চা ডিশে ঢেলে খায়।

প্রভাসকুমার কৌতূহলি হয়ে উঠলেন সান্ত্বনা সম্পর্কে। তিনি সান্ত্বনার সামনে বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা জেরা করে যান। ভূতে পাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে খুঁজছিলেন এমন একজনকে যে নিজের চোখে ভূত দেখেছে কিংবা ভূত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

প্রভাসকুমারের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যটি অবশ্য খুব নিরিবিলিতে হয় না। বাড়িসুদ্ধ নোক সেই সময় ওদের ঘিরে থাকে। বাচ্চারা হাসে, গোলমাল করে। সান্ত্বনা কোনও কথারই প্রায় জবাব দিতে চায় না, চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকে প্রভাসকুমারের দিকে। এক এক সময় সে এমন এক একটা কথা বলে যা শুনে সত্যিই হাসি সামলানো যায় না। যেমন সে বলল, দেশের সেই ভূতটা ছাগল সেজে কলকাতায় চলে এসেছে।

প্রভাসকুমার প্রশ্ন করলেন, কেন?

সান্ত্বনা বেশ দৃঢ় ভাবে বলল, আজ যে দেখলাম, একটা ছাগলের দাড়ি আছে! ‘ ‘

অন্যরা হাসলেও প্রভাসকুমার হাসেন না। তিনি একটা মোটা খাতা এনেছেন সঙ্গে। সান্ত্বনা কিছু একটা কথা বললেই তিনি শ্রীলেখাকে নির্দেশ দেন, লিখে রাখো। এটাও লিখে রাখো! লিখতে লিখতে শ্রীলেখা একসময় বিরক্ত হয়ে যায় কিংবা লজ্জা পায়। সে বাদলের হাতে খাতা কলম তুলে দিয়ে বলে, তুই লেখ তো!

কিন্তু সান্ত্বনার অসুখটা ঠিক হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। সে জ্বলজ্বলে চোখে স্থির ভাবে তাকিয়ে থাকে। তারপর অদ্ভুত ভাবে হাসে এবং মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। তখন তার দাঁতে দাঁত আটকে যায়।

প্রভাসকুমারের এক বন্ধুর দাদা ক্যাম্ববেল হাসপাতালের বড় ডাক্তার। তিনি প্রতিদিন আসছেন, সান্ত্বনার রোগটি মৃগী বলে সন্দেহ করছেন কিন্তু ওষুধে কাজ হচ্ছে না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা, মনোবিশ্লেষণ সবই চলছে-সেইসঙ্গে একদিন হরি সংকীর্তনের আসরও বসে গেল।

প্রভাসকুমারের সঙ্গে বাদলের আস্তে আস্তে ভাব হল। বাদলের হাতের লেখা মেয়েলি ধরনের গোটা গোটা এবং বেশ স্পষ্ট। সেই হাতের লেখা প্রভাসকুমারের পছন্দ হল, তিনি নিজেই ডেকে বাদলকে পড়াশুনোবিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। বাদল গল্পের বইটই বেশ পড়েছে, সে কথা ও কাহিনী'র একাধিক কবিতা নির্ভুল মুখস্থ বলতে পারে। অতি উৎসাহের সঙ্গে সে বন্দি বীর'আবৃত্তি করতে লাগল। প্রভাসকুমার তাকে দেখিয়ে দিলেন, উঁহু, ও ভাবে নয়, ও ভাবে নয়। আরও আস্তে আস্তে, আরও টেনে 'পঞ্চনদীর তীরে' বলবার সময় ডান হাতের পাঁচটা আঙুল ফাঁক করে দেখাবে, বেণী পাকাইয়া শিরে' বলবার সময় মাথায় চুলের ওপর হাত দিয়ে বেণীর মতন দেখিয়ে।

আবৃত্তি শেষ হলে তিনি বাদলকে প্রশ্ন করলেন, তুমি বড় হয়ে কী হবে?

বাদল মাথা চুলকোতে লাগল। বড় হয়ে সে কী হবে? সে তো অনেক কিছু হবে। সে জাহাজে চেপে পৃথিবী ঘুরবে, সে এভারেস্টের চূড়ায় উঠবে, সে নতুন গ্রহতারকা আবিষ্কার করবে। আরও কত কী? এর মধ্যে কোনটা বলবে সে?

প্রভাসকুমার আবার বললেন, বড় হয়ে কী হবে, ঠিক করোনি?

বাদল আচমকা বলে ফেলল, ঘুড়ির দোকান করব!

বাদলের ঘুড়ি ওড়াবার খুব শখ। এবার আসবার পর কেউ তাকে ঘুড়ি-লাটাই কিনে দেয়নি। তার পুরনো লাটাই সুতো বড়বাবুর বাড়িতে রয়ে গেছে। তার ধারণা, বড় হয়ে ঘুড়ির দোকান করলে কোনও দিন আর ঘুড়ির অভাব হবে না।

প্রভাসকুমার তাকে বললেন, বয়সের তুলনায় তুমি অনেক ছোট আছ। ও-সব কথা বলে না। এখন থেকেই ঠিক করে রাখো তুমি মানুষের মতন মানুষ হবে। তোমার দাদার মতন হতে ইচ্ছে করে না? সূর্যদা?

বাদল চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, আপনি সূর্যদাকে চেনেন?

নিশ্চয়ই চিনি। তোমার সূর্যদা একজন বীর পুরুষ। একদিন সারা দেশের লোক ওকে চিনবে।

বাদল ঠিক যুক্তিটা জানে না, তার অবচেতন মনে এ রকম একটা আশা গড়ে উঠেছিল। যে সূর্যদা আর জামাইবাবুর পক্ষে পরস্পরকে সহ্য করা সম্ভব নয়। সূর্যদা ভীষণ রাগী, বড়দির বিয়ের সময় খুব রেগে গিয়েছিল, জামাইবাবুকে দেখলেই তো আরও রেগে যাবার কথা।

সূর্যদাকে আপনি কোথায় দেখলেন?

খড়্গপুরে আমাদের বাড়িতে এসে তো ছিল কয়েক দিন। আমার কথা যদি শুনত, তা হলে পুলিশে ওকে ধরতেও পারত না।

সূর্যদাকে কি জেলখানায় মেরে ফেলেছে?

যাঃ পাগল, মেরে ফেলবে কেন! ওর এখনও বিচার চলছে।

বাদল ছুটে চলে এল শ্রীলেখার কাছে। উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, বড়দি, সূর্যদা তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল?

শ্রীলেখা এস্তে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, চুপ, আস্তে কথা বলতে পারিস না? তোকে কে বলল?

জামাইবাবু।

হ্যাঁ গিয়েছিল। শোন, সূর্যদার কথা জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে বলতে নেই এখন।

কেন, কী হয়েছে।

সূর্যদাকে তো পুলিশে ধরেছে। এখন সূর্যদার কথা অন্য কেউ আলোচনা করলে তাদেরও পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। বাবা ওর কথা বলতে বারণ করেছেন।

সূর্যদা তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, আর তুমি ওকে আটকে রাখতে পারলে না, কেন ওকে পুলিশে ধরল?

শ্রীলেখা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাদলের দিকে। ক্রমশ ভারী হয়ে এল দৃষ্টি। খুব আস্তে আস্তে বলল, সূর্যদা কি কারওর কথা শোনে?

সূর্যদা কি মরে যাবে? ফাঁসি হবে?

না, না, ছিঃ, ওকথা উচ্চারণ করতে নেই।

শ্রীলেখা আর নিজেকে সামলাতে পারল না, দু ফোঁটা জল নেমে এল তার চোখ দিয়ে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল, বাদল, তুই আর আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ সূর্যদাকে ভালোবাসে না! উঃ, আমাদের বাড়িতে যখন এল, কী চেহারা হয়েছিল, তুই দেখে চিনতেই পারতিস না। আস্তে আস্তে একটু ভালো হয়েছিল, সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, পুলিশে ধরা পড়ার কোনও কথাই ছিল না, তবু ও একদিন চলে গেল।

কেন চলে গেল?

আমার জন্য।

তুমি সূর্যদাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে?

না রে। আমি ওকে ধরে রাখতে চেয়েছিলুম, সেই জন্যই ও জোর করে চলে গেল। তুই এটা বুঝবি না।

বাদল সেই বয়সে বার বার অনেকের মুখে শুনেছে, তুই এখন এসব বুঝবি না। এই কথাটা শুনলেই মনটা উতলা হয়ে যায়, জলের মধ্যে প্রবল আলোড়নের মতন বোধের সীমানাগুলো কেঁপে ওঠে। বাদল এইটুকু অন্তত বুঝেছিল, তার বড়দি আর সূর্যদা কী যেন একটা অদৃশ্য বন্ধনের মধ্যে রয়েছে-ওরা পরস্পরের কাছে ভীষণ ভাবে আসতে চায় কিন্তু অন্যরা আসতে দেবে না। সূর্যদা বড়দিকে কাদাবে আবার নিজেও কষ্ট পাবে।

ওরা সূর্যদাকে নিষ্ঠুর ভাবে মেরে মেরেও কোনও কথা বার করতে পারেনি।

ওরা সূর্যদাকে মারে? ইস, আমি যদি একটা বন্দুক পেতাম!

চুপ, এসব কথা কারোকে বলিসনি।

তুমি কী করে জানলে?

বড়বাবু বলেছেন। আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বড়বাবু তো এ বাড়িতে আজকাল আর আসেন না।

বড়বাবু তো নেই কলকাতায়।

বড়বাবু সূর্যদাকে দেখতে গেছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে যান।

আমি বড়বাবুর সঙ্গে যাব!

পারবি? বড়বাবুকে জোর করে বলতে পারবি? আমি তো মেয়ে, আমি অনেক কিছু পারি না। তুই ইচ্ছে করলে পারিস, বড়বাবুকে যদি খুব করে বলিস-

পারব, নিশ্চয়ই পারব।

৫০. কাছাকাছি মানুষের প্রভাব

কাছাকাছি মানুষের প্রভাব আমার ওপর খুব বেশি পড়ে। যাকে একটু ভালো লাগে, অমনি তাকে অনুকরণ করা শুরু করে দিই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি প্রভাস জামাইবাবুর খুব ভক্ত হয়ে উঠলাম। উনি যেমন একটু সুর করে কথা বলেন, আমার কথার মধ্যেও সেই রকম টান এসে গেল। উনি বলেন, শোনো ও- ও- ও কিংবা বলো ও-ও-ও, বেশ মিষ্টি শোনায়।

গ্রাম থেকে আমি কয়েকটি খারাপ অভ্যেস নিয়ে এসেছিলাম। যেমন রাস্তায় গুলি খেলা কিংবা অন্য লোকের বাড়িতে জিজ্ঞেস না করে ঢুকে পড়া। গ্রামে কড়ি খেলার খুব চল ছিল, কলকাতায় দেখলাম আমাদের বাড়ির কাছেই খুব ছিপি খেলা হয়। নিয়ম একই। সোডার বোতলের ছিপি এক-এক জনের কাছে কুড়ি-পঁচিশটা করে থাকে– সেগুলো দূরে দাগের মধ্যে রেখে বাটখারা দিয়ে নির্দিষ্টটাকে মারতে হয়। দারুণ উত্তেজনার খেলা, ছিপি ফুরিয়ে গেলে কিনতে হয় সঙ্গীদের কাছ থেকে, চার পয়সায় দশটা। অর্থাৎ এটা জুয়া খেলার কিশোর সংস্করণ। আমার চরিত্রের মধ্যে একটা জুয়াড়ি গুপ্ত ভাবে ছিল বলেই বোধহয় আমি ওই খেলায় খুব মেতে উঠেছিলাম। জেতার আনন্দ এবং হারার দুঃখ, দুটোই ছিল তীব্র। মায়ের কাছে পয়সা চাইবারও দরকার হত না, আমার পইতের সময় পাওয়া টাকা তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। সারা সকাল দুপুর বিকেল আমি ছিপি খেলে কাটাতাম বাড়ি ফেরার সময় আমার দু'পকেট ভরতি ছিপি ঝমঝম করত। এ ছাড়া একটু দূরে বস্তির মুখে ছিল গুলি খেলার আড্ডা।

বাড়ির কারওর শাসন তখন আমি গ্রাহ্য করি না। একমাত্র ভয় পাই জ্যাঠামশাইকে কিন্তু তিনি আমাদের কারওর ব্যাপারে মন দেবার সময়ই পান না। শেষ পর্যন্ত আমার ওই সব খেলার নেশা ঘুচিয়ে দিলেন প্রভাস জামাইবাবু। তিনি একদিন আমায় রাস্তায় ওইসব খেলাধুলোর মধ্যে ব্যস্ত দেখে এমন ভাবে মুখ করে থমকে দাঁড়ালেন, যেন নরকের দৃশ্য

দেখছেন। কাছে ডেকে বললেন, ছি-ছি, তুমি এইসব করো? তা হলে আর অধঃপাতে যাবার বাকি রইল কী?

জামাইবাবুরা শ্বশুরবাড়িতে এসে হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-আহ্লাদ করবেন, এইটাই নিয়ম। কিন্তু প্রভাসকুমার হাসি-ঠাট্টার ধার ধারেন না। বড়দির ছেলেমেয়ে না হওয়া পর্যন্ত তিনি কলকাতাতেই থাকবেন এবং এর মধ্যেই তিনি এখানে পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছেন। আমার দিদির অসুখ এখন অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, তাই প্রভাসকুমারের হাতে এখন অন্য কোনও কাজ নেই, তিনি আমাকে নিয়ে পড়লেন। বোধহয় কিশোর মনস্তত্ব সমীক্ষা করার ঝোঁক চাপল তাঁর, তিনি প্রায় সারা দিন আমাকে তার ঘরে আটকে রেখে নানা রকম কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। দিনের পর দিন এই রকম চলল।

প্রথম প্রথম আমি অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেও ক্রমশ তার অনুরক্ত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হল, এ রকম বিদ্বান কিংবা এ রকম সুন্দর চেহারার মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি। আসলে কিন্তু প্রভাসকুমার সুপুরুষ ছিলেন না। তার গায়ের রং খুব। ফরসা ছিল, এ ছাড়া তার শরীরে কোনও সামঞ্জস্য ছিল না।

প্রভাসকুমারকে অনুকরণ করতে করতেই আমি পদ্য রচনা শুরু করলাম। প্রভাসকুমার যে একজন কবি-এর মধ্যে কোনও গোপনীয়তা ছিল না, বাড়িসুদ্ধ সবাই জানত। প্রভাসবুমার যখন ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতেন, তখন ছোটরা কেউ বাইরে চঁচামেচি করলেই জ্যাঠাইমা তাকে ধমক দিয়ে বলতেন, এই, তোরা গোলমাল করছিস কেন, তোদের জামাইবাবু এখন কবিতা লিখছেন না? একথা শুনে কেউ কখনও হাসেনি। প্রভাসকুমারের দ্বিতীয় কবিতার বই ছাপিয়ে দিয়েছেন তার শ্বশুর। জ্যাঠামশাই তার জামাইয়ের লেখা কবিতা-পুস্তক উপহার দিতেন অতিথিদের। অনেকেই সেই পদ্যগুলি পাঠ করে ধন্য ধন্য করেছেন। শুধু দু'এক জন এ রকম মুখের ভাব করেছেন, কাগজ ব্যবসায়ীর জামাই কবিতা টবিতা লিখে কেন কাগজ নষ্ট করছে এই দুর্মূল্যের বাজারে?

আমার মনে হল, জামাইবাবুর মতন অসাধারণ মানুষ হতে গেলে কবিতা না লিখে উপায় নেই। শুরু করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

কবিতা লেখার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। যারা কবিতা লেখে না–তারা অনেকেই কখনও কবিতার কথা চিন্তা করে না কিংবা এটাকে একটা আজেবাজে ব্যাপার মনে করে। আবার অনেকের ধারণা, কবিতা লেখা বুঝি খুব একটা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু যারা কোনওক্রমে একবার কবিতা লিখতে শুরু করে, তারা প্রথম চোটেই পৃথিবীর যে-কোনও বিষয় নিয়ে হুড়হুড় করে অজস্র কবিতা লিখে ফেলে। শিশুর প্রথম হাঁটতে শেখার মতন কিংবা ছাগলের নতুন শিং গজালে যেমন সে সর্বত্র ছুঁ মেরে বেড়ায়- তেমনি নবীন কবিও কোনও কিছুই বাদ দেয় না। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি একটি খাতার পাতা ভরিয়ে ফেললুম। একটা কবিতা শেষ করে তক্ষুনি মনে হয় আর একটা লিখতে হবে! রাস্তার ছিপি-খেলোয়াড় থেকে আমি একেবারে কবি হয়ে উঠলাম এবং চুলে তেল-মাখা বন্ধ করে দিলাম।

কবিরা যে কত ঈর্ষাপরায়ণ, সেটাও টের পেলাম সেই সময়। জামাইবাবু এত কাব্যোৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কবিতা রচনার ব্যাপারটা খুব সুনজরে দেখলেন। না। এক বাড়িতে দু'জন কবি থাকা ওঁর পছন্দ নয়। উনি আমাকে কবিতা লেখার জন্য কখনও তেমন উৎসাহ দেননি। আমি আমার সদ্য রচিত পদ্য ওঁকে পড়ে শোনালে উনি সামান্য ঠোঁট ফাঁক করে মৃদু হাস্যে শুধু বলতেন, বাঃ, আবার লেখো। যেন আমি ওঁকে হোম টাস্ক দেখাচ্ছি। তখন আমি অবশ্য ওই সামান্য মন্তব্যেই পুলকিত হতাম। আবার মা বা জ্যাঠাইমা যখন জামাইবাবুর কবিতার প্রশংসা করতেন, তখন আমি মনে মনে ভাবতুম, ওঁরা শুধু জামাইবাবুর কথা বলছেন কেন, আমিও ওঁর চেয়ে খারাপ লিখি না।

কবিতা লেখার কথা আমি আগে কখনও চিন্তা করিনি। কবিতা জিনিসটা মনে হত বইতেই শুধু ছাপা থাকে–কোনও জ্যান্ত মানুষ যে এগুলো লেখে–এ কথা মাথাতেই আসেনি এর আগে। চোখের সামনে প্রভাস জামাইবাবুকে টাটকা টাটকা কবিতা লিখতে দেখে ভেবেছিলাম, এটা তা হলে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, আমিও পারি। জামাইবাবুই

বলেছিলেন যে উনি নিজে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি আমার চেয়েও কম বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তা হলে তো আর কোনও কথাই নেই।

দিদিদের কিংবা মা-জ্যাঠাইমাকে আমি যখন কবিতা শোনাই, এমনকী, স্বভাব কবির মতন মুখে মুখে কবিতা বানাতেও আমার অসুবিধে হয় না। তা ছাড়া জামাইবাবু বলেছিলেন যে মডার্ন কবিতায় ছন্দ এবং মিল লাগে না। বাড়ির লোকেরা আমাকে দেখেই কানে হাত চাপা দিতে শুরু করল। কবিতা শুনিয়ে শুনিয়েই আমি আমার দিদির ভূত ছাড়িয়ে দিলাম বলতে গেলে, বহু দিন পর দিদির মুখে হাসি দেখা গেল।

প্রথম কবিতাটি লেখার সময়ই আমাকে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হয়েছিল, তারপর-তো এসে গেল গড়গড় করে। প্রথম কবিতাটি কষ্টকল্পিতই বলা যায়। কী নিয়ে যে লিখব, সেটাই ছিল সমস্যা। বহু চিন্তা ভাবনার পর আমার প্রথম কবিতাটি রচিত হয়েছিল কারাগার বিষয়ে। তাতে মোটামুটি এই ভাব প্রকাশ পেয়েছিল যে, কারাকক্ষের অন্ধকারে এক দিব্যজ্যোতি পুরুষ বসে আছেন, তার গা থেকে আলো বেরোচ্ছে, তিনি উঠে দাঁড়াতেই ঝনঝন করে শিকল ভেঙে পড়ল। একমাত্র বড়দিই আমার এই প্রথম কবিতাটি খুব পছন্দ করেছিল-আমি পরে অন্য কবিতা শোনাতে গেলে বড়দি বলেছে, তার থেকে বরং তোর সেই জেলখানায় কবিতাটা আর একবার পড়ে শোনা।

কবিতা রচনা ছিল তখন আমার কাছে ছেলেখেলা ও আমাদের ব্যাপার। যে-কোনও একটা কিছু নিয়ে আমার মেতে থাকা স্বভাব। ছিপি খেলা কিংবা ঘুড়ি ওড়ানোর বদলে। আমি কবিতা নিয়ে মেতেছিলুম। কবিতা লেখার মুহূর্তগুলিতে যে তীব্র বিষাদ আছে, তা টের পেতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল।

রেণুদের বাড়িতে যখন আমি এবার এসে প্রথম বার গেলাম, তখন আমি পরিবর্তিত মানুষ। এখন তো আমি আর আগের সেই সাধারণ ছেলেটি নই-এখন আমি রীতিমতো একজন কবি। জামায় বোতাম লাগাই না, সিঁথি কেটে চুল আঁচড়াই না, কথা বলতে বলতে

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যাই এবং খাবারের প্লেট সামনে দিলে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াই না সে-দিকে।

রেণুদের ওখানে গিয়ে দেখলাম, ওদের বাড়িটা বদলে গেছে আরও অনেক বেশি। আমি মাত্র দেড় বছর কলকাতা ছেড়ে ছিলাম, এর মধ্যে অনেক কিছুই বদলে গেছে। রেণুর বাবা মারা গেছেন, এটা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। শেষের কয়েক মাস ওরা কোনও চিঠি লেখেনি আমাকে। বিধবা হওয়ার জন্য রেণুর মাকে হঠাৎ বুড়ির মতন দেখায়। সাদা থান-পরা ওঁর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। রেণুও যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, ওর এখন দশ বছর মোটে বয়স, এর মধ্যেই চশমা নিয়েছে। চশমা-পরা রেণুকে আমি প্রথমটায় চিনতেই পারিনি।

বিষ্ণু কিছু দিন টাইফয়েডে খুব ভোগার ফলে এখনও রোগা আর দুর্বল। বিষ্ণুর মা তাকে ঘর থেকে বেরোতেই দেন না। আমি ওর বিছানায় বসতে গেছি, ওর মা বললেন, একটু দূরে বসো, তোমার তো রাস্তার জামাকাপড়!

দীপ্তির বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল অনেক আগেই, কী কারণে যেন সেই বিয়ে ভেঙে গেছে। দীপ্তিদের সঙ্গে বিষ্ণুদের কথা বন্ধ। এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখন আর সকলে সকলের ঘরে যায় না। বড়দের মধ্যে ঝগড়া ও মনকষাকষি অনেক পরিব্যপ্ত। বাড়িটির অবস্থাও আরও জরাজীর্ণ, কেন না সারাবার দায়িত্ব কোনও শরিকই নেবে না–এবং গেটের সামনেই ব্যাল ওয়াল তোলা হয়েছে বলে আরও কদাকার দেখায়। প্রথম যখন এ বাড়িতে আসি, তখন অদ্ভুত আনন্দময় পরিবেশ মনে হয়েছিল। কিংবা তখনও বোধহয় এই রকমই ছিল–আমার বয়স আরও কম থাকার জন্য চোখ পড়েনি।

এইসব বনেদি একান্নবর্তী পরিবারগুলির শেষ ঘণ্টা তখন বেজে উঠেছে, প্রাসাদগুলির গায়েও সেই নিয়তির লেখা।

বিষ্ণুর সঙ্গে আমার গল্প আর ফুরোয় না। বিষ্ণু সব কথাই ভারী সুন্দর করে বলতে পারে। ও আমাকে রেণুর বাবার মৃত্যুর কথা শোনাল। রেণুর বাবাকে আমি দেখেছি অনেক বার

কিন্তু কোনও দিন কথা বলিনি। খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ ছিলেন এবং দিনের বেশির ভাগ সময়েই বাড়ির বাইরে থাকতেন। তিনি মারা যান হঠাৎ হার্ট ফেল করে। মাঝ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে বুকে ব্যথার কথা বলেন, ডাক্তার ডেকে আনার আগেই ওঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। মৃত্যুর ঠিক আগে ওঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু জল পড়ছিল চোখ দিয়ে। সেই চোখের জল বিষ্ণুকে খুব আশ্চর্য করেছে। ও বার বার বলছিল, জ্যাঠামশাইকে কাঁদতে দেখব, কখনও ভাবিনি। জ্যাঠামশাই কি ভয় পাচ্ছিলেন। মরতে কি মানুষ ভয় পায়?

বিষ্ণু আরও বলল, ওর যখন টাইফয়েড হয়েছিল, তখন ওর খুব ভালো লাগত। অসুখ হওয়া খুব আনন্দের ব্যাপার। বিষ্ণু বলল, জানিস বাদল, যখন ভীষণ জ্বর হতজ্বরের ঘোরে খানিকটা অজ্ঞান অবস্থা, তখন কত রকম স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, আমি যেন কোথায় চলে গেছি, অচেনা সব সুন্দর সুন্দর জায়গা, একটা সাদা রঙের পাহাড়, তার। ওপরে একটা মন্দির। সেখানে নীল শাড়ি পরে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে মনে হল আমার মা, তারপর আবার দেখি মা তো নয়, অন্য কেউ। বোধহয় কোনও দেবতা–অথচ ঠিক মানুষের মতন–মুখখানা একটু দুঃখী দুঃখী, কিন্তু যেই হাসলেন, এত সুন্দর হাসি আমি কখনও দেখিনি। ইস, আবার যে কবে তাঁকে দেখতে পাব! আর একবার দেখলাম অসংখ্য জিরাফের পাল, একটা মাঠ ধু ধু করছে, তার মধ্যে জানিস তো, জিরাফরা গলা দিয়ে শব্দ করতে পারে না, তাই সেখানে কোনও শব্দ নেই-পাশ দিয়ে একটা নদী।...এখন আর সেই সব স্বপ্ন একটাও দেখি না।

আমি গোপন খবর দেবার মতন বিষ্ণুকে বললাম, এই জানিস, আমি এখন কবিতা লিখি।

বিষ্ণু জিজ্ঞেস করল, কেন?

আমি বললাম, লিখি, মানে এমনিই। আমি লিখতে পারি।

বিষ্ণু রেগে গিয়ে বলল, ট্রেইটার?

বাঃ, আমি কী করেছি?

কথা ছিল না আমরা দুজনে এক্সপ্লোরার হব? নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করব?

কবিতা লিখলে বুঝি এক্সপ্লোরার হওয়া যায় না?

না। কোনও এক্সপ্লোরার কবিতা লেখে না।

তুই জানিস?

নিশ্চয়ই জানি। স্কট, এমান্ডসেন, ডঃ লিভিংস্টোন এরা কখনও কবিতা লিখেছে? বিষ্ণুর তুলনায় এসব বই আমি কম পড়েছি, তাই কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, এক্সপ্লোরাররা কবিতা না লিখতে পারে, কিন্তু কবিরা কি এক্সপ্লোরার হতে পারে না?

বিষ্ণু বলল, না, কবিটবিদের দিয়ে এসব শক্ত কাজ হয় না।

জামাইবাবুর অনুকরণ করতে গিয়ে বিষ্ণুর কথা আমার মনে ছিল না। কিন্তু বিষ্ণু আমার প্রাণের বন্ধু, তার মনে আমি আঘাত দিতে পারি না। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তা হলে কবিতা লেখা ছেড়ে দেব?

বিষ্ণু গম্ভীর ভাবে অনুমতি দেবার সুরে জানাল, ঠিক আছে, যতদিন না আমরা বড় হচ্ছি, ততদিন লিখতে পারিস। বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে পড়লে আর ওসব চলবে না।

রেণুর বাবা মারা গেছে বলে বেণুকে আমার এখন অন্য রকম লাগে। আমার যা যা আছে, অন্য কারওর তা নেই–এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। সূর্যদার মা নেই, একথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানতাম, সেই জন্যই সূর্যদা অন্য রকম। কিন্তু রেণু তো আমাদেরই মতন অথচ তার বাবা থাকবে না কেন? রেণুর ভাই অংশুর সঙ্গে আমার বরাবরই ঝগড়া

হয়, এখন সেই অংশুকে দেখেও মায়া হতে লাগল। আমি অংশুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চাইছিলাম। অংশু কিন্তু প্রথমেই আমাকে বলল, কী রে বাঙাল, কবে এলি?

আমাকে কেউ বাঙাল বললে এখন আমার রাগ হয়। পূর্ব বাংলায় আমাকে সবাই ঘটি কিংবা ক্যালসেশিয়ান বলত, কারণ আমার কথার উচ্চারণ অন্য রকম হয়ে গেছে। আর এখানে এখন আমাকে বাঙাল বলার কোনও মানে হয়? অংশু আমার জামার ফাঁক দিয়ে পইতেটা উঁকি মারছিল দেখে বলল, এটা কী? তুই বামুন হয়েছিস নাকি? আমাদের বাড়িতে রান্না করবি? আমাদের ঠাকুর পালিয়ে গেছে!

না। চেষ্টা করলেও অংশুর সঙ্গে আমার ভাব হবে না। অংশুর মা ছেলেকে বকলেন। রেণু আমাকে বলল, তুই আমাদের বাড়িতে আর আসিস না কেন রে?

আমি বললাম, বাঃ, আমরা তো এখানে ছিলাম না।

কত দিন আগে ফিরেছিস?

চোদ্দো-পনেরো দিন।

তা হলে এর মধ্যে আসিসনি কেন?

এখন তো অনেক দূরে থাকি।

ওর মা বললেন, এই রেণু, তুই বাদলকে তুই তুই বলিস কেন? এখন বড় হয়েছিস না? এখন থেকে ওকে বাদলদাদা বলবি।

রেণু বলল, ইস, মোটে তত তিন বছরের বড়। দাদা বলব না ছাই বলব। এই বাদল, তোদের নতুন বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবি না?

নতুন বাড়ি নয়, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি।

আমি সেখানে যাব।

মা বললেন, কার সঙ্গে যাবি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি নিয়ে যেতে পারি। বাসে করে সোজা ওয়েলিংটন, কোথাও বদলাতে হয় না।

রেণু আমার সঙ্গে যাবার জন্য খুব বায়না ধরে বসল। কিন্তু দারোয়ান না থাকায় ওর মা কিছুতেই ওকে ছাড়বেন না। আমি নিয়ে গেলেও ফিরিয়ে আনবে কে! তা ছাড়া আমার সঙ্গে ছেড়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমার মনে হল, রেণু, অংশু কিংবা বিষ্ণুর চেয়ে আমি অনেক স্বাধীন! আজকাল আমি বাড়ি থেকে একলা একলা বেরোতে পারি, কেউ নিষেধ করে না। এখন আমি বাসের নম্বরও জেনে গেছি। রেণুকে আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে বেশ হত- সারা দিন ওর সঙ্গে গল্প করতাম। ওর মা দৃঢ় ভাবে মানা করায় আমি চুপ করে গেলাম। আমি যদি ম্যাজিক জানতাম, এক্ষুনি অদৃশ্য হয়ে রেণুকে নিয়ে উড়ে চলে যেতাম। কোথায়? সারা জীবন ধরে আমি সেই উত্তর খুঁজেছি। কোথায় নিয়ে যাব?

রেণুকে বললাম, বিষ্ণু সেরে উঠুক, তারপর তোরা সবাই মিলে একদিন আমাদের বাড়িতে আসবি।

রেণু বলল, না, আজই যাব।

ওর মা এবার ওকে বেশ কড়া করে ধমক দিলেন।

রেণু বড় জেদি মেয়ে, শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করে দিল। রেণুকে সেই অবস্থায় রেখেই চলে আসতে হল আমাকে।

সিঁড়ির কাছে দীপ্তির সঙ্গে দেখা। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল সিঁড়ির পাশে একটা ছোট ঘরে। এই ঘরটা আগে খালি পড়ে থাকত–এখন এখানে অনেক জিনিসপত্তর, একটা খাটবিছানাও রয়েছে। শুনলাম, বিষ্ণুর জন্য নিযুক্ত মাস্টারমশাই ওখানে থাকেন, দিনেরবেলা বাইরে চাকরি করেন, সকালেসন্ধ্যাবেলা পড়ান।

দীপ্তি বলল, কী রকম বেড়িয়ে এলি বল? আমার সঙ্গে কথা বললি না কেন রে?

তখন তো তোকে দেখলাম, তুই এলি না কেন বিষ্ণুদের ঘরে?

ওই হিংসুটের ঘরে আমি যাই না।

বিষ্ণুকে হিংসুটে বলবি না।

ও নয়, ওর মা-টা!

দীপ্তির কথা বলার ধরন বরাবরই খারাপ। আমার মনে পড়ল, পাড়ার ছেলেরা আমার হাত দিয়ে দীপ্তিকে চিঠি পাঠাত। দীপ্তি কখনও কখনও আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেত–আমার খুব বিশ্রী লাগত তখন। এখন কিন্তু দীপ্তিকে দেখে আমার একটুও খারাপ লাগছে না। আমি একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম দীপ্তিকে। আমি এখন কবি হয়েছি তো, তাই এ রকম ভাবে দেখতে হয়। মনে হল, দীপ্তিকে নিয়েও অনায়াসে কবিতা লেখা যায়। দীপ্তি যদি আজ আমায় আদর করে, তা হলে ওকে নিয়ে আজই কবিতা লিখব। দীপ্তির সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে বসা কিংবা ওর শরীরের একটু ছোঁয়া পাবার জন্য আমার মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছিল। এটা আমার নতুন অভিজ্ঞতা। আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। দীপ্তিকে আমার পছন্দ হয় না অথচ ওর সামনে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে, বার বার তাকাতে ইচ্ছে করছে ওর শরীরের দিকে। এর মানে কী?

হঠাৎ সুপ্রকাশদা এসে পড়ায় দীপ্তিকে নিয়ে সেদিন আমার কবিতা লেখা হয়নি।

৫১. বেয়াল্লিশ সালের গোড়ায়

বেয়াল্লিশ সালের গোড়ায় কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। তেতাল্লিশের শেষের দিকে তার থেকে আরও অনেক বেশি মানুষ এসে ঢুকল কলকাতা শহরে। এরা অন্য ধরনের মানুষ। এরা মরতে এসেছিল।

পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গা থেকে বৃদ্ধ, শিশু, নারী ছুটে আসতে লাগল কলকাতায়। কলকাতায় শান বাঁধানো রাস্তায় তারা আছড়ে পড়ল। রাস্তায় রাস্তায় কিলবিল করছে মানুষ।

কলকাতার নাগরিকরা প্রথম প্রথম ব্যাপারটা দেখে ভুরু কুঁচকেছে। এত গ্রামের মানুষ শহরে কেন? শহরের কি আর মান ইজ্জত রইল না। এর আগে বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে কোনও এলাকায় বিপর্যয় ঘটলে কলকাতার লোকেরা চাঁদা তুলেছে। একদল উৎসাহী লোক হারমোনিয়াম ও খোল করতাল সঙ্গে নিয়ে মিছিল বার করে গান ধরেছে। মেদিনীপুরেতে বন্যা হয়েছে, শোনো শোনো ভাই নগরবাসী। মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে যাও সবে, ক্ষুধিতের পাশে দাঁড়াও আসি...। কোনও বছর যদি আসামে বন্যা কিংবা চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় হয়-তা হলে ওই একই গানে মেদিনীপুরের বদলে সেই জায়গার নাম বসিয়ে গাওয়া হয়। কিন্তু এবার এসব কী? দুর্ভিক্ষের বর্ণনা বঙ্কিমবাবু লিখে গেছেন আনন্দমঠে, সেই সূত্রে লোকে জানে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা। এবারে কি আবার সেই রকম দুর্ভিক্ষ শুরু হল? খবরের কাগজে কী বলে?

খবরের কাগজ অনেক দিন কিছুই বলেনি। যুদ্ধের বড় বড় খবরে সবাই ব্যস্ত দেশের মধ্যেও কংগ্রেস-লিগ কোন্দল খুব মজাদার জায়গায় পৌঁছেছে। গ্রামগুলোতে কী ঘটছে কে খবর রাখবে? তবে আশ্চর্যের বিষয়, তখনকার দিনে বক্সওয়ালা এবং পাট কোম্পানির সাহেব মালিকদের মুখপত্র একটি ইংরেজি দৈনিকেই প্রথম ফলাও করে দুর্ভিক্ষের ছবি ও খবর ছাপা হতে শুরু করেছিল।

গ্রামের মানুষ যখন শহরে এসে মরতে লাগল, তখন সকলের টনক নড়ল। ব্যাপারটা বড় নোংরা। মরতে যদি হয়, চোখের আড়ালে মরাই তো উচিত ছিল। ভিখিরিরা রাস্তায় আর পয়সা ভিক্ষে চায় না, তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁচায়, মা, একটু ভাত দাও! কিছু দিন পর তারা ভাতও চায় না। তারা বলে, মা, একটু ফ্যান দাও! ডাস্টবিনে খাবার খোঁজার জন্য কুকুরের ও মানুষের লড়াই, সেই প্রথম দেখা গেল এ শহরে। তারই মধ্যে একটা রসিকতাও চালু হয়ে গেল, অনশনে এক জনও মরেনি, সবাই মরেছে হার্টফেল করে। সরকারি হিসেব মতনই বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা পনেরো লক্ষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি সমীক্ষায় এই সংখ্যা হয়েছিল পঁয়তিরিশ লাখ। বামপন্থীদের কাগজপত্রে বলা হয়েছে, এক কোটি কুড়ি লক্ষ। ইংলন্ডের জনসংখ্যা তখন এর দ্বিগুণ মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সৃষ্ট কারণে এই বিপুল মৃত্যুর জন্য কোথাও কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় এর অপরাধীদের কোনও খোঁজ পড়েনি। প্রাণহানির সংখ্যার হিসেবে হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলা বাংলাদেশের তুলনায় কিছুই না। তবু সারা পৃথিবীর কাছে এ-খবর পৌঁছোয়নি।

তখন শহরের মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট গুদামে হাজার হাজার বস্তা খাদ্য জমানো রয়েছে, যুদ্ধের জরুরি প্রয়োজনে। এর অনেক চালই শেষ পর্যন্ত পচে নষ্ট হয়েছে। অনেকের পকেটে তখন কাঁচা পয়সা ঝনঝন করছে, হোটেল-শুড়িখানাগুলো জমজমাট, দোকানের শোকেসে ভালো ভালো খাবার সাজানো। একটাও গুদাম লুঠ বা কেড়ে খাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। মানুষ শুধু পুঁকতে ধুকতে মরেছে।

কংগ্রেসের একগুঁয়েমি এবং ভ্রান্ত নীতির ফলে ফজলুল হক তখন বাধ্য হয়ে লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করেছেন। বাঙালি মুসলমানরা বড় আবেগপ্রবণ, তারা অনেকেই হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশেই থাকতে চায়, ভাষার সূত্রে হিন্দুদের আত্মীয় মনে করে। অবাঙালি মুসলমানরা তখন রাজনীতিতে ভাগ বাটোয়ারার আস্বাদ পেয়ে এখানকার মুসলমানদের মধ্য থেকে বাঙালিত্ব মুছে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। কতিপয় নবাবপুত্র

এবং ব্যারিস্টাররাই তখন জননেতা। ধর্মের প্রশ্নটি আস্তে আস্তে জিগিরে পরিণত হচ্ছে। হিন্দু এবং মুসলমানের উভয় সংস্কৃতিতে লালিত পালিত, মনে প্রাণে বাঙালি ফজলুল হক তখন দেখছেন ঘটনা প্রবাহ তার অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের মন্ত্রিসভা নিজের শক্তিতে টিকে থাকতে পারে কি না-সেটাই তখন সরকারের কাছে বড় প্রশ্ন। কোনও রকম দুর্বলতাই সরকার স্বীকার করতে রাজি নয়। খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দি তেতাল্লিশের ৯ই মে ঘোষণা করলেন, দেশে খাদ্যের কোনও ঘাটতি নেই। মজুতদার আর মুনাফাবাজরাই দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে। এবং বেশি খাদ্য গ্রহণ করা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত খারাপ সেকথাও জানালেন।

এদিকে এপ্রিল মাসে বোট অরডিনাসের ফলে পঁচিশ হাজার নৌকো অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গ্রামে গ্রামে মালপত্র চলাচল বন্ধ। আমন ধান সেবার ভালো ওঠেনি। বন্যা হয়েছে নানা জায়গায়। জাপানিরা বার্মা দখল করে নিয়েছে বলে সেখান থেকে আর চাল আসে না।

পরের মাসে অ্যাসেম্বলিতে একজন সদস্য প্রশ্ন তুললেন, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের কথা কি ঘোষণা করা হবে না? সোহরাওয়ার্দি বললেন দুর্ভিক্ষ কোথায়?

ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব স্মিথ বললেন, একদল লোকের সবকিছুই বড্ড বাড়িয়ে বলা স্বভাব।

ভারতসচিব আমেরি বললেন, খাদ্যের স্টক যথেষ্ট আছে আমাদের। তা ছাড়া গমের ফলন খুব ভালো হয়েছে।

আর তখন শুধু সাতক্ষীরার রাস্তাঘাটেই দু'হাজার মানুষের মড়া পড়ে আছে। বিভিন্ন জেলায় স্বামীরা স্ত্রী-পুত্র কন্যা ফেলে পালাচ্ছে। মায়েরা ছেলেমেয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। জলের দামে। এবং সন্তান বিক্রি করা টাকায় শেষ বারের মতন খেয়ে নিয়ে বমি করতে করতে মরছে। মাঠেঘাটে পড়ে-থাকা মানুষদের রাতের অন্ধকারে শেয়ালে এসে খেয়ে

যাচ্ছে, তারা অনেকে তখনও বেঁচে। মরা মায়ের বুক থেকে দুধ খাবার চেষ্টা করছে। শিশু-এই ছবি তুলে তুলে সাহেবরাও ক্লান্ত।

১০ই অক্টোবর সোহরাওয়ার্দি ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে।

তখন মৃতদেহগুলি দাহ করার পালা। খাদ্যদ্রব্যের দাম তখন ছশো গুণ বেড়েছে।

বাদলের জ্যাঠামশাই অতি বৈষয়িক লোক। দুর্ভিক্ষের আঁচ পেয়েই তিনি মস্ত বড় বড় মাটির জালা কিনে তাতে চাল ভরে রাখলেন। নিজে মফসসলে ঘুরে চাল কিনলেন। এবং অচিরেই চালের কারবার সম্পর্কে এমন ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন যে এদিকেও আর একটা ব্যবসা খোলার লোভ হয়েছিল তার। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করার ব্যাপারে তাঁর বিবেক শেষ পর্যন্ত সায় দিল না। তবে পুলিশ লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চালের স্টক খোঁজ করছে-এই রকম একটা গুজব ওঠায় তিনি চালের জালাগুলো সব ঠাকুরঘরে লুকিয়ে রাখলেন। এবং পরে র‍্যাশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় তিনি অনেকগুলো ভুয়ো র‍্যাশান কার্ড করিয়ে রেখেছিলেন।

শেষের দিকে পাড়ায় পাড়ায় যখন লঙ্গরখানা খোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, তিনি তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছেন এবং অনেক টাকা দানধ্যান করে সুনাম কিনেছেন। কিন্তু নিজের বাড়ির লোকের গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দেননি। বাদলরা গ্রামে থাকতে কষ্ট পেয়েছিল, কিন্তু কলকাতায় তারা ভালো ছিল।

প্রত্যেক দিন অসংখ্য মৃত্যুর গল্প। রাস্তায়ঘাটে হাঁটাচলা করা যায় না। কিশোরের নিষ্পাপ সরল চক্ষু বাড়ির বাইরে তাকালেই বীভৎস দৃশ্য দেখে। এক এক দিন খেতে বসে সে বমি করে ফেলে!

একজন মাঝবয়সি স্ত্রীলোক বাড়ির ঠিক গেটের সামনে সকাল থেকে শুয়ে আছে। কিছুতেই সে যাবে না। অনেক চোখ রাঙানো, অনেক তর্জন গর্জন হল, সে কোনও উত্তর

দেয় না—ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। দারোয়ান তাকে লাঠি উঁচিয়ে মারবার ভয় দেখালেও সে ভয় পায় না। কোনও কথারই উত্তর দেয় না সে।

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তাকে নিয়ে। একজন স্ত্রীলোককে তো সত্যি সত্যি মেরে তাড়ানো যায় না। তা ছাড়া, ওকে বোধহয় মারলেও যাবে না। প্রিয়রঞ্জন বার বার দারোয়াকে হুকুম দিতে লাগলেন ওকে সরিয়ে দেবার জন্য। দারোয়ান নাচার। সে আর সবকিছু করতে পারে, কিন্তু মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে পারে না। অথচ বাড়ির দরজার কাছে একজন একটু একটু করে মরবে-এও কি সম্ভব?

স্ত্রীলোকটির বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। তার চেহারাও খুব একটা জীর্ণ শীর্ণ বলা যায় না। বরং শরীরের কোনও কোনও অংশ বেঢপ ভাবে ফুলে ফুলো ও থসথসে। চুলগুলো নোংরা পাটের মতন। তার মুখ ও চোখ দেখলে মনে হয়, পৃথিবীর আর কোনও ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারবে না, মৃত্যু তার দেহভূমিতে পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে এবাড়ির দরজার সামনেই তাকে মরতে হবে কেন? এ তো বড় জ্বালাতনের কথা। অনেক মৃত্যু দেখতে দেখতে মানুষের মন অসাড় হয়ে যায়। দয়ামায়া তখন মনে হয় বিলাসিতা, নিজের এবং প্রিয়জনের বেঁচে থাকাই তখন সবচেয়ে বড় কথা। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরছে-সেখানে একজন-আধজনকে নিয়ে মাথা ঘামাবার আর কী মানে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা চোখের সামনে ঘটছে বলেই এত অস্বস্তিকর।

প্রিয়রঞ্জন আর চিররঞ্জন এই দুই ভাই মিলেও অনেক চেষ্টা করলেন স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দেবার। পারলেন না কিছুতেই। চিররঞ্জনের বাস্তব বুদ্ধি কম, তাই তিনি বললেন, দাদা, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করলে হয় না?

প্রিয়রঞ্জন ভাইয়ের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন এ রকম একটা নির্বোধ তিনি জীবনে দেখেননি। বললেন, তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে? রাস্তায় রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকছে-আর অ্যাম্বুলেন্স আসবে তাদের নিতে?

তা হলে এদের হবে কী?

কী আবার হবে? মরে গেলে কর্পোরেশানের গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যাবে। তারা জ্যান্ত থাকতে থাকতে নেয় না, নিয়ম নেই। হাসপাতালগুলোতে জায়গা আছে? সুস্থ সমর্থ লোকগুলোকে ধরে ধরে জেলখানাগুলোও ভরে ফেলেছে আগেই-সেখানেও জায়গা নেই। যেমন হয়েছে শালার গভর্নমেন্ট।

তা বলে এ রকম আমাদের চোখের সামনে মরবে?

এই দারোয়ান হারামজাদা কোনও কম্মের না। রাত্তিরে এসে যখন বসেছিল তখনই যদি সরিয়ে দিত।

প্রিয়রঞ্জন পাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলেন, বেশ কিছু টাকা দিতে চাইলেন। সুবিধে হল না। এইসব ছেলেরা মদ খাবার পয়সা পেলে অনেক সময় বেওয়ারিশ মড়া পোড়াতে নিয়ে যায়। কিন্তু তারাও জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার করে না।

প্রিয়রঞ্জনের জরুরি কাজ ছিল, তিনি আর থাকতে পারছিলেন না। যে-কোনও উপায়ে ওকে সরিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়ে গেল।

সারা সকাল স্ত্রীলোকটি গেটের সামনে উবু হয়ে বসে ধুকতে লাগল। বাড়ির বাচ্চারা দূর থেকে তাকে দেখে। চাকরবাকর-দারোয়ান গেট দিতে যাওয়া আসার সময় প্রত্যেক বার তাকে একবার করে ধমকে যায়। একসময় তার বুক দিয়ে ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যেতে লাগল।

শ্রীলেখার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, প্রভাসকুমার তাদের নিয়ে ফিরে গেছেন খড়্গপুরে। দুপুরবেলা বাড়িতে চিররঞ্জনই একমাত্র পুরুষমানুষ: গৃহকত্রী তাকে বললেন, ঠাকুরপো,

গেরস্তবাড়ির সামনে একজন মেয়েমানুষ এ রকম ভাবে মরছে, এতে বাড়ির অকল্যাণ হবে না?

চিররঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বললেন, তা তো ঠিকই। কিন্তু কী করা যায় বলুন তো বউদি?

তুমি একটা যা হোক কিছু করো।

আমি তো অনেক করে বললুম, ও তো কোনও কথাই শোনে না।

ওর কি কোনও কথা শোনার ক্ষমতা আছে? এক কাজ করি। আমার খাবারটা বাপু ওকে দিয়ে এসো, খেয়েদেয়ে যদি যায়-

বউদি আপনার খাবার দেবেন কেন? বরং আমারই আজ খিদে নেই-

তখন দেখা গেল, বাড়ির সকলেই নিজের নিজের খাবারটা দিয়ে দিতে রাজি আছে। কারওরই আজ খিদে নেই। সারা বাড়িতে আজ কেউ এক বারও হাসেনি, জোরে কথা বলেনি- মৃত্যুর এমনই গাম্ভীর্য।

খাবার দিতে গিয়ে আর এক বিপত্তি হল। বাড়ির ঝি খাবার নিয়ে যেই গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে-অমনি কোথা থেকে কাক-চিলের মতন একদল অধোলোঙ্গ কালো কালো মানুষ ধেয়ে এল। তারা সবাই খাবার চায়। গেটের সামনে চঁচামেচি হইহল্লা। তারা ভেবেছে, এবাড়িতে আজ অন্নসত্র বসেছে। তখন দারোয়ানকে লাঠি ঘুরিয়ে সেই ভিড় সামলাতে হল।

চ্যাঁচামেচিতে স্ত্রীলোকটি চোখ মেলে তাকিয়েছিল, একটু নড়েচড়ে বসেছিল। ভিড় ফাঁকা হবার পর ঝি তার সামনে খাবারের থালাটা ধরে বললে, এই খাবি?

অদ্ভুত ম্যাজিকের মতন একটা ব্যাপার ঘটল। স্ত্রীলোকটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, দেহটা স্প্রিংয়ের মতন সোজা হয়ে উঠল, ফ্যাসফেসে গলায় বলল, ভাত? দাও, দাও!

হেলাফেলা করে খাবার দেননি সুপ্রভা, অতিথি নারায়ণকে সেবা করার জন্য যত্ন করে থালা সাজিয়ে দিয়েছেন। গরম গরম ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, বাঁধাকপির তরকারি আর এক টুকরো মাছ। খাবার দেখলে মুমূর্ষুও জীবন ফিরে পায়। স্ত্রীলোকটি কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, দাও, দাও!

গেটের সামনে খেতে দিলে আবার কাঙালির দল ছুটে আসবে, তাই গেট বন্ধ করে সামনের চাতালেই খাওয়ানো সাব্যস্ত হল। কুকুরের নাকের সামনে খাবার ধরে যেমন তাকে ডাকা হয়, সেই রকম ভাবে বাড়ির ঝি ওই স্ত্রীলোকটির মুখের কাছে খাবারের থালাটা ধরে এক পা এক পা করে পিছিয়ে বলতে লাগল, এ-দিকে আয়, এ-দিকে আয়।

স্ত্রীলোকটির দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। পা দুটিতে পক্ষাঘাত ধরে গেছে। অদ্ভুত কোনও জন্তুর মতন সে মাটিতে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে গেল। তারপর ভাতের থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ডাল দিয়ে যে ভাত মাখতে হয়, তরকারি যে আলাদা খেতে হয়-এসব নিয়ম সে ভুলে গেছে। সে খাবলা খাবলা করে সব মুখে পুরছে। বাড়ির সব লোক দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তাকে-কেউ একটিও কথা বলছে না।

স্ত্রীলোকটি সারা সকাল মুখ খোলেনি, কিন্তু এখন সে খেতে খেতে আপন মনে অনেক কথা বলছে, তার কিছুই বোঝা যায় না। যেন সে অন্নের সঙ্গেই কথা বলছে-অভিমানী সন্তানের মতন যে অনেক দিন দূরে ছিল।

সবটুকু সে খেতে পারল না, খানিকটা পরে সে থালার পাশেই শুয়ে পড়ল।

ঝি বলল, ও ভালোমানুষের মেয়ে; তুমি বাপু খাবারটাবার খেয়ে এবার অন্য কোথায় যাও।

স্ত্রীলোকটি ফিক করে হেসে রীতিমতন পরিষ্কার গলায় বলল, যাব গো মা, যাব। একটুখানি শুয়ে নিই!

সুপ্রভা বললেন, আহা থাক। আগে সবটা খেয়ে নিক। একটু জিরিয়ে নিক না হয়।

স্ত্রীলোকটি বলল, বড় ভালো রান্না হয়েছে। আহা ভাতের কী সুন্দর সোয়াদ।

সুপ্রভা বললেন, তোমার কোথায় বাড়ি? তোমার আর কেউ নেই?

সবই ছিল মা, এখন কে আছে কে নেই, জানি না। আমাদের বাড়ি হেতমপুর।

এত দূরে কার সঙ্গে এসেছ?

আমার ছেলে।

সে কোথায়?

স্ত্রীলোকটির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। আরও কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সুপ্রভা বললেন, আহা, ওর ঘরসংসার সবকিছুই ছিল।

ও তখন একটা হাত কপালে ছোঁয়াল। যেন সে কিছু একটা বোঝাতে চায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে পেটের সবকিছু বমি করে বার করে দিল। এবং কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করতে লাগল। তখন তাকে সেখান থেকে সরানো আরও অসম্ভব। হয়ে দাঁড়াল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যে পেট ভরে খায়নি, তার পেটে একসঙ্গে এত খাবার বিষের মতন।

প্রিয়রঞ্জন বাড়ি ফিরে এসে সেই দৃশ্য দেখে রাগে একেবারে জ্বলে উঠলেন। কাছেই ছোটভাইকে দেখে বললেন, তুই শেষে এই কাণ্ড করলি? আমার বাড়িতে অলক্ষ্মী ডেকে আনলি? তোকে আমি এত করে বলে গেলাম–

চিররঞ্জন বাধা দিয়ে বলার চেষ্টা করলেন যে তিনি ঠিক নিজের ইচ্ছেয় ওকে ভেতরে আনেননি–বউদিই খাবার দিতে চেয়েছিলেন। প্রিয়রঞ্জন তা শুনলেন না। অনবরত বকতে লাগলেন। ছোটভাইয়ের অকর্মণ্যতা দোষ বিষয়েও খোঁটা দিতেও ছাড়লেন না। রাগলে তার জ্ঞান থাকে না। বার বার বলতে লাগলেন, আমার বাড়িতে এই উৎপাত! দয়াধর্ম যদি করতেই হয় বাইরে গিয়ে করলেই পারিস!

অনেক লোকজন সেখানে জমে গেছে। চিররঞ্জন আর দাঁড়াতে পারলেন না, মুখ নিচু করে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। নিজের ঘরে বসে রইলেন গুম হয়ে।

একটু বাদে হিমানী ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে-ঘরে ঢুকে বললেন, ওগো ওর মুখখানা যেন নীল হয়ে যাচ্ছে, আর বোধহয় বেশিক্ষণ নেই–

চিররঞ্জন বিরক্ত ভাবে বললেন, যা খুশি তোক। আমি কিছু জানি না।

তুমি যাবে না একবার?

না। আমি গিয়ে কী করর?

কী হল তোমার?

দাদা আজকাল প্রতি পদে পদে বুঝিয়ে দেন, এটা ওঁর নিজের বাড়ি, এখানে আমি কেউ নয়।

কখন আবার একথা বললেন?

রোজই তো বলেন। একটু আগেই তো সবার সামনে–

হিমানীর মুখে একটা বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল। ঝংকার দিয়ে বললেন, তা বলেন যদি, মিছে কথা তো কিছু বলেন না! তোমাকে থাকতে দিচ্ছেন, খেতে পরতে দিচ্ছেন এই তো যথেষ্ট।

আমিও তো দাদার অফিসের কাজটাজ দেখছি।

ছাই দেখছ! ও তো একটা ভুজুং ভাজুং দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন শুধু তোমাকে। তোমার ওপর কোন দায়িত্বটা থাকে? কত করে তখন বললাম, আমার বাপেরবাড়িতেই থাকতে। বাবা কোনও দিন যত্নআত্যির ত্রুটি করেছেন?

চিররঞ্জন রেগে উঠলেন। তীব্র গলায় বললেন, তোমার বাপেরবাড়িতে চিরকাল ঘরজামাই হয়ে থাকব নাকি? তোমার জন্য কি আমার মানসম্মানও রাখতে পারব না?

হিমানীও ঝঝের সঙ্গে বললেন, আর আমিই বুঝি তোমার দাদার বাড়িতে দাসীবাদি হয়ে থাকব সারা জীবন?

মোটেই তোমাকে দাসীবাদি করে রাখা হয়নি।

তুমি কতটুকু জানো? আমার ছেলেকে আমি ইচ্ছে মতন কোনও দিন কিছু খেতে দিতে পারি না পর্যন্ত।

একটি অর্থহীন মৃত্যুর পটভূমিকায় এদের মনের তিক্ততাগুলো বেরিয়ে আসছে। চিররঞ্জন আরও কিছু কঠোর কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। আর কোনও উত্তর দিলেন না। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাকে তো আরও বেশ কিছু দিন বেঁচে থাকতে হবে- কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচবেন? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ছাত্র বয়সের দিনগুলোর কথা। আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটি বাড়িতে থাকতেন, কলকাতায় তখনও কোনও সহায় সম্বল না থাকলেও দিনগুলো অনেক লঘু ছিল। মনে কত আশা ছিল। কখনও কোনও কারণে মনখারাপ হলেও ছাত্রের পিসিমা মলিনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই মন আবার ভালো হয়ে যেত। মলিনা প্রায় তারই সমান বয়সি ছিলেন- কী শান্ত, স্নিগ্ধ দুটি চোখ। মনখারাপ হলেই মলিনা ঠিক বুঝতে পারত, কাছে এসে বলত, আপনার কী হয়েছে আমাকে বলুন তো! চিররঞ্জনের তখন বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠত।

চিররঞ্জন অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, এবার কলকাতায় এসে এক দিনও আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া হয়নি। আঃ, এখন যদি মলিনার কাছে গিয়ে বসে থাকা যেত।

হিমানী তখনও বকাবকি করছিলেন বলে চিররঞ্জন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। নীচে তখন মুমুর্ষ স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড়। চিররঞ্জন কী ভেবে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে বললেন, একবার। আসবেন আমাদের বাড়িতে? এক্ষুনি?

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার হয়েছে বলুন তো!

চিররঞ্জন সব ঘটনা বললেন।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে সব শুনে বললেন, দেখুন, এটা একজন গৃহস্বামীর সমস্যা হতে পারে- কিন্তু ডাক্তারদের তো করার কিছু নেই?

আপনি চিকিৎসা করতে পারবেন না?

ডাক্তাররা তো ধন্বন্তরি নয় যে একজন মুমুর্ষ রুগিকে গিয়ে এক পুরিয়া ওষুধ দেব কিংবা একটা ইঞ্জেকশন দেব-আর অমনি সে হেঁটে চলে আপনার বাড়ির থেকে চলে যাবে? আর একটু অপেক্ষা করুন-তারপর মুদাফরাশদের খবর দেবেন।

আমি বলছিলাম, ওকে বাঁচানো যায় কিনা। আমি চিকিৎসার খরচ দেব।

ডাক্তার এবার রীতিমতন ব্যঙ্গ করে বললেন, এ কি ছেলেখেলা পেয়েছেন? চিকিৎসা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে তা হলে ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটবিছানা পেতে শোওয়ান-দেখাশুননা করার জন্য একজন লোক রাখুন। নাকি রাস্তায় ফেলে রেখেই চিকিৎসা? :

চিররঞ্জন তবু ডাক্তারটিকে নিয়ে এলেন। ভিড় সরিয়ে ডাক্তার স্ত্রীলোকটিকে একপলক দেখেই বললেন, আর কিছু করার নেই। আর কয়েক মিনিট, বড় জোর ঘণ্টা খানেক।

সুপ্রভা চোখের জল ফেলতে শুরু করেছেন। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি সরিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে। ছেলেমেয়েদের অকল্যাণের আশঙ্কাতেই তার বুক। কাঁপছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার কাছে ওর অন্ন পাওয়া ছিল, তাই মরার আগে এখানে না এসে পারেনি। হিমানীরও চোখে জল।

মৃত্যুর ঠিক আগে স্ত্রীলোকটির চৈতন্য ফিরে এল। সে জড়ানো গলায় বলল, ওগো, আমাকে বাড়িতে দিয়ে এসো। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে বাড়িতে রেখে এসো।

চিররঞ্জন মুখ ঝুঁকিয়ে বললেন, ও মেয়ে, এখন ভগবানের নাম করো। বলো, কালী-তারা-ব্রহ্মময়ী-

স্ত্রীলোকটি বললেন, বাবু, আমরা মোছলমান। ওসব তো জানি না।

মোছলমান শুনে প্রিয়রঞ্জন একেবারে আঁতকে উঠলেন। লিগ মিনিস্ট্রির আমলে হিন্দুর বাড়িতে মুসলমান মড়া-এতে আবার কোন বিপদ হবে কে জানে। তিনি বললেন, কী। সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! মোছলমান তো আমার বাড়িতে কেন? নাজিমুদ্দি-সুরাবর্দির বাড়িতে যেতে পারলে না? তারা কত বড়লোক-

চিররঞ্জন বললেন, দাদা, ওকে একটু শান্তিতে মরতে দাও!

তারপর স্ত্রীলোকটির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, এই সময় তোমাদের মুখে গঙ্গাজল দেবার নিয়ম আছে কিনা জানি না। তুমি তোমাদের ভগবানের নাম করো। বলো, হে আল্লা, হে খোদা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দাও।

স্ত্রীলোকটি বলল, নিয়াম, নিয়ামৎ রে-

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে বিরাট শব্দে কয়েকটি মিলিটারি গাড়ি যাওয়ায় সবাই চমকে সেই দিকে চোখ ফেরায়। তাই মৃত্যুর মুহূর্তটি কারোকে দেখতে হয়নি।

৫২. আমরা অনেক মৃত্যু দেখেছি

আমরা অনেক মৃত্যু দেখেছি। যে-যুগে আমরা জন্মেছি, সে-যুগ মৃত্যুতে আকীর্ণ। অবশ্য মানুষের ইতিহাসই তো মানুষ মারার ইতিহাস। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এসব তো এ-দেশের নিত্যসঙ্গী। তবু এসবেরও পরে মানুষের সৃষ্টি করা কারণে হাজার হাজার মানুষ মরে। সুদূর পোল্যান্ড দেশ সম্পর্কে হিটলারের মনে একটা শখের উদয় হল, সেই কারণে মুর্শিদাবাদের একটা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যাক না, কী আসে যায় তাতে! পৃথিবীতে এত জন্তুজানোয়ার মারছে মানুষ, স্বার্থের কারণে কিছু মানুষকেও যে মারবে-এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? কোনও রকম প্রাকৃতিক বাধা তো নেই। তবু যে মৃত্যুর এত প্রতিবাদ, যুদ্ধ থেমে যাবার পরই শান্তির জন্য চ্যাচামেচিতার একমাত্র অর্থ বোধহয় এই, আমাকে মেরো না, আমাকে বাঁচতে দাও।

মৃত্যু দিয়ে পরিবেষ্টিত এই জীবন এত মোহময়। যে-কোনও মুহূর্তে খেলা শেষ হয়ে যেতে পারে, তবু এই খেলা থেকে বাদ পড়তে ইচ্ছে করে না। সেই কবে থেকে শুরু হয়েছে এই খেলা। ছিলাম মাতৃগর্ভে, এক তরল সমুদ্রে নারায়ণের মতন ভাসমান। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, তামস দিন রাত্রি, শুধু অবিরাম শুনতে পাই একটা দুপ দুপ শব্দ। কোথা থেকে সেই শব্দ আসে জানি না, কোথায় আদি জানি না, বোধ নেই, দৃষ্টি নেই, শুধু সেই শব্দ।

তারপর একদিন সেই তরল সমুদ্রে আলোড়ন ওঠে। যে-রক্ষণশীল দেওয়াল আমাকে ঘিরে রেখেছিল, হঠাৎ সেই দেওয়াল প্রবল শক্তিতে আমাকে চেপে ধরে। কেন এই শাস্তি, কেন ওই সুখশয্যা থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবার উদ্যোগ। মাথা টু দিয়ে বেরিয়ে আসি, মুখে অসহ্য কষ্টের চিহ্ন নিয়ে। সেই কষ্ট সামলাবার জন্য আমাকে নিশ্বাস নিতে হয় এই রোগভোগ জীবাণু ও শত্রুতে ভরা পৃথিবীর হাওয়ায়। দম ছেড়ে কান্না বার করতে

আমার পাঁচ-ছ' সেকেন্ড সময় লাগে। কেউ আমার কষ্ট বোঝে না, আমার কান্না দেখে কাঁদে না, তারা হাসে। আমি হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানাই, কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে? কেউ ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবে না। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এ রকম প্রতিবাদ জানিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমার নাভির কাছে ফুল ফুটে ওঠার অনুভূতি হয়। এখন আমি একটা আলাদা অস্তিত্ব–এখন আমিও সৃষ্টিকর্তা। আমিও একদিন নতুন প্রাণের সৃষ্টি করতে পারব। কিংবা, সামান্য অঙ্গুলি হেলনে অন্যের প্রাণ বিনষ্ট করে দেব। আমি এসেছি। সেই মুহূর্তে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ব্রহ্মার নিদ্রার মতন আমারও ঘুমের এক একটি মুহূর্তে কল্পান্ত পার হয়ে যায়। আবার জেগে উঠে দেখি, এ-পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। আমার খিদে পায়।

আমি সেই ঘুম থেকে জেগে না উঠতেও পারতাম। আমি মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যুতে নীলবর্ণ হয়েও বেরোতে পারতাম। কিংবা রক্তমাখা একটা মাংসপিণ্ড হয়ে আমার স্থান হতে পারত ডাষ্টবিনে। সে রকম কিছু হয়নি। আমি এসেছি। তা হলেও মৃত্যু আমার সব সময়ের সঙ্গী। আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় প্রকৃতি–আবার এই প্রকৃতিই সামান্য সুযোগে আমাকে মেরে ফেলবে। এসব জেনেশুনেও বেঁচে থাকার কী অদ্ভুত নেশা মানুষের।

সব মানুষ তার জীবনের অনিশ্চয়তার কথা জানে, তবু ভুলে থাকে। এটাও প্রকৃতির খেয়াল যে মানুষকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে রাখবে। শুধু এক এক সময় মনে হয় না জন্মালেই বা কী হত।

আমার কৈশোরে আমি দেখেছি দেশ জোড়া অনাচার ও মৃত্যুর তাণ্ডব। তবু সেই সব দৃশ্যও তো আমাকে সর্বাঙ্গীন ভাবে বিমর্ষ করে তোলেনি। সময় পার হয়ে যায়, আমরা সব ভুলে যাই। দু-একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনার স্মৃতিই জ্বলজ্বল করে।

জীবনে তিন বার আমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছি। মানুষ কেন আত্মহত্যা করতে চায়, তা আমি জানি না। আমি শুধু নিজের কথাই জানি। তবে, এটুকু সাধারণ ভাবে বলা যায়

যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা সচরাচর আত্মহত্যা করে না, এই ঝোঁকটা দেখা যায় কৈশোর-যৌবনেই বেশি। আমি প্রথম বার চেষ্টা করি আমার পনেরো বছর বয়সে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পড়েছে। হিটলার এবং নেতাজির বেঁচে থাকা বা মৃত্যু সম্পর্কে গুজবের অন্ত নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের বিচার হবে লাল কেল্লায়। বিজয় উৎসবের জন্য প্রত্যেক স্কুলে স্কুলে মিষ্টি বিতরণ করে লম্বা ছুটি দেওয়া হয়েছে। সেবার আমি বিষ্ণুদের সঙ্গে দেওঘর বেড়াতে গেলাম। বিষ্ণুদের সঙ্গে আমাকে বেড়াতে যেতে দেওয়ার ব্যাপারে বাবার বরাবরই একটা আপত্তি ছিল। কিন্তু বাবা এখন আর জোর দিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না। তা ছাড়া বিষ্ণুদের সঙ্গে আমার এতই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে যে আপত্তি করার তেমন প্রশ্নই ওঠে না। বাবা আমাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে দিলেন আসবার সময়ে।

দেওঘরের বম্পাস টাউনে বিষ্ণুদের কোন আত্মীয়ের বাড়ি। বাড়িখানা বিরাট। বাগানে অজস্র ডালিয়া, গোলাপ, ইউক্যালিপটাস ও আতা গাছ। এসেছেও বিরাট একটি দল। বিষ্ণুর মা-বাবা, রেণুর মা, ছোটকাকা, অংশু আর রেণু, তিনজন ঠাকুর-চাকর। আমার আর বিষ্ণুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনেই। আমাদের একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে সকালে-সন্ধ্যায় আমাদের নিয়মিত পড়াশুনো করতে হবে।

জীবনে মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার চেয়ে শক্ত কিছু নেই। আমি পড়াশুনোয় খুব একটা খারাপ ছিলাম না-ক্লাসে ওঠার পরীক্ষায় কোনও বারই তো আটকে যাইনি, তবু ম্যাট্রিক পরীক্ষার কথা ভাবলেই মনে হত ফেল করব। এ যেন লটারি। কেন না, আমাদের আগের বছরে জীমূত ফেল করেছিল। জীমূত আমার থেকে অনেক বেশি ঝকঝকে ছেলে, কত সুন্দর ভাবে সাজিয়ে কথা বলতে পারে, ইংরেজি গল্পের বই পড়ে ডিকশনারি না দেখে, তবু সে অঙ্কে ফেল করেছিল।

বিষ্ণুর অবশ্য আত্মবিশ্বাস বেশি। ও শুধু ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়ার কথাই চিন্তা করে না-ও স্ট্যান্ড করার কথা ভাবে। পড়াশুনোয় বিষ্ণুর মনোযোগও অনেক বেশি। আমার মা আমাকে

পড়াশুনোর জন্য ইদানীং প্রায়ই বকাবকি করতেন। কখনও কখনও বলতেন, বিষ্ণুকে দেখে শিখতে পারিস না? ওর পা-ধোওয়া জল খা। অথচ বিষ্ণুর চেয়ে যে আমি অঙ্ক ভালো জানি সে কথা কেউ জানে না।

চমৎকার হালকা সব দিন। বাতাসে ধুলোবালি নেই, আকাশ নম্র নীল। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় নাকে আসে শুকনো পাতার সুগন্ধ।

ভোরবেলা উঠে বাড়িসুষ্ঠু সবাই বেড়াতে যায়। এটা বিষ্ণুর বাবা একেবারে নিয়ম করে দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যের কারণে। স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে এসে রোজ না হাঁটলে শরীর ভালো থাকে না। বেশির ভাগ দিনই আমরা নন্দন পাহাড়ের দিকে যেতাম। কমপিটিশান দিতাম কে আগে উঠতে পারে। প্রচণ্ড দৌড়োদৌড়ি করে ওপরে উঠে হাপাতাম। আমাদের আরাম দেবার জন্য আকাশ তখন ঠান্ডা সুবাতাস পাঠিয়ে দিত। দূরের ধানখেত হলুদ-সবুজ শতরঞ্চির মতন।

নন্দন পাহাড়ের ওপরটায় দাঁড়ালে দূরে একদিকে দেখা যায় ডিগরিয়া পাহাড় আর একদিকে ত্রিকূট। এই দুই পাহাড় সম্পর্কে আমরা কত রকম গল্প শুনতাম। ডিগরিয়া পাহাড়ে নাকি কেউ কখনও উঠতেই পারে না। ভারতীয়দের তৈরি প্রথম বোমা পরীক্ষার জন্য ফাটানো হয়েছিল ওই পাহাড়ে। যে বাঙালির ছেলেটি বোমাটি নিয়ে গিয়েছিল, সে সেই বিস্ফোরণে মারা যায়, কিন্তু তার দেহটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। এই গল্প বললেন বিষ্ণুর বাবা। ডিগরিয়ার তুলনায় ত্রিকূট পাহাড় বেশি উঁচু হলেও মানুষ উঠতে পারে।

একদিন বিষ্ণু আর আমি দু'খানা সাইকেল নিয়ে ঘুরে এলাম ত্রিকূট পাহাড়। অংশু সাইকেল চালাতে জানে না-আমরা ওকে পেছনে ক্যারি করবার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় একজনকে পেছনে বসিয়ে সাইকেল চালানো অসম্ভব-তাই ওকে নামিয়ে দিয়ে গেলাম। অংশু কথা বন্ধ করে দিল আমাদের সঙ্গে।

কোনও গাইড সঙ্গে না নিয়েই ত্রিকূট পাহাড়ের একটা চূড়ায় উঠেছিলাম বিষ্ণু আর আমি। আমাদের অভিযাত্রী হবার সেই প্রথম পদক্ষেপ। বিষ্ণু দারুণ উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু

পাহাড়ের অনেক উঁচুতে এক পাল মোষ দেখে আমি একটু হতাশ হয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বুনো মোষ, পরে দেখলাম সঙ্গে রাখাল রয়েছে। যে-পাহাড়ে মোষরাও উঠতে পারে-সেই পাহাড়ে অভিযান করার কৃতিত্ব কোথায়!

প্রাতভ্রমণের পর বাড়িতে এসে জলখাবারের পর্ব। তারপর আমি আর বিষ্ণু পড়তে বসি। আমাদের দেখাদেখি রেণু আর অংশুও বইখাতা নিয়ে আসে। কিন্তু ওরা নীচের ক্লাসে পড়ে বলে ওদের আমরা পাত্তা দিই না। তাড়া দিয়ে বলি, যা, যা, এখানে বিরক্ত করিস না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমি আর বিষ্ণু বাড়ির মধ্যে থাকি না। বাগানে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে আমরা আস্তানা বানিয়ে নিয়েছি। সেখানে শুয়ে থাকি। শুকনো ইউক্যালিপটাস পাতা গুঁড়ো করে নাকের কাছে গন্ধ শুকি। আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে এত ভালো লাগে যে মনখারাপ হয়ে যায়।

একথাও ঠিক যে, তখন মাঝে মাঝেই আমার খুব মনখারাপ হয়ে যেত। সেই মনখারাপের আমি কোনও কারণই খুঁজে পাইনি। মা বাবাকে ছেড়ে থাকবার জন্য আমার মনখারাপ হবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তখন আমার পনেরো বছর বয়স-তখনই মা বাবার সঙ্গে আমার একটু একটু করে দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে'বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতেই আমার বেশি ভালো লাগে। দেওঘরে বন্ধুদের সঙ্গে এত হইচইয়ের মধ্যেও আমার হঠাৎ হঠাৎ মনখারাপ লাগত। ঘরের মধ্যে সবাই মিলে খুব গল্প হচ্ছে হয়তো আমি এক ফাঁকে সেখান থেকে চলে যেতাম। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় সাদা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে ভাবতাম, আমাদের দুঃখ দেবার জন্যই এই ফুলটা ফুটেছে।

বিষ্ণুর ছোটকাকা সেই অবস্থায় আমাকে দু-এক বার দেখে ঠাট্টা করে বলতেন, আমাদের কবিমশাইয়ের কান্ড দেখো! কী হে বাদলকুমার, কবিত্ব একেবারে উথলে উঠল নাকি?

আমি ওঁকে অনেক বার বলেছি যে আমার নাম বাদলকুমার নয়, বাদলরঞ্জন। কিন্তু সে কথা ওঁর মনেই থাকে না।

সন্ধ্যার সময় বড়রা আলাদা ভাবে বেড়াতে যেতেন। ছোটরা বাড়িতেই থাকবে। কিংবা ছোটরা দলবেঁধে বাইরে গেলেও সাতটার মধ্যে ফিরতে হবে। সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনো বিশেষ হত না- তখন আমরা নানা রকম খেলাধুলোর উদ্ভাবন করতাম। ভূত সাজার খেলাটা ছিল আমাদের খুব প্রিয়। রেণুর সাংঘাতিক ভূতের ভয়- আর ওকে ভয় দেখিয়েই আমাদের বেশি মজা।

খাওয়াদাওয়ার পর অনেক রাত জেগে গল্পের বই পড়তাম বিষ্ণু আর আমি। তখন আমরা বড়দের বইয়ের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছি। বিষ্ণু শরৎ চাটুজ্যে শেষ করছে। আমি ছিলাম ডিটেকটিভ গল্পের পোকা-দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরী সিরিজ, শশধর দত্তের মোহন সিরিজ একটার পর একটা গিলছি। মোহন রমাকে প্রায়ই বলত, 'ভয়াতুরা কপোতী আমার'- কী ভালো যে লাগত এই উৎপ্রেক্ষাটা! চুপি চুপি আমি এটা একটা কবিতাতেও ব্যবহার করে ফেলেছিলাম পর্যন্ত।

বেশ তো কাটছিল দিন। এর মধ্যে আমার একটু জ্বর হল। সামান্য জ্বর, আর কোনও অসুবিধে হয় না, শুধু শরীর ম্যাজম্যাজ করে। কিন্তু এতেই বাড়িসুষ্ঠু সবাই এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে আমার খুব লজ্জা করতে লাগল। এই সময় জ্বর হবার কোনও মানে হয়! কোনওক্রমে জ্বরটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না! কিন্তু জ্বরটা চলতেই লাগল তিন-চার দিন, সেই সঙ্গে পেটে ব্যথা! জ্বরের কথা লুকোনো যায় না কিন্তু পেট ব্যথার কথাটা আমি কারোকে বলিনি। এক এক সময় আমার মনে হত এর থেকে মরে যাওয়াই ভালো। সেই আমার প্রথম মৃত্যুচিন্তা।

একদিন দুপুরবেলা আমি একা একা শুয়ে বই পড়ছি। চাদর দিয়ে আমার শরীর ঢাকা, বাইরে রোদ ফটফট করছে, তবু আমার একটু একটু শীত বোধ হয়। বিষ্ণু আর অংশু কোথায় জানি না হয়তো বাগানে গাছতলায় শুয়ে আছে কিংবা জসিডিতেও যেতে পারে। রেণু ওর মা আর কাকা-কাকিমার সঙ্গে এইমাত্র গেল বৈদ্যনাথ মন্দিরে পূজো দিতে। ছোটকাকা তার নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন, এইখান থেকেও শুনতে পাওয়া যায় তার নাকডাকার শব্দ।

বইটা পড়তে পড়তে আমার চোখ টনটন করছিল। একসময় বাগানের গেট খোলার শব্দে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম রেণু ছুটতে ছুটতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। একটু বাদেই রেণু যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি ডাকলাম, এই রেণু, শোন–

রেণু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বলল, কী রে?

আমি বললাম, আমাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা না।

রেণু ফিরে এল বাড়ির মধ্যে। জলের গেলাস হাতে আমার ঘরে ঢুকে বলল, তুই একলা একলা শুয়ে আছিস? ছোড়দারা কোথায়?

কী জানি। বাগানে নেই?

না তো।

তা হলে বোধহয় জসিডি গেছে। আজ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এখান দিয়ে ট্রেনে করে যাবেন, ছোটকাকা বলছিলেন–

বাড়িতে আর কেউ নেই?

ছোটকাকাই তো রয়েছেন! নাকডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?

আমি বসব তোর কাছে?

রেণুর এই কথাটায় আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। একলা একলা খুব মনখারাপ লাগছিল। অথচ অন্য কেউ যদি আমার জ্বরের জন্য সহানুভূতি দেখিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে চাইত–আমি তাতেও লজ্জা পেতুম, আমার জন্যে কারোকে আটকে রাখা পছন্দ করতুম না। কিন্তু রেণু সম্পর্কে সেকথা মনে হল না।

তবুও আমি ক্ষীণ গলায় বললুম, তুই পুজো দিতে গেলি না? ফিরে এলি যে?

রেণু বলল, আগে একদিন তো গেছি। মন্দিরে বড্ড ভিড় হয়, আমার ভালো লাগে না।

কয়েক বছর আগে রেণুর যখন ঘন ঘন অসুখ করত, তখন আমি ওর বিছানার পাশে। বসে ওকে গল্পের বই পড়ে শোনাতাম। জানি না, সে কথা রেণুর মনে আছে কিনা। এই কয়েক বছরে রেণু অনেকটা বদলে গেছে। চোখে চশমা নেওয়ায় মুখখানা অন্য রকম দেখায়-মাথার কেঁকড়া চুল এখন কোমরের কাছ পর্যন্ত নেমেছে। এখনও ফ্রক পরে রেণু, কিন্তু দু-এক দিন শাড়ি পরতেও দেখেছি। আজ পরে আছে একটা গোলাপি রঙের ফ্রক। রেণু পড়াশুনোয় খুব ভালো, প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়।

আমি উঠে বসে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম। রেণুকে বললুম, তোর চশমাটা খুলে ফ্যাল তো! চশমা ছাড়া তুই দেখতে পাস না?

দূরের জিনিস ভালো দেখতে পাই না। কাছের জিনিস দেখতে পাই।

আমি তো কাছেই বসে আছি।

রেণু আমার চোখের দিকে তাকাল। আমিও ওর চোখে স্থির দৃষ্টি মেলে রইলাম। এই রকম ভাবে দু'জনে তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। যেন আমরা স্ট্যাচুর খেলা খেলছি।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম, রেণুর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ অন্য সময় অনর্গল কথা বলি। এখন কিছু বলতে গেলেই মনে হচ্ছে, এটা বলা ঠিক হবে না। রেণুও তো কোনও কথা বলছে না।

একটু বাদে বললাম, তুই শুধু শুধু আমার জন্য এখানে বসে রইলি। কাকিমাদের সঙ্গে গেলে কত কিছু জিনিসপত্তর কেনাকাটি হত।

রেণু বলল, মোটেই আমি শুধু শুধু বসে থাকছি না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তাই বসে আছি।

তোকে দেখে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল।

মন খারাপ ছিল বুঝি?

হুঁ। তোকে দেখলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়।

সত্যি?

ঠিক ঠাট্টার সুরে নয়, কথাটা বলতে গিয়ে রেণু একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর বলল, আমারও মাঝে মাঝে খুব মনখারাপ হয়ে যায়।

কেন?

কী জানি!

আমি একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, রেণু, তুই আর আমি সারা জীবন বন্ধু থাকব। তুই রাজি আছিস?

রেণু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হু।

আমাদের কখনও ঝগড়া হবে না। তুই যা বলবি, আমি শুনব। আমি যা বলব, তোকেও শুনতে হবে। রাজি?

হুঁ।

আমরা কেউ কারওর ওপর রাগ করতে পারব না। রাগ করলেও ক্ষমা করে দেব আবার। তাই না!

হুঁ।

তুই শুধু হুঁ হুঁ বলছিস কেন? আর কিছু বলছিস না যে?

তুই আমাকে কখনও ভুলে যাবি না?

ভুলব কেন? ভুলে যাওয়া কি সম্ভব নাকি!

না, সত্যি করে বল, ভুলে যাবি কি না!

বলছি তো–

নিজের বুকে হাত দিয়ে বল।

রেণু মাঝে মাঝে এই রকম পাগলামি করে। কখন যে কোন কথাটা কী ভেবে বলে, তা বোঝার উপায় নেই। আমরা দুজনে কাছাকাছি বসে আছি, সারা জীবন আমাদের দেখা হবে-এর মধ্যে আবার ভুলে যাবার কথা আসে কী করে? তবু রেণুর এই ধরনের পাগলামিই আমার অসম্ভব ভালো লাগে।

আমি ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আমার মুখে বুলোতে লাগলাম। আমার জ্বরতপ্ত মুখে ওর হাতের স্পর্শ অসম্ভব ঠান্ডা লাগল। আমি বললাম, রেণু, তোর হাতে কী সুন্দর। গন্ধ!

রেণু লজ্জা পেয়ে বলল, যাঃ! আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দেব?

না। আমার অসুখ সেরে গেছে।

এখন তো জ্বর রয়েছে।

থাকুক।

আমার মনে হল, রেণুর সমস্ত শরীরটা একটা অয়স্কান্ত মণি। কত ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি, অথচ আজ সবকিছুই অন্য রকম। আমি ঝুঁকে এসে রেণুর ঘাড়ে, গলায়, কপালে, গালে চুমু খেতে লাগলাম।

রেণু বিস্মিত ভাবে বলল, এ কী?

তারপর একটু সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কি খারাপ কাজ?

আমি তীব্র গলায় বললুম, না।

তুই কী করে জানলি?

আমি ঠিক জানি।

রেণু আবার কাছে এগিয়ে এসে বসল। আমি রেণুর গলা জড়িয়ে ধরলাম। আমার মনের মধ্যে একটা উথালপাথাল চলছিল। আমি কী করছি, নিজেই জানি না। আমি ব্যগ্র ভাবে রেণুর বুকের দিকে তাকিয়ে আছি। আমি রেণুর বুকের মাঝখানে হাত রেখে বললাম, আমি তোর বুক ছুঁয়ে বলছি, তোকে কখনও ভুলব না।

রেণু আমার হাত সরিয়ে দিতে গেল। আমি ওর বুকে আমার মুখটা ঘষতে লাগলাম।

রেণু বলল, এটা কি খারাপ কাজ?

না।

তোকে কে বলেছে?

আমি বইতে পড়েছি–

যদি বইতে মিথ্যে কথা লেখে!

বইতে কখনও মিথ্যে কথা লেখে না। তোর ভালো লাগছে না?

কী জানি?

তুই নিজে জানিস না? আমার অসম্ভব ভালো লাগছে। দেখ, আর একবার করছি।

কিন্তু এটা যদি খারাপ কাজ হয়?

কক্ষনও নয়।

ইচ্ছে হল রেণুকে আমার বুকে জড়িয়ে একেবারে পিষে ফেলি। ওর ছোট্ট শরীরটা আমার বুকের মধ্যে চলে যাক। রেণুকে শুইয়ে ফেলে আমি ওর ফ্রকের নীচে মাংসল বুক দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম।

রেণু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু বাদে আমার কাছ থেকে পিছলে সরে গিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, এটা নিশ্চয়ই খারাপ কাজ। আমি ঠিক জানি।

না, রেণু শোন–

কিছু শুনব না। এটা খারাপ কাজ, এটা অসভ্য, আমি ঠিক জানি–

রেণুর মুখে খানিকটা ভয় এবং খানিকটা ছেলেমানুষি অহংকার মেশানো। সেই মুহূর্তে ওকে 'ভয়াতুরা কপোতী আমার' বলার খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু লজ্জা পেলাম।

রেণু চুল ঠিক করতে করতে বলল, খারাপ ছেলেমেয়েরা এইসব অসভ্য জিনিস করে। তুই যদি এ রকম আর কখনও করিস, তা হলে তোর সঙ্গে আমি মোটেই বন্ধুত্ব করতে চাই না।

রেণু, প্লিজ, চলে যাস না।

তোর সঙ্গে আজ আমি কথা বলব না!

তারপর কয়েক ঘণ্টা আমার যে কী ভাবে কাটল, তা আর কেউ জানবে না। সন্ধ্যার পর আমি ঠিক করলাম, রেণুর চোখে যখন আমি ছোট হয়ে গেছি, তখন আর আমার বেঁচে

থাকার কোনও মানে হয় না। শুধু এই কারণটুকু নয়, রেণুকে ছাড়িয়ে আমার বিষাদ আরও পরিব্যপ্ত হয়ে গেল। আমার যাবতীয় মনখারাপ এক হয়ে মিলল। আমার বদ্ধমূল ধারণা হল, আমার বেঁচে থাকার কোনও মূল্য নেই, এই পৃথিবীতে আমি অবান্তর। সেই রাত্তিরেই আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করি।

মরিনি যে তা বলাই বাহুল্য। না হলে, পরে আরও দু'বার আমি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কী করে?

৫৩. সকালবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্য

সকালবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘরের বাইরে আসা যায়। প্রাতঃকৃত্যের জন্য গোসলখানার বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় আন্ডার ট্রায়াল বাবুরা। নানা রকম রস রসিকতা গুঞ্জরিত হয়। জেলের জীবন অনেকটা সহ্য হয়ে গেছে।

কয়েক জনকে দেখা যায় চাতালে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতে। প্রিয়লালবাবু একটি স্কুলের ড্রিলমাস্টার ছিলেন, তিনি এখানেও মাস্টারি ভঙ্গিতে অন্যদের সঠির ব্যায়ামের নির্দেশ দেন।

অবশ্য সোস্যালিস্ট দলের ছেলেরা তখন আলাদা দাঁড়িয়ে থাকে। জাতিভেদের মতনই জেলখানার মধ্যে পার্টিভেদ খুব প্রবল। এক পার্টির লোক অন্য পার্টির কারওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে সেই নিয়ে রীতিমতন কানাকানি শুরু হয়ে যায়। যেমন, প্রৌঢ় ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ইন্দ্রজিতের অন্তরঙ্গতা অনেকেই রীতিমতন খারাপ চোখে দেখছে। ধনঞ্জয়বাবু একটি দিনও ইন্দ্রজিৎকে না দেখে থাকতে পারেন না। ইন্দ্রজিৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলে তিনিও অসুখের ছুতো করে কিংবা ইচ্ছে করে অসুখ বাধিয়ে হাসপাতালে গিয়ে তবে ছাড়লেন।

তবে দু'জন মানুষকে সবাই খাতির করে। বৃদ্ধ শর্মাজি ভোর হতে-না-হতেই ভজন গান শুরু করে দেন। তাঁর গলা ভারী সুন্দর। একটার পর একটা গান গেয়ে চলেন তিনি, ওয়ার্ডার, মেটরাও চুপ করে শোনে। দূরের ব্যারাক থেকে অনুরোধ আসে, শর্মাজি, আর একখানা, আর একখানা! শর্মাজির কোনও ক্লান্তি নেই।

শর্মাজি মুঙ্গের জেলার লোক। বাংলাও খুব ভালো জানেন। বেদ স্তোত্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের বহু গান তার জানা-এমন সংগীতপাগল লোক কেন রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন কে জানে। প্রায় প্রত্যেক দিন ভোরবেলাই তিনি শুরু করতেন এই গানটি দিয়ে:

...যুগ যুগান্তর তব তপোবন পর কতহি ধরম বাখন।
বিমান কম্পই উঠত নিতি গম্ভীর ঝঙ্কার তান।।
যমুনাকিতটপর কৈসন মনোহর শ্যামকী বশী বয়ান।
যোহি দরস কিয়া যমুনাকি পানিয়া চঞ্চল চলত উজানা।।
অব ওহি ভারত পর-পদ লাঞ্ছিত বিহীন যশ বীর্ষ মান।
সোহি দরশ কিয়া দিন হুঁ রাতিয়া ঝরত মেরা নয়ান।।

এই গানটা বহু বার শুনতে শুনতে অনেকেরই মুখস্ত হয়ে গেছে। রাজবন্দিদের মধ্যে যারা দেশকে মাতৃকা রূপে ধ্যান করে না, তাদেরও অনেককে গুণ গুণ করতে শোনা যায় এই গান। গানটা কার লেখা জিজ্ঞেস করলে শর্মাজি হাত উলটে বলেন, জানি না। তাতেই অনেকের ধারণা হয়, ওটি ওঁরই রচনা।

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে তার প্রিয় গান:

'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক

মুখ তুলে আজি চাহ রে।'

আর একজন মানুষ অতুলপ্রসাদ রায়। কোনও দিন কেউ তার মুখে একটাও অভিযোগের কথা শোনেনি। কোনও দিন কারোকে উপদেশ কিংবা ভর্ৎসনা করেন না। দীর্ঘদেহী পুরুষ, মাথার চুল কাঁচাপাকা। তিনি নিজের রসে নিজে মজে আছেন সব সময়। তার চেহারা ও ব্যক্তিত্বে একটা সর্বাত্মক সতোর পরিচয় স্পষ্ট। সতোর প্রতি মানুষের এখনও বাধ্যতামূলক শ্রদ্ধা আছে-তাই অতুলপ্রসাদের কাছে সকলেই একটু অবনত হয়ে যায়।

রাজনৈতিক কর্মী মাত্রেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নয়, বিশেষত জেলখানায় এলে তাদের অনেক ক্ষুদ্রতা, লোভ ও স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে পড়ে। প্রাণ তুচ্ছ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে লোক, কারাগারে এসে সে সামান্য খাবারদাবার প্রভৃতি নিয়ে এমন রেষারেষি করে যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অনেকের যৌন অতৃপ্তিও এখানে এসে হঠাৎ প্রকাশ পেয়ে যায়। অতুলপ্রসাদ এখানে আছেন বলেই তার তুলনায় বেশ কয়েক জনকে মানুষ হিসেবে অতি তুচ্ছ মনে হয়।

অতুলপ্রসাদ রায় জেলের বাইরে রীতিমতন বড় দরের নেতা ছিলেন, বি পি সি সি'র সদস্য ছিলেন অনেক দিন। কিন্তু জেলে এসে যেন রাজনীতি একেবারেই ভুলে গেছেন। এখানে কয়েকটি দলের নিয়মিত স্টাডি সার্কল বসে, অতুলপ্রসাদ তাতে যোগ দেন না। কেউ এসে ডাকলেও উদাসীন ভাবে হেসে বলেন, বুড়ো হয়ে গেছি, আমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে-এখন নতুন নতুন ছেলেরা কাজের ভার নেবে।

প্রত্যেক দিন ভোরবেলা দেখা যায়, তিনি চাতালের এক প্রান্তে যে কয়েকটি ছোট ছোট গাছ রয়েছে, সেগুলোতে জল দিচ্ছেন, গোড়া নিড়িয়ে দিচ্ছেন। সেগুলো ফুল গাছও না, দামি কোনও গাছও না-নেহাতই আগাছা-তবু সেগুলির প্রতিই তার অসীম ভালোবাসা।

জেলখানার নিয়মকানুনের কড়াকড়ি এখন অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। দেশে আর কোনও আন্দোলন নেই। অনেক দিন নতুন বন্দি আসে না। জেলখানার মধ্যে বন্দিদের গতিবিধি এখন আর তেমন নিয়ন্ত্রিত নয়। ছোট ছোট সেলের বদলে ব্যারাকের মতন বড়

ঘরে একসঙ্গে অনেকে মিলে থাকে-নিঃসঙ্গতার শাস্তিটুকু অন্তত পেতে হয় না। লোহার সানকি হাতে নিয়ে আর দাঁড়াতে হয় না খাবারের লাইনে, সরকার এখন মাথা পিছু টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছেবন্দিরা নিজেরাই ছোট ছোট দল করে নিয়ে নিজেদের খাবার রান্না করে খায়। কবে কী রান্না হবে, কিংবা কে কত ভালো রাঁধে-সেই আলোচনায় অনেকটা সময় কাটে। এক দল আরেক দলকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। আবার মাছের টুকরো কে ছোট পেয়েছে, কে বড় নিয়েছে-এই নিয়ে ঝগড়া লাগার ঘটনাও বিরল নয়।

বিকেলে কিছুক্ষণ খেলাধুলোর সুযোগ মিলেছে, অনুমতি পাওয়া গেছে বাইরে থেকে বই আনানোর। একটি দেওয়াল পত্রিকাও একদিন আত্মপ্রকাশ করল।

সূর্য এবং আরও সাত জনের বিচার শেষ হয়ে গেছে-এখন ওরা দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষায়। ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল হিসেবে ওদের সেলেই রাখা হয়েছে। তাতে অবশ্য ওদের তেমন অভিযোগ নেই। এ-জেলের সুপারিনটেনডেন্ট প্রকৃতই সজ্জন-প্রায়ই এসে ওদের সুযোগ সুবিধের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে যান। মাঝে মাঝে তিনি ঠাট্টা করে বলেন, কী মশাই, আপনারা পালা করে এক এক জন অসুখ বাধাতে পারেন না? তা হলে বেশি করে দুধ মাখন আর ডিম খাওয়াতে পারতাম।

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই। সূর্যর স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। তবে, দাড়ি কামায় না বলে তার মুখখানা অন্য রকম দেখায়।

মাসের পর মাস জেলের জীবন নিস্তরঙ্গ। শান্তিপ্রসাদ নামে একটি ছেলের হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেনি।

শান্তিপ্রসাদের মা মারা যাওয়ার খবর আসার পর থেকেই সে খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল। সবাই তাকে নানা কথায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, অতুলপ্রসাদ তাকে গীতা পড়ে শুনিয়েছেন। তবু শান্তিপ্রসাদ একদিন বাথরুমে যাবার সময় সূর্যকে ফিসফিস করে বলেছিল, রেডি থাকবেন, আমাদের জেল ভেঙে বাইরে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

কথাটা শুনেই সূর্যর খটকা লেগেছিল। বাইরে তাদের কোনও দল নেই, কারওর সঙ্গে যোগাযোগও হয়নি কারা হঠাৎ তাদের জেল ভেঙে বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

কিন্তু শান্তিপ্রসাদ দিনের-পর-দিন সেই অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে মেতে রইল। ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। একদিন রাত্তিরবেলা সে লোহার গরাদে প্রচণ্ড জোরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে চিৎকার করতে লাগল, এসে গেছে! এসে গেছে!

ওয়ার্ডবয় আর সেন্ট্রিরা ছুটে এল। অন্যান্য সেলের বন্দিরা উদগ্রীব হয়ে রইল খবর জানবার জন্য। শান্তিপ্রসাদের চিৎকারের বিরাম নেই। তার কপাল থেকে দরদর করে। রক্ত পড়ছে। জেলার সাহেব এলেন একটু বাদেই। দরজা খুলে তার চিৎকার থামাবার জন্য তাকে মারধরও করা হল–কিন্তু শান্তিপ্রসাদ তখন সবাইকে কামড়ে দিতে আসছে। তারপর ডাক্তার এসে জোর করে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে দিলেন ওকে। একদিন বাদে শান্তিপ্রসাদকে সরিয়ে নেওয়া হল এই জেল থেকে–কোথায় গেল কেউ জানে না।

সূর্য কিছু দিন ছিল ব্যারাকে অন্যদের সঙ্গে। তখনও সে বিশেষ সুখে থাকেনি। সে কোন দলের ছেলে, কী তার রাজনৈতিক বিশ্বাস–তা কেউ জানে না। তার সঙ্গে কথা বলেও কিছু বার করা যায় না। অন্য বন্দিদের মধ্যে সূর্যর পূর্ব-পরিচিত শুধু শংকরবাবু। তিনি এখন অন্য মতে বিশ্বাসী। সূর্যকে তিনি আগেও বিশেষ পছন্দ করতেন না এখানেও তাকে বেশি পাত্তা দিলেন না।

তবু, পূর্ব-পরিচিত বলেই সূর্য প্রথম প্রথম শংকরবাবুর কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিল। হাজারিবাগে যে-গুপ্ত দলটির সঙ্গে সূর্য একদিন পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল, সেই দলের লোকজন ছাড়া সূর্যর আর কোনও বন্ধু নেই, আর কারোকে সে চেনে না। শংকরবাবুর সঙ্গে সে হরকুমার, ব্রজগোপাল কিংবা যোগানন্দ সম্পর্কে কথা বলতে চায়। শংকরবাবু তাকে পাত্তা দেন না। বিদ্রূপ করে বলেন, আমি তখনই বলেছিলাম না, শুধু গুন্ডামি আর ডাকাতি করে দেশ স্বাধীন করা যায় না! সূর্য আহত হয়ে সরে আসে।

অন্য অনেকে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। বিশেষত তার সুন্দর চেহারা দেখে কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়, কেউ কেউ আবার ওই চেহারার জন্যই তার সঙ্গে একটু বিদ্রুপের সুরে কথা বলে। সূর্য তাদের উত্তর দেয় কঠিন অবজ্ঞায়। একদিন কী এক অজ্ঞাত কারণে একজন নেতৃস্থানীয় দাদার সঙ্গে সুর্যর মারামারি শুরু হয়ে গেল। দু'একটা কথার পরই সূর্য কষিয়ে দিল তার মুখে এক ঘুষি। তাঁর মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। এই ঘটনায় সবাই ছি ছি করতে লাগল সূর্যকে। রাজনৈতিক বন্দিদের এ রকম মারামারি বড়ই কেলেঙ্কারির কথাসাধারণ চোর-ডাকাত কয়েদিরা যে একথা শুনে হাসবে। সবাই একঘরে করল সূর্যকে।

তারপরই সূর্যকে আবার সেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই কেটে গেল টানা দেড় বছর। একাকিত্বে সূর্যর কোনও কষ্ট নেই। সে আশা করে আছে, তাকে আন্দামানে পাঠানো হবে। মৃত্যুদণ্ডের কথা সে চিন্তা করে না। মৃত্যুর আবার কোনও মানে। হয় নাকি? সে কিছুতেই মরবে না। তা ছাড়া, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, বেয়াল্লিশের আন্দোলনে ধৃত কারোকেই সরকার এখনও ফঁসি দেয়নি। যাদের মেরে ফেলার আগেই মেরে ফেলেছে। হাজারিবাগ জেলে কয়েক জন বন্দির রহস্যজনক মৃত্যুর কথা শোনা গেছে। এখনও ঢালাও ভাবে দেওয়া হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সূর্য আন্দামানেই যেতে চায়-এখানকার কারাজীবন তার পছন্দ হয়নি-দেখাই যাক না আন্দামানটা কী রকম। সুপারিনটেনডেন্টকে সে এই মর্মে অনেক বার অনুরোধ জানিয়েছে।

সূর্য অবশ্য জানত না, আন্দামানে বন্দি পাঠানো অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু দিনের জন্য সুভাষ বোস আন্দামান স্বাধীন করে সেখানে জাতীয় পতাকাও উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ধরা পড়ার পর প্রথম প্রথম সূর্যকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তার মুখ দিয়ে কথা বার করার জন্য কোনও বীভৎস পন্থাই তারা বাকি রাখেনি। সে-সব দিনগুলো এখন দুঃস্বপ্নের মতন মনে হয়। সেই অত্যাচারের সময় সূর্যর জেদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। সে

ভাবত, আবার সে জেল থেকে বেরিয়ে লড়াইতে নেমে পড়বে। কত দিন জেলে আটকে রাখবে তাকে–পালাবার পথ একটা বেরোবেই।

এখন সে বুঝে গেছে, আগামী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অন্তত তার বেরোবার। কোনও সম্ভাবনাই নেই। আন্দামান গেলেই বা কী হবে! আন্দামান থেকে কি কেউ কোনও দিন পালাতে পেরেছে? তাকে একলা একলাই কাটাতে হবে অনেকগুলি বছর। সে আর লড়াইয়ের কথা ভাবে না।

সূর্যর সেলে একটা জানলা আছে। এটা একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার, কারণ অধিকাংশ সেলই অন্ধকূপের মতন। জানলাটা এত উঁচুতে যে সূর্য লাফিয়েও সেটা ছুঁতে পারে না। অনেক বার চেষ্টা করে দেখেছে–এর ফলে তার হাইজাম্পে দক্ষতা বাড়লেও জানলা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি। জানলাটার বাইরে আকাশ দেখা যায় না। একটু দূরেই একটা উঁচু দেওয়ালের চৌকো অংশ শুধু চোখে পড়ে। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় শুয়ে থাকলে সেই চৌকো অংশটা ছোট কিংবা বড় হয়। দেওয়ালটাতে শ্যাওলা ধরা বর্ষার সময় আর রোদ্দুরে শ্যাওলার রং পালটায়।

জানলাটা থাকার একটা সুবিধে, বাইরের শব্দ বেশি আসে। বাইরের নানা রকম কথা সে শুনতে পায়, এমনকী জেলারের কোয়ার্টারের বাচ্চাদের কিংবা মেয়েদের গলার আওয়াজ কখনও কখনও ভেসে আসে। একদিন একটা শালিক এসে জানলার শিকে বসে সূর্যর দিকে খুব মনোযোগ সহকারে তাকিয়েছিল। সূর্য তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করল, রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিল–তবু উড়ে গেল শালিকটা, সাত দিনের মধ্যে আর এল না। তারপর আবার পর পর দুদিন এসে আবার কয়েক দিন একটানা ডুব। অদ্ভুত খেয়ালি পাখি।

সকালবেলা শর্মাজির গান শুনে সূর্যর ঘুম ভাঙে। কয়েকটা গান সে এতবার শুনেছে যে গানগুলোর সময় সেও ঠোঁট নাড়তে পারে। যদিও এত দূর থেকে শোনার জন্য সবক'টা শব্দ সে ঠিক জানে না। মুখটুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সে বই নিয়ে পড়তে বসে। এখন

সে ইচ্ছে মতন বই পায়। তার মধ্যে একটি অধ্যবসায়ী ছাত্র সুপ্ত ছিল বই পড়তে সে ক্লান্ত বোধ করে না। পড়তে পড়তে সে জানলার দিকে তাকায় বার বার, শালিকটার প্রতীক্ষা করে। লক্ষ্মীছাড়া শালিকটা যে রোজ আসে না–আবার যে-কোনও সময়েই আসতে পারে, এইটাই ওর একমাত্র আকর্ষণ।

বাবার কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি আসে। বাবার চিঠিগুলো সংক্ষিপ্ত এবং শুধু নানা রকম খবরে ভরা। ছেলের কাছে লেখা চিঠিতে বড়বাবু আবেগের আতিশয্য দেখাতে চান না। এবং নিজের বিষয়েও কিছুই লেখেন না। তাঁর চিঠির অনেক খবরই জেল কর্তৃপক্ষ কালো কালি দিয়ে কেটে দেয়। বাদলও মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। মাস দু'-এক আগে বড়বাবুর সঙ্গে ও একবার দেখাও করতে এসেছিল এখানে। বাদল বেশ বড় হয়ে গেছে।

একদিন সূর্য একটা চিঠি পেয়েছিল, সে চিঠিতে কোনও সম্বোধন নেই। শেষে নাম সই নেই। তবু সূর্যর বুঝতে অসুবিধে হয়নি, চিঠিটা কার লেখা। এ রকম চিঠি তাকে ইহ সংসারে শুধু একজনই লিখতে পারে। চিঠিটাতে লেখা ছিল:

'জেলখানার ভেতরটা কী রকম দেখতে হয় আমি জানি না। কিন্তু সব সময় আমি তোমার পাশাপাশি আছি। তুমি টের পাও না? আমি তোমাকে দেখতে পাই। আমি সব সময় তোমাকে খুব কাছে পাই। যদি জিজ্ঞেস করো কেন এবং কী ভাবে, বলতে পারব না। সবার মধ্যে বসে থেকেও মনে হচ্ছিল, কোনও এক জায়গায় ওই মানুষটি একান্তই আমার। আমার মতন করে একে আর কেউ জানে না। এই অনুভূতিটা সত্যি হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে, কিন্তু এমন ভাবনা আমাকে গভীর তৃপ্তি দেয়, বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

তুমি আমায় স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছ।'

চিঠিখানা সূর্য অন্তত একশো বার পড়ে ফেলল একদিনে। শ্রীলেখার মুখখানা তার মনে পড়ছে, আর সে চিঠিখানা মেলে ধরছে চোখের কাছে।

দু'দিন এ রকম চলার পর সে ভাবল, এ রকম করলে সে পাগল হয়ে যেতে পারে। এত বেশি আবেগ তার এই অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর। তখন সে চিঠিখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ছড়িয়ে দিল ঘরের মধ্যে। তারপর এক একটা টুকরো তুলে নিয়ে বাকি অংশটা মুখস্ত বলে যেতে লাগল। কিন্তু শ্রীলেখাকে কোনও উত্তর লিখল না।

সূর্য শুয়ে শুয়ে বুখারিনের লেখা 'হিস্টরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' বইখানা পড়ছিল- এই সময় অতুলপ্রসাদ তার সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার হাতে একটা ছোট্ট সাদা ফুল।

তিনি একদৃষ্টিতে সূর্যকে দেখতে লাগলেন। দরজার দিকে পা রেখে সূর্য উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, অতুলপ্রসাদের উপস্থিতি লক্ষ করেনি। লোহার শিকের বাইরে থেকে এই যুবকটিকে দেখতে দেখতে অতুলপ্রসাদ এক ধরনের মায়া অনুভব করলেন। তার মনে হল, বহু বইতে তিনি এই রকম দৃশ্যের বর্ণনা পড়েছেন কিন্তু সেই সব দৃশ্যের সঙ্গে বাস্তব চিত্রটি একেবারেই মেলে না। কারাগারে বন্দি তেজস্বী যুবকের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের তুলনা দিয়েছেন অনেক লেখক-। কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে কোনও মহৎ ট্র্যাজেডি নেই, আছে দারুণ অপচয়। এই সুকুমারকান্তি যুবকটির জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এই চার দেওয়ালের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। অতুলপ্রসাদ অকৃতদার, পুত্রস্নেহের কোনও অভিজ্ঞতা তার নেই-কিন্তু সূর্যকে দেখে বার বার তাঁর নিজের যৌবনের কথা মনে পড়তে লাগল।

তিনি মৃদু গলায় বললেন, সূর্যকুমার, কেমন আছ?

সূর্য তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বই মুড়ে রেখে এগিয়ে এসে বলল, আমি ভালো আছি, আপনি হঠাৎ এ-দিকে যে!

অতুলপ্রসাদ বললেন, আমাকে তো সব দিকেই যেতে দেয়। কেউ কিছু নিষেধ করে না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

আপনি–

আমি কাল ছাড়া পেয়ে যাচ্ছি!

সূর্য একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, খুব ভালো লাগল শুনে। আপনাকে শুধু শুধু আটকে রেখেছিল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, না হে, ঠিক তার উলটো। আমাকেই বরং অনেক দিন আটকে রাখার কথা ছিল। এখনও আমাদের কেসই উঠল না ভালো করে, হঠাৎ যে ছেড়ে দেবে কে ভাবতে পেরেছিল!

অতুলপ্রসাদকে মোটেই উৎফুল্ল দেখা গেল না। কিংবা আর একজন বন্দির কাছে। নিজের মুক্তির কথা জানাতে তার সহজাত ভদ্রতায় আটকাচ্ছিল। শুকনো হেসে বললেন, সরকার আর আমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে চায় না। সরকারের চোখে তো আমরা ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল নই। আমরা তো অকর্মার ঢেঁকি।

অতুলপ্রসাদের মুখে কেউ কোনও দিন আপশোস বা অভিযোগের কথা শোনেনি- শুধু আজই মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে তাকে একটু ক্ষুব্ধ মনে হল।

সূর্য জিজ্ঞেস করল, শুধু আপনি একা?

না। আমাদের ও-দিককার সতেরো জনের রিলিফ অর্ডার এসেছে।

শর্মাজি?

হ্যাঁ, শর্মাজিও ছাড়া পাচ্ছেন। শুনে তোমার মনখারাপ লাগছে, না?

না, না-

আমার কথা বাদ দাও। আমি তো কারওর কোনও উপকারে লাগতাম না-কিন্তু শর্মাজি তোমাদের গান শোনাতেন-সকালবেলা ওই চারণ কবির গান আর তোমরা শুনতে পাবে না।

তা বলে উনি কি আমাদের গান শোনাবার জন্য সারাজন্ম জেলে কাটাবেন?

তুমিই কি সারা জীবন জেলে কাটাবে ঠিক করেছ নাকি?

আমি কিছু ঠিক করিনি।

শুনছি তো আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে একটা দলকে এখানে পাঠাবে। তাদের মধ্যে কেউ গায়ক থাকতে পারে। তবে শর্মাজির জায়গা কেউ নিতে পারবে না। অসাধারণ মানুষ!

সূর্য অনুভব করল, অতুলদা তাকে কিছু একটা বলতে চান। শুধু বিদায় নেবার হলে-এতক্ষণে তো তা হয়ে গেছে।

অতুলপ্রসাদ নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন সূর্যর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। অস্বস্তি কাটাবার জন্য সূর্য একটু হালকা ভাবে বলল, আপনি ছাড়া পাচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে খুশি মনে হচ্ছে না কেন?

ছাড়া পেয়ে কী করব?

বাঃ, আপনার কি জেলখানাই ভালো লাগে!

জেলখানায় আমার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। সেই দেশবন্ধুর আমল থেকে। এখন আর ভালো লাগা খারাপ লাগার প্রশ্ন নেই। তবে তোমাদের মতন তো আর কম বয়স নেই-আমাদের বয়সি লোকেরা জীবনের সবকিছুই ভেবেচিন্তে ছক বেঁধে করতে

চায়। মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম, আরও অন্তত দু-তিন বছর এখানে থাকতে হবে– সেই অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছিলাম জীবন–হঠাৎ সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

জেলখানার এই একঘেয়ে জীবনে আবার সাজাবার কী আছে, সূর্য তা ভেবে পায় না। তবু এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে কিছু একটা কথা বলার জন্যই সে বলে, আপনার বাড়ির লোকেরা আপনাকে পেয়ে খুশি হবে।

ত্রি-সংসারে আমার কেউ নেই রে ভাই!

আপনার পার্টি?

প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করে না। আমার পার্টির লোকেরা কি আমার জন্য বসে আছে? উপেনদা জেল থেকে বেরিয়ে নিজের পার্টিতে ভোটে হেরে গিয়েছিলেন।

তা হলে আপনি বেরিয়ে আবার একটা কিছু করে জেলে ফিরে আসুন।

অতুলপ্রসাদ হাসলেন। তারপর বললেন, যাই হোক, কালই চলে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। যদি কিছু অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা কোরো আমাকে।

অতুলপ্রসাদ সত্যি হাত জোড় করলেন। সূর্য একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। এই নিঃশত্রু প্রৌঢ়ের পক্ষে তার কাছে কোনও অপরাধ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবু এই বিনয়ের সৌম্যতা, এই প্রাচীন আদর্শবোধ–যা তার চরিত্রের একেবারে বিপরীত, তাকে হঠাৎ খুব নাড়া দেয়।

সূর্য গরাদের বাইরে হাত বাড়িয়ে অতুলপ্রসাদের বাহু চেপে ধরে বলে, দাদা, এ কী বলছেন! আমিই হয়তো কখনও রাগের মাথায় কিছু বলে ফেলেছি–

না, না, তুমি কিছু বলেনি–

আমি ছাড়া পেলে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব–

যদি তত দিন আমি বেঁচে থাকি! শোনো, বাইরে গিয়ে তোমার কোনও খবর কাউকে পৌঁছে দিতে হবে?

সূর্য একটুক্ষণ ভেবে বলল, না। সে রকম কিছু নেই।

তোমার বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

তোমার বাড়িতে গিয়ে আমি বলে দেব এখন তোমার স্বাস্থ্যটাস্থ্য ভালো আছে। ঠিকানা কী।

বাড়িতে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনিও কখন বাড়িতে থাকেন তার ঠিক নেই। আমি তো চিঠি লিখে তাঁকে খবর দিচ্ছিই। আপনি কষ্ট করে যাবেন কেন?

না।

তোমার আর কোনও প্রিয়জন নেই? কোনও বন্ধুবান্ধব? না।

আশ্চর্য! ভারী আশ্চর্য। তোমার বয়সে এ রকমটি ভাবা যায় না। তোমার কোনও কাজই কি আমি বাইরে গিয়ে করে দিতে পারব না?

সে রকম তো কিছু মনে পড়ছে না।

তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তোমার কোনও চিঠি যদি কোনও জায়গায়। পৌঁছে দিতে হয়–

আমি আপনাকে অবিশ্বাস করব কেন? আপনিই বিশ্বাস করুন, আমার আর কোনও দল নেই। কারওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

তা হলে, সূর্য, তুমি আমার একটা উপকার করবে?

বলুন।

অতুলপ্রসাদ হাতের সাদা ফুলটা সূর্যর হাতে দিয়ে বললেন, এটার গন্ধ শুঁকে দেখো! এটা কী ফুল বলতে পারো?

সূর্য একটু বিস্মিত ভাবে ফুলটা নিল, নাকের কাছে নিয়ে শ্বাস টানল। মৃদু মৃদু মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু সূর্য তার কৈশোর থেকেই যে ধরনের জীবন কাটিয়েছে, তাতে তার ফুল চেনার অবকাশ হয়নি।

সে বলল, বেশ সুন্দর গন্ধ। কী ফুল?

অতুলপ্রসাদ গর্বের সঙ্গে বললেন, লেবু ফুল। বিশ্বাস করতে পারো, সত্যি সত্যি একটা লেবু ফুল।

কোথায় পেলেন?

আমি তৈরি করেছি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মতন সরল হাস্যে তার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে গেল। একটি লেবু ফুলের বার্তা তাঁর কাছে মুক্তির চেয়েও অনেক বড়।

তিনি বললেন, সবাই ভেবেছিল আগাছা, আমিও তাই ভেবেছিলাম-জমাদার কত দিন সাফ করতে চেয়েছে-আমি তবু দিইনি, তবু তো একটুখানি সবুজ। তারপর একদিন টের পেলাম, সেই আগাছার জঙ্গলে একটা লেবু গাছও রয়েছে। টের পাবার পর কাউকে বলিনি। যদি সত্যি না হয়! আজ প্রথম ফুল ফুটেছে, এবার কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে? কত যত্নে গাছটাকে তৈরি করেছি-দিনের পর দিন-এক একটা লেবু গাছ বন্ধ্যা হয়, ফুল

ফোটে না, ফল হয় না–যদি সে রকম কিছু হয়–এই ভয়ও ছিল। আজই ফুল ফুটল, আর কাল আমাকে চলে যেতে হবে! একি পরিহাস নয়!

ফুলটা আপনি সঙ্গে নিয়ে যান। একটা স্মৃতি।

আমি এ-স্মৃতি নিয়ে কী করব! আমি আশা করেছিলাম, গাছটা একদিন বড় হবে, ফল ফলবে–আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব। আমার গ্যাসট্রিক আছে, আমি লেবু খাই না–অন্যরাই খেত–কিন্তু আমি দেখে যেতে পারলাম না। তুমি আমার অবর্তমানে এই গাছটার ভার নেবে? এটাকে বাঁচিয়ে রাখবে?

আমি? কিন্তু আমি তো গাছের বিষয়ে কিছু জানি না।

অতুলপ্রসাদ মহা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, তার জন্য কোনও চিন্তা নেই। কাল সকালটাতে তো সময় আছে–সেই সময় আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব। আসল কথা হচ্ছে ভালোবাসা। তুমি যদি কোনও কাজকে ভালোবাসতে শেখো–তবে তার সম্পর্কে তোমার কিছুই জানতে বাকি থাকবে না। এমনকী গাছও ভালোবাসা বোঝে।

আপনি এত লোক থাকতে আমার ওপরই এ-ভার দিয়ে যাচ্ছেন কেন?

যেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে যাচ্ছেন এই সুরে তিনি বললেন, সকলকে তো বিশ্বাস করা যায় না। একটু অযত্ন করলেই ধাঙড়-জমাদাররা উপড়ে ফেলে দেবে। তোমার সঙ্গে আমার যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে পাই। তোমাকে আমার বরাবরই বড় ভালো লাগে। এমন ঠান্ডা স্বভাব, মুখের মধ্যে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে–তুমি ঠিক পারবে। তা ছাড়া তোমারই বয়স সবচেয়ে কম–

সূর্য স্নেহ-ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে না। যে-ই তাকে স্নেহ-ভালোবাসা দেখাতে আসবে–তাকেই নিষ্ঠুর প্রতিআঘাত দেবার একটা অদ্ভুত প্রবণতা আছে তার। মধ্যে। এখানেও সে নিজেকে সামলাতে পারল না।

নিষ্ঠুরের মতন বলল, আমার বয়স কমতার মানে আমি সবচেয়ে বেশি দিন জেলে থাকব–বেশি দিন আপনার গাছটা দেখাশুনো করতে পারব–সেই জন্যই আমাকে বেছে নিয়েছেন, তাই না?

তারপর সূর্য হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে দরজা ধরে ধাক্কা দিতে দিতে বলল, আমি থাকতে চাই না, আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি বাইরে যেতে চাই। চুলোয় যাক আপনার লেবু গাছ!

অতুলপ্রসাদ বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। প্রথমটা কোনও কথাই বলতে পারলেন না। তারপর দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে আস্তে আস্তে বললেন, না, আমি সে কথা ভাবিনি। সে কথা ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি একটা কিছু নিয়ে ভুলে থাকতে পারবে। তোমার শুকনো দিনগুলো একটা কিছুর প্রতীক্ষায় কাটবে। আমি মনে প্রাণে চাই তুমি তাড়াতাড়ি ছাড়া পাও। যদি আমার বদলে তোমাকে–

অতুলপ্রসাদের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। গরাদের ফাঁক দিয়ে তিনি সূর্যর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন।

৫৪. স্কুল ছাড়ার আগে

স্কুল ছাড়ার আগে বিষ্ণু ছাড়া আমার আর যে দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়, তাদের নাম ভাস্কর আর পঙ্কজ। এদের মধ্যে পঙ্কজ একটি কীর্তি করে সারা স্কুলে বিখ্যাত হয়েছিল। সরস্বতী পুজোর ভাসানের সময় নৌকো থেকে ধরাধরি করে প্রতিমা যখন গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তখন ঝোঁক সামলাতে না পেরে পঙ্কজও জলে পড়ে যায়।

গঙ্গায় সে-দিন পূর্ণ জোয়ার, জল থইথই করছে। নৌকোয় মাস্টারমশাইরা কেউ ছিলেন না, শুধু আমরা কয়েক জন উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা। পঙ্কজ জলে পড়ে যাওয়ায় আমরা শুধু হাসাহাসি ও চাচামেচি করেছি। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। তারপর যা করেছি,

সেটা আরও মূর্খের মতন। সেই ভরা গঙ্গায়, মাঝিদের কথায় কর্ণপাত না করে, আমরা আরও তিন জন জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রভাত নামের একটি বার বার ফেল করা ছেলে ছিল সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান, সে-ই প্রথম জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয়-আমি বাঙালদেশের ছেলেসুতরাং আমারও পিছিয়ে পড়া উচিত নয় এবং আমার দেখাদেখি ভাস্কর।

আমাদের তিন জনের খুব বেশি বিপদ হয়নি-কাছাকাছি তিনটে নৌকোর মাঝি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু পঙ্কজকে আমরা খুঁজে পাইনি। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে বাবুঘাটের কাছে জলপুলিশের একটি লঞ্চ পঙ্কজকে উদ্ধার করে। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে তখনও বেঁচে ছিল।

সরস্বতী মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবে যাওয়া এবং পরে রোমহর্ষক ভাবে তার উদ্ধার পাওয়ায় পঙ্কজ এমনই বিখ্যাত হয়ে যায় যে পরে স্কুলের ছেলেরা তাকে ভিড় করে দেখতে আসত। এই উপলক্ষে খবরের কাগজে তার নামও ছাপা হয়েছিল। পঙ্কজ অবশ্য এই ব্যাপারে কখনও লজ্জা প্রকাশ করেনি। সে গম্ভীর ভাবে বলত, আমাকে তোলা হল কেন? সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ডুবে মরলে আমি পরের জন্মে নিশ্চয়ই ঈশান স্কলার হতাম।

পঙ্কজ লেখাপড়ায় সাধারণ ছাত্র ছিল, কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তার আশাতীত ভালো রেজাল্ট হওয়ায় অনেকেই বলেছিল, মা সরস্বতীর কৃপা। কিন্তু এই ঘটনা পঙ্কজের জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি-উত্তরকালে পঙ্কজ ঘোরতর নাস্তিক হয়ে যায়।

আমার বাড়ির গ্রামে আমার পইতে হবার পর থেকেই আমার বেশ দেবদ্বিজে ভক্তি হয়। আচার অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত মেনে চলতাম, কখনও গলা থেকে পইতে খুলে ফেলার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না। কী করে এই সব সংস্কার আস্তে আস্তে দূর হল, তা ঠিক মনে নেই। তবে, আমার বন্ধুদের সংসর্গ নিশ্চিত খুব কাজ করেছিল। ছাত্রমহলে তখন নাস্তিকতার একটা ঢেউ উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়ং বেঙ্গল যে নাস্তিকতার জোয়ার এনেছিলেন, হিন্দু ধর্মকে সংস্কার মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন- সেই উদ্দীপনা

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের পর স্তিমিত হয়ে যায়। রক্ষণশীলতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করার আপ্রাণ চেষ্টা কিছুতেই সার্থক হয়নি। এ জন্য আমরা ব্রিটিশের ভেদ নীতিকে সর্বাংশে দায়ী করলেও উভয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী মনোভাবও কম দায়ী নয়। বক্তৃতা মঞ্চে কিংবা মিছিলে হিন্দু-মুসলমানকে পাশাপাশি আমরা ডাক দিলেও, সামাজিক জীবনে মেলামেশা ছিল না। নজরুল ইসলাম শ্যামাসংগীত গাইলে হিন্দুরা খুশি হয়, মুসলমানরা চটে যায়। এই খুশি ও অখুশি–দুটোই এক রকমের গোঁড়ামির ফল।

স্লোগান হিসেবে 'বন্দেমাতরম'-মুসলমানরা গোড়া থেকেই মেনে নিতে চায়নি। এই আপত্তির কারণ কতটা সংস্কৃত ভাষার জন্য, কতটা দেশকে মাতৃরূপে কল্পনার জন্য, আর কতটা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য–তা আজও স্পষ্টরূপে নির্ধারিত হয়নি। কিন্তু যেহেতু এই স্লোগান স্বতঃস্ফূর্ত, তাই হিন্দুরা এটি ছাড়েনি। সশস্ত্র বিপ্লবীরা পরজন্মে বিশ্বাসী এবং গীতায় নিষ্কাম ধর্মকে অবলম্বন করেছিল বলে মুসলমানরা তাদের থেকেও দূরে থেকেছে।

এদিকে, বাংলায় মুসলিম লিগ শাসনের দাপটের ফলে হিন্দুরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত হিন্দুদের যেটা একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই চাকরিও যখন তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তখন তারা ঘোরর মুসলমান বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে রক্ষণশীলতা বেড়ে যায়। এবং এই অবস্থায়, বোমা বানানো বাঙালিদের মধ্যে আরও বিভেদের ফাটল সৃষ্টি করায় ইংরেজ সরকারের যেমন স্বার্থ ছিল, তেমনই অবাঙালি ব্যবসায়ীদেরও কম স্বার্থ ছিল না। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছিল এর প্রস্তুতি পর্ব।

মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের প্রবীণরা ও অভিভাবকরা যখন বেশি বেশি রকমের ধর্ম-গোঁড়া হয়ে উঠলেন, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছাত্র সমাজের মধ্যে নাস্তিকতা এসেছিল। নতুন করে। অভিভাবকদের বিপরীত মত পোষণ করা আধুনিকতার একটি অঙ্গ। মুসলমান

ছাত্রদের মধ্যে অবশ্য এই প্রতিক্রিয়া আসতে আরও কয়েক বছর সময় লেগেছিল–তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়ে ওঠার জন্য। তার আগে পর্যন্ত, তাদের মধ্যে ছিল শুধু সর্বাত্মক ভাবে অধিকার আদায়ের প্রশ্ন একে একে সবাই গিয়ে ভিড়ে পড়ছিল মুসলিম লিগে।

তা ছাড়া, হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে তখন মার্কসবাদ এক নতুন প্রেরণা এনেছে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ার সময় বিজয় এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান রক্ষা পেয়েছে, এবার বাকি পৃথিবী ওই সমাজতন্ত্রের আওতায় আসবে। কেন না, উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ লড়াই করে শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যসুতরাং তারা একদিন পরস্পর লড়াই করে মরবেই–সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে আসবে প্রত্যেক মানুষের জন্য সমান অধিকার। ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট হবার দারুণ ফ্যাশান চালু হয়েছে। একটু ভালো ছাত্র বা চৌকোশ ছেলেরা যদি কমিউনিস্ট না হয়–অন্যরা তাদের বিদ্রূপ করে।

এবং নতুন কমিউনিস্টরা সব দিক থেকেই উগ্র হয়। রাজা রামমোহন যেমন ভাবে দুর্গ পূজার নেমন্তন্ন অস্বীকার করেছিলেন, ঠিক সেই একই কায়দায় ভাস্করের দাদা অরুণদা তার বাড়ির সিঁড়িতে বসে বাঁকা হাস্যে একদল ছেলেকে বলেছিলেন, সরস্বতী পুজোর চাঁদা? তোমরা কী ভাই মেয়েছেলে যে আমার কাছে পুতুল খেলার কথা বলতে এসেছ?

মাথার উসকুখুসকু চুলে তেল নেই, গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পাজামা পরা অরুণদা ছিলেন। আমাদের কাছে দারুণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এই রকম পোশাক-পরা নতুন দাদারা আমাদের কাছে মৃদু গলায় শোনাতেন অসম্ভব সব জ্ঞানের কথা।

বিষ্ণু, আমি, পঙ্কজ আর ভাস্কর–আমাদের এই ক'জনকে দাদারা বলতেন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। কেউ কেউ যখন বলত, চার জন আবার থ্রি মাস্কেটিয়ার্স হয় কী করে, তাদের দিকে আমরা অবজ্ঞার চোখে তাকাতাম। তারা বইটা পড়েনি। আমাদের মধ্যে কে দার্তাগনান সে

সম্পর্কে তর্কের কোনও অবকাশই ছিল না-সে পদমর্যাদা প্রথম থেকেই ভাস্করকে দিতে হয়েছিল।

বন্ধুদের মধ্যে ভাস্কর যেমন অহংকারী, তেমনই দুর্মুখ। অতি অল্প বয়স থেকেই তার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব জন্মে গিয়েছিল, যে জন্য তার চেয়ে বয়সে বড় লোকেরাও তার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলত। ভাস্করের ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাথা-ভরতি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল এবং চোখের মণি দুটো কটা। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কোনও গণতন্ত্র ছিল না, ভাস্করের ইচ্ছে মতনই আমাদের চলতে হত। তবে, ভাস্কর মনে মনে সমীহ করত বিষ্ণুকে। বিষ্ণু কম কথা বললেও তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস পেত না ভাস্কর। আমার আর পঙ্কজের ভূমিকা ছিল বকুনি খাওয়ার-আমরা কিছু বললেই ভাস্কর ধুৎ বলে অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে তা উড়িয়ে দিত।

আমাদের বয়সি ছেলেরা তখন অনেকেই বিড়ি সিগারেট খেতে শিখেছে-ভাস্কর এক দিন মাত্র সিগারেট বিষয়ে উল্লেখ করায় বিষ্ণু এমন ভাবে ছিঃ বলেছিল যে আমরা সবাই একবাক্যে সিগারেটের নিন্দে করা শুরু করে দিলাম। কেউ আর লুকিয়ে চুরিয়ে একটান দেবার কথাও. ভাবিনি। ইস্কুলের বাথরুমের দেওয়ালে অসভ্য কথা এবং ছবি আমাদের সবারই চোখে পড়ত যদিও, কিন্তু কেউ সে-বিষয়ে আলোচনা করিনি। এটাও বিষ্ণুর প্রভাব। তবে, অন্য সব বিষয়ে আমরা ভাস্করের নির্দেশই মানতাম।

ভাস্করের প্রধান শখ ছিল পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো। বিকেলবেলা আমরা জমায়েত হতাম হেদোর মোড়ে। সেখান থেকে শুরু হত পদযাত্রা। জোড়াসাঁকো, পোস্তা, ক্যানিং স্ট্রিট হয়ে আমরা চলে যেতাম হাওড়া ব্রিজের কাছে। তখনও নতুন হাওড়া ব্রিজের দুদিকে দুটো বিরাট ধাতব বেলুন ওড়ে। আমরা শুনেছিলাম, এই ব্রিজের কাছাকাছি শত্রু পক্ষের বিমান এলেই বেলুন দুটো ফেটে গিয়ে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড হবে। গঙ্গাতেও আমরা একটা নতুন জিনিস দেখিজলে ভাসে এরোপ্লেন। এই সি-প্লেনগুলি নাকি জল থেকেই উড়ে যেতে পারে। সেই প্লেনের ডানার ওপর শুয়ে খালি গায়ে রোদ পোহায় আমেরিকানরা, যাদের আমরা বলতাম লালমুখো।

সন্ধ্যা হয়ে এলেই পঙ্কজের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। ভাস্কর তাকে ধমকে ঠান্ডা করে দেয়। ভাস্করের নির্দেশে আমরা ব্রিজ পেরিয়ে চলে যাই হাওড়া স্টেশনে। ভাস্কর প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটে, আমরা যে-কোনও একটা খালি ট্রেনের কামরায় উঠে বসে থাকি। আমরা কোথাও যাব না, তবু ট্রেনের কামরায় আমাদের দারুণ গল্প জমে। ব্যাপারটাতে আমরা একটা নিষিদ্ধ আনন্দ পাই। আমাদের চেনা কেউ দেখতে পেলে কী ভীষণ চমকে উঠবে, মনে করবে বুঝি আমরা বাড়ি থেকে পালাচ্ছি। সে রকম কারওর চোখে পড়ার জন্য আমরা জানলা দিয়ে মুখ বার করে থাকি পর্যন্ত।

যে-ট্রেন ছাড়তে অনেক দেরি আছে কিংবা সে-দিন ছাড়বেই না-সেই সব ট্রেনই আমরা পছন্দ করে বসি। তাতে আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না-আমরা বেঞ্চে বসে পা দোলাতে দোলাতে মনে করি, ট্রেন সত্যি বহু দূর চলে যাচ্ছে, আমরা চার বন্ধু কোনও নাম-না-জানা দেশের মধ্য দিয়ে চলেছি।

কোনও কোনও সন্ধ্যাবেলা আমরা যেতাম বেলেঘাটা, তিলজলা কিংবা খিদিরপুর। এই সব জায়গাই আমাদের কাছে নতুন-আমরা একটু একটু করে কলকাতা শহরটাকে আবিষ্কার করতাম। আমরা চারজনে একসঙ্গে থাকতাম বলেই রাস্তা হারিয়ে ফেলার জন্য ভয় ছিল না। রাস্তা হারাতাম, ঘুরে ঘুরে আবার খুঁজে পেতাম। এই শহরের শিরা উপশিরার মতন অসংখ্য গলিখুঁজি, কত নানান রকমের বাড়ি-সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য জগৎ। পাথুরেঘাটার গলিতে ঢুকে পুরনো কালের কতগুলো বিরাট বিরাট বাড়ি দেখে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, বিশাল স্তম্ভ, কোনও বাড়ির ছাদ আবার দুর্গের মতন। কোনও বাড়ির গেটের সামনে সিংহ মূর্তি। রাজেন মল্লিকের বাড়িতে এসে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম আস্ত একটি চিড়িয়াখানা। কে. কে. হাজারির বাড়িতে দেখেছি শিকল দিয়ে বাঁধা সত্যিকারের জ্যান্ত বাঘ।

প্রতিদিন আমরা অন্তত ছ'সাত মাইল হাঁটতাম। ভাস্করের কড়া নির্দেশে আমাদের ক্লান্ত ভাব দেখাবার কোনও উপায় ছিল না। ফেরার পথটা একটু একঘেয়ে লাগত-খুব বেশি

রাত না হলে আমরা ট্রামে-বাসে ফিরতাম না। আমরা কখনও কখনও ফুটবল বা ক্রিকেট খেলেছি বটে, কিন্তু হেঁটে বেড়ানোই ছিল আমাদের বেশির ভাগ দিনের প্রোগ্রাম। শেষ পর্যন্ত এটা আমাদের নেশার মতন হয়ে গিয়েছিল। কলেজে এসেও দু'-এক বছর এটা বজায় রেখেছিলাম।

এই ভাবে কলকাতা শহরটা আমাদের হাতের পাতার মতন চেনা হয়ে যায়। আমরা ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডি থেকে শুধু যে বেরিয়ে আসি, তাই-ই নয়, এই শহরটাকে খুব আপন মনে হয়। আমরা মনে মনে বেশ জোর করে বলতে পারি, এই শহরটা আমাদের।

আর একটা কথাও আমি আলাদা ভাবে বুঝতে পারি, গ্রামের মাঠে কিংবা নির্জন বাগানে বা নদীর ধারে একা একা ঘুরে বেড়িয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, শহরের অচেল রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার আনন্দ ও উত্তেজনা তার চেয়ে মোটেই কম নয়। একটা গলি পার হলে কোথায় পড়ব আমরা জানি না, আচমকা পেয়ে গেছি পার্ক কিংবা পুকুর। আলুপোস্তার কাছে একদিন পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোলাম, যেখানে সকলেই চিনেম্যান, বস্তির মধ্যে সরু সরু গলিতে গরিব চিনেরা থাকে– দোকানের সাইনবোর্ডও চিনে ভাষায়। কয়েক জন লোক আমাদের পেছনে ঘুরঘুর করে বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগল। একটু একটু গা ছমছম করছিল আমাদের, কিন্তু ভাস্কর তার স্বভাবসুলভ অহংকারের সঙ্গে বলল, চল, এখানে একটা হোটেলে ঢুকে চা খাই।

বিষ্ণু আর পঙ্কজ একসঙ্গে বলল, না। আমি চুপ করে রইলাম। আমার আপত্তি ছিল না।

ভাস্কর চার দিকে তাকিয়ে বলল, এই জায়গাটা চায়না টাউন, আমার কাকার কাছে শুনেছি।

একটা দোকানের সামনের সাইনবোর্ডে দুটো সাপের ছবি আঁকা, ভাস্কর বলল, চীনা, ভেতরে ঢুকে দেখি!

বিষ্ণু দৃঢ় ভাবে না বলায় সেদিন আর বেশি দূর এগোনো যায়নি। বিষ্ণু তার বাবা-মায়ের খুব আদরের ছেলে–তার গতিবিধি সম্পর্কে অনেক বিধিনিষেধ ছিল–তবু সে জোর করেই বিকেল বেলা আসত আমাদের সঙ্গে। তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে আমরা একটা দায়িত্ব বোধ করতাম।

বেড়াবার সময় আমরা কখনও যে কোনও বিপদে পড়িনি তা নয়। কখনও কোনও পাড়ায় হঠাৎ গোলমাল শুরু হওয়ায় ও পুলিশের আবির্ভাবে আমরা অন্ধের মতন। ছুটেছি। কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপার ছাড়াও একবার বেশ একটা গুরুতর ব্যাপারই ঘটেছিল।

তখন কলকাতায় অনেক বাড়িই খালি পড়ে থাকত। 'টু লেট' ঝোলানো বাড়ি আকছার। তা ছাড়াও, দমদম, বরানগর, বেলগাছিয়ার দিকে অনেক বড় বড় জমিদারদের বাগানবাড়ি–যা যুদ্ধের সময় মিলিটারিরা নিয়ে নিয়েছিল–সেগুলো এখন জানলা দরজা ভাঙা অবস্থায় হা-হা করছে। সেই সব বাড়িতে ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর দেখার ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল ছিল, আমার এই ইচ্ছেটা ভাস্করকে প্রকাশ করায় সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ফাঁকা বাড়ি পরিদর্শন করাও ছিল আমাদের একটা কাজ। সেখানে আমাদের কেউ হঠাৎ দেখলে চোর বলেও ভাবতে পারত, কিন্তু আমাদের চুরি করার মতন কিছুই ছিল না। আমরা সেই বিশাল বিশাল বাড়ির এক একটা ঘরে এক একজন ঢুকে হাহো ইত্যাদি চিৎকার করতাম প্রতিধ্বনি শোনার আশায়।

একদিন কী কারণে স্কুলে হাফ হলিডে হয়ে গেছে, বাড়ি ফেরার বদলে ভাস্কর আমাদের নতুন জায়গায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিল। সেদিন বিষ্ণু ছিল না সঙ্গে, বিষ্ণু জ্বরের জন্য স্কুলে আসেনি। কিন্তু প্রভাত বলে আর একটি ছেলে আমাদের দলে জুটে গেল। প্রভাত একটু বখাটে ধরনের ছেলে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় 'ভারতী' কথাটার মানে 'সিনেমার ভারতী' লিখেছিল বলে সে বাংলার স্যারের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। এ ছাড়াও সে একবার হেডমাস্টার মশাইকে পেছন থেকে হেড়ু হেড়ু বলায় খুব লাঞ্ছিত হয়েছিল। তবু প্রভাতকে দলে নেওয়া হল, কারণ সে খুব মজার মজার কথা বলে।

শ্যামবাজারের খালপাড়ের স্টেশন থেকে টিকিট কিনে আমরা চড়ে বসলাম ট্রেনে। প্রায় খেলনার গাড়ির মতন ছোট ট্রেন, লোকের বাড়ির গা ঘেঁষে যায়-চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে আবার দৌড়ে ওঠা যায় সহজেই। এই রকম ট্রেন পরে আমরা আবার দেখেছিলাম দার্জিলিংয়ের রাস্তায়।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে পশু হাসপাতালের পাশ দিয়ে, বেলগাছিয়া ভিলার গা ঘেঁষে ট্রেন চলল দুলতে দুলতে। এরপর থেকে আর সবকিছু আমাদের অচেনা। হাতিয়াড়া নামে কোন এক সুদূর রাজ্যে গিয়ে এই ট্রেনের যাত্রা শেষ হবে।

কিছুদূর যাবার পর আমাদের মনে হল আমরা একটা অপূর্ব সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছেছি। সবুজ মখমলের মতন ঘাসে-ভরতি মাঠ, তার ওপাশে বিস্তৃত জলাভূমি, মাঠের আর এক প্রান্তে একটা মস্ত প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের দেওয়ালে নানা রকম রঙিন কাঁচ বসানো, বিরাট সিংহদরজার পাশে দু'জন পুতুল দারোয়ান। কিন্তু দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় বাড়ি পরিত্যক্ত। এমন সুন্দর স্থান শুধু স্বপ্নে দেখা যায়।

এক পাল গোরু পার হচ্ছে বলে ট্রেনটা সেখানে থেমে আছে। আমরা ক'জন ঝুপঝুপ করে নেমে পড়লাম।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাস ভিজে। তার ওপর দিয়ে আমরা দৌড়োতে লাগলাম বাড়িটার দিকে। ধারে কাছে কোনও লোকজন নেই। এই জায়গাটা যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। পঙ্কজ তো উৎসাহের আতিশয্যে সেই মাঠে ডিগবাজি খেয়ে জামা-প্যান্টে কাদা লাগিয়ে ফেলল।

বাড়িটার সিংহদরজা পেরিয়ে গেলে ভেতরে একটা ছোট বাগান। দেখলেই বোঝা যায়, এবাড়িও মিলিটারিদের দখলে ছিল-যে-সব মাছ-মাংসর টিন তারা ব্যবহার করত-সারা বাগানে সেই টিন ছড়িয়ে আছে। কয়েকটা তাল গাছের গুঁড়িও কাটা অবস্থায় এখানে সেখানে ছড়ানো। আমরা আগেই শুনেছিলাম, জাপানিদের ভয় দেখাবার জন্য তাল গাছের

গুঁড়ি কামানের মতো সাজিয়ে রাখা হত যুদ্ধের সময়-আসল কামানের অভাব দেখা গিয়েছিল। সেই বস্তু চোখের সামনে দেখলে উত্তেজনা লাগে।

বাগানটাতে গাছপালা কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই বলতে গেলে, তবে একটা আম গাছে। কচি কচি আম ফলে আছে। ধারে কাছে অনুমতি নেবার মতন কেউ নেই, আমরা হুড়োহুড়ি করে আম পাড়তে লাগলাম। নিজের হাতে পাড়া সেই কঁচা আমের এমন অপূর্ব স্বাদ-যেন জীবনে আমরা সে রকম আম কখনও খাইনি।

প্রভাত বলল, ইস, মাইরি, একটু যদি নুন পাওয়া যেত তা হলে একেবারে আলুর দম হয়ে যেত!

সেকথা শুনে আমরা একেবারে হেসে লুটোপুটি। বিষ্ণু সঙ্গে নেই বলে প্রভাতের মাইরি বলায় আমরা কেউ আপত্তি জানালাম না। প্রভাত সব কিছুকেই আলুর দম বলে। আমাদের ইতিহাসের নতুন স্যারকে খুব ভালো লাগত। প্রভাত বলেছিল, এই স্যারটা খুব ভালো। একেবারে আলুর দম!

বাড়িটার সদর দরজা ভাঙা। কেউ যেন কুড়ুল দিয়ে দরজাটা ভেঙে খান খান করেছে। জানলার ভাঙা কাঁচ এখনও ছড়িয়ে আছে।

আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। সুদৃশ্য ডিসটেম্পার করা এক একটি ঘর-কিন্তু সেই সব দেওয়ালে ধোঁয়ার দাগ। দেওয়ালের মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার চৌকো চৌকো দাগ দেখে মনে হয়, আগে সেসব জায়গায় ছবি ছিল। ছাদ থেকে ঝুলন্ত ঝাড়লণ্ঠনের সামান্য ভগ্নাংশই অবশিষ্ট আছে।

চওড়া কাঠের সিঁড়িতে আংটা লাগানো। দেখে বোঝা যায়, আগে সেই সিঁড়িতে কার্পেট পাতা থাকত-এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। সেই সিঁড়ি দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ওপরে উঠলাম।

ওপরে চৌকো চৌকো রঙিন পাথর বসানো বিরাট বারান্দা। এক পাশে লোহার রেলিং দেওয়া বারান্দা, আর এক পাশে সারি সারি ঘর। এত বড় বড় ঘর আমি কখনও দেখিনি। এত বড় বাড়িতে এক জনও লোক নেই বলে গা ছম ছম করে।

একটা ঘরে ঢুকে দেখি অসংখ্য ছেঁড়া কাপড় ছড়ানো। এবং কাগজের টুকরো। কাপড়গুলো ছুঁতে আমাদের ঘেন্না হয় কিন্তু কাগজের টুকরো দু-একটা তুলে দেখি। হাতের লেখা, মনে হয় যেন চিঠি। কিন্তু টুকরোগুলো এতই ছোট যে কিছু বোঝা যায় না। এ রকম ভাবে কেন এগুলো ছিঁড়েছে, কে ছিঁড়েছে? মিলিটারিরা বাংলা চিঠি পেল কোথায়!

বিভিন্ন কাগজের টুকরো মিলিয়ে দেখার জন্য আমার একটা ঝোঁক চেপে যায়। অতি কষ্টে দুটি লাইন উদ্ধার করতে পারলুম। তোমার চোখে রাজ্যের ঘুম...আমার চোখে ঘুম। নেই।...তুমি ঘুমোও, আমি বরং তোমায় দেখি... এটুকু পড়েই আমার বুকের মধ্যে শিরশির করে–যদিও মনে হয়, এ বোধহয় চিঠি নয়, কোনও কবিতার লাইন।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, ঘরে আর কেউ নেই, আমি একা। সেই ফাঁকা ঘরে রেণুর জন্য আমার মন কেমন করে ওঠে।

ভাস্কররা ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে গিয়ে দেখে দু'জন গুন্ডা চেহারার লোক সেখানে কী যেন করছে। ওদের দেখেই তোক দুটো হুংকার দিয়ে ওঠে, কী চাই?

ভাস্কর সহজে দমবার পাত্র নয়। সে তেজের সঙ্গে বলে, আপনারা জিজ্ঞেস করার কে? এটা কি আপনাদের বাড়ি?

তখন তাদের একজন ভাস্করের ঘাড় চেপে ধরল, আর একজন একটা মস্ত ছোরা বার করল, যাকে লোকে বলে ড্যাগার।

রীতিমতন সংকটজনক অবস্থা। প্রভাত কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, আমাদের ছেড়ে দিন। আর করব না, ছেড়ে দিন।

ওদের মধ্যে একজন ভাস্করের ওপর খুবই রেগে গেছে। সে বলল, ভাস্কর যদি নাকে খত দেয়, তা হলে ছাড়তে পারে। ছুরির বিরুদ্ধে আমাদের করার কিছু ছিল না। ভাস্করকে। নাকে খত দিতেই হল। ভাস্করের সেই অপমানিত মুখ কোনও দিন ভুলব না।

৫৫. যদিও সুর্যর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যদিও সুর্যর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু ছেচল্লিশ সালের মাঝামাঝি সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেল। বাংলার অ্যাসেমব্লিতে 'জেল ডেলিভারির'র জন্য হট্টগোল চলছিল অনেক দিন ধরেই। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের পর বাংলার জেলগুলিতে রাজবন্দিদের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। সোহরাওয়ার্দি মুখ্যমন্ত্রী হবার পর অনেককেই ছেড়ে দিলেন– চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার অনেক বন্দিও এই সময় ছাড়া পান।

সূর্য বাড়িতে কোনও খবর পাঠায়নি, তার ধারণা ছিল সে একা বাড়ি ফিরে সবাইকে চমকে দেবে। তবু কী করে রটে যায়। সংবাদপত্রেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল। সূর্য যে ট্রেনে ফিরল, সেই ট্রেনেই আরও পঁচিশ-তিরিশ জন রয়েছেন। হাওড়া স্টেশনে বিপুল ভিড়, বহু লোক ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামতেই মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠল–দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চারদিকে। অনেক মা তাঁদের সন্তানকে বহু বছর বাদে দেখলেন, অনেক পিতা তাদের সন্তানদের ইহজীবনে আর দেখার আশা পরিত্যাগ করেছিলেন। অতিরিক্ত আবেগ ও আনন্দের সঙ্গে তাই চোখের জল মেশে।

সূর্যকে নিয়ে যাবার জন্য ছোটখাটো একটি দল এসেছে। বড়বাবু, চিররঞ্জন, হিমানী, সান্ত্বনা, বাদল এবং বাদলের তিন-চার জন বন্ধু। বাদলের জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। শ্রীলেখা কলকাতায় থাকলে বোধহয় যেমন করেই হোক আসত।

ট্রেনের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সূর্য। সে এখন বাইশ বছরের যুবক, মাথা-ভরতি ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, দাড়ি-গোঁফ একবারও কামায়নি পর্যন্ত, লম্বায় সে বড়বাবুকেও

ছাড়িয়ে গেছে। তার কাঁধে ঝোলানো একটা কাপড়ের ব্যাগ, হাতে একটা নতুন সুটকেস। ধুতি আর একটা টুইলের শার্ট পরে আছে।

গাড়ি থামতেই চিররঞ্জন এগিয়ে গিয়ে সূর্যকে জড়িয়ে ধরলেন। সূর্যর মুখে বিষণ্ণতা বা ক্লান্তির ছাপ নেই। তাকে বেশ উৎফুল্লই দেখাচ্ছে। সে নেমে এসে প্রথমে বাদলের মাকে বলল, কী মেজোমামিমা, কেমন আছেন? কী রে বাদল, সান্ত্বনা

হিমানী পা দুটোকে এমনভাবে জোড়া করে আছেন যে দেখলেই বোঝা যায় তিনি প্রণামের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু প্রণাম করার কথা সূর্যর মনেই পড়ল না। সে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার শরীর ভালো আছে তো?

বড়বাবু স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লেন।

বিষ্ণু আর রেণুকে সূর্য চিনতেই পারেনি। রেণুর হাতে একটা সাদা ফুলের মালা। সে লাজুক ভাবে এগিয়ে এসে মালাটা সূর্যকে পরিয়ে দিতে গেল। সূর্য প্রথমে দেখতে পায়নি, চমকে গিয়ে বলল, এ কী এ কী!

সূর্যর গলা পর্যন্ত রেণুর হাত পৌঁছোবে কেন? সে লাজুক মুখে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চিররঞ্জন বললেন, দাও, দাও, মালাটা পরিয়ে দাও

কয়েক জন প্রায় জোর করেই সূর্যর মুখটা নিচু করে দিল, রেণু মালাটা পরিয়ে দিতেই বাদলের বন্ধু ভাস্কর চেঁচিয়ে উঠল, ইনকিলাব-

বহু অচেনা লোক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল-জিন্দাবাদ।

সেই রকম ভাবেই চলল, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়!

সূর্যকে ঘিরে রীতিমতন একটি ভিড়। অস্বস্তি ও লজ্জায় সূর্য মুখ তুলতে পারছে না, মালাটা খুলে নিয়ে সান্ত্বনার হাতে দিয়েছে। নানা জনের নানা প্রশ্ন। চিররঞ্জন বলল, আরে বাড়িতে চল, ছেলেটাকে আগে একটু বিশ্রাম নিতে দে-।

রণক্ষেত্র থেকে বীর সৈনিকের প্রত্যাবর্তনের মতন একটা দৃশ্য।

বড়বাবু ভাবছেন, মেদিনীপুরের স্টেশনে কয়েক বছর আগেকার সেই দৃশ্যের সঙ্গে আজকে হাওড়া স্টেশনের এই দৃশ্যের কত তফাত। সূর্য আজ সুস্থ সবল শরীরে ফিরে এসেছে। সেদিন তিনি ভেবেছিলেন, সূর্যর সঙ্গে আর দেখাই হবে না। তিনি সূর্যর পিঠে হাত রেখে বললেন, আসবার পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো?

সূর্য বলল, না। শোওয়ার জায়গা পেয়েছিলাম।

স্টেশনের বাইরেও কিছু লোক ওদের ঘিরে থাকে। সূর্য আজ অনেকেরই দ্রষ্টব্য। কেউ কেউ এমনি ভিড় দেখে হঠাৎ তার মধ্যে ঢুকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, দাদা কী হয়েছে! কী করেছে? ইনি কে?

বাদল সগর্বে উত্তর দেয়, আমার দাদা। একজন বিপ্লবী।

বড়বাবু দুখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। হইহল্লা করতে করতে আসা হল বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে। অনেক পাড়াপ্রতিবেশী উঁকিঝুঁকি দিতে এল।

এবং বিকেলের মধ্যেই সকলের সব কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়ে গেল। তারপর থেকে সূর্য এই শহরের যে-কোনও একজন সাধারণ মানুষের মতন।

জমিয়ে গল্প বলার দক্ষতাও নেই সূর্যর। তার পলাতক জীবন ও কারাবাস সম্পর্কে ছেলের দল অসংখ্য প্রশ্ন করে-সূর্য মাত্র দু'-একটা বাক্যে তার উত্তর সেরে দেয়। সকলেই তাকে ভাবছে এক রোমাঞ্চকর ঘটনার নায়ক, অথচ নায়কটির আত্মগরিমা প্রচারের কোনও আগ্রহ নেই। সূর্যর সুটকেস খোলার পর তার থেকে যখন দুটো কাঁচা পাতিলেবু বেরোল-

তখন সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ-দুটো এনেছ কেন? সূর্য শুধু উত্তর দিল, জেলখানার স্মৃতি। তারপর লেবু দুটো নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকতে লাগল।

দুপুরবেলা বড়বাবুর বাড়িতেই সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। চিররঞ্জন-হিমানী অনেক দিন বাদে এ বাড়িতে এলেন। এত বড় বাড়িটা কঁকা পড়ে আছে। বড়বাবু এক বার চিররঞ্জনকে বললেন, চিরু, তোমরা এসে আবার এ বাড়িতে থাকো। ছেলেটার একটু যত্নআত্যি করার দরকার, তোমরা যদি একটু দেখাশুনো না করো-

চিররঞ্জন বললেন, দাদাকে বলে দেখি-

সূর্যর ঘরখানা বড়বাবু পরিষ্কার করিয়ে রেখেছেন। সূর্যর জিনিসপত্র সব আগেকার জায়গায় ঠিকঠাক সাজানো রয়েছে। শুধু আলনায় তার যে পুরনো শার্টগুলো ঝুলছে-সেগুলো এখন আর তার গায়ে লাগবে না।

সূর্য ঘরে প্রথম পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মনে হল টেবিলটার পাশে শ্রীলেখা দাঁড়িয়ে আছে-নীল শাড়ি পরা, হাতে একটা চিরুনি। সূর্য শ্রীলেখার চিঠির উত্তর দেয়নি-সেই কথা মনে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে বাদলকে জিজ্ঞেস করল, শ্রীলেখা কেমন আছে রে?

সে-দিনটা ছিল বাইশে শ্রাবণ। বাদলরা সব বন্ধু মিলে ভাস্করদের পাড়ায় রবীন্দ্র স্মরণসভার আয়োজন করেছে। দুপুর থেকেই তারা ছটফট করছে সেখানে যাবার জন্য। এবং সূর্যকেও নিয়ে যেতে হবে। সূর্যকে কোনও কিছু না বলেই ওরা তাকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করে ফেলেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে এর মধ্যেই পোস্টার লাগানো হয়ে গেছে, প্রধান অতিথি: নির্যাতিত রাজবন্দি সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

সূর্য সেই অনুষ্ঠানের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল। এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে বলল, যা যাঃ, আমি ও-সব মিটিং ফিটিংয়ে যাই না।

তখন চলল ঝুলোঝালির পালা। সূর্যকে না নিয়ে যেতে পারলে বাদলের সম্মান থাকে না বন্ধুদের কাছে। সূর্য কিছুতেই যাবে না। চিররঞ্জনও বললেন, ছেলেটাকে তোরা একটু বিশ্রাম নিতে দে। আজই কেন বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিস।

শেষ পর্যন্ত বাদল তার মাকে আর দিদিকে ধরল সূর্যকে রাজি করাবার জন্য। সূর্যর চরিত্র সম্পর্কে বাদল এইটুকু অন্তত বুঝেছে সে মেয়েদের মুখের ওপর কোনও কঠিন কথা সাধারণত বলে না। মেয়েদের সে সম্মান দেয়।

শেষ পর্যন্ত সূর্যকে যেতেই হল। পরিচিত রাস্তাগুলি দিয়ে সূর্য অনেক দিন পরে হাঁটছে। এই রাস্তা দিয়েই বাদল একদিন সূর্যকে বিষ্ণুদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। হাতিবাগান বাজারের কাছে এসে সূর্য জিজ্ঞেস করল, বাদল, তোর মনে আছে? বাদলের মনে নেই। সে বলল, কী সূর্যদা?

এই যে, ঠিক এইখানে একদিন একটা মিছিল আসবার সময় পুলিশ তোকে আর আমাকে মেরেছিল?

বাদল বলল, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা লালমুখো সার্জেন্ট!

কী রকম ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল?

এই কথা বলার সময় সূর্য হাসছে। তিক্ততা বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। এটাও যেন একটা মধুর স্মৃতি।

সেই জায়গাটা দিয়ে এখন অনবরত লোকজন যাচ্ছে আসছে, কাছেই ফুটপাতে সামগ্রী বিছিয়ে বসে আছে একজন ফেরিওয়ালা। সেদিনের সেই দুটি অপমানিত বালকের মুখচ্ছবি এখন কোথাও নেই। জীবন থেমে থাকে না কোথাও।

ভাস্করদের বাড়ির কাছেই রাস্তার ওপর প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা সাড়ে পাঁচটায়-কিন্তু উদ্বোধন সংগীত যিনি গাইবেন, তিনি এখনও এসে পৌঁছোননি বলে

আরম্ভ করতে একটু দেরি হচ্ছে। সভাপতি এসে গেছেন এরই মধ্যে সভাপতি উদীয়মান কথা সাহিত্যিক তাপস সিংহ রায়। তিনি এখন ভাস্করদের বৈঠকখানায় বসে সিগারেট টানছেন।

সূর্যকে সেখানে এনে বসানো হল। বাদল অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, তাপসদা, ইনি আমার দাদা, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আজই এসেছেন।

তাপস সিংহ রায়ের হাতে একটা বই ধরা ছিল। তিনি শুকনো ভাবে বললেন, নমস্কার। তারপর আবার বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলেন।

তাপস সিংহ রায়ের এই নিরুত্তাপ ব্যবহার দেখে বাদল একটু দমে গেল। সে আশা করেছিল, তার কীর্তিমান দাদার কথা শুনে যে-কেউ লাফিয়ে উঠবে, বিস্ফারিত চোখে বলবে, ও আপনিই সেই!

তাপস সিংহ রায়ের মতন লেখকরা তখনও বাদলের চোখে দেবতার সমান। যে-কোনও ম্যাগাজিন খুললেই যাঁর লেখা দেখতে পাওয়া যায়-তার মতন কীর্তিমান আর কে আছে। অবশ্য সূর্যও কম কিছু নয়।

বাদল আবার বলল, আমার দাদা সেই ফরটি টু থেকে জেলে ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত ওঁদের ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

তাপস সিংহ রায়ের মতন লোকেরা নিজেরাই অপরের দ্বারা অভিনন্দিত হতে চায়। কোনও জায়গাতেই নিজের থেকে অপরকে বেশি উল্লেখযোগ্য হিসেবে মনে করা পছন্দ করে না। তিনি একটু বিরক্ত ভাবেই বললেন, তোমাদের আরম্ভ হতে আর কত দেরি?

বাদল কোনওক্রমে একটা উত্তর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর তাপস সিংহ রায় সূর্যর দিকে নিজের সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, চলবে?

সূর্য বলল, আমি খাই না।

তাপস সিংহ রায় আগের সিগারেট থেকেই নতুন একটা ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এইসব মিটিং কিছুতেই টাইমলি আরম্ভ করতে পারে না। আমাকে আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে। আপনি নজরুলের কিছু খবর, জানেন?

সূর্য বলল, নজরুল ইসলামের কথা বলছেন? কী হয়েছে তার?

শুনছি তো শরীর অসুস্থ। কাল প্রেমেনদার বাড়িতে গিয়েছিলেন। প্রেমেনদা বললেন-

প্রেমেনদা কে?

তাপস সিংহ রায় একটু অবাক হয়ে বললেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই নাম কি দ্বিতীয় কারওর আছে?

সূর্যর মুখ দেখেই বোঝা গেল সে এই নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। সে চুপ করে গেল।

তাপস সিংহ রায় কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি পাক পড়েননি? কিংবা পুতুল ও প্রতিমা?

সূর্য নম্র ভাবে বলল, আমি বাংলা বই বিশেষ পড়িনি।

তাপস সিংহ রায় হঠাৎ উৎকট ভাবে গম্ভীর হয়ে গিয়ে নিজের হাতের বইখানাতে আবার মনোনিবেশ করলেন। এই হামবাগটা প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই লেখা যদি না পড়ে থাকে, তা হলে তাপস সিংহ রায়ের লেখাও নিশ্চয়ই পড়েনি। একে তা হলে এই সভায় এনেছে কেন? তাপস সিংহ রায় সেই জাতীয় লেখক যাঁরা মনে করেন যে-লোক তার লেখা পড়েনি-সে মানুষ হিসেবে গণ্য করার মতন কিছু নয়।

লোকটির ভাবভঙ্গি দেখে সূর্যর একটু মজা লাগল। তার কারাবাস বিষয়ে তার মনে কোনও ভুল ধারণা নেই কিন্তু সে কথা এই লোকটির মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না-এটা একটু আশ্চর্য হবারই মতন। এই কথা শুনে সকলেই কিছু না কিছু প্রশ্ন করে।

তাপস সিংহ রায় সূর্যর চেয়ে বছর দশেকের বড়। রোগা পাতলা চেহারা, ঠোঁট দুটো কালচে, চোখের নীচেও ঘন কালো দাগ। একমাথা চুল, চুলগুলো মাঝে মাঝে কপালে এসে পড়ছে, উনি এক হাত দিয়ে সরাচ্ছেন। এটা প্রায় ওঁর মুদ্রাদোষের মতন। এ ছাড়া, একটু নার্ভাস ধরনের মানুষ শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন না, অনবরত হাঁটু দোলাচ্ছেন, সিগারেটের প্যাকেটটা ক্ষণে ক্ষণে হারাচ্ছেন আর খুঁজে পাচ্ছেন এবং একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। একবার যখন তিনি চোখ থেকে চশমা খুলে তাকালেন, তখন মনে হল, তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

সূর্য ঠিক মিশুকে প্রকৃতির নয়-তবু এই লোকটির সম্পর্কে তার আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু কী ভাবে কথা শুরু করবে, ভেবে পেল না।

একটু বাদেই সভা শুরু হল। সমুখে শান্তি পারাবার' দিয়ে উদ্বোধন। এরপর গানের পর গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, একটি ছেলে আর মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুরো কর্ণ কুন্তী সংবাদ' শোনাল। সূর্যর বেশ ভালোই লাগছে। সবকিছুই যেন তার কাছে নতুন। জেলে থাকতেও আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনাররা মাঝে মাঝে গানবাজনার আসর বসিয়েছে-কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনওই মিল নেই। অধিকাংশ কম বয়সি ছেলে-মেয়ে, তাদের ভয়, লজ্জা ও অহংকার মিশ্রিত মুখ। রেণু আবৃত্তি করল, নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ পরিষ্কার উচ্চারণ, রিনরিনে কণ্ঠস্বর। বাদল শোনাল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্যারোডি, ভগবান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে' ইত্যাদি। লোকেরা খুব হাসল।

সভাপতির জরুরি কাজ আছে বলে তিনি প্রধান অতিথির আগেই ভাষণ দিয়ে ফেললেন। খুব জোরালো বক্তৃতা দিলেন তিনি। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে এ-ধরনের অনুষ্ঠান করার কোনও সার্থকতা নেই, জন্মদিনটাই পালন করা উচিত। মৃত্যুদিনে শোকের ভাবগাম্ভীর্য মোটেই বজায় থাকে না-লোকে আনন্দ করে, ভালো লাগলে হাততালি দেয়। এবং রবীন্দ্রনাথকে ভালোভাবে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যকেও জানতে হবে-কেন না একই নদীর প্রবাহ ইত্যাদি। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যকে যারা রবীন্দ্র-ধুত্তোর

সাহিত্য বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে তারা যে আসলে কত মূর্খ ইত্যাদি। এবং অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তিনি শনিবারের চিঠি পত্রিকাটিকে গালাগালি করতে লাগলেন।

সভাপতির বক্তৃতার সময়েই সূর্য চুপি চুপি সরে পড়বার চেষ্টা করেছিল-কিন্তু বাদলের বন্ধুরা স্টেজের বাইরে সতর্ক পাহারায় রয়েছে। সূর্য এখানে আসবার আগে বাদলকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিয়েছিল যে, সে কোনও বক্তৃতা দিতে পারবে না। স্টেজেও বসবে না। কিন্তু এখন তার কোনও কথাই খাটছে না। তাকে জোর করে স্টেজে বসানো হয়েছে এবং নানা অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তার গুণপনার বর্ণনা দিয়ে তার বক্তৃতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সূর্য কী করে পালাবে বুঝতে পারছে না।

একসময় তাকে মাইকের সামনে দাঁড়াতেই হল। সে অনুভব করল, তার পা কাঁপছে। সে হাজার হাজার জনতার সঙ্গে একসঙ্গে দৌড়েছে, পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতেও ভয় পায়নি-অথচ এখানে এই শ' দু'-এক নারী-পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে আসছে।

সে হাত জোড় করে বলল, আমার বলার কোনও ক্ষমতা নেই। আমাকে ক্ষমা করুন।

শ্রোতারা চেঁচিয়ে বলল, যা হয় একটু কিছু বলুন।

সূর্য বলল, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না।

একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি জেলখানার অভিজ্ঞতার কথা বলুন। বাদলের বন্ধুরাও চিৎকার করে উঠল, হা, হা, জেলখানার অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

সূর্য মাইকের সামনে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার কিছু মনে পড়ছে না। আমার জেলখানার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলার মতনও কিছু নেই-হাজার হাজার লোক জেল খাটছে-এর মধ্যে নতুনত্ব কী আছে?

বলুন, তবু কিছু বলুন

সূর্য লোকজনের মুখের দিকে না তাকিয়ে দূরের দিকে চোখ রাখল। তারপর বলল, আমার শুধু মনে পড়ছে কয়েক জন মানুষের কথা। আমার গুরু যিনি ছিলেন–তার নাম হরকুমার ভট্টাচার্য তিনি বেশ কয়েক বছর পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে ছিলেন। শেষকালে তার টি. বি. হয়। বেলেঘাটায় বস্তির মধ্যে লুকিয়ে থেকে তিনি বিনা। চিকিৎসায় মারা যান। দেশের কাজের জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন–কিন্তু তাঁর নামও এখন কেউ জানে না।...আর একজন, ব্রজগোপাল মিত্র-বেয়াল্লিশের আন্দোলনে তিনিই আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ঝাড়গ্রামের কাছে পুলিশ তাকে লাঠিপেটা করে। মারে, মুখের ওপর বুট জুতো দিয়ে...আরও একজন, তার কথাই আমার বেশি মনে পড়ছে–যোগানন্দদা, আমরা অনেক দিন একসঙ্গে ছিলাম–খড়্গপুরে যখন আমরা দু' জনে একসঙ্গে পালাচ্ছিলাম, যোগানন্দদা আমার থেকে মাত্র তিন-চার হাত দূরে–

একটু থেমে ঢোক গিলে সূর্য আবার বলল, উনি রাস্তার ওপরেই গুলি খেয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। আমি ওঁকে কোনও সাহায্যও করতে পারিনি, এঁদের জন্য কি কোনও দিন কোনও সভাট হবে? জানি না, এঁদের নামও কেউ মনে রাখবে কিনা–

৫৬. দু-এক দিনের মধ্যেই সূর্য

দু'-এক দিনের মধ্যেই সূর্য বুঝতে পারল যে কলকাতায় নিজের বাড়িতেও সে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তার ব্যাপারটা তো ঠিক ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসা নয়। কোনও দিনই সে পুরোপুরি পারিবারিক জীবনের মধ্যে থাকার সুযোগ পায়নি–মাঝখানে কয়েকটা বছর শুধু এক যৌথ পরিবারের মধ্যে নিজেকে মেলাবার চেষ্টা করে বিড়ম্বিত হয়েছে। এখন ফিরে আসার পর এখানে এমন কেউ নেই–যার প্রতি সে। কোনও টান অনুভব করতে পারে।

এত বড় বাড়িতে শুধু বাবা আর ছেলে। বড়বাবু তাঁর সেই তিন তলার ঘরটিতেই আছেন–এত বয়স হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে বেশ হাঁফ ধরে–তবু ঘর বদলাননি। সূর্য থাকে দোতলায়। বাকি ঘরগুলো সব তালাবন্ধ।

বড়বাবু এত দিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়ে তাকে আদরযত্ন করার জন্য খুব উন্মুখ। কিন্তু তিনি জানেন না ছেলে কী খেতে ভালোবাসে, কীসে ছেলের মনে স্ফূর্তি হয়। এসব কথা তিনি মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতেও পারেন না। ঠাকুর-চাকরদের শুধু বারবার সতর্ক করে দেন, দেখবি, দাদাবাবু কী চায়।

বড়বাবুর ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। তাকে চা দেওয়া হয় প্রত্যেক দিন ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়! চা খেয়ে কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করে তিনি নীচে নেমে আসেন। নামবার সময় সিঁড়ির পাশেই ছেলের ঘরে একবার উঁকি মারেন, ছেলেকে তিনি সকাল সকাল ডাকতে চান না। ওর শরীরের ওপর দিয়ে বহু অনিয়ম অত্যাচার গেছে–এখন একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নিক।

কিন্তু প্রত্যেক দিনই দেখেন সূর্য আগেই ঘুম থেকে উঠে একখানা বই নিয়ে পড়তে বসে গেছে। দিনের অধিকাংশ সময়ই সূর্য বই নিয়ে কাটায়। জেলখানা থেকে এই অভ্যাসটি নিয়ে এসেছে।

বড়বাবু তখন সূর্যের ঘরে ঢুকে বলেন, জানলাটানলাগুলো সব খুলিসনি কেন? এত কম আলোয় পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যাবে।

জেলখানার সেলে যে কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছে, বেশি আলোই তার বোধহয় এখনও সহ্য হয় না।

বড়বাবু নিজেই জানলাগুলো খুলে দেন। বাইরের রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। সূর্যর ঘরের নতুন রং করা দেওয়ালগুলো ঝকমক করে। সূর্যর ঘরের দেওয়ালগুলোতে একটাও ছবি বা ক্যালেন্ডার নেই। হঠাৎ বড়বাবুর মনে হয়, সূর্যর।

মায়ের একখানা ছবি বাঁধিয়ে রাখা উচিত ছিল। বুলবুলের একটা মাত্র ছোট ছবি আছে। তাঁর কাছে-বিবর্ণ হয়ে এসেছে এত দিন, যদি বড় করা যায়-।

বড়বাবু বললেন, মুখটুখ ধুয়ে নে। আমি নীচে যাচ্ছি, ঠাকুরকে বলছি জলখাবার দিতে-

বড়বাবু নীচ থেকে খবরের কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ির তদারকি করে আবার ফিরে আসেন দোতলার খাবার ঘরে। সূর্য না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

সূর্য এসে নীরবে টোস্টে মাখন লাগাতে শুরু করে দেয়। তার এক হাতে তখনও বই।

বড়বাবু একদৃষ্টে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোনও কথা খুঁজে পান না। অথচ অনেক কথাই বলার আছে। প্রাপ্তে তু যোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ। কিন্তু ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কোনও সুযোগই তো হল না।

ডিম খেলি না?

সূর্য বই থেকে চোখ না তুলে বলল, না। খেতে ইচ্ছে করছে না।

তোর শরীর ভালো আছে তো?

হুঁ।

তুই বাইরের কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসবি?

এবার বই মুড়ে রেখে সূর্য মুখ তুলে তাকাল। পিতাপুত্রে চোখাচোখি হল, দু'জনেই চোখ সরিয়ে নিল প্রায় একসঙ্গে।

সূর্য বলল, কোথায় যাব?

তোর শরীর সারাবার জন্য যেখানে যেতে ইচ্ছে হয়। যদি কোনও পাহাড়ি জায়গায় যেতে চাস-

আমার শরীর তো বেশ ভালোই আছে।

একথা ঠিক, সূর্যর স্বাস্থ্য এখন বেশ চমৎকার। সুগঠিত দীর্ঘ শরীর, চোখ দুটি উজ্জ্বল। তবে অন্যান্য বাইশ বছরের যুবকদের মতন তার মুখে সেই সরল লাবণ্যের ভাবটা আর নেই। চার বছরের কারাবাসই তাকে অনেক অভিজ্ঞ করে তুলেছে। সে কদাচিৎ হাসে, তবু সেই হাসির সময়েও তার মুখে এই পৃথিবীকে চিনে নেওয়ার একটা ভাব ফুটে ওঠে।

তোর মার কথা তোর একটুও মনে আছে?

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ পরিবর্তনে সূর্য সামান্য একটু চমকে উঠল। বড়বাবু এ-বিষয়ে কোনও দিন সূর্যর সঙ্গে কথা বলেননি। সূর্য মুখ নিচু করে টেবিলের ওপর ডান করতল মেলে সেই দিকে তাকাল। নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ, একটু একটু

তোর মনে থাকার কথা নয়। তখন তোর বয়স খুবই কম। অবশ্য তোর দু'জন মা ছিল। দ্বিতীয় মায়ের কথা হয়তো–

দু'জনের কথাই আমার মনে আছে।

তোর নিজের মা আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই কথাটা বলে বড়বাবু তীব্র চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে চান। তাঁর এই দুর্বোধ্য স্বভাবের ছেলের কোনও দিকে কোনও দুর্বলতা আছে কিনা–এটা জানা যেন তার বিশেষ দরকার।

সূর্য স্বাভাবিক গলায় বলল, কেন?

তা আমি জানি না। কেউ জানে না।

দু'জনেই একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বড়বাবু বললেন, তোর মা খুব বড় শিল্পী ছিলেন। যারা তাঁকে দেখেছে-কোনও দিন ভুলতে পারবে না।

সূর্যর মুখ দেখে মনে হয়, সে তার মায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে কারওর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না। এমনকী, নিজের বাবার সঙ্গেও না। সে যেন খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ার জন্যই ছটফট করছে।

তোর মায়ের অনেকগুলো মোহর আছে আমার কাছে। সেগুলো আমি তোর কাছেই দিয়ে যেতে চাই।

আমি নিয়ে কী করব?

আমার যা কিছু আছে, তোকে এবার বুঝে নিতে হবে। আমি আর কত দিন থাকব। এবার তো একদিন যেতেই হবে।

সূর্য খুব বুদ্ধিমানের মতন মৃত্যুর প্রসঙ্গটা বুঝতে পেরেও ভাবাবেগের প্রশ্রয় দিল না। সেটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আপনি কি শিগগিরই কোথাও যাচ্ছেন।

বড়বাবুও বুঝতে পারলেন ছেলের মনোভাব। তিনিও একটু ইতস্তত করে বললেন, ভাবছি একবার এলাহাবাদ, গোয়ালিয়ার-ওই সব দিকে ঘুরে আসব। তোর মায়ের অনেক স্মৃতি আছে ওই সব জায়গায়। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

আপনি একাই ঘুরে আসুন।

তুই তা হলে এখানে একলা একলা কী করবি?

আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

সূর্য উঠে পড়ল টেবিল থেকে। বড়বাবু একটু আহত ভাবে তাকিয়ে রইলেন। নিজের মায়ের সম্পর্কেও ছেলেটার আগ্রহ এত কম? অথচ তিনি তার মায়ের কথা শুনবার জন্য

বার বার ছুটে যেতেন ভবানীপুরে। বড়বাবু চুপ করে ভাবতে লাগলেন নিজের মায়ের কথা। প্রায় সত্তর বছর আগে মৃতা এক কিশোরী বালিকা ছিল তার মা-এ কথা ভাবতে কী রকম অবাক লাগে। যারা মরে যায়, তাদের বয়স বাড়ে না। স্মৃতিতে তার মায়ের-চেহারা অন্যদের মুখে শুনে শুনে তিনি নিজে সেটা সৃষ্টি করেছেন-চিরকাল কিশোরীই থেকে যাবে, আর তাঁর ছেলে আজ বার্ধক্যের মধ্য সীমায়-

ঘোর ভেঙে বড়বাবু উঠে পড়লেন। মনে মনে ঠিক করলেন, যে-কোনও উপায়েই হোক চিররঞ্জনকে সপরিবারে এ বাড়িতে আবার ফিরিয়ে আনতেই হবে। আর কেউ উপস্থিত না থাকলে-ছেলের সঙ্গে একা একা তিনি কিছুতেই কথাবার্তা জমাতে পারছেন না। তার নিজেরও তো কথা বলার কোনও সঙ্গী নেই। অথচ তিনি ভেবে রেখেছিলেন, ছেলেটা ফিরে এলে তার মনের গুমোট কেটে যাবে, সারা বাড়িটাও আবার জমজমাট হয়ে উঠবে।

সূর্য সারা দিনই প্রায় নিজের ঘরেই বই নিয়ে কাটায়। কোথায় যাবে বুঝতে পারে। তার কোনও বন্ধু নেই। পলাতক জীবন শুরু হবার পর থেকে সে যাদের সঙ্গে। কাটিয়েছে, তাদের কথাই বার বার মনে পড়ে। তারা তো অনেকেই বেঁচে নেই, কিংবা কোথায় থাকে সে জানে না। তার জীবনদর্শন এখন অনেকটা বদলে গেছে। এখন তার প্রায়ই মনে হয়, যোগানন্দর মৃত্যুর জন্য সেই অনেকটা দায়ী। যোগানন্দ দল ছেড়ে সংসারের আশ্রয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল। সূর্য অতখানি হিংস্রতার সঙ্গে তাকে টেনে বার না করলেই তো পারত। তাতে কী ক্ষতি হত দেশের? মহাসমুদ্রের মতন এই দেশে সবকিছুই তলিয়ে যায়, কোনও কিছুতেই আঁচড় পড়ে না।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকের মতন মনে পড়ে যায় শ্রীলেখার কথা। সূর্যর মাঝে মাঝেই দৃষ্টি বিভ্রম হয়-সে হঠাৎ হঠাৎ শ্রীলেখাকে দেখতে পায়। তার নাকে ভেসে আসে শ্রীলেখার চুল কিংবা শরীরের গন্ধ। যেন এইমাত্র শ্রীলেখা কাঁদল। বই থেকে মুখ তুলে সূর্য দরজার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শ্রীলেখার অপূর্ব সুন্দর থুতনি সে কাল্পনিক। হাতে স্পর্শ করে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাবে, জেলে থাকতে থাকতে তার মনটা দুর্বল হয়ে গেছে। এ রকম দিবাস্বপ্ন দেখার অভ্যাস তো তার ছিল না আগে।

দু'-এক দিন বাড়িতে বন্ধ থাকার পর সূর্য ঠিক করল সে তার জেলখানার সঙ্গীদের সঙ্গেই গিয়ে দেখা করবে। অতুপ্রসাদের বাড়ি বসিরহাটের দিকে। সেখানে গিয়ে তাকে সে শুনিয়ে আসবে লেবু গাছটার কথা?

তার আগে সে গেল শান্তিপ্রসাদের বাড়িতে। রাজবল্লভ পাড়ায় ওদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে সূর্য একটা আঘাত পেল। জেলখানাতেই শান্তিপ্রসাদের মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছিল, সে রোগ আর সারেনি–এখন সে বদ্ধ উন্মাদ। অন্যরা সবাই ছাড়া পেলেও শান্তিপ্রসাদের আর মুক্তি নেই। শান্তির বাবা সূর্যর পরিচয় পেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

সূর্যর মুখ দিয়ে কোনও কথা সরে না। সে জানে না কোনও সান্ত্বনা বাক্য। তার মনে পড়ে, শান্তিপ্রসাদের বড় বড় জুলপির চুল ধরে টেনে উপড়ে দিয়েছিল এক সি আই ডি অফিসার। শান্তিপ্রসাদ তখন একটুও চাচায়নি। তার পায়ের ওপর জুতোসুদ্ধ দাঁড়িয়ে নাচানাচি করেছে দু'জন পুলিশ–তখনও মনের জোর অটুট ছিল শান্তিপ্রসাদের–তবু কেন মোটামুটি নিরুপদ্রব কারাবাসের সময়ে শান্তিপ্রসাদ পাগল হয়ে গেল কে জানে। মায়ের মৃত্যুসংবাদ কী শারীরিক অত্যাচারের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে?

হঠাৎ সূর্যর অসম্ভব রাগ হয়। ইচ্ছে করে যে-কোনও একটা জিনিস হাতে নিয়ে মট করে ভেঙে ফেলে। দেওয়ালে শান্তিপ্রসাদ আর তার মায়ের যে ছবিটা ঝুলছে–সেটাই আছড়ে ভেঙে ফেললে কেমন হয়!

শান্তিপ্রসাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সূর্য কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। সে ভাবে যে তার একটা কিছু করা দরকার। জেল থেকে ছাড়া পাবার আগে সে প্রায়ই ভাবত, কোনওক্রমে বাইরে বেরোতে পারলে আবার এই সংগ্রামেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখাই তার স্বভাব নয়–স্বাধীনতার লড়াইও তার নিজের জীবনে অন্তত অসমাপ্ত রাখবে না।

কিন্তু কী ভাবে কাজ শুরু করবে, কোন দল, কিছুই সে জানে না। তার নিজের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম যখন সে হরকুমারের সংস্পর্শে আসে–তখন তার কোনও রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল না–সে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নিছক জেদের বশে। জেলখানায় কিছু কিছু বই পড়ে সে খানিকটা তত্ত্ব শিখেছে–কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতি সম্পর্কে তার এখনও কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি। গুপ্ত সমিতিতে–যারা কাজ করেছে প্রকাশ্য জীবনে, যেখানে বহু মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হয়–সেখানে তারা দিশেহারা হয়ে যায়। নতুন জোয়ার এসেছে গণ-আন্দোলনের–এখানে পুরনো কায়দার বিপ্লবীরা অপাঙক্তেয়।

তা ছাড়া, সূর্য লক্ষ করছে, কলকাতায় রাজনৈতিক তৎপরতা হঠাৎ যেন কমে গেছে। আগেকার মতন মিছিল কিংবা সভাসমিতিও তার চোখে পড়ে না। যুদ্ধ শেষের পর মারাত্মক ইনফ্লেশানে যে-যার সংসার সামলাতে ব্যস্ত। রাম শ্যাম যদু মধু যারা সকলেই যুদ্ধের সময় কিছু না কিছু চাকরি পেয়েছিল–এখন পটাপট চাকরি চলে যাচ্ছে। চালের দোকান, কাপড়ের দোকান শুধু নয়-কয়লার দোকানের সামনেও লম্বা লাইন। বাড়ির ঝি চাকররাও কন্ট্রোল আর লাইন–এই ইংরেজি শব্দ দুটি সব সময় ব্যবহার করে।

একদিন ক্ষিতীশদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে। কাঁধে একটা বিরাট থলেতে ভরতি স্কুলপাঠ্য বই। ব্রজগোপালের সঙ্গে শিয়ালদার এক মেসে এই ক্ষিতীশদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সূর্যর। পুরনো আমলের দেশকর্মী ছুটকোছাটকা ভাবে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন। এঁকে দেখে সূর্য খুব খুশি হয়ে উঠল–তবু নিজেদের পুরনো দিন সম্পর্কে কথা বলা যাবে।

ক্ষিতীশদা প্রথমে চিনতে পারলেন না সূর্যকে। ভুরু কুঁচকে বললেন, কে বলো তো তুমি, ভাইটি? কোথায় দেখেছিলে আমায়, রাজসাহীতে? তুমি কি রাজসাহীর মনোরঞ্জনদার ছেলে?

সূর্য পূর্ব পরিচয় দিতেই ক্ষিতীশদা বললেন, ওহহ, তুমি সেই যুবরাজ? তোমাকে ভুলে যাওয়া তো আমার উচিত হয়নি। চেহারা অনেক বদলে ফেলেছ। ব্রজগোপাল যে দিন প্রথম তোমাকে নিয়ে এল, আমি বলেছিলাম, এই যুবরাজটিকে কোথায় পেলে!

সূর্য জিজ্ঞেস করল, আপনি এত বইপত্তর নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন? ক্ষিতীশদা সূর্যর হাত ধরে বললেন, বলছি, সব বলছি। এসো, একটু গোলদিঘিতে বসি–দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলা যাক।

ক্ষিতীশদার বয়স এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। এর মধ্যেই চোখের নীচে কালো ছোপ। কিন্তু মুখে হাসি লেগে আছে।

বই-ভরতি থলেটা পাশে নামিয়ে রেখে তিনি হাতছানি দিয়ে একটা আলুকাবলিওয়ালাকে ডাকলেন। পচা আলু যাতে না দেয় এবং কাবলি ছোলা যাতে বেশি পরিমাণ দেয়–শ্যেনচক্ষে সেদিকে নজর রেখে দান দেবার সময় আবার দরাদরি করতে লাগলেন। সূর্য কিছু একটা বলতে যেতেই তিনি বললেন, উঁহু, তুমি কোনও কথা বলবে না, আমি আজ তোমাকে খাওয়াচ্ছি। চারটি ফুটো পয়সা লোকটিকে গুণে দিয়ে তিনি সূর্যর হাতে একপাতা আলুকাবলি তুলে দিলেন এবং নিজে একটা নিয়ে বেশ হারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলেন। বললেন, প্রায় দু মাস বাদে শখ করে চারটি পয়সা খরচ করলাম, বুঝলে ভাইটি? দিনকাল বড় খারাপ।

সূর্য অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ক্ষিতীশদা বললেন, তোমার কী খবর বলো? রোজগারপাতির কিছু ব্যবস্থা আছে? না হলে আমি সুরেশদাকে ধরতে পারি–

সূর্য জিজ্ঞেস করল, দাদা, আপনি কী করছেন?

ক্ষিতীশদা একগাল হেসে বললেন, আমি? আমি এখন জোয়াল বইছি। এত দিন তো বেশ জেলের ভাত জুটে যাচ্ছিল–এখন আর কে খেতে দেবে বলো? বিয়ে করে ফেলেছিলাম অনেক আগে–সব দায় দিয়ে রেখেছিলাম আমার বাপের ঘাড়ে–বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে

আমাকে বিপদে ফেলে দিলেন। এখন গোটা সংসারের জোয়াল আমার ঘাড়ে। রোজগারপাতি করা কি সোজা? আমরা নামকাটা সেপাই–আমাদের তো আর কোথাও চাকরি জুটবে না। গিয়ে ধরলাম সুরেশদাকে। সুরেশদা বললেন, চাকরি তো দিতে পারছি না–কিছু লেখেটেখো, যা পারি দেব। লিখে মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা পাই–তাতে তো আর সংসার চলে না। তাই এই বইয়ের ব্যবসা ধরেছি। ইস্কুলে ইস্কুলে গিয়ে টেক্সট বই সাপ্লাই করি। হেডমাস্টারদের কাছে গিয়ে প্রাক্তন রাজবন্দি–এই বলে কাঁদুনি গাই! হে-হে-হে-হে।

যেন এটা একটা দারুণ হাসির ব্যাপার। ক্ষিতীশদা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললেন, আমি গুজব শুনেছিলাম, তুই মারা গেছিস।

সূর্য হেসে বলল, না, মরিনি। ভালো, ভালো। বড় খুশি হয়েছি। অনেকেই তো মরেহেজে গেছে। যে কটা বেঁচে আছে আমার মতন–এখন পেটের জ্বালায় ধুকছে। তোর কম বয়স, বড় খুশি হয়েছি, আর এক পাতা আলুকাবলি খাবি?

না।

তুই তা হলে এখন কী করবি?

সেই কথাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি। আমাদের এখন কী করা উচিত? এই সময়ে আমাদের কি কিছুই করার নেই?

ক্ষিতীশদা মুখে একটা তিক্ত ভঙ্গি করে বললেন, কিছু না, কিছুনা। এ-পোড়ার দেশের জন্য আর কিছু করা উচিত না। এখন যে-যার নিজের ধান্দা দেখো।

কিন্তু ক্ষিতীশদা, আমরা এত দিন যা করলাম, তা সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

হয়ে যাবে কী, হয়ে গেছে। সব নষ্ট। কী চলছে এখন এ-দেশে? একে কি রাজনীতি বলে? না কুকুরের কামড়াকামড়ি?

সূর্য একটু দুঃখিত ভাবে বলল, ক্ষিতীশদা, আমরা কি তবে সব চুপ করে দেখব?

ক্ষিতীশদা ধমক দিয়ে বললেন, তা ছাড়া কী করবি? গোল্লায় যাক এ-দেশ! এ-দেশের কিছু হবে না। এখন দরকার কাদের জানিস, যারা এদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে! আমরা কী জন্য স্বাধীনতার লড়াই করলাম? কতকগুলো ব্যবসায়ী আর ব্যারিস্টারের হাতে ক্ষমতা যাবে বলে? এখন সব শালা হিন্দু-মুসলমান নিয়ে লাফাচ্ছে?

আর কিছুক্ষণ কথা বলার পর ক্ষিতীশদা উঠে চলে গেলেন। বইয়ের থলিটার ভারে তাকে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতে হয়। সেই অবস্থায়ই বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে দৌড়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লেন।

সূর্য আরও কিছুক্ষণ বসে রইল সেই বেঞ্চে। বর্তমানের রাজনীতি সে সত্যিই বুঝতে পারে না।

দেশে একটা হাওয়া উঠে গেছে যে, ইংরেজ এবার সত্যিই এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ১৯৪৮ সালেই তারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করছে। এখন স্বাধীনতার প্রশ্ন আর বড় নয় এখন শুধু ভাগাভাগির প্রশ্ন। আবার এসেছে ক্যাবিনেট মিশন, লর্ড ওয়াভেল গান্ধীর সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠকে বসছেন–আর সব বানচাল করে দিচ্ছেন জিন্না। গান্ধীজি যতই ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম করুন, জিন্নাসাহেবের চোখে তিনি হিন্দুই রয়ে গেলেন এবং কংগ্রেস নিছক হিন্দুর পার্টি। এই কংগ্রেসের হাতে দেশের ভার দিয়ে গেলে মুসলমানদের জীবন বিপন্ন হবে। জিন্না ততদিনে এ-দেশের মুসলমানদের প্রায় বুঝিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে পাশাপাশি শান্তিতে থাকা সম্ভব নয়। হিন্দু আর মুসলমানরা এতকাল পরে ঘুম ভেঙে উঠে জানতে পারল যে তারা দুটো আলাদা জাত, তাদের দেশও আলাদা।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা এবং তিনি। পাকিস্তান চিন্তার বিরোধী বলে কলকাতার মুসলমানরা ইদের নামাজের সময় তাঁকে ইমামের কাজ

করতে দিতে অস্বীকার করে। ইসলামি শাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিতকেও হিন্দু ঘেঁষা অপবাদ নিতে হয়। জিন্না তাকে অত্যন্ত কটু ভাষায় জানান, I refuse do discuss with you by correspondence or otherwise, as you have completely forfeited the confidence of Muslim India.

মুসলিম ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের চেহারা যে কী রকম হবে, সে সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। অনেকেই ভাবছে-মুসলমান প্রধান রাজ্যগুলিতে আলাদা আলাদা পাকিস্তান হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরা ভাবছে তারা সকলেই পাকিস্তান হলে তার সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীর চক্রান্ত যাদের চোখে ধরা পড়েছে-তারাও এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

সূর্য এর আগের সময়টাই জেলে কাটিয়েছে বলে রাজনীতির এই নতুন অবস্থাটার, সঙ্গে সে পরিচিত ছিল না। এখন সে বাইরে এসে দেখছে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটাই দেশ জুড়ে আলোড়ন তুলেছে-অথচ এ সম্পর্কে তার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। এখন যদি তাকে আবার নতুন করে লড়াই শুরু করতে হয় তা হলে কার বিরুদ্ধে লড়াই হবে?

নিজে সে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না বলেই ক্ষিতীশদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইল। প্রায়ই সে কলেজ স্ট্রিটে চলে এসে ক্ষিতীশদার সঙ্গে দেখা করে।

একদিন ক্ষিতীশদা বললেন, চল, তোকে সুকল্যাণের বাড়িতে নিয়ে যাই। সুকল্যাণকে মনে আছে তোর?

সূর্য বলল, এই নামের কারওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

ক্ষিতীশদা অবাক হয়ে বললেন, সুকল্যাণকে চিনিস না? দীপ্তি? দীপ্তিকেও চিনিস না?

সূর্য এবারও দু' দিকে মাথা নাড়ল।

ক্ষিতীশদা বললেন, চল, তোর আলাপ করলে ভালো লাগবে। আমাদের পুরনো লোক। আমি প্রায়ই দীপ্তির হাতে চা খেয়ে আসি।

সূর্য সত্যিই এর আগে সুকল্যাণ কিংবা দীপ্তি এই নামের কারওকে দেখেনি। তবু সে কৌতূহলী হয়ে ক্ষিতীশদার সঙ্গে চলল।

হাজরার মোড়ের কাছেই মোটামুটি একটা নতুন বাড়ির দোতলায় উঠে গেলেন ক্ষিতীশদা। সিঁড়ির কাছটা একটু অন্ধকার ছিল। তাই যে-মহিলা দরজা খুললেন, সূর্য তাঁর মুখটা ভালো দেখতে পায়নি।

মহিলাটি সূর্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কী, তুমি? কেমন আছ?

সূর্য বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল।

মহিলাটি মুখ টিপে হেসে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? চিনতে পারছ না?

মহিলাটির মাথায় কোঁকড়া চুল পাতা কেটে আঁচড়ানো। ধারালো মুখ, সোনালি ফ্রেমের চশমা। ঠোঁটে চাপা হাসি। সূর্য ঘরের মধ্যে পা দেবার পর তিনি জিজ্ঞেস। করলেন, কী অমর, এখনও চিনতে পারছ না?

সূর্য অস্ফুট গলায় বলল, বনলতা মাসি?

মহিলাটি ক্ষিতিশদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ক্ষিতিশদা, একে কোথা থেকে পেলেন?

ক্ষিতীশদা কাঁধের ঝোলাটি এক পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম। কলকাতার রাস্তায় এখনও এ রকম দু-একটা মণি মানিক্য মেলে। নে দীপ্তি, একটু চায়ের জল বসা। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

মহিলা আবার সূর্যর দিকে চেয়ে বললেন, আমার নাম বনলতা নয়। আমার নাম দীপ্তি।

সূর্য বলল, আমার নামও অমর নয়। আপনি আমাকে অমর বলেই জানেন। আমার নাম সূর্য।

মহিলা অবাক হয়ে বললেন, তুমিই সূর্য?

ক্ষিতীশদা বললেন, আমার নাম কিন্তু সত্যিই ক্ষিতীশ ভটচায়। আমার আর অন্য নামটাম নেই!

ক্ষিতীশদার বলার ধরনে ওরা হেসে উঠল।

সূর্য জিজ্ঞেস করল, ননী মেলোমশাই কোথায়?

দীপ্তি বললেন, উনি এখনও জেল থেকে ছাড়া পাননি।

ক্ষিতীশদা জিজ্ঞেস করলেন, ননী আবার কে?

দীপ্তি হাসতে হাসতে বললেন, দীনেনদার ভাই রণেন। সে আমার বর সেজেছিল একসময়, আপনি জানেন না? এই ছেলেটা আবার তার সঙ্গে মেলোমশাই সম্পর্ক পাতিয়ে ছিল।

ক্ষিতীশদা বললেন, উঃ, তোদের এই নামের গোলমাল নিয়ে আর পারা যায় না। যত সব নাটুকে কারবার। ও-সব চুকে বুকে গেছে, এখন ছাড় তো।

দীপ্তি বললেন, এর নামটাও তো আমি জানতাম না। সূর্যর কীর্তিকাহিনী আমি এর-তার মুখে কিছু কিছু শুনেছি কিন্তু সে যে আমাদের এই অমর, তা আমি বুঝব কী করে?

বছর সাতেক আগেকার ঘটনা হলেও সূর্যর এখনও সব মনে আছে। চন্দনগরের একটা নির্জন ভাঙা বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য তারা সংসার পেতেছিল–বনলতা আর ননীমাধব এসেছিল স্বামী-স্ত্রী সেজে–ডাকাতির অ্যাকশনের পর সূর্যর হাঁটুতে চোট লাগায় বনলতা কত যত্ন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই বনলতা আজকের দীপ্তি।

দীপ্তি বললেন, আমাকে আর মাসিটাসি বলতে হবে না। দিদি বলবে এখন থেকে। তোমার তো নিজের দিদি নেই-

সূর্য বলল, আপনার মনে আছে?

আমার সব মনে আছে। তুমিই আমাকে দেখে চিনতে পারোনি।

চিনতে ঠিকই পেরেছিলাম। ক্ষিতীশদা অন্য নাম বলে নিয়ে এসেছিলেন তো–

যোগানন্দকে তুমিই মেরেছ?

না, না, আমি মারিনি।

দলের সবাই জানে-যোগানন্দকে তুমিই শাস্তি দিয়েছ-তার ডেডবডি পড়ে ছিল রাস্তায়-

সূর্য উত্তেজিত ভাবে বলল, এটা একদম ভুল। আমি পারলে যোগানন্দদাকে সর্বশক্তি দিয়ে বাঁচাতাম সেই সময়। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি। যোগানদার পুরনো কথা ভুলে যান-ফর্টি টু তে উনি যা করেছেন-ওঁর নামে স্মৃতিস্তম্ভ হওয়া উচিত।

ক্ষিতীশদা বললেন, যোগানন্দ বড় আনস্তুপুলাস ছিল হে। ওকে কেউ কোনও দিন সম্মান করবে না।

সূর্য যোগানন্দকে সমর্থন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একমাত্র সেই যোগানন্দের সঙ্গে দিনের-পর-দিন কাটিয়েছে-তার অনেক দুঃখ-পথের সঙ্গী। কিন্তু দীপ্তি বা ক্ষিতীশদা সেকথা শুনতে চাইলেন না।

এরপর একে একে আরও পুরনো বন্ধুদের কথা উঠল। কেউ মারা গেছে, কেউ এখনও জেলে, কেউ এখন দেখা হলেও ওদের সঙ্গে কথা বলে না। দল ভেঙে গেছে, যুদ্ধ করার স্পৃহা আর কারওর নেই। তবু পুরনো গল্প বলতে ভালো লাগে। ক্ষিতীশদা চন্দননগরের

সেই বাড়ির বৃত্তান্ত ভালো জানেন না-খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। দীপ্তি এক একটা বলেন আর হাসিতে ফেটে পড়েন।

জানেন ক্ষিতীশদা, এই ছেলেটা তখন সাঁতার জানত না। সাঁতারও জানে না আবার বিপ্লবী হবার শখ। আমাকে ধরেছিল সাঁতার শিখিয়ে দেবার জন্য-এত বড় বুড়ো ধাড়ি ছেলেকে কি কোনও মেয়ে সাঁতার শেখাতে পারে! তারপর, ওই বাড়িটার সিঁড়িতে আবার একটা ভিমরুলের চাক ছিল-এর যা ভয়, কিছুতেই সিঁড়ির ওই জায়গাটা দিয়ে একলা যেতে পারে না-আমি ভেবেছিলাম, এ একটা বড়লোকের আদুরে ছেলে, ভিতুর ডিম-এর দ্বারা কোনও কাজ হবে না। কিন্তু ব্রজগোপালদা যে-দিন এর সাহসের কথা বললেন–

ক্ষিতীশদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ব্রজ মানুষ চিনতে কখনও ভুল করত না।

ব্রজগোপালের কথা এসে পড়ায় তিন জনেই একসঙ্গে হঠাৎ চুপ করে যায়। ব্রজগোপালের বীভৎস মৃত্যুর কথা ওদের মনে পড়ে। কেউ আর সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে না।

দীপ্তি একটি মেয়েদের স্কুলে পড়ান। মাঝখানে কিছু দিন সিকিউরিটি প্রিজনার হিসেবে হিজলি জেলে ছিলেন-ফিরে এসে চাকরিটা ফেরত পেয়েছেন। এই ফ্ল্যাটে তিনি আর একজন শিক্ষিকা একসঙ্গে থাকেন। অন্য জন কয়েক দিনের জন্য দেশের বাড়িতে গেছেন। এবাড়িরই ওপরের একটা ফ্ল্যাটে সুকল্যাণ নামে ওদের প্রাক্তন দলের একজন পুরনো কর্মী সস্ত্রীক থাকেন-তারা দরকার হলে সাহায্য করেন এঁদের।

দুখানি ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। দীপ্তির ঘরখানি সুন্দর ঝকঝকে তকতকে ভাবে সাজানো। একটি খাট, একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার। দেওয়ালে শুধু স্বামী বিবেকানন্দর একটি ছবি। বইয়ের র‍্যাকে সমস্ত বই খাকি কাগজ দিয়ে এক ভাবে মলাট দেওয়া-কোনও বইয়ের নাম পড়া যায় না।

ঘরের মধ্যে স্টোভ জ্বেলে দীপ্তি তা তৈরি করলেন গল্প করতে করতে। পেয়ালা পিরিচগুলো নতুনের মতন পরিষ্কার। দীপ্তির শরীরেও কোথাও এক ছিটে ময়লা নেই।

কথায় কথায় অনেক সময় চলে গেল। ক্ষিতীশদাকে এবার উঠতে হবে। তিনি বললেন, চল সূর্য, যাবি নাকি?

সূর্য উঠে দাঁড়াল। ক্ষিতীশদা দীপ্তিকে বলল, শোন। ভালো কথা, তোর ইস্কুলে আমার কিছু বইপত্তর বিক্রির ব্যবস্থা করে দিতে পারবি? ইস্কুলের লাইব্রেরি নেই?

দীপ্তি বললেন, হ্যাঁ আছে। আপনি এমনি আসুন না একদিন আমাদের স্কুলে। কিন্তু আপনি নিজে বইগুলো ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ান কেন–

ক্ষিতীশদা বললেন, কী করব? আমার আর কে আছে বল?

কিন্তু এটা মোটেই ভালো দেখায় না। আমরা কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি না? আমি এখানকার কংগ্রেস কমিটিকে বলে আপনার একটা কাজের ব্যবস্থা

কংগ্রেসের কাছ থেকে দয়া নেব? দুর দুর দুর!না খেয়ে থাকব সেও ভালো। তুই কি আজকাল কংগ্রেসে ভিড়েছিস নাকি?

না, ঠিক যাইনি। তবে লাবণ্যদি প্রায়ই বলেন, কংগ্রেস কমিটির মহিলা বিভাগে যোগ। দিতে। একটা কিছু তো করতে হবে।

পলিটিকসের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। দেখ দীপ্তি, আমরা ছিলাম পেট্রিয়ট, আমরা যুদ্ধ করতে পারতাম কিন্তু পলিটিকস করা আমাদের দ্বারা পোষাবে না। ওসব বেনে কিংবা ব্যারিস্টারদের কাজ। বেনে ইংরেজের সঙ্গে টক্কর লড়ছে আমাদের বেনের। বাচ্চা গান্ধী।

দীপ্তি একটু আহত ভাবে বললেন, ক্ষিতীশদা মহাত্মাজি সম্পর্কে এ রকম ভাবে বলবেন না।

তারপর সূর্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কী করবে ঠিক করেছ?

সূর্য বলল, কিচ্ছু না।

দরজার কাছে এসে দীপ্তি সূর্যকে বললেন, আবার এসো।

সূর্য এই কথাটারই প্রতীক্ষা করে ছিল। দীপ্তির মুখ থেকে এই নিমন্ত্রণটুকু না পেলে আজ রাত্তিরটা সে খুব দুঃখিত হয়ে থাকত। অনেক দিন বাদে আজ সন্ধ্যাবেলা তার সময়টা সত্যিই খুব ভালো কাটল।

পরদিন সকালবেলাতেই সূর্য এসে দাঁড়াল দীপ্তির ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। দরজা খুলে দীপ্তি একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

সূর্য বলল, এমনিই এলাম।

সূর্যর মুখখানা ভাবলেশহীন, সে স্থির চোখে দীপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন তার কিছু একটা গোপন কথা আছে, যা বাইরে দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

দীপ্তি সরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে ভেতরে আসতে দিলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?

না।

এদিকে কোথাও এসেছিলে?

আপনার কাছেই এসেছি।

দীপ্তি এবার হেসে বললেন, আমাকে যে একটু বাদেই চান করে খেয়ে ইস্কুলে যেতে হবে? এখনও রান্না বাকি আছে।

সূর্য বলল, আপনি রান্না করুন না, আমি বসছি।

দীপ্তি সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না। চায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য চা খাবে না। গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেলেটা কি বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছে?

দীপ্তি টুকিটাকি সংসারের কাজ সারতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে দেখে যেতে লাগলেন সূর্যকে। সে স্থির হয়ে বসে আছে ঠিক একই রকম ভাবে। ছেলেটা সত্যিই অদ্ভুত। কারোকে এ রকম ভাবে বসে থাকতে দেখলে অস্বস্তি লাগে। দীপ্তি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বইটই পড়বে কিছু?

সূর্য বলল, আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না।

স্নানটান সেরে দীপ্তি এবার খেতে বসবেন। কিন্তু ঘরে অন্য পুরুষ থাকলে কোনও মেয়ে কি একা খেতে পারে? তিনি বললেন, ওরে বাবা, পৌনে দশটা, আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে।

সূর্য ইঙ্গিত বুঝল না। বলল, আমিও আপনার সঙ্গে বেরোব।

আমি খেতে বসব এখন। তুমিও আমার সঙ্গে খেয়ে নেবে?

না।

এসো না, একটু কিছু খাও।

না, আমার কিছু দরকার নেই–

দীপ্তি প্লেটে করে খানিকটা তরকারি সূর্যর সামনে এনে বললেন, একটু টেস্ট করে দেখো, আমি কী রকম রান্না করলাম–

আপনার রান্না তো আমি খেয়েছি চন্দননগরে।

এখন একটু খেয়ে দেখো–

একটু বাদে দীপ্তি ঘরে তালা দিয়ে বেরোলেন। সূর্যও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল রাস্তায়, তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনার স্কুল কোন দিকে?

কেন, তুমি আমার স্কুলে যাবে নাকি?

না। আপনি স্কুল থেকে কখন ফেরেন?

ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়। আমার ফিরতে ফিরতে সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা হয়।

আর কোনও কথা না বলে সূর্য উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সে-দিন দীপ্তি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার দু-এক মিনিটের মধ্যেই সূর্য এসে হাজির হল। খানিকটা অভিযোগের সুরে বলল, আপনি বলেছিলেন ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফেরেন। এখন সাড়ে ছ'টা বাজে।

দীপ্তি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি?

সূর্য নির্লজ্জের মতন বলল, হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে কি তোমার জরুরি কোনও কথা আছে?

না। আপনি কি সন্ধ্যাবেলা কোথাও বেরোবেন?

উঁহু! কেন বলো তো?

তা হলে আমি আপনার এখানে কিছুক্ষণ থাকব।

তোমার কী ব্যাপার বলো তো?

আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমি কি এখানে একটু বসতে পারি?

হ্যাঁ, বসো। বাঃ, আমি কি বারণ করেছি নাকি?

তবু দীপ্তির মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি রয়েই যায়। স্কুল থেকে ফিরে এখন কাপড় ছাড়া, গা-ধোওয়ার সময়। পাশের ঘরটা ব্যবহার করলেও-একজন যদি এখানে একা একা বসে থাকে। পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস আছে দীপ্তির-পুরনো সহকর্মীরা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে-অন্য কেউ এলে এ রকম অস্বস্তি হয় না-কিন্তু এই ছেলেটি বিশেষ কিছু কথা বলে না বলেই এর কাছে স্বাভাবিক হওয়া যায় না কিছুতেই।

খানিকটা বাদে দীপ্তি স্নান সেরে শাড়ি বদলে আবার এ-ঘরে এলেন। হাতে এক বাটি মুড়ি। বাটিটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, এই নাও সূর্য। তুমি ঝাল খাও? কঁচালঙ্কা লাগবে?

সূর্য মাথা নোওয়াল। দু'টি কঁচালঙ্কা নিয়ে এসে দীপ্তি সূর্যর মুখোমুখি বসলেন। এক বাটি থেকেই দু'জনে মুড়ি তুলে তুলে খাচ্ছে। সূর্য নির্নিমেষে চেয়ে আছে দীপ্তির মুখের দিকে।

দীপ্তি বললেন, তোমার তো মা নেই, তুমি বলেছিলে। বাবা ছাড়া আর কে আছেন?

সূর্য বলল, কেউ নেই।

তাই তো, সারা দিন কি আর বাড়িতে একা একা থাকা যায়? তুমি এখন কী করবে ভাবছ? আবার কলেজে ভরতি হবে?

না।

বাঃ। পড়াশুনো করবে না আর?

অন্য কারওর কাছ থেকে আমার আর কিছু শেখার নেই।

তোমার বাড়ির অবস্থা বোধহয় ভালো, চাকরি বাকরি করার দরকার হবে না।

তাই মনে হয়।

তোমার বাবা কিছু বলেন না?

কী বলবেন?

তোমার বাবা কী বলবেন, তা আমি কী করে জানব? আমি জিজ্ঞেস করছি, তিনি কিছু বলেন কিনা।

না।

তুমি ভারী অদ্ভুত ছেলে। আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।

আমার কোনও বন্ধু নেই।

সেই জন্যই তুমি অদ্ভুত। তোমার বয়সের ছেলেরা এই সময় রাস্তায় রাস্তায় হইহই করে ঘুরে বেড়ায়। সিনেমা থিয়েটার দেখে, খেলার মাঠে যায়-আর তুমি আমার। এখানে চুপচাপ বসে আছ।

যে-বয়সটায় আমার ওইসব শুরু করার কথা, সেই বয়সটা আমি কী রকম ভাবে কাটিয়েছি আপনি তো জানেন?

আহাহা, তোমার এখনও এমন কিছু বয়স হয়নি। বাচ্চা ছেলে! আমিও তো বাবা জেল খেটেছি, কিন্তু এখন আমার আবার সবকিছু মানিয়ে নিতে তো কোনও অসুবিধা হয়। না।

দীপ্তিদি, আপনি বুঝবেন না। আমি নিজের হাতে দু' জন লোককে খুন করেছি- মরার ঠিক আগে আর মরার ঠিক পরে তাদের মুখ যে ভাবে বদলে গেছে, আমি তা দেখেছি। আমার থেকে মাত্র তিন হাত দূরে যোগানন্দদা গুলি খেয়ে ঘুরে পড়ে যায়- আমি তাকে কোনও

সাহায্য করতে পারিনি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম- এইসব কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে আমি কি কখনও স্বাভাবিক হতে পারি?

সূর্য এই কথাগুলো এমন ঠান্ডা অনুত্তেজিত গলায় বলল যে, দীপ্তি শিউরে উঠলেন। হত্যাকারী এই শব্দটা শুনলেই গা ছমছম করে-হোক না তা শত্রু-হত্যা। এই অনিন্দ্যকান্তি যুবকটি একজন খুনি-তাঁরাই একে খুনের দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দীপ্তি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সূর্যর হাতের ওপর নিজের হাত রেখে খুব নরম ভাবে বললেন, ও-সব কথা ভুলে যাও। ও-সব আর মনে রেখে কোনও লাভ নেই- আমি তোমার দিদির মতন-আমি তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করব।

সূর্য হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, হরদা আমাকে বলেছিলেন গীতা পড়তে। বলেছিলেন, দেশের জন্য যা করা যায়, যা আমাদের কর্তব্য-সেখানে হত্যার গ্লানিও আমাদের স্পর্শ করবে না। আমি জেলে বসে গীতা পড়ে দেখেছি। ও-সব গীতাফিতা আমাকে কোনও সান্ত্বনা দিতে পারে না। ইচ্ছে করলেই তো কোনও জিনিস ভোলা যায় না।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখনও আলো জ্বালা হয়নি। দু'জনে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। সূর্য অন্যমনস্ক ভাবে বাটির তলা থেকে মুড়ির দু'-একটা ভাঙা টুকরো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

দীপ্তি উঠে আলো জ্বাললেন। তারপর বললেন, তুমি বই পড়তে ভালোবাসো? আমার যখন মনখারাপ হয়, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি। তোমাকে একটা পড়ে শোনাব?

সূর্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

দীপ্তি বললেন, তোমার একদম পেট ভরল না, না? তুমি এগ পাউডারের ওমলেট খাও? যুদ্ধের পর কত কী যে বেরিয়েছে-গুঁড়ো দুধ, গুঁড়ো ডিম। দাঁড়াও, দুটো ওমলেট ভেজে আনি। তারপর কবিতা পড়ব।

অনেক রাত পর্যন্ত কবিতা পড়ে কাটাল ওরা দু' জন। দীপ্তির খুব মমতা হচ্ছিল ছেলেটার জন্য-তিনি আর ওকে অন্য কোনও কথা ভাবার সময় দিলেন না, একটার পর একটা কবিতা পড়ে গেলেন চয়নিকা থেকে। তারপর সূর্যকে যখন একটা কিছু পড়তে বললেন, সূর্য চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে শুরু করল: ইট ইজ দা উইন্টার অব ডিসকন্টেন্ট- তারপর রিচার্ড দা থার্ড-এর প্রায় অর্ধেকটা মুখস্থ বলে গেল।

সূর্য বিদায় নেবার সময় দীপ্তি তাকে বললেন, ও-সব কথা নিয়ে আর একদম চিন্তা করবে না, কেমন? কথা দাও আমাকে?

সূর্য হাসিমুখে বলল, আচ্ছা।

পরদিন সকালেই সূর্য আবার এসে হাজির হতে দীপ্তি রীতিমতন শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ছেলেটা কি প্রতিদিন দু'বেলাই এ রকম আসবে?

সূর্যকে দেখলে মনে হয় তার সারা রাত ঘুম হয়নি, চোখদুটো লালচে। চিরুনি পড়েনি মাথার চুলে। কিন্তু তার মুখে বিমর্ষ ভাবটা নেই বরং একটা উত্তেজনার ছাপ। দীপ্তি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, এত সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছ?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে?

সাড়ে সাতটা।

আমার অনেকক্ষণ আগে ঘুম ভেঙে গেছে-কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

বসো। চা খেয়ে যাও। চা করছি।

আমি আজ এখানে অনেকক্ষণ থাকব। আপনার সঙ্গে গল্প করব।

দীপ্তি হেসে বললেন, অনেকক্ষণ থাকবে কী করে? আমাকে ইস্কুলে যেতে হবে না?

আজ ইস্কুলে না গেলে হয় না?

বাঃ, ইস্কুলে যাব না কেন? আমার ইস্কুলে যেতে ভালোই লাগে।

ঠিক আছে। আপনি ইস্কুল থেকে ঘুরে আসবেন, আমি আপনার এখানেই শুয়ে থাকব। আমার আর কোথাও যেতে ভালো লাগছে না।

সূর্য একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দীপ্তির দিকে, প্রখর তার দৃষ্টি। দীপ্তির কোমল মন, তার মায়া হল ছেলেটির জন্য। এ-ছেলে যদি মনে মনে কোনও কষ্ট পায়ও মুখ ফুটে কিছুতেই তা বলবে না। একে কী ভাবে সাহায্য করা যায়!

দীপ্তি বললেন, তোমার কী হয়েছে বলো তো? বাড়িতে কোনও গোলমাল হচ্ছে?

চা বানিয়ে এনে দীপ্তি সূর্যকে একপেয়ালা দিয়ে নিজের পেয়ালাটা নিয়ে বসলেন বিছানার ওপর। সূর্য নিঃশব্দে চা খেয়ে যাচ্ছে।

দীপ্তি ওকে বোঝবার চেষ্টা করছেন। যখন তখন একটি ছেলে তার সঙ্গে দেখা করতে এলে পাড়ার লোকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু দেখাবে এটা তিনি বোঝেন কিন্তু সূর্যকে সেকথা মুখ ফুটে বলবেন কী করে?

পেয়ালা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, তুমি তো কোনও কথাই বল না তুমি কী চাও বুঝব কী করে।

সূর্য মুখ তুলে দীপ্তির দিকে তাকাল-কোনও কথা বলল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সোজা চলে এল দীপ্তির সামনে। মাটিতে হাটুগেড়ে বসে দীপ্তির পা দু'খানা জড়িয়ে ধরল!

দীপ্তি বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, এ কী করছ সূর্য।

সূর্য বলল, কিছু না। আপনার পা একটু ছুঁতে ইচ্ছে করল।

তারপর পোষা কুকুরের মতন দীপ্তির পায়ে মুখ ঘষতে লাগল।

দীপ্তি দ্রুত পা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ রক্তাভ। কয়েক পা সরে গিয়ে বললেন, এ কী?

সূর্যও উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্তির কাঁধে হাত রেখে বলল, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

ঠিক আছে, আগে ওই চেয়ারে গিয়ে বোসো, তারপর কথা বলব।

সূর্য দীপ্তিকে ছাড়ল না। তার মুখে এখন একটা খুশির ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে। তার এ রকম মুখ সচরাচর দেখা যায় না। শক্ত করে দীপ্তিকে চেপে ধরে সে বলল, আপনাকে আমি ছাড়ব না।

দীপ্তি টের পেলেন সূর্যর গায়ে বাঘের মতন শক্তি। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। এদিকে দরজা খোলা রয়েছে।

তিনি মিনতি করে বললেন, ছেড়ে দাও, লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু কথা বলতে দাও।

সূর্য দীপ্তিকে ছেড়ে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি আমার ওপর রাগ করছেন?

তুমি এসব কী ছেলেমানুষি করছ বলো তো? আমি তোমার থেকে বয়সে কত বড়–

কত বড়?

অন্তত সাত-আট বছর তো হবেই।

তাতে কিছু যায় আসে না।

তুমি কী চাও আমার কাছে?

আমি আপনার কাছাকাছি থাকতে চাই। খুব কাছে।

তা হয় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে!

কীসের দেরি হয়েছে?

সূর্য, তুমি বড় ছেলেমানুষ, তুমি বুঝবে না। আমি তোমার দিদির মতন, সেই ভাবে যদি তুমি আমার কাছে আসতে চাও–

দীপ্তিদি, আপনি বড় সুন্দর।

সূর্য আবার এগিয়ে আসতেই দীপ্তি ভয় পেয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। সূর্য তাঁকে দরজার পাশেই দেওয়ালে চেপে ধরল। গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল, আপনাকে শ্রীলেখার মতন দেখতে।

কে শ্রীলেখা?

আছে একজন। আপনার সঙ্গে তার চেহারার কোনওই মিল নেই যদিও-তবু আপনাকে দেখে তার কথাই মনে পড়ছে।

তা হলে তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না কেন!

সেখানে যাওয়া যায় না। সূ

র্য ছেড়ে দাও। এসব পাগলামি কোরো না।

সূর্য চোখ বুজে ফেলল। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।

তারপর মুখ নিচু করে দীপ্তির মসৃণ ঘাড়ে ঠোঁট বোলাতে লাগল। আস্তে আস্তে মুখটা নিয়ে এল দীপ্তির বুকে। ভারী নরম বুক। সূর্য যেন অতলে ডুবে যাচ্ছে–দীপ্তির বুকের ভেতরকার সীমাহীন শূন্যতায়। বড় নিশ্বাসে গন্ধ শুঁকছে।

দীপ্তি ছটফটিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলেন না। শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দারুণ কাতর ভাবে বললেন, কী করছ তুমি, জানো না, এ হয় না। এ হয় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার জীবন কী ভাবে চলবে, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

আমি সব উলটোপালটা করে দেব। আপনাকে আমি এখান থেকে নিয়ে চলে যাব। আমার আর কেউ নেই, আমি কোথায় যাব?

সূর্য, তোমার কম বয়সকত জনের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হবে।

আপনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?

তুমি আমার কাছে রোজ এসো, গল্প কোরো–কিন্তু এসব না।

এসব মানে কী? আপনি এত সুন্দর–

সূর্য প্রচণ্ড জোরে দীপ্তিকে চেপে ধরল নিজের শরীরে। যেন সে ওঁর হাড়-পঁজরা ভেঙে দেবে। তারপরই মাটিতে বসে পড়ে দীপ্তির কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে দয়া করুন। আমাকে দয়া করুন।

দীপ্তির চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। সূর্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলল, আমি চিরকাল আপনার কাছাকাছি থাকব। আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না।

দু'হাতে দীপ্তির মুখটা তুলে লোভীর মতন সেই অঞ্চ পান করতে লাগল সূর্য। দীপ্তি আর বাধা দিলেন না।

৫৭. সেই সময় একটা কথা

সেই সময় একটা কথা খুব শোনা যাচ্ছিল, ইনডিপেন্ডেন্স ইজ নকিং অ্যাট দা ডোর। স্বাধীনতা এসে কড়া নাড়ানাড়ি করছে, দরজাটা খুললেই হল। কিন্তু দরজা খুলে সেই স্বাধীনতাকে কে বরণ করে নেবে, সেই অধিকারের জন্য ঘরের মধ্যে তখন শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

কংগ্রেসের দীর্ঘকালের সংগ্রামের শেষ পরিণতি হঠাৎ বিভ্রান্তিকর হয়ে দেখা দিল। এত উচ্চ আদর্শ, এত মহৎ স্বার্থত্যাগ সব কিছুকেই প্রায় বানচাল করে দিল এক কঠিন বাস্তবতা। মহাত্মা গান্ধী অনেক তোষামোদ, অনেক আপোস করেও জিন্না সাহেবকে বাগ মানাতে পারলেন না।

কংগ্রেস আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে যে ক'টি ভুলভ্রান্তি হয়েছে, শেষ পর্যায়ে তার সারমর্ম একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়। কংগ্রেস কোনও দিনই এ-দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়নি, ইংরেজের হাত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে চেয়েছিল। ইংরেজই যদি স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দেওয়ার মালিক হয়, তা হলে, সেই চল্লিশের দশকে, শুধু কংগ্রেসের হাতে তুলে দেবে কেন? অপর শরিক, মুসলিম লিগ কী দোষ করল?

আপাত দৃষ্টিতে, ইংরেজের এই ব্যবস্থাকে তো খুব দোষারোপ করা যায় না। মিঃ জিন্না ততদিনে একথা প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে তার মুসলিম লিগই ভারতের সাড়ে আট কোটি মুসলমানের মুখপাত্র। কংগ্রেস যতই আদর্শবাদের কথা বলুক মুসলমানের কাছে। সে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান মাত্র-ইংরেজ চলে যাবার পর ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের। অধীনে নির্যাতিত হতে চায় না। হিন্দু-মুসলমান কোনও দিন মিলেমিশে থাকেনি, কোনও দিন থাকতে পারবে না।

সিপাহি যুদ্ধের সময় কিংবা নীল আন্দোলনের সময়, এমনকী ওয়াহাবি আন্দোলনের সময়ও যে-হিন্দু-মুসলমান কিছুটা মিলেমিশে লড়তে পেরেছিল সুভাষ বোসের নেতৃত্বে

আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক-সেসব অস্বীকার করা হল। মিলনের জন্য নতুন কোনও প্রচেষ্টার বদলে বিচ্ছেদের কারণগুলোকেই বাড়িয়ে দেখা হতে লাগল। এই কথাই বলা হতে লাগল যে, দীর্ঘকালের বাদশাহী শাসনের পর ইংরেজ আমলে হিন্দুরা সঙঘবদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে ব্রিটিশ-রাজ' চলে গেলে তারা আবার 'হিন্দু-রাজ' স্থাপনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। তার উদ্যোগও যে একেবারে ছিল না তাও তো নয়। এককালের বিপ্লবী বীর সাভারকর দীর্ঘ দিন বাদে আন্দামান থেকে ফিরে এসে হঠাৎ হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য জিগির তুলে দিয়েছেন। মাশারিকির খাকসার বাহিনীর দেখাদেখি হিন্দুরাও তৈরি করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, প্রদেশে প্রদেশে গজিয়ে উঠেছে হিন্দু মহাসভা।

কিন্তু হিন্দুত্ব যে আসলে কী তা কেউ জানে না। মুসলিম লিগের দাবির মধ্যে গোঁড়ামি থাকলেও বক্তব্য অতি পরিষ্কার। একজন মুসলমান জানে, সে কেন মুসলমান। একজন হিন্দু তো তা জানে না। হিন্দুদের বারো জাতের তেরো হাঁড়ি। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দু নামে কোনও একটি বিশেষ জাত নেই, হিন্দুত্ব নামে সর্বজনগ্রাহ্য একটি ধর্ম নেই। এ দেশের রাজনীতিতে ভারতীয় মুসলমানদের কতখানি অধিকার চাই-সেটা জিন্না সাহেব বার বার স্বচ্ছ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। সেই তুলনায় হিন্দুরা অনেক ভণ্ড। তারা অনেকে উদারতার ভান দেখায়, কিন্তু সামাজিক জীবনে ঘোর সাম্প্রদায়িক। অনেকে। নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায় কিন্তু ভেতরটা সংস্কারাচ্ছন্ন। একজন খাঁটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং একজন খাঁটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান কখনওই পরস্পরের আত্মীয় হবে

কারণ ধর্মের সঙ্গে অনেক অনুশাসন ও সংস্কার জড়িত, শুধু ব্যক্তিগত চর্যা হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছে অতি বিরল সংখ্যক মানুষ। একমাত্র, ধর্মহীন ছাড়া কেউ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। দুই ধর্ম মেলাবার উদ্ভট অবাস্তব চেষ্টা করেছিলেন গান্ধীজি, কিন্তু নাস্তিকতা প্রচারের সাহস, তিনি দূরে থাকুন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও কখনও দেখাতে পারেনি।

ক্যাবিনেট মিশন এসে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করতে চাইছে। জওহরলাল নেহরু চাইছেন, কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠন করে সেই সরকারের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া হোক। জিন্না সাহেব পাকিস্তানের দাবি নিয়ে বেঁকে বসে আছেন। মুসলমানদের হাতে আলাদা ভাবে ক্ষমতা না দিলে মুসলমানরা তা কিছুতেই মানবে না। এবং মুসলিম লিগ কোনও দিনই কংগ্রেসের মতন অহিংসায় বিশ্বাসের কথা বলেনি। বাংলায় তখন লিগ মিনিস্ট্রি।

এই অবস্থায় লিগ থেকে ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশানের দিন হিসেবে হরতাল ঘোষণা করে দেওয়া হল। হরতালের দিন দাঙ্গাহাঙ্গামার আশঙ্কা করে একদল সাংবাদিক জিন্না সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, এই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান' কার বিরুদ্ধে?

জিন্না সাহেব চট করে উত্তর দিলেন, কেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে! কিন্তু ইংরেজ তো পাকিস্তান দাবি অস্বীকার করছে না। হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি। হিন্দুরাই তো পাকিস্তান বিরোধিতা করছে।

রণক্লান্ত বিধ্বস্ত ইংরেজ জানে ভারত এবার ছাড়তেই হবে। যুদ্ধের পরেই বিলেতে চার্চিলকে সরিয়ে দিয়ে লেবার পার্টি সরকার গঠন করে এ-সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চিন্তা করছে। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ হয়ে গেল। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহের পরিচয় পেয়েই ইংরেজ বুঝতে পেরে গেছে-দেশি সৈন্যদের সহায়তায় আর বেশি দিন এ-দেশ শাসন করার চিন্তা বিপজ্জনক। আর বেশি দিন দেরি করলে, যদি ১৮৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধের মতন আর একটা কিছু হঠাৎ ঘটে যায় তা হলে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং ভালোয় ভালোয় সরে পড়াই ভালো। হিন্দু-মুসলমান এবং শিখদের পারস্পরিক মনোভাব এখন যে-অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে নিজেদের মধ্যে একটা মারামারি বাধলে ওরা এখন আর সাহেবদের দিকে মনোযোগ দেবার সময় পাবে না। তাতে সাহেবদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

তা ছাড়া, এ-দেশের শাসন ক্ষমতা ছাড়লেও ব্যবসায়ের অধিকার ছাড়বে কেন ইংরেজ? চেম্বার অফ কমার্স বহু দিন থেকেই রাজনীতিতে অংশ নিয়ে আসছে। এ-দেশ যদি টুকরো টুকরো হয় পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করেই সব শক্তি নষ্ট করে, তা হলে ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থনীতির বনিয়াদ কখনও শক্ত হবে না, ব্রিটিশের বাণিজ্য- স্বার্থ বহু কাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

১৬ই আগস্টের প্রায় এক মাস আগেই কলকাতার একটি ইংরেজি সংবাদপত্র একটি গোপন খবর ফাঁস করে দিয়েছিল। পাটকল ও ব্যবসায়ী বাড়ির সাহেব মালিকরা নিজেদের মধ্যে একটা গোপন সার্কুলার পাঠিয়েছে-শিগগিরই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে-তোমরা তৈরি থাকো-নিজেদের সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করো।

১৪ই আগস্ট হিন্দুরা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক মিটিং করে প্রস্তাব পাস করল, এই হরতালের বিরোধিতা না করলে পাকিস্তানের দাবিই মেনে নেওয়া হচ্ছে। এই হরতাল সফল হতে দেওয়া চলে না।

এর পালটা মিছিল বেরোল কলকাতায়। স্লোগান উঠল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লেগে গেল লড়াই।

বহু দিন ভারতের মাটিতে যুদ্ধ হয়নি। তবু, জাতিগত ভাবে মানুষ নামক এই প্রাণীটির মধ্যে সব সময়ই রক্তের তৃষ্ণা থাকে। তাই কখনও ধর্মের নামে, কখনও ভাষার নামে, কখনও নতুন রাজনৈতিক স্বপ্নে, কখনও আরও অনেক ছোটখাটো স্বার্থে পরস্পরকে হত্যা করে এই রক্তের তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয়। বহু যুগ ধরে শোষিত ও নিষ্পেষিত হয়ে কাপুরুষতার বীজ ঢুকে গেছে এ-জাতির মজ্জায়। রণক্ষেত্রে প্রবল শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলেছে-এখন শুধু লাঠিসোটা বা ছুরিছোরা নিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে বেছে বেছে নিরীহ মানুষকে মারার ব্যাপারে ওস্তাদ। যারা এই উন্মত্ততার বাইরে থাকতে চায়, এইসব দুঃসময়ে তারাই সবচেয়ে অসহায়।

সকালবেলা উঠেই সূর্যর একমাত্র কাজ দীপ্তির বাড়িতে যাওয়া। গত তিন-চার দিন ধরে সে প্রত্যেক দিন সকালে ও বিকেলবেলায় দীপ্তির বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে। এক এক দিন দুপুরেও ফেরে না।

আজও সকালবেলা চা খেয়েই সূর্য বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে দেখল, যানবাহন কিছু নেই, চার দিকে একটা থমথমে ভাব। দীপ্তির বাড়ি হাজরার মোড়ের কাছে-এত দূরের রাস্তা, কিন্তু সূর্য একটুও দ্বিধা করল না। সে হেঁটেই যাবে।

বিবেকানন্দ রোড থেকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে এসে দেখল মোড়ের মাথায় বহু লোক জমায়েত হয়েছে, কয়েক জন উত্তেজিত ভাবে বলাবলি করছে কী সব। একদল আবার উৎসুক হয়ে মানিকতলার দিকে চেয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে। সেদিক থেকে গোলমাল ভেসে আসছে।

সূর্য হাঁটতে লাগল হ্যারিসন রোডের দিকে। অন্য কোনও দিকে তার মন নেই। হঠাৎ উলটো দিক থেকে একদল লোক হইহই করে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা রাস্তায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল একেবারে। রাস্তার বাকি লোকেরা কী হচ্ছে না হচ্ছে, না দেখেই ছুটতে শুরু করছে। সূর্যর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছুটে গেল কয়েক জন। সূর্য দেওয়াল ঘেঁষে পঁড়াল। রাস্তা একটু ফাঁকা হতেই আবার হাঁটতে লাগল সামনের দিকে।

একটা গলি থেকে দশ বারো জন লোক লাঠি ও লোহার রড হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, জয় হিন্দ!

ইদানীং এই আওয়াজটা নতুন শোনা যাচ্ছে। জার্মানিতে সুভাষ বোস এটা প্রথম চালু করেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় সাধারণ লোকের মধ্যেও চালু হয়ে যায়।

লোকগুলো সূর্যর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে লাগল, সূর্য ভ্রূক্ষেপ করল না। সুকিয়া স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে দেখল, ইষ্টক বর্ষণ শুরু

হয়ে গেছে। এ-পাশে একদল লোক ও-দিকের একটা দলের দিকে যত না ইট, তারচেয়ে বেশি গালাগালি ছুঁড়ে দিচ্ছে।

সূর্য বিরক্তি বোধ করল। এ যেন শুধু তার যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা। এর মধ্য দিয়ে সে হেঁটে যাবে কী করে। ভুরু কুঁচকে তাকে একটু দাঁড়াতেই হল।

কিন্তু দু'-চার মিনিটের মধ্যেই ঘটনা গুরুতর আকার ধারণ করল। একটা বন্ধ দোকানের পাল্লায় কয়েক জন তোক দমাদ্দম লাথি মারছিল–একসময় পাল্লাটা ভেঙে পড়তেই শুরু হয়ে গেল লুটপাট। সেটা একটা ঘুড়ির দোকান। মুহূর্তে ঘুড়ির কাগজ আর কাপ আর সুতো ভরতি লাটাই গড়াতে লাগল রাস্তায়। উন্মত্ত মানুষের চিৎকারে আর কান পাতা যায় না। চিৎকার আরও তুমুল হল, যখন সেই দোকানের ভেতর থেকে তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতন দু'জন লোক বেরিয়ে এল। রোগা চেহারার দু'জন প্রায় বৃদ্ধ মুসলমান। বিকট উল্লাসে লোকজন তাদের ঘিরে ধরে কিল চড় মারতে লাগল, তারপর দু'-একটা লাঠিও উঠতে দেখা গেল।

এতক্ষণে সূর্যর মনের মধ্যে একটা নাড়া জাগল। সে তার পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, এ কী হচ্ছে কী? ওদের মারছে কেন?

পাশের লোকটি বলল, রাজাবাজারে পাঁচখানা লাশ পড়ে গেছে, জানেন? ওরাই তো শুরু করেছে।

কিন্তু এই লোকদুটো কী দোষ করেছে?

ও-শালাদের বিশ্বাস নেই।

সহজাত প্রবৃত্তিতেই সূর্য লোকদুটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ওই পর্যন্ত পৌঁছোতে পারল না। মেছোবাজারের দিক থেকে একদল লোক সেই সময় তেড়ে এল, ফটাফট সোডার বোতল ফাটছে, সামনের কয়েক জনের হাতে তলোয়ার। এদিকে জনতা

আবার পেছন দিকে ছুটল–সূর্যকেও সেই স্রোতে ভেসে যেতে হল। খানিকটা দৌড়ে এসে সূর্য দাঁড়াল একটা গলির মুখে।

ও-পাশের দলটা খুব বেশিদূর এল না। খানিকটা এসেই থমকে দাঁড়িয়ে আবার পেছন ফিরে আরও জোরে ছুটল। অকস্মাৎ দেখা গেল, রাস্তা ফাঁকা–অনেক দূর থেকে একটা পুলিশের গাড়ি আসছে। লুণ্ঠিত দোকানের সামনে সেই লোক দুটির মধ্যে একজন নিস্পন্দ, আর একজন তখনও ছটফট করছে–একজন দীর্ঘদেহী কালোয়ার অতি দুঃসাহসে দৌড়ে গিয়ে মুমূর্ষ লোকটার পিঠে এক ঘা রডের বাড়ি মেরে সট করে ঢুকে গেল একটা বাড়ির মধ্যে।

সূর্যর পাশেই একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন বাজারের শূন্য থলি হাতে নিয়ে। তিনি সূর্যর কানের পাশে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, এই যে ভাই, শোনো, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ও-দিকে চলে যাও!

সূর্য অবাক হয়ে বলল, কেন?

লোকটি প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই শোনো। ভালোর জন্যই বলছি। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?

কেন বলুন তো?

তুমি কি কলেজের ছাত্র? যাও, যাও, তোমাদের মহল্লার দিকে যাও। কে কখন ধরে বসবে!

লোকটি সূর্যর আপাদমস্তক দেখে মুখের দিকে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে রইলেন। সূর্যর জাগতিক জ্ঞান কম, তাই সে লোকটির এ-ধরনের কথার অর্থ তক্ষুনি বুঝতে পারেনি। কিন্তু আত্মরক্ষার টানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন তার চেতনা হল, তার মুখে দাড়ি আছে, তাকে এরা মুসলমান বলে সন্দেহ করছে।

এটা হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু সূর্য হাসতে পারল না। কোথাও কারওর মুখেই এখন হাসি নেই। মাত্র একশো কি দেড়শো গজ দূরে দুটি লোক এইমাত্র প্রাণ হারাল। টাটকা রক্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তায়।

পুলিশের গাড়িটা যাওয়ার জন্য রাস্তাটা এখন ফাঁকা। সূর্য আর দেরি করল না, সে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। সদ্যমৃত লোকদুটির পাশ দিয়েই যেতে হল তাকে, তাকাবার সময় পেল না। অনেক দিন পর সে এত জোরে ছুটছে! পেছন থেকে একটা আওয়াজ জেগে উঠল, কয়েকটা ইটের টুকরো উড়ে এল তার দিকে।

একদমে কলেজ স্ট্রিট বাজার পার হয়ে এসে সূর্য থামল। হাঁপাতে লাগল একটা দেওয়ালে ভর দিয়ে। তার শরীরের সমস্ত লোমকূপ, হাত-পায়ের নখ পর্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু শরীরে কোনও উত্তেজনা নেই, মুখের মধ্যে একটা তেতো স্বাদ। এর চেয়ে ঢের বেশি জনতার মধ্যে মিশে থেকে সে লড়াই করেছে কিন্তু এ কী রকম জঘন্য লড়াই! এখন তাকে শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে যেতে হবে।

এখানে রাস্তাটা ফাঁকাই ছিল, এক মিনিটের মধ্যেই কলাবাগানের দিক থেকে পিলপিল করে ছুটে এল আবার একটি দল। এদের অনেকেরই হাতে গাঁইতি আর শাবল। অবিলম্বেই এরা বাছা বাছা কয়েকটি দোকানের দরজা ভাঙার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। সূর্যকে নিয়ে ওরা বিশেষ মাথা ঘামাল না। ওদেরও অনেকের গালে দাড়ি আছে।

এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে সূর্য নিজের কর্তব্য স্থির করতে চাইল। এই ভাবে সে কত দূর যাবে? মেডিকেল কলেজের সামনেটা ফাঁকা হলেও দূরে বউবাজারের দিকটায় গোলমাল চলছে মনে হয়। এখনও সে তার নিজের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে আসেনি। অন্য রাস্তার গলিঘুজি দিয়ে বাড়ি পৌঁছোনো যায়।

কিন্তু সূর্য বাড়ি ফেরার চিন্তাটা এককথায় উড়িয়ে দিল। সে দীপ্তির কাছে যাবেই।

হ্যারিসন রোড ধরে সূর্য এগোল সেন্ট্রাল এভিনিউ-র দিকে। এখানে ঠিক মারামারি শুরু হয়নি এখনও–এক দল লোক আর এক দলকে তাড়া করছে, তারা গোরু-ভেড়ার মতন ছুটছে। এক জায়গায় একটা বড় বাড়ি লক্ষ্য করে প্রচুর ইট ছোঁড়া হচ্ছে। সূর্য এসব পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগোতে লাগল। তাকে এখনও অনেক দূরে যেতে হবে।

সেন্ট্রাল এভিনিউতে আবার অন্য দৃশ্য। কোথাও একটাও লোক নেই। পথঘাট একেবারে শুনশান। গাড়িবারান্দার তলায় ভিখিরিরাও উধাও। একটুও শব্দ নেই– কয়েকটা ছেঁড়া খবরের কাগজ উড়ছে। কলকাতার রাজপথে দিনের আলোয় এই দৃশ্য কী রকম অপ্রাকৃত মনে হয়। রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলোর সব জানলা বন্ধ।

সূর্য একটু থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। বিপদের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ে না। খুব সতর্ক ভাবে সে এগোতে থাকে ধর্মতলার দিকে। প্রত্যেক গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়–সেখান থেকে হঠাৎ কেউ বেরিয়ে আসে কি না দেখবার জন্য। কেউ নেই।

বউবাজার স্ট্রিটের কাছে এসে সূর্যর বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে এই রাস্তা কেন এত নির্জন। সকালেই এখানে একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে। কয়েকটি দোকানে আগুন লাগার চিহ্ন। রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে পাঁচটা মৃতদেহ। চার জন পুরুষ ও একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে। এ-ওর গায়ের ওপর এলোমেলো। কনুই থেকে কাটা একটা হাত আলাদা ভাবে একটু দূরে রাস্তায় ওলটানো। আঙুলগুলো যেন মাটি খিমচে ধরতে চেয়েছিল। এই হাতটা ওই লোকগুলোর মধ্যে ঠিক কার–এটা জানা সূর্যর বিশেষ দরকার। সে দু'-এক পা এগিয়ে গেল ও-দিকে। নিহতদের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে কার হাত নেই খুঁজতে লাগল। মনে হয় যেন এখনও ওদের নিশ্বাস সেখানকার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সেই দৃশ্য সূর্যর চোখ চুম্বকের মতন টেনে ধরে। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারে না। সে এখন কী করবে? আবার কয়েক পা পিছিয়ে এসে সে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে দ্রুত দেখে নেয়। তারপর চোখ বোজে।

চোখ বুজতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দীপ্তির মুখ। আঃ, কী ঠান্ডা লাগে তখন। সারা পৃথিবীতে সূর্যর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, দীপ্তির কাছেই যেতে হবে তাকে।

দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে সূর্য এগোতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও বাধা পায় না। ধর্মতলার দিকে কয়েকটা গাড়ির যাতায়াত ও মানুষজনও চোখে পড়ে। আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হনহন করে হাঁটতে আরম্ভ করল সূর্য। মাঝে মাঝে চোখ বুজে দীপ্তির মুখখানা দেখে নেয়।

পার্ক স্ট্রিট ছাড়াবার পর সূর্য আবার বিপদে পড়ে গেল। কয়েকখানা লরি-ভরতি মানুষজন হইহই করে যাচ্ছিল। সূর্য সেগুলোকে দেখে আবার দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। একখানা লরি তার সামনেই এসে থামল। কয়েক জন ছোকরা নেমে এসে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, উধার কা কেয়া হাল হ্যায়?

সূর্য কী আর উত্তর দেবে? কোনওক্রমে আড়ষ্ট ভাবে বলল, উধার আগ লাগ গিয়া!

একটি ছোকরা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, নারায়ে তকদির!

লরি থেকে প্রত্যুত্তর গর্জে উঠল।

এ-লোকগুলি অবাঙালি। এরা সূর্যকে নিজেদের দলের ভেবেছে। সূর্যকে লরিতে উঠতে বলল ওদের সঙ্গে।

সূর্য বলল, সে বিশেষ দরকারে সামনের দিকে যাবে। ওরা তাতে কর্ণপাত করল না। একদল জানাল যে, ও-দিকে ভবানীপুরের দিকে শিখ সর্দারজিরা দারুণ কাণ্ড করছে। হ্যাঁ, ওরাও ও-দিকে যাবে বটে, আরও দলে ভারী হয়ে বিকেলে যাবে সর্দারজিদের পাড়াকে পাড়া জ্বালিয়ে দেবে।

সূর্যকে লরিতে তোলার জন্য টানাটানি করতে লাগল। প্রতিবাদ জানিয়ে লাভ নেই। এতগুলো উন্মত্ত মানুষের কাছে কোনও সুস্থ কথারই কোনও মূল্য নেই।

লরিতে চেপে সূর্য যে-দিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই ফিরে যেতে হল। উর্দু-ঘেঁষা হিন্দি ভাষায় সূর্য বাল্যকালে রপ্ত ছিল–এখন তাতেই কাজ চালিয়ে যেতে লাগল এদের সঙ্গে।

লরিটা সেন্ট্রাল এভিনিউতে গেল না। তার বদলে বাঁক নিল ওয়েলিংটনের দিকে। ওয়েলিংটনের কাছে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। ক্রিক রো, তালতলার দিকে প্রচণ্ড গোলমাল আর আগুনের শিখা।

লরি থেকে সূর্য ঝুপ করে নেমে পড়ল অন্যদের সঙ্গে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, এই দিকেই শ্রীলেখার বাবার বাড়ি। বাদলরাও এইখানে থাকে। ওদের কোনও বিপদ হয়নি তো? কিন্তু ও-দিকে এগোনো এখন অসম্ভব।

ওই বাড়ি থেকেই শ্রীলেখার বিয়ের সময় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সূর্য শ্রীলেখার মুখখানা মনে করতে গিয়েও ঠিক মনে করতে পারছে না। দীপ্তির মুখের সঙ্গে শ্রীলেখার মুখটা মিশে যাচ্ছে। শ্রীলেখা আর দীপ্তি যেন একই।

গোলমালের সুযোগ নিয়ে সূর্য ওই দলটা থেকে আবার পালাল। এখানেও দোকানপাট লুঠ শুরু হয়েছে। লুঠের সময় মারামারিটা একটু কম হয়। ওয়েলেসলির দিকে সর্বত্র হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছে–তবে, এ-দিকে অনেকটা একতরফা চলছে– সূর্যকে কেউ বাধা দিল না।

এলিয়ট রোড পেরিয়ে সাহেবপাড়া আবার একেবারে শান্ত। পার্ক স্ট্রিটে বেশ কিছু দোকানপাট খোলা। সূর্য একটু জিরোবার জন্য একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ কফি নিয়ে বসে রইল। অবস্থা যে অত্যন্ত সাংঘাতিক দিকে যাচ্ছে সেটা বুঝতে তার দেরি হল না। শহরে এত ব্যাপক আকারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে, সেই তুলনায় পুলিশ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম সে একটিমাত্র পুলিশের গাড়ি দেখেছিল। শিখদের

এলাকা কি সে পার হতে পারবে? তার গালে দাড়ি থাকলেও সে লুঙ্গি কিংবা পাজামা পরে নেই, আজ পরেছে ট্রাউজার্স। শিখদেরও তো দাড়ি থাকে। তার মাথায় পাগড়ি নেই।

আর না এগিয়ে সে যদি এই সাহেবপাড়ায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তা হলে তার আর কোনও বিপদ নেই। এখানে বসে থাকলে একটানা-একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তবু সূর্য কফির দাম টেবিলে রেখেই উঠে পড়ল। তার জীবনের কী মূল্য আছে? তাকে দীপ্তির কাছে যেতেই হবে। দীপ্তি একা থাকে–তার কোনও বিপদ হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে না? পার্ক স্ট্রিট ধরে খানিকটা নিশ্চিন্ত ভাবে হাঁটতে হাঁটতে সূর্য ভাবল, এরপর পার্ক সার্কাস, হাজরার ও-দিকে শিখদের পাড়া। দু'জায়গাতেই তার বিপদের সম্ভাবনা আছে। কেউ তাকে চেপে ধরলে–সে নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান-এর কোনওটাই প্রমাণ করতে পারবে কি? কী ভাবে প্রমাণ দেবে? একটু আগেই ওয়েলেসলিতে সে দেখে এসেছে একটা ধুতি-পরা বুড়ো মতন লোকের মাথায় একদল লোক লাঠির বাড়ি মারছে, আর লোকটা হাউ হাউ করে বলছে, আল্লার কিরে, মুই মোছলমান, মুই মোছলমান। আর লোকগুলো বলছে, খোল শালা, কাপড় খোল–।

হিন্দুদের হাতে ধরা পড়লেই বা সে কী বলবে? তার মুখে দাড়ি-কোনও হিন্দুই কি দাড়ি রাখে না? সে নিজেকে বামুনও বলতে পারবে না, তার পইতে নেই–অথচ তার। সত্যিকারের পদবি শুনলে–

সূর্য মনে মনে বলল, দীপ্তি, তুমি কি বুঝতে পারবে, আমি তোমার কাছেই যেতে চাইছি। আমি যদি মরেও যাই, তবু আমি সব সময় তোমার কাছেই যেতে চাই।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল বেড়ে যাচ্ছে। সূর্যর মতো একা আর কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে না, সব জায়গাতেই আলাদা আলাদা দল। সূর্যর ভেতরকার প্রচণ্ড রাগী ও

জেদি ব্যক্তিত্বটি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে–কিন্তু এই ধর্মোন্মাদ রক্তপাগল জনতার কাছে। প্রকৃতপক্ষে সে অসহায়।

বেকবাগানের কাছে এসে সে বুঝতে পারল, সে অত্যন্ত ভুল জায়গায় পৌঁছেছে। এদিককার রাস্তাঘাটও সে ভালো ভাবে চেনে না। এদিকে প্রচণ্ড গোলমাল। হুড়োহুড়ি, মারামারি ও স্ট্যাবিং চলছে, কয়েকখানা বাড়ি জ্বলছে দাউ দাউ আগুনে।

তার মুখে দাড়ি থাকার জন্য সে হিন্দুদের দল এড়িয়ে চলে গেল মুসলমানদের দলে। নিজের দাড়ি তো সে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে না। স্রোতের শ্যাওলার মতন তার নিজের বিরুদ্ধে তাকে দৌড়োদৌড়ি করতে হল ওদের সঙ্গে। তার চোখের সামনেই একটা ঘড়ির দোকান লুঠ হল। যে-যা পারল নিয়ে পালাল, কয়েক জন বিনা কারণে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে লাগল বড় বড় দেওয়াল-ঘড়িগুলো। বিভিন্ন ঘড়িতে অসময় লেখা আছে।

একটা লোকের পিঠে ছুরি মারা হয়েছে, সে শিরদাঁড়া-ভাঙা কুকুরের মতন রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে। তার আততায়ী পাশে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত ছুরি তুলে হাসছে হা-হা করে আর চেঁচিয়ে বলছে, তিন শালাকো খতম কিয়া।

কী অদ্ভুত উল্লাস! অথচ যে আক্রান্ত এবং যে আততায়ী–এরা কেউ কারওর আসলে শত্রু নয়–দু'জনেই নিপীড়িত সমাজের মানুষ। যে-লোকটি আততায়ী, তারও নিশ্চয়ই বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা–কেউ-না-কেউ আছে–সে জানে, তার অভাবে তার সংসারের কী অবস্থা হবে। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে সেটা মনে পড়ে না।

সূর্য ওই মুমূর্ষ লোকটাকে কোনও সাহায্য করতে পারছে না। একবার তার ইচ্ছে হল, ওই আততায়ীর ঘাড় ধরে ওই মুমূর্ষ লোকটার সেবা করতে বাধ্য করায়।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। মনের মধ্যে রাগ চেপে সে ছটফট করে। এই উন্মাদ জনতাকে সে কিছু বোঝাতেও পারবে না–এদের সঙ্গে লড়াই করতেও পারবে না–এই চিন্তা তাকে অসম্ভব কষ্ট দেয়। তার রাজনৈতিক জীবনে সে এই রকম অবস্থার কথা একবারও চিন্তা করেনি। এখন শুধু তার নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

বেপরোয়া ভাবে সে আবার ছুটতে শুরু করে এবং অচিরেই রাস্তা গুলিয়ে ফেলে। হাজরা মোড় কোন দিকে? সে কি উলটো দিকে চলে যাচ্ছে? কলকাতার শিরা-উপশিরার মতন গলিঘুজি দিয়ে সে অনবরত তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে চাইছে।

আর একটা হিন্দু দলের হাতে পড়ে নাজেহাল হয়ে সূর্য কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু তার আগেই তার পিঠে কয়েক ঘা লাঠি পড়েছে। খালি পা ছেঁড়া জামা নিয়ে সূর্য যখন হাজরার মোড়ে পৌঁছোল, তখন দেখল দীপ্তিদের বাড়ির ঠিক নীচেই বড় রকমের হাঙ্গামা চলছে। ও-বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। বাড়ির সামনের ফুটপাতে দারুণ ভিড়, লাঠিসোঁটা নিয়ে একদল লোক রণহুংকার দিচ্ছে। এই দুর্ভেদ্য দেওয়াল পেরিয়ে যাওয়া শক্ত–কিন্তু সূর্যকে যেতেই হবে।

যদি ও-বাড়ির দরজা খোলা থাকত–তা হলে সূর্য গন্ডারের মতন একরোখা ভাবে। দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তো সে ডাকাডাকি করার সময় পাবে না। কাছাকাছি একটা পাঞ্জাবিদের দোকান তখনও খোলা–সে দোকানের পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে আর একজন তোক দীপ্তিদের বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়তে লাগল। ভিড়টা তখন একটু দূরে সরে গেছে। দরজা কিন্তু তবু খুলছে না–লোকটি খুব জোরে জোরে দরজায় ধাক্কাছে আর কার যেন নাম ধরে ডাকছে। সূর্য এই সুযোগে দ্রুত লোকটির পাশে এসে দাঁড়াল।

সূর্যর বিপর্যস্ত চেহারা, মুখে দাড়ি দেখে ভয় পেয়ে গেল লোকটি। সূর্যর দিকে চোখ। তুলে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি বলল, আমি দীপ্তিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কে আপনি?

আমার নাম সূর্য। দীপ্তিদি আমাকে চেনেন।

দীপ্তিদি কে?

সূর্য এবার পালটা প্রশ্ন করল: আপনি কে? আপনি কি এ বাড়িতে থাকেন?

এই সময় দরজা খুলে গেল। যে দরজা খুলল, সে অন্য লোকটিকে চেনে, সূর্যকে চেনে না। সূর্যকে সে ঢুকতে দিতে চায় না। সূর্য জোর করে ভেতরে ঢুকে বলল, আমাকে দীপ্তিদির কাছে নিয়ে চলুন–

দোতলায় দীপ্তির ফ্ল্যাটের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

সূর্য নিরাশ হয়ে গেল। এত দূর এসেও দীপ্তির দেখা পাওয়া গেল না? অথচ কালও সে এসেছে, দীপ্তির তো যাবার কথা ছিল না কোথাও!

এদিকে অন্য লোকদুটি তাকে নানা প্রশ্ন করে জ্বালাতন করছে। এই রকম সময় কেউ অযথা বিরক্ত করলে বড় মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, চলুন, তিনতলায়! সুকল্যাণদা আমাকে চিনতে পারবেন।

সুকল্যাণের ফ্ল্যাটে এসে দেখা গেল বাড়ির সব লোক সেখানেই জড়ো হয়েছে, দীপ্তিও সেখানে রয়েছে। সূর্যর সঙ্গে আসা অন্য লোকটি সুকল্যাণের পিসতুতো ভাই।

সুকল্যাণ সূর্যকে দেখে চিনতে পারলেও সূর্যই সুকল্যাণকে দেখে প্রথমটায় চিনতে পারেনি। কালকেও সে দেখে গিয়েছিল সুকল্যাণের একমুখ দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল বাবরি করা। আজ তার সব নিমূল। দাড়ি-গোঁফ বাদ দেবার জন্য হঠাৎ তাকে আজ খুব রোগা দেখাচ্ছে।

সুকল্যাণ চমকে বললেন, আরে, এ কী? তুমি আজ এলে কী করে?

সূর্য দীপ্তিকে একপলক দেখে নিয়ে শান্ত ভাবে বলল, আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল।

অত দূর থেকে কীসে এলে? ট্রামবাস তো কিছুই চলছে না।

হেঁটেই চলে এলাম।

সেই বিবেকানন্দ রোড থেকে? এ যে অসম্ভব কথা? শুনলাম যে কলাবাগানে দারুণ খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে?

না। ওসব গুজব।

দীপ্তি কাছে এগিয়ে এসে বললেন, তোমার এ রকম চেহারা হল কী করে?

ঘরের সবাই সূর্যকে ঘিরে ধরল। সুকল্যাণের ভাই উত্তেজিত ভাবে বলল, উত্তর কলকাতায় ডজন ডজন লাশ পড়ে গেছে, আর আপনি বলছেন কিনা সব গুজব?

সূর্য বলল, আমি তো কিছু দেখিনি।

এই সময় বাইরে আবার একটু গোলমাল হতেই সবাই ছুটে গেল জানলার কাছে। সামান্য খড়খড়ি ফাঁক করে উদগ্রীব হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

কী যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একদল লোক শুধুই চিৎকার করছে। অনেকেরই হাতে অস্ত্রশস্ত্র।

সুল্যাণরা সূর্যকে বললেন, তুমি শুধু শুধু এত দূর এলে। এখন ফিরবে কী করে?

সূর্য উত্তর দিল না।

সুকল্যাণদা আবার বললেন, ভীষণ ডেঞ্জারাস অবস্থা। এ-পাড়া অ্যাটাক হবে। সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছে, চেতলার দিক থেকে এসে এ-পাড়া অ্যাটাক করবে। খানিকটা আগে বাজারের মধ্যে আমরা ওদের দুজনকে মেরেছি।

আমরা মানে?

এ-পাড়ায় আমাদের আর ওদের স্ট্রেংথ সমান সমান। ওরা অ্যাটাক করলে আমরাও ফাঁইট দেব।

তার আগে, পুলিশে খবর দিলে হয় না?

সেই আশায় আছ বুঝি এখনও? পুলিশ তো সব ওদের হাতে। বড়তলা থানার ওসি খোকার কী করেছে শুনেছ?

না।

তোমাদের তো পাড়ায়। সে পুলিশকে হুকুম দিয়েছে...

সুকল্যাণ সূর্যদের পার্টির সমর্থক ছিলেন। নিজে জেল না খাটলেও অনেক ভাবে সাহায্য করেছেন পার্টিকে। সূর্য লক্ষ করল, রাতারাতি সেই সুকল্যাণদা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনের ঘটনার নিন্দেও তিনি করতে পারছেন না-তিনি চাইছেন পুরোপুরি লড়াই। কিছুতেই পাকিস্তান কায়েম হতে দেওয়া চলবে। না।

সুকল্যাণ সূর্যকে একবার নিয়ে গেলেন ছাদে। বাড়ির বাচ্চারা সেখানে একরাশ ইটের টুকরো জড়ো করেছে। কয়েকখানা বড় বড় ইট দিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ির উনুনের মতন একটা বড় উনুন তৈরি করা হয়েছে। একটা ড্রামে জল ফোঁটানো হচ্ছে সেখানে।

এ-বাড়ি আক্রান্ত হলে ওপর থেকে গরম জল ঢেলে আর ইটপাটকেল ছুঁড়ে প্রতি-আক্রমণ চালানো হবে।

সুকল্যাণ বললেন, তুমি যখন এসে পড়েছ, আজ আর ফিরতে তো পারছনা। তোমার মতন এক লম্বা-চওড়া জোয়ান পেয়ে আমাদের ভালোই হল। দাড়িটা এক ফাঁকে কামিয়ে নিয়ো, বুঝলে?

সূর্য কী উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছে না। সকাল থেকেই তার মুখটা তেতো হয়ে আছে। সত্যিই যদি এ বাড়ি আক্রমণ করে, সে তা হলে কী করবে?

ছাদ থেকে তাকিয়ে দেখল, সব দিকের রাস্তাতেই মাঝে মাঝে লোকজন জড়ো হয়ে আছে। চেতলার দিকে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। চিৎকার শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। সিভিল ওয়ারের দৃশ্য বোধহয় এই রকমই হয়।

অসম্ভব রোদের তেজের জন্য ছাদে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। আবার নেমে এল। নীচে সুকল্যাণের ঘরে। সেখানে এত বেশি মানুষজন যে সূর্য দীপ্তির সঙ্গে নিরালায় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। একতলার লোকেরা এত ভয় পেয়েছে যে, কিছুতেই তারা একতলায় থাকবে না-এখানেই এসে পাকাপাকি আশ্রয় নিয়েছে। দীপ্তিও কি দোতলায় যেতে ভয় পাচ্ছে?

তিন-চার বার রাস্তায় শোনা গেল চাচামেচি, এই আসছে, এই আসছে! অনেক বাড়িতে বেজে উঠল শাঁখ। কিন্তু কিছুই হল না। সুকল্যাণদা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দিলেন যে দিনের বেলায় না এলেও ওরা রাত্তিরে ঠিকই আসবে। আজ সারা রাত সবাইকে পালা করে জেগে থাকতে হবে।

দুপুর দেড়টা বাজে। খিদে পেলেও এতক্ষণ কেউ খাবারদাবারের কথা উচ্চারণ করেনি, এবার সেই প্রসঙ্গ এল।

সূর্য দীপ্তিকে বলল, আমি আজ আপনার সঙ্গে খাব।

দীপ্তি বললেন, এসো-।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দীপ্তি সূর্যকে বললেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এ রকম ভাবে কেউ আসে?

সূর্য বিমর্ষ মুখ করে বলল, আমার আসা উচিত হয়নি?

উচিত-অনুচিতের কথা হচ্ছে না। আজ এত সব সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে-এর মধ্যে কেউ রাস্তায় বেরোয়? আজকের দিনটা অন্তত তুমি বাড়িতে থাকতে পারতে না।

কী করতাম বাড়িতে থেকে।

আচ্ছা মুশকিল তো তোমাকে নিয়ে। তুমি কী করবে, তা কি আমি তোমায় বলে দিতে পারি?

আমার শুধু এখানেই আসতে ইচ্ছে করে।

যা শুরু হয়েছে, সহজে থামবে বলে মনে হয় না। তুমি বাড়ি ফিরবে কী করে?

আমি ফিরব না। আমি আজ রাত্তিরে এখানেই থাকব।

তুমি কি এতই ছেলেমানুষ-তুমি জানো না, তা হয় না?

আমি আপনার ঘরের বাইরে, সিঁড়িতে শুয়ে থাকব!

সূর্য, তুমি কী বলো তো? তোমাকে নিয়ে আমি কী যে করি! তোমার বাবা তোমার জন্য চিন্তা করবেন না? তোমার বাবাকে বলে এসেছ?

না।

দীপ্তি এবার অত্যন্ত রাগত মুখ করে বললেন, এসব আমার মোটেই ভালো লাগে না। তুমি এবার মার খাবে আমার কাছে।

সূর্যর মুখে হাসি ফুটেছে। বলল, মারুন।

দীপ্তি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সূর্যর দিকে। সূর্য চোখ থেকে চোখ সরাল না।

দীপ্তি ধমকের সুরে বললেন, যাও চান করে এসো। আমি ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি।

সূর্য হাত বাড়িয়ে বলল, তোয়ালে?

বাথরুমেই আছে। তোমার জামাটা ছিঁড়ল কী করে? প্যান্টেও তো কাদা লেগেছে।

দীপ্তি এগিয়ে এসে সূর্যর পিঠে হাত রেখে বললেন, পিঠের এখানটা কেটে গেছে। কী হয়েছিল কী?

সূর্য তার পিঠ থেকে দীপ্তির হাতটা সরিয়ে এনে বলল, রাস্তায় একটা দল আমাকে ধরেছিল। তারা আমাকে বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম জিজ্ঞেস করল। আমি বলতে পারিনি। তারপর তারা আমাকে আমাদের সাত পুরুষের নাম বলতে বলল। কিন্তু আমি আমার ঠাকুরদার নামই জানি না।

ঠাকুরদার নাম জানো না?

সত্যিই জানি না। আমার বাবার কাছে তার বাবার কথা কক্ষনও শুনিনি। একটা-দুটো নাম বানিয়ে বলছিলাম-ওরা শেষ পর্যন্ত আমাকে অবিশ্বাস করেনি-কিন্তু একজন। খারাপ হিন্দু হিসেবে কয়েক ঘা মেরেছে। তারপর আমি পড়লাম আর একটা দলের হাতে। সেখানে আমি বললাম, আমি মুসলমান। তারা কী একটা বয়েত বলে তার পরের লাইনটা বলতে বলল। সেটা আমি কখনও শুনিইনি-তবু আমার মুখে দাড়ি আছে বলে। কয়েক ঘা দিয়ে-

এটা কি ছেলেখেলা? কী শুরু হয়েছে চারদিকে, তুমি খবর রাখো না?

মানুষ মানুষকে মারছে। আমি যদি মরেও যেতাম, তবু আপনি কি বুঝতে পারতেন আমি আপনার কাছেই আসছিলাম?

তুমি আমার জন্য এ রকম কেন করছ বলো তো?

আপনি আমাকে নিয়ে নিন। আমার সবকিছু আপনি নিয়ে নিন।

সূর্য, তুমি বুঝতে পারো না আমার জীবন অন্য রকম।

এত শক্ত ব্যাপার আমি বুঝব কী করে?

দীপ্তিকে অত্যন্ত অস্থির দেখাচ্ছে আজ। একবার ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে পড়ে বললেন, যাও চান করে এসো। তোমার কি খিদেও পায়। না?

স্নান করে বেরিয়ে এসে শার্টটা খুলে রেখে, শুধু প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে সূর্য খেতে বসল। খাবারগুলো সব টেবিলে এনে রেখে দীপ্তিও বসে পড়লেন। চিন্তিত ভাবে। বললেন, আমার দাদা বউদিরা থাকে ব্যারাকপুরে, ওদের কী হয়েছে জানি না। ওরাও নিশ্চয়ই আমার জন্য চিন্তা করছে। দাদার কোয়ার্টারে টেলিফোন আছে-স্কুলে যেতে পারলে টেলিফোনে খোঁজ নিতে পারতাম।

সূর্য বলল, আমি টেলিফোন করে আসব?

না, তোমাকে এখন বেরোতে হবে না।

শহরের মানুষ কি সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকবে? এ রকম ভাবে চলবে না, একটা কিছু মিটমাট হয়ে যাবেই।

সুকল্যাণদা বলছেন, এই দাঙ্গা সহজে থামবে না। বিরাট এক চক্রান্ত আছে নাকি এর। পেছনে। তুমি মীনা পেশোয়ারির নাম শুনেছ? সে নাকি অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। আছে। টালার ট্যাঙ্কে নাকি বিষ মেশানো হবে? কী হয়ে গেল বললো তো দেশটা?

সূর্য উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। দেশ সম্পর্কে তার আর কোনও চিন্তা নেই।

দীপ্তি বললেন, আমিই বা এ ভাবে এখানে কত দিন থাকতে পারব? আমাকে দাদার কাছেই চলে যেতে হবে।

এই সময়ে আমাদের কি কিছু করার আছে?

তোমরা একটা কিছু করতে পারো। আমি মেয়ে হয়ে আর কী করব?

আমি আপনাকে আপনার দাদার কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে পারি।

কী করে?

রাস্তায় পুলিশের গাড়ি দেখলেই থামাব।

তোমাকে নিয়েই আমার আরও বেশি ভয়। তোমার তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

দীপ্তিদি, এ-পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, আমি সহজে মরব না। কিন্তু আজই প্রথম আমি দেখলাম, কত সহজে মানুষ মানুষকে মারতে পারে। আমাকেও ওরা মেরে ফেলতে পারত। এইসব কথা ভাবতে এখন আমার ঘেন্না হচ্ছে।

খাওয়া শেষ হবার পর দীপ্তি বললেন, চলো, সুকল্যাণদার ফ্ল্যাটে যাই।

ওখানে গিয়ে কী হবে?

ওখানে অনেকে রয়েছে।

অনেকের সঙ্গে আমার ভালো লাগে না। সুকল্যাণদাকেও আমার ভালো লাগে না।

এ রকম ভাবে তুমি ক'দিন থাকবে? পৃথিবীতে সবার সঙ্গে মিলেমিশেই তোমাকে কাটাতে হবে।

বাইরে আবার একটা গোলমাল হতেই দীপ্তি ধড়ফড় করে চলে গেলেন জানলার কাছে।

সূর্য চেয়ারেই বসে রইল। দীপ্তি খুব সামান্য জানলা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকিয়ে শিহরনের শব্দ করে বললেন, ইস, কাকে যেন ধরে এনেছে।

সূর্য বলল, ওখান থেকে চলে আসুন।

দীপ্তি বললেন, উঃ মা! এরা কি মানুষ।

শিগগির ওখান থেকে চলে আসুন।

একজন বুড়ো লোক। দেখবে এসো, একজন বুড়ো লোক।

আমি কিচ্ছু দেখতে চাই না।

কান ধরে ওঠ-বোস করাচ্ছে।

আপনি এ-দিকে চলে আসুন আমাদের ও-সব কিছু দেখবার দরকার নেই।

আমাদের বাড়ির একেবারে সামনেই। কেউ কি এসব বন্ধ করতে পারে না?

সূর্য উঠে দীপ্তির বাহু ধরে কড়া গলায় বলল, আপনাকে বলছি না জানলা থেকে সরে আসতে?

দীপ্তি বললেন, সূর্য আমার গা কাঁপছে। আমার বুকের মধ্যে কী রকম যেন হচ্ছে। আমার জানলার কাছেই এ রকম হইহল্লা হলে আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না।

সূর্য দীপ্তির দুধে হাত রেখে একেবারে তার মুখের সামনে মুখ এনে চোখের পলক না ফেলে বলল, আমরা ও-সব কিছু দেখব না, আমরা ওসব কিছু শুনব না। পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

কী রকম চাঁচাচ্ছে, আমার কানে তালা লেগে যাচ্ছে!

কান বন্ধ করে থাকুন।

চলো, ওপরে চলো। সেখানে অনেকে আছে।

আর কোথাও কেউ নেই। পৃথিবীতে আর কারও জন্য আমার মাথাব্যথা নেই।

সূর্য দীপ্তির গালে ঠোঁট বোলাতে লাগল। তারপর এমন অসম্ভব জোরে দীপ্তির ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল যে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। দীপ্তি ছটফট করে কিছু একটা বলতে চাইছেন, সূর্য কিছুতেই তাঁকে কথা বলতে দেবে না। সূর্যর হাত ছাড়িয়ে যাবার জন্য দীপ্তি এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছেন কিন্তু সূর্য তার সর্বাঙ্গ ধরে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর সূর্য যখন তাকে ছাড়ল তখন দীপ্তির মুখখানা টকটকে লাল। উত্তেজিত ভাবে বললেন, তুমি আমাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

আপনি আমাকে নিয়ে নিন।

আমি জানি না, আমি কিছু জানি না।

সূর্য দীপ্তির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল পাশের ঘরে। সেখানে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, এই জঘন্য কুৎসিত পৃথিবীর আর কিছু আমি দেখতে চাই না। হয়তো আজকেই আমরা দুজনে মারা যেতে পারি–

এবার খুব নরম ভাবে দীপ্তির নাভির কাছে সূর্য তার মুখটা চেপে ধরল। দীপ্তির শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। সূর্যর মাথার চুল তিনি শক্ত করে চেপে ধরলেন। সূর্য দীপ্তির কোমর ধরে তাকে টেনে নামিয়ে আনল মাটিতে। প্রচণ্ড চুম্বনে দীপ্তির বুকে লাল দাগ করে দিল। তারপর একটা করে খুলতে লাগল বোতাম।

দীপ্তি বড় বড় নিশ্বাস ফেলে কাতর ভাবে বলতে লাগলেন, সূর্য আমি নিজের কাছে হেরে যাচ্ছি। বাইরে মানুষ মরছে, আর আমি–আমি আর পারছি না, চিন্তাও করতে পারছি না।

সূর্য একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীপ্তির সুন্দর শরীরের দিকে। আস্তে আস্তে বলল, পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। হয়তো আমরাও কাল আর বেঁচে থাকব না।

দীপ্তি চোখ বুজে বললেন, আমাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। আরও জোরে, আরও জোরে-।

সে-দিন সন্ধ্যাবেলা একদল লোক এসে বলল, এবাড়িতে একজন মুসলমানকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে বার করে দিতে হবে।

সুকল্যাণ সূর্যকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন তিন তলায়। আয়নার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, দাড়ি কামাও! এক্ষুনি।

৫৮. আমাদের বাড়ির বাজার করার ভার

আমাদের বাড়ির বাজার করার ভার ছিল বাবার ওপর। বাবা একাজে খুব দক্ষ নন, কলকাতার বাজারের ধুরন্ধর দোকানদারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। কিন্তু যৌথ পরিবারের নিষ্কর্মা ব্যক্তিটির ওপরেই সচরাচর বাজার করার ভার পড়ে। জ্যাঠামশাই ইদানীং অত্যন্ত ব্যস্ত, এক মুহূর্ত তার সময় নেই। পয়সা রোজগারের উন্মাদনায় তার আর কোনও দিকে তাকাবার অবসর নেই। যুদ্ধের বাজারে লৌহ ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের মতনই কাগজ ব্যবসায়ীদেরও প্রচণ্ড লাভ হয়েছে। কালোবাজার একেবারে ফলাও হয়ে উঠেছে।

।বাবা ইদানীং প্রতিদিন সকালের বাজার করার ভারটা আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন। সরাসরি দেননি, কিছু দিন অ্যাপ্রেন্টিসগিরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার তখন যা বয়স, তাতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের থলি নিয়ে ঘোরার ব্যাপারটা মোটেই

পছন্দসই বা সম্মানজনক নয়। কোনও বন্ধু বা সহপাঠী দেখে ফেললে অত্যন্ত লজ্জায় পড়ি। আমার বন্ধু বিষ্ণু বা ভাস্কর কোনও দিন বাজারে ঢোকেইনি। হঠাৎ কোনও দিন একলা বাজার করতে গেলে অবশ্য মন্দ লাগে না আমার, দু-চার আনা পয়সা পকেট খরচ জুটে যায়।

সেদিন সকালবেলা বাবার সঙ্গে আমাকে বাজারে যেতে হয়েছে। বাজারের কাছটায় খুব ভিড় ছিল, আমরা তা লক্ষ করিনি। গেট দিয়ে ঢুকতে যেতেই দেখি একজন বুড়ো লোক মাথায় ডিমের ঝকা নিয়ে দৌড়ে আসছে আর বাঁশ হাতে নিয়ে কিছু লোক তাকে তাড়া করেছে। অচিরেই বুড়ো লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, প্রায় দুশো-আড়াইশো ডিম ছিটকে পড়ল মাটিতে। অসম্ভব ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ির পরই লেগে গেল বড় রকমের মারামারি।

সেই গোলমালের মধ্যে আমি বাবাকে হারিয়ে ফেললাম। প্রথমে চমকে গিয়ে আমাকেও দৌড়ে রাস্তার ওপারে চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু বাবাকে খুঁজে না পেয়ে আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল, বিকট চিৎকার, লাঠি ও লোহার রডের প্রবল তাণ্ডবে ধপাধপ মানুষের দেহ পড়ে যাচ্ছে রাস্তায়। এখন আর এখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ানো চলে না–কিন্তু বাবাকে ফেলে আমি চলে যাব কী করে! বাবাও নিশ্চয়ই আমাকে না পেয়ে দারুণ চিন্তা করছেন।

স্নেহ নিম্নগামী। পিতার পুত্রস্নেহের তুলনায় পুত্রের পিতৃভক্তি সচরাচর অনেক কম হয়। সেদিন মারামারি ব্যাপক হয়ে ওঠায় আমি বেশ কয়েক বার অনেক দূর পর্যন্ত পালিয়ে গেছি–আবার বাবাকে খোঁজবার জন্য ফিরে এসেছি একটু একটু করে। কিন্তু বাবা সেই লুঠেরা ও হত্যাকারীদের মধ্যেই পাগলের মতন খুঁজছেন আমাকে। আহত বা নিহত মুখগুলোর কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছেন–এক বারও নিজের জীবনের কথা ভাবেননি।

শেষ পর্যন্ত অক্ষত শরীরেই আমরা দু'জনকে ফিরে পেলাম। আমাকে দেখে বাবা ছুটে এসে আমার কাধ আঁকড়ে ধরলেন। তার চোখদুটি বিস্ফারিত, সারা দেহটা থরথর করে

কাঁপছে। কিছু একটা বলতে গিয়ে শুধু উচ্চারণ করলেন, বাদল, বাদল। আর একটু দেরি হলেই বোধহয় উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। বাবা যেন তাঁর মৃত পুত্রকে ফিরে পেলেন।

বাবার তুলনায় আমি অনেক কম বিচলিত ছিলাম। অরাজকতা ও মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে আমি ছুটলাম বাবার হাত ধরে। কোনও রকমে এসে পৌঁছে গেলাম তালতলার বাড়িতে। এ-পাড়াতেও ততক্ষণে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, বাড়ির সবাই দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল।

একটা ছোটখাটো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বাড়ি ফিরে এই জঘন্য ও নিষ্ঠুর সব হত্যাকাণ্ডের জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়ার বদলে আমি আমাদের পালিয়ে আসার কাহিনী যতদূর রোমাঞ্চকর ভাবে বলা যায়, সেই ব্যাপারেই বেশি উৎসাহিত বোধ করছিলুম। দু'-একটা ছোটখাটো মিথ্যে বলতেও দ্বিধা করিনি। একটা লোক আমাদের ছুরি নিয়ে তাড়া করেছিল–আমিই যে আমার বৃদ্ধ বাবাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছি, আমার কথার মধ্যে এই সুর ছিল এবং মা-জ্যাঠাইমারা বিশ্বাসও করেছিলেন।

এদিকে মৌলালি, ও-দিকে ওয়েলিংটনে দাঙ্গা এত দূর ছড়িয়ে পড়ল যে আমরা মাঝখানে আটকা পড়ে গেলাম। দিনের-পর-দিন এই রকম চলল। সব সময় একটা আতঙ্ক। বাড়ির ছাদে উঠলেই আমরা দূরে ধোঁয়া দেখতে পাই–কোথাও-না-কোথাও বাড়ি পুড়ছে। সারা রাত ধরে চিৎকার ভেসে আসে।

আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই বড়রাস্তার ওপর এগারোটা মড়া পড়েছিল। এখানে ওখানে, খুন করে খুনিরা ওই মৃতদেহ বড়রাস্তায় এনে জড়ো করে রেখেছে। কদাচিৎ পুলিশের গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যায়–মড়াগুলোর দিকে তাকায় না পর্যন্ত। তেতাল্লিশের। দুর্ভিক্ষেও রাস্তায় তোক মরেছিল, কিন্তু মৃতদেহ বেশিক্ষণ ফেলে রাখা হয়নি। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মৃতদেহের প্রতিও কোনও সম্মান নেই।

বাবা-জ্যাঠামশাই প্রথম দিকে আশা করেছিলেন, এখনও তো দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব আছে। ব্রিটিশ সরকার এ রকম বর্বর ব্যাপার কিছুতেই চলতে দেবে না। লিগ মিনিস্ট্রি না হয় পুলিশ বিভাগকে হাত করে রেখেছে, কিন্তু সরকারের হাতে তো মিলিটারি আছে। ফোর্ট

উইলিয়াম থেকে মিলিটারি বেরিয়ে এক দিনেই সব ঠান্ডা করে দেবে। আমার জ্যাঠামশাইয়ের মিলিটারির ওপর অগাধ ভক্তি ছিল।

কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, মিলিটারি আর বেরোল না।

এদিকে মড়াগুলো পড়ে রইল রাস্তায়। বিন্দুমাত্র ইচ্ছে না থাকলেও বার বার চোখ চলে যায় ওদের দিকে। দু-তিন দিন পরই আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, রোগা রোগা লোকগুলো মৃত্যুর পর বেশ মোটাসোটা হয়ে গেছে। পঞ্চম দিনে তাদের কারওর কারওর হাত উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। যেন শুয়ে শুয়ে কোনও একটা নাচের ভঙ্গিমায় তাদের হাতের মোটা মোটা আঙুলে বিভিন্ন মুদ্রা। একজনের উঁচু করা হাত দেখলে মনে হয়, সে আকাশের ঈশ্বরের দিকে কঁচকলা দেখাচ্ছে।

মৃত্যু আমি কম দেখিনি। তাই লঘু হাস্যময় জীবনের প্রতি আমার এত অদ্ভুত লোভ।

মানুষ-পচা বিকট গন্ধ জানলা দরজা বন্ধ করেও আটকানো যায় না। সব সময় আমাদের বাড়িতে ধুপধুনো জ্বলে। আমরা রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখি রাস্তার মড়াগুলো এবার উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে হেঁটে হেঁটে আসছে। আমার দিদি সান্ত্বনার পাগলামির লক্ষণটা আবার বেড়ে গেল।

একদিন পুলিশ এসে পাড়ায় মাইকে ঘোষণা করতে লাগল যে যদি কেউ এ-পাড়া থেকে পছন্দমতন নিরাপদ পাড়ায় চলে যেতে চায়-তা হলে পুলিশের পাহারায় তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এই ঘোষণা শুনেই বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের হৃৎকম্প শুরু হল। তার মানেই নিশ্চয়ই এ পাড়ায় শিগগির একটা বড় রকমের হামলা হবে। এবার আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না। ইতিমধ্যেই একদিন টেলিফোনে বড়বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল–ওই পাড়া তখন শান্ত। আমরা কোনও রকমে বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে পুলিশের গাড়ি চেপে চলে এলাম বড়বাবুর বাড়িতে।

এখানে এসে শুনলাম, সূর্যদা মাঝখানে একদিন খবর পাঠিয়েছিল। এখন সে রিলিফের কাজে ব্যস্ত। বাড়িতে আসার সময় পায় না।

জিন্নার পাকিস্তানের স্বপ্ন সফল হবার আগেই কলকাতায় ছোট ছোট পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান হয়ে গেল। ভাগ হয়ে গেল বিভিন্ন পাড়া–এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় যায় না–দৈবাৎ গিয়ে পড়লে প্রাণ নিয়ে ফেরে না। মাঝখানে দু-এক দিনের জন্য থামে। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। নেতারা পরস্পরবিরোধী চাচামেচি করে।

কলকাতার পর শুরু হল নোয়াখালিতে। হত্যা, নারীধর্ষণ আর অগ্নিকাণ্ডের খবর ছাড়া আর কোনও খবর নেই। বাংলাদেশের বদলা নেওয়া হল বিহার, আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে।

অক্টোবরের শেষ দিকে গান্ধীজি এলেন কলকাতায়। গান্ধীজি তখন মুসলমানদের চোখে পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু। আবার তার জিন্নাতোষণ নীতির জন্য বহু সংখ্যক হিন্দুও তার ওপর খড়্গহস্ত। এই অবস্থাতেও তার শান্তির আহ্বানে কিছুটা ফল হল। গান্ধীজি এসে আশ্রয় নিলেন বেলেঘাটার মুসলমান পাড়ায়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিও এসে আশ্রয় নিলেন তাঁর কাছে। স্কুল কলেজের ছাত্ররা আবার শান্তি মিছিল বার করে কলকাতা পরিভ্রমণ করল, তারপর এল বেলেঘাটায়। সেই মিছিলে আমিও ছিলাম।

গান্ধীজি ও সোহরাওয়ার্দি আমাদের কাছে যুগ্ম ভাবে আহ্বান জানালেন হিন্দু-মুসলমান সমমর্মিতার জন্য। কিন্তু আমরা দেখলাম অতিশয় রূপবান, সুপুরুষ সোহরাওয়ার্দির মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিমর্ষ। ঘটনার বল্গাহীন গতি দেখে তিনি যেন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। গান্ধীজির মুখে দারুণ ক্লান্তির ছাপ। তিনি নির্বাক।

একজন গান্ধীজির বাণী চাইতে গেলে, তিনি বাংলাতেই লিখে দিলেন আমার জীবনই আমার বাণী। কিন্তু কঁপা কাঁপা অক্ষর, তাতে যেন আত্মবিশ্বাসের ছাপ নেই।

একটা ছেলে হঠাৎ সামনের দিকে ছুটে গিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমার বোন...আমার বোনকে ওরা...আমারই চোখের সামনে...মেরে ফেলেছে...আপনি এর কী উত্তর দেবেন?

ছেলেটিকে জোর করে থামানো হল। তখন এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নয়। সমমর্মিতার সময়। আমাদের জল তেষ্টা পেয়েছিল বলে বেলেঘাটার বস্তির বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে আমরা জল চাইলাম। কেউ কেউ বললেন, আমাদের একটু পানি দিন। মুসলমানের হাত থেকে জল নিয়ে সেদিন আমাদের মনে হয়েছিল, আমরা যেন অমৃত পান করছি!

কলকাতা থেকে গান্ধীজি গেলেন নোয়াখালিতে। গান্ধীজিকে একজন প্রশ্ন করেছিল, আপনি বোম্বাই, আমেদাবাদ বা ছাপরায় না গিয়ে নোয়াখালিতে কেন যাচ্ছেন? সেখানে হিন্দুরা উৎপীড়িত হয়েছে বলেই কি যাচ্ছেন?

মর্মাহত হয়ে গান্ধীজি বললেন, নোয়াখালির মতন ঘটনা যদি অন্য কোনও জায়গায় ঘটে এবং তিনি অনুভব করেন যে সেখানে না গিয়ে তার উপায় নেই, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেখানে যাবেন। নোয়াখালির ধর্ষিতা নারীদের আকুল ক্রন্দনই তাঁকে সেখানে যাবার জন্য অস্থির করে তুলেছে।

নোয়াখালিতে গান্ধীজি নিহত হবেন এই রকম একটা আশঙ্কায় বিদেশি সাংবাদিকরা খুব তৎপর হয়ে উঠেছিল। সে রকম কিছু ঘটল না, কিন্তু সাময়িক বিরতি ছাড়া গভীর কোনও প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না। ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তখন গান্ধীজিরও নেই।

কলকাতায় গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় আর একটি শান্তি মিছিল বেরিয়ে ওয়েলিংটনের কাছে আক্রান্ত হল। কয়েক জন শা৷ ওঁবাদীর ছিন্নভিন্ন দেহ লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়।

তার কয়েক দিনের মধ্যেই আমার জ্যাঠামশাই খুন হলেন।

বড়বাবুর বাড়িতে আমরা নিরুপদ্রবেই ছিলাম। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের মন টিকছিল না। সেখানে। ইতিমধ্যেই বড়বাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে যাওয়ায় আবার তার বাড়িতেই আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ফিরে আসতে জ্যাঠামশাইয়ের আত্মসম্মানে লেগেছিল। তা ছাড়া, তার তালতলার বাড়িতে বহু টাকার সম্পত্তি পড়ে ছিল। সে সব ছেড়ে থাকার জন্য তিনি এক মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছিলেন না। একবার কলকাতার অবস্থা একটু ঠান্ডা হতেই তিনি স্ত্রী ও মেয়েদের এ বাড়িতে রেখে জোর করে ফিরে গেলেন তালতলায়। বাড়ির মেয়েদের কান্নাকাটি এবং বড়বাবুর অনুরোধ কিছুই শুনলেন না। বাড়ির চাকর ও দারোয়ানদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

দু দিন বাদেই তালতলার বাড়ি আক্রান্ত হল, আগুন লাগানো হল বাড়িতে। জ্যাঠামশাই পালাতে পারলেন না-অত্যন্ত নৃশংস ভাবে নিহত হলেন। এই ঘটনার দেড় ঘণ্টা পরেই সেই রাস্তায় জ্যাঠামশাইয়ের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলিটারির গাড়ির সার এসে পড়ল, কিন্তু জ্যাঠামশাইকে বাঁচাতে পারল না। জ্যাঠামশাইয়ের বিষয়সম্পত্তি ও প্রাণ একই সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল।

আমরা জ্যাঠামশাইয়ের মৃতদেহ দেখিনি। খবর পাওয়া গিয়েছিল বারো ঘণ্টা পরে। এবং ঘটনাটি সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ করতে সময় লেগেছিল আরও এক দিন। তারপর মর্গ থেকে একটা কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ নিয়ে এসে দাহ করা হয় নিমতলায়।

খবর পেয়ে এই দুর্দিনের মধ্যেও বড়দি চলে এল খড়্গপুর থেকে। সূর্যদাও ফিরে এল বাড়িতে। জ্যাঠাইমাকে সামলাতেই সবাই হিমসিম খেয়ে গেল। জ্যাঠাইমা কিছুতেই তাঁর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করবেন না-তিনি সবার হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চান তালতলার বাড়িতে। সেখানে সে-বাড়ির একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে শুধু, জানলা-দরজাগুলোরও অস্তিত্ব নেই। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর জামাইবাবু জ্যাঠাইমাকে খড়্গপুরে নিয়ে যেতে চাইলেন।

দেশব্যাপী অবিশ্রান্ত মারামারি কাটাকাটির ফলে দেশের সাধারণ লোক একসময় তিতিবিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, এর থেকে দেশ ভাগ হয়েও স্বাধীনতা আসে তো আসুক। তখনও বাংলা বা পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের কথা বিশেষ কেউ চিন্তা করেনি। যে-দিন সত্যিই সে কথা ঘোষিত হল, সে-দিন বাংলার চেয়েও বেশি আগুন জ্বলে উঠল পাঞ্জাবে। রণদুর্মদ শিখ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ পাঞ্জাবিরা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে লাগল।

সাতচল্লিশের মাঝামাঝি এসে কলকাতা অনেকটা শান্ত হয়ে পড়ল। মানুষজন আবার পথেঘাটে বেরোয়, দোকানপাট করে। যেসব পাড়ার লোকেরা এককাট্টা হয়ে অন্য পাড়ার আক্রমণ রুখেছে এখন তারাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগায় রেশনের দোকানের লাইনে। রক্তাক্ত দিনের বিভীষিকাও জনতার মন থেকে কত তাড়াতাড়ি মুছে যায়! মাঝে মাঝেই এখানে সেখানে খালি বাড়ি পড়ে আছে-অধিবাসীরা পলাতক। বিষ্ণুদের। পাড়াতেও দাঙ্গা বেশ প্রবল ভাবেই হয়েছিল, অনেক দিন ওদের খোঁজ নিতে পারিনি। একদিন গিয়ে শুনলাম, ওরা আসামে বেড়াতে চলে গেছে। সিঁড়ির মুখটাতেই রেণুর সঙ্গে দেখা।

রেণুকে দেখলেই আজকাল আমি একটু একটু ভয় পাই। রেণু আজকাল কথায় কথায় আমার বড্ড সমালোচনা করে। জামার বোতাম ঘেঁড়া থাকলে কিংবা জুতোয় পালিশ না থাকলে রেণু ভুরু কুঁচকে তাকায়। রেণু একটা কথা বোঝে না। একদল ছেলে সব সময় ফিটফাট সেজেগুঁজে থাকতে ভালোবাসে, আর একদল ছেলে সেজেগুঁজে ফিটফাট থাকার সরঞ্জামই পায় না। তাদের জুতোয় তাপ্পি থাকে, ছেঁড়া প্যান্ট সেলাই করে পরেও সেটা আবার লুকোতে চায়-ধোপাবাড়িতে পাঠাবার সামর্থ্য নেই বলেই বাড়িতে সোড়া দিয়ে কাঁচা জামা পরে। এ ছাড়াও আর একদল ছেলে থাকে, যারা পরিচ্ছন্ন শার্টেও বোতাম দেয় না, দামি প্যান্টের সঙ্গে ছেঁড়া শার্ট পরে ইচ্ছে করে এবং চুলে তেল দেওয়া পছন্দ করে না। আমি ওই তৃতীয় দলের ছেলেদের অন্তর্গত হয়ে গেছি কারণ এরাই ছাত্রদের সমাজের শিরোমণি।

রেণুকে জিজ্ঞেস করলাম, তোদের বাড়িটা এত ফাঁকা ফাঁকা কেন রে?

সাদা রঙের স্কার্ট পরে রেণু দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি, মুখে একটাও কথা নেই। কপালে এসে পড়েছে কয়েক গোছা চুল, বাঁ হাতে একটা বই, ডান হাত রেলিংয়ে। তকতকে ঝকঝকে শরীর, নির্মল চোখ, সদ্যফোঁটা ফুলের মতন শরীরে নতুন যৌবনের আভা! রেণুকে মনে হল একটা ছবির মতন–এবং সত্যিই যেন এ রকম একটি ছবি আমি আগে কোথাও দেখেছি!

রেণু আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না, সিঁড়ির ঠিক সেই ধাপেই দাঁড়িয়ে রইল। রেণুকে দেখে আমি সব ভুলে গেলাম। এই ক'মাসের ভয়াবহ সময়, রক্তপাত, দুঃস্বপ্ন, শোক। সেই ছবিটির মধ্যে যে সৌন্দর্য ছিল, তা আর সব কিছুকেই আচ্ছন্ন করে দেয়।

আমি দু'-এক পা এগিয়ে এসে বললাম, এই রেণু?

ছবিটা ভেঙে গেল। রেণু সিঁড়ি থেকে নেমে এসে বলল, ছোড়দা, নদা কেউ বাড়ি নেই।

তুই কোথায় যাচ্ছিস?

আমি মল্লিকাদের বাড়ি থেকে বই আনতে যাচ্ছি। ওদের বাড়িতে অনেক বই।

এক্ষুনি আসবি তো? আমি এখানে বসি?

রেণু গম্ভীর মুখ করে বলল, তুই আজকাল সিগারেট খাস?

আমি দারুণ অবাক হয়ে বললাম, না তো!

একজন তোকে দেখেছে!

মোটেই না। কক্ষনও হতে পারে না।

একজন যে আমাকে বলল!

কে?

সে যেই হোক না–

তবু আমি নাম শুনতে চাই।

মল্লিকার দাদা।

সেই মুহূর্তে মল্লিকার দাদাকে হাতের কাছে পেলে আমি দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিতাম। খুন করে ফেলাও বিচিত্র ছিল না।

কঠিন মুখ করে বললাম, হি ইজ এ লায়ার! ড্যাম লায়ার!

তুই সত্যি খাসনি?

না।

আমার হাত ছুঁয়ে বল।

রেণুর হাত ছুঁয়ে আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই তো বলছি!

আসলে আমি মিথ্যে কথা বললাম। রেণুকে ভয় পাই বলেই ওর সামনে মিথ্যে কথা বলতে আমার আটকাল না। রেণু এখনও স্কুলের মেয়ে-ও কী করে বুঝবে যে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভরতি হয়ে যে-ছেলে সিগারেট না খায় এবং রেস্টুরেন্টের চায়ের কাপে ছাই না ফেলে-বন্ধুদের কাছে তার কোনও সম্মানই নেই।

এত কম বয়সেই রেণুর মধ্যে নীতিবোধ ও সততা অত্যন্ত বেশি। ওকে যখন প্রথম দেখি, তখন ও ছিল দারুণ দুরন্ত ও দুষ্টু মেয়ে-হঠাৎ কী রকম বদলে গেছে। যাবতীয় মানবিক ব্যবহারকেও ও ভালো ও মন্দ, এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে-এবং মন্দের সঙ্গে ও

কোনও সংস্রব রাখতেই রাজি নয়। ওর নিজের দাদা অংশু এ রকম নয়–কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে রেণুর খুব মিল আছে এ ব্যাপারে।

বিষ্ণু আর আমি আলাদা আলাদা কলেজে ভরতি হয়েছি বলে বিষ্ণুর প্রভাব আমার ওপর থেকে কমে গেছে। বিষ্ণু ভরতি হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজে কিন্তু ওই কলেজে মেয়েরা পড়ে বলে আমাকে কিছুতেই সেখানে ভরতি করা হল না। আমার বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে দারুণ গোঁড়া–অধিকাংশ বাঙাল পরিবারই এ রকম। আমাকে ভরতি হতে হয়েছিল সেন্ট পলস কলেজে। সেখানে একটি ছেলে একদিন আমাকে বলেছিল, তুই ট্রামরাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে পারবি? সে চ্যালেঞ্জ অস্বীকার করব কী করে?

তবু রেণুর কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার গ্লানি হয় না। বরং বেশ মজা লাগে।

আমি তখনও রেণুর হাত ধরে আছি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রেণু বলল, আমি তোকে। একটা চিঠি লিখেছিলাম।

কই পাইনি তো!

পাঠাইনি।

কই দে। এখন আমাকে দে।

এখন আর দিয়ে কী হবে। এমনি লিখেছিলাম।

আমার চিঠি আমাকে দিতেই হবে। আমি এক্ষুনি চাই।

রেণু বড় একরোখা মেয়ে। একবার কোনও ব্যাপারে না বললে আর সহজে হা বলানো যায় না। চিঠিটা ও কিছুতেই দেবে না। শেষ পর্যন্ত বলল, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছে।

আমি বললাম, মিথ্যে কথা!

রেণু বলল, আমি মোটেই তোর মতন যখন-তখন মিথ্যে কথা বলি না।

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে ছুঁয়ে বল।

রেণু ছুঁয়ে দিয়ে বলল, এই তো বলছি!

রেণুকে দেখলেই বোঝা যায়, ও মিথ্যে কথা বলার মেয়ে নয়। তবু আমার সন্দেহ যায় না। মনে হয়, আমারই মতন রেণুও এ-ক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু সে কথা আর ওকে বলা যায় না।

যে-চিঠি পাওয়া যায় না, সেই চিঠির জন্য মনের মধ্যে একটা দারুণ ঔৎসুক্য থাকে। আমার বার বার মনে হতে থাকে যে সেই না-পাওয়া চিঠির মধ্যেই আমার জীবনের অনেক রহস্যের সমাধান ছিল।

নিস্তব্ধ ঠাকুরদালানে রোদ পড়েছে, তিনটি শালিক সেখানে প্রচণ্ড কলহে মত্ত। বড় থামের পাশে শুয়ে আছে একটা বিড়াল। ওপরে কার হাত থেকে একটা থালা পড়ে গেল ঝনঝন শব্দে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, রেণুর সঙ্গে আমার সারা জীবনে কখনও বিচ্ছেদ হবে না। রেণু যেন একটা মেয়ে নয় শুধু, একটি শিল্প। যে শিল্পের সন্ধান আমাকে সারা জীবন ধরে করে যেতে হবে।

সেইসময় ভাস্কর আর পঙ্কজ এসে পড়ল। আমাকে দেখেই বলল, কী রে বাদল, তোর যে পাত্তাই নেই অনেক দিন!

ওরা দু'জনে ধপ করে ঠাকুরদালানের সিঁড়িতে বসে পড়ে বলল, এই রেণু, বিষ্ণুকে ডাক তো!

আমি বললাম, বিষ্ণু তো নেই এখানে।

সে কথা শুনে ভাস্কর ও পঙ্কজ বেশ দুঃখিত হয়ে পড়ল। ওদের মনে হল, বিষ্ণু ওদের সঙ্গে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বাইরে বেড়াতে যাবার আগে বিষ্ণু তার বন্ধুদের একবার খবরও দিয়ে গেল না! যদিও মাঝখানে কয়েক মাসের ডামাডোলে খবর দেবার অসুবিধা ছিল, তবু বন্ধুদের অভিমান হবেই।

বিষ্ণু আমারই সবচেয়ে পুরনো বন্ধু সুতরাং আমারও অভিমান হবার কথা ছিল। কিন্তু এসেই সিঁড়ির ওপরে রেণুর ছবির মতন দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও রেণুর সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ পঙ্কজ আর ভাস্কর এসে পড়ায় আমি বেশ অপরাধী বোধ করছিলাম। আমার মুখখানা তেলতেলে হয়ে এসেছিল, ওরা অবশ্য সেটা লক্ষ করেনি।

ভাস্কর বলল, ওফ যা গরম! এই রেণু খাবার জল নিয়ে আয়। অনেকখানি খাবার জল নিয়ে আয়।

পঙ্কজ মুখ নিচু করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, শুনলুম নাকি তোর কোন আত্মীয়-

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখখানা কালো হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি কান্নার ঠিক আগের মুহূর্তের মতন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম, আমার জ্যাঠামশাই, আমার নিজের জ্যাঠামশাইকে, উঃ!

আমার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুতে আমি আঘাত পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তেমন ভাবে খুব বেশি শোক পাইনি! জ্যাঠামশাই আমাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না-ইদানীং তার সঙ্গে একটা দূরত্বও তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

তবু, অন্যদের কাছে বলতে গেলে একটু অভিনয়ের ব্যাপার এসেই যায়। আমি এত বেশি শোকের ভান করতে লাগলুম যে ওরা আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

৫৯. জুন মাসের তিন তারিখে

জুন মাসের তিন তারিখে ঘোষণা করা হল ভারত বিভক্ত করে দুটি আলাদা রাষ্ট্রকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে পনেরোই আগস্ট। মাঝখানে মাত্র বাহাত্তর দিনের মধ্যে সীমানা, সম্পত্তি, সেনাবাহিনী, চাকরিবাকরি প্রভৃতি ভাগ বাটোয়ারার সব রকম জটিল প্রশ্ন সেরে নিতে হবে।

সাধারণ মানুষ জানে না, এই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কী, ডোমিনিয়ান স্টেটাস বলতেই বা কী বোঝায়। শুধু স্বাধীনতা কথাটার মধ্যেই একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ আছে। দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচার, উৎপীড়ন, আত্মক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জাতীয় নেতাদের নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি ও দলাদলিতে মানুষ একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ স্বাধীনতা আসছে শুনে সকলেরই মনে হল, এইটাই পরম প্রাপ্তি।

১৪ই আগস্ট সন্ধ্যা থেকেই সারা দেশে অভূতপূর্ব উত্তেজনা। আগামী কাল একটা বিরাট উৎসবের দিন, কিন্তু সেই উৎসবের চেহারা কী রকম হবে কেউ জানে না। ভারতবর্ষের আবহমান কালের ইতিহাসে কোনও দিন স্বাধীনতার উৎসব তো হয়নি। রামায়ণ-মহাভারতেও স্বাধীনতা উৎসবের বর্ণনা নেই। ইতিহাস দিয়েছে শুধু নতুন রাজ্যাভিষেকের খবর। এই দিনটিতে সব মানুষ তাই ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল; দাঙ্গা-হাঙ্গামাও অকস্মাৎ থেমে গেছে।

বড়বাবু একটা নতুন রেডিয়ো কিনে ফেললেন। কদিন থেকেই তার শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল, কোমরে ব্যথার জন্য হাঁটাচলা করতে পারছিলেন না–তবু তিনি এ-দিনটিতে বেশ উত্তেজনা বোধ করছিলেন–শিয়রের কাছে সারাক্ষণ রেডিয়োটা খুলে রাখলেন। মাঝে মাঝে চিররঞ্জন এসে পাশে বসেন। খবর শুনতে শুনতে হঠাৎ একসময় চিররঞ্জনের চোখে জল আসে। অস্ফুট গলায় বলেন, সবই শেষ পর্যন্ত মিটে গেল, মাঝখান থেকে দাদা...

বৃদ্ধ বয়সে শোক বেশি হয়। চিররঞ্জন তাঁর দাদার অপঘাত মৃত্যুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

বড়বাবু তাকে কোনও সান্ত্বনা দেন না। অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে থাকেন কড়িকাঠের দিকে। তারপর হঠাৎ একসময় ব্যাকুল ভাবে বলেন, এই দেশভাগের পরিণতি কী হবে, আমি তো ভাবতেই পারছি না।

চিররঞ্জন চোখের জল মুছে বলেন, আমার শ্বশুরমশাই চিঠি লিখেছেন-ওখানকার বিষয়-সম্পত্তি বেচে দিয়ে এ দিকে চলে আসবার চেষ্টা করবেন।

অতটা বোধহয় দরকার হবে না। একটা কিছু প্রটেকশন থাকবেই। দু'দিকেই তো মাইনরিটি রয়ে গেল।

একটু থেমে বড়বাবু আবার বললেন, শরীরটা যদি সুস্থ থাকত আমি এই সময় দিল্লি চলে যেতাম। এই দৃশ্য তো আর জীবনে কখনও দেখতে পাব নাকাল লালকেল্লায় যখন তেরঙ্গা ঝান্ডা ওড়াবে জওহরলাল।

গান্ধীজির কোনও কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি না কেন?

ওঁর দিন শেষ হয়ে গেছে। উনি এখন সবরমতী নিয়েই থাকুন! থার্টিজেই ওঁর রিটায়ার করা উচিত ছিল।

আপনার কি মনে হয় ওঁর কথা মতন কংগ্রেস পার্টিটা এখন ভেঙে দেওয়া হবে?

রেডিয়োর দিকে উৎকর্ণ হয়ে বড়বাবু বললেন, চুপ, কী বলছে শোনো। ঠিক রাত বারোটায় জওহরলাল রেডিয়োতে ভাষণ দেবে। আমাদের এখানকার চিফ মিনিস্টার হল প্রফুল্ল ঘোষ। বাঙালদের আর দুঃখ করার কিছু রইল না।

সূর্য কিংবা বাদল কেউই বাড়ি নেই।

বাদল সারা সন্ধেটা কাটাল ভাস্কর আর পঙ্কজদের সঙ্গে। কাল খুব ভোরে প্রভাতফেরি বার করবে। তার প্রস্তুতি চলছে। ভাস্করদের বৈঠকখানায় ওরা গানের রিহার্সাল দিল, কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশি কে গীত গায়ে যা এবং কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফ্যাল কর রে লোপাট।

রাত ন'টার সময় ওরা দল মিলে এল বিষ্ণুদের বাড়িতে। বিষ্ণুদের বাড়িতে রীতিমতো হইচই চলছে। ওদের অতবড় বাড়ি আগামীকাল উৎসব সজ্জায় সাজানো হবে। ইলেকট্রিকের মিস্তিরি এসেছে-ছাদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো লাগাবার জন্য তার টানা হচ্ছে। প্রায় শ'খানেক পতাকা কেনা হয়েছে। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বসে গেছে কাগজের শিকলি তৈরি করতে। সুপ্রকাশ তদারক করছে এসবের।

বাদলরাও শিকলি বানাতে বসে গেল। বাদল অন্যদের দেখাদেখি বেশ চটপট বানিয়ে ফেলল অনেকখানি। ভাস্কর এসব কাজে মন বসাতে পারে না। সে একটু বাদে বাদেই বলে, উঃ টায়ার্ড হয়ে গেলুম। এই বিষ্ণু, চা পাঠাতে বল না।

বিষ্ণুর মা ছেলেদের বেশি চা খাওয়া পছন্দ করেন না। একতলা থেকে চাকর চায়ের ফরমাশ নিয়ে গেলেই তিনি প্লেট-ভরতি সন্দেশ আর শরবত পাঠিয়ে দেন।

একটু বাদে সবাইকেই ওপরে ডেকে পাঠানো হল। সকলেরই খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

এবাড়ির দোতলার হলঘরটা বহুদিন ব্যবহার করা হয় না। আজ ঝেড়ে পুঁছে সাফ করা হয়েছে। বার করা হয়েছে পুরনো কালের রূপোর থালাবাসন। পড়ন্ত অবস্থা হলেও এখনও যেতে যেতে কিছু আছে। বিষ্ণুর মা নিজে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাপনা করেছেন। তিন রকম মাছমাংস এবং চার রকমের মিষ্টি না হলে তিনি লোককে খাওয়ানোর কথা ভাবতেই পারেন না। অনেক কিছুই কিনে আনিয়েছেন একটু আগে। সব দোকানপাট এখনও খোলা, বোধহয় সারা রাতই ভোলা থাকবে।

বাদল অনেকদিন বাদে এ বাড়ির ওপরে এল। আজই সে প্রথম রেণুর আর এক কাকাকে দেখল, যাঁর স্ত্রী ছিলেন হৈমন্তী কাকিমা। হৈমন্তী কাকিমার নাম এবাড়িতে অনেকদিন শোনা যায় না। তার বরের চোখ ফুলো ফুলো। গালে চাকা চাকা দাগ তবে খুব শৌখিন মানুষ, কোঁচার প্রান্তটি ফুলের মতন ছড়ানো, হাতে সবুজ রঙের সিগারেটের টিন।

খাওয়া শেষ করে ওরা সবাই ছাদে এল। পতাকাগুলো লাগাতে হবে-আলোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এত রাত পর্যন্ত বাদলরা এর আগে কখনও বাড়ির বাইরে থাকেনি- কিন্তু আজ সে সম্পর্কে কোনও চিন্তাই নেই।

আকাশে কয়েক টুকরো পাতলা মেঘের দিকে তাকিয়ে সুপ্রকাশ বলল, এই সেরেছে। কাল যদি বৃষ্টি নামে! বাদলরা হইচই করে উঠল, না সুপ্রকাশদা, আপনি ও রকম অপয়া কথা বলবেন না। বৃষ্টি হলে সব মার্ডার হয়ে যাবে!

বিষ্ণু বলল, আয়, একটা জিনিস ঠিক করবি? এখন থেকে কাল সারা দিন আমরা একটাও ইংরেজি কথা বলব না। যে একটা ইংরেজি শব্দ বলে ফেলবে, তার তক্ষুনি এক পয়সা করে ফাইন হবে।

সুপ্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে বললে, এই তোমরা বিষ্ণুর কাছ থেকেই প্রথমে এক পয়সা নিয়ে নাও। ও ফাইন বলেছে। ওকেই প্রথমে জরিমানা দিতে হবে!

সবাই হোহো করে হেসে উঠল। বিষ্ণু ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বলতে গেল যে এখনও খেলা শুরুই হয়নি-সে শুধু প্রস্তাব তুলেছে। কিন্তু বিষ্ণুর কথা গ্রাহ্য করা হল না। তাকে পয়সা দিতেই হবে।

সুপ্রকাশ বলল, দেখো, কাল অনেক পয়সা পাওয়া যাবে। পয়সাগুলো একজন কেউ জমা রাখুক-তোমরা ভাস্করকে ক্যাশিয়ার করে দাও।

ভাস্কর হাত বাড়িয়ে বলল, সুপ্রকাশদা আপনিও দিন এক পয়সা। আপনি ক্যাশিয়ার বলেছেন।

সুপ্রকাশ থতমত খেয়ে বলল, আরে ওটা তো বাংলাই। ক্যাশিয়ার কথাটার আবার বাংলা আছে নাকি?

পঙ্কজ বলল, তা হলে, ইংরেজরা আসবার আগে আমাদের দেশে কি টাকাপয়সা ছিল না? কিংবা কারওর কাছে জমা রাখা হত না।

ভাস্কর বলল, একটু বাদে ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর ইংরেজি ছাড়া আমরা একটাও সেন-থুড়ি, বাক্য বলতে পারি না? আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

তুমি বলো, ক্যাশিয়ারের বাংলা কী? তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারে?

অন্য কেউ উত্তর দেবার আগেই ভাস্কর বলল, আপনি রামপ্রসাদের গানটাও শোনেননি?

ভাস্কর দু হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে গান জুড়ে দিল, 'আমায় দে মা তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী—'

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। আনন্দ করার জন্য সমস্ত মন প্রাণ উদগ্রীব, যে-কোনও একটা উপকরণ পেলেই হল।

ঠিক বারোটার সময় মুহুর্মুহু শোনা গেল কামান গর্জন। সমস্ত ট্রেন হুইস দিয়ে উঠল। সেই শব্দও ছাপিয়ে গেল শঙ্খধ্বনিতে। পাড়ার প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই শাঁখ বাজছে। অনেক বাড়িতে উলু দিয়ে উঠেছে মেয়েরা।

ওরা দুদ্দাড় করে নেমে এল ছাদ থেকে। বিষ্ণুদের ঘরে বিশাল রেডিয়োটি খুব জোরে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটু ধরা ধরা গলায় জওহরলাল নেহরু বলে চলেছেন, সারা পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন একটি পরাধীন জাতি স্বাধীনতা পেয়ে জেগে উঠল...

ইংরেজি মতে শুরু হয়ে গেছে নতুন দিন, এসে গেছে স্বাধীনতা। সেই মুহূর্তে সারা দেশের অনেকেই জেগে আছে, এমনকী হাসপাতালের রুগিরাও ঘুমোয়নি। অন্ধকার নদীতে মাছধরা জেলে ডিঙিগুলো থেকে ভেসে আসছে 'জয় হিন্দ'। সেই মুহূর্তে অনেকে অনেক রকম মানত ও শপথ নিয়ে ফেলেছিল, অনেক ক্লান্ত অকৃতদার দেশকর্মী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিয়ে করার। আচার্য কৃপালনী সত্যিই বিয়ে করেছিলেন সেই রাত্রে।

বাড়ি ফেরার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাদল রেণুকে বলেছিল, এখন আমার সঙ্গে একটা প্রতিজ্ঞা করবি!

রেণু শুধু চোখ তুলে চেয়ে রইল।

বাদল আবেগপ্লুত গলায় বলল, আমি তোকে যখন যা বলব তুই শুনবি। তুইও আমাকে যা বলবি আমি শুনব।

রেণু বলল, যদি কিছু অন্যায় কথা হয়?

বাদল জোর দিয়ে বলল, তা হলেও অন্যায় হোক আর নাই হোক।

রেণু চুপ করে রইল। বাদল আবার বলল, আমি কি কখনও তোকে কোনও অন্যায় কথা বলতে পারি? কিংবা তুই-

রেণু তখনও কোনও উত্তর দিচ্ছে না। দরজার কাছ থেকে ভাস্কররা বাদলকে ডাকল, আর সময় নেই। অভিমান নিয়ে বাদল শেষবারের মতন জিজ্ঞেস করল, তুই তা হলে প্রতিজ্ঞা করবি না?

রেণু বলল, আচ্ছা করলাম। কিন্তু তোর মনে থাকবে তো?

দেখিস!

বাদল তরতর করে নীচে নেমে এসে বলল, কাল কিন্তু খুব ভোরে ডাকতে আসব-রাত্তিরে কতটুকুই বা ঘুম হল। ভোরের আলো ফোঁটার আগেই বাদল আবার বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। পঙ্কজের বাবা একটা লরি দিয়েছেন, সেই লরি নিয়ে ঘুরে ঘুরে তোলা হল সকলকে। আজ এই শুক্রবার সকালে কলকাতা শহরটা একেবারে নতুন। এ রকম কলকাতা ওরা কখনও দেখেনি।

যেদিকে তাকাও শুধু তিন রঙের পতাকা। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে, প্রত্যেক মানুষের পোশাকে, সব লাইট পোস্টে, সব গাড়িতে। রাস্তায় রাস্তায় পতাকা কিংবা ব্যাজ বিক্রি হচ্ছে-সেগুলো কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সমস্ত শহর আজ রঙে ঝলমল। মোড়ে মোড়ে বিরাট বিরাট তোরণ-তার ওপর জাতীয় নেতাদের ছবি। অসংখ্য প্রভাতফেরির দল বেরিয়েছে-এক দল আর এক দলের মুখোমুখি এলেই গান থামিয়ে ধ্বনি দিয়ে ওঠে, জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম্! ভারত মাতা কি জয়!

আজ আর কলকাতায় কোনও নিষিদ্ধ এলাকা নেই। প্রায় এক বছর বাদে বাদলরা রাজাবাজার, কলাবাগান, কলুটোলা, মির্জাপুরে ঢুকল-সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা একটুও কম নয়। সেখানেও বাড়িতে বাড়িতে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা, মুসলমানরাও সমান ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় মানুষে মানুষে কোলাকুলি, এক একটা লরি দেখে অন্যরা হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে একটু করস্পর্শ করার জন্য অনেকেই লরি থেকে লাফিয়ে নেমে অচেনা কোনও মানুষকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফাচ্ছে। আজ একবারও মনে হয় না-গত কয়েকটা মাস ধরে এই কলকাতায় কী নারকীয় কাণ্ড চলেছে। হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব মিলনের দৃশ্যই সকলকে আরও বেশি আনন্দে মাতোয়ারা করে দেয়। পরস্পর পরস্পরের জামায় পতাকা আটকে দিচ্ছে, বিনিময়ে পরস্পরকে দিচ্ছে গ্লানিহীন হাস্য।

বাদলরা সকাল থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘুরল লরিতে। তারপর ফিরে এল ভাস্করদের বাড়ি। ভাস্করদের বাড়ি থেকে সেদিন পাড়ার গরিব-দুঃখীদের খাওয়ানো হচ্ছে। কাছাকাছি

দুটো বস্তির সকলের নেমন্তন্ন। সামনের রাস্তায় লম্বা লাইন করে পাতা পড়েছে। তাদের পরিবেশন শেষ করে নিজেদের খেতে খেতে বাদলদের দুটো-আড়াইটে বেজে গেল।

খেয়ে উঠেই কিন্তু ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। এক মুহূর্ত বাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। আজ ট্রাম বাসে টিকিট নেই। ওরা চলল সাহেবপাড়া আর গভর্নরস হাউসের দিকে।

সূর্য দীপ্তিকে নিয়ে হোয়াইটওয়ে লেড ল'র সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দীপ্তি মাঝে মাঝে হাতঘড়ি দেখছেন।

সূর্য আজ পরেছে সাদা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। দীপ্তিও পরেছেন সরু লাল পাড় খদ্দরের শাড়ি। জায়গাটায় এত অসম্ভব ভিড় যে এক জায়গায় সুস্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব-জনতার স্রোত প্রায় ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। সূর্য দীপ্তির একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে।

একটু বাদেই ক্ষিতীশদা এসে হাজির হলেন একঠোঙা বাদাম হাতে নিয়ে। হাসতে হাসতে বললেন, দেখ, এইটুকু বাদাম চার আনা। ঝোঁকের মাথায় আজ একটা সিকি খরচ করে ফেললাম!

ওদের দু'জনের হাতে কিছু কিছু বাদাম তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ আসেনি?

পেছন থেকে দু'জন বলল, এই তো আমরা এসেছি।

রণেন আর সুশোভন। রণেন মাত্র কয়েক দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, এখনও জেলের দাড়ি কামায়নি। তার সেই হাসিখুশি মেসোমশাই-মার্কা চেহারা এখন আর চেনাই যায় না। সুশোভন অনেক দিন পলাতক ছিল যুক্তপ্রদেশে। সে বলল, আমি কাল শান্তিদি আর ক্ষেমেনদাকে খবর দিয়ে এসেছি।

ক্ষিতীশদা বললেন, আমার সঙ্গে শঙ্করের দেখা হয়েছিল বুঝলে, কিন্তু তাকে খবর দেব কি না ঠিক করতে পারলাম না। সে তো আমাদের দল ছেড়ে দিয়েছিল।

রণেন বলল, তাকে না ডেকে ভালোই করেছেন।

দীপ্তি বললেন, শঙ্করবাবু কিন্তু দাঙ্গার সময় রিলিফের কাজ করেছেন খুব।

সূর্য বলল, আমরা ডাকলেও উনি আসতেন না। আমাদের পছন্দ করেন না এখন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই এগারো জন এসে সমবেত হল সেখানে। ক্ষিতীশদা বললেন, আর তো কেউ নেই। এবার চল।

সূর্য ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কাছেই রিপন স্ট্রিটে তারিখ সাহেবের বাড়ি। দাঙ্গার সময় সূর্য এবাড়িতে কিছু দিন আশ্রয় নিয়েছিল।

তারিখ সাহেবের বাড়ির তিনতলায় মস্ত একটি ঘর। টেবিল চেয়ার নেই, মেঝেতে ফরাস পাতা। মাঝখানে একটি নিরাবরণ জলচৌকি।

কোনও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নেই। অনুষ্ঠান আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তারিখ সাহেব বললেন, আমি মোমবাতি এনে রেখেছি। কটা জ্বালাতে হবে বলুন?

ক্ষিতীশদা দীপ্তিকে বললেন, কটা জ্বালবে?

দীপ্তি বললেন, আপনিই ঠিক করুন। আমাদের মধ্যে-যারা যারা-

রণেন বলল, শুধু আমাদের কেন, সারা ভারতে যারা প্রাণ দিয়েছে। এক কাজ করুন, সকলের জন্য তো আলাদা ভাবে কিছু করা যাবে না। নব্বই বছর ধরে স্বাধীনতার লড়াই। চলেছে, সেই হিসেবে নব্বইটা-

তারিখ সাহেব বললেন, আমার কাছে অনেক আছে।

এই প্রস্তাবটা সকলের পছন্দ হল। দীপ্তি এক এক করে মোমবাতি জ্বেলে বসাতে লাগলেন জলচৌকির ওপর। জানলা দিয়ে ফাঁকা হাওয়া এসে মাঝে মাঝে দু-একটা। নিবিয়ে দিচ্ছে। দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দেওয়া হল–অন্ধকার ঘরে জ্বলে উঠতে লাগল একটার পর একটা বাতি। নব্বইটা মোমের আলোয় ওদের মুখগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

দীপ্তি তার হাতব্যাগ থেকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা বইটি বার করে বললেন, এই বইটা ব্রজদার–আমার কাছে ছিল। ক্ষিতীশদা পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে। বললেন, এটা ছিল অশোকের। এই রকম ভাবে কয়েকটি রুমাল, কিছু চিঠি, একটা চিরুনি, তিনটি ছোরা বেরোল অন্যদের পকেট থেকে। এগুলো যাদের জিনিস, তারা আজ আর কেউ বেঁচে নেই।

রণেন আপন মনে বলতে লাগল, চাফেকার, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী; ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, ধিংড়া, কানহেরে–

সুশোভন বলল, কত আর নাম বলবি। সারা ভারতে এ রকম তো হাজার হাজার বরং সকলের জন্য একসঙ্গে দু'মিনিট–

তারিখ সাহেব বললেন, কিছু ফুল আনলে হত। আনব?

সূর্য বলল, না ফুল দরকার নেই।

ওরা সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মোমবাতিগুলোর দিকে। এলোমেলো ভাবে সাজানো হলেও মোমবাতির আলোয় একটা আল্পনার রূপ এসেছে। দপ দপ করে কাঁপছে শিখাগুলো। ফোঁটা ফোঁটা মোম গলে পড়ছে অশ্রুবিন্দুর মতন। একটা ঘড়ির শব্দ হচ্ছে টিক টিক টিক। দু' মিনিট সময়কেই কত দীর্ঘ মনে হয়। যেন এই দু'মিনিটেই স্মৃতির রাজ্যে পেরিয়ে গেল নব্বই বছর।

ক্ষিতীশদা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সময় হয়ে গেছে। এবার ওঠা যাক। দীপ্তি রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছলেন।

ক্ষিতীশদা তারিখ সাহেবকে বললেন, সিরাজুল, সবার পক্ষ থেকে তুমি কিছু বলো।

তারিখ সাহেব বললেন, আপনি দাদা সবার মধ্যে এখন বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আপনি থাকতে আমি কী বলব, আপনিই বলুন।

ক্ষেমেনদা বললেন, হ্যাঁ, ক্ষিতীশদাই কিছু বলুন।

ক্ষিতীশদা মুখ নিচু করে বললেন, বিশেষ কিছু বলার নেই। আজ এই জাতির ইতিহাসে একটা পরম ক্ষণ। আজ আর প্রশ্ন কিংবা সমালোচনা করার দিন নয়। আজ আনন্দেরই দিন। তবু আমাদের যেসব সহকর্মী এবং বন্ধু এই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন–আমরা আজকের দিনে তাঁদের স্মরণ না করে পারি না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই, তাঁদের প্রাণ দান ব্যর্থ হয়নি। ১৯২০ সালে অনুশীলন পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে হরদা এই দল গড়েছিলেন। সমুদ্রবন্ধনের সময় কাঠবেড়ালি যতটুকু সাহায্য করেছিল, হয়তো আমরাও ততটুকু সাহায্য করতে পেরেছি স্বাধীনতাকে নিয়ে আসার জন্য। আজ আর পুরনোদের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই। দলের অস্তিত্বও কিছু নেই বলতে গেলে। তবু যেহেতু আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়েছিল, সেই জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবেই এটা ভেঙে দেওয়া উচিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের জন্য আমাদের কোনও প্রোগ্রাম ছিল না। তা ছাড়া, ক্ষমতাশীল সরকার আমাদের কী চোখে দেখবে, তাও আমরা জানি না। সুতরাং দলের কাছে আমাদের যার যা শপথ ছিল–তার দায়িত্ব থেকে সকলকেই নিষ্কৃতি দেওয়া হল। এখন যে-কেউ ইচ্ছে করলে অন্য যে-কোনও দলে যোগ দিতে পারে। এ-সম্পর্কে কারও কোনও আপত্তি আছে?

কেউ কোনও কথা বলল না। নৈঃশব্দেই সম্মতি বোঝা গেল। ক্ষিতীশদা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। হাওয়া এসে নিবিয়ে দিতে লাগল মোমবাতিগুলো।

একটু পরেই ওরা বেরিয়ে পড়ল তারিখ সাহেবের বাড়ি থেকে। সবাই খুব কাছাকাছি হাঁটতে লাগল। রাস্তার প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে বোঝাই যায় না, ওদের একটা ছোটখাটো মিছিল চলছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে এল গঙ্গার ধারে। এখানেও ভিড় কম নয়। হাওড়া থেকে বহু লোক নৌকোয় বা স্টিমারে আসছে কলকাতার আলোকসজ্জা দেখতে।

ওদের মৃত সহকর্মীদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার থেকে ক্ষণিকা বইটা তুলে নিয়ে দীপ্তি বললেন, এটা আমার কাছেই রেখে দিতে চাই।

কেউ কোনও আপত্তি জানাল না।

বাকি জিনিসপত্র ভরা থলেটা নিয়ে সূর্য জলের ধারে এসে জোরে ছুঁড়ে দিল। জলে পড়তে না পড়তেই ঢেউয়ের ঝাঁপটায় মিলিয়ে গেল।

সূর্য যখন পারে উঠে এল, তখন পর পর কয়েকখানা লরিতে অনেক লোক বন্দে মাতরম ধ্বনি দিচ্ছে। সূর্য হঠাৎ তাদের দিকে ফিরে ভরাট গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বন্দে মাতরম্!

এই শেষ বার। এরপর সূর্য আর কখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনও ধ্বনি দেয়নি।

.

বাদল ভাস্কর, বিষ্ণু আর পঙ্কজ ঘুরতে লাগল সাহেব পাড়ায়। সন্ধ্যার দিকে এত মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছে যে, শহরে আর গাড়িঘোড়া চলার উপায় নেই। এত লোক বোধহয় একসঙ্গে কখনও ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেনি। মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়ানোই যেন স্বাধীনতার প্রতীক। গোলমালের আশঙ্কায় বহু সংখ্যক পুলিশের গাড়ি ছাড়া হয়েছিল– কিন্তু সারা দিনে একটা পকেটমারির ঘটনা পর্যন্ত ঘটেনি। শুধু উল্লাস আর উত্তেজনা। মুসলমান পাড়ায় আতর ছেটানো হচ্ছে সবার গায়ে। কোথাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোলাপ ফুলের পাপড়ি।

রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস ও ক্লাইভ স্ট্রিটের মোড়ে বিরাট এক তোরণের গায়ে বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিচ্ছবি। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের বাড়িতে ভারতের একটি বিরাট মানচিত্র। এইসব বাড়ি থেকে একসময় কত রকম ভারত-বিরোধী রাজনীতি চালানো হয়েছে। লোকেরা সাহেবদেরও ধরে ধরে বুকে পতাকা আঁকা ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে, তারাও আপত্তি করছে না।

সন্ধ্যার পর আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। তারপরই নানা রকম বাজির খেলা দেখা গেল আকাশে।

অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল বাদল আর তার বন্ধুরা। সারা দিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাদলের গলা ভেঙে গেল।

এর কয়েক মাস পরেই অবশ্য বাদলরা রাস্তায় আবার ছাত্র মিছিল বার করে ধ্বনি দিয়েছে, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাত্, ভুলো মাত্।

.

কলেজে আমাদের ক্লাস থেকে দশ জনকে পাঠানো হয়েছে আর ডব্লুএ সি-তে। আমিও সেই দলে ছিলাম। আমরা প্রত্যেক দিন যেতাম শিয়ালদা স্টেশনে। বিরাট বিরাট ড্রামে দুধ গুলে বিতরণ করা ছিল আমাদের কাজ। প্ল্যাটফর্মগুলোতে মানুষ থিকথিক করছে। নোংরা মানুষের শরীরের গন্ধ ও ব্লিচিং পাউডারের কড়া গন্ধ মিলে মিশে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

প্রত্যেক দিন দলে দলে ওরা আসছে। কোথাও আর তিলধারণের জায়গা নেই। প্ল্যাটফর্ম থেকে উপচে পড়ছে রাস্তায়। কলকাতা শহরের ছিমছাম চেহারাটা চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে গেল।

খাটতে খাটতে আমাদের দম বেরিয়ে যায়। দয়া, মায়া ইত্যাদি অনুভূতির আর জায়গা থাকে না। বহু দূরের সব গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-শিশুর দল কলকাতার মতন অজানা অচেনা পুরীতে এসে তাদের চোখের বিহ্বলতা এখনও কাটেনি।

অনেকে এসেছে মৃত্যুর খুব কাছ ঘেঁষে। এখানকার নিয়মকানুন ওরা জানে না।

কিছুতেই লাইনে দাঁড় করানো যায় না ওদের। সবাই একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে আসে। আমরা ওদের বকুনি দিই, ঠেলে দিই, এমনকী অনেক সময় মেজাজ হারিয়ে মারতেও উঠি।

পঙ্কজ এক এক সময় বলে ওঠে, এই বাঙালগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।

আমি মুখ লুকোই। জন্মসূত্রে আমিও যে বাঙাল সে-কথাটা এখন প্রকাশ করতে লজ্জা পাই। অনেক দিন আমাকে কেউ বাঙাল বলেনি। আমার কথায় আর টান নেই, অচেনা লোক কিছুই বুঝতে পারবে না।

পঙ্কজ কিন্তু জানে। সে আমাকে একসময় জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়ির কী হয়েছে রে?

আমি সংক্ষপে উত্তর দিই, কী জানি!

তোদের আত্মীয়স্বজন কেউ আসেনি?

না।

ও, তোরা তো বোধহয় জমিদার ছিলি, তাই না? যত বাঙাল আসছে, সবাই নাকি ওখানে জমিদার ছিল?

পঙ্কজ জানে না, দু-চার বছরের মধ্যেই এদিকে এত বেশি বাঙাল এসে পড়বে যে তখন আর বাঙালকে প্রকাশ্যে বাঙাল বলে মনের সুখও করা যাবে না।

রেডক্রসের কাছে যুদ্ধের উদ্বৃত্ত বহু টুথপেস্টের টিউব ছিল, একদিন দু'হাজার সেই টিউব আমাদের কাছে এল বিলি করার জন্য।

আমাদের ইনচার্জ ফণীদা বললেন, দেখো কাণ্ড! যারা কোনও দিন টুথব্রাস চোখেই দেখেনি, তাদের এগুলো দিয়ে কী হবে বলদিনি? নে, এগুলো তোরা যে ক'টা পারিস নিয়ে যা।

বলা মাত্রই আমরা মুঠোয় করে তুলে পকেটে ভরলুম। প্যান্টের দু পকেট ফুলে গেল। যে-কোনও জিনিসই বিনা মূল্যে পেলে বেশ একটু আনন্দ হয়। এগুলো নেওয়ার জন্য আমাদের কোনও অপরাধ বোধ হয় না–এত লোকের মধ্যে সামান্য দু' হাজার টুথপেস্ট টিউব বিলি করা সত্যিই অর্থহীন। বরং আমাদের কাজে লাগবে।

রাস্তায় বেরিয়ে পঙ্কজ পকেট থেকে একটা টিউব বার করে দেখে। খাঁটি বিলিতি জিনিস দেখে তার একটু আনন্দ করার কথা, তবু বিনা পয়সায় পেয়েছে বলেই অবহেলার সঙ্গে ছিপি খুলে একটু টিপে দেখতে চায়। ফুস করে শব্দ হয়, তারপর কালচে কালচে ময়লা রঙের কিছু বেরোতে থাকে।

পঙ্কজ বলল, দূর শালা! যত সব রদ্দি মাল বলেই ওইসব হাড়হাভাতেদের মধ্যে চালিয়ে দেবার চেষ্টা!

পঙ্কজ চিনেম্যানদের কায়দায় চার-পাঁচটা টিউব একসঙ্গে লোফালুফি করার চেষ্টা করে–আমি পকেট থেকে সবক'টা বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিই ট্রাম লাইনে। তার ওপর দিয়ে ট্রাম চলে গেলে সেই দৃশ্য দেখে মজা লাগে।

গান্ধীজি গুলি খেয়ে মারা গেছেন। কাশ্মীরে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম বারের যুদ্ধ হয়ে গেছে। জিনিসপত্তরের সাংঘাতিক দাম। যুদ্ধ-ঘাটাই হাজার হাজার বেকার, তার ওপরে এই রিফিউজি। সে-বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে মাইক বাজিয়ে উত্তর বলে

দেওয়া হয়েছিল এবং চেয়ার টেবিল পর্যন্ত পাস করে গিয়েছিল। খাদ্যদ্রব্য তো দুষ্প্রাপ্য বটেই, জামাকাপড়ও সহজে কিনতে পাওয়া যায় না। কন্ট্রোলে শাড়ি-ধুতি দেয়, গামছার মতন আকৃতি।

তবু এরই মধ্যে ফুটবল মাঠে ভিড় হয়, রাত্তিরবেলা আলো জ্বেলে টেনিস খেলা জমে। রাস্তা দিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে বরযাত্রীসহ বর বিয়ে করতে যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বাদ পড়ে না। সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মেয়ে কেনার জন্য কারা নাকি আড়কাঠি পাঠায়-তা নিয়ে আবার খবরের কাগজে লেখা হয় গরম গরম সম্পাদকীয়।

সকালবেলা আমরা এই দুঃসহ দৃশ্য এবং নির্যাতিত মানবতার মধ্যে কাটিয়ে এসেও সারা দিন সেই চিন্তা মাথায় ধরে রাখি না। প্রকৃতির কোনও এক অদ্ভুত নিয়মে আমাদের চেতনার মধ্যে সব সময় অসামঞ্জস্য থেকে যায়। আমরা বন্ধুরা এখনও হাস্য-পরিহাস করি এবং প্রণয়লিপ্সায় অনেকটা সময় কেটে যায়।

প্রথম প্রথম আমি শিয়ালদা স্টেশনের দৃশ্য দেখে খুব অবসন্ন বোধ করতাম। এক এক সময় মনে হত, যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। চতুর্দিকে কিলবিল করছে মানুষ, এরই মধ্যে তারা মরছে, অসুখে কুঁকছে, খিদের জ্বালায় ছটফট করছে। তবুও প্রতিদিন গেছি, ইচ্ছে করলেই না যেতেও পারতাম যদিও। দিনের পর দিন দেখতে দেখতে মনের মধ্যে একটা আস্তরণ পড়ে যায়। তখন দুধ বিলি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে-বিশ্রাম নেবার জন্য সিগারেট ধরাই। ক্ষুধার্ত লোকগুলো সেই সময়ে চাচামেচি করলে ধমক দিই। হঠাৎ কোনও স্বাস্থ্যবতী যুবতাঁকে দেখলে দু'-এক পলক বেশি তাকাই। আমাদের ইনচার্জ ফণীদা ভিড় সামলাবার জন্য এক এক সময় বড়ই কর্কশ ভাষায় বকাবকি করেন। অথচ, সবাই জানে, ব্যক্তিগত জীবনে ফণীদা খুব দয়ালু মানুষ।

পঙ্কজ আর আমি শিয়ালদা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করি কলেজের দিকে। সেদিন আকাশ বেশ মেঘলা।

পঙ্কজ বলল, আজ আর কলেজে যেতে ইচ্ছে করছে না। চল, আজ কাট মারি!

আমার কোনও আপত্তি নেই। বললাম, চল, বিষ্ণুকে ডেকে নিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারি।

পঙ্কজ চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে বলল, তোর খুব ঘন ঘন বিষ্ণুদের বাড়িতে যাওয়ার শখ কেন রে?

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

পঙ্কজ বলল, তার চেয়ে চল একটা সিনেমা দেখি!

তখন ইংরেজি বই মানেই যুদ্ধের ছবি। অধিকাংশ ছবিতেই আমেরিকান-জাপানি বন্ধুত্বের গল্প, শেষ দৃশ্যে রাইফেলের ডগায় প্রজাপতি। বললাম, নাঃ, সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করছে না।

তা হলে চল নানকিংয়ে গিয়ে ডাক রোস্ট খাই!

না, থাক।

পঙ্কজ অবাক হয়ে বলল, কেন?

কয়েক দিন আগেই ওখানে ডাক রোস্ট খেয়ে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পঙ্কজ প্রত্যেক দিন দাম দেয়, আমি পয়সা দিতে পারি না। এ রকম ভাবে চলে না।

পঙ্কজ আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল, আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। শেষ পর্যন্ত পঙ্কজ রাগ করে চলে গেল।

আমি রেণুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ওদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা দূর গিয়ে আর সেখানেও যেতে ইচ্ছে করল না। খুব মনখারাপ লাগছে হঠাৎ।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর ফলে তার কারবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বাবা আবার বেকার। এই বয়সে তার পক্ষে নতুন কোনও চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। বড়বাবুর বাড়িতে আমরা তখন পুরোপুরি আশ্রিত হয়ে গেছি, কিন্তু তার কাছে তো টাকাপয়সা চাওয়া যায় না! আমার হাতে একটাও পয়সা থাকে না। হাতখরচ জোগাড় করার জন্য আমি একটা টিউশানি নিলাম।

দুটি ছেলেকে পড়াতে যেতে হয় মদনমোহনতলায়। পুরনো আমলের বাড়ি, কলকাতার এরা আদি বাসিন্দা হলেও এই পরিবারটির মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার তেমন চল। নেই। ছাত্রদের বাবার সঙ্গে একবারই মাত্র দেখা হয়েছে, তিনি রিকশাকে বলেন, রিস্কা, বাক্সকে বলেন বাস্ক, ক্লাসকে বলেন কেলাস। আমি বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়ালেই। ছাত্রদের এক বর্ষিয়সী আত্মীয়া চেঁচিয়ে বলেন, ওরে তপু-নেপু, তোদের ম্যাস্টার এয়েছে!

মাইনে পাই পনেরো টাকা।

প্রথম কিছু দিন এক কাপ চা একখানা করে থিন এরারুট বিস্কুট দেওয়া হয়েছিল। সপ্তাহ দুয়েক পরে হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তার পরেও বেশ কিছু দিন আমি আশায় আশায় থাকতাম। সন্ধ্যা হলেই বড় খিদে পায়। কলেজ থেকে আর বাড়ি না ফিরেই পড়াতে আসি বলে আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। চা খেলে খিদেটা মরে।

একদিন ছাত্রের এক কাকা এসে বলল, মাস্টারমশাই, আপনি আর এক জায়গায় পড়াবেন? আমার এক বন্ধু বলছিল–একটি বেশ ভদ্দরলোকের ছেলে চায়–

আমি রাজি হয়ে গেলাম। তখন আমার বই কেনার দারুণ নেশা–অথচ পয়সায় কুলোয় না। দু'জায়গায় টিউশানি করলে আমার রোজগারটা ভদ্রগোছের হতে পারে।

এই বাড়িটা আহিরীটোলায় এবং পরিবারটি একটু আলোকপ্রাপ্ত। বাড়িটাও দেখতে সুন্দর, পড়বার ঘরটা দোতলায়, একটি মাত্র ছাত্র, বয়স এগারো বছর, ছাত্রের মা প্রথম দিন আমাকে শোনপাপড়ি আর শরবত খেতে দিলেন। মাইনে এখানে কুড়ি টাকা।

কয়েক দিন বাদেই বুঝলাম, দুটি টিউশানি করলে আমার নিজের পড়াশুনোর সময় পাব না-তাই প্রথম টিউশানিটা ছেড়ে দিলাম।

এই বাড়ির পরিবেশটি অত্যন্ত ঘরোয়া ধরনের। ছাত্রের দাদা আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করতে আসে। ছাত্রের মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু একটা মুশকিল, ছাত্রের বাবা এক এক দিন এ-ঘরে বসে হঠাৎ এমন বাঙালদের নিন্দে করতে শুরু করেন যে আমি কাচুমাচু হয়ে যাই। ওঁর অফিসে একটি বাঙাল কর্মচারী রেখেছিলেন, কিন্তু সে-লোকটা এমন গোঁয়ার আর নিমকহারাম সামান্য কথা কাটাকাটিতে একদিন মালিককেই মারতে এসেছিল। এ-জাতকে কখনও বিশ্বাস করতে আছে। এত বেশি রেফিউজি আসতে শুরু করায় কলকাতার মানুষ নতুন করে বাঙালদের ওপরে বিরক্ত।

আমি নিঃসাড় হয়ে বসে থাকি। আমিও যে বাঙাল সেকথা উনি জানেন না। এবং বাঙালের বাঙালত্ব, কয়লার রঙেরই মতন, কখনও ঘোচে না। হঠাৎ একদিন জেনে ফেললে উনি নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পাবেন, আমার সামনেই এইসব কথা বলেছেন বলে। কিংবা রেগেও উঠতে পারেন, যদি ভাবেন আমি আত্মগোপন করে ওঁকে ঠকিয়েছি। কিন্তু আত্মগোপন করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রথম দিন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি, আমিও কিছু বলিনি। লোককে কি ডেকে ডেকে বলতে হবে যে আমি বাঙাল, আমি বাঙাল!

ওই বাড়িটির সূত্রেই আমি আর এক জায়গায় টিউশানি পেয়ে গেলাম। প্রাইভেট টিউশানির জগতে এ রকম একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাপার আছে।

এই বাড়িটি নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে, আমার বাড়ির কাছে হয় বলে, আমার পক্ষে সুবিধাজনক। আগেরটা ছেড়ে আমি এইটাই নিলাম। মাইনেও অনেক বেশি, তিরিশ টাকা। আমার প্রায় বড়লোক হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

কিন্তু এ-বাড়িতেও ঝাট আছে। গৃহকর্তা খুব লম্বা-চওড়া চেহারার বিশাল পুরুষ, নাকের তলায় শেয়ালের ল্যাজের মতন পুরুষ্ট গোঁফ। গলার আওয়াজ জলদ গম্ভীর।

তিনি প্রথম দিন আমার রীতিমতন একটা ইন্টারভিউ নিলেন। ইস্কুলে কোন পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছি, ম্যাট্রিকে কোন ডিভিশান, আমার বাবার লেখাপড়া কদুর ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে শুরু করে-ভবিষ্যতে আমি কী হতে চাই, তা পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে পছন্দ করলেন। তারপর দিলেন তার শর্ত।

তিনি বললেন, তিনি এককথার মানুষ, মাসের ঠিক এক তারিখে মাইনে দেবেন। গ্রীষ্ম এবং পুজোর সময় সাত দিন করে ছুটি। কিন্তু মাঝখানে কোনও দিনই হঠাৎ ছুটি নেওয়া যাবে না। এবং প্রতিদিন ঠিক তিন ঘণ্টা পড়াতে হবে। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে ন'টা! এর এদিক-ওদিক হওয়া চলবে না।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। একটি আট বছরের ছেলে, একটি তেরো বছরের মেয়েকে পড়াতে হবে একসঙ্গে। দু'-একদিন পড়িয়েই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি কোনও দিনই পাশ করবে না, আর ছেলেটি এতই বুদ্ধিমান যে ঠিকমতন পড়াশুনো করলে ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করবে। ছেলেটির নাম সুবোধ, মেয়েটির নাম ছন্দা।

এই দু'জনকে একসঙ্গে পড়ানো খুবই অসুবিধাজনক। কিন্তু একজনকে পড়িয়ে ছুটি দিয়ে আর একজনকে পড়ানোও চলবে না। অভিভাবকের হুকুম, দু'জনকেই সাড়ে তিন ঘণ্টা পড়াতে হবে। পড়ানো কিংবা আটকে রাখা।

ছেলেটি দারুণ ছটফটে। তবু ওকে আমার খুব ভালো লাগে। অঙ্ক দিলে চোখের নিমেষে করে ফেলে। ডিকটেশন দিলে বানান ভুল করে না। কিন্তু আমি একটু অন্যমনস্ক হলেই সে ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চায়। আর মেয়েটি পড়াশুনো না করে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ছেলেটিকে আটকে রাখার জন্য আমি একটা করে গল্পের বই নিয়ে যাই। সে তাতে বেশ আটকে থাকে। আর মেয়েটিকে আমি বলি, পড়ার বই থেকে পাতার পর পাতা টুকতে। তার তো এমনিতেই কিছু হবে না হাতের লেখাটা অন্তত ভালো করুক।

প্রথম টিউশানিটা নিয়ে আমি বন্ধুবান্ধব বা বাড়ির কারোকে কিছুই বলিনি। বাড়িতে বলিনি, কারণ টাকাটা আমি সম্পূর্ণ নিজে খরচ করতে চাই। মায়ের কাছ থেকে যে দু'একটা টাকা হাতখরচ মাঝে মাঝে পাই, সেটাও যাতে বন্ধ না হয়। আড্ডা দিয়ে সাড়ে ন'টা-দশটার সময়ই বাড়ি ফিরি তখন-কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

বন্ধুদের বলিনি লজ্জায়। কারণ, বন্ধুরা আর কেউ তো টিউশানি করে না। নিয়মিত আড্ডায় যাই না কিংবা আড্ডা থেকে হঠাৎ উঠে যাই দেখে ওরা অবাক হয়ে অনেক প্রশ্ন করে। আমি মিথ্যে কথার ফুলঝুরি ছড়াই।

শুধু রেণুর কাছেই একদিন কথায় কথায় বলে ফেললাম। ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে এত সব গল্প মনের মধ্যে টগবগ করে যে কারোকে না বলে কত দিন আর থাকব।

রেণু বলল, তুই প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলা ওখানে যাস?

হ্যাঁ।

আর যেতে হবে না–

কেন?

আমি বলছি।

রেণু গম্ভীর ভাবে হুকুমের সুরে এই কথা বলে। আমিও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিই, এটা মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রেণু বলল, তুই কিন্তু আমার একটা কথাও মানিস না। অথচ কী যেন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলি?

আমি বললাম, সেটা এইসব সাধারণ ব্যাপারে নয়। সেটা জীবনের অনেক গভীর ব্যাপার সম্পর্কে।

এইসব কারণেই আজকাল তোর কবিতা লেখা হচ্ছে না!

লিখব লিখব, অনেক লিখব।

রেণু রাগ করে কয়েক দিন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়।

এর মধ্যেই আমি টিউশানিতে ফাঁকি দিতে শুরু করেছি। ছাত্রছাত্রীকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখে আমি অনেক সময় নিজের কাজ করি।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবই বার করে আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করি। কবিতা মাথায় আসে না। রেণুকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে শুধু। একটা লাইনই বার বার লিখে যাই, রেণু, আমাদের কখনও ভুল বোঝাবুঝি হবে না।

এ-বাড়িটি কিন্তু বেশ রহস্যময়। প্রায়ই ওপরে দুপদাপ আওয়াজ শুনতে পাই। এক এক সময় মনে হয় কে যেন কাকে চাবুক দিয়ে খুব মারছে। একজন মহিলার গলার আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। আমি সচকিত ভাবে তাকিয়ে দেখি, আমার ছাত্রীটি মুখ নিচু করে আছে। টপ টপ করে জল পড়ছে তার চোখ দিয়ে।

তখন আমার কোনও প্রশ্নেরই সে উত্তর দেয় না।

৬০. ও-বাড়িতে আমার টিউশানি

ও-বাড়িতে আমার টিউশানি বেশি দিন টিকল না। কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমার ছাত্র-ছাত্রীর বাবা সন্ধ্যাবেলার দিকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য পাগল হয়ে যান। তখন। সারা বাড়ি জুড়ে তাণ্ডব শুরু করেন। এমনিতে ভদ্রলোককে দেখলে তো কিছু বোঝা যায় না বটেই, তা ছাড়া, তিনি কোন এক সাহেব কোম্পানিতে ক্যাশিয়ারের কাজ করেন। রীতিমতন দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং বাড়িতেও তার প্রচণ্ড দাপট। তার সেই দাপটই তাকে পাগলামির সীমায় ঠেলে দেয়। এক একটি পরিবারের কর্তা বাড়িতে যে রকম। একনায়কত্ব দেখান, পৃথিবীর বড় বড় ডিকটেটাররাও তাদের কাছে লজ্জা পাবেন। আমার ছাত্র-ছাত্রীর পিতাটিও সেই রকম।

তার সেবাযত্নের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলেই সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যায়। প্রত্যেক দিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই তিনি কোনও-না-কোনও ব্যাপারে খুঁত ধরতে শুরু করেন। তখন থেকেই তাঁর মেজাজ চড়তে থাকে। চাকরবাকররা তটস্থ। সারা বাড়িতে একটা ছোটাছুটি পড়ে যায়। চায়ের মধ্যে দুধের সর থাকলে তিনি কাপসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং গর্জন করতে থাকেন। এবং এই তর্জনগর্জনই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় পাগলামিতে। ক্রুদ্ধ দাপাদাপি, জিনিসপত্র ভাঙা চলতে চলতে একসময় চাবুক নিয়ে স্ত্রীকে প্রহার।

এই সময়টা পড়ানো অসম্ভব। আমি চুপচাপ বসে থাকি, আমার ছাত্রী কাঁদে, ছোট ছেলেটা এত বোঝে না–এই ফাঁকে সে বাইরে খেলতে চলে যায়।

প্রথম প্রথম আমার অসম্ভব রাগ হত। আমার মনে হত, এই অত্যাচারী লোকটিকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু, কোনও স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মারে–কোনও তৃতীয় ব্যক্তি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে কি না আমি জানি না। এই লোকটির পাগলামির চিকিৎসা করবারও কোনও উপায় নেই। কারণ, ইনিই বাড়ির কর্তা, ইনি নিজে তো আর পাগলামির কথা স্বীকার করবেন না–তা হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে কে?

অথচ, দিনের পর দিন এ ব্যাপার সহ্য করা যায় না। আমার মাথার ওপর চাপ পড়তে লাগল। ছাত্র-ছাত্রীর মা সাধারণত নীচে নামেন না। একদিন মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম, দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল। মুখোনি দুর্গা প্রতিমার মতন, অথচ অদ্ভুত, উদাসীন-যেন পৃথিবীর কোনও কিছুতেই তার কিছু যায় আসে না। সেই মুখখানা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই টিউশানিটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ওই বাড়িটার কথা তার পরেও অনেক দিন ভেবেছি। ছাত্র-ছাত্রীর বাবাকে কিছু একটা শাস্তি দেবার জন্য আমার হাত নিশপিশ করত। এমনকী একথাও ভাবতাম, একদিন ফাঁকা রাস্তায় লোকটিকে পেলে খুব মারব। যে-সব লোক কখনও মার খায় না-তারাই অপরকে অকারণে মারতে যায়। কিন্তু জীবনে অনেক শুভ ইচ্ছের মতন, এই ইচ্ছেটাও আমার অপূর্ণই থেকে গেল।

অন্য টিউশানি জোগাড় না করেই এটা ছেড়ে দিয়ে বেশ মুশকিলে পড়ে গেলাম। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ছাড়া খুব শক্ত। নিয়মিত কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে টিউশানির খোঁজ করি, যে-কোনও জায়গায় গিয়েই দেখি, আমার আগেই দশ-পনেরো জন সেখানে। লাইন দিয়ে আছে। আমার হাতখরচের খুব টানাটানি, এই সময় আবার জুটল বিনে মাইনের একটা পড়ানোর কাজ।

পাড়ার কয়েকটি ছেলে একদিন এসে বলল, কমরেড, আপনার ওপর একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে কিশোর বাহিনী বিক্রি করেছি। ধর্মতলা স্ট্রিটের পার্টি অফিসেও কয়েক বার গেছি, সুতরাং কোনও দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। পার্টির কয়েকটি ক্যাডার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে-তাদের জন্য নাইট কোচিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, এক এক জন এক একটা সাবজেক্ট পড়াবে। আমাকে পড়াতে হবে অঙ্ক।

ব্যবস্থা খুব সুন্দর, তখন কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনমূলক কাজে বেশ মন ছিল। পাঁচজন ছাত্র, তারা আমার চেয়েও বয়সে বড়-বেশ কিছু দিন লেখাপড়া ছেড়ে দেবার পর এখন

আবার ম্যাট্রিকটা পাশ করে নিতে চায়। এ রকম বিনীত, ভদ্র ছাত্র পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। তারা মনোযোগ দিয়ে শোনে, যা করতে বলি করে। যদিও তাদের অঙ্কে একেবারেই মাথা নেই, এক চাসে পাশ করার আশা খুবই কম, তবু তাদের পড়াতে খুবই উৎসাহ বোধ করি।

ইংরেজি পড়াবার জন্য ভালো লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। ওরা আমাকে বলল, একজন লোক খুঁজে দিতে। আমার মনে পড়ল সূর্যদার কথা। সূর্যদা যদিও কলেজের লেখাপড়া সম্পূর্ণ করেনি, কিন্তু ইংরেজি খুব ভালো জানে। সূর্যদা কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনে একটুও পাত্তা দিল না। বলল, যা যা, আমার অত সময় নেই। তা ছাড়া পার্টির কাজ করতে চায় তো ম্যাট্রিক পাশ করে কী হাতি-ঘোড়া লাভ হবে? ওদের গ্রামে যেতে বল!

সূর্যদার তো কাজের মধ্যে শুধু সারা দিন বসে বই পড়া আর সন্ধ্যা হলেই বেরিয়ে পড়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরা। সূর্যদার চেহারাটা এখন যা দারুণ সুন্দর হয়েছে না, মনে হয়, রাজপুত্রের মতন। মেয়েরা সূর্যদাকে দেখলেই নিজেদের মধ্যে কানাকানি শুরু করে। রাজনীতিতে সূর্যদার এখন আর কোনও আগ্রহই নেই–আমি কখনও কিছু বলতে গেলেও হাত নেড়ে উড়িয়ে দেয়। দীপ্তিদির প্রেমে পড়েই সূর্যদার বারোটা বেজে গেল। কোনও রকম পলিটিক্যাল ট্রেনিং ছিল না তো, শুধু কিছু ইমোশান আর অ্যাডভেঞ্চারের মোহে...

আমাদের নাইট কোচিংয়ের একটি মাত্র ছাত্র শেষ পর্যন্ত পাশ করেছিল। তাতেই আমরা দারুণ খুশি হয়েছিলাম। আদিনাথদা আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, গুড ওয়ার্ক। ভবিষ্যতে আরও কাজ করতে হবে।

স্থানীয় পার্টি সেলের প্রধান আদিনাথদা স্বভাব-গম্ভীর। তাঁর মুখ থেকে একটা প্রশংসা বাক্য পাওয়া কম কথা নয়।

ইতিমধ্যে আমি আরও দু-তিনটি টিউশানি জোগাড় করে ও ছেড়ে শেষ পর্যন্ত একটা খুব ভালো জায়গা পেয়ে গেছি। বস্তুত, প্রাইভেট টিউশানির জগৎ সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা

আছে, তা নিয়ে আমি একটা মহাভারত লিখে ফেলতে পারি। যাই হোক, তার মধ্যে এই বাড়িটির অভিজ্ঞতা অনন্য।

বাড়িটি ব্রিটিশ কা ধরনের। বিরাট বাগানের মধ্যে গম্বুজের মতন চূড়ওয়ালা তিন মহলা অট্টালিকা। বাগানে গেটের পাশে একটি লাল রঙের ঘর-সেখানে একজন লোক প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বনি করে, পাড়ার লোকের ঘড়ি দেখার দরকার হয় না। যত্নে রক্ষিত বাগানটির এখানে-সেখানে পূর্ণাবয়ব নগ্ন নারীমূর্তির সাদা পুতুল, মাঝখানে একটি বিরাট ফোয়ারা। সেই বাগানে অপ্সরার মতন রমণীরা দেবশিশুদের সঙ্গে খেলা করে বিকেলবেলা।

দারোয়ান গেট খুলে দিলে আমি নতমুখে বাগানের পাশের মোরাম-বিছানো রাস্তা দিয়ে গিয়ে দাঁড়াই একটা দরজার সামনে। বাগানে যে-দিন বাড়ির মেয়েরা থাকে, সেদিন কোনও দিকে তাকাই না যে-দিন কেউ থাকে না, সেদিন আমি সাদা পাথরের নগ্ন পুতুলগুলোকে বার বার দেখি। কে বলেছে, নগ্নতা যদি শিল্পের অংশ হয়ে যায়, তবে তা যৌন উত্তেজনা আনে না? মিথ্যে কথা! আমি তো কৈশোর থেকেই ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির বইতে কিংবা বাগানের নগ্ন পুতুলের দিকে তাকালেই উত্তেজনা বোধ করেছি। শরীরে অতিরিক্ত উত্তাপ এসেছে। অবশ্য একা একা যৌন উত্তেজনা বোধ করা কোনও অপরাধ কিনা আমি জানি না। আমার তো তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি!

সদর দরজার সামনে দাঁড়ালে একটি বৃদ্ধ চাকর এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে যায়। বিশাল বিশাল হলঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে তারপর একটি সুসজ্জিত ছোট ঘরের সামনে এসে পৌঁছেই। চাকরটি দরজা খুলে, চেয়ার টেবিল থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে, মাস্টারবাবু বসুন।

সারা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ মনে হয়। মাঝে মাঝে শুধু একটা কাকাতুয়ার গলা শোনা যায়, কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায়? পরিষ্কার উচ্চারণ।

একটু বাদে ঘোমটায় মুখ ঢাকা একজন দাসী কিছু খাবার ও জল রেখে যায়। তারপর চা। খালি পেয়ালা পিরিচ তুলে নিয়ে যাবার পর আমার ছাত্রটি আসে। ফুটফুটে গায়ের রং-দশ বছর বয়স, সে এসেই বলে, মাস'সাই, কাল অর্জুনের সঙ্গে মহাদেবের যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর?

প্রথমে কিছুক্ষণ গল্প না বললে ছেলেটির পড়াশুনোয় মন বসে না। ওইটুকু ছেলের নাম রূপেন্দ্রনায়ণ মিত্র, আমি রূপ বলে ডাকি।

এ বাড়ির নারী-পুরুষ সকলেরই রং ফরসা, নাক টিকোলো, চোখের মণিতে সামান্য নীলচে আভা আছে। মনে হয়, বিশুদ্ধ আর্য রক্তের ধারাটি এই পরিবারে এখনও অক্ষুণ্ন। সকলের ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত এবং নম্র। বাড়ির কারওর সঙ্গে যাতায়াতের পথে দেখা। হলেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে ঘাড় হেলিয়ে বলবেন, মাস্টারমশাই ভালো আছেন? এরা কলকাতার খাঁটি অ্যারিস্টোক্রাট বা অভিজাত বলতে যা বোঝায়, তারই অংশ। বেশ কয়েক পুরুষ ধরেই ধনী। বাড়িতে শিক্ষাদীক্ষার চল আছে, বিরাট গ্রন্থাগার এবং অনেক রকম শিল্প সংগ্রহ এবং মাঝে মাঝেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসে। মানব সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ফসল, শিল্প-সংগীত-সাহিত্য এরা তার সমঝদার। এখানে সবকিছুই সুন্দর।

সন্ধ্যাবেলা এদের বাড়িতে এসে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সারা দিন আমি যে জীবন কাটাই তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে বেশ কিছুটা জড়িয়ে পড়েছি, স্টুডেন্টস ফেডারেশনের উৎসাহী কর্মী। ভূয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আমরা সভায় মিছিলে সোচ্চার। নেহরু বলেছিলেন, কালোবাজারিদের ধরে ধরে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কিন্তু সব ল্যাম্পপোস্ট খালি পড়ে আছে, চতুর্দিকে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্সদেরই রাজত্ব। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, পুলিশ কোনও দিন আর। জনসাধারণের ওপর লাঠি-গু• চালাবে না। সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অনেক সাধারণ লোক পথেঘাটে বলে ফেলে, এর থেকে যে বাবা ব্রিটিশ রাজত্বও ভালো ছিল।

বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ব্রিটিশ রাজত্বের বদলে বলে, কোম্পানির আমল। আমরা তখন আই পি টি এর এই গানটা গেয়ে বেড়াই।

মাউন্ট ব্যাটেন সাহেব গো
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গেলা হায়।

আর একটি গান:

শোনো শিশুর পরিচয়
যেমন তেমন নয়কো শিশু
মস্ত মহাশয়
হিটলার তাহার জ্যাঠা ছিল
মুসোলিনি মেসো-ও–ও
(আর) মার্কিন দেশের মার্সাল মাসি
পাঠায় খেলনা ডলার ঝুমঝুম
নাকের বদলে নরুণ পেলাম
টাক ডুমাডুম ডুম-
জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম
লাগলো দেশে ধুম!

এই সময় সন্ধ্যাবেলার ওই মিত্তিরবাড়ি তো খাঁটি একটি বুর্জোয়া দুর্গ। ওরা পরাস্বপহারী। ওদের সাতখানা কলিয়ারি, কলকাতায় একুশখানা ভাড়াবাড়ি, দু-ডজন যাত্রী বাস ইত্যাদি। অর্থাৎ নিজেরা কিছু পরিশ্রম করে না-অপরের পরিশ্রম করা টাকা দিয়েই এদের বিলাসিতা। কলেজ ক্যান্টিনে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় এদের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করতে পারি বটে, কিন্তু কাছাকাছি এসে কিছুতেই ঘৃণা প্রকাশ করতে পারি না। (তার কারণ অবশ্য এই নয় যে, আমি এদের বেতনভোগী।) এখানে আমি মাইনে পাই চল্লিশ

টাকা, সেটা না পেলে আমি এমন কিছু অভাবে পড়ব না। কিন্তু একটা কথা বার বার মনে হয়, এদের হাতে প্রচুর টাকা ও প্রচুর সময় আছে বলেই কতকগুলি এমন জিনিসের চর্চা করতে পেরেছে, যা অত্যন্ত মোহময়। ব্যক্তিগত ব্যবহারে সভ্যতা, ভদ্রতার উচ্চ আদর্শ, সূক্ষ্ম রুচি এবং শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ-এসব তো সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। এগুলো কি খুবই নগণ্য ব্যাপার? বলাই বাহুল্য, এই সমাজের মধ্যে অনেক লম্পট, জোচ্চোর, ক্রুর এবং রুচিহীন গর্ধভও রয়েছে-তবু সভ্য সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের যে সার্থকতা, তা এই অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মধ্যেই দেখা যায়। যার উদাহরণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

সেই সময় আমাদের 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি আখ্যা দিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল। যুক্তি দিয়ে মানতে হলে তো রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলতেই হবে, কিন্তু মনে মনে বুঝি, এটা হাস্যকর।

একদিন আমার ছাত্র রূপ আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, মাস'সাই, আপনি কি কবি?

আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে বললাম, কেন, একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

বলুন না।

কবিতা লেখা যেন একটা লজ্জার ব্যাপার। মানুষের চরম অযোগ্যতার পরিচয়। তাই নিজের মুখে স্বীকার করতে জিভ সরে না। আবার কেউ কবিতার কথা জিজ্ঞেস করলেই বুকের মধ্যে অস্পষ্ট সুগন্ধের মতন কিছু একটা ছড়িয়ে যায়, আগ্রহ বেড়ে যায় শত গুণ।

তোমাকে কে বলেছে একথা?

ছোটমা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আপনি কি কবি?

ছোটমা কী করে জানলেন? ছোটমা জিজ্ঞেস করেছেন 'দেশ' কাগজে বাদলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে যার লেখা বেরিয়েছে-সেটা কি আপনার?

আমি লজ্জারুণ মুখে কোনওক্রমে বললাম, হ্যাঁ। তারপরই কথা ঘুরিয়ে বললাম, এবার এই অঙ্কটা করে ফেলো তো!

রূপ তার কাকিমাকে ছোটমা বলে, এটা আমি জানি।

তবে, ওর কাকিমাকে আমি কখনও দেখিনি। এবাড়ির মেয়েরা বাইরের লোকের সামনে বেরোন না। তবু সেই মহিলা আমার কবিতা সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাই তার চিন্তা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। কী রকম দেখতে তাকে? বাগানে কয়েক জন মহিলাকে মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখেছি, তার মধ্যে কেউ কি? কোন জন?

একটু বাদে কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আমি আবার রূপকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ছোটমা বুঝি অনেক বই পড়েন।

অনেক অনেক! ছোটমা ফরাসি পড়তে পারেন, তা জানেন? ছোটমা সাহেবদের সঙ্গেও ফরাসিতে কথা বলতে পারেন বাবার কাছে একজন এসেছিলেন...

শুনে আমি আরও চমৎকৃত হয়ে যাই! এত বড় ধনী পরিবারের ফরাসি জানা বিদুষী বধূ আমার কবিতার পাঠিকা? এর থেকে নোবেল প্রাইজ পাওয়া আর কী বড় কথা? আমার কবিতা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়, কেউ পড়ে বলে তো টের পাই না। বন্ধুরা মাঝে মাঝে তা নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি করে, আর অনেকে কোনও রকম উচ্চবাচ্চই করে না। রেণুই আমার একমাত্র প্রত্যক্ষ পাঠিকা।

রূপের কাকিমার চেহারাটা এখন আমার তরু দত্তর মতন মনে হয়। অবশ্য তরু দত্তর চেয়ে এঁর বয়স নিশ্চয়ই বেশি হবে। আমার কবিতাটি কি ওঁর ভালো লেগেছে? মনে মনে

তক্ষুনি ঠিক করে ফেলি, আমার এই অদৃশ্য পাঠিকাকে খুশি করার জন্য এরপরে আর একটা সাঙ্ঘাতিক কবিতা লিখতে হবে।

সেই সন্ধ্যাবেলা আমার মনটা এত খুশি হয়ে থাকে যে, ছাত্র পড়ানো শেষ করে তক্ষুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। বরং ইচ্ছে করে, আমার কবিতার এই অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের কথা এক্ষুনি ছুটে গিয়ে কারোকে বলি। কাকে আর বলব, রেণুকে ছাড়া?

রেণুদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে চলছে তুমুল আড্ডা। বিষ্ণুর মাস্টারমশাই, যিনি এম-এ ক্লাসের ছাত্র, সেই রজতদা রয়েছেন, সুপ্রকাশদা এবং তাঁর দু'জন বন্ধু এবং রেণুও রয়েছে। সুপ্রকাশদার এক বন্ধু দারুণ মজার মজার গল্প বলতে পারেন, সবাই তা শুনে দারুণ হাসছে।

আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে চুপচাপ এক পাশে বসলাম, আমার দিকে কেউ মনোযোগ দিল না বিশেষ। হাসির গল্পের মাঝখান থেকে শুনলে মজা পাওয়া যায় না বিশেষ। আমি তাই বসে রইলাম বোকার মতন মুখ করে।

রেণু এত হাসছে যেন এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। আমার চোখের দিকে ওর তাকাবারও সময় নেই। আমার যে রেণুর সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলার দরকার, ভীষণ দরকার! সুপ্রকাশদার বন্ধু বললেন, তারপর সেই খরগোশটা যার গোঁফ আশু মুখুজ্যের মতন–

আবার একদমক হাসি। হাসির পরিবেশ একবার জমে গেলে যে-কোনও রসিকতাতেই হাসি পায়–সবাই যেন হাসিতে মাতাল। আমি অন্য আবহাওয়া থেকে এসেছি বলেই মাঝে মাঝে শুধু কাষ্ঠ হাসি দিতে হচ্ছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দশটা বাজে। মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল এরা। নিশ্চয়ই একটু বাদে চলে যাবে–তারপর আমি রেণুর সঙ্গে দুটো কথা বলার সুযোগ পাব। কিন্তু, হঠাৎ বুঝলাম, সুপ্রকাশদার দুই বন্ধুই সে-রাত্রে ওই বাড়িতেই থাকবেন। রেণু বলল, খেয়ে উঠে বাকি গল্পটা বলতে হবে কিন্তু। তাড়াতাড়ি ঘুমোলে চলবে না।

হঠাৎ ঈর্ষায় আমার বুকটা জ্বলে গেল। আমার জীবনে সেই প্রথম ঈর্ষা। মনে হল, মেয়েরা কী অসম্ভব নিষ্ঠুর হয়। এক এক সময় কত ভাব, আর এক এক সময় নিদারুণ অবহেলা। রেণু কি আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছে না, আমি শুধু ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যই এসেছি! আমার দিকে তাকাবার মতন সময়ই তো ওর নেই।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলি।

বিষ্ণু বলল, আর একটু বোস না!

না, অনেক রাত হয়ে গেছে।

এখানকার আড্ডা ভেঙে গেল, ওরা এখন ওপরে খেতে যাবে। সবাই এসে দাঁড়াল ঠাকুরদালানের সামনের বারান্দায়। রেণু আমাকে বলল, শঙ্কুদা কী দারুণ গল্প বলেন, না? হাসতে হাসতে একেবারে খিল ধরে যাচ্ছিল। শঙ্কুদার মতন এত বুদ্ধি আমি আর কারওর দেখিনি।

আমি রেণুর দিকে দু'-এক পলক মাত্র তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলাম।

রামায়ণের সীতাও জানত না যে, ঋদ্ধিমান পুরুষ কখনও নিজের নারীর মুখে অপর কোনও পুরুষের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। রেণু তা কী করে জানবে!

আমি শুকনো গলায় বললাম, সত্যি, শঙ্কুদা দারুণ গল্প বলতে পারেন।

শঙ্কুদা রেণুর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, এই, চল চল, খুব খিদে পেয়েছে।

আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললাম, রেণুর সঙ্গে আর কোনও দিন দেখা করতে আসব না।

যুক্তিহীন ঈর্ষা আমাকে এমন ভাবে দগ্ধ করতে লাগল যে, আমি আর অন্য কোনও কিছু চিন্তাই করতে পারলাম না। বার বার মনে হতে লাগল, রেণু আমাকে ভালোবাসে না। আমার কবিতাও ভালোবাসে না, সব শুধু মুখেই। মেয়েদের কখনও বিশ্বাস করতে আছে?

বাড়ি গিয়ে খাওয়াদাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। সামনে খাতা আর কলম। বার বার মনে হতে লাগল, রেণুকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিই, ওর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। দু-চার লাইন করে লিখেও ছিঁড়ে ফেলছি। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে, কপালের দু'পাশে শিরা দপদপ করছে। আজ সন্ধ্যাবেলাটা কত সুন্দর ছিল। সব নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর ঠিক করলাম, চিঠি লেখারও আর দরকার নেই। রেণু চিন্তা করুক, কেন আমি ওর কাছে যাই না! ওকে কোনও দিন জানতেও দেব না। রেণুকে আমি একেবারে ভুলে যাব। আমি এরপর অনেক লিখব, এত ভালো লিখব যে, আমার নাম ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যাবে। তখন রেণু বুঝবে, কাকে ও অবহেলা করেছে। ও কি ভাবে, ও ছাড়া আমার কবিতা কেউ পড়ে না?

অনেক কাটাকুটি করে আমি একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম:

আর্টেমিস, আমি সেই ক্রীতদাস...

তিন-চার লাইন লেখবার পরই বুঝতে পারলাম, কবিতাটা আমি রেণুকে ভেবেই লিখছি। আমার চোখের সামনে ফুলের মতন ফুটে আছে রেণুর মুখ।

৬১. কলেজের সোস্যাল ফাংশান

কলেজের সোস্যাল ফাংশান হবে আগামী শনিবার, আমরা ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক শাখা থেকে একটা গীতিআলেখ্য করব, তার রিহার্সাল চলছিল। কয়েক দিন আগে ইউনিয়নের। ইলেকশানে আমি ম্যাগাজিন এডিটর হবার জন্য দাঁড়িয়েও ভোটে হেরে গিয়ে একটু

অপমানিত ও দুঃখিত হয়েছিলুম তারপর আবার এই গীতিআলেখ্যটা পরিচালনার ভার আমাকে দেওয়ায় আবার জীবনের স্বাদ ফিরে আসে।

গদ্য অংশটা মাইকে আমাকেই পড়তে হবে, তাই রিহার্সালের সময় আমি যতদূর সম্ভব গলাটা মোটা করার চেষ্টা করছি, এই সময় একজন এসে খবর দিল, আদিনাথদা আমাকে ডাকছে।

খবরটা দিয়ে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, এক্ষুনি!

রিহার্সাল বন্ধ রেখে আমাকে উঠে যেতে হল। আদিনাথদা আমাদের কলেজের ছাত্র নন, কিন্তু কলেজের উলটো দিকের রতন কেবিনে তিনি প্রায়ই এসে বসেন। শুধু আমাদের কলেজ নয়, কলকাতার অনেক কলেজের কাছাকাছি চায়ের দোকানেই আদিনাথদাকে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি এলেই কলেজ ইউনিয়নের সদস্যরা তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে।

আদিনাথদা পাজামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে থাকেন, কাঁধে একটি ঝোলা। এই পোশাক ছাড়া আদিনাথদাকে আমি কখনও দেখিনি-মনে হয় এগুলো তিনি গা থেকে খোলেন না। মাথা-ভরতি ঘন চুল, গায়ের রং কালো, নাকটি খঙ্গের মতন উদ্যত-তার চেহারায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে-দেখলেই মনে হয় এ আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতন নয়। আদিনাথদা সব সময়েই গম্ভীর, হাস্য পরিহাস পছন্দ করেন না, সব। সময়েই কথাবার্তা এমন গুরুত্ব দিয়ে বলেন, যাতে মনে হয় এই পৃথিবীর ভালো-মন্দ দেখার গুরু দায়িত্ব তার ওপরেই ন্যস্ত।

আদিনাথদার হাতে একটা চুরুট, তার ডগায় এতখানি ছাই জমে আছে যে দেখলে অস্বস্তি হয়। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করলেন, এরপর তোর ক্লাস আছে?

আমি বললাম, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে-আমি আজ আর যাচ্ছি না।

ভালো। কী করছিলি?

সোস্যাল ফাংশানে আমরা একটা...রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

গীতিআলেখ্য? কথাটা শুনলেই কী রকম ন্যাকা ন্যাকা মনে হয়। আজকাল খুব চলছে। যাই হোক, ওই গীতিআলেখ্যর থিমটা কী?

গ্রামের একটি চাষি পরিবারের জীবন, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত।

কে লিখেছে?

কেউ ঠিক লেখেনি, মানে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তর গান-আর গদ্যটা আমিই-

রবীন্দ্রনাথের গান? রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন গ্রামে গেছেন? চাষিদের জীবনযাত্রা দেখেছেন?

আদিনাথদার কথার উত্তরে আমি ঠিক যুক্তি খুঁজে পাই না-তবে, এমনিতে গান খুঁজতে গেলে ঠিকমতন গান পাওয়া এতই মুশকিল যে, রবীন্দ্রসংগীতের কথাই মনে পড়ে যায়। বৃষ্টির দৃশ্যে আমি 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে' গানটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

আদিনাথদা বললেন, যাকগে, রিহার্সাল দেবার আর দরকার নেই-সোস্যাল ফাংশান এবার হবে কিনা বলা যায় না।

আমি এবং আরও তিন-চার জন আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, সোস্যাল হবে না? কেন?

আদিনাথদা গম্ভীর ভাবে বললেন, দেশের যা অবস্থা, তাতে এখন কি নাচ-গান। হইহল্লা করার সময়? চালের দাম কত?

সেই মুহূর্তে চালের দামের জন্য চিন্তা করার বদলে সোস্যাল বন্ধ হবার আশঙ্কাতেই মনটা বেশ দমে গেল। আর একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, আদিদা, সোস্যালের জন্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে হল বুক করা হয়ে গেছে যে!

হোক। ওসব নিয়ে এখন চিন্তা করার দরকার নেই। পরশু দিন স্ট্রাইক কল করা হচ্ছে। সিনেট হলের সামনে থেকে র‍্যালি হবে। পুলিশ যদি সেকশন হান্ড্রেড ফরটি ফোর তোলে তা হলে গোলমাল হতে পারে। তা হলে স্ট্রাইক কনটিনিউ করবে। এই অবস্থায় তোমরা সোস্যাল ফাংশানের কথা চিন্তা করছ কী করে সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। শোনো, আমাদের পার্টি লাইন এখন থেকেই ঠিক করা দরকার। স্ট্রাইক মানে শুধু মিছিল করে যাওয়াই নয়। এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার...

আদিনাথদা আমার দিকে ফিরে বললেন, বাদল, এখানে বোস। কালকের মিছিলের জন্য কয়েকটা নতুন স্লোগান তৈরি কর। আমি সাবজেক্ট বলে দিচ্ছি।

যে-কোনও কারণেই হোক, তখন পর্যন্ত সরকার বিরোধী স্লোগান অধিকাংশই ছিল হিন্দিতে বাংলা স্লোগান শাখাঁটি তখনও তেমন উন্নতি করেনি।

স্ট্রাইকের আগের দিন রাত্তিরে বাড়িই ফিরলাম না। মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, অনেক বুঝিয়ে, অনেক মিথ্যে কথা বলে অনুমতি আদায় করলাম। পঙ্কজ এক রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে ছিল, সুতরাং আমি পঙ্কজের বাড়িতে কি এক রাত্রি থাকতে পারি না? যদিও পঙ্কজরা তখন কলকাতায় নেই।

সারা রাত জেগে চলল আমাদের পোস্টার লেখা এবং দেওয়ালে সাঁটা। শীতের রাতে নিস্তব্ধ কলকাতা। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। এত রাতে কখনও এই শহরের দৃশ্য দেখিনি। যে-সব রাস্তা সারা দিন মানুষভরতি দেখি, এখন সেখানে একটাও লোক নেই–এটা কেমন অদ্ভুত লাগে। মনে হয় যেন একটা শুকনো নদী–একসময় উত্তাল জল ছিল। না, এ উপমাটা ঠিক নয়। কারণ রাত্রির রাজপথ বড় সুন্দর দু'পাশের আলোগুলো জ্বলছে,

চকচক করছে কালো পিচ বাঁধানো রাস্তা বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অনেক রাস্তাতেই এখনও গ্যাসের আলো আছে।

ভোর হবার পর আমরা আঠার বালতি ও কাগজপত্র এক জায়গায় জমা করে রেখে নিমতলার দিকে চলে এলাম। এখানে অনেক দোকানেই এর মধ্যে কচুরি ও জিলিপি। ভাজা হয়ে গেছে। গঙ্গাস্নান যাত্রীদের জন্য এ-পাড়ার দোকান সবচেয়ে আগে খোলে, সুজিত আমাদের এ-খবর দিয়েছিল। মাত্র ছ' মাস আগে সুজিতের বাবা মারা গেছে সেই সময় শ্মশানে এসে সে এ-দিকে ভোররাতের দৃশ্য দেখেছিল। হরিধ্বনি দিয়ে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে যাবার সময় আমাদের মধ্যে একমাত্র সুজিতই সেদিকে তাকিয়ে প্রণাম করে।

মা বলেছিলেন, সকাল হতেই বাড়ি ফিরে যেতে। তবু ফেরা হল না। বন্ধুরা সবাই মিলে আড্ডা দেওয়া শুরু করলে সেই আড্ডা প্রথম ভেঙে দেবার দায়িত্ব কেউ নিতে চায় না। একজন বাড়ি ফেরার নাম করলেই, আর সকলে তখন বাড়ি ফিরবে, সেই জন্য কেউই বাড়ি ফেরার কথা উচ্চারণ করল না। কচুরির দোকানের ঠিক উনুনের পাশটাতেই বেঞ্চি টেনে গুটিশুটি মেরে বসে গল্প করতে করতে আর সময় জ্ঞান থাকে না। মাঝে মাঝে চা আসে।

একসময় হঠাৎ দেখি ন'টা বাজে। তা হলে তো আর বাড়ি ফেরার প্রশ্ন আসে না। দশটা থেকেই কলেজের গেটে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ফরোয়ার্ড ব্লকের ছাত্র সংগঠন ছাত্র ব্লক তখন আমাদের স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সঙ্গে খুব প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করছে। ওদের ছেলেদের কিছুতেই লিড নিতে দেওয়া হবে না।

সুতরাং মিছিলটিছিল সেরে বিকেল বা সন্ধ্যাবেলার সময় বাড়ি ফেরা যেতে পারে। মা ভীষণ চিন্তা করবেন। দুপুরে না খেতে গেলে মা নিজেও দুপুরে খাবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু বন্ধুদের কি এই কথা বলা যায়? ওরা নিশ্চয়ই আমাকে মায়ের আদুরে ছেলে বলে ঠাট্টা করবে। বিষ্ণুকে যেমন অনেকেই বলে। এক ছেলে হবার এই ঝামেলা! দিদির বিয়ে হয়ে

গেছে-মা সেই জন্যই সব সময় আমার ব্যাপারে পুতুপুতু করেন। যাই হোক, কী আর করা যাবে! পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, মাকে মাঝে মাঝে এ রকম কষ্ট দেওয়া যায়। যতই আমার ওপর রাগ করুন, আমি একসময় বাড়ি ফিরে গেলেই মা খুশি। সারাদিন দুশ্চিন্তার পরও তখন আর বকুনিতে জোর থাকে না।

যদি আর না ফিরি? কেন হঠাৎ এই কথাটা আমার মনে এল, জানি না। তবু বার বার মনে হতে লাগল, যদি আমি আর কোনও দিনই বাড়ি না ফিরি, তা হলে আজ আমার বাড়ির অবস্থা, আমার মায়ের অবস্থা কী হবে?

যদি আর না ফিরি, তা হলে রেণুর সঙ্গেও আর দেখা হবে না। আমার পকেটেই রয়েছে রেণুর একটা চিঠি। রেণু বেশির ভাগ চিঠি লেখে রাত্তিরবেলায়। এ-চিঠিতে ও লিখেছে, 'তুমি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে? একবার চোখ চাইলেই দেখতে পাবে আমি তোমার পাশেই আছি।' ...আমি মরে গেলেও কি রেণু আমার কথা ভাববে?

সেই সময় কিন্তু আমরা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি যে সেদিনকার স্টুডেন্টস র‍্যালিতে কোনও গোলমাল হবে। আদিনাথদা বোধহয় জানতেন একথা, কিন্তু আমরা জানতাম না।

বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে জমায়েত হয়েছে সিনেট হলের সামনে-একদল পুলিশ গোলদিঘির এক কোণে ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে আছে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা। জারি করা হয়েছে, আমাদের আর এগোতে দেওয়া হবে না। কয়েক জন ছাত্রনেতা কথা বলছে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে। আমরা মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছি, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাত্, ভুলো মাত্! ছাত্র সমাজ দিচ্ছে ডাক, কায়েমি স্বার্থ নিপাত যাক!

কে প্রথম ইট ছুড়ল, আমি লক্ষই করিনি। হঠাৎ দেখলাম, দারুণ ইট ছোঁড়া শুরু হয়ে গেছে। ইটের সঙ্গে অনেকের চটিজুতোও। পুলিশ লাঠি চার্জ করল। আমরা একটু পেছনে ছিলাম, হুড়োহুড়ি শুরু হতে দেখে মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল-প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে রাস্তা সারাই হচ্ছিল-সেখানকার খোয়া তুলে নিয়ে মারতে লাগলাম পুলিশের

দিকে। ফট ফট করে আওয়াজ হতে লাগল টিয়ার গ্যাস সেলের–আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কে একজন আমার হাত ধরে বলল, এই, ইডিয়েট, দৌড়ো–

তাকিয়ে দেখি জীমূত। জীমূতের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, এর মধ্যে ও একমুখ দাড়ি রেখেছে। ততক্ষণে আমার সাঙ্ঘাতিক চোখ জ্বালা করতে শুরু হয়েছে–চোখ খুলে তাকাতেই পারছি না–জীমূত আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। রাস্তার চাপাল থেকে রুমাল ভিজিয়ে এনে আমার চোখে চেপে ধরল।

সারা রাত রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি, তারপর চোখে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁপটা একটু বেশি লেগেছে, মনে হল, আমি অন্ধ হয়ে গেছি। জীমূতের হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল ভাবে। বললাম, আমার চোখ, আমার চোখ!

জীমূত ফের রুমাল ভিজিয়ে এনে বলল, ভালো করে চেপে ধরে থাক, একটু জ্বালা করবে, আর কিছু ভয় নেই–

তখন ছাত্র-পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে। গোলদিঘির এ-পাশে আর পুলিশ এগোতে পারছে না। পুলিশকে এক জায়গায় আটকাতে পারাটাই ছাত্রদের কাছে বিরাট জয়ের ব্যাপার মনে হচ্ছে দলে দলে ছেলে ছুটে যাচ্ছে সেদিকে।

আমার চোখটা একটু ভালো হবার পর জীমূত বলল, বাড়ি যাবি? আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে রাস্তা ফাঁকা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর তুই?

আমার কিছু ঠিক নেই। তুই এখানে থাকবি? আরও গোলমাল বাড়বে মনে হচ্ছে। এখন বাড়ি চলে গেলে সেফ সাইডে থাকা যাবে।

তুইও বাড়ি চল তা হলে।

তুই যদি থাকিস, আমিও তা হলে থাকতে পারি।

সিদ্ধান্ত নিতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হল না। তখন সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের মতন উত্তেজনা। এ ছেড়ে জীমূত যদি না যেতে চায়, আমি একা যাব?

বললাম, চল, সামনে এগিয়ে দেখি।

একদল ছেলে ইট ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুলিশ বাহিনীকে তাড়িয়ে প্রায় মেডিক্যাল কলেজের গেটের কাছে নিয়ে গেছে। জীমূত আর আমি রণ-উন্মাদনায় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে গেলাম।

বেশি দূর এগোনো গেল না। কয়েকটা ট্রাম অনেকক্ষণ থেকেই থেমে ছিল, ইট ছোঁড়ার সময় আমরা ট্রামের আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছিলাম-হঠাৎ একটা ট্রাম থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। তারপরই জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে আগুন। স্বাধীনতার পর কলকাতার রাস্তায় সেই প্রথম ট্রাম পুড়ল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই দেখলাম, আমাদের চতুর্দিকেই পুলিশ। উলটো দিক থেকেও যে পুলিশের গাড়ি আসতে পারে, এটা আমরা কেন ভাবিনি, কে জানে!

জীমূত বলল, ক্যান্টিনের দিকে চল-

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে দৌড়োলাম। কলুটোলার কাছে একদল ছাত্র দু'দিকের পুলিশের মাঝখানে একেবারে ফাঁদে পড়ে গেছে-আমরা সিনেট হলের সিঁড়ির নীচে ডান পাশ। দিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যাবার চেষ্টা করলাম-কারণ, এইটুকু জানি, পুলিশ ইউনিভার্সিটির ভেতরে ঢুকবে না।

ক্যান্টিনের দিকে যাবার জন্য লোহার লাল গেটটা কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে। এ-সময় কোনও দিন তো এই গেট বন্ধ থাকে না। আমরা দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে চিৎকার করতে লাগলাম, এই খুলে দাও, শিগগির খুলে দাও-

এমন সময় দড়াম করে একটা শব্দ হল। আমি ভেবেছিলাম, লোহার গেটটা উলটো দিক থেকে কেউ খুলছে বুঝি, সেই শব্দ। তারপরই দেখি, লোহার গেটে একটা গোল গর্ত– আমার থেকে বিঘত খানেক দূরে।

জীমূত আছড়ে মাটিতে পড়ে আমার পা ধরে টেনে বলল, শুয়ে পড়! শুয়ে পড়!. ফায়ার করছে!

আমিও নীচে শুয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। আরও কয়েকটা গুলির শব্দ।

জীমূত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালারা এলোমেলো ফায়ার করছে।

আমি আস্তে আস্তে ওপর দিকে তাকালাম। কোনও সন্দেহ নেই, একটা গুলি ওই লোহার দরজা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। আমার এত কাছ দিয়ে! মৃত্যু এত কাছে এসেছিল? মনে পড়ল সকালবেলার চিন্তাটা। যদি আর বাড়ি না ফিরি? গুলিটা আর মাত্র এক বিঘত ডান দিক দিয়ে এলে আমার আর কোনও দিন বাড়ি ফেরা হত না।

জীমূত ফিসফিস করে বলল, পড়ে যাবার সময় আমার হাঁটুতে দারুণ জোর লেগেছে, দৌড়োতে পারব কিনা সন্দেহ।

আমি বিবর্ণ মুখে বললাম, সত্যি গুলি ছুড়ছে?

তুই কি ভেবেছিলি, স্বদেশি পুলিশ বলে বন্দুকে গুলির বদলে লজেঞ্চুস ভরে ছুড়বে?

আমি আর কোনও কথা বলতে পারলাম না। আমার শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। এত ভয় আমি জীবনে কখনও পাইনি। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে আমি সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারি না। এ ভাবে কেন মরব? আমি কি শুধু একটা সংখ্যা?

মাটিতে পড়ার সময় আমার বুকপকেট থেকে অনেক কাগজপত্রও পড়ে গেছে। তার মধ্যে রয়েছে রেণুর চিঠিটা। খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আমি কাগজপত্রগুলো তুলে নিই।

আমি কোনক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও জীমূত ধরা পড়ে যায়। সব সুষ্ঠু একশো চুয়ান্ন-জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল, এ ছাড়া দু'জন নিহত ও। এগারোজন আহত। পরের দিন আবার ধর্মঘট ডাকা হল, আবার গোলমাল। এই রকম। ভাবে চলল পাঁচ দিন। ততদিনে আমরা জেনে গেছি, আদিনাথদা প্রমুখ ছাত্রনেতাদের এ রকমই পরিকল্পনা ছিল। ধর্মঘট ডেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। পুলিশ যদি অত্যাচার চালায়-সেটাও এক হিসেবে লাভ-তা হলে জনসাধারণের মন এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠবে, এই সরকারের পতন ঘটাতে তা হলে আর দেরি হবেনা-ও-দিকে গ্রামে গ্রামেও মুক্তাঞ্চল তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে। আমরাও এই নীতিকে সঙ্গত মনে করেছিলুম।

পাঁচ-দিন পর যখন মনে হল সাময়িক ভাবে আমাদেরই জয় হয়েছে, সংবাদপত্রগুলি সরকারের সমালোচনায় মুখর, রাস্তার লোকেরাও বিরক্তি প্রকাশ করছে, তখন আপাতত আমরা বিরতি ঘোষণা করলাম। চাপে পড়ে সরকার ছাত্র বন্দিদের মুক্তি দিল, আমাদের পক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হল ধর্মঘট। নিহতের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল তিন জন।

যারা মারা গেছে, তাদের কারোকেই আমি চিনি না। কিন্তু যখনই মনে পড়ে যে আমিও ওদের একজন হতে পারতাম, তখনই আমার শরীরে একটা শিহরন খেলে যায়। রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। মাথায় গুলি লাগা অবস্থায় আমি পড়ে থাকতাম ক্যান্টিনের গেটের সামনে পুলিশের গাড়ি আমার শরীরটা হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যেত, তারপর কাটাকুটি করে পাঠিয়ে দিত মর্গের বরফঘরে। একসময় মুখ থেকে চাঁদরের ঢাকা সরিয়ে দেখে মা কিংবা বাবা বলতেন, হ্যাঁ, এরই নাম ছিল বাদল।

মৃত্যু সম্পর্কে আমার মধ্যে একটা রোমান্টিক মোহ আছে, কিন্তু এর সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। কেন এই মৃত্যু? কবে দেশের অবস্থা বদলাবে কি বদলাবে না, তার জন্য আমি গুলি খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকব? জন্মেছি যখন, তখন এত সহজে এ-পৃথিবী ছাড়ব

না। লেনিন যদি উনিশশো পাঁচ সালের প্রথম বিপ্লবে গুলি খেয়ে মরে যেতেন, তা হলে তার নামও কি আমরা কেউ মনে রাখতাম এখন!

মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চিন্তা এখনও আমার মাথায় ঘোরে। কিন্তু সেই মৃত্যু যেন একটা শিল্পের মতন। মৃত্যু যেন একটি নারী, যেমন রেণু, তার কাছে আমি চিরকালের মতন আশ্রয় পেতে চাই, যাতে আমাকে আর কেউ বিরক্ত না করে। রেণুকেও যা বলতে পারি না, মৃত্যুকে তাই বলব, তুমি আমাকে নাও। সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে।

আসলে এসব কল্পনাবিলাস। আমি একটি কাপুরুষ ছাড়া কিছুই নয়। যখনই মৃত্যুর খুব কাছাকাছি যাই, অমনি দারুণ ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসি। তবু মনে মনে ঠিক করে ফেললুম আমি এ রকম কাপুরুষই থাকব-অকারণে পুলিশের গুলি খেয়ে মরা ঠিক কাজের কথা নয়। আরও ঠিক করে ফেললুম, রাজনীতি করতে গেলে আমাকে খুব শিগগির শিগগির নেতা হয়ে উঠতে হবে। নেতারা চট করে মরে না। জেলটেল খাটা যেতে পারে, কিন্তু গোলমালের সময় সাধারণ ছেলেদের খেপিয়ে পাঠাতে হবে সামনের দিকে। চিরকালই এ রকম কিছু সাধারণ ছেলে মরে-কিন্তু আমি এদের থেকে আলাদা। সূর্যদাকে দেখলুম তোকত কষ্ট সহ্য করেছে, কতবার লাইফ রিস্ক করেছে-অথচ এখন তাকে কেউ চেনেই না। নেতা হতে পারেনি কিনা। ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের এক বিখ্যাত নেতা এখন র‍্যাশনিং ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ হয়ে ঘুষের টাকায় লাল হচ্ছেন-তবু কেউ তাঁকে কিছু বলছে না, কারণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে!

কলেজের সোস্যাল ফাংশান বন্ধ হয়ে গেল, তার বদলে এই আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে এবং বন্দি-মুক্তি উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটা সভা হল। সেই সভায় আদিনাথদার অনুরোধে আমি একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলাম। আমার পা ঠকঠক করে কাঁপছিল এবং সামনের সারির কমরেডদের চোখের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না তবু কোনও রকমে উতরে গেলাম প্রথম পরীক্ষায়।

আমাদের কলেজের পাঁচ জন ছাত্র ধরা পড়েছিল, তারা কলেজে এসে এমন রোমহর্ষক গল্প বলতে লাগল যে রীতিমতন হিংসেই হতে লাগল আমাদের। পুলিশের। মারটার না খেয়ে শুধু একবার জেলটা ঘুরে আসতে পারলে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হতে। পারত।

কয়েক দিন ধরেই এইসব গল্প এবং আলোচনা চলছিল, ক্লাস করার দিকে একটুও মন নেই, বইখাতা নিয়ে সোজা নরেন কেবিনে এসে উপস্থিত হই। ক্লাসে প্রক্সি দেবার ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে। এর মধ্যে নির্মল একদিন এসে আড্ডার সুর কেটে দিল। নির্মলের ডান হাতখানা প্লাস্টার করা, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি।

আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কীরে, তোর হাত ভাঙল কী করে?

নির্মল গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, আমি সাত দিন হাসপাতালে পড়েছিলাম, তোরা কেউ একবার দেখতেও গেলি না।

আদিনাথদা সেদিন হাজির ছিলেন নরেন কেবিনে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় হাত ভাঙল? পাড়ায়?

নির্মল হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠল আদিনাথদার মুখের ওপর। আদিনাথদার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলার কথা আমরা কেউ কল্পনাই করতে পারি না। তা ছাড়া নির্মল বলতে গেলে

আদিনাথদার ঘনিষ্ঠতম শিষ্য।

নির্মল বলল, কোথায় ভেঙেছে আপনি জানেন না? ধর্মঘটের প্রথম দিন আমি আপনার পাশে ছিলাম না?

আদিনাথদা মৃদু গলায় বললেন, তা ছিলে। কিন্তু শেষের দিকে তোমাকে দেখতে পাইনি।

দেখবেন কী করে? আমি তো দেখলাম, পুলিশ ঘিরে লাঠি তুলতে-না-তুলতেই আপনি খেচে রড দিলেন। পেছন ফিরে আর একবারও তাকিয়ে ছিলেন?

সবাই অপ্রস্তুত অবস্থায় চুপ করে গেল। আদিনাথদার নামে এ রকম অভিযোগ দেওয়ায় কে কী বলবে ভেবে পেল না। আমি নিজেও সেদিন পালিয়ে ছিলাম বলে মনে মনে আদিনাথদাকেই সমর্থন করলাম। খামোকা পুলিশের লাঠির নীচে পড়ে পড়ে মার খাবার দরকারটা কী? যারা বোকা, তারাই মার খায়।

আদিনাথদা ঠান্ডা চোখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার হাতে কি ফ্র্যাকচার হয়েছে?

নির্মল সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফের চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমাদের তাতিয়ে সামনে ঠেলে দিয়ে আপনারা সবাই কেটে পড়লেন, আঁ? গৌতমদাদের তো তবু অ্যারেস্টেড হতে দেখলুম–আপনাকে তো কোনও দিন পুলিশের ধারে কাছেও যেতে দেখিনি।

আদিনাথদা বললেন, নির্মল চুপ করো। এসব কথা এখানে আলোচনা করা চলে না। শুধু এইটুকু বলে রাখছি, আমাকে শিগগিরই আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে হবে, তাই আমি ধরা দিইনি।

নির্মল তবু চিৎকার করে বলল, ও তো গত এক বছর ধরে শুনছি! কিন্তু আমার যে হাত ভাঙল, আবার পুলিশের খাতায় নামও উঠে গেল, তার কী হবে?

নির্মল সকলের দিকে ফিরে বলল, জানিস মাইরি, আমার বাবা হাউহাউ করে কাঁদছেন! বাবার অফিসে আমার চাকরি পাবার কথা ছিল–আর আমাকে কেউ চাকরি দেবে?

কমিউনিস্ট হিসেবে একবার কেউ মার্কামারা হয়ে গেলে পুলিশ রিপোর্টে তখন কারওর চাকরি হয় না। চাকরি পেলেও চলে যায়। কিন্তু নির্মল কলেজ থেকে বেরোবার আগেই চাকরি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বলে ওর সম্পর্কে আমাদের একটু করুণা হল। যদিও শুনেছি, নির্মলের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, ওর বাবা শিগগিরই রিটায়ার করবেন, তবু চাকরির মতন একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য ভয় পেয়ে নির্মল আজ এখানে এসে এ রকম চঁচামেচি করছে–এটা আমাদের মোটেই পছন্দ হয় না।

যত সময় যাচ্ছে, ততই নির্মল বেশি মাথা গরম করছে। রাগলে ও যে এত মুখোরাপ করে, আমরা জানতাম না। নির্মল কিছু না বললে ওর নির্যাতনের জন্য আমরা ওকে সহানুভূতি জানাতাম–তার বদলে ও সকলের বিরক্তি আকর্ষণ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নির্মল যখন শালা, হারামির বাচ্চা ইত্যাদি শুরু করল, তখন আদিনাথদা উঠে, পড়লেন। আমাদের কয়েক জনকে বলে গেলেন, ওর মাথা ঠান্ডা হলে আমার সঙ্গে পার্টি অফিসে দেখা করতে বোলো।

আদিনাথদা চলে যাবার পর বীরেশ্বর ও আর কয়েকটি ছেলে নির্মলের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, এই একটু বাইরে চল, কথা আছে। এখানে চঁচামেচি করে লাভ কী?

আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা গলির মধ্যে ডেকে নির্মলকে একটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে দাঁড় করিয়ে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুই আদিনাথদাকে চ্যালেঞ্জ করছিস?

নির্মল বলল, কেন, আদিনাথদা কোন লাটের বাঁট যে তাকে কিছু বলা যাবে না? আমি মাটিতে পড়ে গেলুম, তা দেখেও পালাল–

বীরেশ্বর প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল নির্মলের মুখে। ভাঙা হাতখানা উঁচু করেই নির্মল আটকাতে গেল, পারল না, রক্ত গড়িয়ে এল ওর কষ বেয়ে। আর একখানা ঘুষি খেয়ে নির্মল মুখ নিচু করল। তারপরই আবার লাল টকটকে চোখ তুলে বলল, তোদের আমি দেখে নেব!

ঠিক আছে, দেখে নিস!

এর পরের মাস থেকেই নির্মল একটা আলাদা পার্টি খুলে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে কংগ্রেসের দালাল হয়ে পড়াশুনোই ছেড়ে দিল নির্মল, আমরা ওকে দেখলেই এড়িয়ে যাই।

.

আমার ছাত্র রূপ একদিন আমাকে বলল, মাস'সাই, আজ কিন্তু পড়ানো হয়ে গেলেই চলে যাবেন না। ছোটমা আপনাকে বসতে বলেছেন।

কেন?

ছোটমা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

সেই কথা শুনে প্রথম থেকেই এমন উত্তেজনা বোধ করতে লাগলুম যে পড়ানোতে আর মন বসাতেই পারি না। ঘন ঘন ঘড়ি দেখি। আজ কি একটু তাড়াতাড়ি পড়ানো শেষ করলে খারাপ দেখাবে? এ বাড়িতে সময়ের কড়াকড়ি কিছুই নেই। অনেকদিন আমার ব্যস্ততা থাকলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট পড়িয়েও চলে যাই। তবু আজ আমি কিছুতেই নিজের মুখে বলতে পারলাম না, এবার পড়া শেষ।

একসময় দরজার পাশ থেকে এক মহিলা বললেন, আসতে পারি?

আমি এমন শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম যে টেবিল থেকে একটা বই ও কলম পড়ে গেল, তক্ষুনি সে-দুটো তুলব না উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করব বুঝতে না পেরে একটা হাস্যকর না যযৌ ন তস্থে অবস্থায় রইলাম।

রূপের ছোটমা বললেন, আপনি বসুন।

তিনি নিজেও বসলেন একটি চেয়ারে, হাত দিয়ে কোলের কাছের শাড়ি প্লেন করলেন, তারপর হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

এ বাড়ির কোনও মহিলাকে আমি এত কাছাকাছি থেকে আগে দেখিনি। শুনেছি, এখানে এখনও পরদা-প্রথা মানা হয়, মেয়েরা বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলেন না। সেই জন্যই আমি অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হয়ে রইলাম। মহিলা কিন্তু অত্যন্ত সাবলীল, এমনকী কলেজের মেয়েরাও নতুন কারওর সঙ্গে আলাপের সময় যেটুকু জড়তা প্রকাশ করে-এঁর

মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। ধনী পরিবারের বধূদের সাজগোজের আতিশয্য সম্বন্ধেও আমার মনে মনে একটা ধারণা ছিল কিন্তু এঁর সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। ইনি পরে আছেন একটি লাল পাড় সাদা শাড়ি, হাতে দু'গাছা চুড়ি, বাঁ হাতের অনামিকায়। একটি আংটি, গলা ও কান খালি। মাথার চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপরে। সব মিলিয়ে কী সুন্দর রে বাবা! দম আটকিয়ে আসে যেন। গায়ের চামড়া মোমের মতন নরম ও মসৃণ, টলটলে চোখদুটির দৃষ্টি কী আশ্চর্য কোমল।

মনে মনে আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি অপলক, আসলে আমি সৌজন্যবশত ঈষৎ মুখ নিচু করে রয়েছি। একবার মাত্র দেখলেই এ রকম মুখ আমার মনের চিত্রশালায় সংগৃহীত হয়ে যায় তখন আমি না তাকিয়েও দেখতে পারি। আমার ভেতরটা বড় বেশি রূপের জন্য কাঙাল। হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায়, আমার জামার একটা বোতাম নেই। সারা দিন চটি পরে ঘোরার জন্য আমার পা দুটো ধুলোময়, আমি এত সৌন্দর্যের কাছাকাছি বসে থাকার অযোগ্য। কেন মুখের ঘামটুকু অন্তত একটু আগে মুছে নিইনি? এখন কি মোছা যায়?

আমি নিজে থেকে কোনও কথা বলতে পারলাম না। উনি নিজেই বললেন, আপনাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম না তো?

আমি বললাম, না, না–

আমার ছাত্র বলল, আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ছোটমা, আমি যাই?

উনি বললেন, যাও। চন্দনের মাকে বলে দিয়ো, ঠিক সাড়ে আটটায় দাদাবাবুর ওষুধ। দিতে হবে।

তারপর উনি আমার দিকে হাসিমুখে আবার চেয়ে রইলেন। পূর্ণ চোখ মেলে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কিন্তু আলাপ তো এক তরফা হয় না। রাজ্যের লজ্জা এসে আমার জিভের ডগায় ভর করেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিংয়ের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলতেও আমি এত নার্ভাস হইনি। তা ছাড়া কী কথা বলব, আমি তো ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না।

উনি বললেন, আমি কখনও কোনও কবিকে দেখিনি। খুব ছেলেবেলায় একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম-কিন্তু আমার ভালো করে সেসব কথা মনে পড়ে না। বিয়ের পর অনেক দিন লক্ষ্ণৌতে ছিলাম তো। তারপর এই সে-দিন যখন শুনলাম, খোকার মাস্টারমশাই একজন কবি

আমি মরমে মরে গিয়ে বললাম, না, না, আমি বিশেষ কিছুই লিখিনি, এই সামান্য দু'-একটা–

আমি কবিতা লিখি বটে, কিন্তু আমি কি কবি! কবি বলতে যাদের বোঝায়-যেসব উচ্চ আদর্শের মানুষ ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ-তাঁরা কোথায় আর আমি কোথায়?

আমি আপনার দুটো কবিতা পড়েছি। আপনার কোনও বই আছে?

না।

আচ্ছা, আপনি যে লিখেছেন, 'মুক্তিপিপাসু এক অরণ্য' এর ঠিক মানেটা কী?

অতিরিক্ত লজ্জা হঠাৎ আমার সব লজ্জা কাটিয়ে দেয়। অসহায়তার শেষ সীমায় এসে মানুষ যেমন আচমকা সাহসী হয়ে ওঠে। আমি মুখ তুলে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, দেখুন, নিজের কবিতা বিষয়ে কোনও কথা বলতে আমার খুব লজ্জা করে। তা। ছাড়া আমি জানি, আমি এখনও কিছুই লিখতে পারিনি।

খোকার মতন আপনি আমাকেও পড়াবেন? আমি শুধু কবিতা পড়ব।

আমি?

হ্যাঁ। ধরুন, সপ্তাহে তিন দিন। আমি বাংলা ভালো করে কখনও পড়িনি।

আমি কি আপনাকে পড়াতে পারব?

কেন, আপনার সময় নেই? আপনি আমাকে কবিতা পড়ে পড়ে শোনাবেন, তাই নিয়ে আলোচনা করবেন সারা দিন আমার তো কোনও কাজ নেই। দেখুন না, এত বড় বাড়ি, সব সময় নিঝুম হয়ে থাকে–আমি কী যে করব এত সময় নিয়ে আমি কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসি, কিন্তু নিজে নিজে সব তো বুঝি না।

আপনি তো ফরাসি ভাষা জানেন?

সেও খুব সামান্য। চর্চা নেই তো–

আপনি যদি চান, আমি আপনাকে পড়াবার জন্য একজন খুব ভালো লোক ঠিক করে দিতে পারি। আমাদেরই কলেজের একজন প্রফেসার–

উনি মুচকি হেসে বললেন, কেন আপনার বুঝি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না? ছাত্রী হিসেবে আমি বুঝি–

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না, না, সে কথা নয়। আমি আমার অযোগ্যতার কথা ভেবে বলছিলাম!

আমি তো পরীক্ষা পাস করার মাস্টারমশাই চাইনি। এ বাড়ির মেয়েরা বা বউরা অনেকে ওস্তাদজির কাছে গান বা বাজনা শেখে। মাস্টারমশাই রেখে পড়াশুনো করার রেওয়াজ নেই। কিন্তু আমার তো গানের গলা নেই–

আমি বললাম, আপনার গলার আওয়াজ ভারী সুন্দর।

সুন্দর কথাটা উচ্চারণ করতে পেরে আমার বুকটা অনেক হালকা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই আমার বুকের মধ্যে এই শব্দটা বেরিয়ে আসার জন্য আকুলিবিকুলি করছিল। আসলে আমি বলতে চাইছিলাম, আপনার সবকিছুই সুন্দর।

সহজাত আভিজাত্যে উনি এই প্রশংসাবাক্যের কোনও প্রতিবাদ করলেন না। একটুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর বললেন, আপনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেননি, আমার নাম সুদেষ্ণা। আমি বোধহয় আপনার সমবয়সিই হব। সারাদিন কথা বলার মতনও কারোকে পাই না। আপনি আমাকে পড়াতে চান না?

আপনি যদি বলেন–

আজ নিশ্চয়ই আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। কাল আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব? আপনি বিরক্ত হননি তো?

না, না, কী আশ্চর্য!

এই ঘটনাটা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করলাম, তার একমাত্র কারণ, এটা একটা মরীচিৎকার মতন। সব মানুষের জীবনেই নিশ্চয়ই এ রকম দু-একটা দুর্বোধ্য মরীচিকা আসে। এতে জীবনের পরিচিত নিয়মগুলো উলটেপালটে যায়।

তার পরের দিন তো দূরের কথা, ওই বাড়িতে আমি আরও ছ'সাত মাস পড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু আমার ছাত্রের ছোটমা, ওই সুদেষ্ণা দেবীর সঙ্গে আমার আর কোনও দিন কথা হয়নি। উনি আর নেমে আসেননি নীচে, একটা খবরও পাঠাননি। এমন হতেই তো পারে যে অল্পবয়স্ক মাস্টারের কাছে ওঁর পড়াশুনো করার প্রস্তাবটা বাড়ির কারওর মনঃপূত হয়নি। কিন্তু আমাকে একটা খবর দেওয়া কি উচিত ছিল না? তাতে অসুবিধে ছিল? অবশ্য, এর পরে বাড়ির কারওর ব্যবহার আমার প্রতি একটুও পালটায়নি। মাঝে মাঝে আমি আমার ছাত্রের দিকে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে থাকতাম, যদি সে কিছু বলে। বলেনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি।

সুদেষ্ণা দেবীকে আর একদিন মাত্র দূর থেকে দেখেছিলাম বাগানে। আরও কয়েক জন মহিলা ছিলেন সেখানে। স্পষ্ট মনে হল, আমাকে দেখেই যেন উনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন– চলে গেলেন মর্মর মূর্তির আড়ালে।

আমি সেদিন অত্যন্ত আহত ও অপমানিত বোধ করেছিলাম। এ রকম ব্যবহারের মানে কী! একবার আমাকে স্বর্গে তুলে আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া। আমার মনে হল, পৃথিবীর যেখানে যা সৌন্দর্য, সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্য।

৬২. পর পর অনেকগুলো ট্রাম

পর পর অনেকগুলো ট্রাম থেমে আছে সারবন্দি হয়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল ট্রাফিকের গোলযোগ, তারপর একসময় শোনা গেল, ইউনিয়নের একজন নেতাকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে ট্রামকর্মীরা অকস্মাৎ ধর্মঘট ডেকেছে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা চালাতে পারেননি, ডাক্তার বিধান রায়কেও গোড়া থেকেই বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা হচ্ছে নানা রকম। তবু বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি অনেকটা সামলে নিলেন। শক্ত মানুষ হিসেবে তাঁর নাম রটে গেছে। খবরের কাগজগুলিতে প্রায়ই সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর খবর বেরোয়, দেশের এক বিরাট সংখ্যক লোকের ধারণা সুভাষচন্ত ফিরে এলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রায় প্রত্যেক জলসাতেই সমবেত সংগীত শোনা যায়, ‘আজি তুমি কোথা নেতাজি–। ’

সূর্য আর দীপ্তি একটা ট্রামে পাশাপাশি বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বিভোর হয়ে ছিল। অনেকক্ষণ বাইরের দিকে লক্ষ করেনি। একসময় খেয়াল করল, সমস্ত ট্রামে তারা দু’জন ছাড়া আর কেউ নেই।

দীপ্তি বলল, কিছু একটা হয়েছে বোধহয়, চলো নেমে পড়ি।

সূর্য জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিছুই বুঝতে পারল না। অবাকও হল না। হঠাৎ যানবাহন বন্ধ হয়ে যাওয়া এখন আর তেমন বিস্ময়কর কোনও ব্যাপার নয়। সে নির্লিপ্ত ভাবে বলল, গুলিগোলার শব্দ তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

দীপ্তি হাতের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো–

সূর্য বলল, নেমে কী হবে? এ রকম ফাঁকা জায়গা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। একসময়-না-একসময় তো চলবেই!

তা বলে কতক্ষণ এখানে বসে থাকব?

যতক্ষণ কেউ এসে আমাদের নামিয়ে না দেয়? দু'জনে নিরালায় গল্প করার মতন ফাঁকা জায়গা তো কোথাও নেই কলকাতা শহরে!

দীপ্তি হেসে বললেন, সব জায়গাতেই মানুষের চোখ!

আমার তো বেশ ভালো লাগছে। বসুন না।

দীপ্তি আবার বসে পড়লেন। কিন্তু কথাবার্তায় আর মন বসাতে পারলেন না। ট্রাম থেমে থাকার কারণটা জানতে না পারলে অস্বস্তি হয়।

একটু বাদেই ড্রাইভার ও কন্ডাকটররা ফিরে এল। সূর্য আর দীপ্তিকে দেখে প্রায় ধমকের সুরে বলল, আপনারা এখনও বসে আছেন? যান, নেমে যান।

সূর্য লঘু ভাবে বলল, আমাদের টিকিটের পয়সা ফেরত দেবেন না? সেই জন্যই তো বসে আছি।

টিকিট ফেরত হয় না।

একদিন একটা বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেই বাসের কন্ডাকটর কিন্তু আমার টিকিটের পয়সা ফেরত দিয়েছিল।

সে ওইসব সর্দারজিরা যা খুশি করুক, আমাদের কোম্পানি নিয়মকানুনে চলে।

নিয়মকানুনে চললে কি হঠাৎ ট্রাম থামে?

আপনি নামবেন?

সূর্য দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, না। দীপ্তি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, কী হচ্ছে কী? চলো!

সূর্য যেন বেশ একটা মজা পেয়ে গেছে। বলল, দাঁড়ান না। এক্ষুনি নেমে কী হবে? ট্রাম তো আবার চলবে মনে হচ্ছে।

সব ট্রাম এখন ডিপোয় যাবে। প্যাসেঞ্জার নেওয়া হবে না।

আমরাও যদি ডিপোতে যাই?

সূর্য সাধারণত খুব কম কথা বলে। কিন্তু আজ তার মেজাজ বেশ হালকা আছে বলেই এইসব অবান্তর কথাবার্তায় সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে মনে হয়। ট্রামকর্মীরা অবশ্য তার ঠাট্টা খুব একটা উপভোগ করছিল না-একজন তাদের কোম্পানির কয়েকটা নিয়ম পড়ে শোনাতে আরম্ভ করল পর্যন্ত। দীপ্তি আর সূর্য নেমে পড়ল।

সূর্য বলল, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন? এরা এদের কোম্পানি সম্পর্কে খুব গর্বিত, বাসওয়ালাদের ঘৃণা করে।

দীপ্তি বললেন, তা তো হবেই। চারদিকে দেখো না, কেউ এখন বিলিতি কোম্পানিতে চাকরি পাওয়াটাকে বিরাট একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করে! ইংরেজি বলার ঝোঁকও এখন অনেক বেড়ে গেছে।

পরাধীন আমলে জানতাম দেশ কাকে বলে। এখন দেশ কথাটার মানে আর বুঝতে পারি না। আপনি পারেন?

আমার মনের মধ্যে কিন্তু একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। তবে সেটা স্বপ্নের দেশ বলে মনে হয়। কোনও দিনই বোধহয় সেখানে পৌঁছোতে পারব না।

পণ্ডিত নেহরু জেনারেল ইলেকশানের কথা ঘোষণা করেছেন। তখন আবার খুব একচোট দেশ দেশ শোনা যাবে। কমিউনিস্ট পার্টিও পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসি আপাতত মেনে নেবে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ। আমাদের স্কুলের এক টিচারের মুখে শুনলাম হীরেনবাবু দাঁড়াচ্ছেন-তোমাদের পাড়া থেকেই। আচ্ছা সূর্য, তোমার আর এসবে অংশ নিতে ইচ্ছে করে না?

নাঃ!

তা হলে তুমি কী করবে?

কেন, বেশ ভালোই তো আছি।

দীপ্তি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করলেন, সূর্য, তোমার শংকরদাকে মনে আছে?

কোন শংকরদা?

একসময় আমাদের পার্টিতে ছিলেন। মনে নেই? তোমরা যে ডাকাতিতে গিয়েছিলে, উনিও তো সেই দলে-

ও হ্যাঁ। উনি আমাকে কখনও ঠিক পছন্দ করেননি। জেলেও দেখা হয়েছিল।

উনি এখন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। খুব ভালো করছেন শুনেছি। আমাকে বলছিলেন ওঁদের সঙ্গে যোগ দিতে।

না। আপনার যাওয়া হবে না। এখন অন্য কারওর কথা থাক।

দীপ্তি মুখ তুলে তাকালেন সূর্যর দিকে। সূর্য অপলক ভাবে চেয়ে আছে।

দীপ্তি সে-দিকে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলেন না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লাজুক গলায় বললেন, এ ভাবে আর কতদিন চলবে?

সূর্য বলল, যতদিন না আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন!

মেঘলা মেঘলা বিকেল, বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, একটি চমৎকার দিন। সূর্য আর দীপ্তি হাঁটছে চৌরঙ্গি দিয়ে। আজ আর গাড়িঘোড়া পাবার আশা নেই। সূর্য দীপ্তির তুলনায় অনেকখানি লম্বা। দীপ্তি কখনও রঙিন শাড়ি পরা কিংবা সাজগোজ পছন্দ করেন না–তবু তাকে তার বয়সের তুলনায় কমবয়সি মনে হয়। অবশ্য সূর্যর সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য বোঝা যাবেই।

সূর্য বলল, চলুন, ময়দানে গিয়ে একটু বসবেন?

তুমি যে বলছিলে, তোমার খিদে পেয়েছে? বাড়ি চলো বরং, তোমাকে খাওয়াচ্ছি।

এখন আর খিদে নেই।

দীপ্তি ময়দানের দিকে তাকালেন। এখানে সেখানে ঝোঁপঝাড়। অসময়েই অন্ধকার হয়ে এসেছে। অশ্বারোহী আউটরামের মূর্তিটা ঝাঁপসা দেখা যায়।

একটু চিন্তিত ভাবে দীপ্তি বললেন, জায়গাটা ভালো নয় শুনেছি। সাহেব-মেমরা আসা বন্ধ করায় গুন্ডাদের খুব উপদ্রব বেড়েছে। সে-দিনই কার কাছে শুনলাম, সন্ধেবেলাতেই এই মাঠের মধ্যে একটি মেয়েকে কারা খুন করেছে।

সূর্য বলল, তাই নাকি?

দীপ্তি হঠাৎ হেসে বললেন, অবশ্য তুমি পাশে থাকলে আমার কোনও ভয় নেই।

সূর্যও হেসে আলতো ভাবে দীপ্তির পিঠে হাত ছুঁইয়ে বলল, তা হলে চলুন।

তুমি কি আমাকে আপনি বলা কিছুতেই ছাড়বে না?

এমন অভ্যেস হয়ে গেছে।

আজ থেকেই শুরু করো।

চেষ্টা করব।

হঠাৎ দীপ্তি সূর্যর পাশ থেকে সরে গিয়ে দ্রুত ট্রাম লাইন পার হয়ে যেতে লাগলেন একা। সূর্য ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। দ্রুত পা চালিয়ে এসে বলল, কী হল?

দীপ্তি চকিতে একবার পেছনে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, তুমি এখন আমার সঙ্গে এসো না। আমি পুকুরটার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

কেন?

যা বলছি শোনো না–

সূর্য মন্থর ভাবে হাঁটতে হাঁটতে বিস্মিত ভাবে কয়েক বার পেছন ফিরে তাকাল। অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল না। শুধু একজন প্রৌঢ় লোক অপস্রিয়মান দীপ্তির দিকে কৌতূহলী সরু চোখে তাকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। প্রৌঢ়টির কাঁধে মুগার চাদর, একটি সাত-আট বছরের মেয়ের হাত ধরে আছেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন এ-দিকে।

পুকুরের পাশে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীপ্তি রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। সূর্য সেখানে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হল?

কিছু না।

তবে হঠাৎ ও রকম ভাবে চলে এলেন যে? কী হল, আমাকে বলবেন না?

কিছুই হয়নি। চলো, এখান থেকে অন্য কোথাও যাই।

আপনি কারোকে দেখে যেন পালিয়ে এলেন মনে হল! কে?

দীপ্তির মুখখানা আরক্ত, হঠাৎ কোনও কথা বলতে পারছেন না। তারপর মৃদু গলায় বললেন, ওখানে আমার বড় জামাইবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন।

আপনার জামাইবাবু? আপনি কথা বললেন না?

আমার লজ্জা করল!

কেন? আমি সঙ্গে রয়েছি বলে?

দীপ্তি সূর্যর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। একথা অবধারিত ভাবে সূর্যর মনে। এল যে মাত্র দু'-এক মিনিট আগেই দীপ্তি বলেছিলেন যে সূর্য পাশে থাকলে তার কোনও ভয় নেই। তার ঠিক পরেই সূর্য পাশে থাকার জন্যই তিনি নিজের জামাইবাবুর সঙ্গেও কথা বলতে পারলেন না।

সূর্য একটু থমকে গেল। ভুরু কুঁচকে বলল, আমি পাশে থাকলে কথা বলায় দোষ কী?

তুমি বুঝতে পারো না?

কী বুঝব?

দীপ্তি নিজেকে চাপতে পারলেন না। বেশ অভিমান আর ঝাঁঝ মিশিয়ে জোরে জোরে বললেন, তুমি কিছুই বুঝতে পারো না? গত দু'বছর ধরে আমি কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করি না, কারওর সঙ্গে মিশি না, আমি যে কী করেছি, তা আমি নিজেই জানি না। সূর্য, তুমি আমার এ কী করলে?

সূর্যর মনে হল, আকাশটাতে নোংরা কালি ঢালা। বাতাসে বিষ।

দীপ্তি আবার বললেন, আমার দিদিরা আমাকে চিঠি লেখেন–আমি কারোকে উত্তর দিই না। জামাইবাবু আমাকে এত ভালোবাসতেন, ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেও কথা বলতে পারলাম না। দিদির মেয়ে ঝুনু সঙ্গে ছিল, ও যদি আমাকে দেখে থাকে–কী ভাবল বলো তো?

সূর্য কর্কশ ভাবে বলল, আমরা কি কোনও অপরাধ করেছি? কী অপরাধ?

আমরা বনেজঙ্গলে বাস করি না। আমরা বাস করি সভ্য সমাজে। সেখানে থেকে আমরা অদ্ভুত একটা অসামাজিক কাজ করছি না? তুমি আমার ছোট ভাইয়ের বয়সি, আমরা দু'জনে যে ভাবে আছি–

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সূর্য বলল, এসব সমাজ টমাজ আমি গ্রাহ্য করি না।

তুমি গ্রাহ্য না করলেও আমি কি সবকিছু এড়াতে পারি? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে কি বাদ দিয়ে বাঁচা যায়? সূর্য, আমি তোমাকে কোনও দোষ দিচ্ছি না। আমি নিজেই তো কী রকম হয়ে গেছি। তোমাকে বাধা দেবার শক্তিও আমার নেই। আমি এখন কী করব বলো তো?

দীপ্তিদি, আপনি একটা কথার শুধু জবাব দিন। আমরা কি আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছেমতন বাঁচব, না নিজেদের ইচ্ছেমতন বাঁচব? আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমি আপনাকে চাই।

এতে অন্য কার কী বলার আছে? আমার চেয়ে আপনার বেশি আত্মীয় কে? বেশি বন্ধু কে?

কিন্তু ওই যে বললাম, এটা তো জঙ্গল নয়। এখানে অনেক মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে বাঁচতে হয়-সেই জন্যই এর নাম সমাজ।

চুলোয় যাক সমাজ। এ-পৃথিবীতে এক লক্ষ মানুষ মিলে আপনাকে যতখানি ভালোবাসতে পারে, আমি তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি আপনাকে। আমি কারওর বাধা মানব না।

রাগ কোরো না। লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না। তোমার রাগ কী সাংঘাতিক আমি জানি। তোমার রক্ত গরম, তুমি রাগের মাথায় ভাবো যে গোটা পৃথিবীটাই তুমি উলটেপালটে তছনছ করে দিতে পারো! কিন্তু তা তো হয় না!

ঠিক আছে, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। তাতে তো কারওর আপত্তি থাকতে পারে না।

তা হয় না।

কেন হয় না? পৃথিবীতে কি বয়সের তফাত থাকা সত্ত্বেও কারওর বিয়ে হয় না? দেয়ার আর প্লেন্টি অব ইনস্টানসেস–

তুমি একটু মাথা ঠান্ডা করবে?

আমি অন্যায় কিছু বলছি? আমি যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, তাতে কারওর কোনও আপত্তি থাকতে পারে কি?

যদি আমার থাকে?

আপনার?

হঠাৎ সূর্যর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। একথাটা সে চিন্তাই করেনি। সে একরোখা ধরনের ছেলে, একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকের কথা চিন্তা করতে পারে না। সে ভেবেছিল লোকলজ্জাই যখন বাধা, তখন তার উপযুক্ত ব্যবস্থার নাম বিয়ে। কিন্তু দীপ্তির দিক থেকেও যদি বাধা থাকে–

আহত ভাবে সে বলল, আপনি আমাকে চান না?

দীপ্তি সূর্যর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি! শোনো, আমি সে কথা বলিনি। তোমাকে ছাড়া আমি এখন বেঁচে থাকার কথা ভাবতেই পারি না। ছি ছি ছি, আজ আমি কী বোকার মতন ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। জামাইবাবুকে দেখে আজ আমার মনের মধ্যে এমন একটা গোলমাল হয়ে গেল–আমি যখন বাচ্চা মেয়ে তখন থেকে জামাইবাবু আমাদের...উনি ঠিক আমাদের বড় ভাইয়ের মতন...দিদির মেয়ে ঝুনুকে আমি এত ভালোবাসি–আজ ওকে দেখেও একটু আদর করলাম না, পালিয়ে এলাম–ঠিক যেন কলঙ্কিনীর মতন মুখ ঢেকে পালিয়ে এলাম হঠাৎ মনে হল, আমি কী হয়ে গেছি!

পালিয়ে এলেন কেন?

এটা তো যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়। মনের মধ্যে যা হয়, তা কি আগে থেকে ঠিক করা থাকে? গুরুজনদের সামনে আজকাল আমি চোখ তুলে চাইতেই পারি না। জামাইবাবু যদি বলতেন, ছি ছি, তুমি এ কী করলে? তখন আমি কী উত্তর দিতাম? উনি যদি তোমাকেও অপমান করে কিছু বলতেন? উনি সে রকম মানুষই নন, হয়তো কিছু বলতেন না–

আপনি লোকের কাছে আমার পরিচয় দিতে লজ্জা পান কেন?

এ-পরিচয় দেওয়া যায় না।

তা হলে একটা সোজা কথা বলুন। আমাকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি আছে?

এসব কথা কি এই রকম ভাবে আলোচনা করা যায়? তুমি যে বসবে বলেছিলে? চলো কোথাও বসি।

না, আগে এটা ঠিক হয়ে যাক।

এখনও তোমার রাগ কমেনি? আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব?

আমার বাবা আমার কোনও বিষয়ে আপত্তি করেন না। বাবাকে আমি আজই জানাব। আমার দিক থেকে কোনও অসুবিধে নেই। আপনি আপনার দিকটা ভালো করে ভেবে দেখুন। তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

দীপ্তি ব্যাকুল ভাবে বললেন, আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমাকে এক্ষুনি কিছু ভাবতে বোলো না। তুমি অত রাগ রাগ চোখে তাকিয়ো না আমার দিকে।

সূর্য মুখ নিচু করে বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, দীপ্তিদি, আমার আর কেউ নেই। আমি অন, কছুই জানি না, অন্য কিছুই আমার এখন ভালো লাগে না। আপনি আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।

৬৩. বাদল বাইরের ঘরে

বাদল বাইরের ঘরে তার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। আজ সারা দুপুর বৃষ্টি হয়েছে, এখন একটু থামলেও আকাশ মেঘলা অন্ধকার। আজ আর বিকেল হল না, দুপুরের পরই সন্ধ্যা। এই বৃষ্টির মধ্যেই এসে হাজির হয়েছে পঙ্কজ, ভাস্কর আর বিষ্ণু।

বিষ্ণু শিগগিরই বিলেত যাচ্ছে, অক্সফোর্ডে ভরতি হবার সুযোগ পেয়েছে। তারপর ব্যারিস্টারিও পাস করে আসবে। বিষ্ণু পড়াশুনোতে বরাবরই ভালো, কলেজে ঢোকার পর

একেবারে বইয়ের পোকা হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় তার যে শখ ছিল আবিষ্কারক হওয়ার–সেসব ঘুচে গেছে কবেই, এখন সে ছাপার অক্ষরের মধ্যে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে। ভাস্কর চেষ্টা করছে খড়্গপুরের আই আই টি-তে ভরতি হওয়ার–পঙ্কজই শুধু বাদলের সঙ্গে এম এ পড়বে। বি এর রেজাল্ট এখনও বেরোয়নি।

বন্ধুরা এখন অনেকটা বিচ্ছিন্ন–এই রকম ছুটিছাটার দিনেই আজ্ঞার টানে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। বাদল আর ভাস্করের হাতে সিগারেট জ্বলছিল, এই সময় বড়বাবু বাইরে থেকে ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা জ্বলন্ত সিগারেট দুটো ছুঁড়ে দিল সোফার নীচে।

বড়বাবুর মুখখানা পরিশ্রান্ত ও বিষণ্ণ। কিছু দিন ধরেই তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তবু এই ঝড়-বাদলার দিনেও তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। প্রত্যেক দিন বিকেলবেলা বাগবাজারের অনাথ আশ্রমটিতে তার যাওয়া চাই। অনাথ আশ্রমের একটি ছেলে এবছর স্কলারশিপ পেয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হয়েছে, এ-নিয়ে বড়বাবুর কী গর্ব! কত লোককে যে শুনিয়েছেন একথাটা–তার ঠিক নেই। যেন ছেলেটি তার নিজের হাতের সৃষ্টি।

বড়বাবু বললেন, বাদল, তোর কাছে খুচরো পয়সা আছে? রিকশাওয়ালাকে পাঁচ আনা পয়সা দিতে হবে–

চার বন্ধুই পকেটে হাত দিল। এদিকে সোফার তলা থেকে জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া উঠে আসছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, ওরা দারুণ সন্ত্রস্ত। বাদল পয়সা দিতে বেরিয়ে গেল। বড়বাবু প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী? রেজাল্ট বেরোচ্ছে কবে?

ভাস্কর বলল, এই তো, জুনের সেকেন্ড উইকেই–

বড়বাবু একটু দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে টুকিটাকি দু-একটা কথা বলে ভেতরে চলে গেলেন। সূর্যর কোনও বন্ধু কোনও দিন এ বাড়িতে আসে না। বাদলের বন্ধুদের তিনি চেনেন।

বাদল ফিরে আসার পর ভাস্কর বলল, উঃ, তোর পিসেমশাইকে দেখলেই কী রকম ভয় ভয় করে রে!

বাদল বলল, কেন? বড়বাবু তো কোনও দিন বকুনি টকুনি দেন না!

পঙ্কজ বলল, তা দেন না বটে! কিন্তু এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যে সামনে দাঁড়ালেই কী রকম যেন কুঁকড়ে যেতে হয়।

ভাস্কর বলল, ওঁর চেহারা কিংবা ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় বনেদি লোক।

বাদল বলল, বড়বাবু কিন্তু মোটেই বনেদি বাড়ির ছেলে নন। ওঁর লাইফ হিস্ট্রিটা যদি শুনিস, দারুণ ইন্টারেস্টিং! উনি নিজের বাবা-মা-কে কখনও চোখেও দেখেননি, অনাথ ছেলে যাকে বলে–সারা জীবন স্ট্রাগল করে–

ভাস্কর বলল, তুই বড়বাবুর লাইফ হিস্ট্রিটা লিখে ফ্যাল না!

আমি কী করে লিখব! আমি নিজেও তো সব ঘটনা জানি না–মার মুখে যেটুকু শুনেছি–বড়বাবুকে তো সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না সবচেয়ে ভালো হত, উনি নিজে যদি একটা অটোবায়োগ্রাফি লিখতেন–

ওঁর কি লেখাটেখার হ্যাবিট আছে?

মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখেন। ইচ্ছে আছে একদিন লুকিয়ে পড়ে ফেলব–এখনও চান্স পাইনি।

বিষ্ণুর পছন্দ হল না এই কথাটা। সে একটু দুঃখিত ভাবে তাকাল বাদলের দিকে। বিষ্ণুকে আরও দুঃখিত করে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল–হ্যাঁ রে, সূর্যদার মা নাকি বাইজি ছিল?

এই প্রশ্নে বাদল হঠাৎ একটু রেগে উঠে বলল, তোকে কে বলেছে?

এসব কথা বেশি দিন চাপা থাকে না।

যদি তা সত্যিও হয়, তাতে কী আসে যায়?

সে কথা কি আমি বলেছি? আমি জিজ্ঞেস করছি, সত্যি কি না!

সূর্যদার মা একজন আর্টিস্ট ছিলেন।

বড়বাবু তাকে বিয়ে করেছিলেন? না এমনিই–

বিষ্ণু বলল, ছিঃ, এসব কী হচ্ছে কী? এই ভাস্কর, চুপ করবি?

বাদলের মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। তার সূর্যদা সম্পর্কে সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সূর্য সম্পর্কে কেউ সামান্য অপমানজনক ইঙ্গিত করলেই সে দারুণ রেগে যায়। চড়া গলায় বলল, আমি লক্ষ করছি, ভাস্করটা আজকাল সব সময় খারাপ কথা বলতে ভালোবাসে।

ভাস্কর রীতিমতন অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল, যা বাবা! আমি কী করলাম? যা শুনেছি, সেটাই সত্যি কিনা জিজ্ঞেস করছি।

তোর অত সত্যি-মিথ্যে নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার?

ভাস্কর কারওর বকুনি সহ্য করার পাত্র নয়। যখন সে দেখল, অন্য তিন বন্ধু তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, তখন সে রুখে দাঁড়াল। বিদ্রুপের ভঙ্গি করে বলল, যা, যা, ন্যাকামি করিস না! যা ট্রুথ, তা গোপন করে লাভ কী? এ কথা আজ সবাই জানে যে সূযদার জন্মের ঠিক নেই বলেই এই রকম সব যা-তা কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে।

কী যা-তা কাণ্ড করছে?

দীপ্তি সরকারের সঙ্গে কী স্ক্যান্ডাল করছে তোরা শুনিসনি? আমার ছোড়দা বলছিল, সূর্যদাকে আগে যারা চিনত–তারা কেউ ওর সঙ্গে দেখা হলেও আজকাল কথা বলে না।

বাদল দৃপ্ত গলায় বলল, তার কারণ পৃথিবীতে বেশির ভাগই বোকা লোক। তারা কথা না বললেও সূর্যদার কিছু যায় আসে না। কারোকে ভালোবাসা কোনও পাপ নয়।

এর নাম ভালোবাসা?

নিশ্চয়ই! তুই ভালোবাসার কী বুঝিস?

ভাস্কর বাঁকা ভাবে বাদলকে বলল, তুই এর মধ্যেই ভালোবাসার অনেক কিছুই বুঝে গেছিস দেখছি! তাই আজকাল সব সময় তোর উড়ু উড়ু ভাব।

দ্যাখ ভাস্কর, আমি সূর্যদা সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা শুনতে চাই না। তুইও তো একসময় সূর্যদার দারুণ ভক্ত ছিলি–

সেই সূর্যদা আর এখনকার সূর্যদা এক নয়। আই ফিল সরি ফর হিম। কত সম্ভাবনা ছিল–শুধু শুধু একটা মেয়ের জন্য–

বিষ্ণু বলল, সূর্যদাকে দেখলে আমার কেন জানি না ওয়েদারিং হাইটস-এর হিথক্লিফ-এর কথা খুব মনে পড়ে। সূর্যদা যেন একটা প্রতিশোধ নিতে চাইছে–

কীসের প্রতিশোধ?

তা আমি জানি না।

পঙ্কজ বলল, ভাস্কর, তুই কী বলতে চাস, ঠিক খুলে বল তো!

ভাস্কর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে শান্ত মেজাজে বলল, আসলে ব্যাপার কী জানিস, আমরা সবাই সূর্যদাকে হিংসে করি। যে-লোক সমাজের কোনও নিয়ম মানে না, যা খুশি তাই করে–আমরা তাকে নিন্দে করি। আমরাও কিন্তু মনে মনে ওই রকমই হতে চাই আমাদের সাহস নেই।

বাদল বলল, সাহসের প্রশ্ন নয়। একলা একা নিয়ম ভাঙাই বড় কথা নয়। এই সমাজের নিয়মগুলোই পালটানো দরকার।

পঙ্কজ বলল, অষ্টম এডোয়ার্ড একটা মেয়ের জন্য ইংলন্ডের সিংহাসন ছেড়েই চলে গেল।

ভাস্কর হাসতে হাসতে বলল, আমার সিংহাসন নেই, তাই ছাড়ার কোশ্চেনই ওঠে না। তা ছাড়া শালা, এ- পর্যন্ত সে রকম কোনও মেয়েরই দেখা পেলাম না।

বাদল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাকি তিন জন কথা বলতে বলতে চলে গেল প্রসঙ্গান্তরে।

.

একটু বাদেই আড্ডা ভাঙল। বিষ্ণুকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। বাদলও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল একটুখানি এগিয়ে দিয়ে আসতে।

মোড়ের মাথায় এসে আবার আড্ডা। এক একটা বাস এসে চলে যাচ্ছে, তবু ওরা বিষ্ণুকে উঠতে দিচ্ছে না। আর একটু দাঁড়া, আর একটু দাঁড়া! গাড়িবারান্দাটার নীচে একটা লোক খুব চমৎকার আলুর বড়া আর বেগুনি ভাজে-তাই কিনে খাওয়া হল। এবার একটু চা খেলে কেমন হয়?

বিষ্ণু হাসতে হাসতে বলল, এলগিন রোড থেকে আমার মাসিমারা আসবেন। মা-কে বলে এসেছি ছ'টার সময় বাড়ি ফিরব! এখন সাড়ে সাতটা বাজে যে রে!

ভাস্কর বলল, ধুৎ! তুই ক'দিন বাদেই লন্ডন চলে যাবি-তারপর তোর সঙ্গে কবে আবার দেখা হয় কি না হয়!

কেন দেখা হবে না? আমি কি সারা জীবন থাকব নাকি?

কী জানি ভাই! দেখছি তো, যে যায়, সে আর ফেরার নামটি করে না।

আমি ফিরবই!

তা হলে যাচ্ছিস কেন? এ-দেশে কি পড়াশুনো হয় না?

চার-পাঁচ বছরের বেশি থাকব না, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

পঙ্কজ বলল, চল, আমরা সবাই মিলে বিলেত যাই! একটা নৌকো ভাড়া করে–

বাদল বলল, সে রকম ভাবে যদি যেতেই হয়, তা হলে বিলেত কেন, তাহিতি দ্বীপে যাব–

বন্ধুদের বাসে তুলে দিয়ে বাদল বাড়ির দিকে ফিরে আসছে–এমন সময় তাদের বাড়ির চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, ছোড়দাবাবু, শিগগির আসুন। আপনাকে সবাই খুঁজছেন।

কেন রে, কী হয়েছে?

বড়বাবু সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন। অজ্ঞান হয়ে আছেন।

বাদল তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে তাকাল। বাসটা অনেক দূর চলে গেছে, বন্ধুদের আর ফেরাবার উপায় নেই। যে-কোনও উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতেই বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। বাড়িতে এই বিপদ-বন্ধুরা থাকলে অনেক সাহায্য করতে পারত-বিশেষত ভাস্কর সব ব্যাপারে এত এক্সপার্ট..

তার পরেই বাদল দৌড়োল বাড়ির দিকে।

বড়বাবুকে শোওয়ানো হয়েছে সূর্যর ঘরে খাটের ওপর। দু চোখ বোজা। কপালে ঘাম। চিররঞ্জন তার নাকের সামনে ধরে আছেন স্মেলিং সল্টের শিশি, হিমানী হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছেন।

বাদল ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

চিররঞ্জনের মুখখানা ফ্যাকাশে রক্তশূন্য। তিনি দূর্বল স্নায়ুর মানুষ, কোনও রকম বিপদের সম্মুখীন হলে তার মাথা আরও গুলিয়ে যায়। কম্পিত গলায় বললেন, ডাক্তার ডাক। শিগগির–

বাদল খুব একটা বিচলিত বোধ করল না। বড়বাবুর হাত-পা কিছুই কাটেনি, শরীরের কোনও জায়গা থেকে রক্তপাত হয়নি, তা হলে বিশেষ কিছু না–আচমকা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সে বলল, কী হয়েছে? সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন? মাথায় জল দাও–

চিররঞ্জন বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে বললেন, না না, এমনি এমনি পড়ে যাননি। আমি নিজের চোখে দেখলাম বড়বাবু তিনতলা থেকে নেমে আসছিলেন...আমি তখন বারান্দায়-উনি হঠাৎ থেমে পড়লেন, হাত তুলে আমায় ডাকলেন, চিরু চিরু–আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছি–এই সময় পড়ে গেলেন ঝুপ করে, তারপর গড়াতে গড়াতে–

হিমানী বললেন, এখনও জ্ঞান ফিরছে না–তুই শিগগির যা, অপূর্ব ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়–

বড়বাবু যদি রাগ করেন পরে?

তুই যা তো! শুধু শুধু দেরি করছিস–

বড়বাবু সাধারণত ডাক্তারদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন। তিনি সারা জীবনে খুব কম ওষুধ খেয়েছেন। ছোটখাটো অসুখ হলে তিনি নিজেই নিজের চিকিৎসা করেন। তাঁর ধারণা, যখন তখন ওষুধ খাওয়া মানেই শরীরের একটু ক্ষতি করা। বাদল সেই কথাই ভাবছিল–হঠাৎ বড়বাবুর বুক থেকে একটা অস্বাভাবিক ঘরঘর শব্দ হতেই সে ভয় পেয়ে গেল। বড়বাবুকে এ রকম অসহায় অবস্থায় তো সে কখনও দেখেনি। সে ছুটে বেরিয়ে গেল ডাক্তার ডাকতে।

সন্ধ্যার সময় অপূর্ব ডাক্তারের চেম্বারে বেশ ভিড় থাকে। বাদল সরাসরি ভিড় ঠেলে তার সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, এক্ষুনি আসুন!

ডাক্তারবাবু মুখ তুলে বললেন, কী হয়েছে কী?

বাদলের অত কথা বুঝিয়ে বলার সময় নেই। সে ততক্ষণে ডাক্তারের ব্যাগ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বলল, অন্যদের একটু বসতে বলুন, আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

আরে কী হয়েছে বলো না! অত ব্যস্ত হলে কি হয়?

আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। আপনাকে এবার জোর করে টেনে নিয়ে যাব। কিন্তু। বড়বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

বড়বাবু!

অপূর্ব ডাক্তার আর দ্বিরুক্তি করলেন না, উঠে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়বাবুকে এ-পাড়ার অনেকেই চেনে এবং মান্য করে। বাদল অপূর্ব ডাক্তারকেও প্রায় দৌড় করিয়েই নিয়ে এল বাড়িতে।

হিমানী ততক্ষণে বুদ্ধি করে বড়বাবুর পায়ের তলায় গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন। ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে গম্ভীর ভাবে বললেন, হাসপাতালে পাঠাতে হবে, এখানে চিকিৎসা করা যাবে না।

কী হয়েছে কী?

এখন বলা শক্ত। হার্ট কিংবা ব্রেনে-অনেক কিছু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠান-আমি সঙ্গে যাব-

হাসপাতালে পাঠাতেই হবে? এখানে কিছু হবে না?

চিররঞ্জন তাকালেন স্ত্রীর দিকে। তিনি নিজে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। হাসপাতালের নাম শুনলেই মনে হয়, সেখান থেকে আর কেউ ফেরে না। হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারটা বড়বাবু নিজে কি পছন্দ করবেন? নিজের জীবনের ব্যাপারে বড়বাবু কখনও কারওর পরামর্শ নেননি, নিজেই সব ঠিক করেছেন হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার। পর তিনি যদি চিররঞ্জনকে ভর্ৎসনা করে বসেন, তুমি শেষকালে আমায় হাসপাতালে ঠেলে দিলে?

চিররঞ্জন বিভ্রান্তের মতন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, সূয্যি কোথায়? এই বাদল, দেখ না, সূয্যিকে পাস কিনা কোথাও!

সূর্য বাড়ি নেই। সুতরাং তাকে এখন কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে! চিররঞ্জন ভাবছিলেন, সূর্য যদি নিজের বাবার চিকিৎসার উপায় ঠিক করে, তা হলে তার আর কোনও দায়িত্ব থাকে না।

হিমানী বললেন, হাসপাতালে কেন! বাড়িতে যন্ত্রপাতি আনা যায় না?

অপূর্ব ডাক্তার বললেন, আমি সে দায়িত্ব নিতে পারি না। অবস্থা খুব ভালো মনে হচ্ছে না।

চিররঞ্জন ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, এখনকার মতন একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। কোনও মতে যদি একবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায় বুঝলেন না, ওঁর মত না নিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে...

অপূর্ব ডাক্তার ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বার করতে করতে বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু...

ইঞ্জেকশন শেষ করে তিনি আবার বললেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফেরার কথা। আমি এখন একটু যাচ্ছি, জ্ঞান ফিরলেই আমাকে আবার খবর দেবেন।

আধ ঘণ্টার আগেই বড়বাবুর জ্ঞান ফিরল। খুব ক্লান্ত ভাবে চোখ খুললেন। চিররঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝুঁকিয়ে বললেন, বড়বাবু, বড়বাবু

বড়বাবু শুধু তাকিয়ে রইলেন, কোনও কথা বললেন না।

এখন কেমন আছেন?

বড়বাবু শুধু বললেন, চিরু–

কষ্ট হচ্ছে? কোথায়?

বড়বাবু আর কোনও উত্তর দিলেন না। একটা হাত উঁচু করার চেষ্টা করলেন, সেটা আবার ধপাস করে পড়ে গেল।

চিররঞ্জন আবার ব্যগ্র ভাবে বললেন, ডাক্তার এসেছিল, বলছিল, হাসপাতালে গেলে চিকিৎসার সুবিধে হবে–

বড়বাবু যেন এ কথাটা বুঝতেই পারলেন না। ক্লিষ্ট ভঙ্গি করে পাশ ফিরে আবার চোখ বুজলেন।

ডাক্তারবাবু আবার এলেন একটু পরেই। তিনিও বড়বাবুকে অনেক বার জিজ্ঞেস করলেন হাসপাতালের কথাটা। কোনও উত্তর পেলেন না। তখন আবার ইঞ্জেকশন ও ওষুধ দিয়ে বললেন, আজকের রাতটা অন্তত দেখা যাক। কাল সকালে যা হয় ঠিক করা যাবে। ভয়ের কিছু নেই।

তবু যাবার সময় তিনি চিররঞ্জনকে আলাদা করে ডেকে বললেন, রাত্তিরে যদি খারাপ কিছু হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবেন, যত রাত্তিরই হোক–

ডাক্তারের মুখে চিন্তার ছাপ দেখলে বাড়ির লোকের বুক কাঁপে।

রাত সাড়ে নটা বাজে, সূর্য তখনও ফেরেনি। কোনও কোনও রাত্রে সূর্য বাড়ি ফেরে না, আজও যদি সে রকম হয়? এই কথা ভেবে বাদল অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছে। একসময় সে বলল, বাবা, আমি সূর্যদাকে একটু খুঁজে আসব?

দীপ্তিদির বাড়ি বাদল একবার দেখেছিল দূর থেকে, সেখানে যেতে তার একটু একটু লজ্জা করছে। কিন্তু ওখানে ছাড়া সূর্যর খোঁজ করবে আর কোথায়?

একতলার অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে বাদল উঠে এল দোতলায়। ঘরের দরজা ভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজায় কলিং বেল নেই। আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে আওয়াজ করল বাদল।

দীপ্তি দরজার এক পাল্লা খুলে বললেন, কে?

দরজার ফাঁক দিয়ে বাদল দেখল একটা চেয়ারে সূর্য বসে আছে মুখ গোঁজ করে। ঠিক অভিমানী শিশুর মতন তার বসে থাকার ভঙ্গি। দরজা খোলার পরেও সে মুখ তোলেনি।

দীপ্তি আগে কয়েক বার দেখেছেন বাদলকে। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরে বললেন, বাদল না? কী ব্যাপার!

সূর্য এবার মুখ তুলল। বাদল ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, সূর্যদা, তোমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে।

সূর্যর মধ্যে একটুও চঞ্চলতা দেখা গেল না। সে বলল, এত রাত্তিরে এসেছিস কেন? কী হয়েছে?

বড়বাবুর খুব অসুখ।

দীপ্তি উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন, কী হয়েছে কী? বাদল, তোমার মুখ এত শুকনো কেন?

বাদল বলল, সূর্যদা, তাড়াতাড়ি চলো। বড়বাবু সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন, অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন–

আমাকে ডাকতে বললেন?

কোনও কথা বলতে পারছেন না।

দীপ্তি তাড়া দিয়ে বললেন, সূর্য, তুমি এক্ষুনি চলে যাও।

সূর্য মন্থর ভাবে উঠে দাঁড়াল। তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ার কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে বাদলকে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার এসেছিল?

ডাক্তারবাবু বললেন, ওঁকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার–

দীপ্তি বললেন, সূর্য, আর দেরি কোরো না তা হলে–

সূর্য বলল, যাচ্ছি। বাদল, তুই নীচে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাক তো–আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।

বাদল বেরিয়ে যাবার পর সূর্য গম্ভীর ভাবে বলল, দীপ্তিদি, চট করে তোমার দু-একটা জামাকাপড় গুছিয়ে নাও–তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে।

আমি?

হ্যাঁ। বাবার অসুখ যদি গুরুতর হয়, তা হলে আমি কদিন আসতে পারব না। তুমি ওখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবে।

তা হয় নাকি? পাগল হয়েছ?

নিশ্চয়ই হয়!

দীপ্তি এগিয়ে এসে সূর্যর বাহু ছুঁয়ে মিনতি করে বলল, এখন এ রকম পাগলামি কোরো না। তাড়াতাড়ি চলে যাও–আমি কাল সকালেই একবার খবর নেব

সূর্য বলল, আমি অন্য কিছুর জন্য বলছি না। আমি এখানে না এলেই অন্য লোকেরা তোমাকে আজেবাজে কথা শোনাতে আসবে।

তাতে আমার কিছু হবে না। একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার সঙ্গে না গেলেও, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি। তুমি যেখানেই যাও, আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি চোখ বুজলেই দেখতে পাবে, আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

সূর্যর মনে হল, এই কথাটা সে যেন আগে কোথাও শুনেছে। জেলে থাকার সময় শ্রীলেখা চিঠিতে এই রকমই কিছু লিখেছিল।

সে বলল, চোখ বুজে নয়, চোখ খুলেই আমি তোমাকে সব সময় দেখতে চাই আমার কাছাকাছি। কাল সকালে তুমি ঠিক আসবে তো?

আসব।

সূর্য আর কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল। বাদল ততক্ষণে ট্যাক্সি ডেকে ফেলেছে।

সূর্যকে এত সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্যই বাদল আরও বেশি উত্তেজিত বোধ করছে।

খোঁজাখুঁজির জন্য সময় নষ্ট হলে সে-কথা মনে পড়ত না, এখন মনে পড়ছে সেই কথা–খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি তো! যদি এর মধ্যেই–

মাড়োয়ারিদের বিয়ের একটা আলো-বাজনার বিরাট জুলুস বেরিয়েছে বলে ট্যাক্সিটা আটকে পড়েছে। বাদল চেঁচিয়ে বলল, আঃ, এদের জ্বালায় আর পারা গেল না। সর্দারজি, আপ ডাইনে ঘুমাকে জলদি চালাইয়ে, বহুত জলদি!

সূর্য বাদলের পিঠে হাত দিয়ে বলল, তুই এত চঞ্চল হচ্ছিস কেন?

একটানা আট দিন বড়বাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। ঘুম ও জাগরণের মাঝখানের একটা অবস্থা। কখনও তিনি তাকিয়ে থাকেন তোকজনের মুখের দিকে, কেউ কথা বললে শুনতে পান-ও মনে হয়, কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারেন না। আবার এক এক সময় নিজে থেকেই একটা-দুটো কথা বলে ওঠেন-সেসব কথার মর্মোদ্ধার করাও সহজ নয়।

ধন্বন্তরি হিসেবে বিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সদ্য প্র্যাকটিস করা বন্ধ করেছেন, বাড়িতে শুধু সকালে এক ঘণ্টা বিনা পয়সায় রোগী দেখেন। মন্দাকিনীর ছেলে সুরেশ্বরের সঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের পরিচয় আছে। সুরেশ্বর বিশেষ চেষ্টা করলেন তাকে আনবার জন্য। কিন্তু ডাঃ রায় অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য বাড়িতে আসতে পারলেন না, চেম্বারে আনতে বললেন। সেখানে বড়বাবুকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই এখন ওঠে না, তাই ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনকে কল দেওয়া হল।

বাড়িতে সব সময় লোকজনের ভিড়। নানা সূত্রে বড়বাবুকে অনেকেই চেনে। খবর পেয়ে সবাই ভিড় করে আসছে। সকলেই একবার অন্তত রোগীর কাছে গিয়ে জানাতে চায়, আমি এসেছি, আমাকে চিনতে পারছেন তো? ভিড় সামলানোই মুশকিল। সূর্য একদিন এক বারও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। বাদলও সব সময় তার সঙ্গেই থাকে। বাড়িতে একটা থমথমে ভাব। সকলেই বড়বাবুর ঘরের মধ্যে বা কাছাকাছি থাকে সব সময়। দু'জন নার্স রাখা হয়েছে দিনে ও রাত্রে পালা করে থাকার জন্য, পাড়ার ডাক্তার প্রত্যেক দিন তিন-চার বার করে আসেন।

নবম দিন দুপুরের দিকে বড়বাবু চোখ খুলে দু'বার বললেন, মা, মা-

চিররঞ্জন বারান্দায় ছিলেন, ছুটে এলেন। বড়বাবু অনেকটা পরিষ্কার ভাবেই বললেন, চিরু, আমি ভালো আছি।

চিররঞ্জনের শুকনো মুখে বিদ্যুতের মতন আলো ফুটে উঠল। কয়েক দিনেই চিন্তা ভাবনায় চিররঞ্জন অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে। যন্ত্রণা টণা আছে?

বড়বাবু বললেন, না। এবার বোধহয় ধাক্কাটা সামলে উঠব। আমাকে একটু তুলে ধরো তো!

পাশ থেকে নার্স বলল, না, না, এখন উঠবেন না।

বড়বাবু বললেন, এ মেয়েটি কে?

বাড়ির সকলেই অবিলম্বে উপস্থিত হল সেখানে। বড়বাবুকে কয়েকটা বালিশ উঁচু করে ঠেস দিয়ে বসানো হয়েছে। এতদিন পর তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ প্রকট। চামড়া ঝুলে গেছে, চোখদুটি কোটরাগত। গলার আওয়াজে সেই দৃঢ়তা আর নেই। দেখে যত না অসুস্থ মনে হয়, তার চেয়েও বেশি মনে হয়, মানুষটা খুবই ক্লান্ত।

ভালো মতন জ্ঞান ফেরামাত্রই ডাক্তারকে খবর দেবার কথা ছিল, তাই সূর্য চলে গেছে। ডাক্তারকে ডাকতে।

চিররঞ্জন বললেন, আমি এমন বিপদে পড়েছিলাম...ডাক্তাররা বলছিলেন হাসপাতালে পাঠাতে-কিন্তু আপনার মতামত না নিয়ে...

হাসপাতালে কেন?

হার্টের চিকিৎসা বাড়িতে ভালো মতন–

হার্টটাই গেছে বুঝি?

গুরুতর কিছু নয়, সামান্য অ্যাটাক–

হুঁ। হাসপাতালে না পাঠিয়ে ভালো করেছ–

হিমানী বললেন, একদিন তো আপনি কিছুই খাননি। শুধু গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দিয়ে..আজ কিছু খাবেন?

ক'টা দিন কেটেছে বলো তো?

সবাই তখন দিনের হিসেব মেলাতে বসল। তারপর সেই সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার বর্ণনা।

বড়বাবু চুপ করে শুনলেন সব। তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মতন বললেন, আমাকে

একটু মুগের ডাল খাওয়াতে পারো? আমার মায়ের হাতের রান্না খেয়েছিলাম-

সকলে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। এত কঠিন অসুখের রোগীকে কি মুগের ডালের মতন গুরুপাক কিছু খাওয়ানো উচিত? তা ছাড়া, বড়বাবু আবার নিজের মায়ের রান্না খেলেন কবে? কোনও দিন তো ওঁর মায়ের কথা শোনা যায়নি।

হিমানী একটা স্তোকবাক্য দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। রান্নাঘরে গিয়ে মুগের ডাল বার করে রাখলেন-তবে, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস না করে রান্না চাপাবেন না।

ডাক্তার এসে বড়বাবুর অবস্থা দেখে খুব খুশি হলেন, কিন্তু মুগের ডাল খাবার অনুমতি দিলেন না। অসুখ হলে-এত বড় একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গেও সবাই শিশুর মতন ব্যবহার করে। ডাক্তারও বললেন, আর কয়েকটা দিন বাদেই তো পুরো ভালো হয়ে যাবেন-তারপর যা খুশি হয় খাবেন, কেমন?

সন্ধ্যাবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর বড়বাবুর অবস্থা আরও অনেক ভালো মনে হল। নিজে দুধের বাটি হাতে নিয়ে চুমুক দিলেন। বললেন, রেডিয়োটা খোলো তো, একটু খবর শুনব-

কিন্তু সকলেরই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়ে গেল। আর সব দিক ভালো হলেও বড়বাবুর কথাবার্তা একটু যেন অসংলগ্ন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলছেন, যার মানে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয়, তার চৈতন্যের জগতে একটা কিছু উলোটপালোট চলছে। মায়ের কথা বলছেন বার বার। এককালে তিনি গান শিখতেন ওস্তাদ সৈফুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, খাঁ সাহেব কি এসেছিলেন কাল?

সবাই জানে, সৈফুদ্দিন খাঁ সাহেব মারা গেছেন সাত-আট বছর আগে।

কেউ কিছু উত্তর না দিলে বড়বাবু সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, এখন কলকাতায় গানবাজনার জলসা হচ্ছে না কোথাও? আমাকে একটু নিয়ে যেতে পারো?

চিররঞ্জন বিষণ্ণ ভাবে বললেন, শরীরের এই অবস্থা। আপনি এখন কী করে যাবেন?

শরীরটা কি আমার একেবারেই গেছে?

আজ তো বেশ ভালো আছেন!

বড়বাবু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। চিররঞ্জন ও নার্স এসে দু'পাশ থেকে ধরল তাঁকে। দু-তিন পা হেঁটেই বড়বাবু বললেন, আমার মাথা ঘুরছে!

আপনি বিছানায় এসে বসুন।

না, আমি আর একটু হাঁটব। শরীরকে বেশি প্রশ্রয় দিলেই পেয়ে বসবে।

চিররঞ্জন ও নার্সের কথা অগ্রাহ্য করেই বড়বাবু ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করছিলেন। তখন সূর্য এসে বলল, বিছানা থেকে নামা আপনার একদম বারণ।

বড়বাবু বললেন, ডাক্তার-বৈদ্যর কথা শুনে আমি কখনও চলিনি। সূর্য, চল সমুদ্রের ধারে কোথাও বেড়াতে যাবি?

যাব। আপনি আগে একটু সেরে উঠুন।

সূর্য তার বাবাকে ধরে ধরে আবার বিছানার কাছে নিয়ে এল।

বড়বাবু বললেন, আমার এ-জায়গাটা আর ভালো লাগছে না। আমি অন্য কোথাও যাব।

পরদিন বড়বাবু চিররঞ্জনকে একটা চেক সই করে দিলেন পর্যন্ত। এর আগে তিনি হাতও নাড়াতে পারতেন না। হাসতে হাসতে বললেন, আমি ঠিক সেরে উঠব। এত সহজে মরতে রাজি নই হে!

তারপর হঠাৎ আবার অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, বেঁচে থেকে কী হবে, তাও তো জানি না!

একটু বাদেই বৃষ্টি হবে, আকাশ অন্ধকার। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ছায়া। চিররঞ্জন উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করতে যেতেই বড়বাবু বললেন, থাক, খোলাই থাক।

বাদল সূর্যকে বলল, সূর্যদা, আমরা তো আছি, তুমি আজ একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো না!

এর আগে সূর্য বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে কাটাত। এই ক'দিন সে একটানা বাড়িতে থেকে যে ভাবে কাজকর্ম করেছে-তা দেখলে অন্যদের মায়া লাগে। বাড়ির কাজ করা যে-সব ছেলের স্বভাবে নেই-তারা কিছুতেই নিজেদের এসব ব্যাপারে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না।

সূর্য বলল, আজকের দিনটা যাক। কাল বেরোব।

বাদল উৎসাহের সঙ্গে বলল, লরেন্স অলিভিয়ার-এর হ্যামলেট এসেছে, তুমি দেখবে না?

সূর্য অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হ্যাঁ রে, আমি যখন ডাক্তার টাক্তার ডাকতে গেছি, তার মধ্যে কি কখনও দীপ্তিদি এসেছিলেন?

না তো। এলে ঠিক বসিয়ে রাখতাম।

এল না কেন? আশ্চর্য! ওর একটা খবর নেওয়া দরকার।

আমি যাব?

দেখি আজকের দিনটা।

সূর্য জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে, সমস্ত শহরটা নিস্তব্ধ মনে হয়। এই কদিন বাবার অসুখের চিন্তার মধ্যেও সে দীপ্তির কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেনি। দীপ্তি এক বারও খবর নিতে এল না কেন? দীপ্তি এ বাড়িতে তো আগে একদিন এসেছিল। দীপ্তির কোনও বিপদ হয়নি তো?

সূর্যর মনে হল, বৃষ্টির মধ্যেও সে যেন দীপ্তির শরীরের সুগন্ধ পাচ্ছে। দীপ্তি যেন কোনও একজন নারী নয়-সূর্যর মুখ লুকোনোর জায়গা।

দীপ্তি আসেনি, দীপ্তির সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি-কেন সে এ রকম কৃষ্ট দিচ্ছে? সূর্য এর শোধ নেবে। সে তার ভালোবাসা দিয়ে দীপ্তিকে পাগল করে দেবে।

রাত্তিরবেলা ঘুমোতে যাবার আগে সূর্য এসেছে বাবাকে দেখতে। বড়বাবু তখন। চোখ বুজে আছেন।

অসুখ অনেক রকম হয়, তবু অসুস্থ মানুষ দেখলেই প্রথমে জ্বর দেখার কথাই মনে পড়ে। সূর্য তার একটা হাত রাখল বড়বাবুর কপালে। বড়বাবুকে ঘুমন্ত মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি চোখ খুলে তাকালেন। বললেন, বোস একটু

রাত্রির নার্স একটা বই খুলে বসেছিল শিয়রের কাছে। বড়বাবু বললেন, তুমি একটু বাইরে যাও তো মা।

নার্সের টুলে সূর্য বসে পড়ে বলল, আপনার বেশি কথা বলা নিষেধ।

বড়বাবু সে-কথা গ্রাহ্য না করে বললেন, আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়েটয়ে যায় তোকে কয়েকটা কথা বলে রাখা দরকার। বাড়ির দলিল, কোম্পানির কাগজ...

সূর্য বলল, এসব কথা এখন থাক না। পরে হবে।

পরে যদি আর সময় না পাই?

ডাক্তার তো বলছেন।

আমি ডাক্তারি ওষুধে বিশ্বাস করি না। আজ সকাল থেকে তোর কথাই ভাবছি। তোর মায়ের কথা। তুই গোয়ালিয়ার চলে যা।

গোয়ালিয়ার? কেন?

এটা তোর জায়গা নয়।

ওখানে গিয়ে আমি কী করব? কারোকেই চিনি না।

ও। আচ্ছা যাসনি। তুই এখানে কী করবি?

ঠিক ভেবে দেখিনি। তুই বিয়ে করবি না?

সূর্য কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। নিজের বিয়ের কথাটা সে বাবাকে জানাবে বলেই মনস্থির করে রেখেছিল। কিন্তু এখন এ-কথা বলার প্রকৃষ্ট সময় নয়।

সে বলল, আপনি আগে পুরোপুরি সেরে উঠুন।

বড়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

সূর্য একথার ঠিক তাৎপর্য বুঝতে না পেরে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বাবার দিকে। তার মনে হল, বাবার বুকটা যেন একটু বেশি জোরে ওঠা নামা করছে। নিশ্বাসের কষ্ট হবার লক্ষণ কি!

সে বলল, আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?

বড়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, না।

তারপর খুব টেনে টেনে বললেন, আমি চলে গেলেও এ-পৃথিবী এ রকমই থাকবে।

ব্যাপারটা খুব ভালো না মনে হওয়ায় সূর্য উঠে গিয়ে চিররঞ্জনকে ডেকে আনল। চিররঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বড়বাবু বললেন, চিরু, বোসো, তোমার সঙ্গেও কথা আছে।

চিররঞ্জন প্রায় ধমক দিয়েই বললেন, আপনি এখন ঘুমোন তো। সব কথা কাল। শুনব।

বড়বাবু বললেন, না। নিজেই উঠে বসার চেষ্টা করলেন। নার্স তাড়াতাড়ি এসে তার গা ধরে বলল, কী করছেন কী? শুয়ে পড়ুন।

বড়বাবু বললেন, আমার শয্যাকণ্টকী হয়েছে। পিঠ জ্বলে যাচ্ছে। আমি শুয়ে থাকতে পারছি না।

সূর্য চিররঞ্জনকে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার ডাকব?

বড়বাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন। খানিকটা ঘোর-লাগা গলায় বললেন, আমি সারা জীবন ধরে খোঁজার চেষ্টা করেছি, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী? আমার মা। বলেছিলেন...এই কথাটা আমাকে জেনে যেতে হবে। আমি পারিনি। তোমরা কেউ জানো?

চিররঞ্জন কঁদো কাঁদো ভাবে বললেন, বড়বাবু, কথা বললে আপনার কষ্ট বাড়বে। ডাক্তারকে ডেকে আনছি এক্ষুনি।

বড়বাবু নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে ইশারায় বললেন, এক গ্লাস জল। নার্স জল গড়িয়ে এনে খাইয়ে দিতে গেল, বড়বাবু সেটা নিজের হাতে নিলেন। ঠোঁটে ঠেকাবার আগেই গেলাসটা হাত থেকে পড়ে বিছানা জলে ভেসে গেল। বড়বাবু যেন সেই জল শুষে নিতে চান-এই ভঙ্গিতে নিজেও ঠাস করে উপুড় হয়ে পড়লেন বিছানায় তাঁর বুক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল।

সূর্য তক্ষুনি ছুটে যাচ্ছিল ডাক্তার ডাকতে। চিররঞ্জন সূর্যর হাত চেপে ধরে বললেন, তুমি না। তুমি সামনে থাকো-।

বাদলকে পাঠানো হল ডাক্তারের জন্য। চিররঞ্জন আর সূর্য ধরাধরি করে বড়বাবুকে সোজা করে শুইয়ে দিল। বড়বাবু স্থির চোখ মেলে চেয়ে আছেন, আবার তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। চিররঞ্জন আকুল হয়ে তাকে ডাকতে লাগলেন, নার্স ঘষতে লাগল পায়ের পাতা।

ডাক্তার এসে মুখ কালো করলেন। নিচু গলায় বললেন, একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর কোনও আশা নেই। শুধু শুধু আর কষ্ট দিয়ে কী হবে! কোমার পরের স্টেজে একটু ভালো হয়ে তারপর হঠাৎই এই রকম-

সূর্য বলল, আপনি তবু ইঞ্জেকশন দিন।

ইঞ্জেকশন দেবার পর মাত্র এক মিনিট বাদেই বড়বাবু আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক চোখ ঘোরালেন। তারপর ঠোঁট নড়ে উঠল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ কিছু শুনতে পেল না। শেষ নিশ্বাস বেরোবার আগে সেইটাই বড়বাবুর শেষ বার কথা বলার চেষ্টা। তার শেষ কথা কেউ বুঝতে না পারলেও বাদল দাবি করে, সে ঠোঁট নাড়া দেখেই কথাটা ধরতে পেরেছে। বড়বাবু বলতে চেয়েছিলেন, দেখে গেলাম। এবং এই দেখে

গেলাম কথা দুটিরই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে বাদল। তার মতে, বড়বাবুর সারা জীবনের চরিত্রের সঙ্গে এই কথাদুটি মিলে যায়।

৬৪. দুদিনের মধ্যে সান্ত্বনা

দু'দিনের মধ্যে সান্ত্বনা আর শ্রীলেখা তাদের স্বামী-পুত্রদের নিয়ে চলে এল এ বাড়িতে এবং ঈষৎ দমিত কান্নার রোল আবার জাগিয়ে তুলল। ওরা শেষ সময়ে বড়বাবুকে। দেখতে পেল না, এইটাই ওদের সবচেয়ে বড় দুঃখ। চিররঞ্জন কাঁদতে লাগলেন একেবারে শিশুর মতন অযৌক্তিক ভাবে।

সমস্ত বাড়িতে শোকের গন্ধ। মাঝে মাঝে কান্না থামলে হঠাৎ সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ঘরগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, কোনও ঘরেই কোনও মানুষ নেই। কোনও ঘরের জানলা অর্ধেক খোলা, মনে হয়-এরও যেন কোনও তাৎপর্য আছে। এক টুকরো কাগজ হাওয়ার ধাক্কায় বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খেলে বেড়াচ্ছে মনে হয় এই দৃশ্যটাও আগে কোনও দিন দেখা যায়নি। শোকের বাড়ি এই রকম।

এবাড়িতে বড়বাবুর অস্তিত্ব এত বেশি ভাবে সব সময় অনুভব করা যেত যে এখন তাঁর স্থায়ী অনুপস্থিতি কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। কিংবা একজন কেউ সম্পূর্ণ ভাবে মুছে গেলেই তার পূর্বেকার উপস্থিতি আরও বেশি ভাবে মনে পড়ে। যে-কোনও প্রসঙ্গ উঠলেই মনে হচ্ছে, এই সময় বড়বাবু থাকলে কী বলতেন?

একজন মানুষ সাতষট্টি বছর এ-পৃথিবীতে কাটিয়ে চলে গেল। তার সবকিছুর শেষ এখানেই। কয়েক জন তাকে আরও কিছু দিন স্মৃতিতে রাখবে, কিন্তু তার মূল্য কিছু নেই। অনেক গল্প উপন্যাসের চরিত্রও তো মানুষ মনে রাখে। ওই লোকটির জীবনের বাস্তবতা শুধু ওই সাতষট্টি বছর। একথা জেনেও সহজে মেনে নেওয়া যায় না। মৃত্যুকে মনে হয় অবিশ্বাস্য!

হিমানীই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন নিজেকে। বাড়ির আর সকলের স্নান-খাওয়াদাওয়ার নিয়ম চলে গেছে তিনি সেই নিয়ম ফিরিয়ে আনলেন আস্তে আস্তে। কালাশৌচের আচার-আচরণ, তিনিই ঠিক করে দিতে লাগলেন। এ-বিষয়ে তিনি সাহায্য পেলেন সান্ত্বনার বর মিহিরের কাছ থেকে। মিহির কম কথা বলে, কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মে খুব কুশলী। সে চাকরি করে পাটনায়।

সূর্য বরাবর একা ঘরে শোয়। কিন্তু এখন তাকে একলা থাকতে দেওয়া হয় না। বাদলের বিছানা সূর্যর ঘরে পাতা হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে সব সময় সূর্যর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে-অন্তত শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। সূর্য এর মধ্যে কখনও কেঁদেছে কিনা কেউ জানে না, কেউ দেখেনি তাকে চোখের জল ফেলতে-কিন্তু সে অসম্ভব বিমর্ষ হয়ে গেছে। তার সেই নীরবতা ও ম্লান মুখ দেখলে অন্যদেরও মনখারাপ হয়ে যায়। হিমানীর ধারণা সূর্য নিশ্চয়ই আড়ালে কাঁদে, কিন্তু লোকের সামনে দেখায় না। তাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যই সব সময় কারওর সঙ্গে থাকা দরকার।

সূর্যকে যা যা করতে বলা হচ্ছে, সে বিনা প্রতিবাদে সবই মেনে চলছে। শ্মশানে গিয়ে সে বাবার মুখাগ্নি করেছে, এখন সে হিমানীর নির্দেশে মাটির মালশায় নিজের হাতে হবিষ্যান্ন রান্না করে, কোরা কাপড় পরে খালি-গায়ে থাকে। তবে অন্যরা প্রশ্ন না করলে নিজে থেকে সে কক্ষনও একটাও কথা বলে না।

সূর্যর কখনও পইতে হয়নি। শ্রাদ্ধের সময় তার উপনয়নের দরকার আছে কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য হিমানী পুরুত ডাকালেন।

এদিকে বড়বাবুর কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে চিররঞ্জন পেয়ে গেলেন একটি নির্দেশপত্র। লেখাটা অনেক পুরনো। মহাযুদ্ধের সময় বড়বাবু যখন এ বাড়িতে সম্পূর্ণ একলা ছিলেন কিছুদিন, সেই সময়কার।

বড়বাবু লিখেছিলেন, আমার অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে আমার পুত্রকে সে-সংবাদ তৎক্ষণাৎ জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। সে যখন জানিবার হয়, জানিবে। আমার বিষয়সম্পত্তি

দেখাশুনা করিবার জন্য অ্যাটর্নি নিযুক্ত আছে। বারিদবরণ চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি। তাহাদের প্রতি আমার নির্দেশ, আমার কোনও শ্রাদ্ধশান্তি করিবার দরকার নাই। আমি এ-পর্যন্ত কখনও ঈশ্বরের আশ্রয় যাজ্ঞা করি নাই। মৃত্যুর আগে যদি ভয় পাইয়া ঈশ্বরের নাম লই এবং তাহার যদি কেহ সাক্ষী থাকে–তবেই ধর্মীয় আচরণের প্রশ্ন উঠিতে পারে। নচেত শুধু দাহ করিলেই চলিবে। আমি আমার পিতাকে কখনও চক্ষে দেখি নাই, জীবনে মাতৃস্নেহ পাই নাই-সুতরাং পূর্বপুরুষের কাছে আমার কোনও দায়ভাগ নাই। শ্রাদ্ধের যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রভৃতি আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

চিঠিখানা পেয়ে চিররঞ্জন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বড়বাবু শ্রাদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এবং একথাও তো ঠিক, মরার আগে তিনি ভগবানকে ডাকেননি। শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা অনেকখানি এগিয়ে গেছে–এখন কি সব বন্ধ করে দিতে হবে?

চিররঞ্জন পরামর্শ করতে গেলেন হিমানীর সঙ্গে। হিমানী এককথায় সব উড়িয়ে দিলেন। ওসব অনেক লোকের বাতিক থাকে, তা বলে সবই মানতে হবে নাকি, হিন্দুর বাড়িতে শ্রাদ্ধ হবে না-এ কি হয় কখনও?

চিররঞ্জন বললেন, কিন্তু বড়বাবু লিখে গেছেন।

ওই পুরনো কাগজের কী দাম আছে? ছিঁড়ে ফেলে দাও!

চিররঞ্জন ইতস্তত করতে লাগলেন তবু। বড়বাবুর সংস্পর্শে থেকে তিনিও অনেক বিশ্বাস ও সংস্কারকে নির্লিপ্ত চোখে দেখতে শিখেছিলেন। কিন্তু, এখন তার মনে হল, বড়বাবুর আত্মা যেন কাছাকাছি থেকে তাঁকে লক্ষ করছে। এত তাড়াতাড়ি বড়বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করার সাহস চিররঞ্জনের নেই।

তিনি বললেন, সূর্যকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না?

ও ছেলেমানুষ, ও কী বুঝবে? তা ছাড়া, ও কি এসব কোনও দিন দেখেছে?

ছেলেমানুষ হলেও সূর্য এখন বড়বাবুর সবকিছুর উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া খুব ছেলেমানুষও তো নয়! তিনি গেলেন সূর্যর কাছে।

বড়বাবুর চিঠিটা পড়ার পর সূর্য সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আপনি যা বলবেন, তাই-ই হবে।

তবু, তুমি কী মনে করো? কী করা উচিত?

সূর্য বলল, আমার মত জিজ্ঞেস করলে আমি বলব, এসবের কোনও দরকার নেই। তবে, আপনি যা ভালো মনে করবেন, সেটাই হোক।

প্রভাসকুমার উপস্থিত ছিলেন সে-ঘরে। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, কাকাবাবু, শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ বাদই দিয়ে দিন বরং।

একেবারে সব বাদ দেওয়া কি ঠিক হবে?

সে-দিন একটা সংগীতের আসর বসানো হোক। উনি গানবাজনা ভালোবাসতেন।

বাড়ির মেয়েরা তখন দরজার কাছে এসে ভিড় করেছে। হিমানীর নেতৃত্বে তারা এতে ঘোর আপত্তি তুলল। অনেক রকম যুক্তিতর্ক ওঠে। আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনা প্রাধান্য পাওয়ায় শোক ব্যাপারটা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, একদিকে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্যদিকে একটা কীর্তনের আসরও বসানো হবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা রাখতেই হয়, মেয়েদের আগ্রহ আতিশয্যে।

শ্রীলেখার ছেলেটির বয়স চার-পাঁচ বছর। শোকের আবহাওয়া কাটিয়ে দিতে সেও অনেকখানি সাহায্য করে। ফুটফুটে চেহারার অতি দুরন্ত ছেলে–সর্বক্ষণ হুটোপাটি করে গোটা বাড়ি মাতিয়ে তুলল ক'দিনেই। তার কাণ্ডকারখানা দেখে এক এক সময় না হেসেও পারা যায় না। সে মৃত্যুর কিছু বোঝে না বলেই তার মধ্যে এত চঞ্চলতা–সে যখন এর-ওর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সব মনোযোগ ওর দিকেই চলে যায়।

প্রভাসকুমার রামায়ণ-মহাভারত ঘেঁটে বারো-চোদ্দটা নাম বেছে রেখেছেন ছেলের জন্য, কিন্তু কোনওটাই পাকা হয়নি। সবাই এখন ওকে বুড়ো নামে ডাকে। ছেলেকে নিয়েই শ্রীলেখার বেশি সময় ব্যস্ত থাকতে হয়-দুরন্ত ছেলে কখন যে কোথায় পড়ে যায় কিংবা কী ভাঙে না ভাঙে, সেদিকে চোখ না রাখলে চলে না। কিন্তু এরই মধ্যে শ্রীলেখা সময় করে সূর্যর সুখসুবিধের খোঁজ নেয়। দুপুরবেলা ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সে সূর্যর ঘরে এসে বসে। বাড়ির অনেকেই এখন সূর্যর ঘরেই বেশির ভাগ সময় কাটায়।

ঠিক আড্ডা হয় না, পুরনো গল্প হয়। চিররঞ্জন যখন এলাহাবাদে বড়বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেই সময়কার কত স্মৃতি। তখন বড়বাবু এ রকম উদাসীন ধরনের ছিলেন না। তার বাড়িতে সব সময় লোকের ভিড়। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তো লোকজন আসেই-তা ছাড়া বড়বাবুর একসময় এক একটা হুজুগ চাপত। একসময় যত রাজ্যের সাধুসন্ন্যাসীদের ডেকে আনতেন বাড়িতে। প্রয়াগ সঙ্গমে তো সাধুর অভাব নেই-তাঁদের বাড়িতে এনে যত্ন করে খাওয়াতেন, কেউ যজ্ঞ বা পুজোআচ্চার বায়না ধরলে সব বন্দোবস্ত করে দিতেন-আর সর্বক্ষণ নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলে জেরা করতেন তাদের। এ ছাড়া গানবাজনার শখ তো ছিলই। বড় বড় ওস্তাদরা সব আসতেন-নিজেও গলা সাধতেন রোজ। তারপর হঠাৎ একদিন গানবাজনা বন্ধ করে দিলেন। মানুষটা অনেক ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন বরাবরই।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করল, সূর্যদা, তোমার গোয়ালিয়ারের কথা মনে আছে?

সূর্য বলল, খুব সামান্য।

অন্য কেউ হলে সেই সামান্য কী কী মনে আছে, সেটুকুও অন্তত বলত-কিন্তু জমিয়ে গল্প বলা ওর স্বভাবে নেই।

চিররঞ্জন বললেন, বড়বাবু শেষের কয়েক দিন বার বার বলছিলেন গোয়ালিয়ারের কথা। সূর্যকেও বলছিলেন ওখানে যেতে।

বাদল বলল, চলো সূর্যদা, তুমি আর আমি এরপর একবার গোয়ালিয়ার থেকে ঘুরে আসি। জায়গাটা দেখলে তোমার নিশ্চয়ই অনেক কথা মনে পড়ে যাবে।

প্রভাসকুমার বললেন, আমরা সবাই মিলে গেলে কেমন হয়? এসো না একটা প্ল্যান। করা যাক।

শ্রীলেখা বলল, তা হলে কিন্তু আমাদের বাদ দিতে পারবে না। আমরাও যাব–

বেশ তো যাবে। ট্রেনের একটা কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করে সূর্যর জন্মস্থানও দেখা হবে, আমরাও ও-দিকটা বেড়িয়ে আসব। কী হে সূর্যকুমার, প্ল্যানটা কী রকম? তা হলে সামনের মাসে–

সূর্য বলল, আমি সামনের মাসে যেতে পারব না। আপনারা যান, আমার কতগুলো কাজ আছে এখানে–

ঠিক আছে, তোমার কাজ সেরে নাও! তা হলে পুজোর সময় যাওয়া যেতে পারে। তখন গরমটাও কম থাকবে।

শ্রীলেখা আর আগের মতন ভিতু ভিতু ছেলেমানুষ নেই। এখন সে সোজাসুজি সূর্যর চোখের দিকে তাকাতে পারে, অন্যদের সামনেও সূর্যর সঙ্গে কথা বলতে পারে সাবলীল ভাবে। সূর্যই বরং তার চোখে চোখ রাখে না। যখন তাকায়, তখন মনে হয় যেন সে শ্রীলেখাকে দেখছে অনেক দূর থেকে। কিংবা শ্রীলেখাকে সে ভালো ভাবে চেনে না।

তিনতলায় বড়বাবুর ঘরে সূর্য আর বাদল বই আর কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছিল। শ্রীলেখা সূর্যর জন্য এক গেলাস দুধ নিয়ে উঠে এল তিনতলায়। মেঝেতে সবকিছু ছড়ানো। বাদল তড়াক করে উঠে পড়ে বলল, বড়দি, তুমি এখানে একটু কাজ করো তো। এই বইগুলো গুছিয়ে রাখো–আমি একটু নীচ থেকে আসছি।

বাদলের নীচে কোনও কাজ ছিল না। কিন্তু সে বড় হয়েছে, এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। বড়দি আর সূর্যদাকে এখন একটু একলা কথা বলার সুযোগ দেওয়া দরকার।

শ্রীলেখা বসে পড়ে বই গুছোতে শুরু করল। বড়বাবুর ভ্রমণ কাহিনী পড়ার বাতিক ছিল। বহু দুর্লভ সব ভ্রমণ কাহিনী রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। সূর্য বইগুলো সাজিয়ে রাখার বদলে এক একটা বইয়ের পাতা খুলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে উঠছে।

শ্রীলেখা খুব সাধারণ ভাবে জিজ্ঞেস করল, দীপ্তিদি এলেন না একদিনও?

সূর্য শ্রীলেখার দিকে তাকাল। শ্রীলেখার মুখ দেখলে বোঝা যায়, সে দীপ্তিদির সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। মেয়েরা মেয়েদের কথা ঠিক জেনে যায়।

সূর্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, আসবার কথা তো ছিল।

ওঁকে একদিন নিয়ে এলে তো হয়। বাদলকে পাঠাবে?

নিজেই আসবে।

খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই। তার পরেও যখন আসেননি, তখন নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে আছে। একটা খবর নেওয়া দরকার না?

হুঁ।

পরশুর জন্য দীপ্তিদিকে নেমন্তন্ন করেছ? তুমি নিজেই যাও না।

যাব।

আমার খুব ইচ্ছে করে দীপ্তিদিকে দেখতে।

অনেকটা তোর মতনই চেহারা।

শ্রীলেখা লজ্জা পেয়ে বলল, যাঃ, কী যে বলো! আমার থেকে অনেক বেশি সুন্দর। কে বলেছে তোকে?

আমি জানি। আমাকে বাদল বলেছে-। তা ছাড়া দীপ্তিদির কত গুণ। আমি না দেখেই দীপ্তিদিকে ভালোবেসে ফেলেছি। বড়বাবু দেখেছিলেন দীপ্তিদিকে?

না।

ইস! এর কোনও মানে হয়? উনি তো একদিন এসেছিলেন এ-বাড়িতে?

সূর্য একটু হাসল। বাদলের কোনও গল্প করতেই বাকি নেই। দীপ্তিদি কিছুতেই আসতে চায়নি-সূর্য জোর করে একদিন তাকে নিয়ে এসেছিল এবাড়িতে।

সূর্য বলল, বাবা তখন বাড়ি ছিলেন না।

অসুখের সময়েও যদি একদিন নিয়ে আসতে!

কথা ঘোরাবার জন্য সূর্য বলল, তোর ডান পাশের ওই বইটা দে। তুই এখন কেমন আছিস?

বইটা এগিয়ে দিয়ে শ্রীলেখা বলল, এই একরকম। এক এক সময় আমার কী মনে হয়। জানো সূর্যদা: সেই যে আমাদের তালতলায় বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে বলেছিলে-তোমার সঙ্গে চলে যেতে-মাঠে ঘাটে নদীর ধারে থাকতাম তোমার সঙ্গে-কেন যে সে কথাটা শুনিনি! দারুণ বোকা ছিলাম তখন।

না গিয়ে ভালোই করেছিলি!

কেন? এখন এই একঘেয়ে জীবন।

তা হোক। ওই রকম জীবনও সবার জন্য নয়। আমার জন্যও নয়।

দীপ্তিদিও তো কত সাহস করে কত কিছু করেছেন। আমরা কিছুই করিনি।

ও-সব কথা এখন থাক।

শ্রীলেখা হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে সূর্যর দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। একসময় ছিল যখন নির্জন ঘরে সে সূর্যর এত কাছাকাছি বসতে সাহস পেত না। সূর্য চোখের নিমেষে দস্য হয়ে উঠত। এখন সে অন্যমনস্ক ভাবে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে।

শ্রীলেখা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি দীপ্তিদির সঙ্গে দেখা করে বলে দেব, উনি যেন তোমার ঠিক মতন যত্ন নেন! তুমি সব সময় কী এত ভাবো?

যাঃ, যত্ন নেবার আবার কী আছে?

দীপ্তিদি তোমাকে যতই ভালোবাসুক, আমার চেয়ে বেশি কেউ কখনও তোমাকে চিনতে পারবে না।

শ্রীলেখা তুই কিছুই জানিস না। দীপ্তিদি আমাকে মোটেই ভালোবাসে না। আমিই শুধু জোর করি। না হলে, এতদিন কি আমার সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারত?

তুমি ভালোবাসার বোঝো তো ছাই! অনেক দিন দেখা না হলেই বুঝি ভালোবাসা মরে যায়?

সূর্য এবার উঠে দাঁড়াল। শ্রীলেখার দিকে আর তাকাল না। কয়েক দিন মাথায় তেল মাখেনি বলে চুলের রং লালচে হয়ে এসেছে। গালেও সেই রঙের দাড়ি। মন্থর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে। নীচের উঠোনে শ্রীলেখার ছেলে খুব খেলায় মেতে উঠেছে। সান্ত্বনা আর মিহিরের সঙ্গে। সূর্য সেখানে দাঁড়িয়ে শিশুর খেলা দেখতে লাগল।

৬৫. সূর্য আর বাদল

সূর্য আর বাদল নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে। ভবানীপুরে বড়বাবুর বড় মা'র বাড়িতে সূর্য আগে কখনও আসেনি। বাদলের মনে পড়ল অনেক দিন আগে এ বাড়িতে সে বড়বাবুর হাত ধরে একদিন এসেছিল। তখন মন্দাকিনী বেঁচে ছিলেন। বড়বাবুর সঙ্গে মন্দাকিনীর কী সব বিচিত্র কথাবার্তা হয়েছিল-বাদলের অস্পষ্ট মনে আছে এখনও। মন্দাকিনী ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে মানুষের দিকে তাকাতেন, তার ঠোঁটে রক্ত মাখানো : থাকত, তার সামনে এসে বড়বাবু একেবারে শিশুর মতন হয়ে পড়তেন।

মন্দাকিনীর মৃত্যুর পর বাড়িটা অনেক বদলে গেছে। সেই গেট কিংবা বাগানে ফোয়ারা আর নেই। একতলায় সেই পুরনো কায়দায় সাজানো বৈঠকখানাটিও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না-গোটা একতলা জুড়ে এখন একটা পাখা কোম্পানির অফিস।

জীমূত বাড়িতে নেই। জেল থেকে ছেড়ে দেবার পর তাকে দিল্লি পাঠিয়ে দেও হয়েছে। ওখানেই বাকি পড়াশুনো শেষ করবে। রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তার বাড়ির লোকের এই প্রয়াস।

সুরেশ্বর বড়বাবুর অসুখের সময় প্রায় প্রত্যেক দিন গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন, শ্মশানেও গিয়েছিলেন। সূর্যকে জড়িয়ে ধরে তিনি আবার কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, অমরদার একটা ছবি আমাকে দিয়ো। উনি আমার বড়ভাইয়ের চেয়েও বেশি ছিলেন।

ওপর তলায় এসে একটা ব্যাপার দেখে বাদলের খুব অবাক লাগল। মন্দাকিনীর ঘরটা অবিকল ঠিক সেই আগের মতনই সাজানো রয়েছে। শুধু বিছানার ওপর মন্দাকিনীর ছোট্ট কোঁকড়ানো শরীরটা নেই। প্রায় বারো-তেরো বছর আগে বাদল এই ঘরখানা একই। রকম দেখেছিল, ওইখানে খাটের বাজুর পাশে বড়বাবু পাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরটাকে এ রকম ভাবে সাজিয়ে রাখার মানে কী? এক একটা বাড়িতে কী সব অদ্ভুত নিয়ম থাকে।

অনেক মহাপুরুষের ঘর আর ব্যবহৃত জিনিসপত্র এ রকম ভাবে সাজিয়ে রাখতে দেখেছে। বাদল। হয়তো সুরেশ্বরের চোখে তার মা-ও সেই রকম।

চিররঞ্জন নিমন্ত্রিতদের লিস্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন। এ-পাড়ার সবকটি বাড়ি সারা হয়ে যাবার পর ওরা গেল দীপ্তির বাড়িতে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। এই সময় দীপ্তি স্কুলে যান–বাড়িতে থাকার কথা নয়। কিন্তু তার ঘরের বাইরে দুটো তালা ঝুলতে দেখায় অস্বাভাবিক মনে হল। ওঁর ফ্ল্যাটে আর একটি যে মেয়ে থাকত–তার ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে কয়েক মাস ধরে দীপ্তিদি এখানে একাই ছিলেন।

তিনতলায় গিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল, দীপ্তিদি দিন পনেরো আগে তার বাবা-মায়ের কাছে চলে গেছেন কাটিহারে। না, কোনও চিঠিপত্র আসেনি। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছেন বোধহয়।

সূর্য আর কোনও উচ্চবাচ্য করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। বাদল একটু ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকাল তার দাদার মুখের দিকে। তার দাদাটির কী রকম মেজাজ তা তো সে জানে। কিন্তু সূর্যর মুখে কোনও ভাব বৈলক্ষণ নেই। খুব শান্ত ভাবে বলল, এবার কোন দিকে যাবি?

নিমন্ত্রিতদের তালিকায় সূর্যর নিজস্ব বন্ধু বা চেনাশুনো বিশেষ কেউ নেই। চিররঞ্জন। অনেক বার জিজ্ঞেস করেছিলেন, সূর্য বলেছিল, না, সে রকম কারোকে তো মনে পড়ে না। জেলখানায় সূর্যর সঙ্গে যারা একসঙ্গে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রৌঢ় সত্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় এখন পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী–চিররঞ্জনের বিশেষ ইচ্ছে ছিল তাকে আনার সূর্য কোনও রকম উৎসাহ দেখায়নি।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা চলে এল বিষ্ণুদের বাড়িতে। ওরা গেট দিয়ে ঢুকে ঠাকুরদালানের সামনের বারান্দাটায় দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল রেণু। তরতর করে নামতে নামতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো রেণুর স্বভাব।

বাদলের মনে হল, এটা একটা আশ্চর্য যোগাযোগ হলেও এবাড়িতে সে যত বার এসেছে, প্রায় প্রত্যেক বারই সে রেণুকে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই দেখেছে। মনে মনে যখনই সে রেণুর কথা ভাবতে চেষ্টা করে, রেণুকে একটা সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ানো অবস্থাতেই দেখতে পায়। যেন রেণু নিজেই নেমে আসবে, না বাদলকেই ওপরে উঠে রেণুর কাছাকাছি পৌঁছোতে হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। মোট কথা, সিঁড়িতে দাঁড়ানো অবস্থাতেই রেণুকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে বাদলের চোখে।

রেণু ওদের দেখে বলল, দাঁড়াও, ছোড়দাকে ডাকছি। আবার ওপরে উঠে গেল সে। একটু বাদেই বিষ্ণু নেমে এল, কিন্তু রেণু ফিরল না। এটা পছন্দ হল না বাদলের। এ বাড়িতে এসে রেণুকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না, সব সময় অস্বস্তি হয়, অন্য কারওর সঙ্গে কথা বলার সময় মন বসে না। বিষ্ণু কয়েক দিন বাদেই বিদেশ চলে যাচ্ছে, তখন বাদলের এ বাড়িতে আসার উপলক্ষ কমে যাবে।

সেই দিনই ভোরে গঙ্গায় গিয়ে সূর্য ঘাট কামাই করে এসেছে। মসৃণ মাথায় সূর্যকে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। বিষ্ণু এসে বলল, এ কী?

অনেকেই মনে মনে ভেবেছিল, সূর্য মাথা ন্যাড়া করবে না। এ ব্যাপারে তাকে কেউ খুব একটা জোর করারও সাহস পেত না। জোর করেওনি কেউ, হিমানী একবারমাত্র কথাটা উচ্চারণ করায় সূর্য রাজি হয়ে গিয়েছিল। একদিন কোনও কিছুতেই সে আপত্তি জানাচ্ছে না। বোধহয় সংসারের সব রকম বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার আগে সে শেষ বারের। মতন সকলকে খুশি করে যাচ্ছে। মুণ্ডিত মস্তক, পরনে নতুন কোরা কাপড়, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ– সূর্যকে সবার মাঝখানে বেখাপ্পা মনে হয়।

প্রথাসিদ্ধ ভাবে নেমন্তন্ন করে সূর্য বলল, বিষ্ণু, তোমাদের সবাইকেই যেতে হবে। কিন্তু। তোমাকে যেতে হবে দু' দিন। শ্মশানবন্ধুদের জলপানের সময়েও তোমাকে থাকতে হবে।

বিষ্ণু বলল, আমাকে এ ভাবে বলছেন কেন? আমি তো যাবই।

তোমার মা, বাবা, জ্যাঠাইমাদের আলাদা করে বলা উচিত নিশ্চয়ই।

চলুন না ওপরে।

এই সময় রেণু একটা ট্রেতে করে দু'গেলাস শরবত নিয়ে এল। উচ্ছল ভাবে বলল, সূর্যদাকে দেখে আমি প্রথমটায় একদম চিনতে পারিনি। আপনাকে কী রকম দেখাচ্ছে বলব?

বাদল রেণুর মুখের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চায় যে সূর্যদার আজ মন ভালো নেই, তার সঙ্গে হালকা ভাবে কথা না বলা ভালো।

রেণু সেই ইঙ্গিত লক্ষ করল না। বলল, আপনাকে ঠিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন দেখাচ্ছে।

কাকে কখন কী রকম দেখায়, কোন পোশাকে কাকে কী রকম মানায়-তা মেয়েরাই বেশি লক্ষ করে। বাদল এতক্ষণ তার সূর্যদাকে কী রকম দেখাচ্ছে সে বিষয়ে মাথা ঘামায়নি। রেণুর কথা শুনে মনে হল, রেণুর বর্ণনাটা যেন ঠিক। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সে কোনও দিন দেখেনি-কিন্তু এই রকমই হওয়ার কথা।

সূর্য এ-কথা শুনে চুপ করে রইল। রেণু আবার বলল, আপনাকে অন্য সময় দেখলেও কেন যেন সন্ন্যাসীর মতন মনে হয়।

সূর্য এবার মুখ তুলে বলল, আমাকে? আগে তো কেউ কখনও বলেনি–

বলেনি? আমি একবার একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ছবি দেখেছিলাম, হুবহু আপনার মতন।

সূর্য বলল, রেণু, তুমি হঠাৎ বড় হয়ে গেছ। লক্ষই করিনি!

আপনার মনে আছে, আপনি সেই যে বাদলের সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, আপনার মাথা ফেটে গিয়েছিল-

তোমার সে কথাও মনে আছে?

আমার সব মনে থাকে।

বাদল বলল, তোর কি মনে আছে, বড়বাবু কবে এ বাড়িতে এসেছিলেন?

রেণু বলল, উনি এসেছিলেন কখনও? জানি না তো!

উনি এসেছিলেন, তোকে কোলে করে নিয়ে এসেছিলেন। তুই সেই যে গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে গিয়েছিলি?

রেণু লজ্জা পেয়ে বলল, ধ্যাৎ!

বিষ্ণু বলল, তুই তখন এইটুকুনি পুঁচকে মেয়ে–

রেণু বলল, আমি মোটেই হারিয়ে যাইনি–

বাদল বলল, আ-হা-হা। আমি না দেখলে তোকে আর কোনও দিন খুঁজেই পাওয়া যেত না। এখনও তো তোর মধ্যে কী রকম যেন একটা হারাই হারাই ভাব!

রেণু বলল, বাদল, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!

বিষ্ণু বলল, এই রেণু, তোকে কত দিন বলেছি, তুই বাদলের নাম ধরে ডাকবি না। বাদলদা বলতে পারিস না?

রেণু বলল, এতদিন পরে আবার নতুন করে বলা যায় বুঝি?

বাদল বলল, মোটেই নতুন করে না। আগে তুই তো আমাকে বাদলদাই বলতি। মাঝখানে হঠাৎ খুব বড় বড় ভাব দেখাতে লাগলি তো–

রেণু বলল, কেন, নাম ধরে ডাকলে আপত্তি কী আছে?

সূর্য বলল, রেণু, তোমার চোখে চশমা ছিল দেখেছিলাম না–

এখন আর পরতে হয় না। আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে।

বিষ্ণু বলল, দেখুন না-রেণুর চোখ ভালো হয়ে গেল-কিন্তু আমাকে এবার চশমা নিতে হবে।

বাদল বলল, তুই খুব মোটা কালো ফ্রেমের চশমা নিবি। তোকে মানাবে। আমারও খুব চশমা পরার শখ।

রেণু বলল, থাক, অত শখে কাজ নেই।

কত সহজে কথার প্রসঙ্গ বদলে যায়। যৌবনের চাঞ্চল্য কখনও এক বিষয়ে থেমে থাকতে পারে না। দশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল ওরা সম্প্রতি কলকাতার আকাশে দেখতে পাওয়া ধূমকেতু বিষয়ে কথা বলছে। বিষ্ণু বলতে লাগল হ্যাঁলির ধূমকেতু সম্পর্কে তথ্য। তার একটু পরে সূর্যকে নিয়ে ওরা ওপরে গেল বাড়ির অন্যদের নেমন্তন্ন করতে। ফিরে আসার সময় রেণু খুব গোপনে একটা চিঠি দিয়ে দিল বাদলের হাতে। বাদল সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পুরে দিল হাতটা।

ওরা বাড়ি ফেরার পর থেকেই শ্রীলেখা সুযোগ খুঁজতে লাগল বাদলের সঙ্গে আড়ালে কথা বলার। বাদল বিকেলের দিকে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, শ্রীলেখা একতলায় দরজার কাছে তাকে ধরে বলল, এই শোন! দীপ্তিদি কী বলল রে? আসবে তো?

বাদল বলল, দীপ্তিদির সঙ্গে তো দেখাই হল না। দীপ্তিদি নেই এখানে, বাবার কাছে চলে গেছেন।

এটা যেন শ্রীলেখার কাছে একটা ব্যক্তিগত দুঃসংবাদ–শ্রীলেখার মুখখানা সেই রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অস্ফুট ভাবে বলল, দেখা হল না? কোথায় গেছেন?

বাদল বলল, কাটিহার না কালনা কী যেন একটা জায়গা।

কোনও খবরও দিয়ে যায়নি?

না।

ব্যাপারটা কী বল তো? কী হয়েছে?

বাদল বড়দিকে রীতিমতন একটা ধমক দিয়ে বলল, তুমি এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ। কেন? বলে দেব প্রভাসদাকে সব কথা।

কী বলবি? এই বাঁদর ছেলে, কী বলবি রে!

সে যা বলার আমি বলব।

বড্ড পাকা হয়েছিস। শোন, তুই একটা কাজ করতে পারবি? আমি আরও সাত-আট দিন থাকব এখানে। দীপ্তির বাড়ি কোথায় খোঁজ নিয়ে তুই সেখান থেকে একবার ঘুরে আয় না। আমি তোকে ভাড়ার টাকা দেব।

বাদল হাসতে হাসতে বলল, তুমি ভাড়া দিলে আমার বেড়িয়ে আসতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার এত আগ্রহ কেন বলো তো?

আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে দীপ্তিদিকে। তা ছাড়া সূর্যদা মনখারাপ করে থাকবে সব সময় এটা আমার ভালো লাগে না।

ঠিক আছে। সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো?

ওকে জিজ্ঞেস করার দরকার কী?

ওরে বাবা, সূর্যদাকে জিজ্ঞেস না করলে কী রকম মেজাজ করবে কে জানে! তুমি ওর কাছ থেকে পারমিশন করিয়ে নাও, আমার যেতে কোনও আপত্তি নেই।

বাদল বেরিয়ে যাবার পর শ্রীলেখা গেল সূর্যর কাছে। চিররঞ্জন তখন নেমন্তন্নর এসটিমেট করছিলেন প্রভাস, মিহির আর সূর্যর সঙ্গে। এই আলোচনা সহজে শেষ হয় না। শ্রীলেখা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, সূর্যর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে।

সূর্য উঠে এসে বলল, কী?

বারান্দার প্রান্তে সরে এসে শ্রীলেখা বলল, সূর্যদা, তোমার খুব মনখারাপ, না?

সূর্য একটু অবাক হয়ে বলল, কেন?

দীপ্তিদি তোমাকে খবর না দিয়ে চলে গেছেন–

তাতে কী হয়েছে। নিশ্চয়ই কিছু জরুরি কাজ ছিল। কিংবা বাড়ি থেকে বোধহয় কোনও চিঠি এসেছে–

আগে কখনও গিয়েছেন এই রকম?

তা না হলেই বা। কী হয়েছে তাতে?

যত জরুরি কাজই থাক–এ রকম কোনও খবর না দিয়ে কেউ যায় না।

সূর্য ভুরু কুঁচকে তাকাল শ্রীলেখার দিকে। শ্রীলেখার চোখে-মুখে একটু উত্তেজনার চিহ্ন। তার ব্যবহারের মানে বোঝা যাচ্ছে না।

সূর্য বলল, বাড়িতে এত কাজকর্ম–এখন আমার এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই নেই।

শ্রীলেখা তবু কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। কারণ এই সময় সান্ত্বনা ছাদ থেকে নেমে এল কাঁপতে কাঁপতে। সে ছাদের ঘরে বড়বাবুকে দেখেছে!

সান্ত্বনা এই নিয়ে তিন বার ভূত দেখল। ছেলেবেলায় একবার তার যে মাথার গোলমালের মতন দেখা গিয়েছিল, সেটা সেরে গেলেও মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'-একটা উদ্ভট ব্যাপার বেরিয়ে পড়ে। এর আগের দিন সে ভূত দেখার কথাটা শুধু তার মাকে বলেছিল। হিমানী সঙ্গে সঙ্গে সেটা চাপা দিয়ে দিয়েছেন।

এবার সান্ত্বনা সবার সামনে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, তোমরা দেখবে এসো-ছাদের। ঘরে বড়বাবু ইজিচেয়ারে বসে আছেন, আমাকে দেখে হাসলেন-তোমরা তো আমার। কথা বিশ্বাস করো না-

সবাই দুদ্দাড় করে উঠে এল ছাদে।

সান্ত্বনার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি, চিররঞ্জন শক্ত করে তার হাত ধরে রাখলেন। সান্ত্বনা বড়বাবুর ঘরে শূন্য ইজিচেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দেখো, ওই যে-।

সবাই সেদিকে তাকিয়ে বলল, কই?

সান্ত্বনা চেঁচিয়ে বলল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? উনি হাসছেন।

সান্ত্বনার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখদুটি বিস্ফারিত-কৌতুক করার ইচ্ছে কিংবা মিথ্যে বলার কোনও লক্ষণই সেখানে নেই। সে সত্যি দেখতে পাচ্ছে।

হিমানী তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসে সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই নীচে চল। শিগগির নীচে চল।

সান্ত্বনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, বড়বাবু বসে আছেন, তোমরা কেউ দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কী? এর মধ্যেই বড়বাবুকে ভুলে গেলে।

হিমানী জোর করে সান্ত্বনাকে নীচে নিয়ে গেলেন। সে এখন সন্তানসম্ভবা, এই সময় ভয়টয় পেলে কত বড় বিপদ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, জামাই যদি কিছু মনে করে।

পরের কয়েক দিন হিমানী সর্বক্ষণ সান্ত্বনাকে আগলে রাখলেন। অন্য কোনও কাজে মন দিতে পারলেন না। সুতরাং বড়বাবুর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন কোনওক্রমে সারা হল।

সবকিছু মিটে যাবার পর চিররঞ্জন সূর্যকে নিভৃতে বললেন, এবার বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারটা একটু দেখাশোনা করা দরকার। তোমাকেই তো সব বুঝে নিতে হবে।

সূর্য বলল, আপাতত আপনিই সব দেখুন। আমি এখন কিছু দিন কলকাতায় থাকব না।

দু দিন পরেই সূর্য কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। কোথায় গেল, বলে গেল না কারোকে।

৬৬. হিরোসিমাতে যে-দিন অ্যাটম বোমা

হিরোসিমাতে যে-দিন অ্যাটম বোমা পড়ে, সে-দিনও পৃথিবীতে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছিল, প্রায় এক লক্ষ নারী-পুরুষ বিয়ে করেছিল এবং অন্তত একশো কোটি লোক নিছক আহার্য সন্ধান ছাড়া আর কোনও কিছু চিন্তাই করেনি। অন্যান্য দিনের মতন সে-দিনও যথারীতি সারা পৃথিবী জুড়ে বেশ কিছু নারী-পুরুষ আত্মহত্যা করেছে। সেই দিন সেই সময়ে ভাটপাড়ায় এক ভদ্রলোক সনাতন হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবার জন্য দারুণ উত্তেজিত, নারায়ণগঞ্জে তখন ইসলাম বিপন্ন বলে ছোট একটি সভা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই আসামের হাফলংয়ে প্রত্যন্ত পাহাড় থেকে আসা এক কাছাড়ি আদিবাসী সদ্য খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে জীবনের প্রথম এক টুকরো পাঁউরুটি খেতে পেল এবং

ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে কেঁদে ফেলল। সেই দিনই দুপুরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যে এক তুলোখেতে দু'দল খ্রিস্টান নিছক দুরকম গায়ের রঙের জন্য দাঙ্গা করেছিল।

পৃথিবীতে মানুষের কোনও চরিত্র নেই। প্রত্যেক জন্তুজানোয়ারের চরিত্র থাকে, মানুষ জাতিই শুধু চরিত্রহীন। স্পেনে গত তিনশো বছর ধরে যে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই খেলা হচ্ছে, তাতে এত দিনের মধ্যে একটি ষাঁড়ও সোজা ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ ডান দিকে বা বাঁ দিকে বেঁকেনি। মানুষ এ রকম নয়। মানুষ কখন কোন দিকে বেঁকবে তা সে নিজেও জানে না। সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে একদল লোক বাঘের পেটে প্রাণ। দেয়। আবার একদল লোক সারা পৃথিবীর ব্যাঘ্র-সম্পদ বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমিতি গড়ে। একজন সন্ন্যাসীর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে যায়। একজন ডাকাত হঠাৎ কবি হয়ে ওঠে।

মানুষের সুখেরও কোনও নির্দিষ্ট রূপ নেই। একদল লোক সারা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত। ভবিষ্যতের এক সুস্থ সমৃদ্ধ মানবসমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। অবশ্য সেই সমাজের নিয়ন্ত্রণভার তাদেরই হাতে থাকা চাই। আবার একদল লোক খাদ্যশস্য গোপন গুদামে মজুত রেখে হাজার হাজার লোককে না খাইয়ে মারে। দু'দলই সুখের সন্ধানী। মন্দিরের দেওয়ালে সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টি করায় কারওর আনন্দ, কারওর আনন্দ সেই মন্দির ভাঙায়। কেউ একটি নারীর সামান্য সম্মতি পাবার জন্য পাগল হয়, কেউ টাকা দিয়ে নারীকে কিনে আনে।

সকালবেলা শুয়ে শুয়ে আমি এইসব কথা ভাবছিলাম। নিতান্তই অলস চিন্তা। এসব চিন্তারও কোনও মূল্য নেই। পৃথিবী আপন খেয়ালে চলবে। আমার এখন কোনও কাজ নেই বলে আমি যা খুশি আবোলতাবোল ভাবতে পারি। দিবাস্বপ্ন দেখতেও কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু একটু বাদে আমার খিদে পেলে আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ আমার খুব পেটব্যথা করে। তখন আমি যন্ত্রণায় চারদিক অন্ধকার দেখি। সেই সময় পৃথিবীর আর কোনও সমস্যাই আমার কাছে সমস্যা নয়। তখন পৃথিবীটা উচ্ছন্নে যায় যাক।

মেঘলা মেঘলা দিন, বিছানা ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছে করছে না। খবরের কাগজে চোখ বুলোনো হয়ে গেছে। খানিকটা আগে এক কাপ চা খেয়েছি বটে, কিন্তু জলখাবার খেতে হলে আমাকে উদ্যোগী হতে হবে। এখনও খিদে পায়নি। আর এক কাপ চা খেতে পারলে বেশ হত। কিন্তু মায়ের কাছে চা চাইলেই মা বিছানা ছেড়ে ওঠবার জন্য তাড়া দেবে। মা'র চোখে আমি কুঁড়েদের বাদশা। তার থেকে চুপচাপ থাকাই ভালো। এখনও আমার বিছানা ছেড়ে না-ওঠা কেউ লক্ষই করেনি।

আজ সারা দিন বিছানায় শুয়ে থাকলে কেমন হয়? কিছুই তো করার নেই। কোথাও যাবার নেই। এম এ ক্লাস এখনও শুরু হয়নি। তা ছাড়া এম এ পড়া হবে কিনা তারও ঠিক নেই। ও-সব আর এখন ভাবতে ইচ্ছে করে না। তারচেয়ে শুয়ে থাকা কত ভালো। অসুখ না হলেও কি কেউ সারা দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না!

কিন্তু একবারে চুপচাপ শুয়ে থাকাও সম্ভব নয়। কিছুনা-কিছু চিন্তা করতেই হয়। জাগ্রত অবস্থায়, কোনও কিছু চিন্তা না করে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্ত ভাব কি কেউ পেতে পারে? আসলে আমি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে আছি বলেই বিছানায় মুখ গুঁজে আছি। চিন্তার হাত থেকেও মুক্তি চাইছি।

শিয়রের কাছে লাল রঙের মলাট বাঁধানো আমার কবিতার খাতা। হঠাৎ সেটার দিকে তাকিয়ে আমার রাগ হয়ে গেল। ঠেলা দিয়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। পরে ওটাকেই ছাইগাদায় ফেলে দিতে হবে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে। কবিতা টবিতা আর লিখব না। কিছুই লিখব না।

এতক্ষণে পার্টি অফিসে অনেকে এসে গেছে। মুড়ি আর তেলেভাজা খেতে খেতে নিশ্চয়ই দারুণ আড্ডা জমেছে। কেউ কি এক বারও বলবে, বাদল ক'দিন ধরে আসছে না কেন? কেউ বলবে না। পার্টির ডিসিপ্লিন দারুণ কড়া। মন্টুর সঙ্গে আমার এত বন্ধুত্ব ছিল, মন্টুও কাল সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে গম্ভীর ভাবে কথা বলল। আমি কী এমন দোষটা করেছি? আদিনাথদার সঙ্গে তর্ক করেছি। তর্ক করাটাও দোষের? যেটা আমি বুঝতে পারছি না,

সেটা আমাকে বুঝে নিতে হবে না? বিনা প্রশ্নে চুপচাপ সব মেনে। নিলেই কি সত্যিকারের মেনে নেওয়া হয়?

আমার এখন ছুটি, এই সময় আমি পার্টির অনেক কাজ করতে পারতাম। কয়েক জনকে হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানায় পাঠানো হচ্ছে, আমিও তাদের দলে যেতে রাজি ছিলাম। কিন্তু আদিনাথদার মতে আমি এখনও যথেষ্ট তৈরি হইনি। আমার মধ্যে এখনও অনেক পেটি বুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট রয়ে গেছে। আমাকে পার্টি মেম্বারশিপ দেবার এখনও সময় আসেনি। আমি আদিনাথদাকে খুশি করার অনেক চেষ্টা করেছি। তবু আদিনাথদার মন পেলাম না।

ব্যাপারটা হয়েছিল দু'সপ্তাহ আগে। রাজবল্লভপাড়ার একটা বাড়িতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প পড়ার কথা ছিল। ওঁর শরীর অসুস্থ বলে উনি আসতে পারলেন না। তখন আমাদেরই কয়েকজন নিজেদের লেখা পড়ল। আমাকেও একটা কবিতা পড়তে বলা হয়েছিল। আমি কিছুতেই রাজি হইনি। লোকজনের সামনে কবিতা পড়তে আমার জিভ আটকে যায়। তা ছাড়া আমি কোনও লেখাটেখা নিয়েও যাইনি। সব সময়েই তো পকেটে কবিতা থাকে না।

তবু কয়েক জন পেড়াপিড়ি করতে লাগল। বিশ্বদেব বলল, তোমার একটাও মুখস্থ নেই?

আমি বললাম, আমার অন্যদের কবিতা মুখস্থ থাকে। নিজের কবিতা মুখস্থ থাকে না।

বিশ্বদেব তখন ওর টেবিল ঘেঁটে ফস করে একটা পত্রিকা বার করল। সেই পত্রিকাটায় আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটি নতুন, বিশেষ কোনও মতবাদ নেই।

বিশ্বদেব বলল, এতে যে কবিতাটা আছে, সেটাই পড়ে শোনাও।

তখন আর এড়ানো গেল না। কিন্তু ওই কবিতাটা আমার ওই আসরে একেবারেই পড়ার ইচ্ছে ছিল না-নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত অনুভূতির লেখা।

যাই হোক, আমার কবিতাটা পড়ার পর কেউ কোনও মন্তব্য করল না। সাধারণত সবার রচনা নিয়েই পরে কিছু আলোচনা হয়। আমার লেখাটার পর সবাই অন্য কথা বলতে লাগল। আমি দুরুদুরু বুকে সকলের মুখের দিকে চাইলাম। মনে হল কেউই পছন্দ করেনি। বন্দনা সেনগুপ্ত সব আলোচনাতেই অংশ নেন, এখন তিনি মুখখানা বাংলার পাঁচ করে আছেন।

ওখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে আসবার পর আদিনাথদা বললেন, বাদল, তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

পানের দোকান থেকে আদিনাথদা চুরুট কিনলেন, আমিও সিগারেট ধরালাম। আজকাল সবার সামনেই সিগারেট খাই। রেণু ছাড়া।

আদিনাথদা বললেন, কী পড়লি আজকে? ওটা কি কবিতা?

আমি কাচুমাচু হয়ে বললাম, না, ভালো হয়নি ঠিক।

ভালো-মন্দর কথা হচ্ছে না। ওইসব বস্তাপচা জিনিস নিয়েও এখন কবিতা লেখা হয়?

আমি চুপ করে রইলাম। আদিনাথদা কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক করে বল তো, তুই কি বরুণ ঘোষদের সঙ্গে ভিড়ছিস?

আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললাম, মোটেই না। আমি ওদের কাগজে লেখা দিইনি।

বরুণ ঘোষকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। বরুণ ঘোষ তরুণদের মধ্যে রীতিমতন নামকরা কবি, ইউনিভার্সিটিতে ইউনিয়নের কর্মী। তার লেখা গান আই পি টি-এ থেকে গাওয়াও হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং বরুণ ঘোষ প্রেমে পড়ে গিয়ে বেশ কিছু প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। স্বীকার করতেই হবে, কবিতা হিসেবে সেগুলো চমৎকার। কিন্তু সেই নিয়ে পার্টির মধ্যে আপত্তি ওঠে। শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা অনেক দূর গড়ায়। বরুণ ঘোষ বরাবরই চটাং চটাং কথা বলে। শেষ পর্যন্ত বরুণকে পার্টি থেকে

এক্সপেল করা হল। বরুণ ঘোষও তেজের সঙ্গে বলে গেছে, আমি আলাদা কাগজ বার করব। আমি দেখিয়ে দেব, বাংলা কবিতা কোন দিকে মোড় নেয়। বরুণ ঘোষের পত্রিকা সত্যিই এর মধ্যেই বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীনতার ঠিক পর পরই অধিকাংশ লেখকই বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছিল। অনেকেই তখন মার্কসবাদী। কিন্তু কয়েক বছর পরে সবার লেখা নিয়ে যখন চুলচেরা বিচার করে দেখানো হতে লাগল, কে কতখানি মার্কসবাদী, কোনটা লেখা উচিত আর কোনটা লেখা উচিত নয়-এই নিয়ে পার্টি থেকে যখন বেশ জবরদস্তি হতে লাগল-অনেক লেখকই তখন সরে গেলেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে। তাদেরই শেষ উদাহরণ বরুণ ঘোষ।

কিন্তু বরুণ ঘোষদের দিকে যাবার কোনও কারণই নেই আমার। বরুণ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যটা তার জীবন মরণের সমস্যা। আমার তো তা নয়। বাদল মুখার্জির দুটো-চারটে কবিতা শুধু এদিকে সেদিকে বেরিয়েছে। না লিখলেও আমার কিছু আসে যায় না। আমি কাজ করতে চাই। আমি একটা আদর্শকে বিশ্বাস করেছি, আমি সেটা নিয়েই থাকতে চাই।

বরুণ ঘোষ সংক্রান্ত আলোচনার সময় আমি কোনও মন্তব্য করিনি। পার্টির নির্দেশ মেনে নিয়েছি, বরুণ ঘোষের কাগজে লেখা দিইনি-কিন্তু তাকে আমি এখনও ভালো কবি মনে করি। এখন যে সবাই মিলে তাকে রি-অ্যাকশনারি বলতে শুরু করেছে, তা আমি মানতে পারি না। আদর্শের মিল না হলেই একজনকে শ্রেণিস্বার্থের দালাল বলতে হবে? বরুণ ঘোষ মানুষটা যে খাঁটি, তা জোর করে অস্বীকার করা হচ্ছে।

কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারেও এখন পার্টির নির্দেশ আসছে। রেণুর সঙ্গে আমি এখানে সেখানে বেড়াই সেটা কয়েকজন দেখে ফেলেছে। প্রথম প্রথম এই নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছে কেউ কেউ। তারপর আমাকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেওয়া হল, রেণুর সঙ্গে যদি আমাকে মিশতেও হয় তা হলে আমার উচিত রেণুকে দিয়ে পার্টির কিছু কাজ করানো। আমি তাও চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু রেণু অন্য ধরনের মেয়ে। পড়াশুনো করতেই ভালোবাসে, বেশি

লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারে না। এখন আমি রেণুর সঙ্গে যথাসম্ভব গোপনে দেখা করি।

আদিনাথদা বললেন, আজ যে কবিতাটা পড়লি, তাতে কী যেন একটা লাইন ছিল? আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিলে, বার বার ঘামে ভেজা মুখ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসব?

কবিতার লাইন কেউ ভুল বললে আমার বিশ্রী লাগে। অনেক মনোবেদনা, অনেক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা কবিতা লেখা হয়। সেটা ভালো হোক বা খারাপ হোক–তবু তার সঙ্গে সেই দুঃখ জড়িয়ে থাকে। কেউ তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করলে মনে বড় লাগে। কিন্তু প্রতিবাদ তো করা যাবে না। ছাপা হয়ে গেলে সে-সম্পর্কে যা খুশি মন্তব্য করার অধিকার সকলেরই আছে।

ওই কবিতাটা লেখার আগের দিন দুপুরবেলা রেণুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল কফি হাউসে। আমি তার আগে মায়ের জন্য জর্দা কিনতে গিয়েছিলাম বড়বাজারে। বড়বাজারের একটা বিশেষ দোকানের জর্দা ছাড়া মা' র অন্য জর্দা পছন্দ হয় না। ফেরার সময় হঠাৎ ট্রাফিক জ্যাম, বিশ্রী বিশৃঙ্খলা, রিকশা, ঠ্যালাগাড়ি, লরি–এইসবের মধ্যে আবার দু-তিনটে ষাঁড়। একটা ট্রামে আমি বন্দি হয়ে বসেছিলাম, অসহ্য গুমটের দিন, এদিকে আড়াইটে বেজে গিয়েছে। রেণু অপেক্ষা করে থাকবে।

ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু বাদেই একটা ঘড়িতে দেখি, তিনটে পাঁচ। আগের ঘড়িটা কি ভুল দেখেছিলাম? আমার নিজের ঘড়ি নেই। আরও দু-তিনটে দোকানের ঘড়ি মিলিয়ে দেখলাম। সত্যিই তিনটে বেজে গেছে। রেণু কি এতক্ষণ বসে থাকবে? ও নিশ্চয়ই ভাববে আমি ভুলে গেছি কিংবা অন্য কিছু। রেণু একলা একলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটা আমাকে মুচড়ে দিল। আমি দৌড়োতে শুরু করলাম। আমাকে গিয়ে বলতেই হবে, আমি ভুলে যাইনি, সময় আমাকে ঠকিয়েছে।

কোনওক্রমে মিনিট দশেকের মধ্যেই কফি হাউসে পৌঁছে দেখলাম, একটা টেবিলে রেণু একলা চুপ করে বসে আছে। রেণু কফি হাউসে এর আগে একবার-দু'বার মাত্র এসেছে–

এখানে বিশেষ কারোকে চেনে না। একলা এতক্ষণ বসে থাকা, একটি মেয়ের পক্ষে, মোটেই সুখকর নয়।

আমি ঝপাং করে রেণুর উলটো দিকের চেয়ারে বসে পড়েই বলতে শুরু করলাম, জানিস বড়বাজারে..উঃ কী অবস্থা...

রেণু সবটা শুনল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, তুমি না এলেও আমি বসেই থাকতাম। রাত্তির পর্যন্ত বসে থাকতাম।

সেই টেবিল থেকে পাখা অনেক দূরে। হাওয়া এসে পৌঁছোচ্ছে না। আমি তখনও হাঁপাচ্ছি। রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসার জন্য আমার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বসন্ত রোগীর মতন আমার মুখখানা ঘামের ফোঁটায় ভরতি। এদিকে আবার রুমাল আনতে ভুলে গেছি। হাত দিয়ে বার বার ঘাম মুছেও কুল পাচ্ছি না।

এ রকম ঘর্মাক্ত তেলতেলে মুখে রেণুর সামনে বসে থাকতে আমার খুব লজ্জা করছিল। রুমাল আনতে ভুলে যাবার জন্য ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের মুখে একটা ঘুষি মারি। রেণুর সঙ্গে কথা বলব কী, আমি শুধু ঘাম নিয়েই চিন্তা করছিলুম।

রেণু কফির কাপে একটু একটু চুমুক দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে আছে। গলায় একটা সরু হার। ডান পাশে সিঁথি কাটা।

রেণু জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

আমি বললুম, রুমাল আনতে ভুলে গেছি।

রেণু অবলীলাক্রমে ওর আঁচলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, মুছে ফেলো।

রেণু আজকাল বাইরে অন্য লোকজনের সামনে তুমি বলে। আগে ওকে বলে বলেও তুই ছাড়ানো যায়নি। হঠাৎ নিজেই একদিন বদলে ফেলেছে।

কফি হাউসে সেদিন আমার বন্ধুবান্ধব কেউ না থাকলেও, অনেকেই মুখচেনা। সকলের মাঝখানে বসে একটি মেয়ের আঁচল দিয়ে কি মুখ মোছা যায়? আশেপাশের টেবিল থেকে আওয়াজ দিতে পারে।

তবু দ্বিধা কাটিয়ে আমি কোনওক্রমে ওর আঁচলটা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ফিরিয়ে দিলাম।

রেণু বলল, ভালো করে মুছলে না? ভালো করে মুছে নাও।

আমি লাজুক ভাবে বললাম, অনেক লোক রয়েছে যে।

রেণু খুব স্বাভাবিক ভাবে বলল, সেই জন্যই তো। লোকজন না থাকলে আমি নিজেই তো তোমার মুখটা মুছিয়ে দিতাম।

এক একটা কথা শুনলে হঠাৎ মনের মধ্যে শিহরন বয়ে যায়। হঠাৎ আমার মনে হল, রেণুর আঁচলটা সুগন্ধে ভরা। হয়তো অন্যদের কাছে এই ব্যাপারটা বা এই কথাটা অতি সাধারণই মনে হবে। আমি কি একটু বেশি বেশি রোমান্টিক?

সেদিন রেণুকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আমি বাসে ফিরছিলুম। অসহ্য ভিড়, তেমনই গরম। সারা দিন বৃষ্টি আসবে আসবে করেও আসেনি। আমার আবার শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। তখন রেণুর আঁচলটা আর একবার পাওয়ার জন্য আমার ভেতরট ছটফট করতে লাগল।

পরের দিন, এই বিষয় নিয়েই একটা কবিতা লিখে ফেলি। লেখার পরই মনে হল কেন লিখলাম? এই ব্যাপারটা আমার এতই ব্যক্তিগত যে অন্য কারওকে কি বোঝানো যাবে? কিন্তু এক এক সময় নিজেকে প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা থাকে না। কবিতা লিখতে বসে, সেই মুহূর্তে আমার আর কিছুই মনে পড়ছিল না, শুধু রেণুর আঁচলটা ছন্দোময় হয়ে ফিরে ফিরে আসছিল। এ ব্যাপারটা আদিনাথদাকে কী করে বোঝাব!

আদিনাথদাকে বললাম, আমি চেষ্টা করেও ভালো লিখতে পারি না!

আদিনাথদা বললেন, সুকান্তর মতন লিখতে পারিস না?

কোনও কবিই অন্য কারওর মতন লেখে না।

সাহিত্য সম্পর্কে তোর ধারণা কী? সাহিত্য কীসের জন্য?

আমি শান্ত ভাবে কথা বললেও আমার ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা রাগ জমছিল। কিন্তু সেই রাগের পরিমাণ যে এত বেশি, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করে কী হবে? আপনি সাহিত্যের কী বোঝেন?

আদিনাথদা একটু অবাক হলেও গলা চড়ালেন না। আমাকে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, আমি অন্তত এইটুকু বুঝি, সাহিত্যকে একটা হাতিয়ার করে তুলতে হবে।

আমি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে এতদিন মিশে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার কোনও সাহিত্যবোধই নেই। যে নিজে সাহিত্য সম্পর্কে কিছুই বোঝে না, সাহিত্য সম্পর্কে তার ফতোয়া দেবার কোনও অধিকার নেই।

আদিনাথদার সঙ্গে এ রকম সুরে কথা বলার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। কোনও দিন এ রকম করিনি। কিন্তু আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলাতে পারলাম না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত এমন হল, আদিনাথদা অন্যদের নিয়ে উলটো দিকে চলে গেলেন, আমি হাঁটতে লাগলাম একা একা। ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল। সাহিত্য ফাহিত্য নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না। আমি লেখা ছেড়ে দিতে পারি যে-কোনও মুহূর্তে। কিন্তু আদিনাথদা আমার মনের কথাটা বুঝতে না পেরে কেন খোঁচা মেরে কথা বলছিলেন! একা একা হাঁটতে এত খারাপ লাগছিল যে আমি একটা পার্কে চুপ করে বসে রইলাম।

৬৭. কাটিহারে গিয়ে দীপ্তিদির বাড়ি

কাটিহারে গিয়ে দীপ্তিদির বাড়ি খুঁজে বার করতে সূর্যর বিশেষ অসুবিধে হল না। দীপ্তিদির বাবা ওখানকার স্টেশন মাস্টার, সূর্য জানত।

কিন্তু সেখানে গিয়েও দীপ্তিদির দেখা পাওয়া গেল না। মাত্র ছ'দিন আগে দীপ্তিদি কাটিহার ছেড়ে চলে এসেছেন।

ছোট মফস্সল শহরে কোনও বাড়িতে একটি অনাত্মীয় যুবক কোনও মহিলার খোঁজ করে না এ ভাবে। কিন্তু সূর্যর ব্যবহারে কোনও জড়তা নেই। সূর্য সরাসরি এসে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, যিনি বেরিয়ে এসেছেন, তাঁকে প্রথমেই বলেছে, দীপ্তিদিকে একটু ডেকে দিন।

বেরিয়ে এসেছিলেন দীপ্তিদির বাবা। তিনি সূর্যর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার নাম?

সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

ভেতরে আসুন।

দীপ্তিদির বাবা খুব বেশি চমকিত হলেন না। মনে হয়, এনাম তাঁর চেনা। তার মেয়ে গোপনে রাজনীতিতে ঢোকার পর মাঝে মাঝেই অচেনা লোকজন এসে তার খোঁজ। করেছে। তারা কেউ দীপ্তির নিজের দলের লোক, কেউ বা পুলিশের। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এখন তো ওসব চুকেবুকে গেছে। এখন আবার সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবার কথা।

তিনি সূর্যকে বললেন, তুমি চা খাবে? আমি তোমার কথা অনেকের মুখেই শুনেছি।

দীপ্তিদি কোথায়?

সে তো এখানে নেই।

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কোথায় গেছেন?

দীপ্তিদির বাবা চোখের ইঙ্গিত করে বললেন, বোসো। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখানে এসে তুমি কোথায় উঠেছ?

সূর্য বলল, কোথাও না। আমি আজই ফিরে যাব।

আজ সারা দিনে আর কোনও ট্রেন নেই। ফিরবে কী করে?

সেটা বড় সমস্যা নয়। দীপ্তিদির সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার।

আমার বাড়িতে জায়গা আছে। তুমি আজ রাত্তিরটা এখানে থেকে যেতে পারো।

দীপ্তিদি কোথায় গেছেন, আমি শুধু সেই কথাটা জানতে চাইছি।

শোনো, তোমাকে আগে একটা কথা বলি। আমার ছেলেমেয়েদের ওপর আমি কখনও জোর করি না। তারা বড় হয়েছে, ইচ্ছে মতন চলবে। বিশেষত আমার ওই মেয়ে বরাবরই স্বাধীন। সে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করুক, আমি কখনও আপত্তি করব না। কিন্তু সে বিয়ে করতে চায় না। আমার বড়শ্যালক সত্যেনের প্রভাবে পড়েই সে স্বদেশি দলে যোগ দিয়েছিল। সত্যেনও চিরকুমার থেকে দেশের সেবা করতে চায়।

সূর্য ধীরস্থির ভাবে সব কথা শুনল। তারপর বলল, দীপ্তিদি কোথায় গেছেন, সেটা আমাকে বলতে কি কোনও বাধা আছে?

ঠিক ধরেছ। সে জানত তুমি এখানে আসবে। তোমাকে কোনও কথা বলতে সে বারণ করে গেছে?

আমি কয়েক দিন আগে এলে দেখা হত?

সে দেখা করতে চাইত কিনা তা অবশ্য বলতে পারি না।

আচ্ছা, আমি তা হলে যাই।

শোনো, শোনো, বোসো। আর একটু কথা আছে। তোমার জন্য দুটি চাল নিতে বলি? বাইরে থেকে এসেছ, অতিথি মানুষ, কিছু না খেয়ে চলে যাবে, তা কি হয়?

আমি খেয়েই এসেছি।

স্টেশনের ধারে ওই দোকানটা থেকে অখাদ্য খাবারগুলো গিলেছ তো? বড় ভুল কাজ করেছ। এখান থেকে দুটি ভাতেভাত খেয়ে যাও।

আমার এখানে আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। দীপ্তিদি কি স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছেন?

সেই রকমই তো শুনছি। তোমাকে সে ভয় পায় কেন? দেখে তো বেশ ভালো ছেলেই মনে হয়।

দীপ্তিদির সঙ্গে একবার অন্তত দেখা করার খুবই দরকার ছিল আমার।

দীপ্তিদির বাবা হঠাৎ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, সত্যেন থাকে। জলপাইগুড়িতে। তার সঙ্গে একবার দেখা করে পরামর্শ নিতে পারো।

.

সূর্য কলকাতায় ফিরে স্টেশন থেকেই সোজা চলে গেল দীপ্তিদির বাড়িতে। সেখানে গিয়ে শুনল দীপ্তিদি কলকাতায় ফেরেননি। স্কুলে খোঁজ নিতে গেল। সেখানে দীপ্তিদি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর পড়াবেন না।

বাড়িতে এসে সূর্য নিজেও একটা চিঠি পেল দীপ্তিদির। চিঠিখানা তার অপেক্ষায় ডাক বাক্সে পড়ে ছিল। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি।

সূর্য,

তোমার বাবার মৃত্যুর সময়েও তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি, কারণ, শোকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমি জানি না। আমি জানি, তুমি নিজেই সবকিছু সামলে উঠতে পারবে। তোমার ওপর যে আমার অনেক ভরসা।

কলকাতা আমার আর ভালো লাগছে না। তাই অনেক দূরে চলে গেলাম। আমি যত দূরেই থাকি, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি। তুমি ভালো থেকো।

দীপ্তিদি

এ রকম নিরলংকার সাদাসিধে চিঠি, তবু সূর্যর মনে হতে লাগল, এটা যেন হেঁয়ালির ভাষায় লেখা। প্রতিটি অক্ষর সে থেমে থেমে পড়তে লাগল বার বার, যেন ওদের কোনও আলাদা মানে আছে। এবং সে কল্পনা করার চেষ্টা করল, কোন অবস্থায় দীপ্তিদি চিঠিখানা। লিখেছেন। চেয়ার-টেবিলে বসে, না বিছানায় শুয়ে শুয়ে? মাথার চুল খোলা ছিল, না খোঁপাবাঁধা? একবারেই চিঠিটা শেষ করেছেন, না আগে আরও কয়েকটা লিখে ছিঁড়ে ফেলেছেন? এসব কথা জানা যেন সূর্যর বিশেষ দরকার।

সূর্য বাড়ির প্রধান দরজার কাছে চিঠিখানা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, এই সময় বাদল ফিরল। সে জিজ্ঞেস করল, সূর্যদা, কখন ফিরলে?

সূর্যর সুটকেসটা তার পায়ের কাছে রাখা। সে বলল, এখনও ফিরিনি তো?

ওটা কার চিঠি?

দীপ্তিদির।

তুমি তো দীপ্তিদির সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলে? দেখা হল না?

না রে।

সূর্যর মুখখানা খুব শান্ত। তার ব্যবহারেও কোনও চাঞ্চল্য নেই। চিঠিখানা ভজ করে পকেটে রাখল। তারপর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বলল, যাই, একটু ঘুরে আসি।

আবার কোথায় যাচ্ছ?

জলপাইগুড়ির দিকে যাব।

এক্ষুনি? বাড়িতে ঢুকবে না? কিছু খেয়েটেয়ে যাবে না?

নাঃ।

কখন ট্রেন?

সেইটাই তো জানি না। সেই জন্য দেরি করতে পারছি না।

বাদল সূর্যর সঙ্গে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত এল। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

বাদল ফিরে আসার পর চিররঞ্জন বললেন, সূর্য কোথায় গেল? তোর সঙ্গেই কথা বলছিল না?

আবার তো চলে গেল!

আবার চলে গেল? কোথায়?

জলপাইগুড়ি।

চিররঞ্জন একেবারে আঁতকে উঠলেন। বললেন, একবার বাড়ির ভেতরে পা-ও দিল? অনেকগুলো দরকারি কাগজপত্রে সই করাতে হবে। এখন এসব সামলাবে কে? সব উড়েপুড়ে গোল্লায় যাবে! যাক, আমার কী!

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ছমাইল দূরে একটা গ্রামের মধ্যে সত্যেন গুহর বাড়ি। বাড়িটাকে তিনি এখন আশ্রম বানিয়ে ফেলেছেন।

সত্যেন গুহ বরাবরই গান্ধীবাদী। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় তিনি গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালি সফরে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি নিহত হবার পর তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে সর্বোদয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছেন।

তার ভাগনি দীপ্তিকে তিনি একসময়ে অহিংস সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্যই টেনে এনেছিলেন। আস্তে আস্তে সে অবশ্য গুপ্ত বিপ্লবীদের দলে চলে যায়। সেকথাও অনেক দিন টের পাওয়া যায়নি। টের পেয়ে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। এখন দীপ্তি আবার তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার জন্য ফিরে এসেছে বলে তিনি খুব প্রসন্ন।

নিজের বাড়িতেই তিনি একটি আবাসিক প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন। ছাত্ররা অধিকাংশই নিম্নবর্ণের বা অন্ত্যজ শ্রেণি থেকে এসেছে। কারওর কোনও মাইনে লাগে না।

কিন্তু কাজ করতে হয়। সংলগ্ন খেতে শাকসবজি চাষ, হাঁস, মুরগি, গোরু পালন এবং তাঁতের কাজ-এর থেকেই সবকিছুর খরচ তুলতে হয়। সরকার থেকে কিছু সাহায্যের প্রস্তাব এসেছিল, সত্যেন গুহ তা নিতে চাননি। দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলাই তাঁর ব্রত।

সারা দিন ধরে মিহিন বাতাসের সঙ্গে উড়ছে বৃষ্টির গুঁড়ো। দূরের পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে নেমে আসছে হালকা হালকা মেঘ। রাস্তার দু'পাশের গাছগুলি স্নানসিক্ত রূপসি। ঝরে-পড়া ফুল থেঁতলে থেঁতলে চলে যাচ্ছে গোরুরগাড়ি।

একটা গোরুরগাড়ি থেকে সূর্য নামল। গাড়োয়ানকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে তার নির্দেশিত সরু পথটা ধরে হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে। হাতের সুটকেসটা খেলাচ্ছলে দোলাচ্ছে।

টিনের বড় ঘরটার সামনের দরজা বন্ধ। সূর্য ডাকাডাকি করল না। ঘুরে এল অন্য দিকে। উঠোনের চার পাশে কঞ্চির বেড়ার ওপর লকলক করছে মালতীলতা। সূর্য সুটকেসটা বেড়ার ওপর রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

দুটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দীপ্তিদি উঠোনে বসে কাপড় কাঁচছিলেন। একটা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে আছেন, সাদা ব্লাউজ, অযত্নে রাখা চুল এসে পড়েছে কপালের ওপরে। এমন সামান্য সাধারণ পোশাক হলেও দীপ্তিদিকে এখানে মনে হয় বিদেশিনী। এই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী রমণী অন্য কোনও দেশ থেকে যেন এখানে বেড়াতে এসেছেন। গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে এত উৎসাহে কাপড় কাঁচলেও এখনও এই পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে যাননি।

সঙ্গের একটি ছেলের চোখ অনুসরণ করে দীপ্তিদি পেছন ফিরে তাকালেন। সূর্যকে দেখে একটুও চমকে উঠলেন না। ঠান্ডা ভাবে বললেন, এসো, ওই দিক দিয়ে ঘুরে এসো, ভেতরে ঢোকার জায়গা আছে।

সূর্য ভেতরে এসে দীপ্তিদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। দীপ্তিদি একটি ছেলেকে বললেন, এই, ভেতর থেকে একটা মোড়া নিয়ে আয় তো!

ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে একটা মোড়া নিয়ে এসে পেতে দিল। দীপ্তিদি সেটা দেখিয়ে সূর্যকে বললেন, এখানে বৃষ্টির মধ্যে বসবে, না ভেতরে গিয়ে বসবে?

সূর্য বলল, এখানেই বসি।

দীপ্তিদি কাপড় কাঁচা বন্ধ না করে বললেন, খেয়ে এসেছ?

সূর্য হাসিমুখে বলল, না।

এখন এই ভর দুপুরে তোমাকে কী খেতে দেব? এখানে একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত উনুন জ্বলে না।

তা বলে কি মুড়ি-চিড়েও কিছু থাকতে নেই?

দীপ্তিদিও এবার হাসিমুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, খুব খিদে পেয়েছে? একটু বোসো তা হলে। হাতের কাজটা সেরে নিই।

এই বৃষ্টির মধ্যে কাপড় কেচে কী লাভ?

এইটাই নিয়ম। রোজ এখানে এ রকম হয়।

তার মানে, কাজ হোক বা না হোক, নিয়মটা মানতে হবেই।

নিয়ম মানাটাই তো একটা কাজ।

একটা কাজ না একমাত্র কাজ?

কোনও কোনও সময় এইটাই একমাত্র কাজ হওয়া ভালো। নইলে জীবনটা বড় ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

বাচ্চাদুটোকেও বৃষ্টিতে ভেজাচ্ছ কেন? ওদের যদি অসুখ করে?

ওরা এত বেশি বৃষ্টিতে ভিজেছে যে, এ জন্য ওদের আর অসুখ হয় না।

এটাও প্রকৃতির নিয়ম? যারা জীবনে খুব বেশি দুঃখ পায়, তাদের কি দুঃখের অনুভূতি থাকে না?

দুঃখ তো প্রকৃতি দেয় না। মানুষ নিজে তৈরি করে বেশির ভাগ সময়।

বালতির জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, বাচ্চা ছেলেদুটি অদূরের পাতকুয়ো থেকে জল আনতে গেল। মস্ত বড় বালতি, জল ভরার পর দুটি ছেলে দু'দিক ধরে আনছে। সূর্য উঠে গিয়ে নিজেই বালতি নিয়ে এল। তারপর বলল, ছেলেদুটিকে এখন ছুটি দিই? আরও জল আনার দরকার হলে আমিই এনে দিতে পারব।

দীপ্তিদি ছেলেদুটিকে বললেন, আচ্ছা, তোমরা এখন যাও।

কাপড়গুলো নিংড়ে তারে মেলে দিতে দিতে দীপ্তিদি বললেন, মাথা ন্যাড়া করে তোমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন? একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল কয়েক দিন আগে।

প্যান্ট-শার্ট পরা সন্ন্যাসী? তোমাকে কক্ষনও সন্ন্যাসী মনে হয় না।

তা ঠিক।

তুমি এখানে কেন এসেছ?

দীপ্তিদি, তুমি জানতে না আমি আসবই?

জানতাম। তবু জিজ্ঞেস করছি, কেন এসেছ?

তোমাকে নিয়ে যেতে।

তুমি কি জানেন যে আমাকে আর নিয়ে যেতে পারবে না?

না।

যদি চলেই যাব, তা হলে কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম কেন?

কেন চলে এলে, সে কথা তো বলোনি এখনও?

আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই।

অথচ তুমি বলেছিলে, চিঠিতেও লিখেছ, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে।

তা তো আছিই। কিন্তু তার জন্য কাছাকাছি থাকা দরকার নেই।

আছে।

না।

তুমি বুঝতে পারো না, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়? আমি এক মুহূর্তের জন্য অন্য কোনও কিছু চিন্তা করতে পারি না।

আস্তে আস্তে অভ্যাস করতে হবে।

আমি পারব না।

তোমাকে পারতেই হবে, সূর্য। কারণ সেইটাই স্বাভাবিক। তুমি এখন যা চাইছ, সেটা স্বাভাবিক নয়।

মোটেই না!

সূর্য, এখানে কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না। তুমি যদি বাড়াবাড়ি করো, তা হলে আমাকে এ জায়গা ছেড়ে আরও অনেক দূরে চলে যেতে হবে।

দীপ্তিদি, তুমি কত দূরে যাবে? তুমি জানো না, তুমি হিমালয়ের শেষে কিংবা কন্যাকুমারিকায় চলে গেলেও আমি তোমাকে সেখানে তাড়া করে যাব?

দীপ্তিদি হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। মনে হল, তার চোখে জল এসে গেছে। ধরা। গলায় বললেন, তুমি কেন আমাকে এ রকম উতলা করে দিচ্ছ? আমি এখানে খুব শান্তিতে আছি।

সূর্য বলল, আমিও এখানে থাকব। তারপর সে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

.

সত্যেন গুহ শহরে গিয়েছিলেন, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সূর্য ততক্ষণে গেঞ্জি ও ফুলপ্যান্ট পরে মাঠে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে নেমে গেছে। অনেক দিন পর তাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। কাদা-ছড়ানো মাঠে সে দারুণ উৎসাহে দৌড়োদৌড়ি করছে। ছেলেদের সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে, আশ্রমের বড়মা, অর্থাৎ সত্যেন গুহর দিদি নিরুপমা ডেকে ডেকেও ছেলেদের ফেরাতে পারেননি মাঠ থেকে।

সত্যেন গুহ গোরুরগাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলেন। মাঠের মধ্যে একটি অপরিচিত যুবককে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন খেলা, তারপর নিজেই মাঠের মধ্যে ঢুকে বললেন, কই, দাও দেখি, আমার দিকে বলটা দাও একবার।

প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়স হলেও সত্যেন গুহর স্বাস্থ্যটি এখনও মজবুত আছে। রোগা পাতলা বেঁটেখাটো মানুষ, মাথার চুলগুলো পেকে গেলেও হাঁটাচলা খুব সাবলীল। বলে জোরে এক কিক কষিয়ে তিনি বললেন, হেড করো।

সূর্য ছুটে এসেও বলটা মাথায় লাগাতে পারল না। স্কুলে পড়ার সময় সে ভালোই খেলত, তারপর অনেক দিন অভ্যাস নেই।

সত্যেন গুহ তাকে বললেন, একটা হাই কিক করো তো, দেখি কত জোরে মারতে পারো!

সূর্য বলটা হাতে ধরে কিক করল, বেশ উঁচুতেই উঠল, কাছাকাছি গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে। সত্যেন গুহ বললেন, বাঃ!

দু'জনে কেউ কারওর পরিচয় জিজ্ঞেস করেনি এখনও। খেলার মাঠে তার দরকার হয় না বলেই। ছেলেদের দল দু'ভাগ করে দুজনে দু'দলে গিয়ে খেলল আরও কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত সত্যেন গুহ একবার কাদার মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সূর্য দৌড়ে এসে ওঁর হাত ধরে তুলল। তিনি কোমরে হাত দিয়ে বললেন, উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।

খুব বেশি লেগেছে?

কোমরটা আজকাল বড় জ্বালাতন করে। শরীরটা আর নিজের বশে নেই, বুঝলে!

আপনি তো এখনও বেশ ভালোই খেলেন।

এককালে এরিয়ান্স টিমে খেলতাম। তুমি খেলোটেলো নাকি?

না।

তুমি কোথায় থাকো?

সূর্য হাত দেখিয়ে বলল, এই আশ্রমে।

সত্যেন গুহ মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, বটে! এই আশ্রমে থাকো? আর আমিই সেটা জানি না। তুমি কোথা থেকে এসেছ?

কলকাতা থেকে।

ও বুঝেছি। তোমার নাম নিশ্চয়ই সূর্য?

সূর্য বলল, আপনিই কি সত্যেন গুহ?

সত্যেন গুহ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমি তো শুনেছি তুমি অতি বদ ছেলে। তুমি এখানে এসেছ কী করতে?

আমি আপনার এখানে থাকব।

তোমাকে খাওয়াবে কে? আমি কি এখানে দানছত্তর খুলেছি যে, যে আসবে তাকেই খাওয়াব?

আপনারা যা খান তাই খাব। তার বদলে কাজ করব।

তুমি কী কাজটা করবে শুনি?

কথা বলতে বলতে ওরা চলে এলেন টিনের ঘরটার সামনে। দরজা এখন খোলা, ভেতরে একটা বিরাট শতরঞ্চি পাতা। দরজার ঠিক বিপরীত দিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটি ছোট বেদিতে গান্ধীজির একটি চন্দনচর্চিত ফটো, সামনে ধূপ জ্বলছে। এক পাশে আশ্রমের বড়মা পূজারিণীর ভঙ্গিতে বসে আছেন।

সত্যেন গুহ হাত-পা ধুয়ে সেখানে গিয়ে বসলেন। ছেলেরাও সবাই হাতে-পায়ে জল দিয়ে বসল এসে শতরঞ্চির ওপর, হাঁটু মুড়ে। দীপ্তি একটা ধূপদানি এনে ঘর ভরিয়ে দিলেন ধূপের ধোঁয়ায়। সত্যেন গুহ রামধুন গান ধরলেন, ছেলেরা গলা মেলাল।

সূর্য দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে। দৃশ্যটা দেখে, অনেক দিন আগে মেদিনীপুরের এক গ্রামে তমোনাশ ডাক্তারের বাড়ির কথা মনে পড়ল। যদিও কিছুটা তফাত আছে। তমোনাশ ডাক্তার খানিকটা পাগল ধরনের ছিলেন, গানের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করতেন। সত্যেন গুহর মধ্যেও অন্য রকম পাগলামি আছে নিশ্চয়ই। গান্ধীবাদীরা পাগল ছাড়া আর কী!

গান শেষ হবার পর, সূর্য আশা করেছিল, সত্যেন গুহ নিশ্চয়ই ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেবেন, অন্তত হরিজন পত্রিকার পুরনো ফাঁইল থেকে কিছু পড়ে শোনাবেন তো বটেই।

কিন্তু সে রকম কিছু হল না। গান শেষ হবার পর সত্যেন গুহ চোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে রইলেন। অন্য সবাই ওঁকে অনুসরণ করল। অর্থাৎ এটা নীরব প্রার্থনার সময়। প্রার্থনার জন্য কোনও সমবেত ভাষা নেই।

সব ছেলেই যদিও চোখ বন্ধ করে ছিল, কিন্তু সত্যেন গুহ চোখ খোলা মাত্রই তারাও চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল। কেউ কোনও গোলমাল করল না, নীরবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে বেরোবার পর তাদের ছোটখাটো চেঁচামেচি শোনা গেল।

ঘর ফাঁকা হয়ে যাবার পর সত্যেন গুহ কাছে আসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। সূর্য হাঁটুগেড়ে বসল। সত্যেন গুহ জিজ্ঞেস করলেন, মাথা ন্যাড়া কেন?

সূর্য কারণটা জানাল।

তুমি জেল খেটেছিলে না একসময়?

হ্যাঁ।

কোন দলে ছিলে?

আমি রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কখনও ঠিক রাজনীতি করিনি।

এখন?

এখন ও-সব থেকে দূরে থাকতে চাই।

এখনই তো বেশি কাজ করবার সময়।

কাজ করবার জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি।

মিথ্যে কথা বোলো না, মিথ্যে কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।

আপনি ঠিক মানুষ চিনতে পারেন না বোধহয়। মিথ্যে কথা বলা আমার স্বভাব নয়। সত্যেন গুহ মুখ তুলে সূর্যর দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, পৃথিবীতে মানুষের অনেক সমস্যা আছে। কারওর হৃদয়ঘটিত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।

সূর্য ওঁর চোখে চোখ রেখে বলল, আমি আপনার কাছে কোনও সমস্যা নিয়ে আসিনি। আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি। আমি এখানে থাকতে চাই, তারপর যা হবার তাই হবে।

এই সময় দীপ্তি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু আমি একটু আসব?

সত্যেন গুহ দীপ্তিকে দেখে যেন বেশ স্বস্তি পেলেন। বললেন, হ্যাঁ, আয়, আয়। এই ছেলেটাকে আমি একলা সামলাতে পারছি না।

দীপ্তি তার পাশে এসে বসার পর তিনি বললেন, এই ছেলেটি এখানে থাকতে চায়। বলছে।

দীপ্তি খুব শান্ত ভাবে বললেন, আজকের রাতটা তো থাকবেই, আজ তো আর ফিরে যাবার উপায় নেই, কাল চলে যাবে।

সূর্য বলল, না।

সত্যেন গুহ এবার একটু হেসে বললেন, এ তো মনে হচ্ছে পাকাপাকিই থাকতে চায়। এ-বিষয়ে তোর কী মত?

আমার মত নেই।

সূর্য দীপ্তির চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করল। দীপ্তি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

সত্যেন গুহ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সূর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে থাকতে চাও কেন।

আপনাকে তো বলেইছি, আমি কিছু কাজ করতে চাই।

তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি এখানে কী কাজ করবে?

আপনি বুঝি গরিব? যাদের মনটা ছোট তারাই মুখে সব সময় গরিব গরিব করে।

ওরে দীপ্তি, এ-যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে!

দীপ্তি ভর্ৎসনার সুরে বললেন, সূর্য, তুমি বড়মামার সঙ্গে এ রকম ভাবে কথা বোলো না।

সত্যেন গুহ তাড়াতাড়ি বললেন, না, না, আমি কিছু মনে করিনি। পরিষ্কার কথা বলাই তো ভালো। কিন্তু আমি একটাই কথা শুধু বুঝতে পারছি না, একে আমরা কোন কাজে। লাগাব।

দীপ্তি বললেন, ওর জন্য সে রকম কোনও কাজ আমাদের এখানে নেই।

সূর্য বলল, দীপ্তিদি, আমি তো চাকরি খুঁজতে আসিনি। এটা আশ্রম, এখানে তো যত বেশি কাজের লোক পাওয়া যাবে ততই কাজ বাড়বে।

তোমার বাবাও তো একটা অনাথ আশ্রম চালাতেন কলকাতায়। তুমি তো সেখানেই কিছু করতে পারতে। সেটাই তোমার উচিত ছিল। সেটা না করে তুমি এখানে চলে এলে কেন?

সূর্য এতক্ষণে দীপ্তির চোখের দৃষ্টি ছুঁতে পেরেছে। চাপা রাগে তীব্র ভাবে সেই দিকে তাকিয়ে বলল, দীপ্তিদি, আমাকে এত জেরা কোরো না। আমি যুক্তি সাজিয়ে কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমার এখানেই কাজ করতে ভালো লাগবে। কলকাতায় আমার মন টেকে না! আমিও তো কিছু লেখাপড়া জানি, আমি এই আশ্রমের ছেলেমেয়েদের পড়াতেও পারি।

সত্যেন গুহ বললেন, তোমরা যা লেখাপড়া শিখেছ, আমি আমার আশ্রমের ছেলেমেয়েদের তা শেখাতে চাই না। ওই বিদেশি ধাঁচের কুশিক্ষা দেশ থেকে যত

তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল। ঠিক আছে, তোমাকে আমি অন্য কাজ দেব। তার আগে আর একটা কথা বলব, শুনবে?

বলুন!

আমি সব মানুষকেই সন্ন্যাসী হতে বলি না। তবে প্রত্যেকেরই জীবনের কতকগুলো আলাদা আলাদা ক্ষেত্র আছে। আমি আমার এই আশ্রমটিকে সংসারী মানুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে চাই। তোমার মধ্যে যে রকম প্রাণশক্তি আছে, তোমাকে নিজে থেকে আমি সংযমী হবার উপদেশ দিতে পারি না। সেই জন্যই বলছিলাম, তোমার মতন ছেলের জায়গা এটা নয়!

পরীক্ষা করে দেখুন।

তুমি পারবে?

পারব কিনা জানি না। পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কী?

ঠিক আছে দীপ্তি। তুই ছেলেদের ঘরে ওর শোবার জায়গা করে দে আজকের মতন। কাল থেকে অন্য যা-তোক ব্যবস্থা করা যাবে।

সূর্য সেখানেই রয়ে গেল। সকাল থেকে সে ছেলেদের সঙ্গেই সারাক্ষণ থাকে। মাঠে গিয়ে মাটি কোপায়, পুকুরে তাদের সাঁতার শেখায়, দুধেলা গোরুটা কখনও দড়ি খুলে পালিয়ে গেলে দৌড়োদৌড়ি করে ধরে আনে। খেলার মাঠে তো সে আছেই। শুধু সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনায় সে যোগ দেয় না। গান্ধীজির ছবির সামনে সে কখনও বসবে না এ কথা সে সত্যেন গুহকে আগেই বলে নিয়েছে। এর সঙ্গে তার বর্তমান জীবনযাত্রার কোনও সম্পর্ক নেই। এ শুধু অতীতের অভিমান।

আশ্রমের পেছন দিকে অনেকখানি জমি পড়ে আছে। সেটা আশ্রমেরই সম্পত্তি। সেটাকে কাজে লাগাবার জন্য সত্যেন গুহ একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেখানে একটা

ইটখোলা হবে। আশ্রমেরই ছেলেরা মাটি কেটে ইট বানাবে। তারপর সেগুলো পুড়িয়ে যা ইট তৈরি হবে-তার অর্ধেক বিক্রি করা হবে খরচ তোলার জন্য, বাকি অর্ধেক গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে বিলি করা হবে। তাদের ঘর তুলে দিতে ছেলেরাই সাহায্য করবে। একজন মাত্র পেশাদার মিস্ত্রিকে নিযুক্ত করা হয়েছে কাজ শেখাবার জন্য।

সূর্য স্বভাবতই এই পরিকল্পনাটার দায়িত্ব নিয়ে নিল। সারা দিন সে অসুরের মতন পরিশ্রম করে। বইটইয়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই এখন, কোনও রকম নেশাও। নেই, এই কাজই যেন তার একমাত্র নেশা।

শুধু দীপ্তির সঙ্গে তার একবারও সে রকম ভাবে দেখা হয় না।কখনও কখনও দূর। থেকে একপলক দেখতে পায়। লোকজনের মাঝখানে দীপ্তি সূর্যর সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবে কথা বলেন, কিন্তু সূর্যকে একা তার কাছাকাছি আসার সুযোগই দেন না। সে রকম সম্ভাবনা দেখা দিলেও আগে থেকেই এড়িয়ে যান।

কখনও কখনও দীপ্তিকে টুকিটাকি কাজের জন্য যেতে হয় জলপাইগুড়ি শহরে। একা যাবার নিয়ম নেই, অনন্ত নামের একটা কিশোর ছেলেকে নিয়ে যান। সূর্যর মনটা তখন একটু ছটফট করে কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

সত্যেন গুহ প্রথম প্রথম কয়েক দিন সূর্যর দিকে বিশেষ নজর রেখেছিলেন। কোনও ত্রুটি ধরতে পারেননি। সূর্য একবারও লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করার চেষ্টা করেনি দীপ্তির সঙ্গে, কোনও রকম দাবি জানায়নি-সে নিজেকে কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিয়েছে। এই কাজই যেন তার নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তি।

মাটি কাটতে কাটতে হঠাৎ কখনও মুখ তুলে সূর্য দেখে দূরে ক্ষীণ মেঠো রাস্তা ধরে দীপ্তি হেঁটে যাচ্ছেন। গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আকাশ। দীপ্তির সমুন্নত বরাঙ্গ সূর্যর চোখের সামনের আকাশ ঢেকে দেয়। যতদূর দেখা যায় সূর্যর চোখ তাকে অনুসরণ করে।

সেই সময় সূর্যর মুখ দেখলে মনে হয়, তার মতন অতৃপ্ত মানুষ এ-পৃথিবীতে আর একজনও নেই।

৬৮. সূর্যর চালচলন ক্রমশ

সূর্যর চালচলন ক্রমশ বেশ স্বাভাবিক হয়ে এল। তার ছটফটানি এখন আর নজরে পড়ে না। দীপ্তির দিকে আর তাকায় না ঘোরলাগ: চোখে। দীপ্তির সঙ্গে আড়ালে দেখা করার ছুতো খোঁজে না। তা ছাড়া তার সময়ই বা কোথায়। সব সময়েই তো সে নানান কাজে ব্যস্ত। একসময় সূর্যর মনে হয়েছিল, তার কোথাও যাবার জায়গা নেই, কোনও বন্ধু নেই, কোনও দায়িত্বে আস্থা নেই, সেই জন্য দীপ্তির বুকই তার মুখ লুকোবার একমাত্র জায়গা। এখন সূর্য তার মুক্তির একটা ক্ষেত্র পেয়ে গেছে।

এর আরেকটা দিকও আছে। তার রাগ এবং জেদের মতন অভিমানও খুব তীব্র। দীপ্তির প্রতি সে এখন একটা প্রচণ্ড অভিমান বোধ করে। দীপ্তির জন্য সে সবকিছু ছাড়তে রাজি ছিল, তবু দীপ্তির এই রকম ব্যবহারের কোনও কারণই সে খুঁজে পায় না। এই অভিমান বশে সে একলা ঘরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারত কিংবা দীপ্তিকে খুন করতেও পারত, তার বদলে সে নিজেকে বাইরের জীবনে ছড়িয়ে দিল। কারোকে সে কিছু বুঝতে দেয় না। সত্যেনবাবুর মতন ভূয়োদর্শী মানুষও একসময় মনে করলেন, এই ছেলেটির সম্পর্কে তিনি আগে ভুল ভেবেছিলেন। টেররিস্টগুলোর মতন গোঁয়ারতুমি থাকলেও এর নৈতিক চরিত্র সন্দেহের উর্ধ্বে।

সত্যেন গুহ তার আশ্রমটি যে রকম গড়তে চেয়েছিলেন, সূর্য এসে তার রূপ অনেক পালটে দিল। গরিবের ছেলেদের পড়ানো, মাঠে শাকসবজি লাগানো আর প্রার্থনা ট্রার্থনার মতন নিরামিষ ব্যাপারে সে আবদ্ধ রইল না। আগে যে একটি চুপচাপ শান্ত। পরিবেশ ছিল, সূর্য তার মধ্যে এনে দিল প্রাণের চাঞ্চল্য ও হুল্লোড়। আশ্রমের ছেলেগুলোর মধ্যে এনে দিল অ্যাডভেঞ্চার-স্পৃহা। আগে এখানকার ছেলেদের অন্য স্কুলের ছেলেরা গেঁধে

আশ্রমের চ্যালা বলে বিদ্রূপ করত কয়েক মাসের মধ্যে এরা। সূর্যর প্রেরণায় জেলা স্কুলের ফুটবল টিমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাত গোলে হারিয়ে সম্মান আদায় করে নিল। আগে এদের পোশাক ছিল ঠেঙো ধুতি ও খদ্দরের ফতুয়া, সূর্য সে- সব ছাড়িয়ে এদের হাফপ্যান্ট ও হাফশার্টের ফিটফাট পোশাকের প্রবর্তন করেছে। প্যান্টের সঙ্গে বেল্ট পরা বাধ্যতামূলক। এখানে আশ্রমে চরকায় সুতো কাটা হয়। বটে, কিন্তু সূর্য সেই সুতো খাদি ভাণ্ডারে বিক্রি করে আসে, ছেলেদের ব্যবহার করতে দেয় না। সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, খদ্দর টদ্দর বড়দের ব্যবহার করার জন্য চলতে পারে, ছোটদের জন্য দরকার নেই। আমেদাবাদ জায়গাটা তো ভারতবর্ষেই, সেখানকার মিলে তৈরি ছিট কাপড় ব্যবহার করায় দোষের কী আছে? সত্যেন গুহ প্রথম প্রথম ক্ষীণ আপত্তি তুলেছেন, কিন্তু জোর করে বাধা দেননি।

আশ্রমের ছেলেগুলো এসেছে খুবই গরিবের সংসার থেকে অনেকের বাড়িতেই খাবার জুটত না। এইসব ছেলেদের বা তাদের বাবা-মা'র একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, যদি ওরা এখানে থেকে লেখাপড়া শিখে কোনওক্রমে ভদ্রলোক হতে পারে। সূর্য ওদের মধ্যে মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচবার মতন একটা দৃঢ়তা এনে দিচ্ছে। কেউ মিনমিনে গলায় কথা বললে সূর্য তাকে এক ধমক দেয়।

মাঝে মাঝে সে ওদের নিয়ে যায় দূরের জঙ্গলে শিকার করতে। আশ্রমে অবশ্য পিকনিকের কথা বলে যায়। এর মধ্যে ওরা দুটো বুনোশুয়োর ও একটা হরিণ মেরেছে। হরিণটা অবশ্য মারার ইচ্ছে ছিল না, ধরতেই চেয়েছিল ওরা। কিন্তু ঝটাপটিতে সেটার শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। হরিণটাকে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হরিণের মাংস আশ্রমে নিয়ে আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আবার ফেলে দিয়ে আসার কথাও কি চিন্তা করা যায়? আশ্রমের ছেলেদের আমিষ আহার নিষিদ্ধ। জঙ্গলের মধ্যেই গোপনে সেটা কেটেকুটে রান্না করে খেয়ে ফেলার লোভ সূর্য অতি কষ্টে দমন করেছে। দলবল নিয়ে তিন মাইল দূরের একটা আদিবাসীদের গ্রামে দিয়ে এসেছে হরিণটা। হরিণটা পেয়ে আদিবাসীদের উল্লাস দেখাও

একটা উপভোগ্য ব্যাপার। এর কয়েক দিন বাদে আবার সূর্য তার ছেলেদের নিয়ে এই আদিবাসী গ্রামটিতে একটি মস্ত বড় কুয়ো খুঁড়ে দিয়ে আসে।

সূর্যর মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, তা প্রকাশের একটা পথ পেয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার সরল জেদ কোনও রকম বাধাকেই অনতিক্রম্য মনে করে না।

এতকাল সত্যেন গুহর নিরীহ সর্বোদয় আশ্রমটি সম্পর্কে কারওর কোনও ঔৎসুক্য ছিল না। সূর্য আসার পর অনেকেরই এদিকে চোখ পড়ে, তার সম্পর্কে অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের আগ্রহ জাগে। প্রথমত সে অত্যন্ত সুপুরুষ, তার দিকে সকলের চোখ পড়বেই। তা ছাড়া, সে যে একসময় বোমা-পিস্তল নিয়ে কারবার করেছে এবং জেল খেটেছে–এ খবরও সহস্রকান জনতার জানা হয়ে যায়–এ-সম্পর্কে অনেক রোমান্টিক গল্পেরও জন্ম হয়। এবং সে নাকি বড়লোকের ছেলে, সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে এসেছে। সর্বত্যাগী বড়লোকের ছেলেরা এখনও এ-দেশে বেশি শ্রদ্ধা পায়। সুতরাং জনশ্রুতির নায়ক হবার সব রকম যোগ্যতাই তার আছে। আসলে যে সে একটি ছেলেমানুষ ধরনের ক্রেদি মানুষ–এই সত্য পরিচয়টাই লোকের চোখে ধরা পড়ে না।

ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিষ্ট পার্টি এবং আর সি পি আই-এর কর্মীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তার সঙ্গে ভাব জমাতে আসে। তাকে দলে টানার জন্য সকলেই উৎসুক।

সূর্য সকলকেই এক রকম উত্তর জানিয়ে দিয়েছে। সে বলেছে, আপনারা পলিটিকস বোঝেন, আমি রাজনীতিফিতি একেবারেই বুঝি না। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি এ-ও জানি, এ-দেশে সমাজতন্ত্র আনতে হলে একটা যুদ্ধ করতে হবে। আগের থেকেও অনেক বড় যুদ্ধ। দেখছেন না, পুঁজিপতি ব্যবসায়ী আর দালালরা এদেশের শাসন যন্ত্রটা কী রকম ভাবে দখল করে নিচ্ছে। যুদ্ধ ছাড়া এরা কেউ সে অধিকার ছাড়বে না। সেই যুদ্ধে আমিও লড়াই করতে রাজি আছি। দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। কারণ গান্ধীবাদ আমার অস্থি মজ্জায় নেই। গান্ধীবাদ একজন মানুষের নিজস্ব জীবনের ক্ষেত্রে খুবই ভালো,

কিন্তু এই আদর্শে দেশ চালাবার চিন্তা করা বোকামি ছাড়া কিছুই না। এ-দেশের সরকারও যে খুব শিগগিরই গান্ধীবাদের ভেক ছেড়ে দেবে তাও আমি ভালো ভাবে জানি।

তবে, আমার আর একটা কথা আছে। সমাজতন্ত্রের জন্য সেই লড়াইটা চালাবে কে? যুদ্ধ তো শুধু সোলজার দিয়ে হয় না, তার জন্য একজন সেনাপতি লাগে। কে সেই সেনাপতি হবে। সেইটা আগে আপনারা ঠিক করে নিন। আপনারা এক মার্কসবাদের নাম করেই পাঁচ-ছ'টা আলাদা পার্টি খুলেছেন, আমি এর মানে বুঝতে পারি না, কোনও দিন আমার মাথাতে ঢুকবেও না। আপনারা আগে সবাই একমত হয়ে নিন, কে হবে ভারতের লেনিন। আমি সে রকম কারোকে দেখি না। যদি সে রকম কারোকে পাওয়া যায়, আর বিপ্লবের লড়াইয়ের ঠিক মতন প্রস্তুতি হয়, তা হলে আমাকে খবর দেবেন। আমি একজন সামান্য সোলজার হিসেবে যথা সম্ভব লড়াই দিয়ে আসব। সে রকম দিন যতদিন না আসে, ততদিন আপনারা যত ইচ্ছে পলিটিকস করুন, আমি যে রকম জীবন নিয়ে আছি, তাতেই বেশ আছি।

সূর্যর কথাটা কোনও দলের কর্মীদেরই পছন্দ হয় না। কেন না, সব দলেরই রিজিওন্যাল কমিটির কে সেক্রেটারি আর কে প্রেসিডেন্ট হবে, এ নিয়ে সব সময় চলছে একটা ঠান্ডা লড়াই। রিজিওন্যাল কমিটি থেকে কে কবে যাবে সেন্ট্রাল কমিটিতে- তারও একটা চিন্তা আছে। এইসব জরুরি বিষয় সমাধানের পর তো অন্য কথা। সত্যিকারের বিপ্লবের জন্য কোনও দিন লড়তে হবে, একথা কেউই মনের নিভৃততম প্রদেশে বিশ্বাস করে না। ও রকম যদি কখনও হয় তো হঠাৎ হয়ে যাবে। তার আগে, ব্যক্তিগত জীবনে বা দলগত ভাবে যত রকম দোষত্রুটি সবকিছু ঢাকবার জন্যই বিবেকের কাছে আছে এক মহৌষধ, মূল সমস্যার সমাধান না করতে পারলে এ রকম তো হবেই!

যাকে দলে টানতে পারা যায় না, তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, এটাই আধুনিক রাজনীতির নিয়ম। সূর্যর অজ্ঞাতে তার শত্রুসংখ্যা বাড়তে লাগল। কখনও সখনও সে যখন শহরে আসে, তখন ওইসব কর্মীদের সঙ্গে দেখা হলে সে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার জন্য কথা বলতে যায়। কিন্তু তারা কাষ্ঠ হাসি দিয়ে সরে পড়ে একটু বাদেই। এইসব

ছেলেদের মধ্যে অনেকে আছে আন্তরিক দেশকর্মী, কিন্তু নিছক থিয়োরির মন্ত্রে মাথা ঘুলিয়ে ফেলেছে, অন্যের সঙ্গে তর্ক হলেই নানান বইয়ের লাইন উদ্ধার করে উদাহরণ দেয়-মানুষকে তার স্থান কালের পটভূমিতে বিচার করতে ভুলে যায়। সূর্যর মনের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা কেউ করল না।

কয়েক দিন পর আচমকা একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল এলাকাটা জুড়ে। সত্যেন গুহর আশ্রমটা আসলে একটা বেলেল্লাপনার জায়গা। সূর্য আর দীপ্তি বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রীর মতন একসঙ্গে থাকে। সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যে ওদের বেসামাল অবস্থায় কত লোক স্বচক্ষে দেখেছে। কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ওরা এখানে পালিয়ে এসেছে। কয়েকজন কলকাতা থেকে টাটকা এবং পাকা খবর নিয়ে এসেছে-এককালের চন্দননগর মামলার বিখ্যাত দীপ্তি সরকার এক ছোকরার সঙ্গে বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন এখানে এসে আবার সেই লীলাখেলা শুরু করেছেন। এমনকী ওই আশ্রম পরিচালনার টাকা কোন গোপন সূত্র থেকে আসে সে-বিষয়ে তদন্ত করার জন্যও জেলা শাসকের কাছে উড়ো চিঠি গেল।

এসব কথা একবার বাতাসে ছেড়ে দিলেই হল। তারপর বাতাস নিজের গুণেই তা উড়িয়ে বেড়াবে। এবং যত বেশি ছড়ায় ততই এর বলবৃদ্ধি হয়। যৌন ব্যভিচার এবং গুপ্তচর বৃত্তি এই দুটি অভিযোগের মজা এই, যে-কেউ একবার শুনবে, কিছুতেই পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারবে না। যত বিশ্বাসের পাত্রই হোক, তবু মনে হবে ভেতরে একটা কিছু নিশ্চয়ই ব্যাপার আছে। যা রটে তার কিছু অন্তত বটে।

উড়তে উড়তে গুজবটা একদিন আশ্রমে এসেও পৌঁছোল। প্রথম কয়েক দিন কেউ এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না, প্রত্যেকেই অপরের কাছে এমন ভাব দেখাতে লাগল যে, সে কিছু শোনেনি।

গুজবটার সবচেয়ে নির্মল দিক এই যে, এটা যে-সময় ছড়াল, সে-সময় সূর্য আর দীপ্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ জীবন কাটাচ্ছে। সূর্য মেতে আছে ছেলেদের নিয়ে, দীপ্তি আশ্রম

পরিচালনার দিকটা দেখছেন। আর, হাতে কিছুটা সময় পেয়ে সত্যেন গুহ'নোয়াখালিতে গান্ধীজির সঙ্গে এই নামে স্মৃতিকথা রচনায় ব্যাপৃত।

দীপ্তি আশ্রমের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শহরে গিয়েছিলেন তেল, নুন, মশলা কিনে আনতে। মাসে দু-তিন বার তাঁকে এ রকম আসতে হয়। দোকানের লোকদের সঙ্গেও চেনা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, দোকানের লোকজন যেন তার দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে। এই রকম দৃষ্টি গায়ে বেঁধে। কিন্তু এসব ব্যাপার শুধু অনুভব করা যায়, মুখে কিছু তো বলা যায় না।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটি সেরে দীপ্তি ফিরে আসছিলেন, বাবুপাড়ায় দুটি ছেলে একেবারে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দীপ্তিকে দেখে একজন বেশ জোরে বলল, এই সেই মাগিটা না?

মাগিটার বেশ চটক আছে কিন্তু। এই চটক দেখেই ছেলেটা মজেছে।

ছেলেটার চেহারাও তো কার্তিকের মতন লালটুমার্কা। দেখিসনি?

আর একজন বলল, হ্যাঁ। ছেলেটা বড় না মেয়েটা বড় রে?

এই রকম আরও কিছু কথা দু'জনে বলাবলি করল। মনে হয় যেন কথাগুলো আগে থেকেই তৈরি করা।

যৌবনে নির্লজ্জতার মধ্যে এক রকম আনন্দ আছে। কেউ কেউ সেই আনন্দের স্বাদটাই একটু বেশি করে পেতে চায়। এই যুবক দুটির মধ্যেও লজ্জা বা গোপনীয়তার চিহ্নমাত্র নেই। তারা দীপ্তিকে কথাগুলো শোনাতেই চেয়েছে। এমনকী, দীপ্তির সঙ্গে যে একটি ছোট ছেলে আছে-ততটা ছোট নয় যাতে এসব বুঝতে পারবে না—তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

যুবক দুটির বয়স কুড়ি-একুশ হবে। ওরা যখন নিতান্ত বালক ছিল, তখন দীপ্তি এক রাত্রে পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলায় পেছনের পাঁচিল থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তারপর

অন্ধকারের মধ্যে দৌড়োতে গিয়ে একটা পানাপুকুরে পড়ে যান এবং তাঁর চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তোলা হয়। মেয়ে বলেও তাকে পরে থানার অত্যাচার থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি। বেয়াল্লিশে কোনও দয়ামায়া ছিল না–স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার হাতের আঙুলের নখের মধ্যে পিন ফোঁটানো হয়েছিল। তারা এইসব সহ্য করেছিলেন শুধু একটা স্বপ্ন দেখে। একদিন এই দেশ স্বাধীন হবে, তারপর এখানে সুস্থ মানব সমাজ গড়ে উঠবে।

যুবক দুটি এসব জানে না। তাদের জানবার কথাও নয়, তাদের বাবা মারা-ই এর মধ্যে ভুলে গেছে। ওই যুবক দুটির চোখে দীপ্তি একটি নারী মাত্র, যার যৌবন এখনও অক্ষুণ্ন আছে–খানিকটা কলঙ্ক রটায় যাকে আরও মোহময়ী মনে হয়।

কথাগুলো শুনে দীপ্তির.শরীরে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগল। সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে মেয়েরা মাথা নিচু করে চলে যায়, না শোনার ভান করে। কিন্তু দীপ্তি জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

যুবক দুটি সোজাসুজি দীপ্তির চোখে চোখ রাখল। তারা তৈরি হয়ে আছে। দীপ্তি কিছু বললেই তারা আরও অনেকগুলো কুবাক্য ছড়াবে। এমনকী তারা একটা খারাপ গানও গাইতে পারে। কেউ তাদের সেই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

দীপ্তি কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষে। তাঁর চোখে রাগ নেই। অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা অভিমান ঠেলে আসতে চাইছে তার বুক থেকে। তিনি বলতে চাইলেন, তোমরা আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো, আমার মুখে যদি কোনও পাপ দেখতে না পাও, তা হলে ফিরিয়ে নাও তোমাদের কথা।

কিন্তু মুখে এসব উচ্চারণ করা যায় না। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে সঙ্গের ছেলেটিকে বললেন, চল।

তিনি কিছু দূর চলে যাবার পর যুবকরা আবার মুখ খুলল। তারা বুঝিয়ে দিতে চায়, তারা ওই রমণীর ব্যক্তিত্ব দেখে অভিভূত হয়ে যায়নি। অত সোজা নয়।

একজন বলল, এ আবার তেজ দেখানো হচ্ছে।

আরেকজন বলল,...

অর্থাৎ কোনও নারী বা পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও যদি কাছাকাছি আসে, তা হলে তাদের তেজ দেখাবার কোনও অধিকার নেই। বরং অন্য সকলের অধিকার আছে তাদের ভর্ৎসনা করার। তুমি আমি যা খুশি করি, লোককে ঠকাই, বাবা-মাকে অযত্ন করি, শিশুদের কুশিক্ষা দিই-এ-সবই চলতে পারে, কিন্তু সমাজের স্বীকৃতি ছাড়া দু' জন নারী-পুরুষের মিলন-এ কক্ষনও হতেই পারে না।

আশ্রমে ফিরে এসে দীপ্তি কারোকে কিছু বললেন না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কঁদলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ মুছে উঠে পড়ে ভাবলেন, ছিঃ, আমি এত দুর্বল হয়ে পড়ছি কেন? লোকের কথায় কী আসে যায়?

সূর্যর কানেও যখন এসব কথা আসতে লাগল, তাকেও কিছু কিছু টিটকিরি সহ্য করতে হল। তখন সে বড় বিপর্যস্ত বোধ করল। এ কী ধরনের অদ্ভুত শত্রুতা, যার প্রতিরোধ করার কোনও উপায় তার জানা নেই। শত্রু এখানে বস্তুত অদৃশ্য। গুজব কে বা কারা ছড়াচ্ছে তা জানার উপায় নেই। রাস্তায় ছেলেরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁকা বাঁকা উক্তি করলেও তা নিয়ে ঝগড়া করা যায় না। সেটা আরও বিসদৃশ ব্যাপার হয়।

সূর্য খানিকটা মুষড়ে পড়ল। সে বেশি শঙ্কিত বোধ করল দীপ্তিদির জন্য। তার এতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু দীপ্তিদি কি এতটা সহ্য করতে পারবেন?

এ-রাস্তায় নতুন বাস চলতে শুরু করেছে। বাস এলেই আশ্রমের ছেলেরা ছুটে তা দেখতে যায়। একদিন সত্যেন গুহ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চলন্ত বাস থেকে একদল নব্য যুবা

তার উদ্দেশে কতকগুলো অশ্রাব্য উক্তি ছড়িয়ে গেল। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত চোখে তাকালেন আশ্রম-বালকদের দিকে। ফিরে এসেই তিনি প্রার্থনায় বসলেন, প্রায় এক ঘন্টা সেখানেই রইলেন চোখ বুজে, কী সমাধান তিনি পেলেন কে জানে!

সূর্য শিলিগুড়ি স্টেশনে গিয়েছিল একটা কাজে। কাজ সেরে ফেরার জন্য বাস ধরতে যাচ্ছে, দেখল বাসের জানলার পাশের সিটে বসে আছেন দীপ্তি। সূর্য তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে উলটে দিকে ফিরে হন হন করে হাঁটতে লাগল। কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান। দেখে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে।

দীপ্তি সূর্যকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি নেমে এলেন বাস থেকে। সূর্যর কাছে এসে একটু রুক্ষ ভাবে বললেন, তুমি আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে এলে কেন?

সূর্য তক্ষুনি কোনও উত্তর দিল না। প্রায় তিন-চার মাস বাদে দীপ্তি এই রকম ভাবে আলাদা কোনও জায়গায় সূর্যর সঙ্গে কথা বললেন। তাও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত সময়ে।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সূর্য বলল, আমাদের একসঙ্গে এক বাসে না যাওয়াই তো ভালো।

কেন?

আপনি তো তাই চান।

কে বলেছে তোমাকে? আমরা এক আশ্রমে এক জায়গায় থাকি–অথচ বাইরে দেখা হলে কেউ কারোকে চিনতে পারব না–মুখ ঘুরিয়ে চলে যাব–এটা কি সম্মানজনক। ব্যাপার? লোকের কথার বেশি মূল্য দিলে তারা আরও বেশি পেয়ে বসে।

আপনি আমার সঙ্গে কখনও একসঙ্গে বেরোতে চাননি।

সেটা আলাদা কথা।

সূর্য মুখ ভরিয়ে হাসল। চুম্বক-আকৃষ্টের মতন দীপ্তির চোখে চোখ রেখে মনে মনে বলল, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে সুন্দর কেউ নেই। আমি অন্তত আর কারোকে দেখিনি। এখনও তোমাকে দেখলে আমার বুকের মধ্যে কাঁপে।

সূর্য বুক ভরে নিশ্বাস নিল, উজ্জ্বল চোখে তাকাল দীপ্তির দিকে। তারপর বলল, তুমি যদি মনে জোর আনতে পারো, তা হলে আমি কারোকে গ্রাহ্য করি না। আমি তোমার জন্যই চিন্তিত বোধ করছিলাম। কারণ তুমি লোকলজ্জাকে ভয় পাও। এই সামান্য লোকলজ্জার কারণেই তুমি একদিন আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। এর জন্য তুমি তোমার। নিজের মনটাকেও গুটিয়ে রেখেছিলে।

দীপ্তি মৃদুস্বরে বললেন, না ও জন্য নয়। আমি নিজের বিবেক ছাড়া আর কারোর কাছে দায়ী নই।

সূর্য স্পষ্ট গলায় বলল, তা হলে তোমার বিবেক পরিষ্কার করে নাও। আমরা কোনও অন্যায় কাজ করছি না। আমরা পরস্পরকে চাই। এটা সম্পূর্ণ আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে আমাদের কাজের কোনও সম্পর্ক নেই। সমাজের জন্য আমরা যা কাজ করছি তার ভালো-মন্দের বিচার হতে পারে, কিন্তু আমাদের নিভৃত জীবনের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অধিকার কারওর নেই। তবু যদি কেউ সেদিকে নোংরা চোখ ফেলতে আসে জোর করে তা অস্বীকার করতে হবে। তুমি যদি ঠিক থাকো, তা হলে আমি প্রকাশ্য রাস্তায় তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হাটব, আড়ালে লুকোব না, দরকার হলে হাতে একটা চাবুক রাখব সামনের বাধা সরিয়ে দেবার জন্য। ক্যারাভান যখন যায়, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, তাতে ক্যারাভান কখনও থামে না।

দীপ্তি বললেন, এসব কথা আলোচনার জায়গা এটা নয়। চলো বাসে উঠবে না?

সূর্য দীপ্তিকে নিয়ে এসে বাসের জানলার কাছে বসল। তার পরেও অবিরাম কথা বলে যাচ্ছে। অন্য কে দেখছে বা শুনছে সে-দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এই ক'মাসে দীপ্তি এক দিনও তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেননি, আজ নিজে এসে প্রকাশ্যে তার সঙ্গে কথা বলায় সূর্যর সমস্ত অভিমান যেন এক ফুঙ্কারে উড়ে গেছে।

বাস থেকে নেমে সে আবার বলল, তুমি তো জানেনা, তোমার জন্য আমি সবকিছু। ছাড়তে পারি। তবু তুমি কেন আমাকে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলে এতদিন? আমি এর কোনও যুক্তির মাথা-মুন্ডু বুঝতে পারি না।

দীপ্তি বললেন, সূর্য, তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

বলো।

তুমি অন্য একটি বিয়ে করো। তারপর তুমি যদি চাও তা হলেও এই আশ্রমে থাকতে পারো–আমি বড়মামাকে বলে কয়ে রাজি করাব। এতেই লোকের কথাবার্তা সব থেমে যাবে।

সূর্য প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলল, এ তুমি কী ছেলেমানুষের মতন কথা বলছ? আমি চাই তোমাকে, আর বিয়ে করব অন্য একটা মেয়েকে? এ রকম ভন্ডামি তুমি আমার কাছ থেকে আশা করো?

আমার সম্পর্কে টানটাও তোমার আস্তে আস্তে কমে যাবে–

তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ?

না, না, সে কথা বলছি না। আমি বলছি যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে সবকিছুই অন্য রকম হয়ে যায়।

পরে কী হবে, সে কথা ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমাদের মানায় না দীপ্তিদি। আমরা জীবনে অনেক রকম ঝুঁকি নিয়েছি। পরে সে জন্য কখনও কি অনুতাপ করেছি? দীপ্তিদি তুমি আর কোনও দ্বিধা কোরো না। আমাকে তোমার পাশে থাকতে দাও। তোমার জন্য আমি সব সময় ছটফট করি। কত দিন তোমাকে ছুঁইনি, তবু এখনও আমার হাতে তোমার শরীরের গন্ধ লেগে আছে। সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না!

দীপ্তি তক্ষুনি কথাটার উত্তর দিতে পারলেন না। মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন, সূর্য প্রতীক্ষা করে আছে, বলতে তাকে হবেই। মন্থর ভাবে রাস্তার পাশ থেকে একটা বুনো ফুল ছিঁড়ে নিলেন। তারপর বললেন, কী জানি! ভালোবাসা কাকে বলে আমি ঠিক জানি না বোধহয়। তুমি আমাকে উতলা করে দাও। কিন্তু তোমাকে আমি আগে যা অনেক বার বলেছি সেইটাই সত্যি। মনে মনে সারা জীবন আমরা খুব কাছাকাছি থাকব–তা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

মনে মনে কাছাকাছি থাকা নিতান্ত ছেলেমানুষি ব্যাপার। আমরা সেই বয়স পেরিয়ে এসেছি।

সূর্য, আমি জানতাম, এই আশ্রমের জীবন তোমার জন্য নয়।

এতদিনের মধ্যে এক বারও কি আমি অন্যায় কিছু করেছি। এখন তুমি অন্য লোকের কথা শুনে আমাকে এই কথা বলছ। তবে, একথা ঠিক, আমি শুকনো সন্ন্যাসী কিংবা দাঁত-মুখ খিচোনো পলিটিশিয়ান হতে পারব না কখনও। আমি কাজ করতে ভালোবাসি, মানুষের উপকার চাই, তা বলে নিজেকেই বা বঞ্চনা করব কেন? ভবিষ্যৎ জেনারেশনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমরা খাটব ঠিকই, তা বলে নিজেরা সবকিছু ত্যাগ করব–এটা ঠিক নয়। এটা অবৈজ্ঞানিক! যারা মুখে এক কথা বলে আর কাজে অন্য রকম করে–আমি তাদের দলে নই, তুমি তা ভালো করেই জানো।

দীপ্তি মুখ নিচু করে নিঃশব্দে আঁটছেন। সূর্য তাঁর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে আবেগ কম্পিত গলায় বলল, দীপ্তিদি, আমি তোমাকে কী ভীষণ ভাবে চাই, তুমি বুঝতে পারো না? তুমি

আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না। আমরা দু'জনে যদি পাশাপাশি থাকি, আমরা একসঙ্গে অনেক বড় কাজ করতে পারি এখনও। আমরা কারোকে গ্রাহ্য করব না। কেউ আমাদের বাধা দিতে এলে তার মুখে থুতু দেব।

দীপ্তি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ম্লান গলায় বললেন, সূর্য আমি কোনও দিন তোমাকে পাব না। আমি তোমার যোগ্য নই।

এ-কথা বোলো না।

তুমি মেয়েদের কথা বুঝবে না। যেসব মেয়েরা বিয়ে করে, তারা ছেলেবেলা থেকেই বিয়ের কথা ভাবে। তারা না-দেখা স্বামীর স্বপ্ন দেখে, না-জন্মানো ছেলেমেয়েকে মনে মনে আদর করে তখন থেকেই। আমি ছেলেবেলা থেকে কখনও বিয়ের কথা ভাবিনি। আমি অন্য রকম ব্রত নিয়েছিলুম। এখন আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন কি আমার পক্ষে নতুন করে বিয়ের কথা ভাবা সম্ভব? সে সাহসও আমার নেই, সে ইচ্ছেও নেই। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, আমাদের সমাজ সেটা সহজে মেনে নেয় না, তা ছাড়াও সাংসারিক জীবন, ছেলে মানুষ করা-এসবের সঙ্গে আমি আর নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব না।

তুমি বয়সের কথা বোলো না। তোমার কোনও বয়স নেই। তুমি চিরকালের সুন্দর।

এটা ছেলেমানুষি কথা। আমার তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে।

বিয়ে করার ব্যাপারে আমার নিজেরও কোনও ইচ্ছে বা অনিচ্ছে নেই। বিয়ে না করলে কী হয়?

এ-আশ্রমে থেকে সেটা সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছ।

আমরা আজই এ-আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে পারি। এ-আশ্রম ছাড়া কি সারা দেশে আর কোনও কাজের জায়গা নেই?

তারপর সারা জীবন আমরা সমাজ থেকে পলাতক থাকব? কিংবা কোনও অচেনা জায়গায় গিয়ে মিথ্যে পরিচয় দেব? ও রকম পাশ্চাত্য ধরনের জীবন আমার জন্য নয়। তোমাকে আর একটা সত্যি কথা বলি, না হলে আমার পাপ হবে!

দীপ্তি গাঢ় চোখ তুলে সূর্যের দিকে তাকালেন। স্পষ্ট বোঝা যায় তার চোখে জল এসে গেছে। তিনি বললেন, তুমি যখন এই আশ্রমে জোর করে থাকতে এলে, তখন আমি সব সময় তোমার ওপর রাগ করতুম। কিন্তু আমি তখন তোমার চেয়েও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তোমাকে দেখলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি বলেই তো তোমার কাছ থেকে পালাতে চাই। এখানে, প্রথম দিকে রাত্তিরবেলা আমার ঘুম আসত না, বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতাম, খালি ইচ্ছে করত, উঠে তোমার ঘরে চলে যাই, তোমার ঘুমন্ত মুখে একবার হাত ছোঁয়াই। কত কষ্টে যে নিজেকে দমন করেছি। নইলে যে আমি নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম! এখন আমি নিজেকে সামলে নিতে পেরেছি। এখন আমার বাসনা মরে গেছে। ভালোবাসার জন্য যারা সমাজ থেকে পলাতক হতে পারে, আমি আর তাদের মতন নই।

সূর্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, দীপ্তি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমাকে আর একটু বলতে দাও। যারা একবার রাজনীতি বা সমাজ সেবার কাজে আসে, তারা এর থেকে আর বেরিয়ে যেতে পারে না। এটা একটা সাঙ্ঘাতিক নেশা। আমিও এর থেকে দূরে গিয়ে আর কোনও দিন স্বস্তি পাব না। তুমি রাজনীতিতে এসেছিলে ঝোঁকের মাথায়, তুমি। সবকিছুই করো ঝোঁকের মাথায়, সেইটাই তোমার চরিত্র! কিন্তু আমার ব্যাপার তা নয়, আমি ছেলেবেলা থেকেই এর সঙ্গে মিশে আছি।

আর একটা কথা ভেবে দেখো। আমাদের জন্য বড়মামার আশ্রমটা ভেঙে যেতে বসেছে। আমাদের বয়স আছে, আমরা তবু অন্য কিছু করতে পারি, কিন্তু উনি কী করবেন? এই আশ্রমই ওঁর জীবনের সবকিছু-এটা নষ্ট হয়ে গেলে কী নিয়ে আর বাঁচবেন? দেখছ না,

কদিন ধরে কী রকম গুম হয়ে আছেন! জানি, কোনও দিন আমাদের কিছু বলবেন না মুখে–

সূর্য বলল, তা হলে কতকগুলো নীচ চরিত্রের লোকের কথা মতনই আমাদের চলতে হবে? তারা একটা অপবাদ রটাবে বলেই আমরা মাথা নিচু করে থাকব? এ-অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করব না। আমি দেখতে চাই, ওরা কত দূর যেতে চায়–

এর পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে সূর্য একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কয়েকজন আততায়ীর হাতে প্রচণ্ড মার খেল। সূর্য তার বেপরোয়া স্বভাবের জন্যই বিপদটা ডেকে আনল। সে তার কাজকর্ম, ছেলেদের নিয়ে হইচই চালিয়ে যাচ্ছিল পুরো মাত্রায়। জলপাইগুড়ি শহরে যখন তখন যায়। পূর্ববর্তী পরিচিত লোকদের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলে। কথা বলার সময় সরাসরি তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কেউ অন্য প্রসঙ্গে কিছু বললেই সে উত্তর দেবে।

কেউ কিছু বলে না। এমনকী কয়েক দিন পর গুজবটা একটু কমেছেও মনে হয়। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে কয়েক জন এসে সূর্যকে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে খুব পিটিয়ে যায়। সূর্য হাত-পা ছুঁড়ে যতদূর সম্ভব বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের জন্যই নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

সেই সব দিন তো এখন আর নেই, যখন শত্রুকে পেছন থেকে আঘাত করত না মানুষ। নিরস্ত্র শত্রুকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র দেওয়া ছিল শৌর্যের নিদর্শন। এখন চুপি চুপি তিন-চার জন মিলে অসহায় একজনকে মারতেও কোনও দ্বিধা নেই। শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোনও কুকর্মও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ হিসেবে চলে যায়। স্বাধীনতার পর দলের শক্তি বাড়ানোর জন্য কংগ্রেস দলই প্রথমে গুন্ডা শ্রেণিকে প্রশ্রয় দেয়–তারপর পরম্পরা অনুযায়ী অন্য দলগুলিও সেই পথ গ্রহণ করে এবং এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী চলে।

সূর্যকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলার বোধহয় ইচ্ছে ছিল না আততায়ীদের, খানিকটা শাস্তি দিতেই চেয়েছিল। সে মরে গেলে এই মুখরোচক প্রসঙ্গটা থেমে যেতে পারে তার বদলে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মেরে এটাকে জিইয়ে রাখা দরকার। তা ছাড়া যে মরে, সে অনেক সময় শহীদ হয়ে যায়-এও একটা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। আধমরা হলে খবরের কাগজে তার নামও ওঠে না, পুলিশও বিশেষ মাথা ঘামায় না।

আশ্রমের ছেলেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটু বেশি রাত্রে মাঠের মধ্যে সূর্যকে পেয়ে যায়। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে আসে ভেতরে। অনেকখানি রক্ত ঝরেছে তার শরীর থেকে। কিন্তু যে বেড়াল অনেক মার খেয়েছে, সে সহজে মরে না।

সত্যেন গুহ পুলিশে খবর দিলেন না, কোনও রকম হাহুতাশও করলেন না। তিনি, দীপ্তি এবং বড়মা মিলে প্রাণপণে সেবা করতে লাগলেন সূর্যর। দীপ্তি রাত জেগে বসে রইলেন সূর্যর শিয়রের কাছে।

মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সূর্য দীপ্তির হাত চেপে ধরে এবং বড় বড় নিশ্বাস ফেলে। মনে হয় সে খুব সুখে আছে। যদিও তার একটা চোখ বুজে গিয়ে অনেকটা ফুলে গেছে, মাথায় মস্ত বড় ব্যান্ডেজ।

দিন চারেক পর সূর্য একটু সুস্থ হয়েছে সবে, তখনও বাইরে বেরোয় না, দীপ্তিকে দেখে সে খুব শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, এই সামান্য ব্যাপারে ওরা আমাকে ভয় দেখাবে ভেবেছে? আমাকে চেনে না এখনও। আমি আবার যাব ওদের কাছে। আমি দেখে নেব সবাইকে।

গান্ধী আশ্রমের খাটে শুয়ে যে এ রকম উক্তি মানায় না, সেদিকে খেয়াল নেই সূর্যর।

দীপ্তি কোনও উত্তর দিলেন না।

সূর্য আবার বলল, রিভলভারটা হাতছাড়া করা উচিত হয়নি। আমি মারতাম না ওদের, শুধু একটু ভয় দেখালেই চলত।

দীপ্তি ঘর থেকে চলে গেলেন।

আশ্রমের ছেলেরা মাঝে মাঝে দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারে। সূর্য তার চেনা ছেলেদের অনেককেই দেখতে পায় না। তাদের কথা অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে, ছেলেরা একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকায়, উত্তর দেয় না। আস্তে আস্তে অনেক ছেলেই আশ্রম ছেড়ে যাচ্ছে।

সূর্য লক্ষ করল, সত্যেন গুহ, বড়মা কিংবা দীপ্তিদি যখন তার অসুখের অবস্থা দেখতে কিংবা খাবার দিতে আসেন, তারা কেউই বিশেষ কিছু বলেন না। যেন সূর্যর সঙ্গে মামুলি দু'-একটা কথা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। সূর্য যে প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেলেছে, সে কথা শোনাবার মতন কারোকে পায় না।

একদিন সকালবেলা দীপ্তি এসে বসলেন সূর্যর বিছানার কাছে একটা টুল নিয়ে। এর মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন, চুল তখনও ভিজে, বাইরে যাবার উপযোগী শাড়ি পরেছেন। কয়েক রাত ভালো করে না ঘুমোবার জন্য চোখের নীচে কালো ছাপ। চিবুকে একটা দুঃখের দাগ। দীপ্তির এই রূপই সূর্যর বুকে একটা ঝাঁপটা মারে।

দীপ্তি বললেন, শোনো, সূর্য, তোমাকে না বলেই যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু মনকে শক্ত করতে পারলাম না, তাই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

সূর্য অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

কেন?

আমি অনেক ভেবে দেখেছি। আমাদের দুজনের একসঙ্গে এক জায়গায় থাকা আর কোনও দিন সম্ভব নয়।

শোনো, শোনো, দীপ্তিদি–

সূর্য, এ নিয়ে আর কোনও কথা কিংবা যুক্তিতর্কের দরকার নেই। আমি মন একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। আমি যাবই।

তা হলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমি এখানে কী করব?

না, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।

নিশ্চয়ই যাব। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করো তা হলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। আমি এ-কথাও ভেবে রেখেছি।

দীপ্তির কথার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল, যা শুনলেই বোঝা যায় প্রতিবাদ করা এখন অর্থহীন। দীপ্তি খুব শক্ত ধাতুর মেয়ে।

সূর্য শুধু বলল, এতদূর? তারপর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। দু'জনেই।

একটু বাদে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সূর্য বলল, ঠিক আছে, তা হলে আমিই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। তুমি যাবে কেন? এটা তো তোমারই নিজের জায়গা।

দীপ্তি বললেন, সত্যি যেতে চাও?

হ্যাঁ।

তাতে আমি আপত্তি করব না। আমার জন্য তুমি আর নিজের বিপদ ডেকে এনো না।

সূর্য গম্ভীর ভাবে বলল, ঠিক আছে। আমি কালই চলে যেতে পারব। তাতে তুমি খুশি হবে তো?

হ্যাঁ। আর কখনও এখানে এসো না।

আসব না।

সূর্য, আমি জানি সারা জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। না হওয়াই ভালো।

সূর্যর চলে যাওয়ার ব্যাপারে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরেও দীপ্তি আর একটাও কোমল কথা বললেন না তার সঙ্গে। আর নিভৃতে দেখা হল না। সত্যেন গুহ দীপ্তিকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, দীপ্তি উত্তর দিলেন, না বড়মামা আর কোনও কথা বোলো না। এইটাই সবচেয়ে ভালো পথ। এতে ও আর আমি দু'জনেই ভালো থাকব।

সূর্য যখন আশ্রম থেকে বিদায় নিল তখন আশ্রমের অনেকেরই, এমনকী সত্যেন গুহর পর্যন্ত চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু সূর্যর চোখ শুকনো।

শিলিগুড়ি স্টেশনে সে ট্রেনের কাছে দাঁড়িয়েছে। আশ্রমের যে-দুটি ছেলে তার সঙ্গে এসেছিল তারা চলে গেল এইমাত্র। সূর্য শেষ বার ঘাড় ঘুরিয়ে চতুর্দিকে তাকাল। তার মনে হল, সমস্ত লোকজন যেন আড়চোখে তার দিকেই দেখছে এবং মুখ ফিরিয়ে হাসছে। সকলেই ভাবছে, সে হেরে গেছে, সে কাপুরুষ, সে মার খেয়ে ভয়ে পালাচ্ছে।

সেই সময় সূর্যর উষ্ণ নিশ্বাসের কাছাকাছি যদি কেউ থাকত, তা হলে বোধহয় দগ্ধ হয়ে যেত।

আবার শুরু হল সূর্যর ভ্রাম্যমান জীবন।

৬৯. রেণুর একটা নিজস্ব জগৎ

রেণুর একটা নিজস্ব জগৎ আছে। তাদের এত বড় বাড়িটাতে অনেক মানুষজন, কিন্তু অন্য কারওর সঙ্গেই যেন তাকে ঠিক মেলানো যায় না। রেণু সকলের সঙ্গে মিশে আনন্দ এবং হইচই করতে পারে, আবার এক এক সময়ে সে একদম আলাদা হয়ে যায়। তার সমবয়সি কিংবা বয়সে বড়দের মধ্যেও কেউ কেউ তাকে একটু যেন ভয় পায়। ভয় কিংবা সমীহ। অথচ এর কারণটা কেউ বুঝিয়ে বলতে পারবে না। কেউ কোনও খারাপ কথা ওর সামনে বলে ফেললে, রেণু চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সেই সময় ওর মুখে একটা দুঃখের রেখা ফোটে, কিন্তু বলে না কিছুই।

এইসব বনেদি বাড়িতে অনেক লোক একসঙ্গে থাকলেও ভেতরে ভেতরে রেশারেশি থাকে অনেক রকম। এক ছাদের নীচে অনেকগুলো গোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায়, বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও। অমুক নাকি তমুক সম্পর্কে এইসব কথা বলেছিল, এই রকম একটা কিছু সূত্র ধরেই এক ঘরের সঙ্গে আরেক ঘরের মনোমালিন্য হয়ে যায়, কথা ঠিক বন্ধ হয় না, মুখের হাসি শুকনো হয়ে যায় শুধু। কিছু দিন আগে বাড়ির দারোয়ানের কাছে দুই গিন্নি দু'রকম নির্দেশ দেবার উপলক্ষে বিষ্ণুর মা আর রেণুর মায়ের মধ্যে মন কষাকষি হয়ে গেছে। এইসব সময়ে দু'ঘরের ছেলেমেয়েদের যাতায়াতও খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না। বিষ্ণু অবশ্য বিলেতে চলে গেছে। বিষ্ণুর মা'র আর ছেলেপুলে নেই-এবং তার যাবতীয় বাৎসল্য রস ওই ছেলের ওপরেই খরচ হয়ে গেছে। তিনি সাধারণ অল্প বয়সি ছেলেমেয়েদের পছন্দ করেন না।

রেণু কিন্তু এসব ভূক্ষেপ করে না। সে যখন তখন কাকিমার ঘরে আসে। কেন না বিষ্ণুর বই কেনার বাতিক ছিল, প্রচুর বই সে রেখে গেছে, রেণু সেই বইগুলির সদব্যবহার করে। বিষ্ণুর মা ঠিক আপত্তি করতে গিয়েও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। শুধু বলেন, দেখিস ছেড়েটেড়ে না যেন। ওর যা বইয়ের ওপর মায়া!

রেণু মুচকি হেসে বলে, ন'কাকিমা এই বইটার মলাট কিন্তু ছিঁড়ে গেছে!

তিনি আঁতকে ওঠেন। তাড়াতাড়ি এসে মহামূল্য সম্পদের মতন বইখানা তুলে নেন। সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলেন, ইস, তুই এটা ছিঁড়ে ফেললি? এত দামি বইখানা?

রেণু বলে, এই বইয়ের মলাটটা ছোড়দা থাকবার সময়েই ছিঁড়েছিল। আপনি কিছুই দেখেন না।

সত্যি তখন ছেঁড়া ছিল?

হ্যাঁ। ছিড়লেই বা। বই তো পড়তে গেলে একটু-আধটু ছিঁড়বেই!

বিষ্ণুর মায়ের মন তবু খুঁতখুঁত করে। পরবর্তী বিলেতের চিঠিতে তিনি অন্যান্য কথার পর বইখানার নাম উল্লেখ করে এটাও জানতে চান যে, মলাটটা সত্যিই ছেঁড়া ছিল কিনা। বিষ্ণু তখন স্কটল্যান্ডে এক বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে, সেখানে এক নিঝুম সন্ধ্যায় বান্ধবীর কাছে মায়ের চিঠি পড়ে শোনায়। তখনই সে ঠিক করে, রেণুকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

রেণুদের বাড়ির ছেলেরা এখনও কেউ চাকরি করে না। অবস্থা অনেক পড়ে এসেছে। তবু নানান বাড়িভাড়া আর বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার থেকে চলে যায়। বাড়িখানার অবস্থা অনেক জীর্ণ হয়েছে, সারাবার দায়িত্ব কারওর নেই। সিঁড়িতে একদা কার্পেট পাতা থাকত, তা ছিঁড়ে ঝুলিঝুলি হয়ে গেছে কবে। লণ্ঠনগুলোতে ময়লা জমে আছে। একতলার বারান্দার দেওয়ালগুলোতে ড্যাম্পের ছাপ–একটুক্ষণ তাকালেই নানা রকম অতিকায় জন্তুর অবয়ব কল্পনা করা যায়।

পুরনো কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু বংশগুলির মতন এবাড়িতেও মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা কেলেঙ্কারির ঝড় আসে। হঠাৎ জানা যায়, কোন জ্যাঠামশাই হরিদ্বারে গিয়ে গোপনে আর

একটা বিয়ে করে এসেছিলেন, তার বংশধর একদিন এসে সম্পত্তির অংশ দাবি করে। শুরু হয় মামলা-মকদ্দমা। কিংবা, কোনও ঘরের পুত্রবধূ-যে তার বাপেরবাড়ির বড়লোকি চাল নিয়ে সব সময় দেমাক দেখাত-তাদের নাকি বাড়ি বন্ধক পড়েছে। তখন অন্যান্য ঘরে এই নিয়ে বেশ সরস আড্ডা জমে ওঠে।

আর মামলা-মকদ্দমা তো লেগেই আছে। রেণুর ছোটকাকা এখন সব মামলা টামলা পরিচালনা করেন। এর মধ্যেই তার মাথায় টাক পড়েছে।

রেণুর বড়দাদা দিল্লিতেই ব্যবসা করছেন, কলকাতায় আসেন খুব কম। তিনি বিয়ে করেছেন একটি পাঞ্জাবি মেয়েকে, সেই বউ প্রথম বার কলকাতায় এসে শাশুড়ির সামনে সিগারেট খেয়েছিল। ওদের ছেলেমেয়েরা বাংলাতে কথা বলতেই শেখেনি।

সুপ্রকাশ বছর দুয়েক আগে মেনেনজাইটিস রোগে হঠাৎ মারা যায়। তার স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার, প্রাণশক্তি ছিল অন্য অনেকের চেয়ে বেশি, তবু কেন সে পৃথিবীতে বেশি দিন বেঁচে থাকার অধিকার পেল না কে জানে। তার বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, বিয়ের তারিখের ঠিক এক মাস আগে সে অসুখে পড়ে, তার ভাবী বধূ তার মৃতদেহের সামনে অবর্ষণ করে গেছে। মেয়েটির এখন বিয়ে হয়ে গেছে অন্য জায়গায়-তবু রেণুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে।

এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়াই নিয়ম। বিধবা, স্বামীতে নেয় না, এ রকম মহিলা এবাড়িতে আছেন কয়েক জন, কিন্তু আঠেরো বছরের বেশি কোনও কুমারী মেয়ে নেই। রেণু সদ্য আঠেরো বছর পার হয়েছে। অংশুর বিয়ে হয়ে গেছে, একটি বাচ্চাও হয়েছে-লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে অংশু-এখন সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হবার তালে আছে।

এবাড়ির দুটি ছেলেমেয়েই শুধু ব্যতিক্রম। বিষ্ণু আর রেণু। বিষ্ণু কবে ফিরবে ঠিক নেই। রেণু ছেলেবেলায় আর যাদের সঙ্গে খেলা করত, তারা সবাই এখন কী রকম বদলে

গেছে। ছেলেমানুষি ভাব কারওর মধ্যে নেই। হয় ভদ্দরলোক ভদ্দরলোক অথবা গিন্নি গিন্নি ধরনধারণ।

রেণুর মা সরল সাদাসিধে মানুষ, কিন্তু বড্ড অভিমানী। অনেকগুলো শোক দুঃখ পেয়ে মাথাটাও যেন একটু গোলমাল হয়ে গেছে। আগে খুব হাসিখুশি ছিলেন। এখন কথায় কথায় বাড়ির অন্য শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান যে, কেউ তাঁকে সহানুভূতি কিংবা করুণা দেখাতে আসছে, তা হলেই তিনি দপ করে জ্বলে উঠবেন। আর সবকিছুই গেছে, শুধু রয়ে গেছে বনেদি তেজ।

রেণুই তার মাকে সামলে রাখবার চেষ্টা করে। এক এক সময় সে তার মাকে ধমকও দেয়। কিন্তু অংশু বা তার স্ত্রীকে কখনও ভুলেও একটা কঠিন কথা বলে না।

এই বাড়ির পরিবেশ যেন রেণুকে স্পর্শ করে না। সে পড়াশুনো নিয়ে ডুবে থাকে, কলেজে যায়, ঠিক সময় বাড়িতে ফিরে আসে, রেডিয়োর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায়, বাচ্চাদের সঙ্গে হুটোপুটি করে। কিন্তু বাড়ির বড়রা কেউই রেণুর কাছে মনের কথা বলবে না। সবাই অনুভব করে, রেণু তাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

রেণু এখনও ঠিক টাকাপয়সার হিসেব বোঝে না। তার কখনও কিছু দরকার হলেই সে বাদলকে হুকুম করে। দুর্লভ কোনও বই, ঠিক কালো রঙের পেনের কালি, ন্যাশনাল লাইব্রেরির কার্ড-এসবকিছুই বাদলকে এনে দিতে হয়। রেণু কখনও ভাবে না, বাদল কোথা থেকে পয়সা জোগাড় করবে। সে শুধু বোঝে, সে যখন তার দাদাদের কাছে। থেকে কিছু চাইতে পারবে না, তখন বাদল ছাড়া আর কার কাছে চাইবে?

বাদল রেণুকে কিছুই বুঝতে দেয় না। ধার করে হোক যেমন করেই হোক, ঠিক সময় জিনিসটা নিয়ে আসবেই।

বাদল এম. এ ক্লাসে ভরতি হয়নি। তার বাবা খরচ চালাবার বিষয়ে কী একটা মন্তব্য। করেছিলেন, সেই অভিমানে সে আর পড়ল না। সত্যিই তো, তার বাবার কোনও রোজগার নেই, পড়াশুনো চালাবার খরচ আসবে কোথা থেকে!

বাদল এখন সকালে-বিকেলে দুটো টিউশানি করে। আর চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠাচ্ছে। তার বন্ধুরা হইহই করে ইউনিভার্সিটিতে যায়, কফি হাউসে আড্ডা মারে- বাদল সেসব জায়গা থেকে দূরে থাকে। আড্ডা দিতেও যেতে চায় না। বন্ধুরা কখনও এসে জেরা করলে সে চাল মেরে বলে, ক্লাসে গিয়ে পড়াশুনো করা মানে সময় নষ্ট।' কোনও মাস্টার আমাকে আর কিছু শেখাতে পারবে না!

গোপনে গোপনে সে অবশ্য তার সাবজেক্টের এম. এ. কোর্সের সিলেবাস জোগাড় করে রেখেছে। তিন বছর পরে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়া যায়-তখন পরীক্ষা দেবে কিনা সে ভেবে দেখবে।

রেণুও বাদলের এম এ না-পড়ার কারণটা ঠিক বুঝতে পারেনি। সে বাদলের জীবনের সবকিছু জানে, বাদল তো তার শুধু বন্ধু বা প্রেমিক নয়, আবাল্য সঙ্গী-তবু আজকাল সব সময় ওর মনের ভাব ধরতে পারে না।

বাদল রেণুদের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দিয়েছে। রেণুর মামলাবাজ ছোটকাকা বাদলকে একদিন অপমান করেছিলেন। বাদল সে-দিন রেণুকে ডাকতে আসছিল, সদর দরজার কাছেই ছোটকাকার সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, কী হে বাদলকুমার কেমন আছ?

এক একজন মানুষের সঙ্গে এক একজনের কিছুতেই জমে না। বাদল কোনও দিনই এই ছোটকাকাটিকে পছন্দ করতে পারেনি। দেখা হলেই তিনি নানা রকম কথা বলার চেষ্টা করেন। মুখ-মিষ্টি লোক, তবু এঁর স্বভাবে কী রকম যেন একটা ভাঙ্গার ব্যাপার। আছে।

বাদল সংক্ষেপে বলল, ভালো।

তারপর সে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, ছোটকাকা আবার বললেন, বিষ্ণু তো নেই, কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ? অংশুও তো বেরিয়ে গেল দেখলাম।

রেণুর সঙ্গে একটা দরকার আছে।

অ!

এই 'অ' কথাটা উচ্চারণের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে বাদলের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে থমকে দাঁড়াল। ছোটকাকা দারোয়ানের সঙ্গে কী একটা কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাদল কি তার সামনে গিয়ে বলবে, আপনি ওই রকম ভাবে অ বললেন কেন? কিন্তু এ রকম প্রশ্ন করা যায় না। অন্তত বাদল তা পারবে না।

ওপরে না উঠে সে ফিরে যেতে লাগল। ছোটকাকা তাই দেখে বললেন, ও কী চলে যাচ্ছ কেন? রেণুকে ডেকে দেব? তুমিই ওপরে উঠে যাও না!

না, থাক, দরকার নেই।

তারপরই বাদল রেণুকে জানিয়ে দিয়েছে, বিষ্ণু না-ফেরা পর্যন্ত সে আর ওই বাড়িতে কখনও যাবে না। রেণু অনেক পেড়াপেড়ি করেছে, বাদল শোনেনি।

ওই বাড়িতে তো যায়ই না, ওই রাস্তা দিয়েও পারতপক্ষে হাঁটে না। ওই দিকেই কাছাকাছি একটা জায়গায় তাকে সন্ধ্যাবেলা টিউশানি করতে যেতে হয়-সে তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

আজকাল ধুতি পরে বাদল, শীত এসে গেছে বলে গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে নেয়। সিগারেট ধরিয়ে সে মন্থর ভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটে-মনে হয় যেন জগৎ-সংসার সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই। এই কলকাতার মানুষের ভিড়ের মধ্যে সে মিশে যাবে, তাকে আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবিতা লেখা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

রেণুর সঙ্গে প্রায়ই বাইরে দেখা হয়। কিংবা রেণুই বাদলদের বাড়িতে যায়। কলেজ থেকে ফেরার সময় সে ওই বাড়ির কাছে বাস থেকে নেমে পড়ে। বাদল বাড়িতে না থাকলেও সে তার মায়ের সঙ্গে গল্প করে কিংবা বাদলের বইপত্র ঘাঁটে। বাদলের পুরনো বি. এ. ক্লাসের খাতাগুলোর সাদা পাতায় ছবি আঁকে সে, কবিতার খাতাটা খুঁজে পায় না।

এবাড়িটা এখন ভীষণ ভাবে ফাঁকা লাগে। সারি সারি ঘর তালাবন্ধ পড়ে আছে। চিররঞ্জন হঠাৎ খুব বুড়ো হয়ে পড়েছেন, হিমানীর শুচিবায়ু হয়েছে। এই বয়সেও তিনি কপাল চাপড়ে বলেন, বাবা কার সঙ্গে যে আমার বিয়ে দিল, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল!

বাদলের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রেণু ফিরে যাচ্ছে এমন সময় মোড়ের কাছে বাদলের সঙ্গে দেখা। বাদল দুটি ছেলের সঙ্গে খুব তর্কে মত্ত ছিল, রেণু একটু দূরে দাঁড়াল। চার পয়সার চিনে বাদাম কিনল সময় কাটাবার জন্য। একটু বাদে বাদল এসে বলল, কী রে, কখন এসেছিলি?

অনেকক্ষণ।

আজ কলেজে যাসনি?

হ্যাঁ। কেন যাব না।

দুপুরবেলা তোদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আজ দুপুরে তো আমার বেরোবার কথা ছিল না।

তবু দাঁড়িয়ে ছিলাম, যদি দেখা হয়।

বাঃ, আমি তোমার বাড়িতে এসে বসে আছি, আর তুমি এমনি এমনি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ।

বাদল রেণুর কাছ থেকে বাদাম নিয়ে ভাঙতে থাকে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর আবার চোখ তুলে বলল, আজ সকালে তুই কী করছিলি?

কেন?

এই ধর, সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত? তোর সঙ্গে তখন আমার ভীষণ দরকারি একটা কথা বলার ছিল। তক্ষুনি দেখা করা দরকার। কিন্তু কী করে করব?

বাঃ, আমাদের বাড়িতে গেলেই হত।

না, আমি তখন মনে মনে দারুণ ভাবে তোর কাছে ডাক পাঠাতে লাগলাম। রেডিয়ো ট্রানসমিশানের মতন। আমি ভেবেছিলাম সেই ডাক শুনে তোকে চলে আসতেই হবে। তুই শুনতে পাসনি?

রেণু বলল, না। তোমার কী হয়েছে বলো তো। ক'দিন ধরেই কী রকম যেন মনখারাপ দেখছি?

রেণু তোর কাছে আমি একটা জিনিস চাই। কাল দুপুরে তিনটের সময় আমাদের বাড়িতে আসবি? তখন মা বাবা বাড়িতে থাকবেন না।

রেণু একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা আসব।

৭০. হিমানীর বাবা-মা এবং দাদারা

হিমানীর বাবা-মা এবং দাদারা এসে আশ্রয় নিয়েছেন বেলেঘাটায়। হিমানীর বাবার বয়স অনেক হয়েছে, তবু বেশ শক্তসমর্থ ছিলেন এতদিন, হঠাৎ তার শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। মাসখানেক ধরে শয্যাশায়ী, প্রত্যেক দিনই মনে হয়, শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল বুঝি, কিন্তু বৃদ্ধের প্রাণশক্তি প্রচণ্ড।

হিমানী প্রায় রোজই বাবাকে দেখতে যান। দু'দিন ধরে বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে সেদিন তিনি সকালেই চলে গেলেন স্বামীকে নিয়ে। বাদল কিছুতেই গেল না। সে আগে

কয়েক দিন গেছে। কিন্তু অসুখের বাড়িতে তার কিছুই করার থাকে না, ও-বাড়িতে বইপত্রও বেশি নেই–তার সময় কাটানোই এক সমস্যা হয়।

ছোটবেলায় এই দাদামশাই বাদলকে কত ভালোবাসতেন। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন রোজ। সেই যুদ্ধের সময়, যখন বাদলরা সবাই পূর্ব বাংলায় মামাবাড়িতে চলে গিয়েছিল। গ্রামের সেই বাড়িও নেই, মানুষগুলোও কেমন যেন বদলে গেছে। মামা-মামিমাদের সঙ্গে বাদল কিছুতেই ভাব জমাতে পারল না। সে একেই তো একটু মুখচোরা লাজুক, তা ছাড়া বাদল যে-জগৎ নিয়ে চিন্তা করে–সে-জগৎ সম্পর্কে এঁদের কারওর মাথাব্যথা নেই। এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ দাদামশাই সম্পর্কে বাদলের আগে একটা বিরাট ধারণা ছিল, এখন কলেজে-পড়া মন নিয়ে বাদল দেখতে পায় দাদামশাইয়ের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যও তাকে অনেক সংস্কার থেকে মুক্ত করতে পারেনি।

বাদল দাদামশাইকে অসুখের সময় দেখে এসেছে। তিনি এখন মানুষ চিনতে পারেন না। ওবাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই, তা হলে বাদল শুধু-শুধু গিয়ে কী করবে? খালি ভিড় বাড়ানো। তবু হিমানী বলেন, তার দাদা বউদিরা নাকি রোজই জিজ্ঞেস করেন, বাদল এল না? কেন, এল না কেন? শুনেই বাদলের রাগ ধরে যায়। বাঙালদের সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। কোনও কাজ নেই, তবু মুখ দেখাবার জন্য যেতে হবে?

সেদিন সকালে হিমানী অনেক করে বললেন। বাদল যাবে না একেবারে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে।

হিমানী জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুই খাবি কোথায়? হোটেলে মোটেলে খেতে চাস বুঝি?

বাদল বলল, আমি রান্না করে খাব।

রান্না করে খাবি? হেঃ, কোনও দিন রান্নাঘরের ধারেই যেতে দেখলুম না।

সে তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। তোমরা এখন যাও তো– দশটার সময় বেরোবে বলেছিলে, এখন এগারোটা বাজে–

হিমানী বললেন, বাড়িতে বুঝি বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আজ আড্ডা বসানো হবে? নিজের দাদুর এ রকম অসুখ–

বাদল বলল, না, না, আড্ডা হবে না। আমার নিজস্ব কাজ আছে।

একমাত্র ছেলে, সেই জন্যই হিমানী কিছুতেই ইচ্ছে থাকলেও প্রাণখুলে বকতে পারেন না বাদলকে। চিররঞ্জন তার একমাত্র স্বামী হলেও তাকে বকুনি দেবার ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য নেই। স্বামীকে বকেই তিনি আশ মিটিয়ে নেন।

মা বাবা চলে যাবার পর বাদল সত্যিই রান্নার জোগাড়যন্ত্র করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোনও দিন সে রান্না করেনি, তাতে কী। ভাত আর আলুসিদ্ধ সবাই রাঁধতে পারে। ইস, রেণুকে দুপুরের বদলে এই সময় যদি আসতে বলত, তা হলে দু'জনে মিলে দারুণ রান্না করা যেত। শুধু দু'জনের পিকনিক। এখন এক ছুটে গিয়ে রেণুকে ডেকে আনলে কেমন হয়? কিন্তু বাদল যে রেণুদের বাড়িতে আর কখনও যাবে না ঠিক করেছে। রেণুদের বাড়িতে টেলিফোনটাও যে থাকে ছোটকাকার ঘরে। বাদল কিছুতেই ছোটকাকাকে বলতে পারবে না, রেণুকে ডেকে দিন। তিনি যদি আবার সেই রকম 'অ' বলেন!

থাক, রেণু তো দুপুরে আসবেই–এখন আর তাকে ডাকার চেষ্টা করার দরকার নেই। বাদল রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বালল।

এ-বাড়িতে ঠাকুর-চাকর সব ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ঠিকে ঝি শুধু সকালে-বিকেলে এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়। ঠাকুর-চাকর রাখার সঙ্গতি এদের আর নেই। বাড়ির নীচতলাটা ভাড়া দিলে কিছু আয় হয়। ইদানীং হঠাৎ কলকাতায় ভাড়াবাড়ির খুব চাহিদা হয়েছে, ভাড়া বেড়েছে দ্বিগুণ প্রায়ই এ বাড়ির একতলাটা ভাড়া হবে কিনা খবর নেবার জন্য লোকজন আসে। একতলাটা একদম খালি, কেউ ব্যবহার করে না, তবু

চিররঞ্জন ভরসা করে ভাড়া দিতে পারছেন না। সূর্যকে জিজ্ঞেস না করে ভাড়া দেবেন কী করে? সূর্যর তো পাত্তাই নেই।

বাদল স্টোভের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে তাতে জল আর চাল ঢেলে দিল। তারপর সামনে বই খুলে বসল। কিন্তু বই পড়ায় মন বসবে কী করে, প্রতি মিনিটে একবার হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখছে। ভাত তৈরি হতে এতক্ষণ সময় লাগে? টগবগ করে ফুটে উঠলে তখন ঢাকনা খুলে দিতে হয় এবং হাতায় করে খানিকটা তুলে টিপে দেখতে হয় সেদ্ধ হয়েছে। কিনা-এটুকু বাদল জানে।

একসময় টগবগ করল এবং ভাত টিপেও দেখা হল। সব ঠিক আছে। বাদল ফ্যানও গেলে ফেলল হাত না পুড়িয়ে। তবে, চালের আন্দাজ ঠিক করতে পারেনি, ভাত রান্না হয়েছে তাতে অন্তত চার জন লোক পেটভরে খেতে পারে। প্রথমেই আলুগুলো ছেড়ে দেবার ফলে সেগুলো গলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

যাই হোক, তবু এতখানি সার্থকতায় সে বেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। তা হলে, এবার একটা কিছু ভেজে ফেললেই বা কেমন হয়? বাদল চাকা চাকা করে একটা বেগুন কেটে ফেলল, তাতে হলুদগুঁড়ো মাখাল কিন্তু নুন মাখাতে ভুলে গেল। সসপ্যানে তেল ঢেলে চাপাল কিন্তু তেলটা যে গরম হবার পর বুদবুদশূন্য হলে তারপর বেগুন ছাড়তে হয় এতটা সে জানবে কী করে? সুতরাং কাঁচা তেলে জলেভেজা বেগুন ছাড়তেই চটপট করে ঝাঁঝিয়ে উঠল, তার মুখ-চোখে ছিটেফোঁটা লাগতে পারত, কিন্তু লাগেনি।

পোড়া পোড়া বেগুনভাজা আর ঈষৎ গলে যাওয়া ভাতে মাখন মেখে বাদল দিব্যি তৃপ্তি করে খেল। অনেক দিন সে এত ভালো করে খায়নি। নিজের হাতের রান্না তো!

খেয়েদেয়ে সে সবেমাত্র সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার রোদে বসেছে, এমন সময় মনে হল যেন নীচের দরজায় একটা শব্দ। নিশ্চয়ই রেণু এসেছে। বাদল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। নীচে গিয়ে দেখল কেউ নয়। ঘড়িতে দেখল মাত্র সোওয়া একটা বাজে। রেণু এর মধ্যে আসবে কী করে? তার তো আসার কথা সেই সাড়ে তিনটের সময়।

এই অতক্ষণ সময় কাটানো বাদলের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে উঠল। প্রতিটি মিনিটকে মনে হয় এক ঘণ্টা। যত বার ঘড়ির দিকে তাকায়, মনে হয় কাটা থেমে আছে। আরও দু'বার তাকে নীচে নেমে যেতে হল শুধু শুধু।

সময় কাটাবার জন্য সে রেডিয়োটা খুলেছিল। আবার তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল সেটা এই ভেবে যে রেডিয়োর জন্য নীচে দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ যদি সে শুনতে না। পায়? অনেক বাড়িতে আজকাল কলিংবেল বসানো হয়েছে–এ বাড়িতে কে এসব কথা ভাবে?

আজ আবার এই সময় হঠাৎ কোনও উটকো বন্ধুবান্ধব না এসে পড়ে। জিতেনটা আসতে পারে। মাঝে মাঝেই এসে লম্বা লম্বা কবিতা শোনায়। বাদল কত বার বলেছে, তার আজকাল কবিতাটবিতা ভালো লাগে না। তবু সে শোনাবেই। হঠাৎ এসে পড়লে তো তাকে আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা হলে আজকের দিনটাই নষ্ট হবে। হে ভগবান, আজ যেন জিতেন না আসে।

কথাটা ভেবেই বাদল আপন মনে হেসে ফেলল। সে ভগবানে বিশ্বাস করে না, বন্ধুদের কাছে এই নিয়ে অনেক বড়াই করেছে কিন্তু বিপদের চিন্তায় কী রকম ভগবানের নাম মনে এসে গেল। আজ যদি জিতেন না আসে এবং রেণু ঠিক সময় আসে, তা হলে বাদল মাসে একদিন ভগবানকে মানতে রাজি আছে।

বাড়িটা অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ। বাড়িতে আর কেউ নেই। এই কথাটা মনে এলেই এ রকম নিস্তব্ধতার অনুভূতি হয়। অনেক সময় তো বাবা দুপুরে দুপুরে বেরিয়ে যান, মা ঘুমিয়ে থাকেন, বাদল একা একা নিজের ঘরে বই পড়ে–তখন তো এ রকম ঠান্ডা নিস্তব্ধতার বোধ আসে না। একদম ফাঁকা বাড়িতে বেশিক্ষণ একা থাকলে কী রকম গা শিরশির করে। বড়বাবু একসময় দিনের পর দিন এ বাড়িতে একা থাকতেন। অনেক দিন পর বড়বাবুর কথা মনে পড়ল। বড়বাবুর একটা জীবনী লেখার কথা একবার সে ভেবেছিল, এখন সেসব চিন্তা ঘুচে গেছে।

ঘড়িতে মাত্র পৌনে তিনটে বাজে। আরও অনেকক্ষণ। রেণু কি একটু বুদ্ধি করে আগে আসতে পারে না? বাদল দারুণ উত্তেজিত বোধ করতে লাগল। এখন তার গা ছুঁলে মনে হবে, তার জ্বর হয়েছে। সত্যি সত্যি তার চোখ ও কানের পাশটায় যেন। আগুনের হলকা লাগছে। সে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না। তখন তার মনে হল, বার বার দোতলা থেকে একতলায় নেমে যাবার বদলে বৈঠকখানায় বসে থাকলেই তো হয়।

বৈঠকখানায় বসে সে ঘন ঘন সিগারেট খেতে লাগল। ঘড়ি আর দেখবেই না।

তার ছেলেবেলার আপন মনে কথা বলার স্বভাব এখনও রয়ে গেছে। দিবাস্বপ্ন দেখাও তার রোগ। সে কল্পনায় দেখতে লাগল, রেণু আসার পর সে কী রকম ভাবে কথা বলছে।

দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল রেণু। হাতে দু'খানা মোটা মোটা বই। বাদল জিজ্ঞেস করল, এত দেরি করলে যে?

কোথায় দেরি? ঠিক তো সাড়ে তিনটে।

ভুল করেও কি একটু আগে আসতে নেই?

তুমি কোনও দিন ঠিক সময় আসো? তুমি তো সব সময় দেরি করো–

নাঃ, এ তো ঝগড়ার মতন হয়ে যাচ্ছে শুরু থেকেই। আজ রেণু এলে সে ঝগড়া করবে নাকি? এ রকম ভাবে নয়।

রেণুর হাতে দু'খানা মোটা মোটা বই। বাদল জানে, আজ কলেজ বন্ধ। বাদল জিজ্ঞেস করল, কী বই দেখি? আমার জন্য এনেছ?

এ-বই তোমার পড়া। লাইব্রেরির বই। মাকে বললাম কিনা, সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরিতে যাচ্ছি।

আজকাল বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কিছু বলে বেরোতে হয় বুঝি!

বাঃ, এই দুপুর রোদে বেরোলে মা জিজ্ঞেস করবে না? তাও তো মা আসতে দিচ্ছিল না। এত রোদে বেরোলে রং কালো হয়ে যায়।

এই কথা বলে রেণু হাসল। তার উত্তরে বাদল দুম করে বলল, জানো, আজ আমি নিজে রান্না করে খেয়েছি।

সত্যি? যা মিথ্যুক–

বিশ্বাস করো। মা-রা তো দশটার সময় বেরিয়ে গেছেন–হোটেলে না খেয়ে আমি নিজেই রান্না করে খেলাম।

কী কী রাঁধলে?

ধুৎ! রেণু আসতে-না-আসতেই সে রান্নার কথা বলবে নাকি? ভারী একটা কৃতিত্বের ব্যাপার যেন। এটা বড় বোকা বোকা হচ্ছে। রেণু যদি জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলা যেতে পারে।

দরজার সামনে রেণু। হাতে বই নেই। রেণু বলল, আমার দেরি হয়ে গেছে বুঝি?

বাদল বলল, ভীষণ, ভীষণ দেরি করেছ। আমি ভাবছিলাম, তুমি আসবেই না।

সত্যিই বোধহয় আসতে পারতাম না। সেজোকাকিমা চারটে সিনেমার টিকিট কেটেছিলেন, তার মধ্যে বেবিমাসির মাথা ধরেছে বলে যেতে পারবেন না, তাই সেজোকাকিমা বললেন আমাকে যেতে। আমি দেখলাম, দারুণ বিপদ। আমি তো মাথা ধরার কথা বলতে পারি না, কারণ একটু বাদেই বেরোব। বললুম, ছবিটা আমার দেখা। তাও শোনে না–একবার দেখলে কি দু'বার দেখা যায় না? কবে আমি দেখলাম, এই সব। তোমার জন্য আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হল।

আমার জন্য না হয় বললিই একদিন।

আমি মিথ্যে কথা বলি না সবাই জানে। আমার কী রকম অস্বস্তি হয়।

একদিন বললে কিছু ক্ষতি হয় না। তুই আজ না এলে আমি আজ ভীষণ রেগে যেতাম।

আমি তোমার রাগকে বড্ড ভয় পাই। হঠাৎ আজ ডেকেছ কেন?

আজ অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব। কত দিন তো ভালো করে গল্প করা হয়নি। তা ছাড়া আমার কয়েকটা দরকারি কথা আছে।

মাসিমা নেই বাড়িতে?

না, ওরা সাতটা-আটটার আগে ফিরবে না। কাছাকাছি আর কেউ না থাকলে, বেশ এটা, বুঝলি না, বেশ সহজ ভাবে কথা বলা যায়।

হঠাৎ এ রকম গল্প করবার ইচ্ছে হল যে! আজকাল তুমি সব সময় কী রকম গম্ভীর গম্ভীর হয়ে থাকো–

রেণু, আমার খুব মনখারাপ যাচ্ছে।

কেন?

সেই কথাই তো বলব বলে তোকে ডেকেছি। তোকে ছাড়া আর তো কারোকে বলতে পারি না!

আমি তোমার মন ভালো করে দিতে পারি?

শুধু তুইই পারিস। তুই আমার চোখের দিকে তাকাবি, ম্যাজিশিয়ানের মতন ওই। হাত তুলে–

তুমি এই রকম একটা কবিতা লিখেছিলে না?

চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি। চা খাবি? আমি চা তৈরি করে দিতে পারি।

না, চা-টা খাব না। তুমি আজকাল কবিতাটবিতা লেখো না কেন?

কী হবে লিখে? তা ছাড়া, তুই-ও তো আমার কবিতা লেখার প্রেরণা দিচ্ছিস না আজকাল।

আমি আবার কী করে প্রেরণা দেব? ধ্যাৎ!

আমি তোর কাছাকাছি থাকতে চাই। আমার তো এখন আর কোনও বন্ধু নেই- দরজায় এবার সত্যিই শব্দ। বাদল তড়াক করে লাফিয়ে এসে দরজা খুলে দেখল এবার সত্যিই রেণু। হাতে একখানা মাত্র বই, মোটা নয় সরু।

বাদল কোনও কথাই বলল না। রেণু ভেতরে ঢুকে বলল, এ রকম অন্ধকার ঘরে বসে আছ কেন?

বাদল সে কথার কোনও উত্তর দিল না। কোনও কিছু চিন্তাও করল না, দরজাটা বন্ধ করেই রেণুকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। রেণু বাধা দেবার আগেই তার ঠোঁটে ঠোঁট ডোবাল।

রেণু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এ কী?

একটু সরে গিয়ে রেণু দুঃখ ও অভিমান মিশ্রিত গলায় বলল, তুমি আমাকে এই জন্য ডেকেছিলে?

বাদল অপরাধীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বসংসারের বিনিময়েও সে শপথ করে বলতে পারে যে, এক মিনিট আগেও সে এ রকম কোনও কথা ভাবেনি। রেণুকে দেখার পরেই মুহূর্তেই কী যে ঘটে গেল!

কিন্তু অপরাধবোধ থেকে ক্ষমা চাইবার বদলে তার মেজাজ হঠাৎ চড়ে গেল। সে ভাবল, আমি কী দোষ করেছি? রেণু তো আমার নিজস্ব। তাকে নিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি।

মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য সে ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। বেশ কায়দা করে ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, কী হয়েছে কী?

রেণু বলল, তুমি জানো, আমি এসব পছন্দ করি না।

আমার যা খুশি আমি তাই করব।

না।

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। মনে হয়, এক্ষুনি ওরা খুব ঝগড়া করবে। তখন বাদলের মনে পড়ল, রেণু আসবার আগে কত কী কল্পনা করেছিল সে।

বাদল হেসে ফেলে বলল, রেণু, তুই এ রকম কেন রে?

রেণু তবু গম্ভীর ভাবে বলল, আমি তো এই রকমই। তুমি খুব সিগারেট খেতে শুরু করেছ আজকাল। আমার মোটেই ভালো লাগে না।

বাদল রেণুকে আরও রাগাবার জন্য সিগারেট সুষ্ঠু হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই একটু খাবি? একবার টেনে দেখ না!

রেণু বাদলের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর একটা চেয়ারে বসল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। হাতের বইটা খুলে বসল। যেন, সে বাদলের সঙ্গে আর কথা বলতে চায় না।

বাদল ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছে। তার শরীরের মধ্যে এমন একটা চাঞ্চল্য এসেছে, যাতে সে নিজেও একটু বিস্মিত হয়। রেণু তার কত দিনের চেনা, তবু আজ তাকে দেখে সে কেন এমন ভাবে বদলে যাচ্ছে? ইদানীং রেণুকে দেখলেই তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়। কেন? এ কি রেণুকে হারাবার ভয়ে? ওই তো বসে আছে রেণু, এক শাশ্বত দৃশ্যের মতন বসে-থাকা, সে কোথায় হারাবে?

সিগারেটটা শেষ করে বাদল রেণুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রেণু মুখ তুলল না। বাদল নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, কী বই পড়ছিস?

রেণু গম্ভীর ভাবে বলল, বইটা তোমার জন্য এনেছিলাম।

কী বই?

‘সাতটি তারার তিমির’। এ-বইটা দেখেছ আগে? তুমি জীবনানন্দ দাসের নাম শুনেছ?

বাদল অবহেলার সঙ্গে বলল, কবিতার বই? ধুৎ? আমার আর ও-সব পড়তে ভালো লাগে না।

এবার রেণু মুখ তুলে তাকাল। বাদলের মুখে সে খুঁজতে লাগল কী যেন।

বাদল বইটা ছুঁয়েও দেখল না, বলল, তুই কি বইটা কিনেছিস নাকি? হঠাৎ আমার জন্য পয়সা খরচ করতে গেলি কেন?

গতকাল আমার জন্মদিন ছিল। তাই তোমার জন্য একটা কিছু...

তোর জন্মদিন তো আমার জন্য উপহার কেনার কী মানে হয়? আমারই তো একটা কিছু...মানে, কাল তোর জন্মদিন ছিল আমাকে বলিসনি তো?

আমি বুঝি এ কথা সবাইকে বলে বলে বেড়াব?

গত বছর তোর জন্মদিনে আমরা কী করেছিলাম যেন?

ওকথা থাক। আগে তুমি এত কবিতার বই ভালোবাসতে, আর এখন আমার বইটা তুমি নিলে না কেন?

কী হবে কবিতা পড়ে! এসব কবিতা টবিতা তো বুর্জোয়াদের বিলাসিতা।

তুমি আজকাল বড্ড বোকা বোকা কথা বলো।

বাদল আরও কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। যত বার সে ভাবছে রেণুর সঙ্গে ঝগড়া করবে না তত বারই একটা কিছু ঝগড়ার প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে।

এবার সে বইটা তুলে নিল। দ্বিতীয় সাদা পৃষ্ঠাতে রেণু তার সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে, বাদলকে-আমি। বাদল একটু হাসল। রেণু এই কায়দাটা তার থেকেই নিয়েছে। সে আগে যত বার রেণুকে বই উপহার দিয়েছে, কোনও বার নিজের নাম লেখেনি। সব। সময়ই লিখেছে, আমি।

বইটা উলটেপালটে বাদল বলল, অনেকেই বলে, এঁর কবিতা বুঝতে পারা যায় না।

আমিও বুঝতে পারি না সব। ভেবেছিলাম দুজনে একসঙ্গে পড়ব।

এই নির্জন বাড়িতে রেণুর সঙ্গে পাশাপাশি বসে কবিতা গ্রন্থ পাঠ-এই দৃশ্যটির মধ্যে যে রোমান্টিক আবেদন আছে, তা বাদলকে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করে। সে তো এই ধরনের ব্যাপারেই আনন্দ পায়, জীবনের অনেক বড় কৃতিত্বের চেয়ে এই রকম একটা ঘটনার মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। তবু সে জোর করে এই দুর্বলতাটা সরিয়ে দেয় মন থেকে। একটু নির্লিপ্ত ভাবে বলে, কবিতা পড়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু বাস্তবটা বড় কঠিন। তোর সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে।

রেণুর কাঁধ ছুঁয়ে সে বলল, চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি।

রেণু উঠে দাঁড়াল। তারপর টপ করে নিচু হয়ে প্রণাম করল বাদলকে। বিস্মিত বাদল বাধা দেবারও সময় পেল না। রেণু লজ্জারুণ মুখে বলল, কাল আমার জন্মদিনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেছিলাম, তুমি বাড়িতেই ছিলে না।

বাদলের আবার শরীরটা কাঁপছে। রেণু তাকে চুম্বকের মতন টানছে। ইচ্ছে করছে রেণুকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। কবিতা পাঠের মতন এ-দুর্বলতাও সে দমন করল।

সে বলল, আগে আমিও জন্মদিনে গুরুজনদের প্রণাম করতাম। এখন সূর্যদার দেখাদেখি আর কারোকে প্রণাম করি না।

সূর্যদা এখন কোথায়?

কী জানি! এলাহাবাদ না গোয়ালিয়ার কোথায় যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাত্তাই পাওয়া যায় না।

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল দোতলায়। শব্দহীন নির্জন বাড়ি। এ রকম নির্জনতার মধ্যে রেণুর বয়সি কোনও মেয়ে বাদলের বয়সি কোনও ছেলের সঙ্গে স্বাভাবিক থাকতে পারে না। অথচ রেণুর কাছে কিছুই যেন অস্বাভাবিক নয়। এই রকম ফাঁকা বাড়িতে বাদলের সঙ্গে দেখা করতে আসাকেও সে যেমন বিসদৃশ মনে করে না, আবার বাদল এই নির্জনতার সুযোগ নিতে চাইলে প্রথমেই ভৎর্সনা করেছে।

দোতলার সিঁড়ির পাশেই সূর্যর ঘর। আজকাল সব সময় তালা বন্ধ থাকে।

রেণু জিজ্ঞেস করল, মাসিমারা কোথায় গেছেন?

বাদল বলল বেলেঘাটায়। জানিস আজ আমি নিজে রান্না করেছি।

একটুও অবাক না হয়ে রেণু জিজ্ঞেস করলে, কী কী রাঁধলে?

রেণুর উৎসাহের অভাব দেখে বাদল একটু দমে গেল। বলল, ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, মাছভাজা–

হাতটাত পোড়াওনি তো?

কিচ্ছু না। রান্না করা তো খুব সহজ।

ডাল আর মাছভাজা–এই দুটো পদ কল্পিত। কেন যে বাদল এই সামান্য মিথ্যে কথাটুকু বলতে গেল রেণুকে তার কোনও যুক্তি নেই। এই দুটো জিনিসের জন্য তার কৃতিত্ব কি বাড়ল খুব? তবু, এক এক সময় এ রকম ছোট্ট মিথ্যে কথা মুখে এসে যায়।

এই মিথ্যেটুকু বলবার জন্য বাদলের অনুতাপ হল। কিন্তু এখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সে যদি এখন হঠাৎ আবার বলে না রে, আজ ডাল আর মাছভাজা খাইনি, মিথ্যে কথা বলেছিলুম, তা হলে কী রকম শোনাবে?

তার বদলে বাদল অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, রেণু, তুই কার?

রেণু বলল, হঠাৎ একথা কেন?

না, আমি শুনতে চাই?

তোমার।

ঠিক?

ঠিক।

আমি যতই দোষ করি কিংবা অন্যায় করি, তোর সঙ্গে যদি আমার অনেক দিন দেখা নাও হয়, তবু তুই আমারই থাকবি তো?

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো?

বাদল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর সঙ্গে হয়তো আমার আর অনেক দিন দেখা হবে না।

তার মানে?

বলছি, একটু পরে বলছি।

বাদলের ঘরে এসে রেণু বসল বাদলের পড়ার টেবিলের চেয়ারে। বাদল তার কাছেই টেবিলের ওপরেই উঠে বসে বলল, তোকে ডেকে এনেছি এই জন্য যে, অনেক দিন এ রকম ভাবে বসে কথা বলা হয়নি। তা ছাড়া, আর হয়তো বহু দিন তোর সঙ্গে দেখা হবে, না। আমি চলে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছ? চাকরি পেয়েছ কোথাও?

না। চাকরি আমাকে কে দেবে?

আমি জানি, তুমি চাকরির চেষ্টা করছ। সেই জন্যই এম এ পড়লে না।

পড়লুম না নয়। পড়া হল না। আমার একটা চাকরি এক্ষুনি পাওয়া দরকার। কিন্তু কোথাও কোনও চাকরি নেই। চারদিকে শুধু ছাটাই। যুদ্ধের সময় যে লাখ লাখ লোকের চাকরি হয়েছিল, এখন তাদের সব ছাঁটাই করা হচ্ছে। বিচ্ছিরি অবস্থা। সেদিন শুনলাম ইকনমিকসে এম. এ. পাশ এক ভদ্রলোক মাত্র তিরিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি নিয়েছেন।

রেণু এসব ব্যাপার ভালো বোঝে না। সে চুপ করে রইল।

বাদল বলল, টিউশানি ফিউশানি করে কোনও রকমে চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ গত মাসে একদিন মনে হল, আমি হেরে যাচ্ছি। আমি কি এই রকম করে জীবন কাটাব নাকি? এই রকম সামান্য হয়ে থাকব? এ হতে পারে না। অনেক ভেবে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। আমার পক্ষে একমাত্র উপায় এখন বাইরে চলে যাওয়া। ওয়েস্ট জার্মানিতে এখন অনেক লোক নিচ্ছে। যুদ্ধের পর ওদের দেশে শক্ত সমর্থ পুরুষ তো খুব কমে গেছে, তাই গেলেই যে-কোনও চাকরি পাওয়া যায়। আমি আর্টস না পড়ে সায়েন্স যদি পড়তাম, অনেক

সুবিধে হত–যাই হোক, আর কিছু না হোক, কুলিমজুরের কাজ অন্তত পাওয়া যাবেই একটা। তারপর আস্তে আস্তে...। আমার চেনাশোনা এ রকম তিন-চার জন গেছে। কোনও রকমে ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করতে পারলেই হল–জার্মানিতে আমাদের ইন্ডিয়ানদের ভিসা লাগে না

মাসিমা যেতে দেবেন তোমাকে?

কিছুতেই না। এক ছেলে হওয়ার এই এক ঝামেলা। বিষ্ণু ওর মায়ের এক ছেলে– কিন্তু বিষ্ণু বিলেতে পড়তে গেছে সব ব্যবস্থা ট্যবস্থা করে বাড়ি থেকে নিয়মিত টাকা পাঠানো হয়। আমার মতন শূন্যে ঝাঁপিয়ে তো পড়েনি।

মাসিমা আপত্তি করলেও কী করে যাবে তুমি?

কিছু বলিনি এখন পর্যন্ত। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাক, তারপর যতই আপত্তি করুক, আমি যাবই। আমার ইচ্ছে আছে জার্মানি থেকে একদিন রাশিয়া চলে যাওয়ার। রাশিয়া দেখতেই হবে আমাকে। রাশিয়া আমার স্বপ্নের দেশ–সেখানে সব মানুষ সমান, পৃথিবীর ইতিহাসে যা কখনও হয়নি।

রেণু নতমুখে জিজ্ঞেস করল, তুমি কত দিনের জন্য যাবে ভাবছ?

উৎসাহের ঝোঁকে বাদল বলল, চার বছর, পাঁচ বছর, ছ' বছর–

এ রকম তো অনেকেই বিদেশে যায়। তারা সবাই কি জিতে যাওয়া মানুষ?

তা জানি না। এখানে আমি এ রকম ভাবে পড়ে থাকতে পারব না।

মাসিমা-মেলোমশাইকে দেখবার কেউ নেই। ওঁরা এত দিন তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকবেন?

আমি যদি কালকেই হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে মরে যাই, তা হলে কী হবে? সবকিছুই সহ্য হয়ে যায়। এত পিছুটান থাকলে জীবনে কিছু করা যায় না। তা ছাড়া, আমি তো টাকা পাঠাব।

রেণু বলল, আমরা একবার একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে আছে। সেই প্রথম স্বাধীনতার দিনে? তুমি আমাকে যা বলবে আমি শুনব। আমি যা বলব, তোমাকে শুনতে হবে। আমি যদি-

বাদল রেণুর কাধ চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে বলল, না, রেণু না, তুই কিছুতেই আপত্তি করতে পারবি না! প্লিজ...

.

একথার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই যে বাদল তার বাবা মায়ের ঘোর অমত সত্ত্বেও বিদেশে চলে যেতে পারে কিন্তু রেণু একবার না বললেই সে অসহায় হয়ে পড়বে। এখন তার কাছে রেণুর মতামতের দামই সবচেয়ে বেশি। জন্মের পর মায়ের নাড়ির সঙ্গে সন্তানের নাড়ির যে যোগ থাকে, তা কেটে ফেলা হয়। সন্তান যৌবনে পৌঁছেলে অদৃশ্য নাড়ির যোগটাও ছিন্ন হয়ে যায়।

সে তখন মা বাবাকে ধরে নেয় রোদ বৃষ্টি বা শীত-এই রকম কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার মতন-রক্তের তেজে যা সে যখন তখন অবজ্ঞা করতে পারে। সে জানে, তার রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি, বৃষ্টিভেজা কিংবা শীতের মাঠেও বোতামখোলা শার্ট পরা মা বাবা পছন্দ করেন না-অথচ এইগুলোই তার ভালো লাগে। সুতরাং বাবা-মায়ের অন্য সব কথাও অগ্রহনীয়। যেমন, মাঝে মাঝেই তার ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে, হঠাৎ এই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হবার মোহময় চিন্তা তাকে পেয়ে বসেসত্যি সত্যি আত্মহত্যা না করলেও এই চিন্তাটার যে সুখ, সে কথা কি বাবা কিংবা মাকে কখনও জানাতে পারবে?

রেণুর কথা আলাদা। রেণু কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। রেণুকে সে একটু একটু করে সৃষ্টি করছে–আবার তার বাইরেও রেণুর যে রহস্যময় অস্তিত্ব, তাকে আয়ত্ত করতেই হবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মৃত্যু কিংবা বেঁচে থাকার চেয়ে বাদল এখন এটাকে বড় মনে করে।

রেণু জিজ্ঞেস করল, তুমি বিদেশে যাবার ব্যাপারটা একেবারে ঠিক করে ফেলেছ?

বাদল বলল, হ্যাঁ।

রেণু বলল, আমাকেও নিয়ে চলো।

তুই সত্যি যাবি? যেতে পারবি?

কেন পারব না?

বাড়ির সবাইকে ছেড়ে থাকতে পারবি? তোদের বাড়িতে যে কেউ তোকে যেতে দেবে না–এ তো জানাই কথা।

যদি বি. এ.-টা পাস করে নিই, তারপর পড়তে যেতেও পারি। লন্ডনে ছোড়দার কাছে থাকব।

বি. এ. পাসের তো এখনও অনেক দেরি।

তুমি আর দু'বছর অপেক্ষা করতে পারবে না?

না। তা ছাড়া আমি লন্ডনে যাব না, আমি যাব জার্মানিতে। ওখানে এখন অনেক চাকরি।

জার্মানির তো এখন কিছুই নেই। সব ভেঙেচুরে গেছে।

সেই জন্যই তো অনেক কাজের লোক দরকার। রেণু, তোকে বেশ একটা ছেলে সাজিয়ে, প্যান্ট শার্ট পরিয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে হত!

কেন, মেয়েদের বুঝি যেতে দেবে না?

জার্মানিতে এখন মেয়েই বেশি। ওরা এখন–

হঠাৎ থেমে গিয়েই বাদল প্রসঙ্গ বদলাল। বলল, এখনও জরুরি কথাটাই কিছু বলা হয়নি। আমি যে এতগুলো বছর থাকব না, তুই কি আমার জন্য অপেক্ষা করবি?

রেণু একটু অবাক হয়ে বলল, অপেক্ষা মানে?

তোদের বাড়ি যা কনজারভেটিভ, এই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই তোর বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তা হলে কী হবে?

রেণু ভ্রূকুটি করে বলল, কী সব আজেবাজে কথা!

আজে বাজে নয়। এইটাই কাজের কথা। তোদের বাড়িতে তো সবারই খুব কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায়।

জোর করে কারওর বিয়ে হয় না।

ছেলেদের হয় না, মেয়েদের হয়।

তুমি আজকে বড্ড ছেলে-ছেলে মেয়ে-মেয়ে হিসেবে কথা বলছ। জার্মানি যাবার চিন্তাতেই এ রকম হয়েছে বুঝি?

রেণু, আমরা আর ছেলেমানুষ নই। আমরা একটা ব্যাপার জোর করে অস্বীকার করার চেষ্টা করছি। তোকে আর আমাকে এ রকম ভাবে আর বেশি দিন মেলামেশা করতে দেওয়া হবে না। আমাদের বাড়ি থেকে না হলেও তোদের বাড়ি থেকে বাধা দেবেই।

রেণু এসব ব্যাপার সত্যিই যেন বোঝে না। তার সারল্য তার চরিত্রে একটা বিশুদ্ধ তেজ দিয়েছে। সে বলল মেলামেশা কে করতে দেবে না? আমাদের ইচ্ছে আমরা দেখা করব। আমি এবাড়িতে এলে মাসিমা কি আপত্তি করবেন?

কী জানি, করতেও পারেন একদিন। সবকিছুই তো দেখছি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। একটা ছেলে ও মেয়ের সাধারণ ভাবে মেলামেশা করার ব্যাপারটা কেউ মেনে নিতে পারে না সহজ ভাবে। বিয়ে ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নেই। আজ থেকে কুড়ি কি তিরিশ বছর বাদে হয়তো এই ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিংবা আমরা যদি অন্য কোনও দেশে জন্মাতাম–

রেণু বলল, আমার এই দেশই ভালো লাগে।

বাদল রেগে গিয়ে বলল, এটা একটা পচা-গলা দেশ। এদেশের কি হবে না। ভেবেছিলাম, স্বাধীনতার পর সবকিছু বদলে যাবে। দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে হতাশা–

জার্মানি যাচ্ছ তো, তাই এ-দেশ আর পছন্দ হচ্ছে না।

শুধু সে জন্য নয়। আমার মতন ছেলের কোনও সুযোগ আছে এখানে? বি. এ.-তে অনার্স পেয়েছি, তবু এম. এ. পড়তে পারলুম না। একটা কোনও চাকরি করা দরকার, কোনও চাকরি নেই। আমি যে-কোনও কাজ করতে চাই, কেউ কাজ দেবে না। দিন দিন। লক্ষ লক্ষ বেকার বাড়ছে তাদের কাজে লাগাবার কথা কেউ ভাবছে না। পণ্ডিত নেহরু এখন বিশ্বশান্তির ওপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন!

বাদল উত্তেজিত হয়ে গেছে দেখে রেণু চুপ করে বসে রইল। দর্শকের বা শ্রোতার, প্রতিক্রিয়া ঠিক মতন বোঝা না গেলে বক্তৃতা জমে না। বাদল একটু বাদেই তাই চুপ করে গেল।

বিক্ষুব্ধ ভাবে আবার বলল, বিয়ে করলেই যদি লোকে শান্তি পায়, তা হলে আমি তোকে বিয়ে করতেও রাজি। কিন্তু বিয়ে করার যোগ্যতাও নেই আমার। যার চাকরিবাকরি নেই, সে আবার বিয়ে করবে কী? সাধ করে কি আমি দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। দেখছি তো, কত অর্ডিনারি ছেলে দু'-এক বছর একটু বিলেতে ঘুরে গায়ে পালিশ লাগিয়ে আসছে, অমনি লোকে তাদের সম্পর্কে একেবারে গদগদ। আমিও জার্মানি থেকে এক গাদা টাকা নিয়ে ফিরব।

জার্মানিতে বুঝি টাকার ছড়াছড়ি যাচ্ছে?

যে খাটতে পারে, তার সুযোগ আছে। ওখান থেকে রাশিয়ায় যাব–যদি থাকতে দেয়, তা হলে রাশিয়াতেই থাকব। মাঝখানে একবার দেশে ফিরে তোকে নিয়ে যাব জোর করে। জোর করতেই হবে, কারণ এমনিতে তোর সঙ্গে আমার বিয়েতে রাজি হবে না কেউ। আমার মা যে তোকে এত ভালোবাসেন, আমার মা-ও আপত্তি করবেন। দেখিস! তোরা যে কায়স্থ।

রেণু খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, তুমি এমন ভাবে কায়স্থ কথাটা উচ্চারণ করলে, যেন এর চেয়ে নিচু জাত আর নেই!

বামুনরা তো অন্য কারোকেই গ্রাহ্য করে না। আমি যদি তোকে কেড়ে নিতে চাই, তবে অবশ্য আটকাবার সাধ্য কারওর নেই। দরকার হলে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকব। কিন্তু তার আগে একটা কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আমাকে।

রেণুর ঠোঁটে হাসির রেখা লেগে রয়েছে তখনও। সে বলল, সেই যোগ্যতা বুঝি শুধু জার্মানিতে গিয়েই অর্জন করা যায়। আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি একদিন খুব বড় লেখক হবে। সবাই তোমার নাম জানবে। তোমার লেখা পড়ে অনেকে কঁদবে। সেটাও কি একটা যোগ্যতা নয়?

বাদল একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, রেণু তুই আমাকে লেখার কথা আর বলিস না। ওটা আমার একটা দুর্বল জায়গা।

তুমি লেখা কেন ছেড়ে দিয়েছ, বলো তো? আজ তোমাকে বলতেই হবে?

আমি লিখতে জানি না। আমার তো ভালো লাগত!

তুই বললেই তো হবে না! আমি মানুষের সাম্যে বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাস নিয়ে পার্টির কাজও করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা সবাই আমাকে বলল, আমার লেখাগুলো প্রতিক্রিয়াশীল। তখন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। আমি নিজে প্রতিক্রিয়াশীল নই, তা হলে আমার লেখা কী করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়? আমি তা হলে কী লিখব? শুধু স্লোগান? আবার ওরা বলে, বিষ্ণু দে খুব প্রগতিশীল লেখক-অথচ তার কবিতা পড়ে আমি সব মানে বুঝতে পারি না। আমার মাথা গুলিয়ে যায় এসব ভাবতে গিয়ে। তার থেকে লেখা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

তুমি অন্যদের কথা শুনে লিখবে কেন? তোমার নিজের কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই?

আমার ইচ্ছে করে শুধু তোকে নিয়ে লিখতে। কিন্তু তুই তো শুধু একটা মেয়ে, তুই একটা জ্যান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। পৃথিবীতে তার কোনও মূল্যই নেই এখন। পৃথিবীতে মানুষের এখন অনেক কাজ। শুধু আমিই কোনও কাজ খুঁজে পাচ্ছি না।

তা হলে একমাত্র জার্মানিতে যাওয়াই তোমার মুক্তির উপায়।

তাই তো দেখছি।

তা হলে ঘুরে এসো।

তুই আমার জন্য অপেক্ষা করবি তো?

তুমি ঠিক সময়ে ফিরে এসো।

তুই যদি এর মধ্যেই আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠাস, তা হলে আমি যে-কোনও উপায়েই তোক চলে আসব। অবশ্য যাওয়ার ব্যাপারে অনেক বাধা আছে এখনও। পাসপোর্ট দেবার আগে পুলিশের ভেরিফিকেশন লাগে। খুব কড়াকড়ি শুনেছি। আমি কিছুদিন পার্টির কাজ করেছি, সেই জন্য আমাকে নাও দিতে পারে। তারপর আছে ভাড়া জোগাড় করার চিন্তা। বাবা-মায়ের কাছ থেকে কিচ্ছু নেব না!

কত টাকা লাগবে?

জাহাজ ভাড়া চোদ্দোশো-সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক জোগাড় করতেই হবে। সূর্যদা থাকলে ধার চেয়ে নিতাম। সূর্যদা তো বড়বাবুর সব টাকা ঠুকে দিচ্ছে।

দু' হাজার টাকা জোগাড় করা খুব শক্ত বুঝি?

বাদল এবার হেসে বলল, তুই একদম ছেলেমানুষ রেণু। দু'হাজার টাকার দাম ঠিক দু' হাজার টাকা। তোকে বললাম না, লোকে আজকাল তিরিশ-চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্য হন্যে হয়ে যাচ্ছে! তা হলে দু'হাজার টাকা কত হয়?

রেণু বলল, আমারই তো পোস্ট অফিসে তিন হাজার টাকা আছে। বাবা রেখে গিয়েছিলেন আমার নামে। একটা সই করলেই তো সেই টাকা তোলা যায়।

বাদল গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তুই আমার এই বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা এখন কারোকে বলিস না। বিষ্ণুকেও কিছু লেখার দরকার নেই।

রেণু বলল, তোমাকে ওই টাকার জন্য আর কোথাও ঘোরাঘুরি করতে হবে না। টাকাটা আমি তুলে দেব পোস্ট অফিস থেকে। একদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো।

তোর টাকা আমি নেব না।

কেন?

ওকথা থাক। এখন অন্য কথা বল!

রেণু উঠে বাদলের সামনে এসে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ চোখে বলল, তুমি যদি আমার টাকা না নাও, তা হলে জীবনে আমি তোমার মুখ আর দেখব না।

বাদল বলল, রেণু, এ রকম ছেলেমানুষি করিস না। টাকা জোগাড় করার চেষ্টা আমি করব, খুব সম্ভবত পেয়েও যাব। তোর কাছ থেকে টাকা নিতে আমি পারি না।

রেণু বলল, কেন পারো না। সেটাই আমি জানতে চাই।

বাদল একটু অসহায় ভাবে হাত নাড়তে লাগল। ঠিক যুক্তিটা তার মনে আসছে না। তারপর বলল, এটা হয় না। এটা ঠিক মানায় না! আমি তোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশে যাব, এটা কি সম্ভব?

রেণু বলল, আমার যদি টাকার খুব দরকার হত কখনও, আমি তো তোমার কাছেই চাইতাম। আর কার কাছে চাইব?

সেটা আলাদা ব্যাপার।

আমি এই আলাদা ব্যাপারটাই বুঝতে পারি না। আমার কাছে টাকা থাকলেও তুমি নেবে না, আর অন্য লোকজনের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইবে-এর মানে কী?

বাদল বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। অন্য কোথাও না পেলে তোর কাছ থেকেই নেব।

রেণু এতেও খুশি নয়। সে কঠিন মুখ করে বলল, না, ও-সব চলবে না। তুমি অন্য কারওর কাছে চাইতেই পারবে না।

তুই এত জোর করছিস কেন?

কারওর কাছে টাকা চাইবার পর সে যদি না দেয়, তা হলে অপমান লাগে না? আমি চাই না, কেউ তোমাকে সে রকম অপমান করুক।

তুই যেন আমাকে জার্মানিতে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস?

বাঃ, নিজেই তো এতক্ষণ ধরে বলছিলে এইসব কথা। বিদেশে না গেলে নাকি তোমার জয় হবে না!

যেতে আমাকে হবে ঠিকই। আমি যে চার-পাঁচ বছর বাইরে থাকব, তাতে তোর মনখারাপ লাগবে না তো?

রেণু ভুরু কুঁচকে বলল, না, মনখারাপ লাগবে কেন?

রেণু খুব চাপা মেয়ে, তার মনের ভাব বাদলও সব সময় বুঝতে পারে না।

বাদলের মনে হল, যেন তার বিদেশে যাওয়া সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এক্ষুনি সেই বিচ্ছেদের মুহূর্ত। আসলে তার যাওয়ার ব্যাপারে এখনও কিছুই ঠিক নেই। তবু, সে বিচ্ছেদের নাটকীয় মুহূর্তটিকে মনে মনে কল্পনা করে ফেলে।

মাদ্রাজ গিয়ে তাকে জাহাজ ধরতে হবে। সুতরাং ট্রেনে চেপে যাবে মাদ্রাজে। হাওড়া স্টেশনে কি রেণু যাবে তাকে বিদায় দিতে? বোধহয় পারবে না। তা হলে, রেণুর সঙ্গে বাদলের শেষ দেখা কোথায় হবে? রেণুর বাড়িতে তো বাদল আর যাবেনা কখনও। এই বাড়িতেই, নাকি কোনও পার্কে বা রেস্তোরাঁয়?

এই রকম ভাবতে ভাবতে বাদল রেণুর কাঁধে দু'হাত রাখল। আবেগ কম্পিত গলায় বলল, রেণু, তোর কথা সব সময় আমার মনে থাকবে। যদি প্রতি সপ্তাহে তোর চিঠি না পাই-

রেণু হেসে ফেলল। তারপর বলল, তুমি একটা পাগল!

মেয়েদের এইসব সময়কার হাসি ছেলেদের হতবুদ্ধি করে দেয়। বাদল ঘাবড়ে গেল। সে বুঝতে পারল, রেণুর সামনে সে পুরুষোচিত সপ্রতিভ হতে পারছে না।

তখন সে সবচেয়ে সহজ পুরুষোচিত কাজটি করে ফেলল। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রেণুকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, রেণু এবার বাধা দিল না। বাদলের বুকে মুখ রেখে চুপি চুপি বলল, আমার কথা একদম চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। শুধু শুধু চিন্তা করে নিজের কাজ নষ্ট কোরো না!

এবারেও বাদল একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেলল। সে বলল, রেণু, আমি তোকে ভালোবাসি। দারুণ ভালোবাসি।

রেণু খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, জানি।

তারপর সে আঙুল দিয়ে বাদলের বুকে দাগ কাটতে লাগল। হিজিবিজি, রেখা অথবা কোনও অক্ষর।

বাদল রেণুর ওই 'জানি' কথাটাই শুধু শুনল, আঙুলের রেখার ভাষা বুঝল না।

রেণুর এত শান্ত ব্যবহার ঠিক পছন্দ করতে পারল না সে। নিভৃত গোপন জীবনে একটু নাটকীয়তার দিকে তার ঝোঁক।

সে আবার হঠাৎ কাঁপানো গলায় বলল, রেণু, তোর কাছে একটা জিনিস চাইব, দিবি?

কী বলো?

না বলতে পারবি না কিন্তু?

আচ্ছা দেব। কী?

আমাকে একটু আদর করতে দিবি! আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। আমি এটাকে স্মৃতি হিসেবে নিয়ে যাব।

রেণু এবার রীতিমতন কাবু হয়ে পড়ল। এতক্ষণ সে কথায়বার্তায় বাদলকে মাথা তুলতে দেয়নি। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে সে অসহায়। আগে থেকেই হ্যাঁ বলে ফেলেছে।

খুব অস্ফুট গলায় বলল, এসব কি ভালো?

এতে কিছু দোষ নেই। তুই তো আমারই।

তবু আমার মনে হয়, সবাইকে লুকিয়ে চুরিয়ে এটা যেন একটা পাপ।

বাদলের গলায় এবার দৃঢ়তা এসেছে। সে জোর দিয়ে বলল, না, পাপ নয়।

রেণু মুখ না তুলেই বলল, আচ্ছা, একবার।

বাদল আঙুল দিয়ে রেণুর থুতনিটা উঁচু করে তুলে ধরল। চোখে রাখল চোখ। দেখল ঝরনার জলের মতন স্বচ্ছ মুখোনি, খুব যত্নের সঙ্গে সে চুমু খেল রেণুকে। জোরজারি। বা ছটফটানি নেই, খুব শান্ত ভাব। শারীরিক বাসনা নয়, সে যেন শিল্প সম্ভোগ করছে। তার নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। রেণু লজ্জায় বাদলের দিকে তাকাতে পারছে না, ফিরিয়ে নিল মুখ।

বাদল উৎসুক ভাবে জিজ্ঞেস করল, তোর ভালো লাগেনি?

রেণু মুখ অন্য দিকে রেখেই বলল, জানি না।

বাদল দু'হাতে রেণুর মুখখানা নিজের দিকে নিয়ে এল আবার। রেণুর ঠোঁটের ওপর রাখল নিজের একটা আঙুল।

রেণু বলল, আর নয়।

বাদল হুকুমের সুরে বলল, আর একবার।

তুমি কথা রাখছ না। দেখো বৃষ্টি এসে গেছে। জানলা দিয়ে জল আসছে।

আসুক!

বাদল আবার তার ঠোঁট রাখল রেণুর ঠোঁটে। রেণু চুম্বনের মর্ম বোঝে না। সে শুধু দেখছে বাদলের চোখ, যা এখন অসম্ভব জ্বলজ্বলে। বাদল রেণুর নীচের ঠোঁট, যাকে অধর বলে, নিয়ে নিল নিজের মুখের মধ্যে এবং সে অনুভব করল, রেণু সত্যিই আমার।

এবার মুখ সরিয়ে নিয়ে রেণু বলল, আমার গায়ের মধ্যে যেন কী রকম করছে। আমার সত্যিই দুর্বল লাগছে শরীরটা।

বাদল অভিজ্ঞের মতন বলল, ও কিছু না। ও রকম হয়।

রেণু বলল, ভীষণ জোরে বৃষ্টি আসছে। কী করে বাড়ি যাব?

একটু পরেই থেমে যাবে।

বাইরে শোনা যায় ঝড়ের শনশন আওয়াজ। জানলার পাল্লাটা ঠকাস ঠাস শব্দে দেওয়ালে আছড়ে পড়ছে। রেণুর গলা জড়িয়ে ধরে তাকে সঙ্গে নিয়েই বাদল চলে এল। জানলার কাছে। দু'জনেই চোখ রাখল বাইরের ক্রুদ্ধ বন্য ঝড়-বৃষ্টির দিকে।

রেণু বলল, আমি তোমার কথা যখন ভাবি, এইসব কথা কিন্তু কখনও ভাবি না।

এইসব ছাড়াও কি আমরা খুব কাছাকাছি থাকতে পারি না?

বাদল বলল, আমি ওসব জানি না। তুই সুন্দর, তাই আমি তোকে ছুঁয়ে থাকতে চাই। কলেজে পড়ার সময় আমার বন্ধুরা মেয়েদের সম্পর্কে কত রকম কথা বলত। আমার শুধু মনে পড়ত তোর কথা।

রেণু বাদলের বুকে আঙুল দিয়ে আবার কিছু আঁকিবুকি বা লিখতে লাগল।

বাদল বলল, রেণু, তোর গালে আমি একটা দাগ করে দেব?

রেণু লজ্জিত ভাবে বলল, অন্যরা দেখে যখন জিজ্ঞেস করবে, কী বলব?

বলবি কোনও পোকায় কামড়ে দিয়েছে।

তুমি বুঝি পোকা?

আচ্ছা, এমন জায়গায় দাগ করে দিচ্ছি, কেউ দেখতে পাবে না।

রেণু কিছু বলছে না। বাধা দিচ্ছে না, দেখছে বাদলকে। বাদল রেণুর ডান হাতে, কাঁধের কাছটায় ব্লাউজটা সরিয়ে দাঁত দিয়ে আলতো ভাবে কামড়ে ধরল। বাদলের চুলসুষ্ঠু মাথাটা রেণুর গালের কাছে। রেণু অন্য হাতটা রাখল বাদলের চুলে। মনে মনে সে-ও ভাবল, এই মানুষটা আমার।

এই উপলব্ধি তার শরীরে একটা শিহরন এনে দেয়। মনে হয়, এই পৃথিবীটা এই মুহূর্তে শুধু ওদের দু'জনের জন্য। আর কেউ নেই কোথাও। পৃথিবীর বুকে যেন একটা কাটা ফুটে ছিল, এইমাত্র সেই কাঁটাটা কেউ তুলে নিল।

রেণু নিজেই বাদলের মাথাটা টেনে এনে চেপে ধরল নিজের বুকে। খুব জোরে। তারপরেই সরিয়ে দিল।

বাদল কোনও দিন রেণুর হাতের আদর পায়নি। কাঙালের মতন চোখ করে তাকাল। তারপর বলল, আমি অনেকক্ষণ তোর বুকে মাথা রাখতে চাই।

রেণু সরে গিয়ে ব্লাউজের হাতাটা টেনে ঠিক করল। তারপর বলল, না, আর কোনও দিন এ রকম কোরো না।

কেন?

আমাদের পবিত্র থাকতে হবে।

আজকেই নিজেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র মনে হচ্ছে আমার।

যে-দিন আমারও সেই রকম মনে হবে, সেই দিন আবার, কেমন!

বাদল আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে রেণুকে। বাদল জিজ্ঞেস করল, জানলা বন্ধ করে দেব?

না থাক। বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগছে।

বাদল সিগারেট ধরিয়ে রেণুর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। জলের ঝাঁপটায় দু'জনেরই জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে, তবু খেয়াল নেই।

৭১. সূর্য অনেকটা উদ্দেশ্যহীন

সূর্য অনেকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে উত্তর ও মধ্যভারতে। তার সাত-আট বছরকার পলাতক জীবনের সঙ্গে এই ভ্রমণের অনেক তফাত। এখন তার পকেট-ভরতি টাকা। এবং টাকাপয়সা খরচ করে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে।

বড়বাবু মৃত্যুর আগে তাকে বার বার গোয়ালিয়ার যেতে বলেছিলেন। কিন্তু সূর্য পথে থামতে থামতে যাচ্ছে। প্রথমে সে নামল কাশীতে, সেখানে একটি লোককেও চেনে না। হোটেলে থাকে, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে। সারা দিনে কথা বলে খুব সামান্য। কয়েক দিন বাদে চলে এল এলাহাবাদ।

যে-কোনও কারণেই হোক, কাশীর তুলনায় এলাহাবাদ তার বেশি পছন্দ হয়ে গেল। এমনকী, একথাও তার মনে হল একবার, আর সে কখনও পশ্চিম বাংলায় ফিরবে না, এই শহরেই থেকে যাবে।

এলাহাবাদ শহরেও কেউ তার চেনাশুনো নেই। কিন্তু একদিন সে হাইকোর্টের সামনে একটা দোকানে বসে চা খাচ্ছে, এমন সময়-অৰু টেবিলে তর্কে মত্ত দু'জন লোকের মধ্যে। একজনের গলার আওয়াজ শুনে সে আকৃষ্ট বোধ করল। একটু ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর এবং ছ-গুলোকে স-এর মতন উচ্চারণ করা, অর্থাৎ গিয়েসেন, করেসেন ইত্যাদি। এই কণ্ঠস্বরটি তার চেনা।

সূর্য ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। যে ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বর সূর্যের চেনা মনে হচ্ছে, তিনি সূর্যর দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন। ধুতি ও খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, মধ্যবয়স্ক। সূর্যর তবু মনে হল লোকটির নাম বরদাপ্রসন্ন। মেদিনীপুর জেলে একসময় সূর্যর সঙ্গে মাস ছয়েক ছিলেন।

সূর্যর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই, কারওর খোঁজও সে রাখতে চায় না। কিন্তু যাদের সঙ্গে জেলে কয়েকটা মাস পাশাপাশি কাটিয়েছে, তাদের সঙ্গে একসময় যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আত্মীয়তার চেয়েও বেশি। তাদের দেখলেই এখন সবচেয়ে আপনজন বলে মনে হয়। বরদাপ্রসন্ন যদিও গান্ধীবাদী কংগ্রেসি ছিলেন সে-সময়, জেলখানাতেও থাকতেন আলাদা ব্যারাকে, তবু আলাপ পরিচয় ছিল যথেষ্ট।

সূর্য টেবিল ছেড়ে বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে দেখা করতে গেল না। আর এক কাপ চা নিয়ে বসে রইল। ওদের তর্কাতর্কি শুনতে পাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, বরদাপ্রসন্ন রাজনীতির আলোচনাতেই উত্তেজিত। রাজনীতিতে যারা একবার ঢোকে, তারা সারা জীবনে আর কিছুতেই বেরোতে পারে না। বরদাপ্রসন্ন চুটিয়ে নিন্দে করছেন পণ্ডিত নেহরুর। মনে হয়, তিনি প্যাটেল-নীতির সমর্থক। কিংবা ভাবখানা এই, বরদাপ্রসন্নকেই যদি ভারতের

প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়া হত, তা হলে উনি চোখের নিমেষেই সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

খানিকটা পরে বরদাপ্রসন্ন উঠে পড়লেন। সূর্যর টেবিলের পাশ দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়লেন কথা বলতে বলতে। সূর্য নিজে থেকেই বরদা-দা বলে একবার ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল। তার মনের মধ্যে একটা দোলাচল চলছে। অচেনা শহরে একাকীত্ব বড় মর্মান্তিক। সে চায় কারওর সঙ্গে একটু কথা বলতে, কেউ তার নাম ধরে ডাকবে, হাত চেপে ধরে বলবে, আরে, তুমি?-অমনি এখানকার বাতাস কত হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু সূর্য রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চায় না। সে চায় তার অতীতকে একেবারে মুছে ফেলতে।

সূর্যও বেরিয়ে এল চায়ের দোকান থেকে। বরদাপ্রসন্ন তখনও একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গীর সঙ্গে তর্কে মেতে আছেন। ঘন ঘন নস্যি দিচ্ছেন নাকে। সূর্যর মনে পড়ল, জেলে থাকার সময় বরদাপ্রসন্ন নস্যির অভাবে কী রকম আকুলিবিকুলি করতেন। মেটকে একখানা আস্ত পাঁউরুটি দিয়ে তার বদলে কখনও কখনও পেতেন এক পয়সার এ-জে 'র' নস্যি।

সূর্যর মুখে এক মাসের দাড়ি। বরদাপ্রসন্ন হঠাৎ দেখলে সূর্যকে চিনতে পারবেন না হয়তো। সূর্য তবু সে জায়গা ছেড়ে নড়ল না। তৃষ্ণার্ত ভাবে তাকিয়ে রইল এই শহরে তার একমাত্র চেনা মানুষটির দিকে।

একটু বাদে বরদাপ্রসন্ন যখন হাঁটতে শুরু করলেন, সূর্যও যেতে লাগল তার পেছনে পেছনে। এই অনুসরণের কোনও অর্থ নেই। সূর্য যেন চুম্বক-আকৃষ্ট হয়ে হাটছে। তা ছাড়া, কিছু তো করার নেই তার।

অল্প দূরেই একটা ইলেকট্রিকের সরঞ্জামের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লেন বরদাপ্রসন্ন। সূর্য কাঁচের শো-উইন্ডোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখে বুঝল, বরদাপ্রসন্ন এ-দোকানের

মালিক নন। কেন না চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তিনি মালিক-চেহারার একটি লোককে বললেন, এক কাপ চা খাওয়াও হে সতীশ।

সূর্য বুঝতে পারল, বরদাপ্রসন্নও এখন বেকার। ঘুরে ঘুরে আড্ডা দেওয়া ও চা খাওয়াই তার কাজ। সূর্যকে দেখতে পেলে তিনি হাতে চাঁদ পাবেন। মেতে উঠবেন পুরনো দিনের গল্পে, জেলখানার সতীর্থরা এখন কে কোথায় আছে সেই বৃত্তান্তে।

সূর্য আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, তবু বরদাপ্রসন্নকে ডাকল না।

হোটেলে সূর্যর পাশের ঘরেই তিনটি বাঙালি ছেলে এসে উঠেছে দু দিন ধরে। সিঁড়িতে ওঠা-নামার সময় দেখা হয়েছে, কোনও কথা হয়নি।

সে-দিন সন্ধ্যাবেলা ওদের মধ্যে একটি ছেলে এসে সূর্যর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল।

দাদা, আপনি তো বাঙালি?

সূর্য বলল, হ্যাঁ।

ছেলেটি একগাল হেসে বলল, আমরাও তাই ভেবেছিলুম, তবে ঠিক শিয়োর হতে পারিনি। আপনি তাস খেলতে জানেন? আমাদের একজন তোক শর্ট পড়ে গেছে।

আমি তো তাস খেলতে জানি না।

তাস চেনেন তো? আসুন না, শিখিয়ে দেব।

সূর্যকে এবার স্বীকার করতে হল যে, সে তাসও চেনে না।

বাঙালির ছেলে অথচ তাস চেনে না, এতে অপর বাঙালির ছেলেটি বড় আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, তা হলে সারা সন্ধেবেলাটা কী করবেন? আসুন না আমাদের ঘরে। একটু গল্পটল্প করা যাক।

অপরিচিত লোকদের সঙ্গে সূর্য একেবারেই ভাব জমাতে পারে না। তবু ছেলেটির আগ্রহ-আতিশয্যে তাকে যেতেই হল।

দুটো খাট ওরা জোড়া লাগিয়েছে। তার ওপর তাস ছড়ানো। দুটো অ্যাশট্রে সিগারেটের টুকরোয় একেবারে ভরে গেছে। সূর্য এসে এক পাশে বসল।

ছেলে তিনটির নাম অরুণ, সুকল্যাণ আর দেবব্রত। সূর্যরই বয়সি, তিন জনই চাকরি করে, বেড়াতে বেরিয়েছে। ওরা এখন ফেরার পথে। দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিল। ওদের মধ্যে একজনের অফিসের একটা কাজ আছে এলাহাবাদে, সুতরাং অন্যরাও কয়েক দিন থেকে যাচ্ছে এখানে।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা নিজেদের সব কথা বলে গেল। খুব সহজেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারে ওরা। খাটের তলা থেকে আস্তে আস্তে বার করল তিনটে গেলাস আর একটা মদের বোতল।

সূর্যকে জিজ্ঞেস করল, দাদার চলবে?

দৈর্ঘ্য ও স্বাস্থ্যের জন্য সূর্যকে ওদের তুলনায় বড় দেখায়। সেই জন্য ওরা প্রথম থেকেই সূর্যকে দাদা বলতে শুরু করেছে। প্রথমটা লজ্জা ভাঙার আগে ওরা সূর্যকে দেখে মদের বোতল আর গেলাস লুকিয়েছিল খাটের তলায়।

সূর্য বলল, না।

একজন সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সিগারেট নিন অন্তত।

আমি সিগারেটও খাই না। ধন্যবাদ।

দাদা দেখছি খুব ভালো ছেলে। আমরা এসব খাচ্ছিটাচ্ছি বলে কিছু মনে করছেন না তো?

সূর্য ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বলল, না না!

এই ধরনের যুবকদের সঙ্গে আগে মেশার সুযোগ হয়নি সূর্যর। ওরা লম্পট দুশ্চরিত্র কিছুই নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের চাকুরে বাঙালি যে রকম হয়। বছরে একবার ছুটি নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, নিবিড় বন্ধুত্ব, প্রবাসে এসে একটু অ্যাডভেঞ্চারের জন্য মদ চেখে দেখে, নিজেদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কখনও চাকরির আলোচনা কখনও স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আলোচনায় মেতে থাকে। তিন জনেরই বিয়ে হবে হবে অবস্থা, বিয়ে হয়ে গেলে এ রকম বন্ধুত্ব আর থাকবে না।

সূর্যকে তাস খেলা শেখাবার চেষ্টা করে একটু পরেই ওরা নিরাশ হল। যার খেলা শেখার আগ্রহ নেই, তাকে শেখানো যায় না। তখন ওরা মেতে উঠল গল্পে। ওরা সদ্য আগ্রা থেকে ঘুরে এসেছে, সেখানকার সম্পর্কে ওদের অনেক সরস গল্প আছে, নারীঘটিত।

সূর্য একসময় বলে ফেলল, আমিও একবার আগ্রায় যাব ভাবছি।

আগে যাননি?

না।

তখন তিন জনেই মহা উৎসাহে সূর্যকে আগ্রা বিষয়ে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করতে লাগল। কিন্তু কোন হোটেলে সূর্যর ওঠা উচিত, সে সম্পর্কে একটা মতভেদ দেখা গেল ওদের মধ্যে। দুজনে একটা হোটেলের নাম করে, তৃতীয় জন হাসতে হাসতে বলে, যাঃ, দাদাকে ওই হোটেলে পাঠাসনি! কেন মিছিমিছি–

তারপর তিন জনেই হাসতে আরম্ভ করে। সূর্য ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ওরা তিন জনেই একটি হোটেল বিষয়ে একমত হয় এবং স্টেশনে হোটেলের দালালদের কাছ থেকে কী ভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কোথায় যেতে টাঙ্গার কত ভাড়া, সব জানিয়ে দেয়।

ওই ছেলে তিনটিকে সূর্যর খারাপ লাগেনি, ভালোও লাগেনি। কিন্তু ওদের সঙ্গে মেলামেশার কোনও টানও সে বোধ করল না। নিজে থেকে সে একটাও কথা বলতে পারে না। ওদের রসিকতাগুলোও তার কাছে অন্য রকম মনে হয়। একমাত্র বরদাপ্রসন্নর সঙ্গেই সে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারত। সূর্য আবার গেল সেই চায়ের দোকানে। বরদাপ্রসন্ন নেই। ইলেকট্রিক সরঞ্জামের দোকানেও সে বরদাপ্রসন্নকে দেখতে পেল না আর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেই দোকানটার সামনে।

.

সূর্য পরদিনই আগ্রা চলে গেল। সেই যুবক তিনটির নির্দেশিত হোটেলে গিয়েই উঠল। এবং চব্বিশ ঘণ্টা যেতে-না-যেতেই বুঝল, ভুল জায়গায় এসেছে। যুবক তিনটি রসিকতা করেছে তার সঙ্গে।

আগ্রাতেও কিছু বাঙালি ভ্রমণকারী রয়েছে। সূর্যর সঙ্গে কারওর ভাব হল না। প্রায় সকলেই সস্ত্রীক। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে বাঙালি যুবকরা অচেনা কোনও যুবকের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে না।

বিকেলের দিকেই সূর্য গিয়েছিল তাজমহল দেখতে। গাইডের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ দেখার পরই বিরক্ত হয়ে উঠল। তবে, সবাই বলাবলি করছে, সে-দিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দেখা নাকি দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

বড় এক ঠোঙা বাদাম কিনে সূর্য গিয়ে বসল মাঠের মধ্যে। সন্ধ্যার দিকে ভিড় আরও বাড়ছে। বাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যাও অনেক, আর তরুণ তরুণীদের চোখ ভাবে বিভোর–এখানে এলে এ রকম হওয়াই নিয়ম বোধহয়।

ঘাসের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সূর্য। খোসা ছাড়িয়ে বাদাম মুখে পুরছে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে তাজমহলের দিকে। যত বার চোখ তুলছে, সে তাজমহল দেখতে পাচ্ছে না ঠিক, দেখছে দীপ্তিকে।

মুখটা কঠিন করে সূর্য মনে মনে বলছে, আমি তোমার কেউ না। তুমি কেন আসছ এখানে, যাও! তুমি তো বলেইছ, তোমার সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হবে না!

দীপ্তি কোনও কথা বলে না। তরল হাওয়ায় মাঝে মাঝে মিলিয়ে যায়। যখন দীপ্তিকে দেখতে পায় না তখন সূর্য বলে, তুমি আমার!

জ্যোৎস্নায় যখন তাজমহলের বিশ্ববিখ্যাত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তখনও দীপ্তির মায়াময় মূর্তি এসে দাঁড়াল সূর্যর সামনে। দীপ্তির স্বভাব-গম্ভীর মুখে যে অকস্মাৎ হাসি দেখে সূর্য একসময় পাগল হয়েছিল, সেই রকম হাসি-আঁকা ঠোঁট। সূর্য যেন এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ওই ঠোঁট কামড়ে ধরবে। দীপ্তির ছটফটে শরীরটা বাহুবন্দি করে সে... অত্যন্ত তীব্র অভিমানের সময় সূর্য শারীরিক প্রসঙ্গ ছাড়া ভাবতে পারে না।

সূর্য চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে তাজমহলকে আড়াল করে দিল। যেন। তাজমহলও একটা শরীর, সমস্ত সৌন্দর্যের ঘন রূপ, যা শুধু মানুষকে দুঃখ দেয়।

৭২. এলাহাবাদের সেই বাঙালি ছেলেগুলি

এলাহাবাদের সেই বাঙালি ছেলেগুলির কথা মতন সূর্য আগ্রায় যে-হোটেলটাতে উঠেছিল, সেটা একটা গোলমালের জায়গা। বহু পুরনো আমলের বাড়ি এবং অনেক পুরনো পাপ সেখানে বাসা বেঁধে আছে।

সূর্যকে দেওয়া হয়েছে তিনতলার একটি ঘর। ঘরটি ছোট হলেও মোটামুটি পরিষ্কার। জানলা দিয়ে বাইরের অনেকখানি দৃশ্য দেখা যায়। ঘরে একটা পাখা আছে, বিছানায় ধপধপে সাদা চাদর। তবু বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না, এত অসহ্য গরম।

সূর্য তাজমহল থেকে ফিরেছে বেশ রাত করে, আসবার পথেই খেয়ে নিয়েছে। টাঙ্গা নিয়ে সে একবার ইতমদৌল্লার দিকে গিয়েছিল, কিন্তু রাত্রে সেখানে কিছুই দেখার নেই। রাত্রে আর কিছু করবারও নেই তার, পুরনো আগ্রার পথে অধিক রাত পর্যন্ত মানুষজন দেখা যায়, অনেক দোকানপাট খোলা, কোনও কোনও জায়গা থেকে হইহল্লার আওয়াজ ভেসে আসে, কিন্তু যে-মানুষ কারোকে চেনে না, সে আর কোথায় যাবে! হোটেলে ফিরে এসে একটা ইংরেজি উপন্যাস খুলে শুয়েছিল সে।

কিন্তু বইতে মন বসানো অসম্ভব। ঘামে বিছানার চাদর ভিজে যায়। শরীরে যেন সহস্র সুচ় বিদ্ধ হচ্ছে। একসময় অসহ্য বোধ হওয়ায় সূর্য বই মুড়ে রেখে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

এ-বাড়ির গঠন একটু অদ্ভুত ধরনের। চৌকো মতন একটা বড় উঠোনের চারদিকে ঘর, প্রত্যেক ঘরের সামনে দিয়ে অর্থাৎ উঠোনের দিকে রয়েছে টানা বারান্দা, বাইরের দিকে কিছু নেই। প্রত্যেক তলাতেই উঠোনের ওপর অংশটা লোহার শিক দিয়ে ঢাকা। সেই লোহার শিকের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা করা যায় স্বচ্ছন্দে, এর ওপরে দাঁড়ালে একতলা পর্যন্ত দেখা যায়। হোটেলের ছোকরা চাকররা অনেক সময় ওখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে একতলার কারোকে ডাকে।

এখন গরমের জন্য অনেক ঘরের বাসিন্দাই বাইরে এসে বসেছে, কেউ কেউ বিছানা পেতেছে সেই লোহার শিকের ওপর। বাইরেও গরম কম নয়, তবে, ঘরের মধ্যে যেমন একটা পোড়া পোড়া ভাব-এখানে সেটা অন্তত নেই।

গেঞ্জি আর পাজামা পরে সূর্য উঠোনের সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটুখানি স্বস্তি পেল যেন।

পূর্ণিমার রাত্রি, মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে, ঝকঝকে নীল আকাশ-কিন্তু এত অসহ্য গরমের জন্য সৌন্দর্য দেখার দিকে কারওর মন নেই।

সূর্য একবার ভাবল, বেয়ারাকে ডেকে তার বিছানাটা বাইরেই পাততে বলবে কিনা। এখনও অনেকটা জায়গা আছে। কিন্তু দ্বিধা করতে লাগল। সে একা-চোরা স্বভাবের ছেলে, এত লোকের পাশাপাশি শুতে তার ইচ্ছে নেই। কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল রেলিংয়ে ভর দিয়ে।

অনেকেই এখনও জেগে আছে। কোনও বাংলা কথাবার্তা শুনতে না পেয়ে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। এখন কারওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার ইচ্ছে নেই তার। সন্ধ্যা থেকেই মনটা ভারী হয়ে আছে।

উঠোনের এক কোণে বসে জন চারেক লোক খুব খোলাখুলি ভাবেই মদ্যপান করছে। উঁচু গলায় হাসাহাসি করছে তারা। মাংসের হাড় চিবিয়ে লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে সেই হাড় একতলার কারওর মাথায় ফেলার চেষ্টা করা ওদের অন্যতম কৌতুক। হোটেলের বেয়ারারা ব্যস্ত হয়ে তাদের জন্য এনে দিচ্ছে ঘন ঘন সোডার বোতল এবং নানা রকম মাংস। লোকগুলির চেহারা ডাকাতের মতন, কিন্তু একজনের গানের গলা চমৎকার।

কাছাকাছি যারা শুয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কয়েক জন নারী। কিন্তু এই মদ্যপানরত দলটি সম্পর্কে তারা ভ্রূক্ষেপহীন। শুয়ে-থাকা লোকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে এদের সঙ্গে রসিকতা বিনিময় করছে।

মাঝে মাঝে একটি যুবতী মেয়ে নীচতলা থেকে আসছে এখানে, মদ্যপানের দলটির পাশে দু-এক মিনিট বসে আবার চলে যাচ্ছে। মেয়েটির আঁটসাট স্বাস্থ্য, ঘাঘরা ও কাঁচুলি পরা, শরীরের দর্শনীয় ব্যাপারগুলি প্রকট করে তোলার ব্যাপারে যত্নশীল। মেয়েটি একটু বসেই চলে যাচ্ছে, আবার কয়েক মিনিট বাদেই ফিরে আসছে-তার এ রকম ঘন ঘন আসা-যাওয়ার অর্থ বোঝা যায় না।

সূর্য অপলক চোখ মেলে এইসব ব্যাপার লক্ষ করছিল। একসময় ঠিক ওই একই পোশাক পরা এবং প্রায় এক রকম চেহারার তিনটি মেয়েকে দেখে সে বুঝতে পারল, বার বার একটি মেয়েই আসেনি, এসেছিল বিভিন্ন জন।

এরা কারা? সে-সম্পর্কে সূর্যর কোনও কৌতূহল নেই। তবে, একটি মেয়ে যখন সূর্যর কাছেই রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল এবং তার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে হাসল তখন সূর্যকে সচকিত হয়ে উঠতেই হল।

সূর্যও একটু হাসল। মেয়েটিকে সে চিনতে পেরেছে। তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও সে জানে, পৃথিবীতে এ রকম মেয়ের সংখ্যা দু-তিন কোটি তো হবেই? ভুরুর ব্যবহারেই এরা আত্মপরিচয় দেয়।

সেই মাতালের দলটি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে কী যেন বলল। রাগের কথা কিছু নয়। বোধহয় তারা সূর্যকে তাদের সঙ্গে যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছে। বাকি দুটি মেয়েও বসে গেছে ওদের পাশে।

সূর্য হাত জোড় করে বলল, মাপ কিজিয়ে।

মেয়েটি এবার সূর্যর কাছ ঘেঁষে এসে বলল, আইয়ে?

সূর্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, মাপ কিজিয়ে।

তারপর হোটেলের একজন বেয়ারাকে কাছাকাছি দেখে সে গম্ভীর ভাবে ডাকল। তাকে বলল, বরফের একটা বড় চাই আনতে পারো?

এই ব্যাপারটা সূর্যর হঠাৎ মনে পড়েছে। হাজারিবাগে স্কুলে পড়ার সময় সে দেখেছিল, সেখানকার একজন ফাদার কিছুতেই গরম সহ্য করতে পারতেন না। তিনি গ্রীষ্মের দুপুরে তার ঘরে একটা মস্ত বড় বরফের চাই রেখে দিতেন পাখার ঠিক নীচে। তাতে হাওয়া খানিকটা ঠান্ডা হত। সূর্য আজ হোটেলে ঢোকার ঠিক মুখেই দেখেছে, বড় বড় বরফের চাই আঁকষি দিয়ে টেনে ভেতরে আনা হচ্ছে।

সূর্যর কথা শুনে বেয়ারাটি গাঁইগুঁই করতে লাগল। সূর্য ঘরে ঢুকে জামার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট এনে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুরন্ত।

মেয়েটি মুখে ফিকফিকে হাসি নিয়ে সূর্যকে দেখছিল তখনও। সূর্য আর সেদিকে তাকাল না। বেয়ারাটি বরফের চাইটা নিয়ে আসার পর সূর্য সেটাকে পাখার ঠিক সামনেই রাখল একটা টুলে। হাওয়াটা সোজাসুজি যাতে বরফের ওপর লাগে। তারপর সূর্য দরজা বন্ধ করে দিল।

পাখাটার কাছাকাছি দাঁড়াতেই একটু ঠান্ডা হাওয়া পাওয়া গেল এবার। বরফ গলে জল পড়ে সারা ঘরে ছড়াবে অবশ্য, তা ছড়াক! এতখানি বরফ গলতেও অনেক সময় লাগবে।

বাইরের মেয়েটির কথা ভাবতে গিয়েই ঝনঝন করে উঠল একটা কৈশোর-স্মৃতি। হাজারিবাগে স্কুলে পড়ার সময় রাত্তিরবেলা সে যখন কয়েকটি ছেলের সঙ্গে পালাত, হাজির হত একটা জুয়ার আড্ডায়, সেখানে একদিন একটি মেয়ে নাচ দেখিয়েছিল। ঠিক এই রকমই পোশাক, এই মেয়েটিরই জাতের আর একটি মেয়ে। একই রকম ভুরুর ভঙ্গি আর কাঁচুলি ঠেলে বেরিয়ে আসা স্তন।

কী উদগ্র কৌতূহল ছিল তখন সূর্যর। সেই কৈশোরে ওই রকম একটি মেয়ের শারীরিক রহস্য জানবার জন্য সে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারত। আজকের এই মেয়েটির সেই রহস্যের দাম বড় জোর পাঁচ টাকা বা দশ টাকা, কিন্তু সূর্যর কোনও রকম চিত্তবিকারই হল না।

মেয়েটি তার কাছে এসে দাঁড়াবার মুহূর্ত থেকেই সূর্যর মনে পড়ছিল দীপ্তির কথা। তাজমহল কিংবা যৌবনবতী কোনও সুলভ নারী-সবকিছুই আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে দীপ্তি। তার সেই সরল চোখ-যার দুর্বোধ্য ভাষা সূর্য পড়তে পারে না, চিবুকের দৃঢ় ভঙ্গি। সূর্য অত্যন্ত গভীর ভাবে জেনে গেছে যে, দীপ্তির সঙ্গে তার আর দেখা হবে না সে আর কখনও দীপ্তির কাছে ফিরে যাবে না। তবু, বার বার দীপ্তি এ রকম ভাবে চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে কেন? সূর্য কি আর কোনও দিন সুন্দর কিছু উপভোগ করতে। পারবে না?

দীপ্তি একদিন বলেছিলেন, সূর্য, তোমাকে দেখার পর আমি একটা দায়িত্ব বোধ করি। আগে আমি অনেক স্বাধীন ছিলাম। যখন যা খুশি করতে পারতাম। এখন তোমার সঙ্গে দেখা করা কিংবা তোমার কাছে কথা রাখার ব্যাপারে আমাকে সব সময় চিন্তা করতে হয়।

সূর্য ভাবল, দীপ্তিদি কি এখনও তার সম্পর্কে সেই রকম দায়িত্বের কথা ভেবেই...।

সূর্য একটা ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলল।

একটু পরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। সূর্য আলো নেভায়নি, ঘরের দরজা খুলতেই দেখল, সেই রকম দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও কথা না বলে হাসছে মিটিমিটি।

সূর্য ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কী?

মেয়েদুটি একজন ঠ্যালা দিল আরেকজনের গায়ে। ওদের দেখে মনে হয় যমজ। ওদের হাসি ও শরীরভঙ্গির মধ্যে যেন নাচের মুদ্রা আছে।

একজন উর্দু-হিন্দি এবং আশ্চর্যের বিষয়, খানিকটা বাংলা মিশিয়ে বলল, বাবুজি যে আশ্চর্য বুদ্ধি খাঁটিয়ে এই গরমের মধ্যে বরফের হাওয়া খাচ্ছেন, ওরাও কি একটুক্ষণের জন্য সেই হাওয়া খেতে পারে? স্রেফ পাঁচ মিনিটের জন্য?

সামান্য একটু চিন্তা করে সূর্য বলল, আইয়ে ভিতরমে।

মেয়েদুটি ঘরে ঢুকে পাখার সামনে দাঁড়াল। সূর্য খাটে শুয়ে আবার গল্পের বইটা খুলল।

সূর্য মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পাচ্ছে, মেয়েদুটি তাকিয়ে আছে। তার দিকেই। চোখাচোখি হতেই ওরা হাসছে, যে-হাসিতে স্পষ্ট আহ্বান। সূর্য গম্ভীর হয়ে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। সূর্য ভাবছে, মেয়েটিকে এবার ঘর থেকে চলে যেতে বলা উচিত, কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারছে না। আর মেয়েদুটিরও হাওয়া খাওয়ার বিরাম নেই। টেবিল ফ্যানের জোরালো হাওয়ায় উড়ছে ওদের ঘাঘরা, এবং দুষ্টুমি করে ওরা ব্লাউজ টেনে ধরে বুক জুড়োচ্ছে। সূর্যর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ওরা তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে।

একটু পরেই সূর্যর মনে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হল। সে রূপপিপাসী, মেয়েদুটির ভরাট শরীরের দিকে তাকাতে তার যে ভালো লাগছে, একথা অস্বীকার করতে পারবে না। ওদের ফুরিত ওষ্ঠ, সুগোল স্তন এবং সুগঠিত উরুর দিকে বার বার তার চোখ চলে যাচ্ছে। কিন্তু, একথাও ঠিক, ওদের শয্যাসঙ্গিনী করার একটুও ইচ্ছে জাগছে না তার। সূর্যর নীতিবোধ নেই, নারীসঙ্গ পেলে সে স্পষ্টত উৎফুল্ল হয়, তবু তার লোভ জাগছে না কেন? ওরা এত সুলভ বলে? এ-পর্যন্ত যে ক'টি নারীর গায়ে সূর্য হাত ছুঁইয়েছে, সব জায়গাতেই জোর করতে হয়েছে তাকে।

আর একটা জিনিসও বোঝা যাচ্ছে না, দুটি মেয়ে একসঙ্গে এসেছে কেন? মেয়েদুটি যেন যমজ, একই রকম চেহারা, একই রকম পোশাক, মুখদুটি অবশ্য সামান্য আলাদা। বাইরে যে আর একটি মেয়ে রয়েছে, তাকেও এদেরই মতন দেখতে। যদি এদের তিন জনের মধ্যে যে-কোনও এক জনকে বেছে নিতে হয়, তা হলে লটারি করতে হবে।

আর একবার চোখ পড়তেই একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, আপ কঁহাসে আ রাহা হ্যায়?

সূর্য গম্ভীর ভাবে বলল, কলকাতা!

মেয়েটি তখন জানাল যে সূর্যকে দেখলেই বোঝা যায় বাঙ্গালিবাবু। বাঙ্গালিবাবুরা এখানে অনেক আসে। তাদের দিল খুব ভালো হয়।

মেয়েটি এগিয়ে এসে সূর্যর খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার ভাবখানা এই যে, আমাকে আপনার পছন্দ হচ্ছে না? অন্য মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সূর্য বলল, এবার আপনারা বাইরে যান। আমি এবার ঘুমোব।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়ল। নানা রকম ভাবে দুঃখ জানিয়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, ছি, ছি, ছি, তাদের বিষম অন্যায় হয়ে গেছে। সাহেব ঘুমোবেন জানলে তারা মোটেই হাওয়া খেতে আসত না।

মেয়েদুটি ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সূর্য এবার উঠে দরজা বন্ধ করতে যাবে, এর মধ্যেই পুরো মদ্যপায়ী দলটা এসে দাঁড়িয়েছে তার দরজার কাছে। প্রত্যেকের হাতেই গেলাস। একজন বলল, সাহেব নাকি হাওয়া ঠান্ডা করার একটা কল। বানিয়েছেন? বাঃ, বেশ আজিব কায়দা তো!

তারা অনুমতি নেবার অপেক্ষা করল না। সকলে ঢুকে এল ঘরের মধ্যে। বরফের চাইটার সামনে দাঁড়িয়ে তারা বলল, হ্যাঁ, প্রত্যেক ঘরেই এ রকম বন্দোবস্ত করা উচিত। যা গরম আজ!

ওদের সঙ্গে যে তৃতীয় মেয়েটি ছিল, সে এসে সরাসরি বসে পড়ল সূর্যর খাটের ওপর। তার হাতের মদের গেলাসটা সূর্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপ পিতে নেহি?

সূর্য দু'দিকে মাথা ঝাঁকাল।

একজন পুরুষ লঘু গলায় জিজ্ঞেস করল, কেয়া সাব, বেড়াতে এসেছেন তাও একটু ফুর্তিটুর্তি হবে না?

সূর্য এখন রীতিমতন বিরক্ত বোধ করছে। এই লোকগুলোকে এখন ঘর থেকে তাড়ানো যায় কী করে? কত রাত পর্যন্ত এই মাতালের হল্লা চলবে? মেয়ে তিনটির সঙ্গে এই লোকগুলোর সম্পর্ক কী? এদের তো কোনও রকম লজ্জাশরমের ব্যাপার নেই দেখা যাচ্ছে। কালকেই হোটেল পালটাতে হবে।

সূর্য বুঝতে পারছে, এত মাতালের সঙ্গে রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করা যায়, কিন্তু ম্যানেজার কি জানে না যে তিনতলায় এই কাণ্ড চলছে?

খাটের ওপর বসা মেয়েটি তার ব্লাউজ ফাঁক করে ফুঁ দিচ্ছে ঘামে-ভেজা বুকে। তার তকতকে মসৃণ পেট ও নাভির দিকে সূর্য কয়েক বার তাকাল। মাত্র কয়েকটি টাকা দিলেই মেয়েটি বাকি বস্ত্র খুলে ফেলবে। সুগঠিত নারী শরীর দেখতে ভালো লাগে। সূর্যর মনের একটা অংশে সেই ইচ্ছেটা প্রবল, আবার মনের অন্য অংশে একটা ঘৃণা জাগছে এদের সম্পর্কে।

সূর্য মৃদু গলায় মেয়েটিকে মিনতি করে বলল, আমি খুব ক্লান্ত, আমার ঘুম পাচ্ছে, তোমরা এবার বাইরে যাবে?

এই মেয়েটিও খুব লজ্জা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এদের নির্লজ্জতা এবং লজ্জা, দুটোই খুব অদ্ভুত। শারীরিক আমন্ত্রণ জানাবার ব্যাপারে এদের বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, আবার একটি মাত্র কথাতেই এরা হঠাৎ অনুতপ্ত হয়ে পড়ে।

মেয়েটি উঠে গিয়ে মাতালগুলোকে ধমক দিয়ে বলল, আরে চলো, চলো, শিগগির বাহার চলো, সাহেবের ঘুম পেয়েছে!

মাতালের দল সূর্যর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে। সূর্য দরজার খিল তুলে দিল। তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল খাটে।

কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যেও তার ঘুম এল না। ওই মেয়ে তিনটির শরীর তাকে বিরক্ত করছে। বিশেষত তৃতীয় মেয়েটির বুকে ফুঁ দেওয়ার দৃশ্যটা বার বার ভেসে উঠছে তার চোখে। সে জোর করে ছবিটা মুছে দিতে চাইছে। আবার, এটা ভুলতে চাইলে যা মনে পড়ছে, সেটা যে বড় দুঃখের। জলপাইগুড়ির আশ্রমে থাকার সময়ে দীপ্তিদি কোনও দিন সূর্যর কাছাকাছি আসেননি, কোনও দিন একটুও প্রশ্রয় দেননি। তবু শেষের দিকে একদিন তিনি

বলেছিলেন, সূর্য, এক এক দিন আমার ইচ্ছে করত, মাঝ রাত্রে উঠে তোমার ঘরে চলে যাই, তোমার শিয়রের পাশে বসি, তোমার ঘুমন্ত মুখে হাত রাখি কত কষ্ট করে যে নিজেকে দমন করেছি-! কথাটা মনে পড়তেই সূর্যর শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

দীপ্তিদি সত্যি যদি কোনও দিন মাঝ রাত্রে আসতেন তার কাছে, বসতেন শিয়রের পাশে- তা হলে সূর্যর জীবনটা যেন ধন্য হয়ে যেত। সূর্য দু হাত তুলে শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরল। ঠিক এই রকম ভাবে দীপ্তিকে সে নিজের বুকের মধ্যে-

না, এ ভাবে চিন্তা করা ঠিক হচ্ছে না। সূর্য মাথা ঠান্ডা করল। দীপ্তিদি আর কোথাও নেই, কোনও দিন ছিল না। সেটা অন্য জীবন। এই তিনটি মেয়ের যে-কোনও একজনের, সঙ্গে দীপ্তিদির তফাত কী? এই মেয়েগুলিরও শরীরে যৌবন আছে, আনন্দ করার স্পৃহা আছে। তৃতীয় মেয়েটির কথাই ধরা যাক, যে বুকে ফুঁ দিচ্ছিল, তাকে পাশে নিয়ে শুয়ে সূর্য কেন আনন্দ পাবে না? ওর শরীরটা সুন্দর, সুন্দর শরীরই তো উপভোগের, তবু সূর্য কেন ওকে ডাকতে পারল না?না, লজ্জা নয়, অন্য রকম বাধা ছিল। আর, দীপ্তিদি এখানে নেই, সূর্যর জীবনেই আর নেই, তবু তার জন্য এখনও এত কাতরতা রয়ে গেছে কেন? এরই নাম ভালোবাসা? পৃথিবীতে এত সুলভ নারী আছে, অথচ যাকে ভালোবাসা যায়, সেই সবচেয়ে দুর্লভ হয়ে ওঠে কেন?

দীপ্তিদি সহজে তার শরীর স্পর্শ করতে দিতেন না, কলকাতায় সেই অদ্ভুত দুরন্ত দিনগুলিতেও। কখন কে দেখে ফেলবে এই চিন্তা তো ছিলই, তা ছাড়া ভেতরের বাধা। তিনি কোনও সময়েই ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবু কখনও সামান্য একটু বাহুর স্পর্শ, পিঠে একটু হাত রাখা-তাতেই ছিল কত রোমাঞ্চ। মনে আছে, একদিন মধ্য কলকাতার একটা ছোট চায়ের দোকানে সূর্য আর দীপ্তি বসেছিল একট ক্যাবিনে। পরদা। ফেলা ছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ মুখ তুলে দীপ্তিদিকে এত অসহ্য সুন্দর মনে হল সূর্যর, যেন ওই বুকে মাথা রেখে তক্ষুনি মরে যেতে ইচ্ছে হয়। দু'জনের মাঝখানে টেবিলের দূরত্বটা মনে হচ্ছিল কী বিশাল, সূর্য দীপ্তিদির গালে শুধু তার হাতটা ছোঁয়াতে চাইল একবার, দীপ্তিদি মুখটা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে বললেন, না, ও-সব কী! সূর্য তখন

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা দীপ্তিদির ডান হাতটা তুলে নিয়ে একটা আঙুল তার মুখে পুরে দিল। আলতো ভাবে দাতে চেপে ধরে রইল দীপ্তিদির আঙুল, কয়েক মুহূর্ত। সামান্য ব্যাপার, অথচ ওতেই দীপ্তিদির মুখে লাগল লাল রঙের ছোপ, আর সূর্যর শরীরে যেন প্রচণ্ড জ্বরের উত্তাপ। পৃথিবীর আর কোনও মানুষ আর কোনও নারীকে অমন তীব্র ভাবে চেয়েছে? কী নিদারুণ অতৃপ্তি!

না, না, সূর্য এসব ভাববে না, আর কিছুতেই ভাববে না। দীপ্তিদি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাইরে তখনও হইহল্লা চলছে। শোনা যাচ্ছে মেয়েলি গলার চনমনে হাসি। ওরা বেশ জমিয়ে নিয়েছে। এদের জীবন কত সরল। এদের ভালোবাসা টাসার ঝাট নেই। তিনটি মেয়ে কী সহজ ভাবে মাতামাতি করছে অতগুলো পুরুষের সঙ্গে, আবার অর্থ উপার্জনের জন্য ওদের সামনেই একজন পরদেশিকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল–তার জন্য পুরুষদের মধ্যেও তো কোনও ঈর্ষার চিহ্ন ছিল না। ওরা এ রকম কী ভাবে পারে?

সূর্য বিছানা ছেড়ে উঠে এল দরজার কাছে। আলো জ্বালল না। দু-এক মিনিট ধরে ভাবতে লাগল, দরজা খুলে সে-ও ওদের দলে গিয়ে যোগ দেবে কিনা। কেন সে একা একা বিছানায় ছটফট করবে? কিংবা কোনও মেয়েকে ডেকে এনে–

শেষ পর্যন্ত সূর্য দরজা খুলল না। মনের দুটো অংশ কিছুতেই এক হচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সে লোভীর মতন শুনতে লাগল বাইরের ওদের হাসাহাসি। দীপ্তিদি কি তাকে সারা জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে ছেড়ে দিলেন?

পরদিন সকালেই সূর্য হোটেল বদলে ফেলল। দু'দিন ধরে ফতেপুরসিক্রি, সেকেন্দ্রা আর আগ্রা দুর্গ দেখা শেষ করল। তারপর ট্রেন ধরল গোয়ালিয়ারের।

বড়বাবু মৃত্যুর আগে বার বার সূর্যকে বলেছিলেন গোয়ালিয়ারের কথা। তিনি চেয়েছিলেন, ছেলেকে নিয়ে নিজেই এখানে আসবেন একবার। কেন? হয়তো কোনওই মানে নেই,

অসুস্থ অবস্থার প্রলাপ। কিংবা তার নিজের জীবনের অনেকগুলি বছর কেটেছে এখানে, সেই স্মৃতি মনে পড়ছিল।

সূর্যর জন্ম হয়েছিল এইখানে। কিন্তু খুব কম বয়সেই এ-জায়গা থেকে চলে গিয়েছিল। স্মৃতিতে বিশেষ কিছুই নেই।

গোয়ালিয়ারে এসে সূর্যর হোটেল পেতে খুব অসুবিধে হল। ভালো হোটেল নেই। এখানে, সাধারণ যে কটা আছে, তার কোনওটায় জায়গা নেই, কোনওটা তার পছন্দ হয় না। টাঙ্গাওয়ালা তাকে নিয়ে তুলল ডাকবাংলোতে। সেখানেও ঘর খালি নেই। তবে ডাকবাংলোর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে একটি যুবক খবরের কাগজ পড়ছিল, সে সূর্যকে দেখে বলল, ইফ ইউ লাইক, আই ক্যান অ্যাকোমোডেট ইউ ইন মাই রুম। দেয়ার ইজ অ্যান একস্ট্রা বেড।

অন্য কারওর সঙ্গে এক ঘরে থাকা সূর্য একেবারেই পছন্দ করে না। সেই জন্য সে যুবকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আমার একটা আলাদা ঘরই চাই। আমি বরং সার্কিট হাউসে চেষ্টা করে দেখি।

যুবকটি বলল, সার্কিট হাউসে জায়গা পাবার কোনও আশাই নেই। দুজন মিনিস্টার এসেছে। আপনি এখানে থাকলে কাল একটা ঘর খালি পেয়ে যাবেন। আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন, না কোনও কাজে?

সূর্য টাঙ্গা থেকে সুটকেসটা নামাল।

৭৩. যুবকটি সূর্যর চেয়ে

যুবকটি সূর্যর চেয়ে বয়সে কয়েক বছর বড়ই হবে, ছিপছিপে লম্বা চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় যে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। হোটেলে-ডাকবাংলোয় এসে সবাই একটা নিজস্ব আলাদা ঘর পেতে পছন্দ করে, এই

ছেলেটি নিজে থেকেই তার ঘরের ভাগ অন্য একজনকে দিতে চাইছে। সুতরাং সে যে খুব মিশুকে প্রকৃতির তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে জানে না, সে সূর্যর মতন। কতখানি অমিশুককে ঘরে ডেনে আনল।

যুবকটি নিজেই সূর্যর সূটকেসটা নিয়ে এল ঘরে। অন্য দিকের খালি খাটটা দেখিয়ে বলল, চাদরটাদর সব পরিষ্কারই আছে। ওয়ার্ডরোবটাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আমার জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই। খেয়ে এসেছেন তো?

সূর্য বলল, এখন না খেলেও চলবে। স্নানটা করা দরকার।

না, না, খাবার দরকার হলে চৌকিদারকে এখনও বলে দিন। খাবার আনিয়ে দেবে। আপনার কি বিজনেস আছে, না সরকারি কাজ?

কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতেই। যুবকটির ইংরেজি নির্ভুল নয়, তবু সে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, ক্রিয়াপদ বা অব্যয়ের নির্ভুল ব্যবহার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

সূর্য বলল, না আমি বেড়াতে এসেছি।

যুবকটি একটু অবাক হয়ে সূর্যর মুখের দিকে তাকাল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, যাস্ট ফর সাইট সিয়িং? অ্যালোন?

হ্যাঁ।

যুবকটি একটু হাসল। তারপর বলল, এত গরমে কেউ এখানে বেড়াতে আসে? বেড়াতে এসেছেন তো আগে থেকে থাকবার জায়গা ঠিক করে আসেননি? এখানে থাকবার জায়গা পাওয়ার খুবই অসুবিধে।

এই ব্যাপারটাতে সূর্যর মনে একটা অভিমান জন্মেছিল। এই শহরে সে জন্মেছে, একসময় এখানে তার বাবার যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি ছিল, আর এখন এখানে সে একটু থাকবার জায়গাও পাচ্ছিল না।

সূর্য বলল, এই সময় কেউ বেড়াতে আসে না, তবু হোটেল ডাকবাংলোয় এত ভিড় কেন?

আপনাকে বললাম না, মধ্যপ্রদেশের দু'জন মন্ত্রী এসেছেন, সেইসঙ্গে অনেক গভর্নমেন্ট অফিসার-আমি তো একমাস আগে রিজার্ভেশন করিয়ে রেখেছিলাম।

ডাকবাংলোর চৌকিদার এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। যুবকটি তাকে দেখে তাড়া দিয়ে বলল, গোসলখানামে পানি লাগাও পহলে। তারপর সাহেবের জন্য খানা-

যুবকটি সূর্যর দিকে ফিরে বললে, আমাদের এখনও পরিচয় হয়নি-আমার নাম রূপলাল গুপ্তা। আমার একটা ছোটখাটো বিজনেস আছে।

সূর্য নিজের নাম জানাল।

রূপলাল বলল, ভাদুড়ী? আপনি কি শিশির ভাদুড়ীর রিলেটিভ?

না।

ওঃ, সাচ এ গ্রেট অ্যাক্টর। এতবড় অ্যাক্টর ইন্ডিয়াতে কেউ নেই।

আপনি বাংলা থিয়েটার দ্যাখেন নাকি?

যুবকটি তখন বাঙলা বলতে শুরু করল। বলল, বহুত, অনেক! আমি তো পড়া লিখা করেছি কলকাতায়। চিত্তারাঞ্জান এভিনিউতে আমাদের বাড়ি আছে। আপনি কলিকাতায় কি কাম করেন?

সূর্য বুঝতে পারল, যুবকটি তাকে আরও অনেক প্রশ্ন করবে। সে স্নান করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

রূপলাল তারই মধ্যে শুনিয়ে দিল যে কলকাতায় তাদের অনেক দিনের ব্যবসা আছে। সে কলকাতাকে খুবই ভালোবাসে। কলকাতার মতন 'লাইফ' আর কোথাও নেই। তবে সে আর তার দাদা মধ্যপ্রদেশে নতুন একটা কারখানা শুরু করছে। সেই জন্য এখানেই এখন থাকতে হচ্ছে। গোয়ালিয়ারেও এসেছে ব্যবসার কাজে। যে-মিনিস্টার দু'জন এসেছেন, তাদের একজনকে ধরে পারমিট আদায় করতে হবে। জানেন তো, ক্যাপিটালে বসে মিনিস্টারদের মন গলানো খুব শক্ত। তবে বাইরে কোথাও গেলে তারা দিলদরিয়া হয়ে যান, ঝটাকসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেন। তারপর লেগে থাকতে পারলেই হল। তবে আজ মিনিস্টাররা মিটিং ফিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, আজ কোনও কাজ হবে না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আগামীকাল। আজ সে সূর্যবাবুর সঙ্গে সাইট সিয়িংয়ে বেরোতে পারে। দুজনে একসঙ্গে বেরোবার সুবিধে এই, টাঙ্গাভাড়া ভাগাভাগি করে দেওয়া যায়।

সূর্য চুপচাপ শুনে গেল। এই বাক্যবাগীশ ছেলেটির সঙ্গে যদি এক ঘরে কাটাতে হয়, তা হলে কালকেই সে গোয়ালিয়ার ছেড়ে চলে যাবে। টাঙ্গাভাড়া বাঁচাবার জন্য অন্য কারওর সঙ্গে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেও তার নেই।

স্নান করে এসে সূর্য চুল আঁচড়াচ্ছে, রূপলাল তার মধ্যেই ভ্রমণের সূচি বানিয়ে ফেলেছে। সে আগে গোয়ালিয়ার দু'-তিন বার এসেছে অবশ্য, বিশেষ কিছুই দেখেনি।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনি আগে ফোর্ট দেখতে যাবেন নিশ্চয়। ওইটাই তো আসল দেখবার। গুহারী মহলের কাছে তার চেনাজানা একজনের একটা দোকান আছে। তার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। এ ছাড়া সূর্য যদি জলবিলাস আর মতিমহলে যেতে চায়-

সূর্য বলল, আমি আজ আর বেরোব না ভাবছি। শরীরটা ভালো নেই। আজ শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেব।

রূপলাল একটু নিরাশ হয়ে গেল। তবিয়ত ভালো, নেই! কী হয়েছে বলুক না সূর্য? তার কাছে অনেক রকম ওষুধ আছে।

ওষুধের দরকার নেই। এমনিই শুয়ে থাকব।

রূপলাল বলল, তা হলে আমিই বা কোথায় ঘোরাঘুরি করতে যাব? আমিও শুয়েই থাকি!

চৌকিদারকে দিয়ে কিছু খাবার আনিয়ে সূর্য খেয়ে নিল। তারপর নিজের খাটে শুয়ে পড়ে চোখের সামনে মেলে ধরল একটা বই। রূপলাল টুকিটাকি আরও দু-একটা প্রশ্ন চালাল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল হঠাৎ। বোঝা যায়, সে বেশ সুখী লোক, তার ইচ্ছাঘুম। সূর্যর কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে তার ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হল না।

দুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস নেই সূর্যর। রেলের স্টল থেকে কেনা গ্রেহাম গ্রিনের উপন্যাসটায় সে বেশ রস পেয়ে গেল। পড়তে লাগল গভীর মনোযোগ দিয়ে। ঝিমঝিম গ্রীষ্মের দুপুর। মাঝে মাঝে শোনা যায় কাকের শুকনো গলার ডাক।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাইরের একটা শোরগোলে সূর্যর চমক ভাঙল। এটা ঠিক বিপদের। গোলমাল নয়, অন্য রকম। বই মুড়ে রেখে সূর্য ডাকবাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রূপলালও ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে।

একটা বিরাট মিছিল বেরিয়েছে। তেরঙা ঝান্ডা ও ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে একদল লোক, তাদের ফিটফাট পোশাক ও মাথায় গান্ধী টুপি, মিছিলের বাদবাকি লোকেদের চেহারা ও পোশাক মলিন, খালি পা, তারা বন্দেমাতরম শব্দটার অর্থও জানে না, তবু যন্ত্রের মতন গলা মেলায়।

মিছিলের মাঝখানে দুটি মোটরগাড়িতে শুভ্র খদ্দরের পোশাক পরা দু'জন স্থূলকায় ব্যক্তি, এঁদেরও মাথায় গান্ধী টুপি, গলায় প্রচুর মালা, হাত জোড় করে দু'পাশের জনতার। দিকে নমস্কার জানিয়ে বিগলিত হাস্য বিতরণ করছেন।

রূপলাল বলল, জুলুস বেরিয়ে গেছে, আজ বিকালে খুব বড় মিটিং আছে।

তারপর সে খুব উত্তেজিত ভাবে মোটরগাড়ির আরোহী বিশিষ্ট ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে এক জনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে দেখছেন, উনিই হচ্ছেন শ্রীবাস্তবজি। আবগারি মন্ত্রী কাল উনার সঙ্গেই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। পারমিট যদি মিলে যায়–

সূর্য মুখ ফিরিয়ে রূপলালকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কীসের ব্যবসা?

রূপলাল বলল, মদ। ভোপালে একটি বিয়ার তৈরির কারখানা যদি খুলতে পারি–

সূর্য আবার জিজ্ঞেস করল, আজ কীসের মিটিং?

আজ তো আগস্ট দিবস আছে। সেই মিটিং–

আগস্ট দিবস মানে?

আজ কত তারিখ আপনার খেয়াল নেই। আজ ৯ই আগস্ট–ফরটি টু-তে যে-আগস্ট মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল না–

সূর্য সামান্য একটু চমকে উঠেছিল। তারপরই তার মুখের চেহারা খানিকটা বদলে গেল। কোনও কারণ নেই, তবু বেশ রাগ হল তার। আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে এই রকম একটা মিছিল তার মনে হল অতি কদর্য। যেন ওই আন্দোলনটা সূর্যর একেবারেই। নিজস্ব, অন্য কারওর এ ব্যাপারে কোনও অধিকার নেই।

সে রাগত ভাবে জিজ্ঞেস করল, আগস্ট দিবসে আবগারি মন্ত্রী কী বলবেন?

বাঃ, আপনি শ্রীবাস্তবজির কথা জানেন না? সাতারাতে উনি সেই সময় যা লড়েছিলেন–

হয়তো সাতারাতে শ্রীবাস্তবজি সত্যিই খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন বেয়াল্লিশ সালে। আজ স্থূল চেহারায় গান্ধী টুপি পরে আবগারি মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে তিনি সেই সব দিনের স্মৃতি নিয়ে আজ একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা না দিয়ে ছাড়বেন না মনে হয়।

সূর্য হঠাৎ বলল, মিটিংটা কোথায় হবে? আমি শুনতে যাব।

রূপলাল একগাল হেসে বলল, বাঙালিরা বক্তৃতা শুনতে বড্ড ভালোবাসে। চলুন, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

ঘরে ফিরে এসে সূর্য দ্রুত পোশাক পালটাতে লাগল। চুলে চিরুনি বসিয়ে বুঝল, বেশ শক্ত হয়ে গেছে চুল, সহজে আঁচড়ানো যায় না। তা ছাড়া চুল আঁচড়াবার জন্য ডান। হাতখানা উঁচু করতে গেলেই কাঁধের কাছে খচ করে লাগে। জলপাইগুড়িতে তাকে যে মেরেছিল তার ব্যথার রেশ এখনও রয়েছে। দেশের স্বাধীনতা এবং দীপ্তিদি এই দুটি কারণে সে দু'বার মার খেয়েছে, এই দুটিই তার জীবন থেকে অনেক দূরে এখন। দীপ্তিদি তার লেখা চিঠি সূর্যর কাছ থেকে ফেরত চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার যুদ্ধ সূর্যর কাছ থেকে আগেই সবকিছু ফেরত নিয়ে নিয়েছে।

সূর্য কঠিন মুখ করে রূপলালকে বলল, চলুন।

.

সূর্য একা থাকতে অভ্যস্ত, সে একাই শহরে বেরোতে চেয়েছিল, কিন্তু রূপলাল তার সঙ্গ ছাড়বে না। ছেলেটির মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু নেই, অথচ খুব একটা বিরক্তিকরও বলা যায় না। কথার মাঝখানে হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে হাসে, তখন তার মুখে একটা সরল সৌন্দর্য আসে। সূর্যর মতন একজন গোমড়ামুখো ছেলের প্রতি কেন যে সে আকৃষ্ট হল, বোঝাই যায় না। রূপলাল টাকা তৈরি করার জগতের একটা অংশ এবং সে সেই আনন্দেই মশগুল।

স্টেশন ছাড়িয়ে বিরাট চওড়া রাস্তা। এই ঐতিহাসিক পুরনো শহরটিতে ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র খুব সহজ ভাবেই পাশাপাশি অবস্থান করে আছে।

মিছিলটি একটু আগে চলে গেছে এই রাস্তা দিয়ে। সূর্য আর রূপলাল হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ময়দানে। মিটিংয়ে যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছে। সেটা আগস্ট দিবস বলে নয়, মন্ত্রী দু'জনের আগমনের কারণে। মন্ত্রীরা এরই মধ্যে বেশ দ্রষ্টব্য বিষয়। মাত্র চার বছর আগে, দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন এইসব মন্ত্রীরা ছিল ছোটখাটো জননেতা, তখন এইসব রাস্তা দিয়েই তারা কত বার পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলেছেন চেনাজানা লোকদের সঙ্গে। এখন মন্ত্রী হবার পর তারা আর পায়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে যান না কখনও। ব্রিটিশ রাজপুরুষদের কায়দাতেই তাঁরা নিজেদের আলাদা করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন জনতা থেকে। বাইরে বেরোবার সময় পুলিশ পাহারা থাকে।

এখানকার মানুষ কলকাতার মতন সভা-সমিতিতে খুব একটা অভিজ্ঞ নয়। সভায় রীতিমতন বিশৃঙ্খলা। মঞ্চের ওপর শুরু হয়েছে উদ্বোধন সংগীত, ও-দিকে বিভিন্ন জায়গায় গোলমাল চলছে, অনবরত হুইল বাজাচ্ছে টুপি-পরা স্বেচ্ছাসেবকরা।

সূর্য ভিড়ের একেবারে পেছন দিকে এসে দাঁড়াল। সে যথেষ্ট লম্বা, তার দেখতে কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু রূপলাল ঠিক দেখতে পাচ্ছে না, তাকে আঙুলের ভর। দিয়ে উঁচু হতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর সূর্য এই প্রথম কোনও মিটিং শুনতে এল। আগস্ট আন্দোলনের কথাতেই সে একটু উত্তেজিত বোধ করছে-অনেক রকমের স্মৃতি আসে, শরীরের মধ্যে একটা শিরশিরে ভাব হয়।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রথমে সংক্ষেপেঁ দু-চার কথায় তার বক্তব্য সারলেন। মাননীয় দু'জন মন্ত্রীর প্রসঙ্গেই তিনি বেশি বললেন। তিনি বুদ্ধিমান, তিনি বুঝেছেন, আজ তাঁর কথা এখানে কেউ বেশিক্ষণ শুনবে না-মন্ত্রীদ্বয়ই প্রধান আকর্ষণ। ব্রিটিশ রাজত্বের রেশ এখনও যায়নি, যাদের হুকুমে রাস্তায় পুলিশ নামে, দোকানপাট খোলা থাকে কিংবা বন্ধ

হয়, কলমের খোঁচায় চাকরি হয় কিংবা চাকরি যায়-তারা এখন আর সাহেব নয়, আমাদেরই মতন মানুষ-তবু দেখলে সমীহ জাগে।

প্রথমে বলতে উঠলেন আবগারি মন্ত্রী শ্রীবাস্তবজি। বিশাল চেহারা, শুভ্র খদ্দরের পোশাক পরা, মাথায় গান্ধী টুপি। মুখখানা গম্ভীর। প্রথমেই তিনি বললেন, আজ আমার। মনে পড়ছে-সেই সব সহকর্মীর কথা, যাঁদের আত্মত্যাগের মূলে এসেছে এই স্বাধীনতা। সেই সব শহীদদের স্মরণে আমরা দু মিনিট নীরবতা পালন করব।

এই বলেই শ্রীবাস্তবজি চোখ বুজলেন। অনেকে দেখাদেখি চোখ বুজে চুপ করল। অনেকে তাঁর কথা শুনতে পায়নি বলে তখনও গোলমাল করছে আর ভলান্টিয়াররা বলছে, চুপ, চুপ!

সূর্য চুপ করে রইল, কিন্তু যোগানন্দ ছাড়া আর কারওর কথা তার মনে পড়ল না। যোগানন্দকে কি শহীদ বলা যায়? পথের কুকুরের মতন সে রাস্তায় মরে পড়ে ছিল, তার কোনও বন্ধু বা আত্মীয় তার কাছে যায়নি। পুলিসের মুদাফরাশ এসে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়েছিল দেহটা। বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ যোগানন্দ, দেশের জন্য প্রাণ দিতেই চেয়েছিল, তবু মৃত্যু এসেছিল অত্যন্ত অতর্কিতে। সূর্য তাকে ফেলে পালিয়ে ছিল। কোনও ইতিহাসের পাতায় তার নামটাও থাকবে না। কেন সে প্রাণটা দিতে গেল?

যোগানন্দর স্ত্রী শ্যামলীর কথাও মনে পড়ল একবার। সূর্যর সঙ্গে আর কোনও দিন তার দেখা হয়নি। কী ভাবে সে যোগানন্দর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল কে জানে! শ্যামলী ছিল একটু গম্ভীর ধরনের, যেন একটু অহংকারী, কিন্তু হঠাৎ যখন হাসত, অন্য রকম হয়ে যেত তার মুখ। শ্যামলী কি সহ্য করতে পেরেছে? সূর্য নিজেকে অপরাধী বোধ করে।

নীরবতা ভাঙার পর মন্ত্রী মহোদয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ এই পুণ্য। দিনে আমি এখানে যে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি, সে জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই এলাকার যে বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে...।

সূর্য অবাক হয়ে ভাবল, বেয়াল্লিশের সময় গোয়ালিয়ারে কি কিছু হয়েছিল? সে তো শোনেনি। সে সাতনার কথা শুনেছিল বটে। একটু পরেই বুঝতে পারল, শ্রীবাস্তবজি বলছেন ১৮৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধের কথা। তিনি অত দূর থেকে শুরু করেছেন।

শ্রীবাস্তবজিকে ঠিক মেঠো বক্তা বলা চলে না। গরম গরম বুলি ছাড়ার দিকে তার ঝোঁক নেই। ধীর স্থির ভাবে তিনি ইতিহাস আলোচনা করতে শুরু করলেন, অবশ্য একদেশদর্শী ইতিহাস।

মানুষটিকে বেশ সৎ বলেই মনে হয়। এই লোকটিকে যেন আবগারি বিভাগের মন্ত্রী পদে ঠিক মানায় না। বোধহয় আর কোনও দপ্তর খালি ছিল না।

ময়দানের মিটিংয়ে এ রকম মাস্টারমশাই সুলভ বক্তৃতা কেউ বেশিক্ষণ শুনতে চায় না– একটু পরেই এদিক-ওদিক থেকে গুঞ্জন শুরু হল। রূপলাল কিন্তু খুব মুগ্ধ ভাবে শুনছে, এই আবগারি মন্ত্রীর কাছে কাল তার পারমিট আনতে যাওয়ার কথা আছে।

শ্রীবাস্তবজি বেয়াল্লিশের আন্দোলনের বিষয় মাত্র দু-তিন লাইনে সেরে দিলেন। শুধু জানালেন যে, ওই সময় তিনি নেহরুজির সঙ্গে এক জেলে ছিলেন। জেলের ভেতরে থেকে তাঁরা তখন বুঝতেই পারেননি যে, বাইরে এক শ্রেণির লোক হিংস্র হয়ে উঠে গান্ধীজির প্রোগ্রাম বানচাল করে দিতে চলেছে। যাই হোক, গান্ধীজি যে স্বাধীনতা আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন, তাকে রক্ষা করতে হবে...

কে যেন কী একটা প্রশ্ন করল চেঁচিয়ে, ঠিক বোঝা গেল না। অমনি খানিকটা গোলমাল শুরু হল। তারপর দেখা গেল, খাকি পোশাক পরা প্রৌঢ় মতন একজন লোক মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবকরা জাপটে ধরে ফেললে তাকে। খাকি পোশাক-পরা লোকটির একটা হাত কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা, সে হাউহাউ করে কঁদছে আর কী যেন বলতে চাইছে।

শ্রীবাস্তবজি উর্দু মেশানো হিন্দিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সূর্য মোটামুটি বুঝতে পারছিল। খাকি পোশাক-পরা লোকটার কথা সে কিছুতেই বুঝতেই পারল না। লোকটা কি পাগল?

সেরূপলালকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী?

রূপলাল বলল, ও লোকটা বলছে, ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেপাই ছিল। এখন খেতে পায় না। কিছু একটা কাজ চাইছে।

সূর্য হেসে বলল, শ্রীবাস্তবজি তো আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম উল্লেখ করেননি। সেই জন্য, ওঁর কোনও দায়িত্ব নেই।

রূপলাল বলল, নেতাজি যখন ফিরে আসবেন, তখন দেখে নেবেন এক হাত!

ফিরে আসবার কথা আছে নাকি?

আলবাত। তিনি ফিরে এসে যদি তার সব পুরনো সেপাইদের নিয়ে আবার দল তৈরি করেন, সেই জন্যই তো আজাদ হিন্দ ফৌজের কারোকে আর্মিতে নেওয়া হয়নি।

সূর্য এই অভিনব তত্ত্বটি শুনে চুপ করে গেল। ও-দিকে শ্রীবাস্তবজি এবার গলা চড়ালেন। তাকে খানিকটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, স্বাধীনতা শুধু মুখের কথা নয়, এর জন্য অনেক আত্মদান করতে হবে। প্রথমেই আমাদের রক্ষা করতে হবে গণতন্ত্র। সামনেই যে সাধারণ নির্বাচন আসছে–

পরের বক্তা কৃষিমন্ত্রী সাকসেনাজির কথা থেকে আরও স্পষ্ট বোঝা গেল, এটা আসলে একটি নির্বাচনী সভা। কয়েক মাস পরেই ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের স্মৃতি উদ্যাপন নিয়ে কারওর মাথাব্যথা নেই।

সাকসেনাজি আগের বক্তার মতন নিছক ইতিহাসের কচকচি নিয়ে সময় কাটাবার মতন ভুল করলেন না। তিনি সরাসরি নেমে পড়লেন আত্মপ্রচারে। সি শার্পের পঞ্চম সুরের নীচে তার গলা নামে না কখনও। তিনি বললেন, তিনি চোদ্দো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। জেল খেটেছেন, পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন, তবু মহান কংগ্রেসের আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। তিনি সব মিলিয়ে। পাঁচ বার জেল খেটেছেন, তার মধ্যে লাহোর জেলে যে ভয়াবহ অত্যাচার করা হয়েছিল, তার বর্ণনা শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তিনি নাটকীয় ভাবে বোতাম খুলে জামাটা ফাঁক করে গলার কাছে হাত দিয়ে বললেন, এইখানে, ঠিক এইখানে লোহার ডান্ডা দিয়ে আমাকে মেরেছিল, আমি তবুও বলেছি, বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! যত বার মেরেছে তত বার আমি বলেছি–

সূর্যর মনে হল, আগ্রা হোটেলের সেই মেয়ে তিনটি যেমন তাদের শরীরের রূপ-যৌবন দেখিয়ে খরিদ্দার আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল, এই ব্যক্তিটিও ঠিক সেই রকমই যেন নিজের ওপর অত্যাচার-নিপীড়নের বিবরণ দিয়ে ভোট আদায় করতে চাইছে। কেন তিনি ভোটে জিততে চাইছেন? অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে বলে এখন একটু আরাম চান? নাকি, দেশের সেবা করা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে?

সূর্য হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মনে হল, হরকুমার, ব্রজগোপাল, যোগানন্দ– এঁদের স্মৃতিকে অপমান করা হচ্ছে। সেই লোকগুলো কি মূর্খ ও নির্বোধ ছিল, তাই শুধু শুধু প্রাণ দিয়েছে? সে নিজেই বা কেন নষ্ট করল তার প্রথম যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বছর? স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে একসময় তারা উন্মাদ হয়েছিল, এর নাম স্বাধীনতা? মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে দু'জন হোমরাচোমরা, অদূরে পুলিশের গাড়ি পাহারায়–আর কতকগুলো ভিখিরি হাঁ করে শুনে যাচ্ছে নানা রকম উদ্ভট কথা। কোটি কোটি লোক দিশেহারা হয়ে বসে আছে, দেশের কোন কাজে তারা লাগবে, তাও জানে না–তাদের সামনে আজ দেওয়া হচ্ছে মস্ত বড় একটা কাজ, ভোট দাও!

সূর্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না-কিন্তু আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতির নাম করে এই সভা ডাকা হয়েছে বলেই তার মধ্যে জেগে উঠেছে পুরনো দিনের উত্তেজনা।

সাকসেনাজি যখন গলার আওয়াজ আরও উঁচুতে তুলেছেন, সূর্য তখন আরও জোরে চিৎকার করে বলল, শাট আপ।

কিন্তু এতে বড় কিছু আলোড়ন দেখা গেল না। কয়েক জন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এ-দিকে। রূপলাল সূর্যর হাত চেপে ধরে বলল, এ কী করছেন?

সূর্য তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে চাইছিল। তার মুখ এখন রক্তাভ, কপালে ঘাম জমেছে, সে আত্মবিস্মৃত। সামনে যত বাধাই থাক, সে গোঁয়ারের মতন। মঞ্চের ওপর উঠে গিয়ে বক্তার কলার চেপে ধরতে চাইছিল। সে অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ। কিন্তু সূর্যকে বেশি দূর এগোতে হল না, এই সময়েই ময়দানের অন্য অংশ থেকে গোলমাল শোনা গেল। একদল লোক, তাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক-উঠে দাঁড়িয়ে। হইহই শুরু করেছে। তারা বলছে, তারা মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনতে চায় না, চাকরি চায়। ওরা অনেকেই সদ্য চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবকরা আর কিছু জানে না, তাদের ওপর শুধু নির্দেশ আছে, কোনও গণ্ডগোল বাধলেই থামাতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটে গিয়ে ওদের ঘাড় ধরে জোর করে বসিয়ে দিতে গেল। ফলে শুরু হয়ে গেল ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি। এইসব ঘটনার গতি কখন কোন দিকে যাবে, তা আগে থেকে বলা শিবের বাপেরও অসাধ্য। অনেক সভায় এই রকম সামান্য গোলমাল একটুতেই থেমে যায়, অনেক সময় আবার রক্তারক্তি পর্যন্ত পৌঁছোয়। সাকসেনাজি অদম্য ভাবে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, কমিউনিস্টরা দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। তারা পাকিস্তানের সাপোর্টার। তাদের ষড়যন্ত্র আমরা ব্যর্থ করে দেবই। স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান করার কথা যখন উঠেছিল, তখন আমরা তার বিরোধিতা করেছি। আমরা জনতার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করব। আমরা-

পুলিশের লাঠি চার্জে সেই সভা শেষ হয়। আহত হয় এগারো জন, তার মধ্যে এক জন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ এবং একটি এগারো বছরের ছেলে।

সূর্য আর বেশি মাথা গরম করেনি, হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়েছে। বরং নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল তার। এই সাত পাগলের মেলায় তার আসবার দরকার কী ছিল? এই নিরন্ন, বুভুক্ষু, মূর্খের দেশটা উচ্ছন্নে যাক না, তার কী আসে যায় তাতে? হরদা'র কাছে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা শেষ হয়ে গেছে, আর কারওর কাছে তো তার মাথার দিব্যি দেওয়া নেই।

ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে সূর্য ময়দানের অন্য প্রান্তে এসে পড়েছিল, রূপলালকে হারিয়ে ফেলেছে, তাতে সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। যাক, এখন একটু একা ঘোরাফেরা করা যাবে। মিটিংয়ে লাঠি চালনার ফলে রাস্তায় বেশ উত্তেজনার আবহাওয়া রয়েছে, অনেক দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যেই, লাঠিসোটা হাতে কিছু মানুষও দেখা যায়। সূর্য অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে এ রকম অনেক দেখেছে, সে জানে কী ভাবে এড়িয়ে থাকতে হয়।

কিন্তু রূপলালকে এড়ানো গেল না। সে হঠাৎ আবার ফস করে কোথা থেকে হাজির হল। মুখ-ভরতি হাসি নিয়ে বলল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ডাকবাংলো তো উলটো দিকে।

সূর্য বলল, আমি একটু দানৌলি বাজারের দিকে যাব।

সেখানে চেনা জানা কেউ আছে বুঝি?

সেখানে একটা বাড়ি খুঁজতে হবে।

চলুন আমিও যাই।

অগত্যা তাকে নিতেই হল সঙ্গে। খানিকক্ষণ চুপচাপ যাবার পর সে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ আপনার দেমাগ খারাপ হয়ে গেল কেন?

সূর্য কাঁধ ঝাঁকাল, কোনও উত্তর দিল না।

আপনি পলিটিক্স করেন নাকি?

এ কথার উত্তর না দিয়ে সূর্য ফস করে জিজ্ঞেস করল আপনি তো কাল মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

রূপলাল থমকে দাঁড়িয়ে সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল। তারপর বলল, মাথা খারাপ? আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমি মরব? আমি যাচ্ছি পারমিটের জন্য দরবার করতে– সেখানে আপনি গরম গরম বাত বলতে শুরু করবেন–

সূর্য আবার নিজের ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠল। একটু আগেই সে ঠিক করেছিল, ওদের কারওর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না, তবু সে এ কথাটা বলতে গেল কেন? রাজনীতির ভূত কি কিছুতেই ঘাড় থেকে নামবে না? না, আর ওই চিন্তা একদম স্থান দেবে না মাথায়।

সূর্য উষ্ণ গলায় বলল, তা হলে আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন কেন?

রূপলাল বলল, আরে দাদা, আপনি রাগ করছেন কেন? আপনার লাইন আলাদা, আমার লাইন আলাদা। তা বলে কি সন্ধেটা একসঙ্গে কাটাতে পারি না? আপনি তো আমাকে মিটিং শোনালেন, এবার চলুন, আপনাকে আমি ভালো ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। দেখবেন, পছন্দ হয় কিনা।

৭৪. অনেক দিন বাদে সূর্যকে

অনেক দিন বাদে সূর্যকে আজ আবার খুব অস্থির মনে হচ্ছে। তোলপাড় চলছে বুকের মধ্যে। মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে যাচ্ছে চোয়াল, চোখে দৃষ্টি ধারালো। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে রূপলাল কত কিছু বলে যাচ্ছে, কিছুই শুনছে না সূর্য।

সূর্যর এই অস্থিরতা কীসের জন্য? তা সে নিজেই জানে না। একসময় সে মাঠে মাঠে ঘুরেছে, না খেয়ে থেকেছে, জেল খেটেছে, হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে না গেলে তার ফাঁসিও হতে পারত। কিন্তু সেই সব দিনগুলির জন্য তো তার মনে কোনও গর্ববোধ নেই। সে তো বিনিময়ে কিছু চায়নি কখনও। শুধু তার যে সব পরিচিত ব্যক্তি মারা গেছে, অজ্ঞাত থেকে গেছে, তাদের কথা মনে পড়লেই তার নিশ্বাস দ্রুত হয়ে যায়। ওরাই ছিল সূর্যর বন্ধু, আর কেউ নেই এখন। সূর্যর মনে হচ্ছে বার বার, সে নিজেও যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

শহিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় দু'জন মন্ত্রী ভোট ভিক্ষা করছিল নির্লজ্জ ভাবে, এটা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। বার বার তার মনে হচ্ছে, একবার অন্তত মঞ্চে লাফিয়ে উঠে ওই শ্রীবাস্তব আর সাকসেনার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত ছিল। পরক্ষণেই আবার ভাবছে, না, না, আমার ওসব করা উচিত নয়। ওরা যা খুশি করুক, দেশটা জাহান্নামে নিয়ে যাক। আমি একা কী করতে পারি?

সূর্য যখন প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল, তখন সে ছিল প্রায় কিশোর। অনেকখানিই ছিল জেদ আর গোঁয়ারতুমি। এরপর অনেকগুলো বছর গেছে, বাস্তব সম্পর্কে তার জ্ঞান হয়েছে, বইটইও পড়েছে অনেক। এখন সে জানে, এই পৃথিবীতে মানুষের অধিবাসের মধ্যে কত জটিলতা। মানুষের মঙ্গলের জন্য যে সমাজব্যবস্থা তৈরি হয়, সেটাই আবার এক সময় মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। দু'-এক শতাব্দী পর পর মানুষকেই সেই জন্য আবার সেই ব্যবস্থা ভাঙতে হয়। যারা এই ভাঙার কাজে অগ্রণী হয়ে

পড়ে, তাদের সহজে ফেরার পথ থাকে না। কেউ সেই পথে খানিকটা এগিয়ে আবার ছিটকে পড়লে, তার মতন নিঃস্ব আর কেউ নেই। সে কোথাও আশ্রয় পায় না।

ভারতের এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য এই কথাই টের পাচ্ছে, তার নিজস্ব কোনও জায়গা নেই। কোথাও সে মিলেমিশে থাকতে পারবে না। সে পরিত্যক্ত। অথবা, এখন তার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় সে অন্যদের আঘাত করে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে ওদের, সে ভাঙার কাজে নামতে পারে। অথবা মিশে যেতে পারে প্রতিবাদহীন গড্ডালিকার স্রোতে। এ বিষয়ে মনস্থির করাও সহজ কথা নয়।

রূপলাল বলল, এই তো দানৌলি বাজারে এসে গেছি। আপনি কোন বাড়িতে যাবেন?

সূর্য দেখল, দোকানপাট অধিকাংশই বন্ধ, পথে লোকজন কম, মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

সূর্য রূপলালের কথার কোনও উত্তর দিল না। একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। তার কিছুই মনে নেই। কোথায় সে বাড়ি খুঁজবে?

অন্ধ যে রকম রাস্তা চিনে চিনে যায়, সূর্য সেই রকম ঘুরতে লাগল। তারপর হঠাৎ একটা সাদা রঙের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে!

বাড়িটা দোতলা, পুরনো আমলের, সামনের দিকে এখন একটা কাপড়ের দোকান। দোকান বন্ধ, ওপর তলাটাও অন্ধকার।

রূপলাল জিজ্ঞেস করল, এই বাড়িতে আপনার চেনাজানা কেউ থাকে?

সূর্যর এতক্ষণ কিছুই মনে পড়ছিল না, কিন্তু এখন তার কোনও সন্দেহ নেই, এই বাড়িতেই তার শৈশবের কয়েকটা বছর কেটেছে। সে চোখ বুজে বলে দিতে পারে, বাড়িটা দু'মহলা, সামনের দিকটা পার হলেই একটা সিমেন্ট বাঁধানো বড় চাতাল, তার এক

পাশে একটা ইঁদারা। ইদারার উলটো দিক থেকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরে টানা বারান্দা। বারান্দার পাশে একটা ছোট ছাদ।

সূর্য অন্যমনস্ক ভাবে তার বাঁ হাতের কনুইতে হাত দিল। একটা গভীর কাটা দাগ, অনেক দিনের পুরনো। সূর্য একবার ওই ছোট ছাদটায় আছাড় খেয়ে পড়ে হাত কেটেছিল।

হঠাৎ কী করে এসব মনে পড়ে যায়? কোথায় থাকে এসব স্মৃতি? তার একথাও মনে পড়ল, একদিন সে বাবার হাত ধরে মিঞা তানসেনের সমাধি দেখতে গিয়েছিল। বাবা ওখানে প্রায়ই যেতেন, সংগীতের ওপর তার খুব টান ছিল।

সূর্য রূপলালকে জিজ্ঞেস করল, তানসেনের সমাধিটা কোথায়?

রূপলাল এই যুবকটির ধরনধারণ বুঝতে পারছে না। সে বিস্মিতভাবে বলল, সেখানে যাবেন? এখন কি টাঙ্গা মিলবে?

সূর্য বলল, না, সেখানে যাব না। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

এ-বাড়িতে যাবেন না?

সূর্য ভাবল, তার জন্মস্থানটি দেখে তার কি খুব রোমাঞ্চ হবার কথা ছিল? বাবা কেন এখানে আসতে বলেছিলেন? অসুখের ঘোরে প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই না। এখানে এসে তার তো নতুন কিছু বোধ হচ্ছে না। সামান্য কৌতূহল ছাড়া।

তারপর মনে পড়ল, তার জন্ম তো এ বাড়িতে নয়। তার মা তো অন্য বাড়িতে থাকতেন। মা মারা যাবার পর সূর্যকে এ বাড়িতে আনা হয়। কিন্তু আগের বাড়িটা চিনে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব, তখন সে খুবই ছোট ছিল।

সে বলল, না, এবাড়িটা এমনি দেখতে এলাম। আচ্ছা, রূপলালজি, অনেক দিন আগে একজন মারা গেছেন, তিনি কোন বাড়িতে থাকতেন, সেটা কি খুঁজে বার করা যায় এখন?

রূপলাল বলল, কে?

সূর্য বলল, তার নাম ছিল নাসিম আরা বানু। ডাক নাম বুলবুল। তিনি খুব নাচগান জানতেন।

রূপলালের চোখ চকচক করে উঠল। বলল বাইজি?

নিজের মা সম্পর্কে এ রকম পরিচয় অপরের মুখে শুনতে কারওর ভালো লাগে না। কিন্তু সূর্য বিচলিত হল না। বলল, হ্যাঁ।

কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়।

সেটা এ-পাড়ায় নয়। বোধহয় জনকগঞ্জের দিকে।

আমি বাইজিপাড়া চিনি। যাবেন সেখানে?

চলুন।

এ-ব্যাপারে রূপলালের খুব উৎসাহ দেখা গেল। সে সূর্যকে নিয়ে চলে এল অন্য একটা রাস্তায়। নিচু গলায় বলল, যে মারা গেছে তার খোঁজ নিয়ে কী হবে? আমার চেনাজানা দু-এক জন বাইজি আছে, গানটান শুনবেন? গোয়ালিয়ার ঘরানার গান বড় মিষ্টি।

একটা বাড়ির সামনে একজন মোটা মতন তোক দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তার দিকে নজর রাখছিল। রূপলাল তাকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। সে আবার রূপলালকে নিয়ে গেল অন্য কয়েক জনের কাছে। অনেক রকম কথা বলাবলি হল। রূপলাল ফিরে এসে সূর্যকে বলল, না, এরা ওনামে কারোকে চেনে না।

সূর্য একটু হাসল। সে শুনেছিল, তার মায়ের রূপ এবং নৃত্য-প্রতিভার খুব খ্যাতি ছিল। একবার দেখে কেউ তাকে ভুলতে পারত না। মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর এখানকার কেউ

তাকে মনে রাখেনি। সূর্যর ইচ্ছে হচ্ছে, তার মায়ের সমাধির জায়গাটা একবার দেখে আসতে। মায়ের মুখখানাও তার মনে নেই।

সে রূপলালকে অনুরোধ করল, আরও কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করুন। পুরনো লোকেরা বোধহয় চিনতে পারবে।

এদিক-ওদিক ঘুরে কয়েক জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া হল। কেউ কিছু জানে না, মৃত নর্তকীর সম্পর্কে কেউ উৎসাহই দেখাতে চায় না।

একজন শুধু বলল, আপনারা বুলবুলের কথা বলছেন তো? আমি জানি-আসুন, আমি বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি।

লোকটি খুব রোগা এবং লম্বা। মুখখানা ভয়-পাওয়া মানুষের মতন। হাটবার সময় বার বার পেছন ফিরে তাকায়। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশেক, এ হয়তো জানতেও পারে।

লোকটি ওদের নিয়ে একটা মস্ত বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভেতরটা ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। সূর্য তার স্মৃতিকে মুচড়ে মনে করবার চেষ্টা করল, এই বাড়িতেই সে জন্মেছিল কিনা। কিছুই মনে পড়ছে না।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে এল দোতলায়। কয়েকটা ঘরের ভেজানো দরজা থেকে সরু আলো দেখা যাচ্ছে এখন, ভেতরে হারমোনিয়াম ও ঘুঙুরের শব্দ।

একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল লোকটা। ঝলমলে সালোয়ার কামিজ পরা একটি যুবতী মেয়ে দরজা খুলে বলল, কী?

রোগা লোকটা বলল, মেহমান এসেছে।

রূপলাল হেসে বলল, জিন্দা বুলবুলের কাছে নিয়ে এসেছে। আপনার নাম বুলবুল বুঝি?

মেয়েটি হেসে বলল, জি।

রূপলাল কৌতুকের সঙ্গে সূর্যকে দেখিয়ে বলল, আমার এই দোস্ত আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইনি বলছেন, ইনি আপনাকে চেনেন।

মেয়েটি সূর্যর হাত ধরে বলল, আমিও তো অনেক দিন ধরে এঁকে চিনি। আইয়ে, অন্দর আইয়ে।

সূর্য একবার তাকাল মেয়েটির হাতের দিকে। মেয়েটি বিনা দ্বিধায় তার হাত ধরেছে। সূর্য হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে। নিল না। মুখ তুলে মেয়েটির চোখের দিকে দৃষ্টি রাখল। ঝকঝকে দুটি চোখ। গভীর ভুরু। মসৃণ কপাল। কানের লতির পাশে ঢেউ-খেলানো দুই গুচ্ছ চুল। শিশুর মতন চিবুক। চিবুকটা সত্যিই বড় সুন্দর। হাত ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটি রহস্যময় ভাবে হেসে বলল, পরদেশি আমায় চিনতে পারছেন না? আমার নাম বুলবুল।

সূর্যও হেসে বলল, হ্যাঁ, চিনতে পারছি।

ঘরটি বেশ বড়। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার ওপর কয়েকটা লাল ভেলভেটের তাকিয়া ছড়ানো। দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের দু-তিনটে ছবি। একটা মোটাসোটা কাবুলি বেড়াল ঘরের কোণে চুপ করে বসে ছিল, ওদের দেখে পিঠ ফুলিয়ে দাঁড়াল। ঘরটাতে সুন্দর ধূপের গন্ধ।

বুলবুল নামের মেয়েটি সূর্যর হাত ধরে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রহস্যভরা গলায় বলল, এতদিন আসোনি কেন? আমি কত দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি!

রূপলাল বলল, দেখুন, কী রকম ঠিক জায়গায় নিয়ে এলাম। মিছিমিছি এদিক-ওদিক ঘুরছিলেন!

ওদের পথপ্রদর্শক লম্বা মতন লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। রূপলাল তাকে বকশিশ দিল পাঁচ টাকা। সে তবু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

বুলবুল সূর্যর বাহুতে চাপ দিয়ে বলল, তসরিফ রাখিয়ে। কুছ পিয়েঙ্গে?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম বুলবুল? তোমার ভালো নাম কী?

বুলবুল হাসিতে সারা শরীর দোলাতে লাগল। নকল হাসি নয়। সে যখন তখন হাসতে ভালোবাসে। হাসতে হাসতেই বলল, বুলবুলের চেয়ে আবার ভালো নাম হয় নাকি? এনাম তোমার পছন্দ হল না? আর কী নাম চাও? আমার পাশের ঘরে থাকে পরিবানু, তাকে ডাকব?

রূপলাল বলল, আরে না না, আমার দোস্ত তোমার কাছেই আসতে চেয়েছে। সারা সন্ধে থেকে শুধু বুলবুল বুলবুল করছে।

সে সূর্যকে জোর করে বসাল। তারপর কোলের ওপর একটা তাকিয়া টেনে এনে বলল, গান শুনব, নাচ দেখব। দু-আড়াই ঘণ্টা বাদে ফেরার জন্য টাঙ্গা পাওয়া যাবে তো?

বুলবুল এবার মুখে রাগের ভাব আনল। এটা কপট রাগ। বলল, আসতে-না-আসতেই যাবার কথা? তোমাদের আমি আজ সারা রাত আটকে রাখব।

রূপলাল পকেট থেকে দশ টাকার কয়েকটা নোট বার করে বলল, কিছু আনাও টানাও।

বুলবুল জিজ্ঞেস করল, বিয়ার? না হুইস্কি? আমি বেরান্ডি ভালোবাসি।

রূপলাল বলল, ম্যায় তো দারু পিতে নেহি। এই বাঙালিবাবুকো পুছো। আমার জন্য। কয়েক খিলি পান আনিয়ে দাও।

বুলবুল তখন সূর্যকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী খাবে, মেহমান?

সূর্য মাথা নেড়ে বলল, কিছু না।

বুলবুল হাঁটু গেড়ে সূর্যর সামনে বসে পড়ে বলল, একদম কিছু না? একটা কিছু খাও!

সূর্যর শান্ত মুখখানা দেখলে মনে হয়, সে যেন এক নবীন সন্ন্যাসী। এক নর্তকী তার মান ভাঙাচ্ছে।

আসলে, বাইরে শান্ত ভাব দেখালেও সূর্য ভেতরে ভেতরে বিচলিত। সে তন্ন তন্ন করে দেখছে মেয়েটিকে। মেয়েটির রূপের আকর্ষণ আছে, সূর্যর রূপ-পিপাসু মনটা জেগে উঠেছে। মেয়েটির চড়া লাল রঙের পোশাক, অভ্রের গুঁড়ো-মাখা মুখ, রক্তবর্ণ আঙুলের নখ, সব মিলিয়ে একটা ঝকমকে ব্যাপার। চোখের পাতায় ঘন করে আঁকা সুর্মা, ধারালো নাক, টুকটুকে ঠোঁট, গলায় একটা রঙিন পুঁতির মালা, কাঁচুলি বাঁধা বুক বড় বেশি উদ্ধত, সরু কোমর ও ভারী নিতম্ব, পায়ে রুপোর মল। একে হাত বাড়িয়ে কাছে। টেনে নিতেই ইচ্ছে করে।

বুলবুল লম্বা লোকটাকে কী সব আনতে দিয়ে আবার এসে সূর্যর কাছে বসল। এবার অভিমান দেখিয়ে বলল, তুমি কোনও কথা বলছ না কেন?

রূপলাল বলল, তুমি একটা নাচ দেখাও। তখন মেজাজ শরিফ হবে।

বুলবুল বলল, তবলচিকে খবর পাঠিয়েছি। সে আসুক।

রূপলাল বলল, না, না, তবলচির কোনও জরুরত নেই। তুমি এমনিই নাচ দেখাও। কিংবা একটা গানা শুরু করো!

তবলচি ছাড়া আমি নাচতেও পারি না, গাইতেও পারি না।

ঘরে অন্য লোক আমার ভালো লাগে না। গুন গুন করে একটা গান করো। কিংবা তবলা দাও, আমি ঠেকা দিতে জানি। কাজ চলে যাবে।

দাঁড়াও, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আগে পানটান আসুক। কী গো মেহমান, তোমার কী পছন্দ বললে না?

সূর্য এবার ধীরে ধীরে বলল, তুমি নাচ দেখিয়ে কিংবা গান শুনিয়ে টাকা নাও, তাই না? লোকে টাকা খরচ করে তোমার রূপ দেখতে আসে। তোমার রূপের দাম কত?

বুলবুল আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। বলল, কী অদ্ভুত কথা শোনো! রূপের আবার দাম! আমার রূপের কিম্মত দশ জুতি। যাবার সময় আমাকে দশ ঘা জুতো মেরে যেয়ো, তা হলেই হবে।

সূর্য এ রকম হেঁয়ালির কথার মানে বুঝতে পারল না। বলল, না, তুমি তো সত্যিই সুন্দর। টাকা না নিলে তোমার চলবে কেন?

রূপলাল বলল, আরে দোস্ত, ও রকম ভাবে টাকার কথা বলতে নেই। যাবার সময় ওকে খুশি করে গেলেই হবে।

সূর্য একটু বিরক্তির মুখভঙ্গি করল। সে তো দরদাম করতে চাইছে না, সে জানতে চাইছে।

বুলবুল বলল, আমি আবার সুন্দর নাকি? কেউ বলে না। এই দেখো না, আমার গালে বসন্তের দাগ!

ঘন প্রসাধনের জন্য আগে দেখা যায়নি। এবার সূর্য লক্ষ করল, সত্যিই বুলবুলের গালে কয়েকটা বসন্তের দাগ আছে। কিন্তু এর জন্য তার রূপের তো কোনও হানি হয়নি। এর মুখে একটা সারল্য আছে। নিত্য নতুন অচেনা লোকদের মনোরঞ্জন করে, কত রকম মিথ্যে কথা বলতে হয়। তবু মুখে এই সারল্য থাকে কী করে? এখনও কেউ এসে নতুন করে একে ভালোবাসতে পারে। সেই ভালোবাসার স্বাদ কী রকম?

বড় রেকাবির ওপর দশবারো খিলি পান। তার থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে রূপলাল বলল, একটা গান শোনাও। একটা বেশ মিঠি ঠুংরি ধরো তো!

বুলবুল তাকাল সূর্যর মুখের দিকে। সূর্য দু'হাত মেঝেতে হেলান দিয়ে বসে আছে, চোখ বুলবুলের দিকে স্থির নিবদ্ধ। যেন সে কোনও মানুষকে দেখছে না, দেখছে একটা সুন্দর মূর্তি।

রূপলালের অনুরোধ সত্ত্বেও বুলবুল সূর্যকে জিজ্ঞাসা করল, কী গান গাইব?

সূর্য মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

বুলবুল বেশ নিচু গলায় গান ধরল:

বৈঠি শোঁচে ব্রিজবাম
নাহি আয়ে ঘনশ্যাম
ঘেরি আই বদরিয়া...

গানের কথা সামান্যই, লাইনগুলো ঘুরে ঘুরে আসে, কণ্ঠস্বর মুচড়ে মুচড়ে প্রণয় ও বেদনার সুর উচ্ছ্বসিত হয়। রূপলাল অনবরত মাথা দোলায় এবং সমের মুখে এসে হাঁটুতে চাপড় দেয়। সূর্য সংগীতের রস তেমন বোঝে না, সে গানের বদলে গায়িকার দিকে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

গানের শেষে রূপলাল আহা-হা-হা শব্দ তুলে প্রগস্ত হয়ে ওঠে। বুলবুল সূর্যর থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, কী, তোমার কেমন লাগল?

সূর্য সংক্ষিপ্ত ভাবে জানাল, ভালো।

বুলবুল হেসে বলল, আমি গান গাইতে জানিই না। লোকে আমার নাচ দেখতে আসে।

সূর্য বুঝতে পারল, এইটিই বুলবুলের বৈশিষ্ট্য। তার রূপের প্রশংসা করলে সে বলবে

যে সে সুন্দরী নয়। তার গানের প্রশংসা করলে সে বলবে, গান জানে না।

সূর্য বলল, তা হলে এবার নাচ দেখাও!

তাও কি তোমার পছন্দ হবে? তুমি যা গম্ভীর!

বুলবুল দুটি গেলাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে একটা এগিয়ে দিল সূর্যর দিকে। সূর্য বলল, আমার জন্য দরকার নেই।

বুলবুল মিনতি করে বলল, একটুখানি! আমার জন্য!

রূপলাল বলল, খান না। একটু খেয়ে দেখুন।

সূর্য রূপলালের দিকে তাকাল। রূপলাল মদের ব্যবসা করে, কাল সে পারমিট আদায় করতে যাবে মন্ত্রীর কাছে। কিন্তু সে নিজে মদ খায় না, অন্যদের পেড়াপিড়ি করে।

সূর্য ওদের সঙ্গে তর্ক করল না। গেলাসটা পাশে সরিয়ে রাখল। কিছুক্ষণ আগে তার মাথার মধ্যে যে ঝড় বইছিল, এখন তা থেমে গেছে। এখন তার ভালো লাগছে।

বুলবুল অনেকখানি নিট ব্র্যান্ডি এক চুমুকে খেয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'পা জোড় করে নূপুরের ঝংকার তুলল একবার। তারপর রাগত ভাবে বলল, তবলিয়া ছাড়া নাচ হয়? তোমরা কেমন লোক গো!

রূপলাল ঘরের কোণ থেকে বায়া-তবলা জোড়া নিয়ে এসে বলল, আমি তাল দিচ্ছি, তুমি ধরো না।

তবলায় চাঁটি দিয়ে রূপলাল দেখল, ঠিক মতন বাঁধা নেই। সুরে লাগছে না। খানিকটা হাতুড়ি ঠোকাঠুকি করে সে যখন আর কয়েক বার আওয়াজ তুলল, তখন বোঝা গেল সে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়, মোটামুটি কয়েকটা বোল তুলতে পারে।

বুলবুল একটু সরে গিয়ে হাতদুটো নিজের বুকের কাছে জোড় করে দাঁড়াল। পা দুটো পর্যায়ক্রমে ঠুকল কয়েক বার। তারপর খুব ধীর লয়ে নাচ শুরু করল।

সূর্যর মনে হল, ঘরটা যেন কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নাচের সময়ে ঘর-ভরতি লোক থাকবে, মাইফেলে যে রকম থাকে, এদিক-ওদিক থেকে সবাই তারিফ করবে, তা হলেই যেন নাচ ঠিক জমে।

পরক্ষণেই তার মনে হল, এ-ঘরে রূপলাল এখন না থাকলেই ভালো হত। শুধু সে একা যদি বুলবুলের নাচ দেখত, তা হলে ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারত। তবলা ছাড়া নাচ হয় না এ আবার কী অদ্ভুত নিয়ম।

সে তাকিয়ে রইল বুলবুলের মুখের দিকে। মুখটা এখন অন্য রকম। এই ব্যাপারটা সূর্য আগেও লক্ষ করেছে। কোনও শিল্পী যখন তার নিজস্ব শিল্পের মধ্যে ডুবে যায়, তখন তাকে অন্য মানুষের মতন দেখায়। সেই মুখখানা চেনা কারওর মতন নয়।

বুলবুলের হাত ও পা ধারালো অস্ত্রের মতন চতুর্দিকে সঞ্চালিত হচ্ছে। তার শরীরে এখন অনেক তরঙ্গ। বস্তুত, রেখা ও রং এবং সুর ও তালের ঝাঁপটাঝাঁপটির মধ্যে মেয়েটি যেন কোথায় আড়ালে পড়ে গেছে। বুলবুলকে আর দেখা যাচ্ছে না। তার উড়ন্ত গোল ঘাঘরাটিকে মাঝে মাঝে দেখাচ্ছে একটা বিরাট ফুলের মতন।

নাচতে নাচতে বুলবুল যখন দু'-এক বার রূপলালের মুখের কাছে হাত কিংবা শরীর আনছে, রূপলাল মাথা হেলিয়ে সরে যাচ্ছে। সূর্য লক্ষ করল, রূপলাল প্রত্যেক বারই খুব সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে বুলবুলের স্পর্শ। যেন সে একটা অচ্ছুত। ছেলেটি অদ্ভুত সত্যিই, সে মদ খায় না কিন্তু মদ কেনার জন্য টাকা দেয়। সে বাইজির নাচ দেখে ফুর্তি পায়, কিন্তু তাকে স্পর্শ করে না।

নাচ শেষ হবার পর রূপলাল বলল, ধুর, তোমার নাচের চেয়ে তোমার গানই বেশি ভালো। দ্রুত লয়ে ঠিক ছিল না!

বুলবুল অভিমান করে বলল, আমায় কেউ ভালো বলে না। আমার কেউ পছন্দ করে না।

সূর্যর দিকে ফিরে বলল, তোমারও ভালো লাগেনি তো?

সূর্য বলল, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে!

বুলবুল কান্না কান্না গলায় বলল, মোটেই না। আমি ঠিক জানি! তোমরা পরিবানুর কাছে যাবে? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ঘর!

সূর্য বলল, না, কোথাও যাব না। তুমি খুব সুন্দর।

বুলবুল গেলাসে অনেকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে লম্বা চুমুক দিল। তারপর সেই এঁটো গেলাসটা সূর্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও! আমি বলছি খাও!

সূর্য হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বলল, কেন জোর করছ, আমি ও-সব খাই না।

বুলবুল তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমি জানি, তুমি আমায় ঘেন্না করছ।

সূর্য আহত ভাবে বলল, না, তা নয়।

বুলবুল গেলাসটা তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করে বলল, যাও, তোমরা পরিবানুর কাছে চলে যাও! আমি কি তোমাদের ধরে রেখেছি?

এতক্ষণ বাদে সূর্য স্বচ্ছ ভাবে হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, দাও–

সূর্য গেলাসটা নিয়ে একটা চুমুক দিল। বিষম লেগে গেল গলায়। তাই দেখে আবার হাসিতে লুটিয়ে পড়ল বুলবুল। সূর্যর উরুতে চাপড় মেরে বলল, ঠিক হয়েছে! জব্দ করেছি তো! আর খাবে?

রূপলাল হাই তুলে বলল, অনেক রাত হয়ে গেল। এবার ফিরতে হবে। চলুন ভাদুড়ীজি–

সূর্য এই সুযোগটা খুঁজছিল। মুখ তুলে বলল, আপনি যান, আমি এখানে থাকব।

রূপলাল অবাক হয়ে বলল, এখানে থাকবেন? আর কতক্ষণ?

তা জানি না। হয়তো অনেক দিন।

কী বলছেন আপনি? আপনার জিনিসপত্তর।

সে পরে ব্যবস্থা হবে।

সূর্য বুলবুলের দিকে ফিরে বলল, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দেবে?

বুলবুল বলল, সে আপনার মর্জি!

রূপলাল আরও কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করল সূর্যকে ফিরিয়ে নেবার। ব্যর্থ হল। অগত্যা সে উঠে পড়ল একাই চলে যাবার জন্য। বাইজির ঘরে রাত কাটাবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

রূপলালকে বিদায় দিয়ে এসে বুলবুল দরজা বন্ধ করল। তারপর বলল, আমি আজ গান গাইব না, নাচব না, কিছু করব না। আমি শুধু শরাব খাব! মেহমান, তুমি এখানে থাকতে চাইলে কেন?

সূর্য বলল, আমি অনেক খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এলাম। তোমাকে না পেলে আমার সবকিছু নষ্ট হয়ে যেত।

সত্যি?

হ্যাঁ। কাছে এসো।

বুলবুল দৌড়ে এসে সূর্যর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার একটু নেশা হয়েছে। অতি ব্যস্ততায় সে যেন সূর্যর ঠোঁট খুঁজে পাচ্ছে না। তার চোখ, কপাল, গাল চুমোয় ভিজিয়ে দিল।

সূর্য তাকে ধরে সামনে বসিয়ে দিয়ে বলল, শোনো, আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি।

বুলবুল পাগলাটে গলায় বলল, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। আগে বলো, তুমি সত্যিই আমাকে খুঁজতে এসেছিলে?

হ্যাঁ, সত্যি।

কে বলেছে আমার কথা?

কেউ বলেনি।

আমি জানতাম, তুমি ঠিক একদিন আসবে। তুমি আমার ঘনশ্যাম। যদিও তোমার গায়ের রং খুব গোরা–

বুলবুল তার দুটো হাত চেপে ধরল সূর্যর গালে। একেবার মুখের সামনে মুখ! সূর্য চোখ বুজল। কয়েক লহমার জন্য তার মনে পড়ল সেই নারীর কথা, যে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যাকে সে কোনও দিন আর দেখবে না। যে তাকে বলেছিল, তুমি যেখানেই থাকো, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি।

সূর্য চোখ খুলে আপন মনে বলল, না, সে নেই। বুলবুল আছে।

একটানে সে বুলবুলকে নিয়ে এল নিজের বুকের ওপর।

ওড়নাটা আগেই খসে গিয়েছিল বুলবুলের গা থেকে। সূর্য ওর কঁচুলিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য টানাটানি করতে লাগল। সহজে ছেড়ে না। বুলবুল নিজেই সেটা খুলে ফেলে বলল, কী চাও?

সূর্য বুলবুলের নগ্ন স্তনে মুখ রেখে বলল, তোমাকে। আর কিছু না।

বুলবুল বলল, এই তো আমি। আমাকে নাও।

সূর্য বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করবে না? আমাকে তাড়িয়ে দেবে না?

বুলবুল বলল, আমার কী ভাগ্য, তুমি এসেছ। আমায় কেউ পছন্দ করে না। আমার মুখে বসন্তের দাগ–

তারা অন্ধ, তারা তোমাকে দেখতে পায় না। আমি তোমাকে একটু ভালো করে দেখি?

সে বুলবুলকে সোজা করে বসিয়ে তার পিঠ ও কোমরে নিজের হাত রাখল। বুলবুলের চোখে ঈষৎ রক্তিম ছটা, সে হাতে আবার ব্র্যান্ডির গেলাস তুলে নিয়েছে। সূর্যর মধ্যে জেগে উঠছে অসম্ভব রতি সম্ভোগের ইচ্ছে। এখন আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

পুনরায় বুলবুল সূর্যর কণ্ঠলগ্না হয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ডোবাল। দীর্ঘস্থায়ী হল চুম্বন। যেন, পরস্পর জীবনীশক্তি বিনিময় করছে। বুলবুল উঠে এসে বসল সূর্যর কোলের ওপর। সূর্য তার ঘাঘরার দড়ি খোলার জন্য হাত দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোমার বয়স কত?

বুলবুল বলল, বয়স? একশো-দুশো হবে।

সূর্য মনে মনে বলল, বুলবুলের বয়স তিরিশের কাছাকাছি নিশ্চয়ই। ঠিক এই রকমই বয়সে, আর একজন নর্তকী, তার নামও ছিল বুলবুল, তাকে দেখে তার বাবা আকৃষ্ট হয়েছিল। সূর্য যেন সেই একই জায়গায় ফিরে এসেছে।

বুলবুলের শরীরটা পাখির মতনই সূর্যর আলিঙ্গনের মধ্যে ছটফট করে। সূর্যর শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেলে তার বুকে মুখ ঘষতে লাগল বুলবুল। বুলবুলের মসৃণ খোলা পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সূর্য জিজ্ঞেস করল বুলবুল, অনেক দিন আগে আর একজন বুলবুল থাকত এখানে, সে-ও খুব ভাল নাচত, তুমি তার নাম শুনেছ?

না।

তোমার মা-ও কি নর্তকী ছিল?

বুলবুল মুখ তুলে বলল, তুমি এত প্রশ্ন করছ কেন?

সূর্য তাকে আদর করে বলল, এমনিই। বলো না।

হ্যাঁ। আমার মা কোথায় চলে গেছে!

সূর্য আপন মনে হাসল। সে আর বুলবুল তো একই। একজন নর্তকীর ছেলে হিসেবে সে যদি এখানেই থেকে যেত, তা হলে এতদিনে সে গুন্ডা, দালাল কিংবা তবলচি হত। কিংবা ব্যবসা করত রূপলালের মতন। তার বদলে কত দূর চলে গিয়েছিল সে! সেই দূরের জগৎটা বড় জ্বালা যন্ত্রণার। সে আর কোথাও যাবে না।

৭৫. রেণুর কাছ থেকে অনুমতি

আমি ভেবেছিলাম, রেণুর কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গেলেই আমার আর বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা থাকবে না। তারপর থেকে আমি একটু একা থাকলেই স্বপ্ন দেখি। জার্মানির পথে পথে আমি একটা ভারী ওভারকোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দারুণ শীত। মাঝে মাঝে ফুঁ দিয়ে গরম করে নিচ্ছি হাতদুটো। আমি কথা বলছি জার্মান ভাষায়। দিনেরবেলায় কাজ করি কারখানায়, রাত্তিরবেলা কলেজে ক্লাস করি। আমার বাড়ির খুব কাছেই পোস্ট অফিস। এক এক দিন মাঝ রাত্তিরে আমি হেঁটে যাই চিঠি ফেলতে–যেন চিঠিখানা তক্ষুনি পোস্ট না করলে পৌঁছোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

পাসপোর্টের ফর্ম আনবার পর অবশ্য দেখলাম অনেক ঝামেলা। শুধু ভাড়া জোগাড় করতে পারলেই বিদেশে যাওয়া যায় না। একজন কোনও হোমরাচোমরা সরকারি অফিসারের সই লাগবে, না হলেই পুলিশ ভেরিকিকেশান দরকার। সেটা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। তা ছাড়া লাগবে একজন গ্যারান্টর। আমি যদি বিদেশে হঠাৎ মারা ‘যাই কিংবা নিঃস্ব হয়ে পড়ি, তা হলে আমার সৎকার কিংবা আমাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ভারতের

রাষ্ট্রপতির। তিনি সে ব্যবস্থা করবেন বটে, কিন্তু খরচটা পরে আদায় করে নেবেন আমার গ্যারান্টরের কাছ থেকে। কে হবে সেই গ্যারান্টর? আমি সে রকম কারোকেই চিনি না। তা ছাড়া, আমাকে সবকিছুই করতে হবে খুব গোপনে। বাবা-মাকে আগে কিছুই জানানো চলবে না।

সারা দিন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করি, কিন্তু কারোকেই কিছু বলতে পারি না মুখ ফুটে। কিন্তু বিদেশে না গেলে আর আমার চলবেই না। একবার যখন মাথায় ঢুকেছে, তখন শুধু মনে হচ্ছে, এইটাই আমার মুক্তির পথ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রভাস জামাইবাবুর কথা। প্রভাস জামাইবাবুরা বড়লোক, উনি অনায়াসে হতে পারেন আমার গ্যারান্টর। বড়দিকে আর জামাইবাবুকে যদি খুব করে বুঝিয়ে বলি যে বাবা-মাকে এখন কিছু না জানাতে, তা হলে শুনবে না?

কলকাতা এখন বেশ সরগরম। দেওয়ালে দেওয়ালে ইলেকশানের পোস্টার পড়েছে। বিরাট বিরাট। স্বাধীন ভারতের প্রথম জেনারেল ইলেকশান। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদপত্র সন্দেহ প্রকাশ করছে যে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র টিকবে না। এশিয়ার গরিব দেশগুলোতে সামরিক শাসনই একমাত্র পথ। পাকিস্তানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট। ওদিকে, চিনের মূল ভূখণ্ড লাল ফৌজের অধিকারে এসে গেছে, ইয়েনানের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মাও সে তুং এত বড় দেশটাকে একতাবদ্ধ করে সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। চিনের দারুণ সম্মান বেড়ে গেছে। ভারত থেকে কয়েক জন চিন ঘুরে এসে প্রশংসা করছেন উচ্ছ্বসিত ভাবে।

তেলেঙ্গানার ব্যর্থতার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার। আমার পুরনো সহকর্মীদের অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করি। প্রায়ই স্ট্রিট কর্নার মিটিং হয়, একদিন হচ্ছিল আমাদের বাড়ির সামনেই; বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আদিনাথদা। আদিনাথদার সঙ্গে আমার অনেক দিন কথা বন্ধ। মন্টু কিংবা পরিতোষ– যারা লোকাল পার্টি অফিসে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাস্তায় কখনও তাদের সঙ্গে মুখোমুখি

দেখা হয়ে গেলেও কেউ কথা বলে না আমার সঙ্গে। মুখটা ফিরিয়ে নেয়। চাপা রাগ ও অপমানে আমার শরীর জ্বলে। একসময় কত আড্ডা দিয়েছি, কত দিন তিন কাপ চা পাঁচ জনে ভাগ করে খেয়েছি, আর এখন দেখা হলে একটা সামান্য। ভদ্রতার কথাও বলা চলে না! এখন ওদের সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই ঘন ঘন দেখা হয়, আরও খারাপ লাগে।

তবে, একথা ঠিক, ওরা খাটছে খুব। সবাই বলে, কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেরা ডেডিকেটেড ওয়াকার। কংগ্রেস থেকে প্রচুর টাকা ছড়িয়ে ছেলে জোগাড় করছে।

এই রকম সময়ে আমার কোনও অংশ নেই বলেই আমার আরও অসহ্য লাগছিল। মা'র কাছে অনেক কাকুতিমিনতির পর দশটা টাকা আদায় করে চলে গেলাম খড়্গপুরে বড়দির কাছে।

বড়দির শ্বশুর মারা গেছেন। সেই বিশাল একান্নবর্তী পরিবারটি আর একান্নবর্তী নেই। ভাগাভাগির পর প্রভাস জামাইবাবু বাড়িটার একটা অংশ পেয়েছেন, আলাদা সিঁড়ি। প্রভাস জামাইবাবু তিনটি বিষয়ে এম. এ পরীক্ষা দেবার পর থেমেছেন, কোনও চাকরিবাকরি করেন না, কবিতা রচনাতেও ভাটা পড়েছে, তার বদলে স্কুলের টেক্সট বই লেখেন। জমিজমা যথেষ্ট আছে, অবস্থা বেশ সচ্ছল।

বড়দির দুটি ছেলেমেয়ে হলেও চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। প্রভাস জামাইবাবুর টাক পড়তে শুরু করেছে।

আমাকে পেয়ে বেশ খুশি হল বড়দি। বড়বাবুর মৃত্যুর পর আর দেখা হয়নি। কয়েকটা দিন বেশ হইচই করে কাটল। আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলিনি। দিদির বাড়িতে ভাই এমনিই বেড়াতে আসে না? বড়দি আমার আপন দিদি না হলেও নিজের দিদির চেয়েও বেশি ভাব।

সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসেই অনেক পুরনো গল্প শুরু হয়। যে-সময়টা চলে গেছে, মনে হয় যেন সেটাই সবচেয়ে সুখের ছিল। বড়বাবুর বাড়িতে যখন বড়দিরা আর আমরা

সকলে একসঙ্গে থাকতাম, মানুষজনে সারা বাড়িটা গমগম করত, সেই সব দিনের কথা উঠলে মনে হয়, ও রকম আনন্দ আর কখনও ফিরে আসবে না।

কথায় কথায় সূর্যদার প্রসঙ্গও আসে। সূর্যদা সম্পর্কে প্রভাস জামাইবাবুরই আগ্রহ বেশি মনে হয়। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, ছেলেটি অদ্ভুত, ছেলেটি অদ্ভুত, ওই সব। ছেলে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডকারখানা ছাড়া বাঁচতে পারে না! চোখদুটো লক্ষ করেছ, মোটেই স্বাভাবিক মানুষের মতন নয়।

বড়দি হাসতে হাসতে বলে, বাদল, তোর মনে আছে, সূর্যদাকে আমরা যখন প্রথম দেখি, কী রকম সাহেব ছিল? বাংলাই বলতে পারত না!

কথার সূত্রে অতীত ও বর্তমান বার বার স্থান পরিবর্তন করে। আমরা কখনও কখনও বয়স্ক কণ্ঠস্বরে ছেলেবেলার মতন হাসতে চেষ্টা করি।

বড়দি-জামাইবাবুরা দিন দশেক বাদে পুরী যাবেন বলে সব ঠিকঠাক করা ছিল আগে থেকেই। বড়দি আমাকে বলল, বাদল, তুইও আমাদের সঙ্গে চল। আমি কাকিমাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

প্রভাস জামাইবাবুও খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, চলো চলো। খুব ভালো হবে। তুমি পুরীতে যাওনি তো আগে?

আমি পুরীতে যাইনি এবং বেড়াতে খুবই ভালোবাসি। কিন্তু আমার পক্ষে অতগুলো দিন কলকাতার বাইরে কাটানো এখন সম্ভব নয়। বললুম না, তোমরাই যাও। আমার অনেক কাজ আছে।

বড়দি হেসে বলল, তোর আবার কাজ কী রে?

প্রভাস জামাইবাবু বললেন, ও-সব কিছু শুনতে চাই না। তোমাকে যেতেই হবে। শ্রীলেখা, ওকে ধরে রাখতে পারবে না?

আমি ফস করে বলে ফেললাম, তোমরা সমুদ্রের ধারে যাচ্ছ তো, আমি সমুদ্র পেরিয়ে যাচ্ছি।

খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা কৌতূহল নিয়ে বড়দি জিজ্ঞেস করল, কী? কোথায় যাচ্ছিস?

আমি লাজুক ভাবে উত্তর দিলাম, আমি জার্মানিতে যাচ্ছি। সেই ব্যাপারেই জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

বড়দি খুব খুশি হয়ে বলল, জার্মানি যাচ্ছিস? বাঃ, এ তো দারুণ খবর। আগে বলিসনি কেন?

প্রভাস জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এত জায়গা থাকতে জার্মানি কেন? ইস্ট না ওয়েস্ট?

ওয়েস্ট জার্মানিতেই যাব। তার কারণ ওখানে এখন খুব চাকরি পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ইস্ট জার্মানিও ঘুরে আসার ইচ্ছে আছে।

বড়দি বলল, কাকা-কাকিমা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন? কাকিমা তো কদিন আগেই চিঠি লিখেছেন, কিছু জানাননি তো!

মা এখনও জানে না। বড়দি, প্লিজ, মাকে কিছু বোলো না এখন।

তারপর আমার পরিকল্পনা সব খুলে বললাম। প্রভাস জামাইবাবু খুব আগ্রহী হয়ে পড়লেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন সব রকম সাহায্য করার। প্রভাস জামাইবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। উনি মানুষটি খুবই কৌতূহলী ধরনের, সব বিষয়েই জানতে চান। ওঁর নিজের জীবনযাত্রার ব্যাপারে কোনও সমস্যা নেই-তবু দুঃখ-দারিদ্র অর্থাৎ যাকে বলে 'জীবন সংগ্রাম'-এসবের প্রতি একটা রোমান্টিক আকর্ষণ আছে। আমাকে বার বার বলতে লাগলেন, তুমি যে নিজে নিজে চলে যাওয়া ঠিক করেছ, এটা

খুব ভালো করেছ। যা হয় তোক। দরকার হয় রেল স্টেশনে শুয়ে থাকবে, একটা রুটি খেয়ে সারা দিন কাটিয়ে দেবে, তবু জীবনকে দেখতে হবে–

প্রভাস জামাইবাবু আগে একবার দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে একটা ওভারকোট কিনে ছিলেন। পুরনো তোরঙ্গ খুলে সেটা বার করে আমায় বললেন, দেখো তো বাদল, এটা তোমায় ফিট করে কিনা! তোমার তো একটা ওভারকোট লাগবেই!

ওভারকোটটার দু'-এক জায়গায় পোকায় কেটেছে, তবু সেটা গায়ে দিয়ে আমার এত ভালো লাগল যে আমি আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে, আমি হেঁটে যাচ্ছি জার্মানির একটা গ্রামের রাস্তা দিয়ে আমাকে একটা পোস্ট অফিস খুঁজে বার করতে হবে। এক্ষুনি একটা চিঠি পোস্ট করা দরকার, রেণুকে কথা দিয়েছি, প্রত্যেক সপ্তাহে একবার–

বড়দির স্নেহপ্রবণ মন। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর নানা রকম শঙ্কা দেখা দিল। ঘুরেফিরে আমাকে এসে বলতে লাগল, কাকিমা যদি মনে দুঃখ পান? কাকারও বয়েস হয়েছে, বাড়িতে আর কেউ থাকবে না তুই চলে গেলে।

আমি কোনও উত্তর দিই না। বড়দি আমার পিঠে হাত রেখে বলে, বাদল, মায়ের অনুমতি না নিয়ে কোনও কাজ করতে নেই। তুই কাকিমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বল–

আমি তখন বড়দিকে সান্ত্বনা দিই, তুমি অত ভাবছ কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিদেশে যাবার জন্য আমার তখন প্রাণ নাচছে। বার বার মনে হয়, আমি যাবই, যাবই, যাবই, যাবই!

তিনতলার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় মনে হয়, আলোকোজ্জ্বল ইয়োরোপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বড়দি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ফিরে দেখে বললাম, বড়দি, তুমি শুতে যাওনি?

বড়দি হেসে বলল, তোকে দেখছিলাম। সূর্যদাও ঠিক ওই রকম ভাবে জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত।

আমি বললাম, সূর্যদা কি এই ঘরে থাকত নাকি?

হ্যাঁ। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল, না রে? অথচ মনে হয় সেদিনের কথা। কত কী বদলে গেল!

বড়দি, মানুষ তো বদলাবেই।

বড়দি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল, আমি বোধহয় বদলাইনি। আমার এখনও পুরনো সবকিছুর জন্য মন কেমন করে।

বড়দি, তুমি এখনও সূর্যদাকে ভুলতে পারোনি। সূর্যদা কিন্তু তোমাকে বেমালুম ভুলে গেছে।

তা তো ভুলবেই। ওর তো কোনও দোষ নেই। আমি তো ওকে কিছু দিইনি।

সূর্যদা যদি এখন আবার ফিরে আসে, তোমার কাছে কিছু চায়, তুমি দিতে পারবে?

না। এ-কথা জানি, ও আর ফিরে আসবে না। ওর স্বভাব সে রকম নয়।

তা হলে আর মন খারাপ করে লাভ কী?

সে তুই বুঝবি না।

আমি এখন আর সেই ছেলেমানুষটি নেই। এখন সব বুঝি।

ছাই বুঝিস! কারোকে ভালো না বাসলে এসব কিছুই বোঝা যায় না। আর ভালোবাসা কখন বোঝা যায় জানিস? বিচ্ছেদের সময়। যখন দেখা হয় না, তখনই বোঝা যায় ভালোবাসা কতটা গভীর।

কথাটা শুনে আমার মনখারাপ হয়ে গেল একটু। ভালোবাসা মানে কি তা হলে দুঃখ পাওয়া? সূর্যদার জন্য বড়দি তো শুধু দুঃখই পেয়েছে, তবু এত ভালোবাসা থাকে কী করে? প্রভাস জামাইবাবুর কথা ভেবেও আমার একটু কষ্ট হতে লাগল। উনি সুখে আছেন। উনি ভালোবাসা পাননি।

৭৬. কলকাতায় ফিরেই শুনলাম

কলকাতায় ফিরেই শুনলাম, পাড়ার কয়েকটি ছেলে কয়েক দিন ধরে বার বার আমার খোঁজ করে যাচ্ছে। শুনে একটু আশ্চর্য লাগল, কারণ পাড়ার কারওর সঙ্গেই আমার এখন আর মেলামেশা নেই। একটু সন্ত্রস্ত বোধ করলুম।

পরদিন সকালেই মন্টু আর অনিমেষ এসে হাজির। খুব খাতির করে বলল, কী রে, তোর খবরটবর কী? আমাদের একেবারেই ভুলে গেলি?

কয়েক দিন আগে পর্যন্ত ওরা আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে কথা বলত না। হঠাৎ ওদের এ রকম বাড়িতে চলে আসতে দেখে আমার মধ্যে একটা মেয়েলি অভিমান জাগে। ইচ্ছে হয়, আমিও কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে থাকি।

।কিন্তু বাড়িতে কেউ এলে এ রকম করা যায় না। শুকনো গলায় বলি, কী রে, তোরা হঠাৎ, কী মনে করে?

অনিমেষ বলল, এমনিই। তুই ছিলি না, আমরা মাসিমার কাছ থেকে চা খেয়ে গেছি।

মন্টু বলল, আদিনাথদা তোকে একবার ডেকেছেন। বিশেষ করে বলেছেন, আজ বা কালই দেখা করতে।

এবার আমার ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। আমি সোজাসুজি মন্টুর চোখে চোখ রেখে বলি, আদিনাথদার সঙ্গে আমার তো কোনও দরকার নেই! আমি তো প্রতিক্রিয়াশীল!

কে তোকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছে? আদিনাথদা কক্ষনও বলেননি।

আবার তর্ক বেধে যেতে পারত। আমি নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, যাক, ও-সব কথা তোলার আর কোনও মানে হয় না। আমি নিজেই জানি, আমি প্রতিক্রিয়াশীল। আমি প্রেমের কবিতা লিখি।

প্রেমের কবিতা লেখা কি দোষের কিছু নাকি!

এ-যে নতুন কথা শুনছি তোদের কাছে।

অনিমেষ গম্ভীর ভাবে বলল, কাজের কথা হোক। আমাদের পার্টি থেকে ওয়াচ রাখা হচ্ছিল, তুই অন্য কোনও পার্টিতে যোগ দিস কিনা। এখন কংগ্রেস থেকে যা টাকা ছড়াচ্ছে, অনেকেই ওই দিকে ভিড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুই কোনও দিন ওদের দিকে যাসনি, তোর অনেস্টি আছে।

কোনও পার্টি ফার্টিতেই আর নেই আমি। যদি অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলার থাকে আমি বলতে পারি।

মন্টু উঠে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে সস্নেহে বলল, মাথা গরম করছিস কেন? এখন দেশে যে সময় আসছে, তুই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারবি?

আমার মুখে এসে গিয়েছিল যে, আমি আর এ-দেশেই থাকছি না। কিন্তু সেটা এক্ষুনি কারোকে জানানো ঠিক নয়। তাই বললাম, আমি একা একা বেশ আছি।

আদিনাথদা যদি নিজে তোর বাড়িতে আসেন, তুই কথা বলবি না? উনি আসতেই চাইছিলেন।

আমার মতন সামান্য একটা ছেলের কাছে উনি কেন আসবেন?

কিছুক্ষণ বাদে মন্টু আর অনিমেষ চলে গেল। আমি মচকাইনি। কিন্তু সেদিনই এগারোটার সময় যখন রাস্তায় বেরিয়েছি রেণুর কলেজে গিয়ে একবার দেখা করার জন্য, মোড়ের মাথায় আদিনাথদা অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি এড়িয়ে যাবার সুযোগ পেলাম না। চোখাচোখি হতেই আদিনাথদা আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

ঠোঁটে সেই রকম মোটা চুরুট, খুব সিরিয়াস ধরনের মুখ করে আমাকে প্রথমেই বললেন, বাদল, আমরা তোমার সাহায্য চাই।

আদিনাথদার মতন গণ্যমান্য নেতার মুখ থেকে সাহায্য কথাটা শুনে বুক কেঁপে ওঠে, মনে হয়, আমিও তা হলে সামান্য কেউ না।

আমাকে কোনও উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই তিনি আবার বললেন, আমরা এবার একটা বড় রকমের যুদ্ধে নামছি, এখন তোমাদের মতন পুরনো ওয়াকারদের সাহায্য আমাদের বিশেষ দরকার। বিশেষ করে তোমার মতন যারা পড়াশুনো করেছে, যারা সব বোঝে–

যুদ্ধ কথাটা শুনে একটু খটকা লাগার কথা ছিল। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের এমন প্রচণ্ড ডামাডোল চলছে, তাতে বুঝতে ভুল হয় না যে, তিনি এর কথাই বলছেন।

মুখ নিচু করে বললাম, আমি আর কী সাহায্য করতে পারি বলুন। আমার নিজেরই অনেক রকম দ্বিধা আছে।

ও-সব কথা এখন ভুলে যাও। আমরা নির্বাচনে নামছি, ন্যাশনালিস্ট বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার এই সুযোগ। পিপল আমাদের দিকে, আমরা জিতবই, শুধু

দরকার ঠিক মতন অর্গানাইজ করা। এ ব্যাপারে তোমার মতন ছেলেরা অনেক সাহায্য করতে পারে!

তখন এমন একটা বয়স, যখন কারওর কাছ থেকে একটুখানি গুরুত্ব পেলেই জীবনটা সার্থক মনে হয়। কেউ যদি স্নেহের সঙ্গে বলে, তুমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারবে? একমাত্র তুমিই পারবে-তখন আর এক মুহূর্তের দ্বিধা থাকে না।

আদিনাথদার কথায় আবেগ ছিল। আদিনাথদার মতন নেতারা পরবর্তীকালে একেবারে পিছু হটে গেছেন, কেউ হয়েছেন অধ্যাপক বা কেউ দুর্মুখ সমালোচক, অনেকে হারিয়েই গেছেন। কিন্তু সেই সময় এই রকমই ছিল নেতৃত্বের ধরন।

আমার এই কয়েক মাসের রাগ-অভিমান সব জল হয়ে গেল, আমি আগেকার চেয়েও বেশি উৎসাহে পার্টির কাজে যোগ দিলাম।

নির্বাচনের কাজে এমনিতেই বেশ উন্মাদনা আছে। তা ছাড়া, সেবারই প্রথম সারা দেশব্যাপী উদ্যোগ হচ্ছে, রীতিনীতি জানা নেই, উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। সাধারণ মানুষের মুখের কথা শুনে মনে হয় আমরা জিতবই। দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বাড়ছে, গ্রামে গ্রামে হাহাকার, প্রত্যেক মাসে হাজার হাজার লোক চাকরি থেকে ঘাটাই হচ্ছে, টাটা বিড়লা-ডালমিয়া ইস্পাহানিরাই চালাচ্ছে দেশটাকে, নেহরু কোনও কালোবাজারিকেই ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝোলাননি-লোকে ওদের ভোট দেবে কেন? ওরা শুধু আমাদের জনযুদ্ধের সময়কার কথা বলে আক্রমণ করছে, ওরাই সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে এখন সুভাস বোসের নাম ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

কয়েকটা দিন কেটে গেল ঘঘারের মধ্য দিয়ে। স্নান-খাওয়া ভুলে গিয়েছিলাম। নির্বাচনের দিন আমাকে একটা বুথের মধ্যে পাঠানো হল অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির পোলিং এজেন্ট হিসেবে।

বুথে বুথে পুলিশ পাহারা। আমরা কয়েক জন ভেতরে একটা লম্বা বেঞ্চে বসলাম। অ্যাসেম্বলি সিটে অনেক ক্যান্ডিডেট, সকলের পোলিং এজেন্টদের বসবার জায়গা হয় না। আমার ক্যান্ডিডেট লোকসভার-আমার যেন একটু গর্ব বেশি।

আমাদের প্রত্যেকের হাতে ছাপানো ভোটার লিস্ট। লোক দেখে দেখে টিক দিতে হবে। কারোকে সন্দেহ হলে জেরা করতে পারি। ঘোরতর সন্দেহ হলে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার আছে, তাতে যদিও টাকা জমা দিতে হবে। আমার কাছে অবশ্য কোনও টাকা দেওয়া হয়নি, আমাদের গরিব পার্টি, টাকা কোথায় পাবে। আমার টিফিন অ্যালাউয়েস ছ'আনা।

কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টটির বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, দেখলেই মনে হয় পকেটে অনেক টাকা আছে। সে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেই না।

প্রথম প্রথম খুব কম লোক এল ভোট দিতে। অনেকক্ষণ বাদে একজন-দু'জন আসে। তাও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। মনটা একটু দমে গেল। বুড়ো বুড়িরা আমাদের ভোট দেবে না, এটা ধরেই নেওয়া যায়। কিন্তু অন্যরা কোথায়, যাদের বাড়ি বাড়ি ক্যানভাস করতে যাবার সময় হাসিমুখে বলেছিল, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

ক্রমে ক্রমে ভিড় হতে লাগল। সকলেরই মুখ গম্ভীর। কার মনে যে কী আছে, বোঝবার উপায় নেই। আমার দিকে কেউ চোখে চোখ ফেলেও তাকায় না।

কাকে কী জিজ্ঞাসা করব? দু-এক জনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করি, ঠিক ঠিক মিলে যায়, আমার আর কিছু বলার থাকে না।

কংগ্রেসের ছেলেটি যুবক বা যুবতীদের দেখলেই নানা রকম জেরা করে। রীতিমতন ধমক দেয়। কারওর বয়সের গরমিল দেখলেই বলে, রেশন কার্ড এনে দেখাতে পারবেন?

কেউ মুখে মুখে কথা বললেই সে চ্যালেঞ্জ করে।

কংগ্রেসের ছেলেটি হঠাৎ একসময় আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা গোলমাল করলেন না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী গোলমাল?

শুনেছিলাম, আপনারা বোমাবাজি করবেন?

তাতে তো আপনাদেরই সুবিধে হবার কথা। কারণ, আমরাই তো জিতছি।

তাই নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ–

প্রিসাইডিং অফিসার এই সময় আমাদের কাছে এসে বললেন, আপনারা প্লিজ এই ধরনের আলোচনা এখানে করবেন না।

কংগ্রেসের ছেলেটি বলল, ঠিক আছে, চা খাওয়া যাক তা হলে। আমি সকলের জন্য এক রাউন্ড বলছি।

বেয়ারা এসে দশ কাপ চা দিয়ে গেল। আমি আবার দ্বিধায় পড়ে গেলুম। কংগ্রেসের ছেলের পয়সায় কি চা খাওয়া উচিত? এ সম্পর্কে পার্টির পলিসি কী? মুসলিম লিগের ছেলেটাও খাচ্ছে অবশ্য।

চায়ের কাপ না ছুঁয়ে আমি মনোযোগ দিয়ে ভোটার লিস্টটা পড়তে লাগলুম। পাশ থেকে একজন বলল, দাদা আপনার চা যে জুড়িয়ে গেল?

আমি বললাম, আমি চা খাই না।

কংগ্রেসের ছেলেটি উঠে এসে বলল, দাদা, রাগ করলেন? একটু হাসিঠাট্টাও করা যাবে না?

আমি সত্যি চা খাই না।

আজকে অন্তত খান। আমার কথায় খান। না হলে মনে খুব দুঃখ পাব।

বেশিক্ষণ না না বলতে আমার ভালো লাগে না। সেই ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা এক ঢোঁকে খেয়ে ফেললাম। ও রকম বিস্বাদ চা জীবনে খাইনি। সেই মুহূর্তে পি সি রায়ের কথাই ঠিক, চা পান না বিষ পান!

মুখ তুলেই দেখি সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেণু। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। আসলে রেণু নয়, রেণু হতেই পারে না, ওর ভোট নেই। আমারই নেই তো রেণুর থাকবে কী করে। মেয়েটির সঙ্গে রেণুর মুখের খুব মিল–আমি নির্লজ্জের মতন মেয়েটির মুখের দিকে হা করে তাকিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলাম।

মেয়েটি আমাকে রেণুর কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল। কলকাতায় ফেরার পর রেণুর সঙ্গে এক বারও দেখা হয়নি। কয়েক দিন হইচইয়ের মধ্যে অন্য কিছুই করা যায়নি। একই শহরে আছি অথচ সাত-আট দিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি, এও কি সম্ভব? রেণু যদি এর মধ্যে ভুলে যায় আমাকে?

না, এসব কথা চিন্তা করা উচিত নয় আমার। আমার ওপর এখন কত দায়িত্ব। আমি পরবর্তী লোকটিকে অকারণে নানা প্রশ্ন করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি।

ক্যান্ডিডেটরা ঘুরে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি আসতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। এর আগে দুবার মাত্র ওঁকে দেখেছি। উনি আমার কাধ চাপড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

একটু পরে এলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। বৃদ্ধ খুব দুঃখিত ভাবে বললেন, ওহে, তোমরা আমার পোলিং এজেন্টকে বসতে দাওনি? সে বেচারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তাকে তো বলেছিলাম এই ধারটার বসতে। দেখছেন তো জায়গা কম!

আমার আজও মনে আছে, বৃদ্ধ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দু'হাত নেড়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, যদি হয় সুজন, তবে তেঁতুল পাতায় ন' জন! ইচ্ছে থাকলেই জায়গা হয়ে যায়।

আমার পোলিং বুথটা ছিল দর্জিপাড়ার এক স্কুলে। টিফিনের সময় বেরিয়ে একটা চায়ের দোকান খুঁজছি-দেখি একটু দূরেই মন্টু, অনিমেষরা দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা এসে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল, কী রে, এ-দিকে আমাদের অবস্থা কী রকম?

আমি বললাম, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। লোকজন চুপচাপ এসে ভোট দিয়ে। যাচ্ছে। কাকে দিচ্ছে কে জানে!

ওরা কারোকে চ্যালেঞ্জ করেছে?

সব মিলিয়ে আট- দশ জন।

শোন, এদিকে আমাদের পজিশন খুব ভালো। তোর আর ভেতরে গিয়ে দরকার নেই। বাগবাজারের দিকে খুব খারাপ অবস্থা-চল বাগবাজারে চল, অন্য কাজ আছে।

আমার মনে হল, সত্যিই আর ভেতরে বসে শুধু ভোটার লিস্টে টিক মারার কোনও মানে হয় না। আমি ওদের সঙ্গে বাগবাজার চলে এলাম।

রাস্তায় প্রচুর মানুষজন। দেখে মনে হয় সকলেই যেন শ্যামবাজার-বাগবাজারের দিকে যাচ্ছে। নির্বাচন নাকি ওই দিকেই দারুণ জমেছে। বাগবাজারের দিকে আমাদের কোনও চিন্তা থাকার কথা নয়, ও-দিকে আমাদের পার্টির ভালো ভালো ওয়ার্কার আছে, বরং যত বেশি ভোট পড়ে ততই ভালো। কিন্তু মন্টু আর অনিমেষের মুখ গম্ভীর।

বাগবাজারে এসে শুনলাম, এখানে দু-তিনটে সেন্টারে প্রচুর ফল্স ভোটিং হচ্ছে। কংগ্রেস থেকে লরি-ভরতি করে নিয়ে আসছে তোক বাইরে থেকে, তারা হুড়হুড় করে ঢুকে ভোট দিয়ে আসছে।

পরিতোষ আমাদের এদিককার ইনচার্জ, তার চুল উসকোখুসকো, পাঞ্জাবিটা অনেকখানি ছেঁড়া, দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। পরাজয়।

পরিতোষ আমাদের তিন জনকে দেখে বলল, আমার সঙ্গে আয় এ-দিকে, একটা জরুরি পরামর্শ আছে।

পরিতোষের সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে আমরা চলে এলাম বৃন্দাবন পাল লেনে। সেখানে আগাছা-ভরতি একটা মাঠের ও-পাশে একটা ভাঙা বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে থাকতে দেখেছি। শুনেছি বাড়িটার কোনও মালিক নেই। পরিতোষ আমাদের নিয়ে এল সেই বাড়িটার মধ্যে, একেবারে ভেতরের দিকে একটা অন্ধকার ঘরে। যে-কোনও সময় মাথায় ইট খসে পড়তে পারে। ঘরটার মধ্যে আমাদের পার্টির অনেকগুলো ছেলে রয়েছে, কয়েকটা লোহার রড, ফ্ল্যাগ, পোস্টার।

জায়গাটাকে দেখলেই বোঝা যায় একটা গুপ্ত আস্তানা। একটু রোমাঞ্চ বোধ হয়। এর আগে যখন শুনতাম পার্টির লিডাররা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে, তখন আমার মনে হত সত্যিই বোধহয় মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে কোনও লুকোবার জায়গা আছে। সে-বিষয়ে অনেক দিন আমি নিঃসংশয় হতে পারিনি। এই পোড়োবাড়ির ভাঙা ঘরটা দেখেও মনে হয় সেই রকম কিছু। কিংবা গোপন যুদ্ধের হেড কোয়ার্টার।

যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব সম্পর্কে অন্য রকম ছবির কথা চিন্তা করে চিত্ত আন্দোলিত হত। সেই রকম যুদ্ধের সম্ভাবনা এখন অনেক দূরে সরে গেছে। এখন আমরা ভোট-যুদ্ধে মেতেছি। প্রথম বারে তাতেও উত্তেজনা কম অনুভব করিনি।

দুটি লম্বা মতন রাগী চেহারার ছেলে পরিতোষকে জিজ্ঞেস করল লেটেস্ট পজিসন কী?

পরিতোষ বলল, এইট্টি কিংবা নাইনটি পার্সেন্ট পোলিং হচ্ছে এক একটা সেন্টারে। তার মধ্যে একটিও জেনুইন কিনা সন্দেহ! শংকর বোস ক্যানটার করে দিচ্ছে একেবারে।

শংকর বোসের নামটা আমার কাছে যেন চেনা মনে হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শংকর বোস কে রে?

মন্টু অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, তুই গ্রেট ডিগবাজি মাস্টার শংকর বোসকে চিনিস না? আগে টেরারর্স পার্টিতে ছিল, তারপর ফরটি টু-তে জেলে গিয়ে আমাদের পার্টিতে যোগ দিল, খুব বড় বড় কথা বলত, এখন ইলেকশানের ঠিক আগে কংগ্রেসে গিয়ে ভিড়েছে। মিজে দাঁড়ায়নি, কিন্তু এ-পাড়ার কংগ্রেস ক্যান্ডিডেটকে তো সে-ই জিতিয়ে দিচ্ছে। টাকাও পেয়েছে অঢেল!

আমার মনে হল, এই শংকর বোসের নাম আমি সূর্যদার মুখে দু'-এক বার শুনেছি, সূর্যদাদের দলেই ছিল একসময়। সূর্যদা যদি এখন এখানে থাকত, কোন পার্টিতে যোগ দিত? বোধহয় ভোটই দিত না। সূর্যদা রাজনীতি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু টাকা ছড়ালেও এত লোক পাবে কোথা থেকে? এদের সকলেরই তো অন্য জায়গায় ভোট আছে।

পরিতোষ বলল, তুই ইলেকশানের কিছু বুঝিস না। অনেকেরই ভোটার লিস্টে নাম থাকে না। তা ছাড়া রেফিউজিদের তো প্রায় কারওরই ভোট নেই-শংকর বোসের খুব হোল্ড আছে রেফিউজি কলোনিগুলোতেওখান থেকে গাড়ি ভরতি করে করে নিয়ে আসছে।

রাগী চেহারার লম্বা ছেলেদুটি বলল, ওরা এ রকম ফল্স ভোটিং চালাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? তারচেয়ে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে চার্জ করি, ইলেকশান ভন্ডুল হয়ে যাক।

মন্টু বলল, ওখানে অনেক পুলিশ আছে।

থাক পুলিশ। আমরা আধলা ইটে ভুষ্টিনাশ করে দেব।

পরিতোষ বলল, শুধু পুলিশ নয়, ওরা ওখানে অনেক গুন্ডা লাগিয়ে রেখেছে। ইলেকশান ভাঙতে দেবে না-ওদের কাছে ড্যাগার আছে। আমরা প্রিপেয়ার্ড নই। কাশীপুরে ওরা দুজনকে স্ট্যাব করেছে।

অনিমেষ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালা! আমরা কি তা হলে কিছুই করব না! পরিতোষ বলল, আমরা কাউন্টার অ্যাকশন নেব। আদিনাথদা খবর পাঠিয়েছেন, আমরা যত জনকে পারি জোগাড় করে আমাদেরও ফল্স চালাতে হবে।

পরিতোষ ঘাড় ফিরিয়ে অন্য কয়েকটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, দাগ তুলতে পেরেছিস।

একজন বলল, ইজি! পাঁচ-সাত মিনিট লাগে।

সে কাছে এগিয়ে এসে আঙুলটা দেখাল। তর্জনীর পাশের দিকে কালির ফোঁটা যেখানে থাকার কথা, সে জায়গাটা ফরসা। দেশলাই কাঠির বারুদের দিকটা জলে ডুবিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট ঘষলেই উঠে যাচ্ছে দাগটা। শুধু দেশলাই কাঠির বারুদ ঘষলেই যে দাগটা ওঠে, তা এত তাড়াতাড়ি কী করে সকলে জেনে ফেলল, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

মন্টু বলল, বাদল, তোর দাগটা তুলে ফেল!

আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমার এ বছর ভোটিং রাইট হয়নি। যদিও আমার এখন একুশ হয়ে গেছে, কিন্তু ভোটার লিস্ট তৈরি করার সময় কম ছিল।

সে কথা বলতেই ওরা সবাই একসঙ্গে হইহই করে উঠল। আমি এখনও একটাও ভোট দিইনি, এ তো ম্যান পাওয়ার নষ্ট করা। তক্ষুনি ভোটার লিস্ট দেখে একটা নাম বার করল, সাধন রায়, বয়স চব্বিশ, বাবার নাম শশাঙ্ক রায়। পরিতোষ জানাল, এই সাধন রায় পাটনায় গেছে, ওরা খুব ভালো ভাবে জানে, সুতরাং কোনও রিস্ক নেই।

আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ওরা পাঠিয়ে দিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। যদিও একটু আগে আমি নিজে পোলিং এজেন্ট হিসেবে দেখে এসেছি যে ভয়ের কিছু নেইনামটাম ঠিক বলতে পারলে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না, তবু আমার বুক কাঁপছিল। এই প্রথম আমি সজ্ঞানে একটা অন্যায় করতে যাচ্ছি। অন্যরা অন্যায় করছে বলেই আমার নিজের অন্যায়টা ছোট হয়ে যায় না।

মন্টু আমাকে এগিয়ে দিল বুথের কাছাকাছি। শেষকালে বলে দিল, আমাদের পোলিং এজেন্ট যদি তোকে চিনতে না পেরে বেশি জেরা করে তা হলে ডান দিকে কানের পাশটা চুলকোতে থাকবি। তা হলেই বুঝতে পারবে।

আমি সাধন রায় ও শশাঙ্ক রায়ের নাম জপ করতে করতে লাইনে দাঁড়ালাম। বার বার মনে হচ্ছে, এই সামান্য নামদুটো শেষ মুহূর্তে ভুলে যাব। মুখখানা হাসি হাসি করে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়েও বুঝতে পারলাম, ঠিক মতন হাসি ফুটছে না। আমার বুকের মধ্যে যে এত জোরে ধড়াস ধড়াস শব্দ তা কি অন্যরা শুনতে পাচ্ছে না? রেণু যদি জানতে পারে কখনও? রেণু একটু মিথ্যে কথা বলাও সহ্য করতে পারে না। আর আমি অন্য লোকের নামে পরিচয় দিয়ে। রেণু যদি আমাকে ভালো না বাসে, তা হলে কি আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারব? নাঃ, রেণুকে বোঝাতে হবে, এটা একটা স্ট্র্যাটেজি।

শেষ পর্যন্ত কোনও অসুবিধে হল না। যন্ত্রের মতন আমি নাম ও ঠিকানা বলে গেলাম, পোলিং এজেন্টরা বলল, নেক্সট! এখানে দেখলাম, কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টরা দারুণ প্রতাপের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। প্রিসাইডিং অফিসারটি মিনমিনে। তাকে বোঝানো হয়েছে যে, লাইন বিরাট হয়ে গেছে, সুতরাং এখন বেশি জেরা করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

আঙুলে ফোঁটা দিয়ে, ব্যালট পেপারটা বাক্সে ফেলার পরের মুহূর্তে আমার সমস্ত গ্লানি কেটে গেল। আমার মনে হল, আমি একটা দারুণ ব্যাপার করে ফেলেছি। আমি অসৎ লোকদের ঠকাতে পেরেছি।

লাফাতে লাফাতে ফিরে এলাম সেই ভাঙা বাড়িতে। আমি অত্যন্ত উচ্ছাসের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কেউ তেমন উৎসাহ দেখাল না। পরিতোষ বলল, দাগটা মুছে ফ্যাল। তোকে আবার যেতে হবে।

সকলেই তিন বার-চার বার করে যাচ্ছে। কংগ্রেসের অর্থবল আছে, লোকবল আছে। আমাদের এ দুটোর একটাও নেই বলে এক এক জনকেই যেতে হচ্ছে বার বার। এই গোপন ঘরটায় একটা কারখানা বসে গেছে। এক এক জন ভোট দিয়ে আসছে, আর তিন জন এক্সপার্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তাদের দাগ তুলে ফেলার জন্য। আমাদের যেখানে যত ওয়ার্কার আর ভলান্টিয়ার ছিল সকলকেই ডেকে আনা হয়েছে এখন আর মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে যতগুলো তুলতে পারা যায়। অনিমেষ ভেতরে ঢুকে ভোটার। লিস্ট বার করে এনেছে কায়দা করে, কোন কোন নামের পাশে এখনও টিক পড়েনি দেখবার জন্য।

এবার আমাকে দেওয়া হল সুশান্ত তালুকদার, বাবা জয়দেব তালুকদার, বাড়ির নম্বর সাতাশের দুই, হলদে রঙের বাড়ি। এবার অন্য বুথে, তেমন একটা ভয়ও করছে না। লাইনে দাঁড়িয়ে আরাম করে সিগারেট ধরালাম। লাইনে আমার সামনে-পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা কোনওক্রমেই বাগবাজারের লোক নয় বাগবাজারের লোক দেখলেই চেনা যায়।

খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলাম, এই বুথের চেহারা অন্য রকম। আমাদের পার্টির কোনও পোলিং এজেন্ট এখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না। যারা বসে আছে তারা যাকে তাকে ধরে হঠাৎ জেরা করছে, ছেলেছোকরা দেখলে আর রক্ষে নেই। ভেতরে পুলিশ রয়েছে, উঠোনের মধ্যে কয়েক জন ভোটারকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের মিথ্যে পরিচয় প্রমাণিত হয়ে গেছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওদের। এবং স্বয়ং শংকর বোস ওই বুথ পরিদর্শন করতে এসেছেন। সেই প্রথম আমি দেখলাম শংকর বোসকে–তখন ঘুণাক্ষরেও অনুমান করা সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক কিছু জড়িয়ে আছে।

লোকজনের কথাবার্তা শুনেই আমি চিনতে পারলাম শংকর বোসকে। খুব রোগা আর লম্বা মতন মানুষ, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। আমার বন্ধুরা যেমন বলেছিল, সে রকম কোনও ফন্দিবাজ মানুষের মতন মুখ নয়, বরং যেন একটু বেশি অভিজ্ঞ আর ক্লান্ত মনে হয়। মোটামুটি চেহারা দেখলে খারাপ ধারণা কিছু হয় না।

আমার শরীরে ভয়টা আবার ফিরে এল। স্পষ্ট টের পাচ্ছি পা কাঁপছে। সুশান্ত তালুকদারের বাবার নাম যেন কী? বাড়ির নম্বর সাতাশের দুইনা সাঁইতিরিশের দুই! ইস, কাগজে লিখে আনিনি কেন? এই সামান্য ব্যাপারটাও মনে থাকে না? এখনও চলে যাব? বড্ড কাছাকাছি এসে গেছি, এখন চলে যেতে গেলে যদি কিছু মনে করে!শংকর বোসের সামনেই ধরা পড়ব, যদি উনি কোনওক্রমে জানতে পারেন আমি সূর্যদার ভাই।

শংকর বোস সেই মুহূর্তেই সেখান থেকে চলে গেলেন বলে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল কিছুটা। নাম ঠিকানা সব ঠিকঠাক মনে পড়ে গেল।

নাম?

সুশান্ত তালুকদার।

বাবার নাম?

জয়দেব তালুকদার, সাতাশের দুই...

পোলিং এজেন্টটি আমাকে ছেড়ে দিয়ে টিক দেওয়ার জন্য মাথা নিচু করেছিল, হঠাৎ আবার মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাবা তো মারা গেছেন?

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে আমি বললাম, না তো!

লোকটি এবার রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনার বাবা মারা যাননি?

আমিও জোর দিয়ে বললাম, না!

প্রথম বার প্রশ্নের সময় অতর্কিতে আমি নিজের বাবার কথাই ভেবেছিলাম। পরের বার খেয়াল হয়েছে। তবু সামান্য কুসংস্কার, মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, আমার বাবা মারা গেছেন। আমার বাবা বড় নিরীহ মানুষ, তাকে মুখের কথাতেও আমি মেরে ফেলতে পারি না।

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, জয়দেব তালুকদার আমার মাস্টারমশাই ছিলেন, উনি মারা যাবার পর ওঁর ডেডবডি আমি নিজে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেছি, আর আপনি বলছেন, উনি মারা যাননি!

আমার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমি ধরা পড়ে গেছি। কাছেই পুলিশ। হয়তো এই লোকটা অত্যন্ত চালু, জয়দেব তালুকদারের মারা যাবার ব্যাপারটাও বানিয়ে বলছে, কিন্তু আমার আর জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই।

দু'এক মুহূর্ত আমি চুপ করে ছিলাম শুধু। সেই সময়টুকুতে পৃথিবীর আর কিছু নয়, শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠল রেণুর মুখ। রেণুই যেন আমার বিচারক। রেণু কি আমার সব দোষ ক্ষমা করবে? রেণুর চোখের দিকে তাকালেই ও কি বলবে, আমি রাগ করিনি!

আমি খুব দুর্বল গলায় লোকটিকে বললাম, দাঁড়ান, আমি বাড়ি থেকে রেশান কার্ড নিয়ে আসছি!

রেশান কার্ড এনে কী দেখাবেন? আমি জানি না?

আমি আর অপেক্ষা করলাম না, পেছন ফিরেই দৌড়োলাম।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, ধরুন, ধরুন, ওই ছেলেটাকে ধরুন তো!

কিন্তু তখন আমি অন্ধ, আমি কারোকেই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু দৌড়োচ্ছি। অত জোরে জীবনে কখনও ছুটিনি আগে।

একসময় বুঝতে পারলাম, আমি বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি, আমি ধরা পড়িনি, বেঁচে গেছি। তবু দৌড় থামালাম না। তীব্র গতিতে ছুটছি। সেই ভাঙা বাড়ির দিকে নয়, বন্ধুদের দিকে নয়। কোন দিকে জানি না। ভয় চলে গিয়ে এখন ফিরে এসেছে লজ্জা। আমি হেরে গেলাম। অন্যরা কী রকম অনায়াসে তিন-চার বার ফল্স দিয়ে এসেছে। আমি পারলাম না। আমি হেরে যাই বার বার। আমি ভয় পাই।

কিন্তু ফিরে গিয়ে আবার চেষ্টা করার ইচ্ছে হল না। আমি বুঝতে পারলাম, এইসব পথ আমার জন্য নয়। আমি অযোগ্য। আমাকে একাই থাকতে হবে।

ছুটতে ছুটতেই আমি দেখলাম, সার সার লরি-ভরতি নকল ভোটার তখনও আসছে। গণতন্ত্রের বিচিত্র রূপ আমার সেই দিনই দেখা হয়ে গেল।

৭৭. কিছুক্ষণ ছোটার পর

কিছুক্ষণ ছোটার পর আমি যত না বেশি হাঁপিয়ে পড়লাম, তার থেকেও বেশি মনখারাপ হয়ে গেল। বার বার মনে হতে লাগল, আমি একটা অপদার্থ। পৃথিবীতে আমার কোনও মূল্যই নেই। আমি অন্যায়কে ভয় করি, আবার ন্যায়ের পথে যাবারও দৃঢ়তা নেই। কিংবা সে-পথ কোনটা আমি জানি না।

এই যে মানুষজন, রাস্তায় এত ভিড়, হইচই, হাসি ও ঝগড়া-এই সবেরই কি কোনও উদ্দেশ্য আছে? আমি কোথায় যাব? শৈশবের এক একটা স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, আর চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে যেন সেই ভাঙার ঝনঝন শব্দে।

কোথায় যাব, এই প্রশ্ন মনে এলে তৎক্ষণাৎ একটা সহজ ও অবধারিত উত্তর মনে আসে। রেণুর কাছে।

আমার মাথার মধ্যে অনেক রকম প্রশ্ন এবং অনেক রকম সমস্যা এসে ভিড় করে। অনেক সময় দিশেহারা হয়ে যাই। কিন্তু দুটি ব্যাপারে আমার উত্তর সব সময়ই সরল। খিদে পেলে খেতে হবে, আর খারাপ হলেই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এখন মাথা থেকে আর সবকিছু জটিল ব্যাপার সরিয়ে ফেলে এই সরল দুটি পথ। বেছে নিলাম।

প্রথম কথা, দারুণ খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে শুধু কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। এই কথা মনে পড়তেই আরও অসম্ভব বেশি খিদে পেয়ে গেল।

পকেটে কিছু খুচরো পয়সা আছে। দু'আনি এক-আনি দু পয়সা মিলিয়ে প্রায় বারো আনা। যথেষ্ট খাওয়া হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে এক কোয়ার্টার মাংস, দুখানা রুটি আর পাঁচটা সিগারেট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে একা খাব কী করে? কোনও দিন আমি একলা কোনও হোটেল রেস্তোরাঁয় ঢুকিনি। একলা বসে বসে কোনও দোকানে চুপচাপ খাবার খেয়ে যাওয়া আমার কাছে একটা অত্যন্ত ভালগার দৃশ্য মনে হয়। অনেককে দেখেছি এ রকম ভাবে খেতে, তারা নিশ্চয়ই মফসসলের লোক।

আমি শ্যামপার্কের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।খালি পেটে সিগারেট টানলে পেটের ভেতরটা চিন চিন করে, তাতেও এক ধরনের নেশা নেশা হয়। অনেক দিন আগে বিষ্ণু আমাকে বলেছিল, জ্বর হলে ওর খুব ভালো লাগে। খুব বেশি জ্বর বাড়লে যখন একটা ঘোরের মতন হয়, তখন কত রকম দৃশ্য দেখা যায়, মনটা খুব চমৎ কার ভাবে হালকা হয়। এখন আমি বিষ্ণুর ওই কথাটার মর্ম বুঝতে পারি। শরীরকে কষ্ট দেবার মধ্যেও একটা আরাম আছে। খালি পেটে সিগারেট খাওয়ার কোনও যুক্তি নেই, অথচ ইচ্ছে করে। বিশেষ করে যখন মনখারাপ থাকে তখন শরীরকে কষ্ট দিলে অন্য রকম উপকার পাওয়া যায়।

খিদে পেলেই খেতে হবে, এই সিদ্ধান্ত খুব সরল হলেও গ্রহণ করা সহজ নয়। যেমন, আমার খিদে পেয়েছে, পকেটে পয়সা আছে, তবু আমি খেতে যেতে পারছি না। আমার কোনও বন্ধু যদি একা আমাকে কোনও দোকানে বসে খেতে দেখলে ঠাট্টা করে! আমার কোনও বন্ধুর সঙ্গে এখন দেখা হয়ে গেলে আমি তাকে অনায়াসেই দ্বারিকের দোকানে লুচি আর আলুর দম খাওয়াতে পারতাম। ওরা বিনে পয়সায় যে ডালটা দেয়, সেটার স্বাদই সবচেয়ে ভালো। মনে করলেই জিভে জল আসে।

পঙ্কজ কিংবা ভাস্কর কলকাতায় থাকতে পারে এখন। অনেক দিন ওদের বাড়ি যাই না, এখন একবার গেলে হয়। ভাস্করের বাড়িতে গেলেই খিদের সমস্যা মিটে যায়-এ রকম বিকেলবেলা ওদের বাড়িতে যে-কেউ গেলেই তার জন্য ওপর থেকে খাবার আসে।

কিন্তু এখন ভাস্করের কাছে গেলে আর সহজে ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। তা হলে রেণুর সঙ্গে দেখা হবে কী করে?

চার পয়সার চিনে বাদাম কিনে নিয়ে তাই খেতে খেতে হাঁটতে লাগলাম। একা একা চিনেবাদাম খাওয়া যায়। ঝালমুনটা কী অসম্ভব ঝাল। চোখের জল বার করে দেয়।

মনখারাপ হলেই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে হবে-এই ব্যাপারটাও খুব সরল মনে হলেও আসলে খুব সরল নয়। ইচ্ছেটা সরল, কিন্তু পৃথিবী বড় জটিল। তীব্র ইচ্ছে থাকলেও রেণুর সঙ্গে দেখা করব কী করে?

রেণু অনেক সময় অভিযোগ করেছে যে বেশির ভাগ সময় ওই আমার কাছে দেখা করতে আসে, আমি ওর কাছে যাই না। কথাটা অনেকটা সত্যি, আমার মন-প্রাণ রেণুর দিকে সব সময় ছুটে যেতে চায়, কিন্তু পথে অনেক বাধা। রেণুকে যখনই জিজ্ঞেস করেছি, আবার কবে দেখা হবে, রেণু বলেছে তুমি আমার বাড়িতে আসবে। আমি বলেছি যাব, তবু যাওয়া হয় না। কেন যে যাই না, তা রেণুকেও বুঝিয়ে বলতে পারি না।

বিষ্ণু চলে যাবার পর আর যখন তখন ওদের বাড়িতে যেতে পারি না। শেষের দিকে বিষ্ণুই ছিল ওই বাড়িতে আমার একমাত্র বন্ধু। রেণুর দাদা অংশুর সঙ্গে কিছুতেই আমার বনল না। এখন শুধু রেণুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কি যায়? কেউ বারণ করেনি, রেণুর ছোটকাকা একদিন শুধু একটু বক্র ইঙ্গিত করেছিলেন। ওদের পুরনো আমলের বনেদি বাড়ি বাইরের কোনও ছেলে ও-বাড়ির কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় না। আমি এত ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়িতে যাচ্ছি যে নিজেকে বাইরের ছেলে বলে কখনও ভাবিনি। কিন্তু রেণুর ছোটকাকার ইঙ্গিতটাতে আমার গা জ্বলে গিয়েছিল। সেই থেকে আর ওদের বাড়িতে কখনও যাইনি। আর কিছু নেই, শুধু আমার বাঙালের গোঁটুকু এখনও আছে।

খড়্গপুর থেকে ফেরার পর আর রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি। অনেক দিন রেণুর কোনও খবর জানি না, আজ তো কলেজ ছুটি, রেণু কোথায় থাকতে পারে?

ঘুরতে ঘুরতে আমি রেণুদের বাড়ির রাস্তায় চলে এলাম। একবার হেঁটে গেলাম বাড়িটার সামনে দিয়ে। সদর দরজাটা খোলা, ভেতরের উঠোনটার একটা অংশ দেখা যায় ফাঁকা। অনেক দিন ও বাড়িতে নতুন শিশু জন্মায়নি। ওই উঠোনে এখন কেউ আর খেলাধুলো করে না।

খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসতেই হল। ওই বাড়িটা আমাকে চুম্বকের মতন টানছে। অনায়াসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারি। রেণুর ছোটকাকার চোখ এড়িয়ে যদি দোতলায় উঠে যাই রেণুর মা আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। উনি তো একসময় আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। উনি কি কখনও রেণুর কাছে আমার কথা জিজ্ঞেস করেন না?

যেমন পকেটে পয়সা থাকা সত্ত্বেও আমি খাবারের দোকানে ঢুকতে পারিনি, সেই রকম, এখানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি রেণুদের বাড়িতে ঢুকলাম না। এ রকম ভাবে। যাওয়া যায় না।

ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেকে আমার আরও নিঃস্ব মনে হতে লাগল। কিংবা ভিখারি। কিংবা চোর। রাস্তায় প্রতিটি মানুষ কি আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে না? যারা হেঁটে যাচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই কোথাও-না-কোথাও যাচ্ছে, আমি শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

সত্যিই তো, কেন দাঁড়িয়ে আছি? রেণু যে আজ বাড়ি থেকে বেরোবে, তার কি কোনও মানে আছে? কিংবা রেণু বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, ফিরবে বেশি রাত্রে। ভবানীপুরে ওর মাসির বাড়িতেও যেতে পারে। একমাত্র আমার ইচ্ছাশক্তির জোরেই আমি রেণুকে এখানে টেনে আনতে পারি। এর জন্য কতখানি ইচ্ছাশক্তি দরকার? পি. সি. সরকারের একটা বইতে পড়েছিলাম, রোজ সকালবেলা সবুজ গাছপালার দিকে। তাকিয়ে চোখের একটা ব্যায়াম করলে দৃষ্টিশক্তি এত দূর বেড়ে যায়। ইস, কেন যে সেই চোখের ব্যায়ামটা করিনি।

পেছন থেকে কে একজন আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, কী রে বাদল!

এই ব্যাপারটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এ পাড়ায় অনেকেই আমাকে চেনে। এই রকম কোনও জায়গায় চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ-না-কেউ এসে কথা বলবেই।

তাকিয়ে দেখলাম, সুবীর। আমার বয়সি হলেও বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা। রেণুদের বাড়ির ঠিক উলটো দিকে থাকে। এ-পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে ওকে ভয় পায়, আর সুবীর নিজেকে প্রত্যেকটি কুমারী মেয়ের অভিভাবক হিসেবে মনে করে।

আমি সুবীরের দিকে অসহায় ভাবে তাকালাম।.সবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মন জয় করার জন্য। হাসলাম ফ্যাকাশে ভাবে। যদি সুবীর আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তা হলে আমি আগামী এক সপ্তাহের জন্য ভগবানে বিশ্বাস করতে রাজি আছি।

সুবীর বলল, এখানে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে?

সুবীর জানে না, আমি এখন আর বিষ্ণুদের বাড়ির ভেতরে ঢুকি না। সুবীর জানে, আমি যে-কোনও সময়েই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে পারি। সুতরাং ও সে-দিকে কিছু সন্দেহ করবে না।

সম্ভবত ঈশ্বরই আমার মাথায় বুদ্ধি জুটিয়ে দিলেন। আমি বললাম, ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অনেকক্ষণ ট্রাম আসছে না।

মল্লিকাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

এই প্রশ্নে আমি আরও বেশি চমকে উঠি। এটা আবার সুবীরের কী কায়দা? রেণুদের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস না করে মল্লিকাদের বাড়ির কথা বলার মানে কী? মল্লিকা নামটা চেনা চেনা, কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ নেই।

উত্তর না দিয়ে আমি এমন একটা মুখভঙ্গি করলাম, যার অনেক রকম মানে হতে পারে। এবং কথা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, সুবীর, তুমি ইলেকশানের সময় কিছু করোনি?

সুবীর অত সহজে ভুলল না। ইলেকশানের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, মল্লিকাদের বাড়িতে খুব রসের কারবার জমেছে, নারে?

আমাকে সাবধান হতে হবে। সুবীরের কাছে দুর্বলতা দেখালে চলবে না। কোনও রকম যুক্তি মানে না সুবীর। যে-কোনও সময় গালাগালি দিতে বা হাত চালাতে পারে। আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম।

সিগারেটে টান দিয়ে সুবীর বলল, বাদল, তুই থিয়েটার করছিস না?

প্রথম দেখার পর আমি সুবীরকে এড়াতে চেয়েছিলাম, ভয় পেয়েছিলাম, এখন আমার কৌতূহল বেড়ে উঠল, সুবীর এসব বলছে কী?

সুবীর আবার বলল, তুই পার্ট ফার্ট করছিস না? দেবুদা তোকে পার্ট দেয়নি?

তৎক্ষণাৎ সুবিধে মতন কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি সোজা কথাটাই বললাম। মাথা নেড়ে জানালাম, না।

দেবুদা, নিজেকে মস্ত বড় ডাইরেকটার ভাবে কিনা। মাইরি যেন সেকেন্ড শিশির ভাদুড়ী। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্য মাল খাওয়া শুরু করেছে, জানিস তো?

এসব কিছুই আমার জানার কথা নয়। কারণ, আমি দেবুদাকেই চিনি না। আমি সোজা সুবীরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যাতে আমাকে প্রশ্ন করার বদলে ও নিজেই। কিছু বলে।

সুবীর এরপর যে কথাটা বলল, সেটা আমার পক্ষে হজম করা শক্ত।

দেবুদা রেণু আর মল্লিকা দু'জনের সঙ্গেই হিড়িক দিচ্ছে শালা।

রেণুর নাম নিয়ে কেউ কোনও প্রকার খারাপ কথা বললে আমার শরীর জ্বলে যায়। আমার উচিত ছিল সুবীরের নাকে বিনা বাক্যব্যয়ে একটা ঘুষি মারা। কিন্তু তার উপায় নেই, সুবীরের শরীরের ওজন আমার অন্তত দ্বিগুণ। এবং নিতান্ত বোকা গোঁয়ার ছাড়া কেউ এই সময় মারামারি করে না। আমি তক্ষুনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ভবিষ্যতে কোনও-না-কোনও একদিন আমি সুবীরকে কঠিন শাস্তি দেব। সে-দিন হয়তো ও বুঝতেই পারবে না, কী অপরাধের জন্য ওই শাস্তি।

সুবীরের সঙ্গে আমার আর একটাও কথা বলার ইচ্ছে নেই। আমি আপন মনেই বললাম, ওই তো ট্রাম এসে গেছে।

ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম ট্রামে। সুবীর আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, শুনতে পেলাম না। সুবীরের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হচ্ছিল। ট্রামটা একসময় এসে শ্যামবাজার ডিপোর মধ্যে ঢুকল, তবু আমি বসেই রইলাম। ট্রাম থেকে নামলেই কোনও একটা জায়গায়

যাওয়ার কথা ঠিক করতে হবে। কিন্তু কোথায় যাব? এই সময় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মুখের ভেতরটা তেতো তেতো লাগছে। আমি রেণুর কাছে যেতে চাই, কিন্তু যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

সুবীরের কথা শুনে বোঝা গেল, মল্লিকাদের বাড়িতে কোনও একটা নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। রেণু কি তাতে অভিনয় করছে? রেণু কোনও নাটকে অভিনয় করছে, আর আমি তার কিছুই জানি না, এ কি কখনও হতে পারে? অবশ্য, আমিও যে একদিন ইলেকশানের কাজে মেতে ছিলাম, রেণু তা জানে না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, রেণু তো বাইরে কারওর সঙ্গে বেশি মেশে না, নাটক করবে কী করে?

মল্লিকাদের বাড়ি রেণুদের বাড়ির পেছনেই। কোনও দিন আমি সেখানে যাইনি। কিন্তু রেণুকে কয়েক দিন ও বাড়িতে যেতে দেখেছি গল্পের বই আনবার জন্য। রেণু সেখানে এখন রিহার্সাল দিচ্ছে, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব? এই মুহূর্তে হাজার হাজার ডিনামাইট দিয়ে কলকাতা শহরটা ধ্বংস করে দিলে কী হয়?

একসময় দেখি যে আমার ট্রামটা আবার চলতে শুরু করেছে। আবার রেণুদের বাড়ির সামনে দিয়েই যাব। আমি উদাসীন ভাবে বসে রইলাম। যেখানে খুশি যাক।

হাতিবাগান থেকে ট্রামটা ঘুরতেই আমি নেমে পড়লাম ঝপ করে। এবারও যদি সুবীর আমাকে দেখতে পায়, কী করবে জানি না। আমি কোনও দিকে না তাকিয়ে রেণুদের বাড়ির পাশের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

মল্লিকাদের বাড়িটা চিনতে কষ্ট হল না। জোরে জোরে কথাবার্তার আওয়াজ হচ্ছে একতলার একটা ঘর থেকে। জানলার বাইরে অনেকগুলি কৌতূহলী ছেলেমেয়ে এবং কয়েকটি লোভী ছোকরা। তাদের মধ্যেও সুবীরও আছে।

সুবীর আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী রে?

আমি ওকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললাম, একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম।

আমি সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। এক নজরে তাকিয়ে দেখে নিলাম, রেণু ছাড়া আর এক জনও চেনা নেই।

আমি হঠাৎ ঢুকে পড়ার জন্য কেউ আমাকে কিছু বলবে কিনা এ-চিন্তা আমার মনেই আসেনি। আমি প্রগাঢ় অভিমান বোধ করছিলাম। কেন কী জানি।

আজ সারা দেশ জুড়ে সাধারণ নির্বাচনের উত্তেজনা, খানিকক্ষণ আগেই আমি দারুণ এক ভিড় ও হুড়োহুড়ির মধ্যে থেকে এসেছি–অথচ এখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। এরা নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। এ রকম হয়, আমি আগে খেয়াল করিনি। গত কয়েকটা দিন ধরে আমি ভাবছিলাম যে, এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে। এখন দেখতে পাচ্ছি অনেকে এ ব্যাপার নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামায় না।

রিহার্সাল তখন মধ্যপথে। রেণুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আর একজন মাঝবয়সি লোক হাউহাউ করে কান্না কান্না গলায় বলছে, মা জননী, মা জননী, তুমি একবার রাজাবাবুকে বলল–

রেণু আমার দিকে একবার চেনা-চোখে তাকাল, কোনও কথা বলল না। আমি দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম।

রেণুকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘরের সকলের দৃষ্টি তার দিকে। রেণুর ঈষৎ কোঁকড়া চুল শুধু একটা রিবন দিয়ে বাঁধা। একটা সাদা সিল্কের শাড়ি পরে আছে। সবচেয়ে সুন্দর লাগে ওর গম্ভীর ধরনের অথচ ছেলেমানুষি মুখখানা। রেণুর মতন ওইটুকু একটা মেয়েকে একজন বয়স্ক লোক মা জননী বলছে, এটা হাস্যকর। অবশ্য এইসব অ্যামেচার নাটকগুলো হাস্যকরই হয় সাধারণত। দু-একটা লাইন শুনলেই বোঝা যায় এক বিন্দুও সাহিত্যরস নেই।

পরিচালককে সহজেই চেনা যায়। একজন ফরসা ও দীর্ঘকায় লোক, চুল ওলটানো, দীর্ঘ নাসা, গিলে করা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা। এই তা হলে দেবুদা।

ঘরে আরও আট-দশ জন ছেলে ও মেয়ে আছে। সকলেই চুপচাপ। এদের মুখ-চোখে বেশ একটা সাংস্কৃতিক ভাব আছে। আমি চিনি এইসব ছেলেমেয়েদের–এরা সংস্কৃতির চর্চা করতে ভালোবাসে, অন্য সময় প্যান্ট-শার্ট পরা থাকলেও সংস্কৃতি করার সময় ধুতি পাঞ্জাবি পরবেই।

পরিচালক এগিয়ে এসে রেণুর থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে বলল, মুখটা তোলো, মুখটা তোলো, অডিয়েন্সের দিকে তাকাও।

রেণু হেসে ফেলে বলল, বললাম তো আমি পারব না। আমি একদম পারব না। কেন পারবে না? পারবে কি পারবে না তা তুমি নিজে কী জানো, সে তো আমরা বলব।

রেণু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আর থাক বরং।

না, না, না–থার্ড সিনটা হয়ে যাক।

পরিচালক দেবুদা রেণুর পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঠিক যেন আমার দিকেই তাকিয়ে বলল, ঠিক এই ভাবে হেসে হেসে মুখটা তুলে বলো, আপনি বোধহয় জানেন না, আমি মানুষ চিনতে কখনও ভুল করি না।

রেণু সেই কথাগুলো উচ্চারণ করল কিন্তু এখনও মুখ নিচু করে। সে যেন আমার দিকে তাকাতে পারছে না।

দেবুদা আবার রেণুর থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, মুখটা তোলো, মুখটা তোলো, সোজা ওই দিকে–

আমার চোখ আটকে আছে দেবুদার আঙুলের দিকে। সেই আঙুল রেণুর থুতনি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। দেবুদা নামের এই লোকটির সঙ্গে সারা জীবনে কখনও যে আমার বন্ধুত্ব হবে না তখনই তা ঠিক হয়ে গেল।

আমি এই সময় আবার মনে মনে কথা বলা শুরু করে দিলাম। অনেক লোকের মাঝখানে একা হয়ে পড়লেই এ রকম হয় আমার।

আমি রেণুর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি কোথাও আছি?

রেণু উত্তর দিল কেন?

তুমি আমাকে মনে রেখেছ?

তার মানে?

তুমি কি এই ক'দিনে এক বারও আমার কথা ভেবেছ?

কী মনে হয়?

আমি বুঝতে পারি না, আমি বুঝতে পারি না। আমার ভয় হয়।

দেবুদা তখনও রেণুর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। উনি কি অভিনয় শেখাচ্ছেন, না নাচ শেখাচ্ছেন? হাত ধরে, কাঁধ ধরে বুঝি অভিনয় শেখাতে হয়? আমি সেদিকে চেয়ে থাকতে পারছি না। গত দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই কি পৃথিবীটা আমার জন্য বদলে গেল? আমার খিদে পেয়েছে, আমি ক্লান্ত, এই সময় রেণুকে আমি কাছে পাব না, অন্য একজন তার গা ছুঁয়ে থাকবে?

বাড়ির ভেতর থেকে অনেকগুলি কাপ-ভরতি করে চা আসছে। চায়ের ব্যাপারে যে মেয়েটি তদারকি করছে, সেই-ই যে মল্লিকা, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। একটু মোটাসোটা ধরনের। কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় চেহারা, মুখখানা সব সময়ে হাসিখুশি।

আমার অস্বস্তি বেড়ে গেল অনেকটা। এরা আমাকে চেনে না, নিশ্চয়ই আমাকে চা দেবে না। আমি যে চা খাবার জন্য মরে যাচ্ছি তা নয়, কিন্তু অন্য সকলকে চা দেবার পর আমাকে যদি না দেয়–

মল্লিকা প্রথমেই এসে আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে হেসে বলল, নিন। আমি নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে চা নিলাম।

মল্লিকা আবার বলল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না! রেণুকে কত বার আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছি, এর আগে এক দিনও আপনাকে নিয়ে আসেনি।

আমার সঙ্গে মল্লিকার কোনও দিন আলাপ হয়নি। তবু মল্লিকা আমাকে চিনল কী করে! মেয়েরা বোধহয় এ রকম ভাবে অন্যদের অজ্ঞাতসারে অনেক কিছু জেনে ফেলে।

আমি লাজুক ভাবে বললাম, আমি কলকাতায় ছিলাম না অনেক দিন।

কোথায় গিয়েছিলেন?

খড়্গপুরের দিকে।

দেবুদা হাত তুলে বলল, আস্তে আস্তে!

রেণু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আর ভালো লাগছে না। এবার অন্য সিন থোক।

সেই দৃশ্য শেষ হয়ে যাবার পর আবার অন্য দৃশ্যের রিহার্সাল শুরু হল, তার মধ্যে রেণু নেই। রেণু কিন্তু উঠে এসে আমার সঙ্গে কথা বলল না। একবার তাকালও না। হঠাৎ কী একটা আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল মল্লিকার সঙ্গে।

আমি রেণুর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রেণু যেন আমার উপস্থিতির কথা ভুলেই গেছে। মল্লিকার সঙ্গে ওর কী এত কথা?

এদিকে পরিচালক দেবুদা নিজেই এখন অন্য আর দু'জনের সঙ্গে একটা দৃশ্যের রিহার্সাল দিতে শুরু করেছেন। সংলাপ শুনে মনে হয় উনিই নায়ক। পেছনে একটি ছেলে বসে প্রমটিং করছে, কিন্তু দেবুদার দরকার হচ্ছে না প্রমটিংয়ের। নাটকটাও কী ওঁরই লেখা নাকি? একই সঙ্গে নাট্যকার, পরিচালক ও নায়ক–এতগুলি গুণ সমন্বিত কোনও লোক যদি রেণুর থুতনিতে হাত ছোঁয়ায়, তবে আমি তাকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না।

এখানে আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার। রেণু আমার কাছে আসছে না কেন? আমিও তো কাছে গিয়ে রেণুকে ডাকতে পারি। এটা তো খুবই স্বাভাবিক। অথচ আমি কিছুতেই ডাকব না। রেণু নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা না বললে আমি ডাকতে পারি না।

তখন আমি পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালাম। রেণুর সামনে সচরাচর সিগারেট খাই না। রেণু জানে, আমি সিগারেট আবার ছেড়ে দিয়েছি। ও ভীষণ রেগে যাবে। কিন্তু এইটাই আমার প্রতিবাদ। আমি কোনও ঘরে ঢুকলে রেণু আর সবাইকে ফেলে প্রথমেই আমার সঙ্গে কথা বলবে, আমি এটা চাই।

পরিচালক দেবুদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, এই কবি, কবি, তুমি এবার এদিকে এসো!

বড় চুলওয়ালা একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। চোখে একটা উদাস উদাস ভাব। ছেলেটিকে দেখে আমার বেশ মজা লাগল। এর নামই কি কবি, না কবিতা লেখে? অথবা কবির ভূমিকায় অভিনয় করছে? মুখের মধ্যে একটা পান্তুয়া-ভরে কথা বললে যে রকম হয়, এর গলার আওয়াজ সেই রকম।

দেবুদা তাকে ঠিক মতন দাঁড় করিয়ে দিলেন। বাঁ হাতটা বাউলের মতন উঁচুতে তোলা। সে এই ভাবে কবিতা বলতে বলতে মঞ্চে ঢুকবে। সে একজন আধুনিক কবি। অর্থাৎ আধুনিক কবির ব্যঙ্গচিত্র। শনিবারের চিঠি এবং প্রমথনাথ বিশীর লেখালেখির জন্য আধুনিক কবিদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা বেশ ফ্যাশন হয়েছে। একটুক্ষণের মধ্যেই জানতে

পারলাম, যে-ছেলেটি অভিনয় করছে, সে নিজে সত্যিই একজন কবি। প্রত্যেক পাড়াতেই যেমন একজন পাড়াকবি থাকে। সে পান্তুয়া-গলায় উদ্ভট সব লাইন বুলে যেতে লাগল।

আমার অসহ্য বোধ হল। আজকাল আমি কবিটবিদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ছেলেটির অভিনয়ে ঘরের মধ্যে হাসির ফোয়ারা পড়ে গেছে। আমি রেণুর দিকে একবার তীব্র চোখে তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

হনহন করে হেঁটে এসে দাঁড়ালাম মোড়ের মাথায়। রেণু আজ আমাকে অপমান করেছে। এক একটা দিন আসে এই রকম। প্রত্যেকটি ঘটনাই আমার বিরুদ্ধে যায়। ঘটনাগুলো ষড়যন্ত্র করে ঘটতে থাকে। বিকেলবেলা আমার অতখানি মনখারাপ হবার পর রেণুর কাছে এসে একটু শান্তি কি প্রাপ্য ছিল না?

এখনই সত্যিই আর আমার যাবার কোনও জায়গা নেই। যাবার জায়গা নেই বলেই আমি বাড়িতে গিয়ে পালিয়ে থাকব না। সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।

খুব সিগারেট খাওয়া হচ্ছে।

চমকে পাশে তাকালাম। কখন যেন ম্যাজিকের মতন রেণু এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

কোনও কথা না বলে আমি রেণুর দিকে কড়া ভাবে তাকিয়ে রইলাম। রেণু আবার বলল, সিগারেট ফেলে দাও এক্ষুনি।

না। কেন ফেলব?

তুমি আমাকে না ডেকেই চলে এলে যে?

আমি তো তোমাকে ডাকতে যাইনি।

তবে? রিহার্সালের ওখানে গিয়েছিলে কেন?

এমনিই।

রেণু এক পা এগিয়ে এসে বলল চলো, আমাদের বাড়িতে চলো। ওখানে বসে কথা বলব।

না, তোমাদের বাড়িতে যাব না।

এত রাগ রাগ করে কথা বলছ কেন? কী হয়েছে কী?

তুমি ওদের ওখানে আমার সঙ্গে কথা বলেনি কেন?

এর উত্তরটা খুব সোজা। তোমার বোঝা উচিত ছিল।

না, আমি অত সব বুঝতে পারি না। কী?

আমার লজ্জা করছিল।

একটু থেমে রেণু আবার মিনতি করে বলল, আমাদের বাড়িতে আজ একবারটি এসো। নীচেই বসবে-লক্ষ্মীটি এসো।

তোমার ছোটকাকা-

বাজে কথা বোলো না। ছোটকাকা তোমাকে কোনও দিন বারণ করেননি।

বিকেল থেকেই মনটা খুব দুর্বল হয়ে আছে, তাই আর বেশি জেদ দেখাতে পারলাম না। অনেক দিন পর রেণুদের বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকেই কয়েকটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। বড় গেট দিয়ে ভেতরে এসে উঠোন ও ঠাকুরদালানের পাশেই একটা নতুন পাঁচিল উঠেছে। উঠোনের পাশে আর একটা ঘর। প্রশ্ন-চোখে রেণুর দিকে চাইতেই ও জানাল ভাড়া দেওয়া হবে।

বুঝতে পারলাম, এ বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে আর বেশি দেরি নেই। এইসব বনেদি পরিবার নিজের বসত বাড়িতে বাইরের লোককে এনে ভাড়াটে বসাবে, আগে চিন্তাও করা

যেত না। রেণুদেরই আর দু-তিনটি-ভাড়া বাড়ি এবং মফস্সলে জমিদারি ছিল শুনেছিলাম। কিন্তু এদের বাড়িতে অধিকাংশ পুরুষই কোনও কাজ করে না, অথচ সকলেরই ব্যয়বহুল বিলাসী জীবন-বিষয় সম্পত্তিগুলো তাই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। রেণুর ঘোটকাকার একমাত্র কাজ মামলা-মোকদ্দমা করা।

যেটা বিষ্ণুর পড়ার ঘর ছিল সেটা এখন বারোয়ারি বসবার ঘর হয়েছে। সোফার ঢাকাগুলো ময়লা। দেওয়ালগুলো চুনকাম হয়নি বহু দিন। সেই ঘরে এসে বসলাম।

রেণু জিজ্ঞেস করল, মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না?

রেণুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওপরে যেতে হবে। তা হলে বিষ্ণুর মায়ের সঙ্গেও দেখা করা উচিত। অনেক দিন পরে এসেছি। ওপরে গেলে রেণুর অন্যান্য। কাকা কাকিমাদেরও প্রণাম করা দরকার। একটু ইতস্তত করে বললাম, পরে যাব।

তুমি কী করে জানলে আমি মল্লিকাদের বাড়িতে আছি?

সুবীর বলল।

সুবীর কে?

ওই যে লম্বা সুবীর, তোমাদের পাড়ার।

ও বুঝি আজকাল তোমার বন্ধু?

হ্যাঁ বন্ধুই তো। যদি হয়ই বন্ধু, তাতে কী হয়েছে?

কিচ্ছু না। তুমি আজকাল কোথায় থাকো, কাদের সঙ্গে মেশো, আমি কিছুই জানি না। এতদিন কোথায় ছিলে?

যেখানেই থাকি না কেন, তোমার তো কোনও ক্ষতি হয়নি! তুমি তো দিব্যি নাটকফাটক নিয়ে মেতে আছ।

আমার সঙ্গে রাগ রাগ করে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

বেশ করব! তুমি যে নাটকে অভিনয় করছ, আমাকে তা জানাওনি কেন?

তুমিও তো ইলেকশান নিয়ে খুব হইহল্লা করছিলে খবর পেয়েছি। সে-সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, আমি পছন্দ করি কি না? যত সব বকাটে ছেলের সঙ্গে মিশে বিড়ি সিগারেট খেতে শিখছ।

মোটেই তারা কেউ বকাটে নয়। রাজনীতি করা আর এইসব নাটক করা কি এক হল? রেণু তুই কি দিন দিন ইডিয়েট হয়ে যাচ্ছিস?

একবার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গেলে তা আর ফেরানো যায় না। এই সুরে রেণুর সঙ্গে কখনও কথা বলিনি। কিন্তু রেণুকে আজ আঘাত দিতেই ইচ্ছে করছে। রেণুর হাতটা চেপে ধরে কঠোর ভাবে বললাম, লোকজনের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে তুই বুঝি অপমানিত বোধ করিস? আজকাল প্রায়ই দেখছি..

রেণু আস্তে আস্তে বলল, হাত ছাড়ো।

ওই দেবুদা লোকটা ভালো নয়। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।

আমি বুঝি আর কারওর সঙ্গে মিশব না? তুমি তাই চাও?

চট করে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। আসলে আমি তাই চাই। মুখে এটা বলতে পারা সম্ভব নয়। আর কেউ রেণুর দিকে গভীর ভাবে তাকাবে কিংবা কেউ অভিনয় শেখাবার ছলে ওর চিবুক স্পর্শ করবে, এই চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। আমার সাংঘাতিক ঈর্ষা।

মুখে কিছু বলতে না পেরে আমি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে রেণুকে জড়িয়ে ধরলাম। রেণু কিছু বলবার আগেই আমি ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম দরজার পাশেই, দেওয়ালের গায়ে। ওর বুকের ওপর রাখলাম আমার মুখ।

রেণু বলল, বাদলদা, তুমি অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছ।

হয়েছিই তো। আরও হব।

আমি কিন্তু চেঁচিয়ে কারোকে ডাকব এবার।

রেণুকে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়ালাম। রেণু এ রকম নীরস গলায় কখনও আমাকে নিষেধ করেনি। আমি ভালো হতে চাই। আমি উঁচু মানুষ হতে চাই। আমি অন্য সব জায়গায় হেরে গেলেও রেণুর কাছে এসে সান্ত্বনা পেতে চাই। কিন্তু আজ রেণুই বলছে, আমি খারাপ হয়ে গেছি। হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল, রেণু যাতে দেখতে না পায় তাই আমি মুখটা ফিরিয়ে নিলাম।

রেণু বলল, তুমি পাগলের মতন যখন তখন এ রকম যা-তা কাণ্ড করবে না বলে দিচ্ছি।

রেণু, তুমি আমার নও?

কী গভীর আর্তি নিয়ে যে এ-প্রশ্ন করেছিলাম, তা আর কারোকে বোঝানো যাবে না। ছেলেবেলা থেকে জানি, রেণু আমার। সুতরাং তাকে নিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি। রেণু কি তা অস্বীকার করতে পারবে? এটা যেন একটা চ্যালেঞ্জ।

এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হল না। বাইরের উঠোনে অনেক লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রিহার্সাল ভাঙার পর দেবুদা তার দলবল নিয়ে এ-বাড়িতে চলে এসেছেন।

এ বাড়ির পরিবেশ সত্যি অনেক বদলে গেছে। রেণুদের বাড়ি রীতিমতন রক্ষণশীল ছিল, যখন-তখন বাইরের লোকেরা এসে এ বাড়িতে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারত না আগে।

দেবুদা জিজ্ঞেস করলেন, রেণু, হঠাৎ তুমি চলে এলে যে?

আমি লক্ষ করলাম, দেবুদাকে রেণু বেশ সমীহ করে। কয়েক মাস আগেও দেখেছি, রেণু বাইরের লোকজনের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলতে পারত না। সবাই ওকে গম্ভীর বলত। এখন রেণু অনেক কথা বলে। মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি বদলে যায়!

রেণু বলল, বাঃ, আমার তো আজ হয়ে গেল। আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। দেবুদা, বসুন।

সকলের বসবার জায়গা নেই। আমি উঠে দাঁড়ালাম। দেবুদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনি উঠলেন কেন, বসুন, বসুন।

রেণু আমার সঙ্গে দেবুদার আলাপ করিয়ে দিল। দেবুদা সোৎসাহে বললেন, হ্যাঁ, একটু আগে রিহার্সাল রুমে দেখলাম না? আপনাকে মশাই আমাদের খুব কাজে লাগবে। ঠিক এই রকম একটা রোগা লম্বা চেহারা আমাদের দরকার। আপনি অভিজিতের রোলটা করবেন। কী রেণু, এঁকে অভিজিতের রোলে মানাবে না?

রেণু মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ মানাবে।

আমি শুকনো ভাবে জানালাম, অভিনয় টভিনয় আমার আসে না।

দেবুদা বললেন, সেসব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সবাই তো অ্যামেচার–

রেণু বলল, বাদলদা, তুমি করো না একটা পার্ট।

রেণু আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছে। আমাকে লোকজনের সামনে রাগিয়ে দিতে চাইছে। আমি চুপ করে রইলাম।

দেবুদা বললেন, আচ্ছা, আপনি অরুণের ভাই ভাস্করের বন্ধু না? অরুণের কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনি তো কবিতা টবিতা লিখতেন। এখন আর লেখেন না?

এর প্রত্যেকটি কথায় যেন আমার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারা হচ্ছে। কেউ আমার কবিতা লেখার প্রসঙ্গ তুললেই অপমানে আমার গা জ্বলে যায়।

দেবুদা লোকটি বেশ হাসিখুশি স্বভাবের। আমার ব্যবহারের আড়ষ্টতা তিনি লক্ষ করলেন না। দু-এক মিনিটের মধ্যেই আবার নাটকের আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। থিয়েটারের নেশায় যাদের পেয়ে বসে, তারা এ রকমই হয়। রেণুরও বেশ উৎসাহ আছে। দেখছি।

ওদের কথা শুনে বোঝা গেল, দেবুদার সঙ্গে মল্লিকার চেনা ছিল। মল্লিকার উৎসাহেই রেণুকে নাটকের দলে যোগ দিতে হয়েছে। নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে যে রেণুর কোনও আগ্রহ, আগে দেখিনি। এখন খানিকটা মেতে উঠেছে মনে হয়। নিশ্চয়ই এতে রোমাঞ্চ আনে।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমি। রেণুর সঙ্গে আর একটাও কথা বলিনি। বাইরে এসেই ঠিক করে ফেললাম, রেণু যদি নাটকের অভিনয় না ছাড়ে, তা হলে রেণুর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। দেবুদা যদি পারে তো রেণুকে নিয়ে নিক। আমার চাই না। পৃথিবীতে আমার আর কিছুই দরকার নেই।

৭৮. বুলবুল চেয়েছিল সূর্যকে নিয়ে

বুলবুল চেয়েছিল সূর্যকে নিয়ে সে আলাদা কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকবে। এমনকী, সে এ-শহর ছেড়ে চলে যেতেও চেয়েছিল। সূর্য রাজি হয়নি। এ বাড়িতেই সে বেশ আছে।

এতগুলো দিন কেটে গেল, তবু বুলবুল বুঝতে পারে না, সূর্য কী চায়। ও কক্ষনও নিজের কথা কিছু বলে না। তবে, লোকটা তাকে ভালোবাসে, এটা সত্যি। এত যত্ন করে তো আগে কেউ বুলবুলকে ভালোবাসেনি। কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে বুলবুল এইটুকু অন্তত বুঝেছে যে শুধু মেয়েমানুষের ভালোবাসায় পুরুষমানুষের মন ভরে না। ওদের আরও কিছু দরকার। বুলবুল ভেবেই পায় না, সূর্যকে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েও আর কী দিতে পারে। এই বদ্ধ বাড়িটার পরিবেশ ছেড়ে বাইরের খোলামেলা হাওয়ায় গেলে হয়তো আরও আনন্দ পাওয়া যেত। বুলবুলের বড় সাধ, একবার সে সূর্যকে নিয়ে সমুদ্রের ধারের কোনও দেশে বেড়াতে যাবে। কিন্তু সূর্য গা করে না।

দিনের বেলা বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে। সকালে দশটা-এগারোটার আগে কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না। ঘুম থেকে ওঠার পরও সবকিছুর মধ্যেই একটা আলস্য ভাব। যখন-তখন হাই ওঠে। এ বাড়ির বাসিন্দাদের কারওর যেন খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই। নারীদের চুল বিস্রস্ত, ঠোঁটে গত রাত্রির পান খাওয়ার দাগ, চোখের সুরমা খানিকটা মুছে গেছে, পোশাকের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুকনো ফুলের মালাগুলো ছড়িয়ে থাকে। বারান্দায়।

অনেকের ঘরেই প্রত্যেক দিন রান্না হয় না। নোকররা দোকান থেকে খাবার এনে দেয়। সেই দোকানের শালপাতার ঠোঙা থেকেই খাওয়া হয়ে যায়, থালাবাসন বার করার ঝামেলাও নেয় না। আবার কেউ যদি শখ করে রান্না করতে বসে, অন্য ঘরের মেয়েরা ভিড় করে এসে দাঁড়ায় তার রান্নাঘরের দরজায়।

অধিকাংশ ঘরের মেয়েরাই একলা থাকে। এদের মধ্যে যাদের বাঁধা প্রেমিক আছে, তাদের সেই সব প্রেমিকরাও দিনের বেলা থাকতে চায় না কখনও। তবলচি বা দালালরা কখনও কখনও টাকা চাইতে আসে, বারান্দায় উবু হয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যায়– দিনেরবেলা সময়ের কোনও দাম নেই এখানে। কারওর কারওর ঘরে বুড়ি মা এবং দু'একটা বাচ্চাও থাকে। সব মিলিয়ে সাত-আটটি বাচ্চা আছে এ বাড়িতে। তাদের হুটোপুটির শব্দ কচিৎ শোনা যায় বটে, কিন্তু ঠিক সন্ধ্যার পর বাচ্চাগুলো যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় কে জানে!

সূর্য সারা দিন প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটায়। বুলবুল হাজার চেষ্টা করেও তাকে বাইরে পাঠাতে পারে না। বিছানায় মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকাই সূর্যর সবচেয়ে প্রিয় ভঙ্গি। বুলবুল খাবার নিয়ে এসে ডাকাডাকি করলে সূর্য উঠে বসে, মুখটুখ না ধুয়েই খাবার খায়। এ বাড়িতে চায়ের রেওয়াজ নেই। পাথরের মস্ত বড় গ্লাস-ভরতি গরম দুধ খেতে হয় তাকে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে গোসলখানায় যায়। ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ে।

দুপুরে আর একবার স্নান করার জন্য উঠতে হয়। প্রত্যেক দিন স্নান করার ইচ্ছে হয় না তার, কিন্তু বুলবুল এ-ব্যাপারে খুব কড়া। ঠেলেঠুলে তাকে পাঠাবেই। বুলবুলের স্নানের বাতিক আছে। সারা দিনে সে নিজে অন্তত তিন বার স্নান করে, জ্বরজারি হলেও বাদ দেয় না।

স্নান করতে যাবার আগে সূর্য তার শরীরের জড়তা ভাঙবার জন্য হঠাৎ লাফালাফি শুরু করে। প্রথমে শ' খানেক ডন বৈঠক দেয়, তারপর এদিক সেদিক শরীর মোচড়ায় আর লাফায়। লাফিয়ে লাফিয়ে সে ঘরের ছাদ পর্যন্ত ছোঁবার চেষ্টা করে, কখনও এলোমেলো তাণ্ডবনৃত্য লাগিয়ে দেয়। সেই সময় বুলবুল হেসে একেবারে কুটিকুটি হয়।

এই ব্যায়ামের সময় সূর্যর নৃত্যস্পৃহা দেখে বুলবুল প্রথম প্রথম কয়েক দিন চেষ্টা করেছিল সূর্যকে নাচ শেখাবার। কয়েক দিন পরেই সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। সূর্যর ব্যায়াম করা শক্ত শরীরে এখন আর ভারতীয় নৃত্য আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

সূর্যর আসল নামটি আর কেউ মনে রাখেনি, তাকে সকলে ডাকে বাঙ্গালীয়া বলে। প্রথম প্রথম বাঙ্গালীয়া বাবু বলত, এখন বাবু শব্দটাও অতিরিক্ত হয়ে গেছে। এখানকার সকলের সঙ্গেই তার বেশ ভাব। অন্য ঘরের মেয়েরা তার সঙ্গে খুব সহজ ব্যবহার করে, কখনও কখনও প্রয়োজন হলে তারা নিঃসংকোচে এসে বলে, বাঙ্গালীয়া পাঁচঠো রুপিয়া। দেও তো।

দিনেরবেলা মেয়েরা এখানে শুধু একটা ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে থাকে। কারওর কারওর আবার কঁচুলিরও বালাই থাকে না, শুধু ঘাগরাটাই বুক পর্যন্ত টেনে গিট বেঁধে রাখে-সেই অবস্থায় সূর্যর সামনে পড়ে গেলে তারা একটুও লজ্জা পায় না। এত বড় বাড়িতে গোসলখানা মাত্র দুটি এবং স্নানের জায়গাটি একতলায় ইদারার ধারে এবং উন্মুক্ত। সব সময়েই ভিড় লেগে থাকে। স্নান করতে এসে সূর্যকে প্রায়ই আধ ঘণ্টা-এক ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়, অন্য মেয়েরা স্নান করতে করতেই সূর্যর সঙ্গে গল্প এবং রঙ্গরস করে।

গোড়ার দিকে সূর্যকে দেখে সকলেই নিশ্চিত দারুণ বিমূঢ় হয়েছিল। একটা লোক অন্য এক বাবুর সঙ্গে ফুর্তি করতে এসে তারপর একেবারে থেকেই গেল। সেই যে এল আর এক দিনের জন্যও আর কোথাও গেল না? কোনও মেয়ের জন্য কেউ কি এ রকম সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে থাকতে পারে? তাও কিনা বুলবুলের সঙ্গে? এ বাড়ির মেয়েদের মধ্যে বুলবুলেরই আকর্ষণ সবচাইতে কম, তাকে কেউ সুন্দরী মনে করে না, তার গালে বসন্তের দাগ এবং সে ভালো গানও জানে না। নাচতে জানে বটে, কিন্তু সুরত না থাকলে মেয়েমানুষের নাচের আবার দাম কী? সেই বুলবুলের কাছেই কিনা চলে এল কোথা থেকে এক রাজপুত্তুর। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমন ফরসা গায়ের রং। টাকাপয়সাও খরচ করে এন্তার। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষটার শরীরে এক বিন্দু রাগ নেই, যে-যা বলে তাই। শোনে।

কারওর কারওর মনে একসময় সন্দেহ হয়েছিল যে সূর্য বোধহয় কোনও ফেরারি আসামি, এখানে এসে লুকিয়ে আছে। এ রকম ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু কয়েক মাস কেটে গেল, সে রকম কিছুই বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে এখানে পুলিশের লোকও আসে, কিন্তু তারা সূর্যকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অন্য ঘরের মেয়েরা এখন বুলবুলের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে। তবে এখানে এক রকমের কঠোর নীতিবোধ আছে। অন্য ঘরের কোনও পুরুষকে কখনও কেউ ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের ঘরে ডেকে আনবে না। সেই পুরুষ। নিজে থেকে আসতে চাইলেও রাজি হবে না।

সারা দিন সূর্য পড়ে ঘুমোয়। সন্ধ্যাবেলায় এ-বাড়িতে যখন একটা সাজসাজ রব পড়ে যায়, তখন সেও জেগে ওঠে। মেয়েরা যেমন সাজসজ্জা বদলে প্রসাধন সেরে নেয়, সূর্যও তেমনই একটু সাজগোজ করে। বুলবুল তার জন্য কয়েকটা শেরওয়ানি আর কলিদার সিল্কের পাঞ্জাবি বানিয়ে দিয়েছে। সূর্যর এখন মস্ত বড় গোঁফ এবং মুখ-ভরতি দাড়ি। ওই সব পোশাকে তাকে আর বাঙালি বলে চেনাই যায় না। রাজপুত কিংবা শিখ বলেই মনে হয়। জামাকাপড় বদলানো হয়ে গেলে বুলবুল নিজের হাতে সূর্যর চুল আঁচড়ে দেয়, আতর মাখিয়ে দেয় গোঁফে। বুলবুল নিজেও খুব পরিপাটি করে সাজে। হাতে আঁকে মেহেদি, ঠোঁটদুটো লাল টুকটুকে করে, লম্বা বেণী ঝোলায়। একটা মোতির মালা গলায় পরে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আয়নার সামনে। তারপর মুচকি হেসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় সূর্যকে জিজ্ঞেস করে, কেমুন দেখাচ্ছে? এই, বলো না?

বুলবুলের সব সাজগোজই এখন সূর্যর জন্য। তার ঘরে এখন আর অন্য কেউ আসে না। অন্য ঘরে নিত্যনতুন বাবু আসে, নাচগান যখন জমে ওঠে, তখন বুলবুল আর সূর্য পরস্পরকে নিয়ে মত্ত থাকে।

এক একটা দিন অবশ্য অন্য ঘরের কোনও কোনও মেয়ে তাদের বাবুদের নিয়ে চলে আসে এ-ঘরে। সকলে মিলে একসঙ্গে হইচই হয়। গানবাজনা সাধারণত বেশি লোক না হলে জমে না। অন্য কোনও ঘরে মাইফেল বসলেও তারা সূর্য আর বুলবুলকে ডেকে নিয়ে যায়। সকলের কাছেই ওরা দু'জন প্রিয়। সূর্য সারা দিন প্রায় চুপচাপ কাটালেও এই সময়ে বেশ ফুর্তিবাজ হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড মদ খায় আর প্রচুর সিগারেট ফোঁকে। যে-কোনও রসিকতায় হেসে ওঠে হো হো শব্দে। মাত্র কয়েক মাস আগেও সে যে মদ বা সিগারেট স্পর্শ করত না–এখন তাকে দেখে তা কল্পনাও করা যায় না। শেষ রাত্রের দিকে অন্যরা ক্লান্ত হলেও সে ক্লান্ত হয় না একটুও। তার দিন বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছে।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় টানা বারান্দায় গোল হয়ে তাস খেলছিল আট-দশটি নারী, এদের রূপ ও যৌবন ছাড়া আর কোনও পরিচয় নেই। এরা আনন্দের পণ্যা। সাধারণ সংসারী নারীদের তুলনায় এদের দুঃখবোধ কম। তাস খেলাটা একটা নিমিত্ত মাত্র,

আসলে ওরা রসের গল্পে বসেছে। সকলেরই চুল এখন ভোলা। পিঠের ওপর ছড়ানো, এ-ওর গায়ের ওপর ভর দিয়ে পা-মেলে বসেছে, অনেকেরই বুক ও পেটের অনেকখানি অংশ অনাবৃত, কারণ কাছাকাছি কোনও পুরুষ নেই। হঠাৎ হঠাৎ উলু দেবার মতন ওরা কলস্বরে হেসে ওঠে, গড়িয়ে পড়ে একজন আর একজনের গায়ে কেউ কেউ নিজের উরুতে চাপ-চাপড় মারে। ওদের এই সময়কার হাসিতে অসভ্যতার ঝংকার আছে, তার মানেই গত রাত্রের কোনও গূঢ় গল্প।

ক্রমে আলো মিলিয়ে আসে, নোকররা ঘরে ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে যায়, ফুলওয়ালা মালা নিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। ওদের তবু ওঠার নাম নেই। একজন বুড়ি এসে ওদের বকাবকি করতে শুরু করে, গা-ধুয়ে সেজেগুঁজে নেবার জন্য তাড়া দেয়। আঁধার হয়ে এল, এক্ষুনি যে বাবুরা আসতে শুরু করবে। ওই বুড়ি পরীবানুর মা-এ বাড়িতে পরীবানুই সবচেয়ে রূপসি, তার কাছে বেশি লোক আসে। সকলের ধারণা ওই বুড়ি এত টাকা জমিয়েছে যে ভালো মহল্লায় তিনখানা বাড়ি কিনতে পারে।

অগত্যা খেলা ভাঙবার পর যে-যার ঘরে ফিরে যায়। হাসির রেশ তখনও লেগে থাকে। বুলবুল নিজের ঘরে এসে সে-দিন সাজগোজের দিকে গেল না, ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সূর্য ততক্ষণে জেগে উঠে সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে কী চিন্তা করছিল। বুলবুলকে শুয়ে পড়তে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ কী, শুয়ে পড়লে যে?

বুলবুল মুখ দিয়ে একটা শুধু আদরের উঁ উঁ শব্দ করল।

সূর্য নিজে উঠে বসে বলল, এই, সন্ধ্যাবেলা শুয়ে থাকে নাকি? ওঠো। আজ ঠাকুরসাহেবের আসবার কথা না?

বুলবুল বুকের কাছে হাতদুটি এনে গুটিশুটি হয়ে বলল, আমার শীত লাগছে।

সূর্য বুলবুলকে ছুঁয়ে দেখল তার তার গা ছ্যাঁকছেঁকে, প্রায়ই বুলবুলের একটু-আধটু জ্বর হয়। কিন্তু এমন পাগল মেয়ে কিছুতেই ওষুধ খাবে না। কাছাকাছি এক বৃদ্ধ হেকিমসাহেব

থাকেন, তিনি এদের চোখে একেবারে ধন্বন্তরি-তার দেওয়া পুরিয়া খায় মাঝে মাঝে। জ্বর কমুক বা নাকমুক সেই অবস্থাতেই খুব করে আবার চান করে, তারপর ছলছলে চোখে সুর্মা মাখে।

সে-দিন ঠাকুরসাহেবের আসবার কথা। ঠাকুরসাহেব যে-দিন আসেন সে-দিন সারা বাড়িতে এক বিরাট উৎসব পড়ে যায়। ঠাকুরসাহেব নিজেও সঙ্গে আনেন সাত-আট জনের একটি দলসারা বাড়ির সবাইকে একঘরে জড়ো করে নাচগানের এক জলসা বসিয়ে দেন। খাবারদাবার মদ ইত্যাদি সবকিছুরই খরচ ঠাকুরসাহেবের। তার চেহারাটা পুরনো আমলের জমিদারদের মতোই-পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, গলার আওয়াজটা বাজখাঁই। ঠাকুরসাহেবের রোজগারের সূত্র কী কেউ জানে না, তবে এখানে অনেকের ধারণা, চম্বলের ডাকাতদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে। তবে লোকটি গানবাজনার প্রকৃত সমঝদার।

সে-দিন রাত আটটার পর ঠাকুরসাহেব দলবল নিয়ে পরীবানুর ঘরে জমিয়ে বসেছেন, তখনও বুলবুলের ঘর অন্ধকার। একটি মেয়ে বাইরে থেকে এসে ডাকাডাকি করতে লাগল। বুলবুল, বুলবুল, এ বাঙ্গালীয়া-

ঠাকুরসাহেব এর আগে কয়েক বার এসেছিলেন, সূর্যর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। তিনি নিজেই খোঁজ করেছেন সূর্য আর বুলবুলের।

সূর্য মেয়েটিকে জবাব দিল, আজ আমরা যাব না। বুলবুলের তবিয়ত ভালো নেই।

বুলবুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বলল, আমি যাব না, তুমি যাও।

সূর্য বলল, না, আমারও ইচ্ছে করছে না।

বুলবুল অনুযোগ করে বলল, আমার জন্য তুমি শুধু শুধু ঘরে বসে থাকবে কেন! এ কী রকম মরদ।

সূর্য একদৃষ্টে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই দৃষ্টিতে কী রকম যেন অস্বস্তি লাগে। চেনা মানুষকে কি কেউ এতক্ষণ ধরে দেখে? বুলবুল জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ, অমন করে?

সূর্য বলল, তুমি বুঝতে পারো না?

না। তুমি প্রায়ই এ রকম সোজাসুজি তাকিয়ে থাকো, আমি মানে বুঝতে পারি না।

তোমার মধ্যে যে আর-একটা বুলবুল আছে, আমি তাকে দেখি।

আর-একটা বুলবুল? আর কেউ নেই, আমার ভেতরে আর কিচ্ছু নেই!

আমি ঠিক দেখতে পাই।

তোমার ভেতরে যে আর-একজন সূরয আছে, তা কিন্তু আমি ঠিক জানি। তুমি যদিও আমাকে বলোনি।

বলার দরকার কী! আমার ভেতরের মানুষটাই তো তোমার ভেতরের মানুষটাকে ভালোবাসে।

বুলবুল বলল, ঠিক আছে, ওঠো, ওঠো। তুমি যাও, ঠাকুরসাহেব তোমাকে ডাকাডাকি করছেন।

সূর্য তবু যেতে রাজি নয়। ও-দিকে পরীবানুর ঘর থেকে প্রবল হুল্লোড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। আলাহিয়া বিলাবলে গান ধরেছে কেউ। অনেকে মিলে একসঙ্গে হাততালি বাজিয়ে তাল দিচ্ছে। বুলবুল জানে, সূর্য এসব ভালোবাসে।

সে তখন উঠে পড়ে বলল, ঠিক আছে, চলো আমিও যাচ্ছি।

সূর্য বলল, তুমি এই জ্বর গায়ে নিয়ে কোথায় যাবে? না, আজ যেতে হবে না।

আমার কিচ্ছু হবে না।

বাতি জ্বালিয়ে বুলবুল প্রসাধন করতে বসল। সূর্য অনেক করে নিষেধ করল তাকে, কিছুতেই শুনবে না। শেষ পর্যন্ত সূর্য বলল, তুমি সাজলে কী হবে। আমি যাব না। আমার আজ আর ইচ্ছে নেই।

বুলবুল বললে, তুমি থাকো তা হলে। আমি একলাই যাই?

বুলবুল জানে, সূর্যকে তা হলে যেতেই হবে। সে কক্ষনও বুলবুলকে ছেড়ে একা ঘরে বসে থাকবে না।

একটু বাদে ওরা দু'জন পরীবানুর ঘরে ঢুকতেই সকলে একসঙ্গে অভ্যর্থনা করল ওদের। ঠাকুরসাহেব সূর্যকে রসিকতা করে বললেন, বাঙালিবাবু, আপনাকে এতক্ষণ দেখিনি! ফুল আর বুলবুল, এ কি কেউ একা একা ভোগ করে!

এখানে এই আনন্দের পরিবেশে অসুখের কথা বলা মানায় না। সূর্য বলল না বুলবুলের জ্বরের কথা। আর বুলবুলকে দেখে তো এখন আর কিছুই বোঝা যাবে না। সে এখন পাখির মতনই ছটফট করছে।

ঠাকুরসাহেব নিজের পাশে বসালেন সূর্যকে। ঠাকুরসাহেবের স্বভাব আছে, পুরুষদেরও কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলা। উৎসাহের আতিশয্যে এক এক বার তিনি সূর্যর কাধ আঁকড়ে ধরে ধরে কাছে টেনে আনছেন আর সূর্যর কনুইতে একটা কঠিন কিছুর খোঁচা লাগছে। সূর্য সহজেই বুঝতে পারে, ঠাকুরসাহেবের কোমরে পিস্তল গোঁজা আছে। কোমরে পিস্তল গুঁজে নাচগানের আসর জমানোটা মন্দ ব্যাপার নয়। ঠাকুরসাহেবের মুখে জর্দার ভুরভুর গন্ধ–সেই গন্ধটা তাড়াবার জন্য সূর্য ঘনঘন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়।

বুলবুলকে দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না, যে তার শরীর খারাপ। ছুন্নির গানের সঙ্গে তবলচি একটা চমৎকার বোল দিতেই বুলবুল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে

লাগল। সকলে একটা উল্লাসের শব্দ করল। বুলবুলের পাতলা ছিপছিপে দেহটা বিদ্যুতের মতন ঘুরতে থাকে। ছুন্নি আর তবলচি ক্রমশ লয় বাড়িয়ে দেয়। বুলবুল যেন চ্যালেঞ্জের সুরে তাদের কাছে ভাও বাতলায়।

ঠাকুরসাহেব যত বেশি মাতাল হন, ততই তার ফুর্তি বাড়ে। লোকটির প্রাণশক্তি আছে বটে, সারা রাতেও ক্লান্ত হন না। কাছাকাছি বসে থাকা যে-কোনও নারী-পুরুষের উরুতে চাপড় মেরে তিনি হইহই করে হাসতে থাকেন। আজ বুলবুলের নাচ তার খুব পছন্দ হয়েছে-এ জন্য সব কৃতিত্ব যেন সূর্যর, সেই চোখে তিনি তাকান সূর্যর দিকে।

বুলবুলের এক একটা নাচ শেষ হতেই সকলে বলে উঠে, আরও, আরও! বুলবুলের কোনও আপত্তি নেই, সে যেন বেশি উৎসাহ পেয়ে গেছে। এক এক বার বিরতির সময় বুলবুল সূর্যর কাছে আসে তার গ্লাস থেকে মদে চুমুক দিতে। সূর্য তাকে চোখের ইশারায় জানাতে চায়, আর না। আজ আর থাক। বুলবুল ভ্রূক্ষেপ করে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আজ এখানকার সবাইকে সে একাই মাতিয়ে রেখেছে।

রাত আড়াইটের সময় বুলবুল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে সূর্য তাকে কোলে করে নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

৭৯. ভারতের যে-কোনও শহরেই

ভারতের যে-কোনও শহরেই একজন না-একজন বাঙালি ডাক্তার, উকিল বা অধ্যাপকের দেখা পাওয়া যাবেই। বুলবুল বেশ কয়েক দিন অসুখে ভোগার পর সূর্য যে ডাক্তারটিকে ডাকতে গেল, তার নাম রাধাগোবিন্দ কর। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। সূর্যকে তিনি গ্রাহ্য করলেন না, গম্ভীর ভাবে বললেন, পেশেন্টকে এখানে নিয়ে এসো। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

সূর্য জানাল যে, রোগিনীর হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই।

ডাক্তার বললেন, হাঁটতে না পারেন মাইজিকে বলো টাঙ্গা নিয়ে আসতে। আমার যাবার সময় হবে না।

সূর্য তখন ইংরেজিতে বলল, পুরো ভিজিট দিলে ডাক্তারদের কি রুগি দেখতে যাবার নিয়ম নেই?

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মুখ তুলে তাকালেন। অবাক হলেও তিনি মুখের ভাবে তা প্রকাশ করেন না। সূর্যকে তিনি বাড়ির দারোয়ান টারোয়ান মনে করেছিলেন-অনেক চাকর বা দারোয়ানের চেহারাও সুদর্শন হয়। সূর্য ডাক্তারবাবুকে যে বাড়িটিতে নিয়ে যেতে চাইছে-তিনি সেই বাড়িটির পরিচয় জানেন, সেই জন্যই আপত্তি। কিন্তু সেবাড়ির দারোয়ান ইংরেজি বলে না। তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি ধমকের সুরে বললেন, আমার ইচ্ছে না হলে আমি রুগি দেখতে যাব না, আমাকে কেউ জোর করতে পারে?

সূর্য একদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল। বুলবুলরা ওদের চেনা হেকিমসাহেবের ওষুধ খায়। কিন্তু কদিন ধরে কিছুতেই বুলবুলের কাশির রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। যে কয়েক জনের কাছে সে একজন বড় ডাক্তারের নাম জিজ্ঞেস করেছে, প্রত্যেকেই এই রাধাগোবিন্দ করের নাম বলেছে। কিন্তু কে জানত, তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত?

এখানে রাগারাগি করে লাভ নেই, তাই সূর্য অনুনয় করে বলল, আপনি গেলে বিশেষ উপকার হত। আপনি দয়া করে চলুন না।

ভিজিটকা রুপিয়া কৌন দেগা?

ম্যায়–

চশমখোরের মতন ডাক্তার তক্ষুনি হাত বাড়ালেন। সূর্য একটি একশো টাকার নোট এক টাকার নোটের ভঙ্গিতে রাখল টেবিলের ওপর। তিনি সেটা নিয়ে পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালেন। আদেশ করলেন, আমার ব্যাগটা নিয়ে চলো। গাড়ি ডাকো।

গাড়িতে ডাক্তার একটাও কথা বললেন না। বাড়ির সামনে এসে নাক কুঁচকোলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় অন্য একটি মেয়ে নামছিল-ডাক্তার এমন ভাবে দেওয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালেন, যাতে মেয়েটির হাওয়াও তাঁর গায়ে না লাগে।

বুলবুল বিছানায় শুয়ে আছে চোখ বুজে। কুলসম নামে একটি মেয়ে হাওয়া করছে মাথার পাশে বসে। ডাক্তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, এঃ, কী বিশ্রী অস্বাস্থ্যকর ঘর! সব জানলা খুলে দাও। পরদা সরাও!

বুলবুলের ঘরে খাট নেই, মেঝের ওপর পাতা বিছানা। সেখানে ডাক্তার বসলেন না। কুলসম ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এল। সেখানে বসে, রুগি দেখবার আগে ডাক্তার সূর্যকে প্রশ্ন করলেন ইয়ে জেনানা তুমহারা কৌন হ্যায়?

সূর্য বলল, সি ইজ মাই ওয়াইফ।

ডাক্তার বিশ্রী ভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, জল গরম করতে বলো এক বাটি। রুগিকে উঠে বসতে বলো।

মনে হচ্ছে, তিনি সরাসরি রোগীর সঙ্গে কথা বলবেন না। তা হলে চিকিৎসা করবেন কী করে?

তিনি কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বুলবুলের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টেথেসকোপটা বাড়িয়ে রাখলেন রোগিনীর পিঠে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন এবং নিজেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলেন ঘন ঘন।

কুলসম গরম জলের বাটি নিয়ে এল। আরও কয়েক জন এসে ভিড় করেছে দরজার সামনে। কুলসম সূর্যকে বলল, বাঙ্গালীয়া, ডেটল আউর সাবুন উধার রাখ দিয়া

ডাক্তার এবার সত্যি সত্যি চমকে উঠলেন। আপাদমস্তক দেখলেন সূর্যকে। তারপর কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাঙালি?

হ্যাঁ।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর শুধু নীতিবাগিশ তাই নয়, অত্যন্ত বেশি রকমের প্রাদেশিক। রোগিণীর দিক থেকে নজর ফিরিয়ে তিনি ধমকে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার?

সূর্য উত্তর না দিয়ে কাধ ঝাঁকাল।

তুমি কোথায় থাকো?

এখানেই।

কেন?

আপনি রুগিকে কী রকম দেখলেন?

ডাক্তার ততক্ষণে স্টেথেসকোপ গুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অবজ্ঞার সুরে বললেন, এখানে এর কিছু করার নেই। একে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

হাসপাতালে যাবে না। যেতে চায় না।

তা হলে আমার আর কী করার আছে?

ওর কী হয়েছে কী?

ওর কী হয়েছে, তা যে-কোনও অন্ধও বুঝতে পারে। এক্স-রে নিতে হবে, থুতু পরীক্ষা করাতে হবে-কিন্তু তার আগেই সঠিক ভাবে বলে দেওয়া যায়, ওর দুটো লাংসই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আগে কোনও রকম চিকিৎসা করায়নি?

আগে তো ঠিক বোঝা যায়নি।

এরা সাধারণত বুঝতে দেয় না। রোগের চিকিৎসা করালে আর অন্য পুরুষমানুষের সর্বনাশ করবে কী করে?

ডাক্তার শেষের দিকে বাংলা কথা বলছিলেন বলে সূর্য একটু আস্বস্ত বোধ করল। বুলবুলের এসব কথার মর্ম বোঝার দরকার নেই। অন্য একজন সহৃদয় ডাক্তার ডাকলেই হবে। এই কাঠখোট্টা লোকটিকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না।

ডাক্তার গরম জলে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধুলেন। ওদের তোয়ালে না ছুঁয়ে বার করলেন নিজের পকেটের রুমাল। সূর্যকে বললেন, চলো।

বাইরের দরজা পর্যন্ত এসে সূর্য হাত তুলে নমস্কার করে বলল, আচ্ছা–

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা মানে? আমাকে চেম্বারে পৌঁছে দাও।

আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি একটা গাড়ি ডেকে দিচ্ছি। আমি নিজে যদি না যাই।

তোমাকে যেতে হবে।

আমি তো এক্ষুনি যেতে পারছি না। পরে যদি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করি–

পরে আবার কী? তুমি এখনও এখানে থাকবে নাকি? তোমাকে আমি এখানে থাকতে দেব না। তোমার লজ্জা করে না? দেখে তো ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। রাঙালি জাতির কলঙ্ক!

সূর্য দৃঢ় ভাবে বলল, আমাকে এখানেই থাকতে হবে!

ডাক্তার আবার নাক কুঁচকে সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমার স্ত্রী যদি শোনে আমি এই বাড়িতে চিকিৎসা করতে এসেছি, তা হলে আমাকে এলাহাবাদে গিয়ে

গঙ্গায় চান করে আসতে হবে, তা জানো? তোমার কথা শুনে আমি এলাম, আর তুমি আমার কোনও কথা শুনবে না?

সূর্য চুপ করে রইল।

ওই মেয়েটির জন্য আর চিন্তা করে কোনও লাভ নেই।

আপনি তো ওর চিকিৎসার কথা কিছুই বললেন না।

ডাক্তার আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, নামকরা ডাক্তারদের একটা ট্র্যাজেডি কী জানো? তাদের হাতেই বেশি রুগি মরে! সকলে একেবারে শেষ সময়ে নিয়ে আসে আমাদের কাছে। এখানে আসবার আগেই আমি জানতাম!

আপনি কী বলছেন?

হাসপাতালে নিয়ে যাও আর যেখানেই চিকিৎসা করো–মাস দু'একের বেশি ওই মেয়েটি বাঁচবে না।

মাত্র চার-পাঁচ দিন আগেও সুস্থ ছিল, কোনও কিছু বোঝা যায়নি।

মেয়েছেলেরা পারে, মেয়েছেলেরা পারে। ওদের অনেক কিছুই বোঝা যায় না। এইসব রুগিকে বিধান রায়, নলিনী সেনগুপ্ত বা আসরফউল্লার মতন ডাক্তাররা হয়তো বাঁচাতে পারে, আমি পারি না।

সূর্য স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এসব কি বিশ্বাস করা যায়? বুলবুল, এত প্রাণবন্ত বুলবুল–

ডাক্তার পকেট থেকে একশো টাকার নোটটি বার করে বললেন,–নাও–

না, না, আপনার ফি আপনি নেবেন না কেন?

আবার বাঁকা হাসিতে তিনি ধিক্কার দিলেন সূর্যকে। নোটটা মুড়ে বাজে কাগজের মতন তিনি ছুঁড়ে দিলেন। আর কোনও মন্তব্য না করে হাত তুলে ডাকলেন একটা চলন্ত টাঙ্গা।

সূর্য নিজের ঘরে ফিরে আসার পর অনেকে মিলে ঘিরে ধরল তাকে। কী বললেন, ডাক্তারসাব?

সূর্য হেসে বলল, খুব রাগ করলেন ওঁকে ডেকে এনেছি বলে। কিছুই হয়নি। সর্দি জমে গিয়ে রক্ত পড়ছে। অত বড় ডাক্তার এত ছোট অসুখ দেখেন না!

সকলে মত প্রকাশ করল, তারাও এই কথাই বলেছিল। হেকিমসাহেবের দাবাই খেলে কোনও শক্ত অসুখ হয় না। বুলবুলকে আজই অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে না?

বুলবুল বিছানায় উঠে বসে ক্লিষ্ট ভাবে হাসতে চেষ্টা করছে। মুখখানা চুপসে গেছে এই কদিনেই। তবুও বিশীর্ণ চন্দ্রলেখার মতন একটা রূপ আছে সেই মুখে। চুলে চিরুনি পড়েনি দু-তিন দিন।

সূর্য বলল, হ্যাঁ, আজ অনেক ভালো দেখাচ্ছে। ডাক্তারবাবু তো কোনও দাবাই পর্যন্ত দিতে চাইলেন না। বললেন, এমনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে-দিন সারা দিন ধরে সূর্য বার বার চোরা চোখে তাকাতে লাগল বুলবুলের দিকে। আগের মতন আর সোজা তাকাতে পারছে না। জেলে থাকার সময় সে একজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিকে দেখেছিল। সকলেই তার দিকে দারুণ সমীহের সঙ্গে তাকাত। যেন তার শরীরে লেগেছিল মৃত্যুর প্রগাঢ় গাম্ভীর্য। বুলবুলও অনেকটা সেই রকম। মাত্র দু-তিন মাস? এ কি স্বপ্ন?

সারা দিন সে বুলবুলকে হাসিখুশিতে রাখার চেষ্টা করল। ভেতরে ভেতরে তার অসম্ভব দ্বন্দ্ব চলছে। এখন কী করা উচিত? হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করা উচিত

নয়? তা হলে বুলবুলকে জানাতে হবে। হাসপাতালের খাটে বুলবুল একা শুয়ে আছে, এটা সে কিছুতেই কল্পনা করতে পারছে না।

জীবন থেমে থাকে না। সেদিনও অন্যান্য ঘরে সন্ধ্যাবেলা বাবুরা এল, হারমোনিয়াম, ঘুঙুর ও তবলার আওয়াজ শুরু হল, যারা বুলবুলকে ভালোবাসে খুব, তারাও এক সময়ে নেশাগ্রস্ত গলায় খিলখিল করে হাসে।

বুলবুলের ঘরে সে-দিন আলো জ্বলল না। সন্ধ্যা থেকে বুলবুলের আবার জ্বর এসেছে, মাঝে মাঝে কাশির দমকে বেঁকে যাচ্ছে পিঠ। সূর্য তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

একসময় ঘুমিয়ে পড়ল বুলবুল। সূর্য জেগে রইল ঠায়।

একাগ্র হয়ে সে শুনতে লাগল বুলবুলের নিশ্বাসের শব্দ। এখন থেকেই তার ভয় হচ্ছে, হঠাৎ বুঝি নিশ্বাস থেমে যাবে। মৃত্যু জিনিসটা কী রকম, তার কোনও নির্বাচন নেই? পৃথিবীতে এত মানুষ রয়েছে, তবুবুলবুলকেই মরতে হবে কেন? বুলবুল জীবনকে এত ভালোবাসে, আনন্দে ফুর্তিতে তার কখনও কোনও ক্লান্তি নেই, সেই বুলবুলকে মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যাবে? মৃত্যুর এলাকা কত বড়? তার বাইরে কোথাও বুলবুলকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় না?

জানলার বাইরে একটা নিঃসঙ্গ তারা দেখা যায়। বড় বেশি জ্বলজ্বল করছে। একটা সময় যেন তারাটা সরে গেল মনে হল। কে যেন বলেছিল তারারা মাঝে মাঝে স্থান বদল করে? মানুষের জীবনের বিশেষ কোনও মুহূর্তেই দেখা যায় তারা সরে যাবার দৃশ্য। কী। এর মানে?

একসময় শুনতে পেল কান্নার শব্দ। বুলবুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সূর্য তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, এ কী, কাঁদছ কেন? এই, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

বুলবুল বলল, ডাক্তারসাহেব কী বলেছে আমি জানি। আমি আর বাঁচব না!

আরে, তুমি বলছ কী? মোটেই ডাক্তার সাহেব একথা...

আমার কাছে আর মিথ্যে বোলো না। আমি সব বুঝে গেছি।

সূর্যর হাতটা আপনিই গুটিয়ে এল। মেয়েরা শুধু যে অনেক কিছু গোপন করতে পারে তাই নয়, অনেক গোপন খবরও জেনে যায় অনায়াসে।

সূর্য হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে আমি অত সহজে মরতে দেব ভেবেছ? না! তোমাকে আমি মরতে দেব না!

বুলবুল তার সজল চোখদুটি তুলে বলল, আমি তো আর বাঁচতে চাই না!

সূর্য ক্রুদ্ধস্বরে বলল, মরা অত সোজা নাকি! আমি তোমাকে কিছুতেই মরতে দেব না!

সূর্যর গলার আওয়াজে শিশুসুলভ দৃঢ়তা ছিল। যেন সে সত্যিই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে চায়। শুধু বুলবুলকে বাঁচাবার জন্যই নয়, মৃত্যুকে পর্যুদস্ত করার স্পৃহাও তার মধ্যে জেগে ওঠে। মৃত্যুকে সে তো অনেক বার অনেক রূপে দেখেছে। তাই তার রাগ বেশি।

বুলবুল আর কোনও কথা বলার বদলে কাঁদতে শুরু করে। যুক্তির বদলে কান্নাই তার পক্ষে প্রশস্ত মনে হয়। যদিও এই কান্না নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়, নিজেকে ধ্বংস করার জন্য।

বুলবুলের এ-ধরনের যুক্তিবোধ সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় করে দেয়। তারপর সে বুলবুলের কাঁধ কাঁপিয়ে বলে, তুমি বলছ কী? তুমি মরতে চাও?

বুলবুল তার কৃশ মুখোনি তুলে বলে, আমি আর কেন বাঁচতে চাইব বলো? আমার কী আছে?

বুলবুল, আমি আছি! তুমি আমার কথা চিন্তা করছ না?

বাঙ্গালীয়া, আমি তোমার যোগ্য নই! আমি তোমাকে পেলাম না।

তুমি এ কী বলছ?

আমি ঠিকই বলছি! আমি আর কী চাইতে পারি? আমার মতন মেয়ে আর কী আশা করতে পারে? তোমার মতন একজন পুরুষ, এত যার রূপ, এত বড় যার হৃদয়, তাকে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? তবু আমার ভাগ্যে সইল না! আমার নসিবটাই খারাপ! আমার নিজের মা কী ভাবে মারা গেছে তুমি জানো? ঠিক আমারই মতন–

বুলবুল, ছিঃ, এমন কথা বলে না। আমার মা কীসে মারা গিয়েছিলেন তাও তুমি জানো না। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তা বলে, আমিও কি আত্মহত্যা করছি!

বাঙ্গালীয়া, তুমি কেন আত্মহত্যা করবে? তুমি আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাও!

পাগলির মতন কথা বোলো না! তোমার কী হয়েছে কী, কিচ্ছু হয়নি!

সূর্য তার পরদিন থেকে তোলপাড় কাণ্ড করতে থাকল। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের কাছে সে আর গেল না–তার বদলে সে অন্য তিন জন ডাক্তার ডেকে আনল। সব রকম পরীক্ষা ও ফোঁড়াখুঁড়ি চলল। তখনও, পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে, যক্ষ্মাকে রাজরোগ মনে করা হত। এর মধ্যে একজন ডাক্তার আবার অভিমত দিয়ে ফেললেন যে বুলবুলের মোটেই টি বি হয়নি। এক্স-রে রিপোর্ট সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়স্বরে তার মত ঘোষণা করতে লাগলেন। এই ডাক্তারটি যদিও ছিলেন এম বি বি এস, তবু ছিলেন জল চিকিৎসার ভক্ত। দিনের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে জল পান করিয়েই যে এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, তিনি তাই সুপারিশ করলেন। এবং, আশ্চর্যের বিষয়, বুলবুলের কিছুটা উন্নতি হতে লাগল। তার জ্বর ছেড়ে গেল, কাশির দমকেও আর কষ্ট পায় না।

চিকিৎসার সময়ে প্রায় এক মাস সূর্য এক বারও বুলবুলের পাশ ছেড়ে নড়েনি। সূর্যর স্বাস্থ্যজ্ঞান আছে, সে জানে টি. বি. রোগীর পাশে ও রকম শুয়ে থাকা উচিত নয়, কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি। ও-দিকে, বুলবুলের স্বাস্থ্যজ্ঞান নেই, সে জানে না, তার থুতু বা কাশি অন্য কেউ ছুঁলে কী হয়-তবু সে প্রত্যেক দিন সূর্যকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে অন্য কোনও ঘরে চলে যেতে। অন্য কোনও ঘর মানেই অন্য কোনও মেয়ের ঘর। এবাড়িতেই আর তো কোনও খালি জায়গা নেই। সে কথা বুঝেও বুলবুল সূর্যকে চলে যাবার জন্য জোর করে। সূর্যকে অন্য কোনও মেয়ের হাতে সঁপে দিতেও তার কোনও আপত্তি নেই এখন। প্রতি রাত্রে এই বিষয়ে পনেরো কুড়ি মিনিট কথা কাটাকাটি হয়ে উঠেছিল একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বুলবুল ঘুমিয়ে থাকার পরও সূর্য জেগে থেকেছে। তার ভিতরে সব সময় এই চাপা ভয়টা ছিল যে বুলবুল বুঝি যে-কোনও সময়ে নিঃশব্দে মরে যাবে। সূর্য মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চায় সে কিছুতেই বুলবুলকে একা ছাড়বে না। কোনও কোনও দিন বুলবুলের বুকে খুব বেশি ব্যথা হলে সূর্য সেখানে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কাঁচুলি খোলার পর বুলবুলের উন্নত বুকে হাত বুলিয়ে সূর্যর মনে হয়েছে, কিছুই তো বদলায়নি। বুলবুল তো ঠিক সেই রকমই আছে। মৃত্যুটা তা হলে নিশ্চয়ই একটা অবাস্তব ঘটনা!

বুলবুল যখন অনেকটা ভালো হয়ে উঠছে, সেই রকম সময়ে একদিন মাঝ রাত্রে সূর্য একটি ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল! সে-দিন সূর্যর একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ বমির শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। সূর্য ধড়ফড় করে উঠে দেখল, বুলবুল বিছানায় নেই।

বাথরুম অনেক দূরে, সেই জন্য ঘরের কোণে একটা বড় গামলা রাখা ছিল। বুলবুল সেখানে বসে আছে। সূর্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে দেখল, বুলবুল গলায় হাত দিয়ে। ইচ্ছে করে বমি করছে। গলগল করে বেরোচ্ছে কাঁচা রক্ত।

সূর্য কোমল ভাবে বুলবুলের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কী হয়েছে বুলবুল? তোমার বুকে ব্যথা করছে?

বুলবুল এক ঝটকায় সূর্যর হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, ছোড় দেও মুঝে-

সূর্য অবাক ভাবে চেয়ে রইল বুলবুলের চোখের দিকে। বুলবুলের দৃষ্টি উন্মাদিনীর মতন। সে চিৎকার করতে লাগল, নিকাল যাও! তু মেরা ঘরসে নিকাল যাও!

বুলবুলের অসুখ পুরনো হয়ে গেছে। এখন আর তার আকস্মিক চিৎকার শুনলে অন্য ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে আসে না। এই রাত্তিরেও কোনও কোনও ঘর থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসে। রক্ত-মাংসের উল্লাসময় যে জীবন, তা অন্য কারওর দুঃখ নিয়ে। মাথা ঘামায় না।

দৈত্যের হাতের খেলনার মতন সূর্য জোর করে বুলবুলকে কোলে তুলে নিয়ে আসে। বুলবুল ছটফট করে, সূর্যকে আঁচড়ে কামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে দিতে চায়। সেই সঙ্গে তার মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতন বেরোয় অজস্র গালাগালি। এমনকী সূর্যকে সে রেন্ডিকা বাচ্চা বলতেও দ্বিধা করে না। আশ্চর্য, যে নিজে রেন্ডি, তার কাছেও রেন্ডির বাচ্চাই একটা চূড়ান্ত গালাগাল।

পর পর কয়েক দিন বুলবুল সূর্যকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সে কিছুতেই আর সূর্যর সঙ্গে থাকতে চায় না। তার ব্যবহারে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে সে আর নিজের ভাগ্যের সঙ্গে সূর্যকে জড়াতে চায় না। সে সূর্যকে মুক্তি দিতে চাইছে। বুলবুল তো আর সূর্যর গোঁয়ারতুমির পূর্ব পরিচয় পায়নি!

দিন দশেক বাদে বুলবুলের অবস্থা আবার হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়ে। জল চিকিৎসার সেই ডাক্তার খুঁটিনাটি ব্যাপারে ভুল ধরে সূর্যকে তিরস্কার করেন। অন্য ডাক্তাররা বলেন, কাছাকাছির মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ছাড়া অন্য কেউ আর বুলবুলকে বাঁচাতে পারবে না। সূর্য আবার রাধাগোবিন্দ করের কাছে গিয়ে কাকুতিমিনতি করে তাঁকে ডেকে এনেছিল। তিনি খিটখিটে মেজাজ নিয়ে আবার এলেন, বুলবুলের সঙ্গে একটিও কথা না বলে ভালো করে পরীক্ষা করলেন-তারপর সূর্যকে বাংলাতে জানালেন, আর দিন দশেকের মধ্যে মেয়েটা এই পাপ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

সূর্যর দিকে ফিরে তিনি জ্বলন্ত চোখে বললেন, তোমারও মুক্তি!

ডাক্তার চলে যাবার পর সূর্য জিজ্ঞেস করল, বুলবুল, তোমার কী ইচ্ছে করে? তুমি কিছু খেতে চাও? তুমি কোনও জিনিস চাও?

বুলবুল আগের তুলনায় অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে। সে তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বাঙ্গালীয়া, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না!

মৃত্যুর বোধ যে কী প্রগাঢ়, তা বুলবুলকে দেখলে এখন বুঝতে পারা যায়। সব রকম অতৃপ্তি, ছটফটানি থেমে গেছে তার, সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। কয়েক দিন আগেও সে সূর্যকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তার কথা শুনলে মনে হয়, সকলে এসে মৃত্যুকে সম্মান করুক। ভয় পাবার কিছু নেই।

সূর্য বুলবুলের উষ্ণ কপালে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে বলল, তোমাকে আমি কক্ষনও ছেড়ে যাব না। আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই!

সূর্য একটু অন্যমনস্ক হতেই বুলবুল বিছানার ওপর উঠে দাঁড়াল। টলটলে পায়ে একটু হেঁটে বলল, তুমি নাচ ভালোবাসো। আমি এখনও নাচতে পারি। দেখবে?

সূর্য এক লাফে বুলবুলের কাছে এসে তার কাধ চেপে ধরে ধমকে বলল, কী হচ্ছে কী?

বুলবুল হাসতে হাসতে শরীর দোলাতে লাগল। পরক্ষণেই সূর্যর বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল হু হু করে।

সব ব্যাপারটা অতি নাটকীয় মনে হয়। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কোনও নাটক নেই।

কয়েক দিন বাদে, বুলবুলের যখন কণ্ঠস্বর পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে, সেই সময় সূর্যর একটা কথা মনে পড়ল। বুলবুল একসময় প্রায়ই বলত, সে কখনও সমুদ্র দেখেনি। গোয়ালিয়ার ছেড়ে সে বাইরেই গিয়েছে খুব কম-তবু সে পাহাড় ও নদী দেখেছে, কিন্তু

সমুদ্র দেখা হয়ে ওঠেনি। কয়েক বার সে সূর্যর কাছে আবদার করেছিল, বাঙ্গালীয়া, আমাকে একবার সমুদ্র দেখাবে?

সূর্যর মনে হল, জীবনটা শেষ হয়ে যাবার আগে, বুলবুলের এই বাসনাটা অতৃপ্ত থাকে কেন? সে কানে কানে জিজ্ঞেস করল, বুলবুল তুমি সমুদ্র দেখতে যাবে?

বুলবুল চোখ অর্ধেক খুলে বলল, সেখানে তুমি আমার পাশে থাকবে তো?

হ্যাঁ। আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব। আমি আর ভয় পাই না। কিন্তু বুকের মধ্যে বড্ড কষ্ট হয়।

সেখানে আমার অসুখ কি কমবে? ওগো, আমার বড় কষ্ট-আমার কষ্টটা একটু কমিয়ে দাও না!

এবার তোমার কষ্ট কমে যাবে। আমার বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করে! আমি জীবনে কী পেলাম? বড় কষ্ট...তুমি বুঝবে না...সত্যি সমুদ্র দেখতে পারব? তোমার পাশে দাঁড়িয়ে?

নিশ্চয়ই। সমুদ্রের ধারে কারওর অসুখ থাকে না। সেই জন্যই তো সমুদ্রের কাছে যাবার কথা বললাম।

বুলবুলের মতন সামান্য মেয়ে তখন অসামান্য চোখে সূর্যর দিকে তাকায়। সূর্যর এই স্তোকবাক্য শুনে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকের চেয়েও গভীর ভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, যদি আর একটা বছরও বাঁচতে পারতাম!

আর একটা বছর বাঁচলে বুলবুলের কোন পরমার্থ সাধিত হত, তা সূর্য জানে না। তবু সে তীব্র ভাবে চিন্তা করতে লাগল, মাত্র একটা বছর সে কোনও জায়গা থেকে ধরে আনতে পারে না? তার নিজের জীবন থেকে অনেকগুলো বছর তো সে যে-কোনও মুহূর্তেই দিতে রাজি আছে!

ট্রেনে বুলবুলকে এই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ঠাকুরসাহেবের সহায়তায় সূর্য একটা মস্ত বড় স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করল। বুলবুলকে সে বোম্বাইতে নিয়ে যাবে। গাড়ির ঝাঁকানিতে পাছে বুলবুলের কষ্ট হয়, তাই সূর্য তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে রইল। বুলবুল সূর্যর বাহু চেপে ধরে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, সত্যিই আমরা সমুদ্র দেখতে যাচ্ছি!

সমুদ্র দেখার সম্ভাবনায় সে যেন ঠিক শিশুর মতন কৌতূহলী ও খুশি।

গোয়ালিয়ার শহর ছাড়াবার আগেই বুলবুলের হেঁচকি উঠতে লাগল এবং অসম্ভব বমি। সে এখন কথাও বলতে পারছে না। শুধু ফ্যাসফ্যাসে গলায় মাঝে মাঝে বলতে লাগল, পানি, একটু পানি দাও, বড্ড তেষ্টা–অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য বুঝতে পারল, বুলবুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হাসপাতালের গেটে পৌঁছে বুলবুলকে গাড়ি থেকে নামাতেও হল না। একজন ডাক্তার তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি একটু উঁকি দিয়েই বললেন, এ তো মুর্দা হ্যায়।

সূর্যর কোলে মাথা রেখে বুলবুল একটু আগেই মারা গেছে।

সূর্য কঁধদুটো আড়ষ্ট করে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। তার ঠোঁটে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছে। যেন বুলবুলের মৃত্যুর জন্য নয়, বুলবুলকে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র দেখানো গেল না বলেই সে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

৮০. বাবাকে উত্তেজিত এবং খুশি দেখা গেল

অনেক দিন বাদে আমার বাবাকে খানিকটা উত্তেজিত এবং খুশি দেখা গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। উনি আমার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলেছেন প্রায়।

ইদানীং বাবা-মা দুজনেই আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সন্তানের জীবনের সুসামঞ্জস্য সম্পর্কে বাবা-মায়ের তো চিন্তা থাকবেই। আমাদের মতন পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে ঢোকে, তারপর চাকরি পাকা হলেই বিয়ে করে, ক্রমে সে-ও সংসারী হয়। আর একজন বাবা হয়ে গিয়ে আবার নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু আমার ব্যাপারে এটা ঠিক মিলছিল না। আমার পড়াশুনো মাঝপথে থেমে গেল, কিছু দিন কবিতাটবিতা লেখা, কিছুদিন রাজনীতি নিয়ে মেতে রইলাম–কোনওটাতেই বেশি দিন লেগে থাকতে পারি না। চাকরির ব্যাপারেও কোনও আগ্রহ নেই। দুটো-একটা টিউশানি করি, বাড়ির কাছ থেকে হাতখরচ চাইতে হয় না, এই যা।

বাবা আর মা ধরেই নিয়েছিলেন যে রেণুকে আমি বিয়ে করব–সেই জন্যই আমাকে একটা চাকরি খুঁজতে হবে মরীয়া হয়ে। কিন্তু চাকরির জন্য কখনও আমি গা করিনি এ-দিকে যখন বাবা-মা শুনতে পেলেন যে রেণুর বিয়ের জন্য ওর মা চেষ্টা করছেন। ইদানীং–তখন তারা রীতিমতন হতভম্ব হয়ে পড়লেন। আসলে, বাবা-মায়েরা তাদের যুবক সন্তানদের সম্পর্কে খুবই কম জানেন।

ইদানীং দেখতাম, বাবা প্রত্যেক দিন সকালবেলা খবরের কাগজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপনগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। সে রকম বিজ্ঞাপন অবশ্য ক্রমেই কমে আসছে। মাঝে মাঝে বাবা কোনও একটা বিজ্ঞাপনের পাশে লাল দাগ দিয়ে আমার পড়ার

টেবিলের ওপর কাগজটা ফেলে রাখতেন, কিন্তু তা নিয়ে আমি কখনও কোনও উচ্চবাচ্য করিনি। আমার বাবা নিজে কখনও চাকরিজীবনে সার্থক হতে পারেননি, এখানে-সেখানে টুকটাক কাজ করেছেন মাত্র। তবু শেষ জীবনে চাকরির ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস দেখা গেল।

অবশ্য, এর একটা কারণও ছিল। দারিদ্র্যের ছায়া আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছিল এ-সংসারে। আমরা পরের বাড়িতে থাকি। বাবার এখন নিজস্ব আর কোনও আয় নেই। একতলার দুটি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে, সেই টাকা খরচ হচ্ছে আমাদের সংসারে যদিও আইনত সে টাকা সূর্যদার প্রাপ্য। সূর্যদার পাত্তা নেই বহু দিন, ওই ঘর দু'খানা ভাড়া দেবার কথাও সে জানে না। আমার বাবার এই পরভৃতিক জীবনে সব সময় শঙ্কা লেগেই থাকে। প্রতিদিনই মনে হয়, আগামীকাল একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু বিপদ ঘটবে। শেষ জীবনটাই বা কী ভাবে কাটবে? সূর্য বাইরে কোথাও থাকে, নিয়মিত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেয়। সেই ভাবেই যদি বাইরে থেকে হঠাৎ বিক্রি করে দেয় বাড়িটা? তখন কি পথে বসতে হবে? কাটার মতন এই চিন্তাটা বাবাকে সব সময় বিদ্ধ করে।

আমার হিসেবটা ছিল অন্য রকম। সূর্যদা আর কোনও দিন ফিরবে কি ফিরবে না, তার ঠিক নেই। যদি কখনও ফেরেও, বাবা-মাকে কখনও এ বাড়ির আশ্রয়চ্যুত করবে না। কারণ, বড়বাবু নিজে আমার বাবা-মাকে ডেকে এনেছিলেন। সুতরাং বাবা-মায়ের থাকার। জায়গার জন্য কোনও চিন্তা নেই। আর কীসের চিন্তা? বড়বাবু বাবার নামেও কিছু টাকা রেখে গিয়েছেন উইলে, ঠিক কত আমি জানি না-সাত হাজার বা দশ হাজার। এ ছাড়া বাবার একটা ইনসিয়োরেন্স ও মায়ের কিছু গয়না আছে-এ দিয়ে ওঁদের বাকি জীবনটা চলে যাবে। দিদি বিয়ের পর এখন বেশ ভালোই আছে, পর পর দুটি সন্তান হবার পর মাথার গোলমাল একেবারে সেরে গেছে। বাকি রইলাম আমি। আমি পৃথিবীর ভিড়ে মিশে যাব-আমার জন্য কারোকে ভাবতে হবে না। তা ছাড়া আমি তো এ-দেশে থাকছিই না।

বাবা নিজেই একটি চাকরির দরখাস্ত টাইপ করে এনে আমাকে বললেন, সই করে রাখ। সার্টিফিকেটগুলোও গুছিয়ে রাখিস। সন্ধ্যাবেলা তোকে নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে নিয়ে যাব।

নিকুঞ্জবাবু কে?

বাবা বললেন, দাদার বাড়িতে পূর্ণবাবু বলে একজন কাজ করত তার কথা তোর মনে আছে তো? সেই পূর্ণবাবুই নিকুঞ্জবাবুর সন্ধান দিলেন। পূর্ণবাবুর ছেলের চাকরি ও-ই করে দিয়েছে। নিকুঞ্জবাবুর হাত দিয়ে অনেক ছেলের চাকরি হয়েছে রেল কোম্পানিতে।

রেল এখন আর কোম্পানির নেই, সরকারের-তবু সেকথা পুরনো লোকদের মনে থাকে না। রেলের চাকরি এখনও নাকি দারুণ লাভজনক। বাবা যে চাকরির সন্ধান এনেছেন, সেটা কেরানিগিরি-কিন্তু উপরি আছে, তা ছাড়া আরও কত সুবিধে।

বাবার মুখের ওপর কিছুনা বললেও মাকে গিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বাবা এসব কী শুরু করেছেন? এ-চাকরি আমি কিছুতেই করব না।

মা শুনে একেবারে আঁতকে উঠলেন। করবি না কী? আজকাল কেউ মাথা খুঁড়েও চাকরি পায় না আর এমন সোনার চাকরি তুই

সোনার চাকরি না ছাই! একটা কেরানিগিরি কি আমি নিজে চেষ্টা করলেও জোগাড় করতে পারতাম না?

পারলি কোথায়? এতদিন তো দেখলাম–

আমি কেরানিগিরি করতে চাই না।

কেরানিগিরি আবার কী? একশো সাতান্ন টাকা মাইনে হলেও নিকুঞ্জবাবু বলেছেন, মাস গেলে সাত-আট শো টাকা হাতে আসে।

এটা চাকরি, না চুরির ব্যবসা?

বাজে কথা বলিস না। আজকাল সবাই এই করে। তা ছাড়া, রেলের পাস—পাবি মা-বাবার জন্যও পাস দেয়-কোথাও তো কখনও বেড়াতে যাইনি-কতকালের ইচ্ছে একবার হরিদ্বার ঘুরে আসব।

মা, আমি তোমাকে একদিন না একদিন ঠিক হরিদ্বার ঘুরিয়ে নিয়ে আসব, কিন্তু তুমি আমাকে এ-চাকরি নিতে বোলো না!

মা আর কথা না বলে কাঁদতে বসলেন। কান্নার কাছে আর কোনও যুক্তি নেই। মায়ের কান্নার সময় যত রাজ্যের পুরনো কথা মনে পড়ে। কেন তার এই পরিবারে বিয়ে হয়েছিল, সেই আপশোস থেকে শুরু করে, কেন তার আজও মরণ হল না-এইখানে এসে থামে। আমি চুপ করে বসে রইলাম। কান্নার মধ্য দিয়ে মা এই কথাও জানালেন যে, আমি যদি বাবার সঙ্গে নিকুঞ্জবাবুর কাছে না যাই, তা হলে বাবা ভীষণ দুঃখ পাবেন মনে। একেই তো ওঁর শরীর আর মন দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে। তা ছাড়া নিকুঞ্জবাবুকে এক হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে-কত কষ্ট করে সেই টাকা জোগাড় করেছেন-।

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা দুটি ব্যাপারে বাঁধা পড়ে যায়। এইসব পরিবারের মেয়েরা যতই প্রগতিশীলা হোক, বিয়ের সম্বন্ধের সময় মেয়ে-দেখার আসরে তাকে হাজিরা দিতেই হয়। তার কোনও আপত্তিই টেকে না। বরপক্ষের লোকের সামনে তাকে একবারনা-একবার সং সেজে দাঁড়াতেই হবে, না হলে তার মা বাবা যে মনে দুঃখ পাবেন।

ছেলেদের ব্যাপারেও তাই। বাবা যদি নিজে থেকে কারোকে ধরাধরি করে ছেলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেন, ছেলেকে সেখানে একবার অন্তত যেতেই হবে। না হলে মা-বাবার মনে দুঃখ দেওয়া হয়।

মায়ের কান্না থামাবার জন্য আমাকে রাজি হতেই হল। নিকুঞ্জবাবু নামক লোকটিকে একবার অন্তত চোখে দেখবার লোভও আমি সামলাতে পারলাম না। লোকটি এক হাজার টাকা ঘুষ চায় চাকরি করে দেবার জন্য? গল্পেটল্পে এইসব লোকের কথা পড়েছি, কিন্তু সত্যি সত্যি কি এ রকম কেউ থাকে? এরা কী রকম মানুষ! বাইশ-তেইশ বছরেও ন্যায়-

নীতি সতোর ওপর অগাধ বিশ্বাস থাকে। কোনও মানুষকেই কিছুতেই ঠিক অসৎ বলে মানতে ইচ্ছে করে না।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ি বন্ডেল রোড দিয়ে গিয়ে একেবারে রেললাইনের ধারে। বাড়িটি দোতলা এবং নতুন। ইনিও রেলের কেরানি-নতুন বাড়ি বানিয়েছেন। সে বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবা আমাকে সপ্তম বার মনে করিয়ে দিলেন যে নিকুঞ্জবাবুকে দেখামাত্রই যেন আমি প্রণাম করি। কারণ, উনি ব্রাহ্মণ। বড়বাবুর প্রভাবে বাবা একসময় অনেকখানি সংস্কারমুক্ত হয়েছিলেন-এখন বার্ধক্যের দুর্বলতায় আবার সব মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিকুঞ্জবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, এ হে হে, আপনারা বড় দেরি করে ফেললেন। সাড়ে ছ'টার সময় আসতে বলেছিলাম আপনাকে।

বাবার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। তখন সাতটা বাজতে দশ। বাবা শুকনো গলায় বললেন, এ-দিককার বাস এত দেরি করে আসে-তার ওপর আবার জ্যাম-

একটু আগেই আর একজন এসেছিল, তার একেবারে কান্নাকাটি করার মতন অবস্থা।

কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলেন-

ঘরে সোফাসেট ছিল, কিন্তু নিকুঞ্জবাবু আমাদের বসতে বলেননি। মানুষটি বেঁটে ও রোগা-খুবই ছোটখাটো চেহারা, শরীরের তুলনায় মুখখানা আরও ছোট্ট মনে হয়। আমি ওঁর মুখখানা তন্ন তন্ন করে দেখতে চাইছিলাম, কিন্তু উনি কারওর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারেন না। এইসব মানুষ রাস্তায়ঘাটে খুবই অকিঞ্চিৎকর, ভিড়ের মধ্যে নগণ্য, পৃথিবীতে এদের ভূমিকা সম্পর্কেই সংশয় জাগে। সেই জন্যই এরা নানা রকম ষড়যন্ত্র ও পাঁচ কষে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। আমার বাবার মতন একজন মানুষকে কৃপাপ্রার্থী করতে পেরেছেন তো!

বাবা আমার দিকে বার বার চোখের ইশারা করছিলেন ওঁকে প্রণাম করার জন্য। আমি বাবার দিকে আর না তাকিয়ে একটা সোফায় বসলাম। তখন নিকুঞ্জবাবু বাবাকে বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না।

বাবা বিগলিত ভাবে বললেন, আপনি আমার ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন, এই যে আমার ছেলে–

নিকুঞ্জবাবু আমার দিকে তাকালেন না। কিংবা উনি আমাকে আগেই দেখে নিয়েছেন। বাবাকে বললেন, আপনাকে কথা দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটু আগে আর একজন এসে পড়ল–সে আবার আমার ভায়রাভাইয়ের বন্ধুর ছেলে, এমন কান্নাকাটি করতে লাগল–।

বাবা বোধহয় চিন্তা করতে লাগলেন, তিনিও কান্নাকাটি করবেন কিনা। একটু ধরাধরা গলায় বললেন, আমি অনেক আশা করে এসেছিলুম–

তা তো ঠিক। কিন্তু একটা মাত্র পোস্ট খালি আছে। সেই কথাই তো চিন্তা করছি–

পূর্ণবাবু আমাকে বলেছিলেন, আপনি ইচ্ছে করলে ঠিকই পারেন। দরখাস্ত টরখাস্ত সবই নিয়ে এসেছি। বাদল, বার কর না।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। নিকুঞ্জবাবু এবার আমার দিকে একপলক তাকালেন। তারপর বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের বিয়ে দিয়েছেন?

আজ্ঞে না। একটা চাকরি বাকরি না জুটলে–

আপনার তো এই একটিই ছেলে। বিয়ে দেবেন না? আমার হাতে ভালো সম্বন্ধ আছে–

নিকুঞ্জবাবুর কথার মধ্যে কোনও রকম ভদ্রতা সভ্যতার সম্পর্ক নেই। নিছক চাচাছোলা কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কোনও কথাই উনি জানেন না। পৃথিবীতে আছে এই রকম

এক ধরনের মানুষ, যারা চাকরি বা ব্যবসা, বাড়ি বানানো, ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না।

বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার সামনে ওই বিয়ের প্রসঙ্গটা তোলা একেবারেই ঠিক হয়নি। সেই জন্যই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন।

বাবা বললেন, আপনার বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন শুনছিলাম? পূর্ণবাবু বলছিলেন...

হ্যাঁ। মন্দির মানে কী, তিনতলায় একটা ঠাকুরঘর করে রাধামাধবের প্রতিষ্ঠা করব- আমাদের বংশের বিগ্রহ, এখন পড়ে আছে আমার ছোটকাকার কাছে। কিন্তু বাড়িটার দোতলা তুলতেই সব পয়সা খরচ হয়ে গেল। তাই লোকের কাছে চেয়েচিন্তে যদি জোগাড় করে ঠাকুরঘরটা তুলতে পারি-একটা ভালো কাজ তো, লোকে দেয়ও

তা তো বটেই, তা তো বটেই। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করবেন-এ রকম একটা ভালো কাজ উপলক্ষে সবাই যথাসাধ্য দেবে

কেউ কেউ দিচ্ছে–

আমিও এনেছিলাম হাজারখানেক–

নিকুঞ্জবাবু এবার একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মনে হল। আমার দিকে আবার একপলক তাকিয়ে বললেন, তা আপনাদের শুভেচ্ছায় যদি ঠাকুরের একটা জায়গা হয়-শুনুন, আপনার ছেলের চাকরি হয়তো হয়ে যাবে, তারপর ছেলের বিয়ে দেবেন।

বিয়ের কথা তো এখনও কিছু ভাবিনি–

ভাবুন, এখন থেকে ভাবুন বাবার জন্য আমার কষ্ট হতে লাগল। বাবা খুবই অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। এই লোকটিকে আমার সামনেই ঘুষ দিতে যে তিনি মরমে মরে যাচ্ছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদিকে, বাবা কিংবা মা ঘুণাক্ষরেও জানেন না যে,

আমার বাইরে চলে যাবার ব্যাপারে অনেকখানি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি।

নিকুঞ্জবাবু বললেন, ঠিক আছে, কাল ঠিক দশটায় ছেলেকে নিয়ে আসুন অফিসে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। আমেরি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। আর একটা কথা। আপনিও বামুন, আমিও বামুন। আমেরি সাহেবকে বলব, এ-ছেলেটি আমার ভাইপো। ভেরি নিডি। চাকরি না হলেই নয়। আমেরি সাহেব যখন কিছু জিজ্ঞেস করবেন, তখন আপনার ছেলে যেন আমার ভাইপো হিসেবেই পরিচয় দেয়। ভাইপো ইংরেজি জানে তো?

সেই মুহূর্তে আমি কী করছিলাম, তা জানতে পারলে নিকুঞ্জবাবু আঁতকে উঠতেন। সোফার পাশেই জানলার বেদিতে আমি একটা ব্লেড পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। সেখানে কে এবং কেন ওই ব্লেডটা ফেলে রেখেছে, আমি তা জানি না। কিন্তু ওটা দেখেই আমার কল্পনাশক্তি বেড়ে যায়। ব্লেডটা একসময় চলে এসেছে আমার হাতে। সম্প্রতি আমি ব্লেডটা দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে দিচ্ছিলাম নিকুঞ্জবাবুর সোফার গদি। তবু আমার রাগ কমছিল না। আমি মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, ঘুষের টাকায় নিকুঞ্জবাবুর তিন তলায় ঠাকুরঘর যে-দিন উঠবে-সে-দিন যে-কোনও উপায়ে এসে আমি লাথি মেরে ওর ঠাকুরকে উলটে ফেলে দিয়ে যাব।

ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বাবা আমাকে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, চাকরি শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, না রে? কাল সকালে যখন যেতে বললেন-

আমি নীরস গলায় বাবাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি টাকাটা ওকে দিয়ে দেননি তো?

না। কেন?

কাল সকালে আমি যাব না!

যাবি না? কী বলছিস কী, যাবি না?

না। এ-চাকরি আমি করব না।

বাবার সঙ্গে আমি কোনও দিন ঝগড়া করিনি, মুখে মুখে তর্কও করিনি। সেই প্রথম। আমার বাবা পৃথিবীর সব মানুষকে যেমন ভয় পান, সেই রকম আমাকেও ভয় পান। আমার শান্ত বিদ্রোহ দেখে তিনি রেগে উঠলেন না। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন শুধু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তা হলে আমাকে এতদূর নিয়ে এলি কেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

বাস এসে গেছে। আমি হাত দেখিয়ে বাস থামালাম। বাবা উঠে পড়ার পর আমি বললাম, আপনি যান, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

বাস ছেড়ে দিয়েছে বলে বাবা আর নামতে পারলেন না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

আমার ইচ্ছে করছিল আবার নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে ফিরে যেতে। আমার শরীর রাগে জ্বলছিল। কিন্তু আমার রাগ বেশি হলেও মারামারি করার অভ্যাস নেই আমার। আমি হঠাৎ অন্ধের মতন ছুটে গিয়ে কারোকে আঘাত করতে পারি না। একা একা নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমি কী বলব?

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। বাড়ি ফিরে আবার মায়ের কান্নাকাটির সম্মুখীন হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। সমস্ত পৃথিবীর ওপর ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

টো-টো করে বহুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায় রাস্তায়। যেন আমি শেষ বার কলকাতা শহরটাকে দেখে নিচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। আমি আর এখানে থাকব না, আমার কথা কেউ মনেও রাখবে না।

হাজরার মোড়ে এসে একজন মহিলাকে দূর থেকে দেখে বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। মহিলার হাতে দু-তিনটে জামাকাপড়ের প্যাকেট, কোনও রকমে হাত তুলে ট্যাক্সি

থামাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন। দীপ্তিদি না? হ্যাঁ, দীপ্তিদিই তো। দ্রুত এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

দীপ্তিদিকে দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠবার কারণ কী? জানি না। তবু কী রকম যেন একটা দুঃখ মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। দীপ্তিদি যেন আমার অনেক দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। আমার তো না, সূর্যদার। অথচ, মনে হয় যেন আমারও।

দীপ্তিদি সেই রকম আগেকার মতন সুন্দর আছেন। বয়স বাড়লেও এক একজন নারীর রূপ অম্লান থাকে। খুব সাধারণ সাজগোজেও কী অপরূপ লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছে দীপ্তিদিকে। দীপ্তিদির পা দু'খানাও সুন্দর বার বার তাকাতে ইচ্ছে করে।

দীপ্তিদি।

আরে, বাদল না? কী খবর তোমার?

আপনি কলকাতায় কবে এলেন। আপনি তো জলপাইগুড়িতে থাকতেন।

কয়েক মাস ধরে কলকাতাতেই আবার চলে এসেছি।

সেই বাড়িতেই আছেন? আপনার হাতে এতগুলো প্যাকেট, দিন না, আমি ধরছি, পৌঁছে দিচ্ছি আপনার বাড়িতে।

না, বাদল, আমি সে বাড়িতে থাকি না। তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না, আমি ট্যাক্সি নেব। আমি এখন থাকি বালিগঞ্জ প্লেসে, একদিন এসো আমার বাড়িতে।

ট্যাক্সি ডেকে দেব আমি?

এই সময় আর একজন লোক এসে দীপ্তিদির হাতে একটা বিস্কুটের টিন দিয়ে বললেন, এটা ধরো। ট্যাক্সি পেলে না এখনও? ট্যাক্সি দাঁড় করাও, আমি আসছি, আর একটা জিনিস বাকি আছে।

লোকটিকে আমি চিনতে পেরেছি। ইলেকশানের দিন দেখেছিলাম, সেই শংকর বোস। একসময় সূর্যদাদের দলে ছিলেন, এখন কংগ্রেসের বড় ওয়াকার। ইলেকশানের সময় খুব নাম করেছেন। শুনেছি, কাশীপুরের বাই-ইলেকশানে উনি নিজেই এবার দাঁড়াবেন। জিতলে নির্ঘাত মন্ত্রী হবেন–এ রকম জোর গুজব। দীপ্তিদি শংকর বোসের সঙ্গে যাবেন।

আমি দৌড়োদৌড়ি করে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালাম। দীপ্তিদি জিনিসপত্র নিয়ে তার মধ্যে উঠে বসে বললেন, তুমি কোন দিকে যাবে, বাদল? তোমাকে নামিয়ে দিতে পারি।

না, আমি অন্য দিকে।

ট্যাক্সির পাশ থেকে সরে এসেছিলাম। আবার ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দীপ্তিদি, আপনি সূর্যদার কোনও খবর জানেন?

দীপ্তিদি ভারী নরম ভাবে তাকালেন আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমিও তোমাকে সেই কথাটা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। কেন, সূর্য কলকাতায় নেই বুঝি?

না, সূর্যদা তো অনেক দিন কলকাতায় নেই। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন– চিঠিও লেখেন না। আপনাকে চিঠি লেখেননি?

না–আমাকে লিখবে কেন?

দীপ্তিদি আর কোনও কথা না বলে মুখটা নিচু করলেন। দীপ্তিদি আমাকে ছেলেমানুষ ভাবেন। তাই আমার কাছে কিছু বলবেন না। উনি যেন সূর্যদাকে ভুলেই গেছেন, এই রকম ভাব দেখালেন। অথচ আমি তো সব জানি। এই সময় শংকর বোস এসে গেলেন, আমার দিকে একপলক তাকালেন, চিনতে পারলেন না। আমি সরে দাঁড়ালাম। আর কোনও কথা হল না, ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

৮১. জাহাজ ছাড়বে কোচিন থেকে

জাহাজ ছাড়বে কোচিন থেকে। পঙ্কজকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একদিন আমার প্যাসেজ বুক করে এলাম। পঙ্কজকে সব কথা খুলে বলতেই হয়েছে। একা একা সবকিছুর ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যাতীত হয়ে উঠছিল। অন্তত আলোচনা করার জন্যও তো একজন কারোকে দরকার। রেণু এখন থিয়েটার নিয়ে খুব ব্যস্ত।

পঙ্কজের সঙ্গে কিছু দিন আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর পঙ্কজের সঙ্গে আর দেখাই হত না। পঙ্কজ ভালো ছাত্র হিসেবে খুব সুনাম করেছে, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে ঘুরে বেড়ানোকে সে বাজে সময়। নষ্ট বলে মনে করে। আগেকার তুলনায় পঙ্কজ এখন অনেক গম্ভীর। অন্যান্য সঙ্গীদের হারিয়ে আমাকে আবার আমার এক বাল্যবন্ধুর কাছেই ফিরে যেতে হল।

পঙ্কজ প্রথমে আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই উড়িয়ে দিয়েছিল ছেলেমানুষি বলে। ধমক দিয়ে বলেছিল, বোকার মতন এম. এ.-টা কমপ্লিট করলি না কেন? তা হলে কোনও কলেজে লেকচারারের কাজ পেয়ে যেতিস। বিদেশে গিয়ে কী হাতি ঘোড়া হবে?

কিন্তু আমার কাছে বিদেশযাত্রা মানে শুধু জীবিকার্জন নয়। আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যেই রয়েছে আমার মুক্তির পথ। এই বদ্ধ গণ্ডি ভেঙে আমাকে বেরোতেই হবে।

পঙ্কজ ইচ্ছে করলেই একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে অন্য দেশে পাড়ি দিতে পারত। কিন্তু পঙ্কজ বিদেশ-বিমুখ। আমাকে আবার বলল, অন্য দেশে গিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে থাকতে তোর ভালো লাগবে? আমি তো ভাবতেই পারি না।

আমি বললাম, কোনও একটা দেশেই আমি বেশি দিন থাকব না। ঘুরে ঘুরে বেড়াব। নাগরিকত্ব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এখানেই বা কী ভালো আছি?

বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর সঙ্কজ আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল। পঙ্কজের মাথা ঠান্ডা, সে সব দিক চিন্তা করতে পারে। কোনও রকম কাজকর্ম না জুটিয়ে হঠাৎ জার্মানি চলে যাওয়ার প্রস্তাবটা ও বাতিল করে দিল প্রথমেই। অজানা অচেনা দেশে ও রকম ভাবে গিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি অবশ্য বলেছিলাম যে, আমি দরকার হলে কুলিগিরি করতেও পারব। পঙ্কজ হেসে উঠেছিল সেই কথা শুনে। বলেছিল, এ তো আর কলকাতা শহর নয় যে, যে ইচ্ছে সেই এসে যা খুশি করবে! ও-সব দেশে কুলিগিরি করতে গেলেও সরকারের অনুমতি লাগে। আর, নিজেকে চিনতে শেখ। দরকার হলে যারা কুলিগিরিও করতে পারে, তারা অন্য টাইপের মানুষ। তুই পারবি না। তুই না খেয়ে কিংবা অভিমান করে মরবি।

পঙ্কজ বলল, প্রথমে আমার ইংলন্ডে যাওয়া উচিত। ওখানে বিষ্ণু আছে, তার কাছে। থাকতে পারব কয়েক দিন। বিষ্ণু অনেক রকম সাহায্য করতে পারবে, দরকার হলে জার্মানিতে চিঠিপত্র লিখে কাজের ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। মোট কথা, দেশের বাইরে গিয়ে প্রথমেই অকূল পাথারে পড়ব না।

এই উপায়টিই যে যুক্তিসঙ্গত, তা মেনে নিতেই হয়। তবে, একটা জিনিস আমি দৃঢ় ভাবে ঠিক করে রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডে আমি কিছুতেই থাকব না। ইংরেজ জাতটার ওপর আমার জাতক্রোধ রয়ে গেছে, ওদের কাছে গিয়ে কোনওক্রমেই কৃপা চাইব না। যদি প্রচুর টাকা নিয়ে বেড়াতে যেতে পারতাম, সে আলাদা কথা।

বিষ্ণুকে চিঠি লেখার পর অতি দ্রুত উত্তর চলে এল। বিষ্ণুর দারুণ উৎসাহ। বিষ্ণু ইদানীং ওর সব চিঠিতেই ক্যারল নাম্নী একটি মেয়ের কথা লেখে। সেই ক্যারল নাকি ওর কবিবন্ধুকে দেখার জন্য দারুণ এক্সাইটেড। আমি যেন ক্যারলের জন্য খাঁটি দার্জিলিং পিকো চা নিয়ে যাই কয়েক পাউন্ড।

পঙ্কজের চেষ্টাতেই একটা কারগো জাহাজের টিকিট কাটা হল সস্তায়। পঙ্কজের সাহায্য না পেলে পাসপোর্টও অত সহজে হত না। পঙ্কজরা কলকাতার পুরনো লোক, অনেক

রকম জানাশুনো। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং পুলিশ বিভাগে ছড়িয়ে আছে। সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করার জন্য আমার পুলিশ ভেরিফিকেশনে গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আর একজন বাদল মুখার্জির সন্ধান পাওয়া গেল যে বরানগরের বাসিন্দা এবং দু' বছর জেল খেটেছে। পুলিশ এই দুই বাদল মুখার্জির রেকর্ড গুলিয়ে ফেলেছিল, আমার নামে ছিল জেল খাটার অভিযোগ–পঙ্কজের এক পুলিশ আত্মীয়ের সহায়তায় সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ায় আমার অন্য অসুবিধেগুলোও দূর হয়ে যায়। দুর্বল গণতন্ত্রের স্বভাবই এই, যার ঘুষ দেবার ক্ষমতা আছে কিংবা ওপর মহলে চেনাশুননা আছে, তার কোনও ব্যাপারেই কোনও অসুবিধে হয় না।

আমাকে টাকা খরচ করতে হচ্ছিল টিপে টিপে। রেণুর টাকাটা এখনও ছুঁইনি। টিউশানির টাকা থেকে জমিয়ে জমিয়ে ন'শো টাকা পুঁজি করেছিলাম বইটই বিক্রি করে আরও দু'শো টাকা জুটল। পঙ্কজ ধার দিয়েছে সাতশো টাকা, খড়্গপুরে ভাস্করের কাছে চিঠি লিখে আরও পাঁচশো টাকা পাওয়া গিয়েছিল। লন্ডনে যখন নামব, তখন আমার হাতে কয়েক পাউন্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকবে।

পঙ্কজ টাকা বাঁচাবার আর একটা ব্যবস্থা করে দিল। কারগো জাহাজ ঠিক নির্দিষ্ট দিনে নাও ছাড়তে পারে। তা হলে আমাকে কোচিনে কয়েক দিন হোটেলে থাকতে হবে। পঙ্কজের এক জামাইবাবু থাকেন মহীশূরে, বিরাট চাকরি করেন, একটা ওষুধ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার। আমি জাহাজ এর কয়েক দিন আগেই মহীশূরে গিয়ে পৌঁছোব। জামাইবাবুকে অফিসের কাজে প্রায়ই গাড়ি নিয়ে উটকামন্ড, এনাকুলাম যেতে হয়। উনি ঠিক দিনে আমাকে কোচিনে জাহাজে তুলে দেবেন। একজন চেনা কেউ জাহাজে ওঠার সময় আমার পাশে থাকবেন, এটা ভেবে আমি একটু ভরসা পাই। কখনও একা একা দূরে কোথাও যাইনি।

আর আট দিন পরে যাত্রা। বাড়ি ফিরেই শুনলাম, রেণু এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। মা বললেন, এইমাত্র তো গেল, তোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়নি?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

প্রায় এক ঘণ্টা বসে ছিল বেচারা।

কোনও দরকার ছিল?

তিনখানা টিকিট দিয়ে গেছে আমাদের। ও কী একটা থিয়েটার করছে, আমাদের সবাইকে বিশেষ করে যেতে বলেছে। তার বাবা যাবে কি না জানি না, তুই আমাকে নিয়ে যাবি তো?

আমি কার্ডটা দেখলাম। যে-দিন রেণুদের থিয়েটার, তার আগের দিনই আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপব। রেণু যখন মঞ্চের ওপর কৃত্রিম কাহিনীর দুঃখের দৃশ্য কাঁদবে, সেই সময় আমি দু-তিনটে প্রদেশ পার হয়ে গেছি।

খুব উৎসাহ দেখিয়ে মাকে বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, রেণুরা যে নাটক করছে, তুই নেই তার মধ্যে? তুই কিছু করছিস না?

মা ধরেই নিয়েছিলেন, আমাকে বাদ দিয়ে রেণু কখনও কিছু করতেই পারে না। অনেকগুলো বছর ধরে এই রকমই হয়ে আসছে।

মায়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। এখনও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। মায়েদের কী একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, যাতে, সন্তানের মিথ্যে কথা অনায়াসেই ধরে ফেলতে পারে।

অবহেলার সুর ফুটিয়ে বললাম, আমাকে অনেক করে ধরেছিল, কিন্তু আমার একদম সময় নেই। মাঝে মাঝে রিহার্সালে যেতে হয় অবশ্য।

সময় নেই? কী এমন রাজকার্য করছিস?

খাবার দাও না, খিদে পেয়েছে। খুব কড়াইশুটির কচুরি খেতে ইচ্ছে করছে।

ইচ্ছে করছে তো দোকান থেকে কিনে নিয়ে আয়!

কেন, তুমি বানাতে পারবে না? আগে তো বানাতে–

আহা-হা! বললেই হল কিনা!

একমাত্র খাবারের কথা তুলেই মাকে অন্যমনস্ক করে তোলা যায়। আমি কিছু খেতে চাইলে মা শত অসুবিধে সত্ত্বেও সেটা করে দেবেনই। বাড়ির বেকার ছেলে সাধারণত খাবারদাবারের জন্য বায়নাক্কা করতে লজ্জা পায়। আমারও লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কয়েক দিন ধরে আমি ছোট ছেলের মতন আদুরে স্বভাবের অবুঝ হয়ে উঠছি। নিজে মনে মনে বুঝতে পারলেও দমন করতে পারি না। আমার যা যা প্রিয় খাবার, তা এক এক দিন এক একটা তৈরি করে দেবার জন্য আবদার তুলছি। এখন চালতা পাওয়া যায় না। তবু আমি কয়েক দিন ধরে চালতার ডালের কথা বলায়-মা শিয়ালদা বাজারে বাবাকে পাঠিয়ে চালতা খুঁজে আনিয়েছেন। আমি নির্লজ্জের মতন সেই ডাল এক বাটি খেয়ে আর এক বাটি চেয়েছি।

এইসব খাবার খেয়েও ঠিক তৃপ্তি হয় না, মনটা বিষাদে ভরে যায়। বার বার মনে হয়, আমি চলে যাব। আমি আর সারা জীবনে কখনও চালতার ডাল খাব না। অন্তত মায়ের হাতের রান্না আর খেতে পাব না। যদিও আমার চলে যাওয়া মানে চিরবিদায় নয়, তবু এই রকম মনে হয়।

ভেতরে ভেতরে আমার অসম্ভব উত্তেজনা, তবু বাইরে সেটা লুকিয়ে রাখার জন্য আমি সদাসতর্ক। একটু এদিক-ওদিক হলেই মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাব। তবু মা মাঝে মাঝে

আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকান। কিছু সন্দেহ করেছেন কি? কিংবা আমারই চোখের ভুল।

প্রস্তুতি চলছে অত্যন্ত গোপনে। একটা সুটকেস কিনে পঙ্কজের বাড়িতে রেখেছি। প্রভাস জামাইবাবু যে ওভারকোটটা দিয়েছিলেন, সেটাও একদিন সরিয়ে দিয়েছি পঙ্কজের সঙ্গে। পাসপোর্ট টাসপোর্ট কিছুই বাড়িতে আনিনি। একটা সুটও করাতে হয়েছে। গরম গেঞ্জি, গ্লাভস, ড্রয়ার অন্যদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে জোগাড় হয়েছে। আমার মধ্যে এখনও বাঙালত্ব রয়ে গেছে, কী কী বিছানাপত্তর নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম– পঙ্কজ খুব ঠাট্টা করেছে তাই নিয়ে। বিলেতে কেউ বেডিং নিয়ে যায়, শুনেছিস? বাঙাল কোথাকার!

রেণুর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছে। প্রতিদিন একখানা করে চিঠি বিনিময় হয়। কোনও কোনও দিন রেণু একসঙ্গে দুটো চিঠিও লেখে। চিঠিগুলো ডাকে আসে, অনেক দিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি। যাবার আগে রেণুর সঙ্গে দেখা না করে চিঠিতেই সব কথা জানিয়ে যাব ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু সেই চিঠিটা আর কিছুতেই মনঃপুত হয় না। অনেক বার লিখে লিখে ছিঁড়ে ফেলতে হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, খুব সংক্ষিপ্ত চিঠিতেই আসলে সবচেয়ে বেশি কথা বলা যায়। রেণু, আমি চলে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে। ভালো থেকো। ইতিবাদল।

একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের পৃষ্ঠার ঠিক মাঝখানে এই তিন লাইনের চিঠিটা লিখে ফেললাম। বেশ পছন্দ হল। ভালো দেখাচ্ছে। রেণু সব বুঝতে পারবে। রেণুকে আমার মনের সব কথা খুলে বোঝাতে হবে কেন? ওর তো নিজে নিজে বুঝে যাওয়া উচিত।

অনেক স্থির সিদ্ধান্তই দু'-এক মুহূর্ত পরে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। চিঠিখানা লিখে, স্ট্যাম্প সেঁটে ডাকে ফেলার জন্য তৈরি হবার পরও আমি অন্ধের মতন ছুটে গেলাম মল্লিকাদের। বাড়ির সামনে। যেখানে রেণুদের নাটকের রিহার্সাল হবার কথা। সেখানে ওরা নেই। আজ ওদের স্টেজ রিহার্সাল হচ্ছে স্টার থিয়েটারে। রাস্তা পেরিয়ে চলে এলাম স্টার থিয়েটারে। যেন

আর এক ঘণ্টা বা দু ঘণ্টাও অপেক্ষা করা চলবে না–এই বিশেষ মুহূর্তেই রেণুর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

দেবুদা আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এই যে ভাই, আপনি এসে গেছেন। খুব ভালো হয়েছে। আপনি গোটা নাটকটা দেখে একটু অনেস্ট ওপিনিয়ান দিন তো! মনরাখা কথা বলবেন না, অনেস্ট ওপিনিয়ান চাই কিন্তু। যদি কিছু সাজেশান থাকে

দেবুদা ভাড়ে চা খাচ্ছিলেন। একজন কাকে ডেকে বললেন, এই বাদলবাবুকে চা দে রে!

দেবুদার সঙ্গে মাঝে দু-তিন বার দেখা হয়েছে। প্রত্যেক বারই ওঁর ব্যবহারে অতিরিক্ত খাতিরের ভাব থাকে মনে হয়। ওঁর বন্ধুর ছোটভাই হিসেবে আমাকে এতটা। মূল্য দেবার তো কোনও কারণ নেই। তা হলে, উনি আমাকে নিয়েছেন রেণুর বন্ধু হিসেবে। উনি আমাকে রাগাতে চান না। অত্যন্ত চতুর লম্পটরা এ রকম হয়।

এসব বুঝেও আমি অসহায়। কেউ বেশি খাতির করলেই আমি অতি বিনয়ে একেবারে বিগলিত হয়ে যাই। মুখ দিয়ে একটাও সত্যি কথা বেরোয় না। আমি বললাম, আপনার নাটক তো দুর্দান্ত হচ্ছে, আমি যেটুকু রিহার্সাল দেখেছি...

উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে রেণু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল মঞ্চের ওপর উঠে আসার জন্য। তখন বিরতি চলছে। অডিটোরিয়ামে কয়েক জন লোকের সঙ্গে দেবুদা গল্প করায় ব্যস্ত। মঞ্চটা ফাঁকা।

আমি একটু লজ্জিত ভাবে এদিক-ওদিক তাকালাম। আমি ওপরে উঠে গেলে কেউ কিছু মনে করবে না তো! পরমুহূর্তেই সাহস সঞ্চয় করে ওপরে উঠে এলাম।

রেণুকে রাজেন্দ্রানীর মতন দেখাচ্ছে। রেণুকে আমি বেশি সাজগোজ করতে কখনও দেখিনি। নাটকে জমিদার-দুহিতা সেজেছে বলেই এত জমকালো পোশাক। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, কখন এসেছ?

অনেকক্ষণ। তোমাদের অভিনয় দেখছিলাম। নাটকটা সত্যিই খুব দারুণ হচ্ছে- মানে, সকলেরই বেশ ভালো-অ্যামেচার গ্রুপ হিসেবে এত ভালো প্রোডাকশান-

বেশ কয়েক মিনিট আমি নাটক সম্পর্কে কথা বলে গেলাম।

রেণু বলল, কার্ড দিয়ে এসেছি। মাসিমা, মেলোমশাই আসবেন তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবেন। মায়ের তো দারুণ আগ্রহ-শোনো তোমরা খবরের কাগজের লোকদের কার্ড দিয়েছ? 'পরিচয়' পত্রিকায় আমার এক বন্ধু আছে, তাকে বলে দিতে পারি-

আমার ঔদাসীন্য দেখে রেণু যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই জন্যই আমি বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম। যদিও আমার বুকটা ঈর্ষায় হা হা করে জ্বলে যাচ্ছিল। সেই ঈর্ষার কী প্রচণ্ড উত্তাপ! কোনও ব্যক্তিবিশেষকে নয়, এমনকী দেবুদাকেও নয় সমগ্র নাট্যজগৎকে আমি ঈর্ষা করছিলাম-কেন তারা রেণুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে? যাবার আগে কয়েকটা দিন কি রেণুকে আমার সর্বক্ষণের জন্য পাওয়া উচিত ছিল না? ঠিক এই সময়েই রেণুকে নাটকের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে? তবু আমার মুখে হাসি মাখানো।

নাটকের কথায় রেণু আনন্দ পাচ্ছিল। ওর বাড়ির দমবন্ধ পরিবেশ থেকে একটু মুক্তির জন্য রেণু যেন এই নাটকটাকে পেয়েছে।

পরের সিন কখন আরম্ভ হবে?

রেণু হেসে বলল, একটু দেরি আছে। একটা বন্দুকের শব্দ করতে হবে-কিছুতেই শব্দটা ঠিক হচ্ছে না।

আমি বললাম, আচ্ছা, স্টেজের পাশে কোথাও একটা গ্রিনরুম থাকে না? আমি কখনও দেখিনি। ঘরটা কি সত্যিই সবুজ?

রেণু আবার হাসতে হাসতে বলল, গ্রিনরুম দেখবে? এসো আমার সঙ্গে।

বাঁ দিকের উইংসের পাশ থেকে মঞ্চের ওপর দিয়েই রেণু আমাকে ডান দিকে নিয়ে এল। মঞ্চের ওপর দিয়ে যাবার সময় আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আগে কখনও আমি মঞ্চে উঠিনি, এই প্রথম, অথচ আমি অভিনেতা নয়। আমি বাদল হলেও আমার পাশে রেণু নেই-ও এক জমিদার নন্দিনী। আমি একবার রেণুর মুখের দিকে আর একবার অডিটোরিয়ামের দিকে তাকালাম। এখানে আমি কী বিশ্রী রকমের বেমানান!

মঞ্চের ওপর দিয়ে যেতে যেতেই রেণু জিজ্ঞেস করল, তোমার বাইরে যাওয়ার কিছু ঠিক হয়েছে?

আমি বললাম, এখনও বিশেষ কিছুই ঠিক হয়নি।

মঞ্চের ওপর তো মানুষ মিথ্যে কথাই বলে।

ডান দিকের উইংসের পাশে অনেকে চা খেতে খেতে জটলা করছিল। দেওয়ালে গিরিশ ঘোষের একটা মস্ত বড় ছবি। রেণু আমাকে নিয়ে এল গ্রিনরুমে। সৌভাগ্যবশত সেখানে কেউ ছিল না। একটা রঙের তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎবেগে রেণুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম।

রেণু আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। রেণু আমি যত বারই চুমু খেয়েছি, রেণু আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আমাকেও এমন সব অসম্ভব জায়গা ও সময় বেছে নিতে হয়! যখন ইচ্ছে তখনই রেণুকে পাই না বলেই যে আমি এ রকম করি, তা কি রেণু বোঝে না?

ত্রাস ও ক্ষোভ মেশানো গলায় রেণু বলল, তুমি কি কিছুতেই এসব ছাড়বে না?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তুমি যদি এই রকম ব্যবহার করো...

আমি আবার হাত তুলতেই রেণু সরে গিয়ে দরজার কাছে এমন জায়গায় দাঁড়াল, যাতে ওকে বাইরে থেকে দেখা যায়। যাতে আমি ওকে আর ধরতে না পারি।

আমি বললাম, ভয় নেই, আমি আর কিছু করব না। আমি ক্ষমা চাইছি। রেণু, আমাকে একটা কথা দেবে? আমাকে এক দিন তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবে?

আবার ওই সব কথা? আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না।

আজ নয়। কোনও একদিন তুমি আমাকে তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবে? শুধু কথা দাও তা হলেই হবে।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

রেণু, আমার বাইরে যাওয়ার দিন ঠিক হয়ে গেছে।

কবে?

আমি ইচ্ছে করেই দিন দশেক পরের একটা তারিখ বললাম। রেণু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। ওর নাটকের ফাঁইনাল অভিনয়ের আগে কোনও রকম বিঘ্ন ঘটাতে আমি চাই না।

তোমার যাওয়ার দিন আমি স্টেশনে যাব!

রেণু জানে না, আজই ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়ে গেল।

.

আমার ট্রেন বিকেলবেলা। সকাল থেকে হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করতে লাগলাম। শেষ মুহূর্তে মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাব না তো? জানতে পারলে মা কিছুতেই যেতে দেবেন। একমাত্র ছেলে হওয়ার অনেক ঝামেলা। কত লোক দিব্যি টিকিট কেটে প্রকাশ্যে আনন্দ করতে

করতে বিদেশে যায়। বাড়ির সব লোক স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসে। আমার বেলায় এত লুকোচুরি, গোপনতা। শেষ সময়টুকুও সুখের হবে না।

বাবা খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় বেরিয়ে গেলেন। সে-দিনকার সেই চাকরির ঘটনার পর থেকে বাবার সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুবই কমে গেছে। বাবাকে এখন সব। সময়েই চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়। বাবার কাছ থেকে আমার বিদায় নেওয়া হল না।

মা-ও শুয়ে পড়লেন একটু বাদে। দু দিন ধরে মায়ের ডান পায়ের পাতাটা একটু ফুলেছে। ইদানীং বাতের কষ্ট পাচ্ছেন। আমি মায়ের ঘরের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলাম। পঙ্কজরা অপেক্ষা করছে। আমার এক্ষুনি যাওয়া উচিত, তবু যেতে পারছি না। এর আগে বাইরে কোথাও গেলে মাকে প্রণাম করেছি। আজ প্রণাম করার প্রশ্নই উঠে না। একটা কথা অন্তত বলা উচিত, কিন্তু কী বলব? যে-কোনও কথা বলাই বিপজ্জনক। বুদ্ধ কিংবা চৈতন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন–তখন কারওর সঙ্গে একটিও কথা বলে যাননি। আমি তা জানি, কিন্তু আমি তো সন্ন্যাসী হতে পারিনি!

মা ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি প্রণাম করে পালাতে পারতাম। কিন্তু মা মরণের পরপারে' নামে একখানা বই খুলে শুয়েছেন। এই বই পড়তে পড়তে কারওর ঘুম আসে?

বার বার উঁকি দিয়ে যাচ্ছি। একবার দেখলাম, মা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বইখানা ওলটানো। কিন্তু আমি ঘরে পা দিতেই মা বললেন, কী রে? কিছু চাইছিস?

না।

কোথাও বেরোবি নাকি?

আমার আর সময় নেই। মাথায় একটা বুদ্ধি এল সেই মুহূর্তে। পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখ মোছার ছলে সেটা ফেলে দিতে চাইলাম মায়ের পায়ের ওপর। দূর ছাই, সেটা ঠিক পায়ের ওপর পড়ল না। সেটা তুলতে গিয়ে মায়ের পায়ের সঙ্গে আমার পা ছুঁয়ে

গেল। গুরুজনদের পায়ে পা ঠেকলে প্রণাম করতে হয়। এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই। টপ করে মাকে প্রণাম করে বললাম, মা আমি একটু ঘুরে আসছি!

আর কোনও কথা না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম একবস্ত্রে। পঙ্কজের বাড়িতে ভাস্করও অপেক্ষা করছিল। ভাস্কর দু'দিন ধরে কলকাতায় আছে। ওর এখন ছুটি নেই- ভাস্কর যে আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যই কলকাতায় থেকে গেছে আমি জানি। কিন্তু ও সে কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না। মুখে বলছে, ওর কত সব জরুরি কাজ আছে, বাড়ির ব্যাপার। ভাস্কর কারওর কাছেই নিজের কোনও রকম দুর্বলতা দেখাতে চায় না।

আমি পৌঁছোতেই ভাস্কর ধমক দিয়ে বলল, তুই কি ডোবাবি নাকি? আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি! আমি তো ভাবছিলাম, তোর বদলে আমিই চলে যাব।

আমার গলা ভারী হয়ে আছে, সহজে কথা বলতে পারছি না। ভাস্কর নিজেই দৌড়োদৌড়ি করে ট্যাক্সি ডেকে আনল। পঙ্কজ জিনিসপত্র সব তুলে দিয়ে বলল, চল, চল, ট্রেন না মিস করিস।

ট্যাক্সি ছাড়ার আগে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, আর কেউ যাবে না? আর কারোকে। বলিসনি?

না।

রেণুকেও না?

পঙ্কজ বলল, চল, এখন আর ওসব ভাববার সময় নেই। বলেইনি যখন-এখন আর কী করা যাবে!

ভাস্কর আমার সঙ্গে রেণুর ব্যাপারটা জানে। ভেংচি কেটে বলল, ইডিয়েট, এই সময় মান-অভিমান করার কোনও মানে হয়? এখনও যথেষ্ট সময় আছে, যদি চাস তো রেণুকে বাড়ি থেকে তুলে নিতে পারি।

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে না না বলতে লাগলাম। ভাস্কর আপন মনে হেসে উঠল।

হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছোলাম, তখন সত্যিই বেশি সময় ছিল না। জায়গা রিজার্ভ করাও ছিল না। ভাস্কর আর পঙ্কজ উঠে পড়ে ঠেলাঠেলি করে থার্ড ক্লাস কামরায় আমার জন্য জানলার ধারেই একটা জায়গা ঠিক করে ফেলল। বন্ধুরা না থাকলে আমি কী করতাম?

আমাকে বসিয়ে দিয়েও ওরা প্ল্যাটফর্মে নেমে ছোটাছুটি করতে লাগল। পঙ্কজ কিনে আনল কমলালেবু আর আমার পছন্দ মতন এক গাদা সিগারেটের প্যাকেট। ভাস্কর কয়েকটা গুলিসুতো আর সুচ কিনে এনে একটা প্যাকেটে মুড়ে দিয়ে বলল, রেখে দে, দেখবি অনেক দরকারে লাগবে। হঠাৎ যদি প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে যায়–

হুইল দেবার পর ট্রেন নড়ে উঠল। আমি ওদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। পঙ্কজ বলল, মাইশোরে পৌঁছেই একটা চিঠি দিস। জামাইবাবুকে বলিস–

ভাস্কর চালাক ছেলে। ও ঠিক বুঝেছিল, শেষ মুহূর্তে আমার চোখে জল আসবে। সেই জন্যই ওর নাকের ওপর দু'হাতের আঙুল জুড়ে, যাকে পাক দেওয়া বলে, সেই রকম অদ্ভুত ভঙ্গি করতে লাগল। আমি না হেসে পারলাম না।

.

ট্রেন ছাড়ার পরই মনে হল, শেষ হয়ে গেল আমার জীবনের একটা অংশ। এরপর থেকে আমার কাছে সবকিছুই নতুন। জীবনের এই কটা বছর ধরে যেসব মানুষজন সংগ্রহ করেছিলাম, তাদের কারওর সঙ্গেই আমার আর দেখা হবে না। রেণুকে একদিন গঙ্গার ঘাটে খুঁজে পেয়েছিলাম, আজ আবার হারালাম।

প্রথম কয়েক ঘণ্টা আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলাম ট্রেনে। কোনও সহযাত্রীর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। যেন, আমি কথা বললেই ওরা জেনে ফেলবে, আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কী। অকারণ এই ভয়! জীবনটা তো আমারই, এ-জীবন নিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি! আজ থেকে

আমি স্বাধীন, তবু স্বাধীনতা পেয়েও কেন এত অবশ হয়ে থাকে? মানুষ কী রকম স্বাধীনতা চায়?

মহীশূরে পঙ্কজের জামাইবাবুর বাড়িতে পৌঁছে মনটা আরও দমে গেল। দারুণ সাজানো-গোছানো বিরাট প্রাসাদ একেবারে। অচেনা লোকের কাছে আমি কিছুতেই সহজ হতে পারি না। এ রকম আড়ম্বরপূর্ণ বাড়িতে এলে সব সময় মনে হয়, প্রতি মুহূর্তেই যেন আমি কোনও নিয়মকানুনের ভুল করে ফেলছি। যেসব ঘরে কার্পেট পাতা থাকে, সে-সব ঘরে কি জুতো পরে ঢুকতে হয়? কোনও কোনও বাড়িতে জুতো বাইরে রাখার প্রথা, আবার কোনও কোনও বাড়িতে কেউ জুতো খোলে না।

গেট পর্যন্ত পৌঁছেও একবার মনে হয়েছিল ফিরে যাই। কোনও একটা ছোটখাটো হোটেলে থাকলে ক্ষতি কী? আমি কখনও একলা কোনও হোটেলে থাকিনি। কিন্তু ফিরে যাওয়া হল না, পঙ্কজের জামাইবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে গেলেন।

ওঁর নাম সুব্রত মৈত্র। খুব রোগা আর লম্বা মতন মানুষটি, বাংলা সিনেমার নায়িকাদের বাবার মতন ড্রেসিং গাউন পরা এবং মুখে পাইপ। সাহেবি ধরনের মানুষ। তবে, ওঁর কথা শুনে আমাকে চমকে উঠতে হল। উনি দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বললেন, আরে আসো আসো ট্রেন ল্যাট ছিল কয় ঘণ্টা?

সুব্রতদা কাঠ-বাঙাল। বাংলা কথার উচ্চারণ একেবারে যাচ্ছেতাই-উনি শোধরাবার চেষ্টাও করেন না। স্বাধীনতার পর বাঙালরা এদিকে দলে ভারী হয়ে ওঠার ফলে, উচ্চারণ নিয়ে আর মোটেই লজ্জা পায় না। সুব্রতদার মতন এমন সাহেবি ধরনের বাঙাল আমি আগে কখনও দেখিনি। চায়ের স্বাদ একটু খারাপ হলে উনি কাপ সরিয়ে রাখেন, নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথাবার্তাতেও প্লিজ আর থ্যাংক ইউ যোগ করেন, কুকুরের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজিতে-কিন্তু বেড়ালকে বলেন বিলোই।

সুব্রতদা খুব সহজেই আমাকে আপন করে নিলেন। ওঁর স্ত্রী সুধাদি একটু গম্ভীর ধরনের হলেও যথেষ্ট স্নেহশীলা। প্রথম প্রথম সুধাদিকে দেখে একটু ভয় ভয় করছিল, মনে

হয়েছিল, উনি বোধহয় বাড়িতে অতিথি আসা পছন্দ করেননি। পরে বুঝেছিলাম, ওঁর স্বভাবই কম কথা বলা–মানুষকে যত্ন করার ব্যাপারে ওঁর কোনও ত্রুটি নেই। ওঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটি ছোট, পাঁচ-ছ' বছরের, আর মেয়েদুটির বয়স পনেরো আর ষোলো, হঠাৎ দেখলে যমজ বলে মনে হয়। একই রকমের পোশাক, একই ধরনের বেণী। ঝোলানো, দু'জনেই বাড়িতে সব সময় লাল রঙের চটি পরে থাকে। ওদের নাম যমুনা আর সরস্বতী, ছেলেটির নাম সুভাষ। সুভাষের সঙ্গেই আমার ভাব হল আগে।

আমাকে থাকতে দেওয়া হল একতলার একটি ঘরে। সেই ঘরে বিছানা থেকে আরম্ভ করে বাথরুমের তোয়ালে সাবান পর্যন্ত সবই আগে থেকে সাজানো, এটা ওদের বাড়িতে গেস্ট রুম। কোনও বাড়িতে যে এ রকম ঘর সাজানো থাকে, আগে আমার জানা ছিল না।

সুব্রতদা আগেই খবর নিয়ে রেখেছিলেন, আমার জাহাজ ছাড়তে আরও ছ'দিন দেরি আছে। এই কদিন আমাকে বিলেতি আদবকায়দায় দীক্ষা দেবার জন্য সুব্রতদা উঠে পড়ে লাগলেন। সুব্রতদা সাত বছর লন্ডনে ছিলেন–অনেক দিন বাদে তার প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাবার মতন একজন শ্রোতা পেয়েছেন। সব বিলেতফেরতই বিলেতের গল্প করতে ভালোবাসে। হ্যাঁন্ড শেক করার সময় ঠিক কতটা হাত কঁকাতে হবে এবং হাউ ডু ইউ ডুর উত্তরে যে হাউ ডু ইউ ডু-ই বলতে হয়–এসব আমি মনোযোগী ছাত্রের মতন শিখতে লাগলাম।

একসময় সুব্রতদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিলাতে কী পড়তে যাইত্যাছো?

আমি বললাম, পড়তে তো যাচ্ছি না। চাকরি করতে–

সুব্রতদা ভুরু কুঁচকে বললেন, চাকরি? চাকরির জন্য অত দূরে যাওয়া ক্যান?

আমি বললাম, কী করব বলুন। এ-দেশে তো আর চাকরি পেলাম না। আমাদের দেশ তো আমাদের দেশের ছেলেদের চাকরি দিতে পারে না।

সুব্রতদার কথাটা পছন্দ হল না। সুব্রতদার মতে ইউরোপীয়রা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে আছে–সুতরাং ওদের কাছে সে-সব শেখার জন্য যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওদের অধীনে চাকরি করা, ছি ছি–এটা বড় হীনতার কাজ।

আমার কাছে এখন এসব কথার আর কোনও মূল্যই নেই। আমি চুপ করে রইলাম।

সুব্রতদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে চাকরি করবে? আমার অফিসে তোমাকে এক্ষুনি একটা চাকরি দিতে পারি।

এ রকম হয়। যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন অনেকেই কিছু দিতে চায়। আমি বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, নাঃ, এ-দেশে আর আমি থাকব না।

সুব্রতদার চাকরিটা ভারী আরামের। অফিস না গেলেও চলে। অফিসের লোকেরাই বাড়িতে কাগজপত্তর নিয়ে আসে। এ ছাড়া অসংখ্য টেলিফোন আসে, সারা দিনে সুব্রতদা নিজেও অন্তত ছ'টা-সাতটা ট্রাঙ্ক কল করেন। বাড়িতে বসে টেলিফোনে কাজ সেরেও এত বড় চাকরি পাওয়া যায়!

বিকেলের দিকে পর পর তিন দিন সুব্রতদা আমাকে অনেক জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে আসে। সুধাদি বেড়াতে ভালোবাসেন না। এই ভাবে আমার চামুন্ডী পাহাড় এবং বৃন্দাবন গার্ডেনস দেখা হয়ে গেল। একদিন বেড়াতে গেলাম চন্দনের বনে। হাত দিয়ে একটা চন্দন গাছ প্রথম ছুঁয়ে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। ঠিক যেন একটা অলৌকিক সৌভাগ্যের মতন। আগে তো কখনও ভাবিনি, আমি একদিন এই রকম ভাবে চন্দন গাছের ছায়ায় পঁড়াব। কাবেরী নদীর কাছে গিয়েও অনেকটা এই রকমই মনে হয়েছিল। আর কিছুই নয়, অন্য যে-কোনও নদীর মতনই তো–তবু কাবেরী নামটা যেন শুধু কবিতার মধ্যেই ছিল–হঠাৎ সেই নামের নদীর কাছে চলে এলে মনে হয়, এটা যেন ঠিক কোনও বাস্তব ঘটনা নয়।

যমুনা আর সরস্বতী এই দুই বোনের মধ্যে সরস্বতী একটু বেশি লাজুক। যমুনা আমার-সঙ্গে অনেক গল্প করে-কিন্তু বার বার আমার চোখ চলে যায় সরস্বতীর দিকে। এক এক সময় বুকটা কেঁপে ওঠে। মনে হয়, সরস্বতাঁকে যেন অবিকল রেণুর মতন দেখতে। যদিও ঠিক ঠিক বিচার করলে, রেণুর সঙ্গে ওর বিশেষ কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না- ওর মুখের গড়ন আলাদা, নাক-চোখও অন্য রকম, তবু সরস্বতীর মুখের কোনও একটা। রেখায়, কিংবা তাকানোর ভঙ্গিতে দপ করে রেণুর কথা মনে পড়ে যায়। ট্রেনে আসবার সময় এই রকম আরও দু-তিনটি মেয়েকে দেখে ঠিক রেণুর মতন মনে হয়েছিল। রেণু কথা ভুলতে চাইছি বলেই বোধহয় রেণু বার বার নানা চেহারায় আমার চোখের সামনে এসে হাজির হচ্ছে।

বৃন্দাবন গার্ডেনস দেখতে গিয়ে যে-দিন আমরা কাবেরী নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, সে-দিন সরস্বতী বলেছিল, দিদির নামের সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম কাবেরী রাখলে অনেক ভালো হত। ঠাকুর দেবতার নাম আমার একটুও ভালো লাগে না!

ও জানে না যে সরস্বতী নামেও নদী আছে। আমি ওকে বললাম, তুমি এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমের কথা শোনোনি? সেখানে গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী-এই তিনটে নদী একসঙ্গে মিশেছে?

যমুনা জিজ্ঞেস করল, আপনি এলাহাবাদে গেছেন?

মেয়েদের সামনে মিথ্যে কথা বলতে আমার একটুও আটকায় না। আমি ঘাড় হেলিয়ে বললাম, হ্যাঁ-

কী রকম দেখতে সেই জায়গাটা? যেখানে তিনটে নদী একসঙ্গে মিশেছে?

কল্পনা করা এমন কিছু শক্ত নয়। তা ছাড়া নদীর বর্ণনা দেওয়া আর এমন কী কথা। মনশ্চক্ষে আমি প্রয়াগের ত্রিবেণীসঙ্গম দেখতে পেলাম, সেখানে দুর্গের ছায়া পড়েছে। সুব্রতদা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার বর্ণনা শুনে খুব হাসতে লাগলেন।

যমুনা-সরস্বতী প্রায় জন্মকাল থেকেই প্রবাসে আছে। ওদের ব্যবহার অনেক সহজ, শাড়ির বদলে স্কার্ট পরে। যমুনা আমার হাত ধরে বলল, বাদলদা, একটা জিনিস দেখবেন আসুন। আসুন না-

একটা গাছের পাতায় একটা পরিত্যক্ত বোলতার বাসা-ঠিক একটা বড় কদম ফুলের মতন-যমুনা আমাকে সেটা দেখতে আনে। জিনিসটা সত্যি সুন্দর। কাছাকাছি কোনও বোলতা নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি সেটাকে ভেঙে নিয়ে এলাম। সেটাকে দেখবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশে যমুনা আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল-ওর শরীরের গরম স্পর্শ আমি টের পেলাম। সেই মুহূর্তেই আমার মুখখানা অপরাধীর মতন বিবর্ণ হয়ে গেল। যেন আমি রেণুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। যে কয়েক বারই যমুনা সাধারণ সরলতায় আমার হাত ধরেছে কিংবা শরীরের সঙ্গে ছোঁয়া লেগে গেছে প্রত্যেক বারই আমার এ রকম মনে হয়েছে। রেণু ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে আমি স্পর্শ করতে পারি না। কদাচিৎ অন্য কোনও মেয়ের বুকের অনাবৃত অংশের দিকে আমার চোখ পড়ে গেলেও আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। নারীর কাছ থেকে আমার যা কিছু পাবার-তা সবই রেণুর কাছে গচ্ছিত রয়েছে। মাঝে এ রকম কথাও আমার মনে হয়েছে যে থিয়েটারের সেই দেবুদা যদি রেণুর গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে পারে, তা হলে আমিই বা অন্য কোনও মেয়েকে ছুঁতে পারব না কেন? কিন্তু আমার এ-বিদ্রোহ বেশি দূর দানা বাঁধেনি। এখন রেণুর কাছ থেকে দূরে আছি বলেই যেন আমার কঠোরতা আরও বেড়ে যায়।

আমার কোচিন যাবার আগের দিন এ বাড়িতে একটা ছোটখাটো উৎসব হয়ে গেল। উৎসবের উপলক্ষটা আমি সারা দিনের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারিনি কিংবা আমার কাছে গোপন করে রাখা হয়েছিল। সেদিন সরস্বতীর জন্মদিন-আমি যাতে উপহার টুপহার কিনে টাকা খরচ করে না ফেলি, সেই জন্য সুব্রতদা আমাকে বলতে চাননি। সন্ধ্যাবেলা সুভাষ দৌড়োতে দৌড়োতে এসে আমাকে খবর দিয়ে গেল, এবার দিদির নামে কেক কাটা হবে-আপনি শিগগির আসুন!

ওপরে গিয়ে দেখলাম সরস্বতী একটা উজ্জ্বল লাল রঙের শাড়ি পরেছে। তার প্রথম শাড়ি। তার লাজুকতার সঙ্গে ওই লাল রং মানিয়েছে ভারী চমৎকার। ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ঠিক যেন রেণুকে দেখছি। রেণুর জন্মদিনটা যেন কবে? আমার কিছুতেই মনে থাকে না। গত বছর রেণুর জন্মদিনে আমি কোনও উপহার দিইনি, রেণুই আমার জন্য একটা বই কিনে এনেছিল।

কারোকে কিছু না বলে টুক করে এক ফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। উপহার কেনার অভ্যাস নেই, কী কিনব জানি না। বই কেনার কথাই প্রথমে মনে পড়ে। কিন্তু সুব্রতদার বাড়ি-ভরতি বই। অনেক ভেবেচিন্তে এখানকার বিখ্যাত সাবান কিনে ফেললাম এক বাক্স। আশ্চর্য ব্যাপার, দোকানদারের হাত থেকে যখন সাবানের বাক্সটা নিচ্ছি- তখনও আমার মনে হচ্ছে, যেন রেণুই এই সাবান মাখবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাথরুমে রেণু...। এই ক'দিনে বাবা-মা'র কথাও আমার তেমন করে মনে পড়েনি, রেণুর স্মৃতিই জ্বালাতন করছে সবচেয়ে বেশি।

সুব্রতদার পরিচিত কিছু নারী-পুরুষ এসেছিলেন নেমন্তন্ন খেতে। বাইরের সবাই চলে যাবার পর আমরা দোতলার বড় হলঘরটাতে বসে গল্প করছিলাম। সুব্রতদা খুব রাগাবার। চেষ্টা করছিলেন সুধাদিকে। মিঃ আয়েঙ্গার নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি নাকি সুধাদির প্রেমে পড়েছেন। ছেলেমেয়ের সামনেই সুব্রতদার এই ধরনের রসিকতার ব্যাপারটা আমার বেশ ভালো লাগে। সুব্রতদা যমুনাকে জিজ্ঞেস করলেন, খুকু তুই দেখিসনি, আয়েঙ্গার তোর মায়ের দিকে কী রকম ঢুলুঢুলু চোখে তাকাচ্ছিল? তোর মা-ও কী রকম লজ্জা লজ্জা ভাবে-

এই সময় ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। সুব্রতদা উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে লাগলেন। অর্থাৎ ট্রাঙ্ক কল। একটু বাদেই সুব্রতদা আমার দিকে ফিরে বললেন, বাদল, তোমার। তারপর হাসতে হাসতে সকলকে জানালেন, বাদলের আর যাওয়া হল না। ওর বাড়ি থেকে ডাক এসেছে-

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়ের। আমাকে এখানে কে টেলিফোন করবে! আমার বাড়ির কারওর পক্ষে জানা তো অসম্ভব! আমার দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হল, কঠিন প্রতিজ্ঞার। যাই হোক না কেন, আমি কিছুতেই ফিরে যাব না। কিছুতেই না। টেলিফোন তুলে দৃঢ় গলায় বললাম, হ্যালো-।

এটাই আমার ভুল হল। টেলিফোন যন্ত্রটা হাতে নেওয়াই আমার ঠিক হয়নি। আমার উচিত ছিল সুব্রতদাকে দিয়েই বলানো যে আমি চলে গেছি।

ট্রাঙ্ক কল করেছেন বাবা। আমাকে ধমকালেন না, কান্নাকাটি করলেন না। খুব শান্ত গলায় বললেন, তোমার বাবা বলছি। তোমার মায়ের খুব অসুখ। তিনি তোমাকে বার বার দেখতে চাইছেন। তোমার ইচ্ছে হলে আসতে পারো। তবে তুমি আসবে কি না আসবে, তা তুমিই ঠিক করবে। আমি শুধু খবরটা জানিয়ে দিলাম, না হলে তোমার মা শান্ত হচ্ছিলেন না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথার মধ্যে প্রবল বেগে অনেক কিছু ঘুরছে। বাবা আমাকে সত্যিই চমকে দিয়েছেন। যে-সব ছেলে বাড়ি থেকে চলে যায়, তাদের সকলেরই মায়েরা গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী হয়। এটা নতুন কিছু নয়। এই খবরে আমি বিচলিত হতাম না। কিন্তু বাবার ওই শান্ত কণ্ঠস্বরে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি। আমাকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ বা আদেশ না করে এ রকম ভাবে কথা বলার মানে কী? ফিরব কিনা তা আমাকেই ঠিক করতে হবে। এই অসুখের ফলে যদি মা মারা যান, তা হলে আমিই হব সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী। যেন সবাই মিলে একটা ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে। মায়ের অসুখটাও সেই ষড়যন্ত্রের অংশ। পরিবার এবং সমাজ নামে দুটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান আমাকে বলতে চাইছে, তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে, তোমাকে পালাতে দেব না আমরা। তোমার মায়ের মৃত্যুর দায়িত্ব তুমি নেবে কি না তা এখনও ভেবে দেখো! আমার ইচ্ছে হল টেলিফোনটা আছড়ে ভেঙে ফেলি।

৮২. মহীশূরে সুব্রতদাদের বাড়িতে

মহীশূরে সুব্রতদাদের বাড়িতে থাকার বদলে আমি যদি কোচিনের কোনও হোটেলে উঠতাম, তা হলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা অন্য রকম হত। মায়ের অসুখের খবর কোনও ক্রমে আমার কাছে পৌঁছোত না, আমি বিদেশের পথে পাড়ি জমাতাম। আর কোনও দিন ফিরতাম কিনা কে জানে! কোচিনে কোনওক্রমে আমার কাছে খবর পৌঁছোলেও সেখানে আমি অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, একা হোটেলের ঘরে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারতাম আমি। কিন্তু এখানে সুব্রতদা, সুধাদি, যমুনা ও সরস্বতী তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

সুব্রতদা জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে কী করবে? আমার তো মনে হয়, তোমার ফিরে যাওয়াই উচিত।

আমার মুখে কোনও উত্তর এল না। ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আমার পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে এসেছে। একতাল ছানা কাপড়ে জড়িয়ে নিংড়ে নিংড়ে যেমন জল বার। করে, সেই রকম ভাবে আমার ভেতরটা কেউ নিংড়োচ্ছে। মায়ের অসুখ, আমার উচ্চাকাঙ্খ এবং সুব্রতদারা কী মনে করেছেন, এই তিন রকমের চিন্তা আমাকে দিশেহারা করে দেয়। আমি এত ভাবতে পারি না, এত দায়িত্ব, এমনকী নিজের সম্পর্কেও, নেবার অভ্যাস নেই আমার।

সুধাদি কিংবা যমুনাসরস্বতী আমার টেলিফোনের বৃত্তান্ত জানে না। যমুনা বলল, কী হল? বাদলদা, আপনার বিলেত যাওয়া হবে না?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ, আমার আর কিছুই হবে না।

এরপর সকলে মিলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে। সুধাদি যখন জানলেন যে আমি বাড়িতে কারোকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছি, তখন রেগে গেলেন খুব। আমাকে

আশ্রয় দেবার জন্য যেন তিনিও অপরাধী। তৎক্ষণাৎ সুব্রতদাকে বললেন, তুমি ট্রেনের খোঁজ করো। ওর এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।

সুব্রতদা একটা উপায়ান্তর খুঁজে বার করলেন। তিনি জাহাজ কোম্পানিকে টেলিফোন করে দেখবেন, টিকিটি ক্যানসেল করা যায় কিনা। সেটা সম্ভব হলে তিনি দু'-তিন মাস পরে আবার কোনও জাহাজে সিট বুক করে রাখবেন। ইতিমধ্যে আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসব এবং মায়ের অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

ট্রেন রাত তিনটেয়। সুব্রতদাদের বাড়ির সকলে মিলে আমাকে তুলে দিতে এল স্টেশনে। যমুনা আর সরস্বতীর সঙ্গে এই ক'দিনে আমার বেশ একটা বন্ধুত্বের মতন হয়ে গিয়েছিল। ওদের মুখ দেখে বোঝা যায়, আমার বিদেশ যাওয়া হল না বলে ওরা খুব দুঃখিত হয়েছে। আন্তরিক দুঃখ। কেউ কোথাও আমার জন্য দুঃখ পেয়েছে–এটা টের পেলেই মনের মধ্যে অসম্ভব একটা মায়া জেগে ওঠে কেন?

ফেরার পথ সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমার চিন্তাশক্তিও যেন অসাড় হয়ে গেছে। বার বার একটা ছবিই ভেসে আসছে চোখের সামনে। আমি ফিরে গিয়ে মাকে আর দেখতে পাব। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শ্মশান থেকে ফিরে সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে সিঁড়ির ওপরে। আমাকে দেখে বাবা বললেন, যদি এত দেরিই করলি, তা হলে আর এলি কেন?

বাঙ্কের ওপর শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একজন সহযাত্রী আমাকে ঠ্যালা দিয়ে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল, ও ভাই, কী হয়েছে আপনার? অসুখ করেছে?

আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে আমার কাছে। নানা প্রাদেশিক ভাষায় নানা প্রশ্ন। আমি ঘুমের মধ্যে কাঁদছিলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সেই জন্যই সহযাত্রীরা আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমার অসম্ভব লজ্জা করতে লাগল। ইস, এরা কী ভাবছেন–এত বড় একটা ছেলে ঘুমের মধ্যে কাঁদে? অনেকেই অবশ্য ধরে নিয়েছেন, আমি কোনও অসুখের কষ্ট

পাচ্ছি। এঁরা কেউ জানেন না, আমি সদ্য-মাতৃহীন। একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোক অতি সহৃদয় ভাবে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি পেটব্যথা করছে? আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে।

আমি পেটের ব্যথার কথাই স্বীকার করলাম। মানুষের মনের কষ্টের কথা অন্য কারোকে বোঝানো যায় না, তাই শারীরিক কষ্টের কথাই সকলে জানতে চায়। মাদ্রাজি। ভদ্রলোক একটা টিনের কৌটো থেকে কী একটা কালো গুঁড়ো মশলার মতন বার করে। দিলেন, খেয়ে ফেললাম বিনা দ্বিধায়। জিনিসটা বেশ সুস্বাদু। হাত বাড়িয়ে বললাম, আর একটু দিন।

দু'দিন ট্রেন জার্নির পর অস্নাত রুক্ষ চেহারায় পৌঁছোলাম কলকাতায়। ট্যাক্সি যখন বাড়ির সামনে থামল, তখন পর্যন্ত আমার বুকের মধ্যে কঁপুনি ছিল। কিন্তু বাড়ির দিকে একবার তাকিয়েই আমার মনে হল, এটা শোকের বাড়ি নয়। এখানে মৃত্যুর গন্ধ নেই। যদিও সদর দরজা বন্ধ, বাইরে কেউ নেই, দু-এক দিন আগে কোনও ঘটনা ঘটে গেলে বাড়ি এ রকমই থাকবে-তবু শোকের বাড়ি দেখলে চেনা যায়। মৃত্যু যেখানে একবার আসে, সেখানে দরজায় চিহ্ন থাকে।

তখন আমার মনে হল, মায়ের অসুখের কথাটাই পুরোপুরি মিথ্যে। খবরের কাগজের 'খোকা ফিরে এসোর বিজ্ঞাপনের মতন! সামান্য মিথ্যে কথায় আমার বিদেশ যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হল? আমি কাল-পরশুই আবার তা হলে ফিরে যাব।

একটু জোরেই দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। দরজা খুলে দিলেন বাবা। শুধু বললেন, এসেছিস?

এখানকার সব খবর ভালো তো?

এই এক রকম।

আমি তখনও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। দরজার ওপাশে বাবা। ট্যাক্সির ভাড়া মেটানো হয়নি। আমি আবার ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ব? এ বাড়ির সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কী? আমি এ বাড়ির কেউ না-আমি এত কষ্ট করে ফিরে এলাম, বাবা যেন সেটা গ্রাহ্যই করছেন না। শুধু আমার দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে আছেন।

ট্যাক্সিওয়ালা হর্ন দিতেই আমি সজাগ হলাম। হঠাৎ নাটকীয় কিছু করে ফেলা আমার ধাতে নেই। ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে সুটকেসটা নামিয়ে নিলাম। বাবা দরজার সামনে থেকে। সরে দাঁড়িয়েছেন। একবার শুধু বললেন, সুটকেসটা আমাকে দে।

আমি বললাম, না ঠিক আছে। আমিই নিচ্ছি।

সিঁড়ি দিয়ে বাবার পেছনে পেছনে ওঠবার সময় আর একটাও কথা হল না। দোতলায় ওঠার ঠিক আগেই মনে হল, বাবাকে আমার প্রণাম করা উচিত ছিল। বরাবরই তো এ। রকম হয়ে এসেছে, বাইরে থেকে ফিরেই বাবাকে-মাকে প্রণাম করেছি। দরজা খোলার পরই বাবা সেই জন্যই বোধহয় আর কোনও কথা না বলে আমার প্রণামের অপেক্ষায় ছিলেন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এসব আর এখন আমার মনে থাকে না। মাত্র বছর। খানেকের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার কতটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। এখনও সুটকেসটা। নামিয়ে রেখে প্রণামটা সেরে ফেলা যায়। সুটকেসটা নামিয়েও রাখলাম কিন্তু বাবা তখন বারান্দা দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। প্রণাম করার জন্য কেউ কি গুরুজনদের ডাকে?

মায়ের ঘরে বড়মামা আর বড়মামিমা বসে আছেন। বিছানার ওপর মা, চোখ বোজা। মা'র সত্যিই অসুখ। আমি মাথার কাছে বসলাম। মা'র অসুখের জন্যই বেলেঘাটা থেকে।

বড়মামিমাদের আনানো হয়েছে। বাইরের লোকের উপস্থিতির জন্যই আবহাওয়া অনেক সহজ হল। নইলে, বাবা বোধহয় আর আমার সঙ্গে কথা বলবেনই না ঠিক করেছিলেন।

বড়মামা বললেন, এসেছিস? ওঃ, যা চিন্তায় ফেলেছিলি! এ রকম ভাবে কেউ যায়? ইডিয়েট, এককোঁটা বুদ্ধি নেই মাথায়।

বড়মামিমা বললেন, থাক, ছেলেটাকে এখন বোকো না। হিমানীকে ডাকব?

এখন ডেকো না। এইমাত্র তো ঘুমোল।

একবার ঘুম ভাঙালে কিছু হবে না। সারাক্ষণ ছেলেটার নাম করছিল!

আস্তে, আস্তে। হঠাৎ না চমকে ওঠে। চিররঞ্জন নিজে টেলিফোন করেছে, ছেলেটার গলার আওয়াজ শুনেছে-তাও হিমানী বিশ্বাস করে না। মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে এ রকম ভাবে কেউ যায়?

আমি কাচুমাচু হয়ে বসে রইলাম। ঠিক ভেবে পেলাম না, এ-ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়া না কষ্ট পাওয়া, কোনটা অপরাধ?

বড়মামিমা বললেন, যা বাদল, হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আয়। চেহারার কী ছিরি হয়েছে তোর?

আমি তবু বসেই রইলাম। বাবা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। যেন এ-ঘরের কোনও ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও সংযোগই নেই।

বড়মামিমা মায়ের গায়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, হিমানী, ও হিমানী।

মা চোখ না খুলেই বললেন, উঃ?

এখনও ব্যথা আছে?

আছে।

খুব!

কী জানি!

শোনো, বাদল এসেছে।

মা সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। ব্যাকুল ভাবে বললেন, কই? কই?

এর পরের দৃশ্য বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নেই। মায়ের চোখের জল দেখে আমাকেও আবার কাঁদতে হল। এরই মধ্যে একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম। আমার ফিরে আসা সঠিক হয়েছে। আমি চলে যাবার পরদিনই মায়ের হার্ট স্ট্রোক হয়েছিল, ডাক্তারের মতে মাইল্ড ধরনের হলেও প্রাণ সংশয় ছিলই। এখন, মায়ের বিছানার পাশে বসে থেকে বুঝতে পারি, মায়ের মৃত্যুর বিনিময়ে আমার কোথাও যাওয়া চলে না। আমার সম্পর্কে আমার মায়ের টানটা সম্পূর্ণ জৈবিক, এখানে যুক্তির কোনও প্রশ্ন নেই।

কান্নাকাটি ও বিষণ্ণ পরিবেশই রইল বাড়িতে। বড়মামা চলে গেলেন, বড়মামিমা ক'দিন ধরেই এখানে থাকছেন। আমার মামারবাড়িতে সকলেরই ধারণা, আমার বাবা নিতান্তই অকর্মা এবং অপদার্থ। মাকে তারা বেলেঘাটায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন মাকে নড়াচড়া করানো ঠিক নয় এবং মা যেতেও চাননি।

বড়মামিমাই খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে আমাকে জোর করে ঘুমোতে পাঠালেন। একটা লম্বা ঘুম দিলাম। জেগে ওঠার পর আবার মনখারাপ হয়ে গেল। এই মনখারাপের নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। চুপচাপ দু-তিনটে সিগারেট শেষ করে আবার এসে বসলাম মায়ের বিছানার পাশে। মা এখন আবার অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন।

রেণু এল সন্ধ্যার দিকে। আমিই দরজা খুলে দিয়েছিলাম। আমাকে দেখে রেণু চমকে উঠল না, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না, শুধু জিজ্ঞেস করল, মাসিমা কেমন আছেন?

আমি অপরাধী। সকলের চোখেই আমি তাই। সকলে মিলে শুধু একজনকে বার বার বিদ্ধ করলে তার ফল কি ভালো হয়? রেণু এ রকম না করলেও পারত।

এরপর আমিও একটা ভুল করলাম। আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, তুমি কেমন আছ? কিংবা, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ? কিংবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না? কিংবা, রেণু আমার চোখের দিকে তাকাও, আমাকে চিনতে পারছ না?

কিন্তু, এ রকম কোনও ব্যক্তিগত কথায় বদলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের থিয়েটার কেমন হল?

রেণুর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আমি ওর থিয়েটার করা পছন্দ করিনি। এবং এখনও সেই রাগ পুষে রেখেছি। রেণুও রাগের সঙ্গেই বলল, খুব ভালো। হয়েছে।

তারপর আর একটাও কথা না বলে উঠে এল দোতলায়। বেশ কয়েক দিন পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে গেছি এই খবর পেয়ে থিয়েটারের আসল অভিনয়ের দিন রেণু বলেছিল, ও পার্ট করবে না। সর্বক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। শো ভন্ডুল হয়ে যাবার আশঙ্কায় অনেকে মিলে প্রায় জোর করেই রেণুকে ধরে নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছিল স্টেজে। কেন জানি না, এই কথাটা শুনেও আমার রাগ হয়েছিল।

রেণু মায়ের ঘরে বসে রইল। কথা বলতে লাগল বড়মামিমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলার কোনও আগ্রহই নেই ওর। আমার দিকে তাকাচ্ছেও না। আমি সিগারেট খাবার ছলে কয়েক বার উঠে গেলাম নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, রেণু যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসবে আমার কাছে। রেণু এল, না। একথাও আমার মাথায় আসে না যে, আমি নিজে না-ডাকলে রেণু আসবে না। বরং আমার অভিমান হয়, আমি এত দূরে গিয়েও আবার ফিরে এলাম, তবু রেণু এক বারও। আমার হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল না, তোমার কোনও কষ্ট হয়নি তো?

এরপর আরও একদঙ্গল আত্মীয়স্বজন এসে পড়লেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাতেই এঁরা আসেন। আজ এঁরা দাদামশাইকেও নিয়ে এসেছেন। দাদামশাই প্রায়ই কঠিন অসুখে ভোগেন, আবার সকলকে অবাক করে দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে হাঁটাচলা করতে শুরু করেন। বয়স হয়ে গেলেও চেহারাটি এখনও সোজা আছে। মামাবাড়ির গ্রামে যে দোর্দন্ডপ্রতাপ মানুষটিকে দেখেছিলাম, এখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই, বেলেঘাটার জবর দখল কলোনির সামান্য পরিবেশে এই মানুষটিকে আঁটানো যায় না। প্রায় সারা জীবন যিনি সকলের ওপর হুকুম চালিয়ে এসেছেন আজ তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। তার বেশ কিছু টাকা তিনি কলকাতার একটি ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, পঞ্চম দশকে একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে সেই ব্যাঙ্কটিও হঠাৎ একদিন গণেশ উলটেছে।

অন্যদের নিষেধ সত্ত্বেও দাদামশাই আজ দেখতে এসেছেন তার ছোটমেয়েকে। সিঁড়ি দিয়ে তাকে ধরে ধরে ওঠানো হল। মেয়ের কপালে হাত রেখে বললেন, হিমু, কেমন আছিস মা? সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

কী তীব্র সেই চোখের দৃষ্টি, আমি বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারি না। বড়মামিমাই আমাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য বললেন, ও তো ওর ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল। ও কিছুই জানত না।

বুঝলাম, দাদামশাইকে সব কথা জানানো হয়নি। দাদামশাই আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আবার বললেন, অনেক দিন তোকে দেখি না কেন?

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ঘুচেই গেছে! কিন্তু দাদামশাইরা যে-কালের মানুষ, তা তো ওঁদের কাছে বয়ঃকনিষ্ঠ আত্মীয় মানেই অনুগত প্রজার মতন, নিয়মিত হাজিরা দেওয়া তাদের কাজ।

এই বৃদ্ধ তার ব্যক্তিত্বে ঘরের সবাইকে চুপ করিয়ে রেখেছেন। রেণুকেও উনি দু-তিন বার দেখলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, তোমার মা এখন একটু ভালো আছেন তো দিদি?

রেণু একটু অবাক হল। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তুমি তো দিদি, এ-বুড়োকে এক দিনও দেখতে গেলে না!

রেণু বুঝতে না পারলেও ঘরের আর সবাই বুঝতে পেরেছে যে দাদামশাই রেণুকে আমার জ্যাঠামশাইয়ের কোনও মেয়ে বলে ধরে নিয়েছেন। অসুস্থ কারোকে দেখতে এসেও উপস্থিত অন্য সকলের কুশল প্রশ্ন করাও পুরনো প্রথা।

মা কথা না বলে চুপ করে শুয়ে আছেন। কথা বলতে গেলেই কষ্ট হয়। দাদামশাই আবার তাঁর মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, তোর কোনও চিন্তা নেই মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোনও ছেলেমেয়ে আমার আগে মরে যাবে না। বুঝলি?

দাদামশাই আমার কাধ ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভালো করে চিকিৎসা করাবি, বুঝলি? সেরা ডাক্তার দেখাবি। আমার তো এখন আর কিছুই করার সাধ্য নেই। এই দুটো রাখ, এই দুটো বেচে চিকিৎসাপত্তর করাবি।

দাদামশাই তার ফতুয়ার পকেট থেকে বার করলেন দুটি মোহর। আমি দেখলাম, আমার সব মামা-মামিমা ও মাসিদের বিস্মিত চোখ পড়ল সে দুটোর দিকে। দাদামশাইয়ের এই গুপ্ত সম্পদের কথা ওঁরা কেউ জানতেন না, বোঝাই যায়। দাদামশাই কারোকে গ্রাহ্য না করে আমার হাতে সে দুটো তুলে দিয়ে বললেন, নে! সাবধানে রাখবি।

মোহর দুটো বাবাকে দেবার বদলে আমার হাতে দেবার মধ্যে যে একটা তীব্র তাচ্ছিল্য ও অপমান আছে, তা আমিও বুঝতে পারি। আমি তক্ষুনি মোহরদুটো বাবার সামনে টেবিলের ওপরে রাখলাম। বাবা সেদিকে তাকিয়েও দেখলেন না।

আত্মীয়স্বজনরা চলে যাবার পর আমি রেণুকে বড়রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেবারও সুযোগ পেলাম না। এর মধ্যেই পঙ্কজ এসে গেল। রেণু চলে গেল একা।

দিন দশেকের মধ্যে মায়ের অসুখের সংকট অনেকটা কাটল বলা যায়। এখন দীর্ঘ চিকিৎসার দরকার। আমার বিদেশে যাবার সম্ভাবনা মুছে গেল একেবারে। তবু মহীশূর পর্যন্ত যাওয়ার একটা উপকারিতা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। সুব্রতদা ওখান থেকে নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছিলেন–এক মাসের মধ্যে আমার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিলেন ওঁদের কোম্পানির কলকাতা শাখায়। সে-চাকরি প্রত্যাখ্যান করার কোনও যুক্তিই রইল না আমার। চাকরিতে জয়েন করার দিন মাকে যেন আরও অনেক সুস্থ মনে। হল। অনেক দিন বাদে বাবা আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বললেন। বাবা-মাকে খুশি করার জন্য সুযোগ্য সন্তানরা যা করে, আমিও শেষ পর্যন্ত তাই করলাম বলা যায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় রুটিন বাঁধা হয়ে গেল আমার জীবনটা। সকালবেলা প্রায় ঘুম থেকে উঠেই অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হয়। বিলিতি কোম্পানি, সুতরাং সেখানে হাজিরা দিতে যাতে আমার এক মিনিটও দেরি না হয়, সে জন্য বাবা আর মা-ই বেশি ব্যস্ত হয়ে থাকেন। একজন রাঁধুনি রাখা হয়েছে, মা বিছানায় শুয়ে থেকেই তাকে নির্দেশ দেন। দাড়ি কামিয়ে, ফিটফাট জামা-প্যান্ট জুতো পরে আমি গরম গরম ভাত খেয়েই দৌড়োই বাস ধরবার জন্য। বাবা পরামর্শ দিয়েছিলেন, একটু আগে বেরিয়ে আমি। যেন উলটো দিকের ট্রাম ধরে শ্যামবাজার চলে যাই, তা হলে সেখান থেকে বসবার জায়গা পাব। সে পরামর্শ মানা হয় না, ভিড়ের বাসে কোনওক্রমে হ্যাঁন্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ডালহৌসি পৌঁছে যাই। অফিসটাতে অধিকাংশ বাঙালি কর্মচারী হলেও যেহেতু এখনও কয়েক জন ইংরেজ আছে, তাই সবকিছুই চলে সাহেবি কায়দায়। অফিসে ঢোকার মুখে অন্যদের সঙ্গে দেখা হলেই গুড মর্নিং বলতে হয়। আমি টাই পরি না বলে ইতিমধ্যেই একজন শুভার্থী আমাকে মৃদু ধমক দিয়েছেন।

একটা বড় হলঘরের মধ্যে আমার ডেস্ক। টেবিলে অনেক কাগজপত্র, তবু আমাদের সকলের মুল কাজ, বেল বাজিয়ে কোনও সাহেব ডেকে পাঠালেই অতি দ্রুত তার ঘরে

গিয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়াননা। টেবিলে বসে এক এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। বড় বড় নিশ্বাস পড়ে। সাধারণ চাকুরিজীবীদের মতন জীবন কাটাব-এ রকম কখনও ভাবিনি। অথচ সেই জীবনই আমাকে নিতে হল। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী? মাত্র একটি দিনের ব্যবধান। আর একটি দিন খবর পেতে দেরি হলেই আমি সমুদ্রে ভেসে পড়তাম। এতদিনে আমি জার্মানিতে-

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রায় প্রত্যেক দিনই ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তর চেম্বারে যেতে হয়। মায়ের অসুখের রিপোর্ট দেওয়া ও নির্দেশ নেওয়া। অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। বড় ডাক্তারের কাছে ভিড় হয়ই, তা ছাড়া ইদানীং উনি পয়সা নিচ্ছেন না।

বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ মায়ের দেখাশুনো করা। কোনও কোনও দিন পঙ্কজ কিংবা অন্য কোনও বন্ধুবান্ধব আসে। কিছুক্ষণ আড্ডা। তারপরই খাবার খেয়ে নিয়ে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়া। কখনও বা বই মুড়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে আবোলতাবোল চিন্তা।

জীবনটা যখন এই রকম প্রায় ছকে বাঁধা হয়ে এসেছিল, সেই সময় হঠাৎ আবার সূর্যদার আবির্ভাব। সূর্যদা কলকাতায় এসে আবার সবকিছু তছনছ করে দিল।

৮৩. সূর্য কলকাতায় এসে পৌঁছোল

সূর্য কলকাতায় এসে পৌঁছোল রাতদুপুরে। পরনে চোস্ত আর শেরওয়ানি, বেশ ময়লা, গলায় মোটা মাফলার, একমুখ দাড়ি, মাথায় কঁকড়া ঝাকড়া চুল। সঙ্গে আরও দু'জন কাঠখোট্টা চেহারার লোক, ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হল বাড়িতে। বাদলরা সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দরজার শব্দ শুনে জেগে উঠল সকলে। বাদল ছাড়া আর কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। চিররঞ্জন খানিকটা ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, একটা কোনও খোঁজখবর নেই। বহু দিন কোনও চিঠিপত্র নেই, কোথায় ছিলে?

সূর্য প্রশ্নটাকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে উত্তর দিল, এই, ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম নানা জায়গায়। আপনারা সবাই কেমন আছেন?

বাদলের মায়ের অসুখের কথা শুনেও সূর্য বিশেষ কোনও ঔৎসুক্য দেখাল না। দু-চার কথার পরেই জিজ্ঞেস করল, বাড়িতে কিছু খাবারদাবার আছে? আমার সঙ্গে দু'জন লোক এসেছে, তারা আজ রাত্রে এখানেই থাকবে।

এত রাত্রে তিন জন লোকের মতন খাবার আর কী করে থাকবে? কিছুই নেই। চিররঞ্জন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। একজন রাঁধুনি রাখা হয়েছে, তাকে ডেকে তুলে কিছু তৈরি করতে বললেও অনেক রাত হয়ে যাবে।

বাদল বলল, আমি খাবার কিনে আনব? পাঞ্জাবিদের দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

সূর্য পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, যা তো, কিছু রুটি আর মাংস নিয়ে আয় তো চট করে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে যা।

বাদল একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। নিঝুম নিস্তব্ধ রাস্তা, দু'পাশের আলোগুলো ঝকমক করছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েও বাদল কোনও ট্যাক্সি পেল না। শ্যামবাজারের মোড়ের মাথায় একটা দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, সেখানে গেলে কিছু পাওয়া যাবেই। বাদল আর দেরি না করে হনহন করে হাঁটতে লাগল। সে একটুও কষ্ট বা বিরক্তি বোধ করছে না-সূর্যদাকে দেখলেই তার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আসে। সূর্যদার জন্য সে কিছু একটা করতে পারছে-এইটাই যেন ধন্য হয়ে যাবার মতন ব্যাপার। সূর্যদা ফিরে এসেছে, আবার সবকিছু বদলে যাবে-এই চিন্তা তাকে একটা চাপা উত্তেজনা দেয়। তবু, এক একবার মনের কোণে আর একটা কথাও উঁকি মারে, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে সে ভুলতে চায়, আবার মনে আসে। সূর্যদা যেন খানিকটা দেরি করে ফেলেছে। ফিরলই যখন-।

শ্যামবাজারের কাছে বাদল যখন এসে পৌঁছোল, তখন সে রীতিমতন ঘামছে। মাংসের দোকানটা সেই সময় ঝাঁপ ফেলার উপক্রম করেছে। নতুন করে কিছু রুটি বানাতে হল, মাংস খানিকটা ছিলই। একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল সেখান থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হল, সূর্যদার প্রত্যাবর্তনের সংবাদটা যেন এক্ষুনি সারা কলকাতায় জানিয়ে দেওয়া দরকার। যেখানে বাদলের যত চেনাশুনো মানুষ আছে, সকলকে এই সময়েই জানিয়ে এলে কেমন হয়। এবং রেণুকে?

বাড়িতে ফিরে বাদল দেখল চিররঞ্জন ইতিমধ্যেই আবার শুয়ে পড়েছেন। অনেক আলোই আবার নেভানো। তিনতলা থেকে সূর্যদাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে কয়েকটা প্লেট নিয়ে বাদল খাবারগুলো সমেত উঠে এল ওপরে।

তিনতলায় বড়বাবুর ঘর অনেক দিন ভোলা হয়নি। আসবাবপত্র ধুলোয় ধূসর। বাদল। সেখানে এসে দেখল, সেই ধুলোর মধ্যেই মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে ওরা তিনজন বসে গেছে, সামনে গেলাস ও মদের বোতল।

সূর্য বলল, খাবার পেয়েছিস? আয়, বোস এখানে।

বাদলের সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও আঘাত লুকোতে পারছে না। সূর্যর সঙ্গী দু'জন দুর্বোধ্য হিন্দিতে কিছু প্রশ্ন করল, বাদল ঠিক বুঝল না, সুর্য উত্তর দিল সেই রকম ভাষায়। ওদের মধ্যে একজন, যার চেহারা অনেকটা সিনেমার অমর মল্লিকের মতন, নিজের পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে চাপড়ে বলল, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, ইধার বৈঠিয়ে।

বাদল হাঁটু মুড়ে বসে প্লেট ক'খানাতে মাংস ঢেলে রুটি সাজিয়ে দিল। সূর্য এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে বলল, বাঃ বেশ।

গলা থেকে মাফলারটা খুলে সূর্য তাতে হাত মুছল। তারপর মদের বোতলটা ধরে বাদলকে জিজ্ঞেস করল, তুই একটু খাবি, তা হলে গেলাস নিয়ে আয়!

বাদল শুকনো গলায় বলল, না, না, দরকার নেই।

তুই খাস না?

না।

সিগারেট টিগারেট খাস তো। এই নে, নিতে পারিস।

সূর্য একটা সিগারেটের টিন এগিয়ে দিয়েছে। ঠিক ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় নয়, যান্ত্রিক ভাবে হাত বাড়িয়ে বাদল একটা সিগারেট তুলে নিল। দেশলাই জ্বেলে ধরাতে গিয়ে সে টের পেল, তার হাত কাঁপছে। সূর্যদাকে সে অনেক রকম অবস্থায় দেখেছে, কিন্তু এই রকম অবস্থায় দেখবার কথা সে কল্পনাও করেনি। মদ খাওয়া সম্পর্কে যে তার খুব একটা ভীতি আছে তা নয়। অনেক বিদেশি গল্প-উপন্যাস পড়ার পর সে এ-সম্পর্কে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু নীচে বাবা-মা রয়েছেন, এতদিন পরে বাড়িতে ফিরেই সূর্যদা, বিশেষত বড়বাবুর ঘরে এ রকম আসর জমিয়ে বসেছে–এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সূর্যদার আগেকার সেই গাম্ভীর্যও আর নেই, লোকদুটির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল।

একসময় সূর্য বাদলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তারপর তোদের খবরটবর কী বল?

বাদল বলল, নতুন খবর কিছু নেই। বড়দিরা অনেক দিন কলকাতায় আসেনি। আমি কিছুদিন আগে খড়্গপুরে বড়দিদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম–

প্রথম শ্রীলেখার কথাই মনে এল বাদলের। তাই সে সবিস্তারে শ্রীলেখার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সূর্য কোনও আগ্রহই দেখাল না। হঠাৎ মাঝপথে বাদলকে জিজ্ঞেস করল, তুই কি এখন কী করছিস, পড়ছিস?

লজ্জায় অবনত মুখে বাদল বলল, না, চাকরি করছি।

বাদল ভেবেছিল, সাধারণ ছেলের মতন সেও যে শেষ পর্যন্ত চাকুরিজীবী হয়ে গেছে, একথা শুনে সূর্য নিশ্চয়ই উপহাস করবে। কিন্তু সূর্য এ ব্যাপারেও কোনও মন্তব্য করল না। যেন নিছক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, উত্তরগুলি সম্পর্কে তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

বাদল এবার জিজ্ঞেস করল, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে সূর্যদা?

অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। গোয়ালিয়ার, গাজিয়াবাদ, সিমলা-এ-দিকে। কন্যাকুমারিকা পর্যন্তও গিয়েছিলাম।

এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে তো?

কী জানি!

কত দিন আর ঘুরে বেড়াবে। তোমাকেও একটা কিছু করতে হবে তো!

সূর্য এবার হাসল বেশ উঁচু গলায়। তারপর বলল, একটা কিছু করতে হবে, তাই না। দেখা যাক!

সূর্যর সঙ্গীরা গপাগপ করে মাংস রুটি খাচ্ছে। মাংসের ঝোল পড়ছে জামাকাপড়ে, তাতে কোনও হুঁশ নেই। সিগারেটের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে ঘরের যেদিকে-সেদিকে। একজন তার লম্বা পা ছড়িয়ে দিয়েছে দেওয়ালের দিকে, সেখানে গাদা করা বইতে যে তার পা লাগছে, সেটা খেয়ালই করছে না। বাদল সজ্ঞানে কখনও বইতে পা ছোঁওয়ানোর কথা চিন্তাই করতে পারে না। তার বার বার মনে হচ্ছে, বড়বাবুর ঘরটাকে যেন অপবিত্র করা হচ্ছে। এ-ঘরে এলে বড়বাবুর কথা বড় বেশি মনে পড়ে-যেন বড়বাবুর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি ভেসে আছে সর্বত্র। সূর্যদার কি একবারও মনে পড়ছে না সেসব কথা!

পরদিন সকাল নটার মধ্যেও সূর্য আর তার সঙ্গীদের ঘুম ভাঙল না। বাদল দু-তিন বার ওপরে এসে দেখে গেল। ওদের জন্য তৈরি করা চা ঠান্ডা হয়ে গেল দু'বার। ওরা কাল কত রাত্রে ঘুমিয়েছে কে জানে, তাই বাদল ডাকতে সাহস করল না।

এদিকে বাদলের অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। একবার সে মনে মনে ভেবেছিল, আজ আর অফিসে যাবে না। কিন্তু সেকথা উত্থাপনেরই সুযোগ পেল না। তার বাবা-মা-ই বার বার তাড়া দিতে লাগলেন। নতুন চাকরি, এরই মধ্যে কামাই করা চলে নাকি? বিলেতি কোম্পানি-ওদের নিয়মকানুন খুব কঠোর। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বাদল অফিসে গেল। এতদিন পরে সূর্যদা এসেছে, কত কী গল্প করার আছে।

অফিস ছুটির পর একটুও দেরি না করে বাড়ি ফিরে এল বাদল। তখন সূর্য বেরিয়ে গেছে। দুপুরে খেয়েদেয়েই সে বেরিয়েছে, কখন ফিরবে বলে যায়নি। সারা সন্ধ্যা সে অপেক্ষা করে রইল।

সূর্য ফিরল প্রায় রাত বারোটার সময়, সঙ্গীদের নিয়ে হল্লা করতে করতে। ওরা যে যথেষ্ট মাতাল হয়ে এসেছে, তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। গোপন করারও কোনও চেষ্টা নেই ওদের। ওপরতলায় উঠে গিয়ে গানবাজনা জুড়ে দিল।

দু-তিন দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে সূর্য কলকাতায় ফিরে এসেছে শুধু উপদ্রব করতে। বাদলের বাবা-মাকে গুরুজন হিসেবে ও সামান্য সমীহও করে না। ওঁদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলারও সময় নেই তার। অধিকাংশ সময়েই সে বাড়িতে থাকে না, আবার নিতান্ত অসময়ে অজানা-অচেনা লোকদের বাড়িতে ডেকে আনে। সূর্য চিরকালই একরোখা ছেলে, যখন যেটাকে ধরে সেটাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে। এখন ও বেল্লেলাপনাতেই শুধু আনন্দ পাচ্ছে।

হিমানী ও চিররঞ্জন আবার দারুণ অশান্তিতে পড়লেন। এখন সব সময় একটা কথা কাটার মতন বেঁধে, সূর্যই এই বাড়ির মালিক। তাকে জোর করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু বাড়ির মালিক হলেই যে সে যা খুশি তাই করবে, এটাই বা সহ্য করা যায় কী করে? ভদ্রসমাজে সম্মানরক্ষা করে বাঁচতে হবে তো!

হিমানী হঠাৎ একদিন জেদ ধরে বসলেন, তিনি আর এ বাড়িতে থাকবেন না। বিয়ের পর থেকে এতগুলো বছর তাকে কত রকম অপমান সহ্য করতে হয়েছে, এখন মরার আগে তিনি একটু শান্তি পেতে চান। চিররঞ্জনকে তিনি বললেন, আমার ছেলে এখন চাকরি করে, সে কি এখন আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। কেন আমরা অপমান সহ্য করে এখানে থাকব। যত সব ম্লেচ্ছদের উৎপাত শুরু হয়েছে।

বাদলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, কী রে, তুই পারবি না? তোর বাবা তো সারা জীবন আমাদের জন্য একটা বাসা জোগাড় করতে পারল না। পাঁচজনকে আমি বলতে পারব তবু আমার ছেলে আমার জন্য...

পুত্রগর্বে হিমানী তার স্বামীকেও অপমান করতে দ্বিধা করেন না। চিররঞ্জন প্রতিবাদ করে বললেন, কেন, আমরা এবাড়ি ছাড়ব কেন? এতদিন রইলাম, দেখাশুনো করলাম-এখন এখানে থাকার একটা রাইট আছে আমাদের। কাগজপত্তরও সব আমার কাছে। আমরা না থাকলে তো এ বাড়ি এতদিনে বেওয়ারিশ হয়ে যেত।

হিমানী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, লাথিঝাঁটা খেয়েও তুমি এখানে থাকতে চাও! বেশ তো, তুমি থাকো। ছেলেকে নিয়ে আমি আলাদা থাকব।

বাড়ি ভাড়া করে আলাদা সংসার করা কি কম খরচের কথা। বাদল কতই বা মাইনে পায়। এর ওপর তোমার চিকিৎসার খরচ আছে।

দরকার নেই আমার চিকিৎসার। না হয় আধপেটা খেয়ে থাকব-তবু এই কুলাঙ্গারের সঙ্গে এক বাড়িতে...

মা কোনও দিনই সূর্যদাকে ঠিক পছন্দ করেননি।

সূর্যদার জন্মবৃত্তান্ত মা কখনও ভুলতে পারেন না। সামাজিক রীতিনীতিগুলোকে মা বড় বেশি মূল্য দেন। সমাজও যে বদলায়, মা'র সেদিকে খেয়াল নেই। সূর্যদার স্বভাবের। ছেলেমানুষি দিকটাও মা'র চোখে পড়ে না।

মা বাবার বচসার সময় বাদল কোনও কথা বলে না। তার মনটা বিস্বাদ হয়ে যায়। আজকাল যখন তখন হঠাৎ টাকাপয়সার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। টাকাপয়সাকে কেন্দ্র করেই যা কিছু শান্তির চিন্তা। যে-চাকরিটাকে সে একেবারেই পছন্দ করে না, সেই চাকরির কয়েকশো টাকা মাইনের ওপরেই নির্ভর করছে তাদের পারিবারিক নিরাপত্তা যতদিন বাবা-মা বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাকে এই চাকরি থেকে উপার্জন করে যেতে হবে। এর নাম দায়িত্ব। সে নিজের ইচ্ছে মতন বাঁচতে পারবে না। যাদের টাকা আছে, শুধু তারাই নিজের ইচ্ছে মতন বাঁচবে। যে শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন সে কলেজজীবনে দেখেছিল, তা আজ কত দূরে সরে গেছে। কোনও সমাজেই আর মানুষের মুক্তি নেই। এখনও মানুষ আলাদা ভাবে নিজের চেতনার জগতেই শুধু মুক্তি খুঁজতে পারে। বাদল নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে।

সব অশান্তির মূল যে, সেই সূর্যদার ওপরে বাদল তবুও রাগ করতে পারে না। সেই ছেলেবেলা থেকেই তার ধারণা, সূর্যদা একদিন-না-একদিন বড় কিছু একটা করবে। এখনও সেই ধারণাটা ছাড়তে পারে না। সূর্যদা এ-পর্যন্ত একবারও সুস্থির হতে পারল না। একটু সুস্থির হলেই সূর্যদা অনেক কিছু করতে পারে।

অফিস থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে এসে বাদল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। রেণুর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। অনেক দিন দেখা না হলেও রেণু কি বুঝতে পারে যে ওকে দেখার জন্য সে সব সময় ছটফট করছে? কম বয়সে সন্দেহ কিংবা ঈর্ষা– এসব কিছুই থাকে না। কয়েক বছর আগেও পরস্পরের ওপর নির্ভরতা ছিল, তা কী করে চলে গেল? এখন কয়েক দিন চোখের আড়াল হলেই বাদলের মনে হয়, রেণু বুঝি তাকে ভুলে গেছে। কিংবা, অন্য কোনও রূপবান, গুণবান যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। হেসে হেসে। দেবুদার পর্বটা অনেকটা চুকেছে। মহীশূর থেকে ফেরার কয়েক দিন পর বাদল

নিজেই রেণুর সঙ্গে দেখা করে তার মান ভেঙেছিল। তখন সব মিলিয়ে বাদলের অপরাধবোধ খুব প্রবল ছিল।

অফিসে চাকরি নেবার পর রেণুর সঙ্গে আর নিয়মিত দেখা হয় না। রেণু কখনও কখনও বাড়িতে আসে। আজ সকাল থেকে নানা রকম পারিবারিক ঝামেলার কথা চিন্তা করতে করতে বাদলের একসময়ে মনে হয়েছে, রেণুকে আমার চাই। রেণুকে আরও বেশি সময়ে খুব কাছাকাছি না পেলে আমি বেঁচে থাকতে পারব না।

ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে, গেটের কাছে রেণুকে দেখতেও পেল বাদল। কিন্তু রেণু রাস্তা পার হবার পরেই একটা মিছিল এসে পড়ল। পর পর তিনটি গাড়ি আসছে ধীর গতিতে, তার সামনে পেছনে একদল ছেলে লাফালাফিই করছে মহা উৎসাহে। বিরাট বড় কংগ্রেসের পতাকা, গান্ধীজির ছবি, সেই সঙ্গে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। মাঝখানের জিপ গাড়িতে ফুলের মালা গলায় এক ব্যক্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাদল চিনতে পারল। শংকর বোস। কাশীপুর বাই ইলেকশানের ফলাফল বেরিয়েছে আজ, শংকর বোস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। উনি যে জিতবেনই সবাই জানত–তবু এই আনন্দ উৎসবের মিছিল।

বাদল ওই মিছিলের সব মানুষ এবং গাড়ি তিনটের মধ্যে দ্রুত চোখ বোলাল একবার। শংকর বোসের গাড়িতেই সে দেখতে পেল দীপ্তিদিকে। মৃদু হাসিমাখা মুখে দীপ্তিদি আরও দু-তিন জন মহিলার সঙ্গে বসে আছেন পেছনের সিটে। বাদলের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এই জন্যই তার মনে হয়েছিল, সূর্যদা যখন ফিরলই, এত দেরি করে ফিরল কেন?

বাদল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল দীপ্তিদির দিকে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একদিনের কথা। বড়বাবু যে-দিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সে-দিন বাদল সূর্যকে খুঁজতে গিয়েছিল দীপ্তিদির বাড়িতে। ঘরের মধ্যে সূর্যদা আর দীপ্তিদি ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওদের চোখের দৃষ্টি দেখেই বোঝা গিয়েছিল, ওরা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালোবাসে। তবু ওরা এত দূরে সরে গেল কেন?

উল্লাস-মিছিলটা এইটুকু পথ পেরিয়ে যাবার জন্য যতটুকু সময় লাগা উচিত ছিল, তার চেয়েও বেশি সময় লাগছে। সামনের দিকটা থেমে পড়েছে হঠাৎ, তরুণ ভলান্টিয়াররা নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। সাধারণত বিপক্ষ দলের শক্ত ঘাঁটিগুলোর সামনেই জয়ের আনন্দ বেশি করে দেখাবার নিয়ম। কলেজ পাড়ার ইউনিয়নগুলো অধিকাংশই এখন এস এফ-এর দখলে, তাই কংগ্রেসের ছেলেরা এখানে বীরত্ব দেখাতে চায়। বাদল যদিও আবার তার পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, তবু রক্তের মধ্যে তার রেশ রয়ে গেছে। এখনও। সে নির্বিকার থাকতে পারে না, ভোটে-জেতা কংগ্রেসিদের এই আস্ফালন দেখে। তার রাগ হয়, দাঁতে দাঁত চেপে সে চোয়াল শক্ত করে।

জিপের ওপর দাঁড়িয়ে শংকর বোস হাত জোড় করে, এ-দিকে ও-দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। তবে সাধারণত এইসব পরিস্থিতিতে এইসব লোকের মুখে যে একটা বিগলিত হাসি থাকে, ওঁর মুখে সে রকম হাসিটা নেই। বরং বেশ খানিকটা ক্লান্ত ভাব। দেখলেই মনে হয়, মানুষটি তার জীবনে বহু পথ ও বহু সংঘর্ষ পার হয়ে এসেছেন। এখন যেন তার খানিকটা বিশ্রাম ও আরামের প্রয়োজন। খবরের কাগজগুলো আগে থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছে, ভোটে জিতলেই শংকর বোস অন্তত রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবেনই। অর্থাৎ ক্লান্ত বিপ্লবীর জন্য এবার আরামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

মিছিলটা পার হতে হয়তো সময় লেগেছিল দশ বা বারো মিনিট। কিন্তু বাদলের মনে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। সে অধীর হয়ে উঠল। তার মনে হল এই মিছিলটা একটা অজগর সাপের মতন তার আর রেণুর মাঝখানে পড়ে আছে–কিছুতেই দু'জনকে। কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না। ভিড়ের আড়ালে রেণুকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন। এরপর কি আর রেণুকে সে খুঁজে পাবে? মনশ্চক্ষে সে একটা অজগর সাপই দেখতে পাচ্ছিল, ঘোর ভেঙে সে নিজেকে ভর্ৎসনা করল। মনে মনে বলল, আমি বড় বেশি রোমান্টিক, তাই আমার এত দিনেও একটুও বাস্তব বুদ্ধি হল না। শুধু শুধু মনগড়া দুঃখে আমি কষ্ট পাই। মিছিল আর কতক্ষণ থাকবে, এক্ষুনি চলে যাবে, রেণুকে আমি খুঁজে পাব। ওই তো, মিছিল নড়তে শুরু করেছে, অজগর নয়, মিছিলই। সে আবার তাকাল দীপ্তিদির দিকে।

দীপ্তিদি বড় সুন্দর। যেন দীপ্তিদি বাদলেরই প্রেমিকা, এই ভাবে বাদল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বস্তুত বাদলের দীর্ঘশ্বাসের কারণ এত সরল নয়, আরও অনেক জটিল।

বাদল রেণুকে আগেই দেখেছিল, কিন্তু রেণু তো তাকে দেখেনি। রেণু তার দু'জন বান্ধবীর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল বাস স্টপের দিকে, বাদল দ্রুত হেঁটে তার আগেই সেখানে দাঁড়াল। রেণুর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করল। রেণু কী একটা গল্পে মত্ত। অন্য দিন। হলে বাদল অন্য মেয়ের সামনে রেণুর সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেত, কিন্তু আজ সে। কিছুতেই রেণুকে চোখের আড়াল হতে দিতে পারে না। সে কাছে গিয়ে ডাকল, ইন্দ্রানী!

রেণু মুখ ফিরিয়ে বাদলকে দেখল, তারপর বান্ধবীদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই এগিয়ে এল বাদলের দিকে। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? কী?

বাদল হকচকিয়ে গিয়ে বলল, কিছু হয়নি তো? কেন?

তুমি হঠাৎ দুপুরবেলা–

এমনিই। মানে–

কিছু হয়নি তা হলে? বাবাঃ!

রেণু হেসে ফেলল। মেয়েদের এ রকম আকস্মিক হাসির অর্থ ছেলেরা আবার কবে বুঝতে পেরেছে! বাদল বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইল।

রেণু মুখ তুলে তার সঙ্গিনীদের উদ্দেশে বলল, তোরা যা, আমি একটু পরে যাব।

তারপর আবার বাদলের দিকে ফিরে বলল, মুখ-চোখের কী রকম চেহারা হয়েছে। তোমার, গলার আওয়াজ অন্য রকম-"আমি ভয় পেয়ে ভাবলাম কিছু একটা বিপদ হয়েছে বুঝি!

মুখ-চোখের চেহারা কী রকম?

জানো না? ওই পানের দোকানের আয়নায় মুখটা দেখে নাও? মাসিমা কেমন আছেন?

বাদল এর মধ্যে এক দিনও অফিস কামাই করেনি, দুপুরে পালায়নি, সুতরাং হঠাৎ তাকে দেখে রেণু ধরে নিয়েছে অন্য কিছু। কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা পালটাল কেন? বাদল জানে না। রেণু কি ভেবেছে, বাদল আর কখনও হঠাৎ যে-কোনও সময়ে রেণুর

সঙ্গে দেখা করতে আসবে না?

রেণু খবর জানতে চেয়েছিল বলেই বাদল বলল, জানো, সূর্যদা ফিরে এসেছে।

রেণু উৎসাহিত হয়ে বলল, তাই নাকি? কোথায় ছিলেন এতদিন? কী রকম চেহারা হয়েছে?

মুখ-ভরতি দাড়ি গোঁফ।

আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো না।

খুব ব্যস্ত। তুমি এসো আমাদের বাড়িতে। এখন চলো না।

এখন? এখন যে আমাকে একবার বাড়িতে ফিরতেই হবে।

প্লিজ রেণু, আজ একটু থাক আমার সঙ্গে। আমি তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

কয়েকটা কথা মানে আগে থেকে ঠিক করা বিশেষ কোনও কথা নয়। বাদল চাইছে রেণুর সঙ্গ। শরীরের যে একটা দুরন্ত পিপাসা আছে, তা কিছুক্ষণের সান্নিধ্য ও কথাবার্তাতেও অনেকখানি মেটে। আজ সকালেই বাদল ঠিক করেছে, রেণুকে অনেকক্ষণের জন্য কাছাকাছি না পেলে তার চলবে না, সে বিদেশে পালাতে পারেনি, এবার রেণুর বুকের কাছে আশ্রয় নেবে। আর দু'বছরের মধ্যেই বিয়ে করবে সে, ততদিনে রেণুর পরীক্ষা হয়ে যাবে। একথাটা রেণুকে এখন জানাবার দরকার নেই।

রেণু বলল, কিন্তু আমার যে বাড়ি ফেরা বিষম দরকার এখন?

কেন, কেউ আসবে বুঝি?

বাদলের এই প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল, রেণু তা পছন্দ করল না। সে দৃষ্টিতে সামান্য ছিঃ দিয়ে তাকাল বাদলের দিকে। তারপর বলল, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

বাদল দুঃখিত ভাবে বলল, তোমের কাজ থাকলে আমি আর গিয়ে কী করব?

আমি শাড়িতে বাটিকের কাজ করছি। রং টং সব ভিজিয়ে রেখে এসেছি। এখন না। গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি রং করব, তুমি পাশে বসে গল্প করবে।

বাদলের মনের মেঘ কেটে গেল। এটা একটা ভালো আহ্বান। মেয়েদের কোনও রকম মেয়েলি কাজ করতে দেখলে বাদলের সেই সময়টা বেশ ভালো লাগে। যেমন রান্নাঘরে। কুটনো কুটতে বসা কিংবা স্নান করার পর চুল ঝাড়ার সময়, কিংবা মেয়েরা যখন কাঁচের চুড়ি পরে, তখন বাদলের চোখে তাদের অন্য রকম একটা রূপ ভেসে ওঠে, যাতে অন্য রকম মোহ। রেণুর বাটিক রচনার দৃশ্যও সে উপভোগ করবে।

উৎসাহে দরাজ হয়ে বাদল একটা ট্যাক্সি ডেকে বসল। রেণুর আপত্তি শুনল না। ট্যাক্সিতে উঠে সে রেণুকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তোমার দু'জন বন্ধুর সঙ্গে বাসে উঠতে যাচ্ছিলে– তারপর আমার সঙ্গে চলে এলে, ওরা কিছু ভাবল না?

রেণু বলল, ভাবুক না! তুমি একদিন বলেছিলে, অন্য লোকের সামনে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি না। আসলে তা নয়। তুমিই অন্য লোকের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাও! তোমার মনের মধ্যে সব সময় থাকে, অন্য কে কী ভাবছে। আমি তা গ্রাহ্য করি না।

এটা তর্ক করার বিষয় নয়। বাদল সন্ধি করার কার্যক্রম হিসেবে রেণুর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। কী পরিচ্ছন্ন নরম হাত। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রং লেগে আছে, না,

মেহেদি নয়, সকালবেলা বাটিকের রং গুলেছিল। অনেক দিন পর বাদলের মাথায় দু'লাইন কবিতা জেগে উঠল অকস্মাৎ! প্রথম শ্লোক উচ্চারণের পর বাল্মীকি যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, ততটা না হলেও বাদল রীতিমতন অবাক হয়ে মনে মনে বলেছিল, এ কী! আবার কবিতার উৎপাত কেন? পরে বাদলের সেই কবিতাটি ছাপা। হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবয়ের মতন বিদগ্ধ সমালোচক দু-এক জনকে বলেছিলেন, ছেলেটি কে? বেশ লিখছে তো!

কবিতার সৌরভ অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। রেণুদের বাড়ির গেটে ওর ছোটকাকা দাঁড়িয়ে ছিলেন। রেণু ও বাদলকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে তিনি সরু চোখে তাকালেন। তারপর তার অখুশি মুখে অনাবশ্যক হাসি ফুটিয়ে বললেন, এই যে, বাদলকুমার যে, অনেক দিন দেখিনি! কোথায় ছিলে?

ছোটকাকা সম্পর্কে বাদলের মনোভাব রেণু জানে। তাই সে তাড়াতাড়ি বাদলকে বলল, চলো, ওপরে চলো–।

কিন্তু ছোটকাকা বাদলের হাত ধরে বললেন, আরে বোসো বোসো। এখানে একটু বোসো, তোমার সঙ্গে গল্প করি। চাকরিবাকরি পেয়েছ?

বাদলকে ফেলেই রেণু তর তর করে ওপরে উঠে গেল। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই। আবার নেমে এসে বলল, এই ওপরে এসো। মা তোমাকে খাবার দিয়েছেন!

ছোটকাকার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাদল রেণুর সঙ্গে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। মনটা আবার একটু বিস্বাদ হয়ে গেছে। মামলাবাজ ছোটকাকাটি অতি পাজি, হাসতে হাসতে অনেকখানি বিষ ঢেলে দিয়েছে বাদলের কানে।

সিঁড়ির বাঁক ঘুরে রেণু থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল, এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রথম স্বাধীনতার দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মনে আছে?

বাদলের মনে ছিল না। মনে পড়ল। সে ঘাড় নাড়ল।

রেণু বলল, তুমি আমার জন্য অন্তত আমাদের বাড়ির কারওর ওপর কখনও রাগ করবে না। পারবে?

পারব।

মুড়ি, চিঁড়েভাজার সঙ্গে নারকোলকোরা আর চিনি মিশিয়ে একবাটি দেওয়া হল বাদলকে। রেণুদের বাড়িতে এই সুখাদ্যটি বাদল আগে অনেক বার খেয়েছে। আজ অবশ্য অনেক দিন পরে ওপরে এসেছে। কিন্তু রেণুকে আর নিরিবিলি পাওয়া গেল না। সে বাটিকের রং করতে বসতেই তার কাকিমা, পিসিমা এবং অন্য ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে রইল।

একটু বাদে সেখানে এসে দাঁড়ালেন রেণুর মা। মুখখানায় গাম্ভীর্য ও দুঃখ মাখা। ছেলেবেলায় বাদল সব সময় রেণুর মাকে হাসিখুশি দেখেছে। দেখলেই মনে হত, খুব সরল ধরনের ভালোমানুষ। পর পর কয়েকটা নিদারুণ শাক পেয়ে ওঁর আর মাথার ঠিক নেই এখন।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি বাদলের দিকে তাকালেন। বাদল তাড়াতাড়ি হাতের বাটিটা নামিয়ে রেখে ওঁকে প্রণাম করল। রেণুর মা বললেন, বাদল, আমার সঙ্গে একটু এসো তো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

৮৪. রেণু এল পরদিন সকালবেলা

রেণু এল পরদিন সকালবেলা। বাদল তখন খেতে বসেছে। নীচে সদর দরজায় একজন ভিখিরি সেই সময় গান করছিল খঞ্জনি বাজিয়ে। গরম ডাল আর ভাত মাখতে মাখতে বাদল মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সেই গান। ভিখিরিটি অনেককাল ধরেই আসে, ভাঙা ভাঙা গলায় গায়:

নিম খাওয়ালে চিনি বলে
কথায় করে ছল- ও- ও–
মিঠার লোভে তিতো মুখে
সারা দিনটা গেল- ও- ও–

বাদল এইসব গান শুনতে ভালোবাসে। ভিখিরিটিকে একটা পয়সা দেওয়া দরকার। কিন্তু কে দেবে? চিররঞ্জন বেরিয়ে গেছেন, হিমানী স্নানের ঘরে। রাঁধুনিটি কানে ভালো শোনে না, তা ছাড়া এত বেশি বুড়ি যে তাকে নীচে পাঠাতে মায়া হয়। বাদল নিজেই খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে পয়সা দিয়ে আসবে ভাবছিল, এই সময় দেখতে পেল, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে রেণু উঠে আসছে।

বাদল রেণুকেই বলল, আমার জামার পকেট থেকে পয়সা নিয়ে নীচে ওই লোকটাকে দিয়ে এসো না!

রেণু বাদলের কাছ থেকে পয়সা নিল না, নীচে নেমে গেল। নিশ্চয়ই অনেক বেশি পয়সা দিয়েছে। বাদল উপর থেকেই শুনতে পেল, লোকটি রেণুকে আশীর্বাদ করছে, বেঁচে থাকো, সুখে থাকো মা। ধনে-পুত্রে সৌভাগ্যবতী হও, রাজরাজেশ্বরী হও

বাদল একটু হাসল এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সে গুন গুন করতে লাগল গানটা। এক একটা গানের লাইন হঠাৎ বিনা কারণে মাথায় গেঁথে যায়। বেগুনভাজাতে কামড় দিয়েও বাদল গাইছে, মিঠার লোভে তিতো মুখে সারা দিনটা গেল- ও- ও- ও

রেণু ফিরে এসে বলল, তুমি এরই মধ্যে খেতে বসে গেছ? কটায় বেরোতে হয়?

বাদল বলল, ন'টা কুড়ি। এখন ক'টা বাজে? ন টা পাঁচটাচ হবে বোধহয়।

মাসিমা কোথায়?

চান করছেন। বোসো না এখানে। তুমি কিছু খাবে?

না, আমি কিছু খাব না। আমার সামনে খেতে তোমার লজ্জা করবে না তো? ছেলেদের এ রকম হয় শুনেছি।

বাদল হঠাৎ অনুভব করল, রেণু আর ছেলেমানুষ নেই। বয়সের তুলনাতেও সে এখন অনেক বেশি পরিণত। তার চলা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে ব্যক্তিত্ব, সে একটি পরিপূর্ণ যুবতী। এক নিমেষের জন্য রেণুকে বাদলের খুব অচেনা লাগে।

বাদল খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করছে আর রেণু দেখছে তাকে। দাঁড়িয়েই আছে। প্রায় দিনই সকালে মাছটাছ রান্না হয় না, বাদলের সে জন্য একটু লজ্জার ভাব এসেছিল, কিন্তু রেণু সে-সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করল না। জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাড়িটা এত চুপচাপ কেন? সূর্যদা কোথায়?

সূর্যদা ঘুমোচ্ছে এখনও।

এত বেলা অবধি? সূর্যদা না আগে ভোরবেলা উঠে এক্সারসাইজ করতেন?

সে-সব কতকাল আগেকার কথা।

সূর্যদাকে আমি ডাকব?

বাদল কিছু উত্তর দিল না। সূর্যদা কাল কত রাত্রে ফিরেছেন, বাদলও তা জানে না। কেউ ডাকে না ওকে, যখন খুশি ওঠে, যখন খুশি স্নান-খাওয়া করে।

রেণু সূর্যকে ডাকবার জন্যই চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে এল। জিজ্ঞেস করল, কাল। আমার মা তোমাকে ডেকে নিয়ে কী বললেন?

বাদল ভাতের থালার দিকে মনোনিবেশ করে বলল, কিছু না তো! ও এমনিই। জিজ্ঞেস করছিলেন আমার মায়ের অসুখের কথা

আর কিছু বলেননি?

বাদল মুখ তুলল না। থালার ওপর দাগ কাটতে কাটতে বলল, না তো। আর কী বলবেন?

তুমি আর ভাত নেবে না? এইটুকু মোটে খাও?

অনেক খেয়েছি। এক্ষুনি দৌড়োদৌড়ি করে যেতে হবে।

বারান্দার বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বাদল আবার সেই গানটা গাইতে লাগল মুখ বুজে। সে যে গান গাইছে তার নিজেরই খেয়াল নেই।

জুতোর ফিতে বেঁধে, শোওয়ার ঘরের ঘড়িতে উঁকি মেরে দেখে বলল, এখনও পাঁচ-সাত মিনিট সময় আছে।

এই সময় ওপর থেকে সূর্যর গলা ভেসে এল, বাদল, এক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বল তো।

সূর্য এখন দোতলার নিজের ঘরটা ছেড়ে তিনতলার বড়বাবুর ঘরটাতেই পাকাপাকি আশ্রয় নিয়েছে। তার খাবারটাবার ওখানেই পাঠাতে হয়।

বাদল বলল, সূর্যদা জেগে উঠেছে, তুমি দেখা করবে বলছিলে তো, চলো–

রেণু একটু অবাক চোখে বাদলের দিকে তাকায়। বাদলের কিছু একটা হয়েছে আজ। তার ব্যবহারে যেন খানিকটা শুকনো ভদ্রতার ছাপ। তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাদল বলল, সূর্যদা, রেণু এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

যদিও বাতাসে শীতের আমেজ রয়েছে, তবু সূর্য তিনতলার বারান্দায় একটা খাকি রঙের প্যান্ট পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মাথার ঝকড়া আঁকড়া চুল ও দাড়ি-গোঁফের জন্য তাকে পশ্চিমি সৈন্যের মতন দেখায়। অল্প নিদ্রার ক্লান্তিতে চোখের নীচে গভীর কালো দাগ।

ভরাট গম্ভীর গলায় সূর্য বলল, ও, এই রেণু। চিনতেই পারিনি, এর মধ্যে এত বদলে গেছে।

রেণু বলল, আমিও আপনাকে চিনতে পারিনি। এ কী বিশ্রী চেহারা হয়েছে আপনার!

বিশ্রী চেহারা। তাই বুঝি!

শেষ বার যখন আপনাকে দেখি, তখন আপনার মাথা ন্যাড়া ছিল, ঠিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন দেখাচ্ছিল।

সূর্য হেসে উঠে বলল, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী? হ্যাঁ, মনে আছে বটে, তুমি তাই বলেছিলে আমাকে। তখন ন্যাড়া ছিলাম, এখন পাঁচ-ছ'মাস চুলই কাটিনি।

কেন কাটেননি কেন?

কী দরকার? বেশ তো আছে।

মোটেই বেশ নেই। এ রকম চেহারায় থাকতে কারওর ভালো লাগে বুঝি? আজই চুল কেটে আসুন।

এই কথাটা বাদল এবং তার বাড়ির সকলে সূর্যকে অনেক বার বলবে ভেবেছে। কিন্তু বলতে পারেনি। রেণু অনায়াসে বলতে পারে। সূর্য তার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়। ঘরে ঢুকে একটা বোতামহীন শার্ট পরে নিয়ে বলল, বোসো!

কোথায় বসবে রেণু। ঘরটা নোংরা হয়ে আছে। খাটের ওপর এলোমেলো বিছানা পাতা। মেঝেতে কার্পেটের ওপর ছেঁড়া কাগজ, দেশলাই কাঠি, সিগারেটের প্যাকেট। দরজার পাশেই গড়াচ্ছে দুটো খালি মদের বোতল।

বড়বাবুর ইজিচেয়ারটা হাত দিয়ে খানিকটা পরিষ্কার করে বাদল রেণুকে বলল, তুমি এখানে বোসো। সূর্যদার সঙ্গে কথা বলো, আমি চলি তা হলে?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, তোকে এক্ষুনি যেতে হবে। তোর কী অফিস রে? কোন কোম্পানি?

গত বারো দিনের মধ্যে এ-প্রশ্ন করার অবকাশ বা ইচ্ছে হয়নি সূর্যর। বাদল সংক্ষেপে অফিসের কথা জানাল। সূর্য বলল, আমাকেও একটু বাদে বেরোতে হবে।

বাদল বলল, রেণু ততক্ষণ বসুক। আমি দুকাপ চা পাঠিয়ে দিতে বলছি এককড়ির মাকে।

রেণু বলল, মাসিমার স্নান হয়ে গেলে আমি মাসিমার সঙ্গে দেখা করে তারপর যাব।

বাদল আর অপেক্ষা করল না। বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার মোড়ে এসেই সে লাফিয়ে উঠে পড়ল একটা চলন্ত বাসে। তখনও সে গুন গুন করছে সেই গানের লাইনটা, 'মিঠার লোভে তিতো মুখে সারা দিনটা গেল-ও-ও-। সারা দিনেও এই লাইনটা তার মাথা ছাড়ল না, অফিসে প্রায় সর্বক্ষণ, এমনকী, সাহেবের ঘরে গিয়েও সে মনে মনে লাইনটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সূর্য রেণুকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কী করছ। পড়াশুনো?

হ্যাঁ।

যথেষ্ট বড় হয়ে গেছ তো। আর পড়াশুনো করার কী দরকার?

বাঃ, পড়ব না? বড় হওয়ার সঙ্গে পড়াশুনোর কী সম্পর্ক?

হুঁ। তোমার কী সাবজেক্ট? আর্টস না সায়েন্স!

আর্টস। আমি ইকনমিকসে অনার্স নিয়েছি। আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আপনার সম্পর্কে আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেছিলাম। তখন তারা

আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছিল। কিন্তু আপনাকে তো কত দিন খুঁজেই। পাওয়া যায়নি।

আমার কাছে আবার কী প্রশ্ন?

আপনারা এই যে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করলেন, এত কষ্ট সহ্য করলেন, তারপর একদিন স্বাধীনতা এল-কিন্তু তাতে আমাদের কতটুকু লাভ হল! দেশ কতটা বদলাল?

আমি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলুম নাকি? ভুলে গেছি সেসব কথা।

আপনি ভোলার চেষ্টা করলেও আমরা তো ভুলব না।

যারা এখন দেশটা চালাচ্ছে, তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

তারা তো আছেই। কিন্তু আপনারাই বা দায়িত্ব অস্বীকার করবেন কী করে? শুধু স্বাধীনতা এনেই কি আপনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল? অবশ্য আমার অনেক বন্ধুরা বলে, দেশে এখনও আসল স্বাধীনতা আসেইনি। একটা নকল স্বাধীনতার নাম করে আমাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

রেণুর কণ্ঠস্বরে একটু উত্তেজনা ছিল, সূর্য তা গ্রাহ্য করল না। সে দু'হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমি স্নান করতে যাব। তুমি এবার নীচে যাও।

লালচে হয়ে গেল রেণুর মুখ। ঝট করে অপমানের ছোঁয়া লেগেছে। তীব্র চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন; আপনি আমার এসব কথার উত্তর দেবেন না?

সূর্য নিরাসক্ত ভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, আমার ওসব কিছু মনে নেই। প্লিজ, আমার কাছে এসব প্রশ্ন তুলো না। আমি নিরিবিলিতে থাকতে চাই।

আপনি যে এতদিন পাহাড়ে না জঙ্গলে কোথায় পালিয়ে ছিলেন, সেখানে আপনাকে কেউ এসব প্রশ্ন করতে যাবে না ঠিকই। কিন্তু কলকাতায় থাকলে আপনাকে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।

আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম বুঝি?

নিশ্চয়ই।

সূর্য কয়েক পলক রেণুর দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইল। নতুন যৌবনে ঝকমক করছে রেণুর শরীর, মুখে-চোখে একটুও মালিন্য নেই, দ্বিধা নেই। সূর্যর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল মুগ্ধতা। সে বলল, মেয়েদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়, তা আমি জানি না। আমি দুঃখিত, রেণু, তোমাকে কোনও কথাই আমি ঠিক মতন বলতে পারব না।

মেয়েদের আবার কী! আপনি আমাকে কতদিন ধরে চেনেন, সহজ ভাবে কথা বলতে পারেন না?

তোমাকে কি আমি খুব বেশি দিন চিনি?

বাঃ চেনেন না? মনে নেই, সেই কত দিন আগে, প্রথম যেদিন আপনি আমাদের বাড়িতে এলেন-আপনার মাথা ফেটে গিয়েছিল, বাদলদা আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল!

গিয়েছিলাম বুঝি? আমার তো মনে পড়ে না।

আমার সব মনে আছে।

তোমার নিশ্চয়ই অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। সেই তুলনায় আমি একটা গবেট।

আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি সব কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। আপনার কী হয়েছে। বলুন তো?

সূর্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার মাথা ধরে আছে। স্নান করে দুটো অ্যাসপ্রো না খেলে সারবে না।

নীচে গিয়ে বাদলের মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার পর রেণু রাস্তায় বেরিয়ে দেখল, সূর্য বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রেণুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেও সূর্য অন্যমনস্ক ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। রেণু ওর কাছে পৌঁছোবার আগেই সূর্য উঠে পড়ল একটা ট্যাক্সিতে। রেণুর মুখে একটা দুঃখের ছাপ পড়ল! কোনও মানুষের কাছেই সে এ রকম ব্যবহার আশা করে না। রেণুর নিজস্ব জগতে প্রত্যেক মানুষই সহজ, স্বাভাবিক এবং সুস্থ।

বাদল অফিস ছুটির পর বাড়ি ফেরা বন্ধ করে দিয়েছে। মায়ের অসুখটায় একঘেয়েমি এসে গেছে। হিমানী কখনও একটু ভালো হয়ে ওঠেন, আবার কিছুটা অনিয়ম করলেই শয্যাশায়ী হতে হয়। সম্পূর্ণ সেরে ওঠার আর বুঝি কোনও আশা নেই। মায়ের বিছানার পাশে বাদল এখন কদাচিৎ বসে, কারণ, বসলেই হিমানীর মুখে একটানা-একটা অভিযোগ শুনতে হবে। চিররঞ্জন বাড়ি খোঁজা শুরু করেছেন, হিমানী এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর। সূর্যর ব্যবহার দিন দিন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

অফিস ছুটির পর বাদল ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে চলে যায় ইদানীং। প্রথম কয়েক দিন এলোমেলো বই পড়ছিল, তারপর সে সুনির্দিষ্ট ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনো শুরু করে। পৃথিবী ও প্রাণের সৃষ্টি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত তাকে আকৃষ্ট করতে লাগল খুব।

ন্যাশানাল লাইব্রেরি বন্ধ হয় ন'টার সময়। সেখান থেকে বেরিয়ে তার কোনও তাড়াহুড়ো নেই বাড়ি ফেরার জন্য। বাসে না উঠে সে ময়দানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। অলস, মন্থর তার গতি, আপনমনে সিগারেট টানে কিংবা বাদামভাজা কিনে চিবোয়।

বাড়ি সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই বাদলের, অথচ তার অন্য কোথাও যাবার জায়গাও নেই। তার বয়সি ছেলেরা রাজনীতি অথবা নাটক করে, রবীন্দ্রসংগীত গায় অথবা সাহিত্য

নিয়ে তর্ক করে কিংবা স্রেফ আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়।বাদল এর সবক'টা দল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে তার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সূর্য সত্যিই খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বাড়িতেই এখন তার মূল আড্ডা। কী সব অদ্ভুত চেহারার নোক আসে তার। কাছে, কারওর মাথা কামানো, কারওর গলায় রুমাল বাঁধা, এদের মধ্যে অনেকের চাউনির ধরনধারণ দেখলে ভয় লাগে। সূর্য যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আর মিশবেই না। ওই লোকগুলোর বাড়িতে আনাগোনার একটি কারণ, সূর্য নাকি ওদের সঙ্গে কী একটা সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করবে ঠিক করেছে। 'ভাদুড়ী ট্রেডার্স' নামে একটা সাইনবোর্ডও লাগানো হয়েছে বাড়ির সামনে।

সূর্যর এখন টাকায় টান পড়েছে বলেই বোধহয় কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। বড়বাবুর জমানো টাকাপয়সার প্রায় সবটাই সে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। চিররঞ্জনের সঙ্গে টাকাপয়সা সংক্রান্ত আলোচনায় সূর্য একবার একথাও বলেছে যে, তার ব্যবসায়ের বিনিয়োগের প্রয়োজনে তাকে হয়তো বাড়িটাই বিক্রি করতে হবে। তা হলেই আর কিছু বাকি থাকে না! এ-কথা সকলেই জানে, সূর্যর দ্বারা কোনও দিনই ব্যবসা হবে না। সে সবকিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে। সূর্যর কাছে যে-সব লোকেরা আসে, তারা। ব্যবসা নিয়ে কতটা আলোচনা করে তা বোঝা যায় না, শুধু মদ খায় আর হইহল্লা করে, এক একদিন মাঝ রাত্তিরেও সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়!

রেণু সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে এসে পড়লে আরও মুশকিল হয়। রেণু দেখা করতে চায় সূর্যর সঙ্গে। বাদলরা কেউ আর এখন সূর্যর ঘরে যায় না। ওপরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া বাড়ির কারওর আর কোনও সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে। কিন্তু রেণু যেতে চাইলে বাদলকেও সঙ্গে যেতে হয়। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। সূর্য রুক্ষ ভাবে অপমান করে কথা বললেও রেণু তার সঙ্গে তর্ক করতে চায়। আগে দেশের অবস্থা কিংবা রাজনীতি সম্পর্কে রেণুর কোনও আগ্রহ ছিল না। কলেজে ভরতি হবার পর সে এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কলেজে তোতা রাজনীতিই এখন প্রধান আলোচ্য বিষয়। মাত্র তিন-চার

বছরের মধ্যে প্রতিবেশী চিনের অগ্রগতি দেখে সবাই মুগ্ধ, পদে পদে ভারতের সঙ্গে তুলনা এসেই যায়।

বাদল হাঁটতে হাঁটতে এসে একটা রেইনট্রির নীচে দাঁড়াল। রাত্রের দিকে ময়দানের মধ্যে একা একা হাঁটা খুব নিরাপদ নয়। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। কেপমারি গ্যাঙের অত্যাচারের কথা খুব শোনা যায়। প্রায়ই মাঠের মধ্যে রেস খেলায় জেতা লোকদের লাশ পড়ে থাকে। কিন্তু বাদলের মাথায় কোনও চিন্তা নেই। সে আত্মবিস্মৃতের মতন গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর সে গাছের গুঁড়িতে হাত দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস কবল, বলো তো, কেন আমি রেণুর টেলিফোন ধরিনি?

অনেকক্ষণ থেকেই একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। বাদল ওই প্রশ্নটা করার পর রেইনট্রি থেকে কয়েকটি পাতা খসে পড়ল তার গায়ে-মাথায়। বাদল আগ্রহের সঙ্গে পাতাগুলো তুলে নিল হাতে। তার মনে হল, গাছটি তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। পাতা ঝরানোই তো গাছের ভাষা। কিন্তু বাদল সে-ভাষা জানে না। তা ছাড়া অন্ধকার।

সে-দিনই দুপুরবেলা বাদলের অফিসে রেণু ফোন করেছিল। বাদলের নিজের টেবিলে টেলিফোন নেই। তা ছাড়া সেই সময় সে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। কোনও নিষেধ না থাকলেও সে অফিসে বয়স্ক লোকদের সামনে সিগারেট টানতে লজ্জা পায়, তাই তাকে উঠে যেতে হয়। একটি বেয়ারা এসে তাকে খবর দিল যে বড়বাবুর টেবিলে তার একটি টেলিফোন এসেছে, একজন মেয়েছেলে তাকে ডাকছে।

বাদলের বুকটা ধক করে উঠেছিল। নিশ্চয়ই রেণু। রেণু ছাড়া আর কোন মেয়েছেলে তাকে ফোন করবে? এক রকমের খুশির চাঞ্চল্যে তার মুখটা রক্তাভ দেখায়। কয়েক দিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই রেণু খোঁজ নিচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাদল এগিয়ে গিয়েছিল বড়বাবুর টেবিলের দিকে। তিনি তখন চেয়ারে ছিলেন না, সুতরাং বাদলের কথা বলার কোনও অসুবিধে ছিল না। রিসিভারটা হাতে তুলে নেবার আগের মুহূর্তেও বাদল ভাবেনি সে এ রকম কিছু করবে। হঠাৎ তার মাথার মধ্যে কী হয়ে গেল, সে রিসিভারটা তুলে

গম্ভীর গলায় বলল, বাদলবাবু অফিসে নেই। এবং কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করেই রেখে দিল রিসিভারটা। কেন সে এ রকম করল, নিজেই জানে না। রেণু হয়তো তার গলা চিনতে পারবে না-এর আগে রেণুর সঙ্গে কখনও টেলিফোনে কথা বলেনি সে। তবু সে নিজেই রেণুকে-কী এর মানে! মানুষ কেন এ রকম করে? যাকে সে ভীষণ ভাবে চায়, তাকেও কেন এক-এক সময় ফিরিয়ে দেয়? কোনও সৃষ্টিতত্ত্বের বইতে এর ব্যাখ্যা নেই।

বাদল আবার গাছটাকে প্রশ্ন করল, তুমিও বলতে পারলে না? হাতের শুকনো পাতাগুলো মুড়মুড়িয়ে ভেঙে বাদল গন্ধ শুঁকে কিছু বোঝবার চেষ্টা করল।

রেণুর সঙ্গে দেখা হল রবিবার সকালে। রেণুর মুখ-চোখে রাগ। সে অভিমান কিংবা রাগ মনের মধ্যে চেপে রাখে না। বাদল নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল। রেণু সেখানে এসে প্রথমেই বলল, তোমার ব্যাপার কী বলো তো?

একটা লাল রঙের শাড়িতে রেণুকে জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। ফাঁকা ঘর। বাদলের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, এক লাফে উঠে রেণুকে জড়িয়ে ধরা। রেণুর চেহারার মধ্যে এমন একটা টাটকা ভাব আছে যে স্পর্শ না করলে যেন সবটুকু দেখা হয় না। কিন্তু বাদল আশ্চর্য ভাবে নিজেকে দমন করে অত্যন্ত নিরুত্তাপ গলাতেই বলল, কত দিন তোমার দেখা পাই না।

তোমার কী হয়েছে বলো তো সত্যি করে?

কিছু হয়নি তো।

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কদিন ধরেই তোমার কী রকম যেন আলগা আলগা ভাব দেখছি। তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?

কে কী বলুবে আমাকে? বোসো, বসবে না?

রেণু চেয়ারটা একটু দূরে টেনে নিয়ে বসল। রেণুরও অভিজ্ঞতা এই যে তাকে নিরালায় পেলেই বাদল বড় ছেলেমানুষ হয়ে যায়, চুমু খাওয়ার জন্য অন্ধের মতন ঠোঁট খোঁজে।

রেণু এখন আর এসব ব্যাপারকে অসভ্যতা কিংবা খারাপ ব্যাপার বলে মনে করে না ঠিকই, তবু মেয়েদের প্রাথমিক সতর্কতা থাকে, অন্য কেউ যেন দেখে না ফেলে।

বাদল আজ সে রকম কোনও চেষ্টাই করল না দেখে রেণু সামান্য একটু অবাক হল। খুশিও হল বোধহয়। রাগের ভাবটা সরিয়ে ফেলে বলল, এখনও শুয়ে আছ কেন, ওঠো! ক'টা বাজে জানো?

বাদল হাতের খবরের কাগজখানা সযত্নে ভাঁজ করে রেখে দিল বালিশের তলায়। তারপর উঠে বসল। রেণুর দিকে তাকিয়ে ভাবল, এ রকম একটা দিন আসা উচিত ছিল, যখন সে আর রেণু এক বিছানায় শুয়ে রাত কাটাবে। সকালে রেণু আগে ঘুম থেকে উঠবে, তারপর তার গায়ে ঠ্যালা দিয়ে বলবে, এখনও শুয়ে আছ কেন, ওঠো!

আঙুলগুলো মাথার চুলের মধ্য দিয়ে চিরুনির মতন চালিয়ে বাদল বলল, তোমার সবকিছুই সুন্দর। কিন্তু আমি এর যোগ্য নই।

রেণু ধমক দিয়ে বলল, ওসব আজেবাজে কথা অনেক শুনেছি। তুমি সাত দিন আমার সঙ্গে দেখা করোনি কেন? আমি তোমার অফিসে টেলিফোন করেছিলাম।

অফিসের কাজটা আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি পড়াশুনো করতে চাই। অনেক দিন বাদে আমার কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার সময় নেই।

চাকরিটা ছেড়ে দাও।

তা সম্ভব না। বাড়িতেও নানা রকম অশান্তি চলছে।

কী অশান্তি?

তোমার তা শোনার দরকার নেই। অশান্তির কথা, দুঃখের কথা অন্যকে বলতে নেই।

শুধু শুধু বিব্রত করা।

আমি কিছু করতে পারি না?

পারো।

কী?

যে রকম ভাবে দু'আঙুল দিয়ে নুন তোলে, বাদল আঙুলের সেই রকম ভঙ্গি করে বলল, আমাকে এইটুকু ভালোবাসবে? এইটুকু ভালোবাসাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বাসবে?

উত্তর না দিয়ে রেণু হেসে ফেলল। পরিষ্কার নির্ভেজাল হাসি। ভালোবাসার কথা শুনলে সে হাসে।

অফিসে কিংবা বাড়িতে ঝাট থাকলেই কি একেবারে হাল ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে? আমি লক্ষ করছি, তুমি দিন দিন আরও বেশি মুখচোরা আর গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ। এসব চলবে না। তোমাকে লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, তোমার যেটুকু গুণ আছে, তা প্রকাশ করতে হবে।

ইন্দ্রানী দেবী, আপনি আজ প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে? আপনি বুঝি অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়েছেন?

শোনো। আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা মিলে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছি।

আবার নাটক?

না, নাটক নয়। আলোচনা, কিছু গান, আবৃত্তি। তোমাকে যেতে হবে।

আমি গিয়ে কী করব? তোমার কলেজের বন্ধুরা আমাকে পাত্তা দেবে কেন? আমি সামান্য একটা কেরানি।

তুমি একজন কবি।

ছিলাম, তাও খুব এলেবেলে ভাবে।

এখনও তুমি কবি এবং থাকবেও। মোট কথা তোমাকে যেতেই হবে এবং অনেক সাহায্য করতে হবে। আচ্ছা, সূর্যদাকে নিয়ে যাওয়া যায় না?

সূর্যদার কথা ছেড়ে দাও। হি ইজ লস্ট!

কেন, ছেড়ে দেব কেন? একটা লোক শুধু শুধু নিজেকে এ রকম ভাবে নষ্ট করবে, আর আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব?

রেণু, তুমি কি আজ ত্রাণকীর ভূমিকায় নেমেছ নাকি?

চলো, সূর্যদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

সূর্যদা এখনও ঘুমোচ্ছে।

দশটা বেজে গেছে, এখনও ঘুম? এই করলে কারওর স্বাস্থ্য থাকে? চলো ডেকে তুলব।

বাদল আজকাল পারতপক্ষে সূর্যর সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সূর্য সম্পর্কে যে উজ্জ্বল ছবিটা তার মনের মধ্যে ছিল সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেই দুঃখ পেয়েছে বেশি। কিন্তু রেণুকে এ কথা বলা যায় না।

রেণু প্রবল উৎসাহে টেনে নিয়ে গেল অনিচ্ছুক বাদলকে। সূর্যর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, বাদল ডাকল বাইরে থেকে।

সূর্য রুক্ষ ভাবে বলল, কে? দরজা খোলাই আছে, ধাক্কা দে।

সূর্য টান টান হয়ে শুয়ে আছে খাটের ওপর। ঘুমোচ্ছিল না। তার বুকের ওপর একটা বই ভোলা। দরজা খুলতেই উগ্র অ্যালকোহলের গন্ধ। বাদল ভাবল, সূর্যদা কি সকাল থেকেই মদ খাচ্ছে? কিংবা কাল বোধহয় অনেক রাত পর্যন্ত চলেছে।

সূর্যর চোখদুটো নেশাগ্রস্তর মতন। রেণুকে দেখেও সে কোনও ভাবান্তর দেখাল না। বাদলকে বলল, টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট দেশলাই দে তো!

রেণু বলল, এখনও শুয়ে আছেন কেন? উঠুন! ঘরের জানলা টানলাও খোলেননি!

সূর্য খানিকটা জড়ানো গলায় বলল, না, আমি এখন উঠব না। সারা রাত আমার ঘুম হয়নি, এখনও ঘুম আসছে না।

রেণু তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সূর্যকে নিয়ে যাবার কথা বলতেই সূর্য হঠাৎ খুব রেগে উঠল। বাদলের দিকে তাকিয়ে বলল, এই মেয়েটা আমাকে প্রায়ই জ্বালাতন করতে আসে কেন? বারণ করতে পারিস না? আমি এসব পছন্দ করি না।

বাদল আড়ষ্ট ভাবে বলল, ও তো অন্যায় কথা কিছু বলেনি!

বলছি তো আমি এসব পছন্দ করি না। ওকে অন্য জায়গায় যেতে বল। দেশে অনেক বড় বড় নেতা আছে, যারা দেশের জন্য একসময় জেল খেটেছে, এখন তারাই ক্ষমতা নিয়ে দেশটা চালাচ্ছে-ও তাদের কাছে যাক না! আমাকে বিরক্ত করা কেন? আমি এসব পছন্দ করি না।

রেণু কোমর বেঁধে লেগে গেল ঝগড়া করতে। সূর্যর আজ আর মাথার ঠিক নেই, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে রেণুর সামনেই খারাপ ভাষা ব্যবহার করছে। সমস্ত পৃথিবীর ওপরেই তার একটা ঘৃণার ভাব। অন্যান্য মাতালদের মতনই তার মুখ দিয়ে ইংরেজির স্রোত বইছে। পৃথিবীতে সবাই বাস্টার্ড কিংবা সন অব এ বিচ! সকলেই নরকে যাবার যোগ্য।

বাদল বিরক্ত বোধ করতে লাগল। সূর্যদাকে নিয়ে বেশি বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। একসময় গোয়ারের মতন টেররিস্ট মুভমেন্টে গিয়েছিল, এখনও গোয়ারের মতন নিজেকে নষ্ট করতে চাইছে। একে আর পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। রেণুকে অপমান করার কোনও অধিকার নেই সূর্যদার।

তবু পুরনো দুর্বলতায় বাদলের বুকটা মুচড়ে উঠল একবার। তার মনে হল, সূর্যদার জন্যই সে নিজেও কিছু করতে পারল না জীবনে। তার অনেক দিনের বিশ্বাস ছিল, সূর্যদা আর সে একসঙ্গে মিলে কোনও কাজে নামলে দারুণ কিছু করতে পারত! সে আবেগের সঙ্গে বলে ফেলল, সূর্যদা, কেন নিজেকে নষ্ট করছ। এখনও সময় আছে। আমরা একটা কিছু করতে পারি না? কোনও একটা কাজের মধ্যে না থাকলে তুমি শান্তি পাবে না! কী ব্যবসাট্যবসার কথা ভাবছ-এসব কি তোমাকে মানায়! তুমি আরও অনেক বড় কিছু করতে পারো। তোমার সঙ্গে যারা কাজ করেছে, যারা জেল খেটেছে-দেখো, তারা আজ অনেকেই দেশের হর্তাকর্তা-তুমি এখনও যদি একবার তাদের কাছে যাও, তাদের কিছু বুঝিয়ে বলো-

সূর্য উগ্র মুখ করে প্রচণ্ড জোরে বলল, হোয়াট? আমি কাদের কাছে যাব?

এখন যারা মিনিস্টার, তারা তোমার...

বাদল কথাটা শেষ করতে পারল না, সূর্য সারা মুখটা কুঁচকে বলল, শ্যাল আই, হু স্ট্রাক দা লায়ন, পে দা উলভস হোমেজ? বাস্টার্ডস! অল বাস্টার্ডস! তুই চাকরি করিস, তুই ওদের পা চাট গিয়ে!

অপমানে রক্তশূন্য হয়ে গেল বাদলের মুখ। সে রেণুর দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, এখানে আর বসে থেকে কোনও লাভ নেই।

সূর্য হুংকার দিয়ে বলল, গেট দা হেল আউট অব হিয়ার! আমাকে আর কক্ষনও বিরক্ত করতে আসবি না আমি সাবধান করে দিলাম!

অন্য দিন সূর্য বেশি কথা বলে না কিংবা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়। আজ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার মাথায় রাগ চড়ে গেছে। বাদল আর রেণু চলে আসবার পরেও সে উন্মত্তের মতন

চাচাতে লাগল। কীসের ওপর যেন সে দুম দুম করে ঘুষি মারছে। সারা বাড়ি কেঁপে উঠছে তার চিৎকারে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রেণু কম্পিত গলায় বলল, এ রকম করলে তো উনি পাগল হয়ে যাবেন!

সকালবেলা কোনও মাতালের চিৎকার শোনার অভিজ্ঞতা নেই রেণুর। তার অস্তিত্ব ও জগতে বড় রকমের একটা ধাক্কা লেগেছে। তার দু'চোখে ঘনিয়ে এসেছে করুণা।

রেণু বলল, আমাদের উচিত ওঁকে সাহায্য করা।

বাদল নীরস গলায় বলল, তুমি যাও–।

রেণু আবার ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। সূর্যর বাহুতে হাত রেখে বলল, সূর্যদা, একী করছেন? শান্ত হোন। আমরা ওই সব কথা আর কখনও বলব না।

বাদল আশঙ্কা করেছিল, সূর্য বোধহয় রাগের মাথায় রেণুকে ধাক্কা দেবে কিংবা চড় মেরেই বসবে। সূর্য তা করল না, রেণুর হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যাও।

রেণু দৃঢ় গলায় বলল, না, আমি যাব না। আপনি শান্ত না হলে আমি যাব না।

বাদল একটুক্ষণ স্থির ভাবে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর নীচে নেমে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে বালিশের তলা থেকে টেনে বার করল খবরের কাগজটা। শেষ পৃষ্ঠার একটা ছবির দিকে চেয়ে রইল। সূর্যদার মন ফেরাবার জন্য এই একটাই মাত্র উপায় আছে বোধহয়। বারাসাতে একটি হাসপাতালের উদ্বোধন করছেন নতুন মন্ত্রী শংকরলাল বসু। তার পাশে দাঁড়ানো দীপ্তিদিকে স্পষ্ট চেনা যায়। সূর্যদা কি জানে, প্রায় দু'মাস আগে দীপ্তিদির সঙ্গে শংকরলাল বসুর বিয়ে হয়ে গেছে; কারওর কাছে থেকেও কি শোনেনি?

বাদল খবরের কাগজটা নিয়ে আবার ওপরে উঠে আসছিল, সিঁড়িতে পা দিয়েও ফের মত পালটাল। তার মুখ রাগে গনগন করছে। তবু সে খবরের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে।

৮৫. বরানগর-আলমবাজারের দিকে

বরানগর-আলমবাজারের দিকে একটা দোতলা বাড়ি। সামনে ছোট্ট একটি মাঠ, যা বাগান হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে, উঁচু পাঁচিল তোলা হচ্ছে সেটাকে ঘিরে, বসানো হয়েছে লোহার গেট। বাড়ির দেওয়ালগুলোতে নতুন রং করা হয়েছে, তাই বেশ একটা টাটকা টাটকা গন্ধ। এই বাড়িতে শংকর বসু সদ্য উঠে এসেছেন।

সকালের দিকে বাড়ির সামনে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। গেটের দু'পাশে বসা দু'জন পুলিশ সেই ভিড় সামলায়। তবে এবাড়ি থেকে যেন কোনও ভিখিরিকেও ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ আছে। একতলার বসবার ঘরে একটি নারকেলমালায় অনেক খুচরো পয়সা রাখা আছে, ভিখিরি এলে পুলিশের লোকই সেখান থেকে পয়সা এনে দিয়ে দেয়। পুলিশ কারওর হাতে পয়সা তুলে দিচ্ছে, এই দুর্লভ দৃশ্য এ বাড়িতে এলেই দেখা যাবে শুধু।

ভিখিরি ছাড়াও নানা রকম প্রার্থী ও উমেদার আসে। সকালবেলা শংকরবাবু দু'ঘণ্টা নীচে এসে বসেন, এক এক করে তাদের সকলেরই কথা শোনেন এবং সাধ্যমতন সাহায্য করেন। বহু লোকের বহু রকমের দরখাস্তে তিনি কখনও লাল ও কখনও নীল পেনসিলে সুপারিশ লিখে দেন। তবে মন্ত্রীদের দু'রকম রঙের পেনসিল ব্যবহার করার পেছনে যে একটা রহস্য আছে, তা অনেকেই জানে না।

রুক্ষ চুলদাড়ি সমন্বিত চেহারায় সূর্য সেই গেটের সামনে এসে দাঁড়াবার পর পুলিশরা তার আপাদমস্তক কয়েক বার দেখল বিতৃষ্ণার সঙ্গে, তবু ঢুকতে দিল ভিতরে। মাঠটা পেরিয়ে এসে বারান্দায় উঠলেই চোখে পড়বে দেওয়ালের গায়ে একটা লাল রঙের তির

আঁকা, তার পাশে লেখা আছে-এই দিকে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী গেলে যে ঘরটি পড়বে, সেখানে বসে থাকেন শংকর বসুর সেক্রেটারি রাখাল চট্টরাজ, যিনি বরানগর পাড়ায় রাখালদা নামে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই ঘরের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনারত শংকর বসুর একটি বাঁধানো ফটোগ্রাফ।

রাখাল চট্টরাজ সূর্যকে অবাঙালি মনে করে তার দিকে ভিজিটিং স্লিপের প্যাড এগিয়ে দিয়ে বললেন, কেয়া নাম আর কেয়া কাম-হিঁয়া লিখ দিজিয়ে।

সূর্য নাম লিখতে গিয়েও ঘরের মধ্যে অপেক্ষমান আরও অনেক দর্শনপ্রার্থী দেখে বলল, আমার খুব জরুরি দরকার।

রাখাল চট্টরাজ একগাল হেসে বললেন, এখানে আর যারা বসে আছে, তাদের কার জরুরি দরকার? ঠিক আছে বুঝেছি, বুঝেছি। একটু বোসো ভাই, বেশিক্ষণ লাগবে না।

হাসির উত্তরে হাসিমুখ দেখানোই মনুষ্যসমাজের নিয়ম। কিন্তু সূর্য মুখখানাকে রেখাহীন করে রাখল। সে বসল না, দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

রাখাল চট্টরাজ বললেন, বোসোনা, দাঁড়িয়ে কেন?

সূর্য উত্তরও দিল না, বসলও না। ঘরে কয়েকখানা চেয়ার ও তিনটি বেঞ্চ, এর মধ্যে বেঞ্চগুলিতে একটু জায়গা থাকলেও সূর্য যেন অন্য কারওর পাশে বসবেই না ঠিক করেছে।

সূর্যর যখন ডাক পড়ল শংকর বসুর ঘরে, তখনও সেখানে দু-তিন জন তোক রয়েছে। যদিও সূর্যর চেহারা অনেক বদলে গেছে এই কয়েক বছরে, মুখ দাড়িগোঁফে ঢাকা-তবু, আশ্চর্যের বিষয়, শংকরবাবু তাকে দেখামাত্রই চিনতে পারলেন। বিস্মিত হয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে, সূর্য, এসো এসো! কোথায় ছিলে এতদিন?

শংকরবাবুর কণ্ঠস্বরে উত্তাপ আছে। এক পার্টিতে থাকবার সময় তিনি কোনও দিনই সূর্যকে ঠিকমতন পছন্দ করতে পারেননি, কিন্তু আজ সূর্যকে দেখে তিনি সত্যই খুশি হয়েছেন মনে হল। সূর্যকে পাশের চেয়ারে বসিয়ে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন।

তারপর কেমন আছ, বলো।

ভালো।

চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। কোথায় ছিলে এতদিন?

ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

ভারত দর্শনে বেরিয়েছিলে? খুব ভালো–এত বিরাট এই দেশ, এর কতটুকু আমরা দেখেছি বা জানি! কয়েক মাস ধরে তোমার খুব খোঁজ করেছিলাম।

তোমার এক মাসতুতো না পিসতুতো ভাই আছে না? তার কাছেও খোঁজ করা হয়েছিল, সেও কিছু বলতে পারে নাকারএর কাছে ঠিকানাও রেখে যাওনি!

ঠিকানা ঠিক ছিল না।

এখন এখানেই থাকবে ঠিক করেছ তো? কী করবে কিছু ঠিক করেছ?

কী জানি!

তুমি অনেক কিছু করতে পারবে–আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য করা সম্ভব হয়।

শংকরবাবু নিতাই নামে একজন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বউদি ফিরেছেন? ফেরেননি এখনও? ঠিক আছে, ফিরলেই এখানে একবার খবর দিস।

সূর্যর দিকে ফিরে বললেন, দীপ্তি এখনও স্কুলে পড়ানো ছাড়েনি। এখানকার একটা স্কুলে হেডমিস্ট্রেস হয়েছে, একটু বাদেই আসবে। তুমি বোসো, ওর সঙ্গে দেখা করে তারপর যাবে। আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা সেরে নিই।

সূর্য চুপ করে বসে রইল এমন একটা ভঙ্গিতে যেন অন্য কারওর কথা সে শুনতে পাচ্ছে না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। শংকরবাবুর কথাবার্তা আগে একটু রুক্ষ ধরনের ছিল, এখন বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মিষ্টভাষী হয়েছেন। যদিও জহরকোট ও গান্ধীটুপি পরে চেহারাটা বদলেছেন, তবু অনর্থক লম্বা লম্বা কথা বলেন না, কাজের কথাই সংক্ষেপে সেরে নিতে চান।

কত রকম লোকের কত রকম চাহিদা। এত বছর পরাধীনতার পর লোকে হঠাৎ কতকগুলো নতুন ঠাকুরদেবতা পেয়ে গেছে, যাদের কাছে এলে সব রকম মনস্কামনাসিদ্ধি হতে পারে, অন্তত যাদের কাছে মনস্কামনার কথা জানানো যায়। সকলেই এসে পৃথক পৃথক ভাবে বলছে, আমাকে দাও, আমাকে দাও! আমার ছেলের জন্য, আমার ভাইয়ের জন্য, আমার নিজের জন্য অর্থাৎ আমাকে কেন্দ্র করে যে-পরিবার, শুধু তার উন্নতির জন্য আমি কিছু একটা চাই, দাও দাও দাও! এর বাইরে যে-দেশ, যে-সমাজ-তার যা হয় হোক, তুমি শুধু আমাকে দাও! ভোটে জেতার আগে কিংবা পরে এইসব দেবতারাও যাকে যতটা সম্ভব পাইয়ে দিয়ে মনে করলেন, তবু তো কিছু একটা করলাম ওদের জন্য। যেন এইটাই দেশের কাজ। যারা চোখের সামনে আসে, তারা এই রকম ভাবে কখনও কিছু পায়। যারা চোখের আড়ালে রইল, সেই পিণ্ড পিণ্ড জনসমষ্টি, তাদের যেন কোনও অস্তিত্বই নেই, গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে তাদের হাড়ে ঘুণ ধরতে লাগল। শংকর বসুও মানুষটা অসৎ না, তিনি মনে করছেন, তিনি সত্যিই দেশের কাজ করছেন আন্তরিক ভাবে, তিনি চোখে একটা ভুল চশমা পরে আছেন।

দীপ্তি এ-ঘরে ঢুকে পড়ে শংকরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যে আজ রানাঘাটে যাবার কথা আছে, কখন বেরোবে?

শংকরবাবু তখন একটা দরখাস্তে মন্তব্য লিখছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, রাখালকে জিজ্ঞেস করো। বোধহয় গাড়ি পাওয়া যাবে না, ট্রেনে যেতে হবে।

কটার সময় ট্রেন?

আমি ঠিক জানি না, রাখাল বলতে পারবে।

সেই সময় দুনিয়া কাঁপিয়ে একটা দুম দুম শব্দ হচ্ছে। তোলপাড় করা ঝড়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে চরাচর। অন্ধকারে বিদ্যুতের মতন ঝলসে উঠল একটা ছুরি। কে যেন আকুল আর্তনাদে বলছে, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না!

চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে সূর্য। মুখ নিচু করা। শংকরবাবু কথার মাঝখানে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একগাল হেসে দীপ্তিকে বললেন, আরে, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। দেখেছ কে এসেছে?

দীপ্তি তাকালেন সূর্যর দিকে, আপনাআপনি তার ভুরুটা কুঁচকে গেল। তিনি প্রথম পলকেই সূর্যকে চিনতে পারলেন না, কিংবা চিনতে চাননি। সূর্যর চোখে তার চোখ থেমে রইল।

শংকরবাবু বললেন, চিনতে পারলে না? এ তো আমাদের সেই সূর্য।

দীপ্তি আস্তে আস্তে বললেন, ও সূর্য? সত্যিই আমি চিনতে পারিনি। অনেক বদলে গেছ তুমি!

সূর্য বলল, কেমন আছেন, দীপ্তিদি?

শংকরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো ভেতরে চলো। আজকের মতন আমার। এখানে কাজ শেষ।

তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে সূর্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, এসো! কত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা, অনেক গল্প করার আছে।

জেলখানায় থাকার সময় শংকরবাবু সূর্যর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিলেন, কারণ তিনি তখন দল বদলেছিলেন। এখন তিনি আবার এমন দলে এসেছেন, যেখানে সকলকেই উদার প্রশ্রয় দেওয়া যায়। নির্বাচনের পর বোঝা গেছে, ভারতে আসলে এখন একটিই দল আছে।

একতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলার প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দাতেই কয়েকখানা বেতের চেয়ার ও টেবিল পেতে একটা বসবার জায়গা। লম্বা দেওয়ালে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের ছবি, মাঝখানে হঠাৎ বেখাপ্পা ভাবে রবীন্দ্রনাথের।

চেয়ারে বসবার আগেই শংকরবাবু বললেন, সূর্য কিন্তু আজ এখানেই খেয়ে যাবে। দীপ্তি, তুমি ঠাকুরকে বলে দাও!

দীপ্তি বললেন, আচ্ছা। তিনি সূর্যকে নিজে থেকে আর কিছু বললেন না। সূর্যও ভদ্রতাবশত আপত্তি জানাল না।

দীপ্তি পরে আছেন একটা কালো পাড়ের সাদা তাঁতের শাড়ি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মাথায় কেঁকড়া চুল-সবকিছুই আগের মতন, শুধু পরিবর্তনের মধ্যে তার সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের চিহ্ন। হাতদুটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ-হিন্দু সধবা মেয়েদের মতন একগাছা নোয়া কিংবা রুলিও নেই। চেয়ারে বসে তিনি শান্ত ভাবে তাঁর উরুর কাছের শাড়ি প্লেন করলেন হাত দিয়ে, এটাও তার পুরনো অভ্যাস। মুখ তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

সূর্য সংক্ষেপে উত্তর দিল, নানান জায়গায়।

শংকরবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে লাস্ট দেখা হয়েছিল কবে যেন? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি বলছি, নাইটিন ফরটি ফোরের জুলাইতে। তারপর আমি অন্য জেলে চলে গেলাম। তোমার অতুলদাকে মনে আছে? অতুলদা এখন কী করছেন জানো তো?

সূর্য মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, না।

শংকরবাবু আপশোসের সুরে বললেন, ভেরি স্যাড! মানুষটাকে সে-সময় আমরা কত সম্মান করতাম। জেল থেকে বেরিয়ে উনি পলিটিকস প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, একটা আশ্রম করেছিলেন অনাথা মেয়েদের নিয়ে-তারপর এই বুড়ো বয়সে একটা বিশ্রী মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লেন। আমার কাছে এসেছিলেন, আমি অনেক চেষ্টা করেও কেসটা ছাড়াতে পারলাম না-এর মধ্যে আবার একটা অ্যাবর্শান আছে। উনিই যে জোর করে অ্যাবর্শান করিয়েছেন তার একেবারে অকাট্য প্রমাণ আছে।

শংকরবাবু দীপ্তিদির দিকে তাকিয়ে বললেন, ওসব আশ্রমটাশ্রম করে যে কিছু হয় না, তা আমি অনেক বার বলেছি।

সূর্য চুপ করে রইল। অতুলদার কথা মনে পড়ল তার। ঋষিকল্প মানুষ ছিলেন, জেলের মধ্যে সকলেই ওঁকে শ্রদ্ধা করত। আঁস্তাকুড়ের মধ্যে একটা লেবুগাছের চারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ওঁর কী আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, সূর্যকে সেই গাছটার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মানুষ-

শংকরবাবু সূর্যকে বললেন, জলপাইগুড়ির আশ্রমে তোমার ওপর যে কী অবিচার করা হয়েছে, তা সবই শুনেছি। তখন যদি আমাকে একবার খবর দিতে! আমি খবর পেলাম আশ্রমটা উঠে যাবার পর। ওখানকার ব্যাড এলিমেন্টসদের অবশ্য আমরা এখন একেবারে উৎখাত করে দিয়েছি!

শংকবাবুর কথাবার্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা ক্ষমতার চিহ্ন ফুটে উঠছে। তিনি অনেক কিছু করতে পারেন। যেখানে যে বিপদে পড়েছে, তার কাছে আসুক, তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

তুমি আর কোনও পার্টিতে যোগ দাওনি? তোমাদের আগেকার পার্টি তো একেবারেই ভেঙে গেছে!

না, আমি আর কোথাও যাইনি।

আমার কী মনে হয় জানো! টেররিস্ট পার্টিগুলোকে একেবারে ভেঙে দেওয়া ঠিক হয়নি! যারা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁরাও অন্যান্য দলে ভিড়ে গেছেন। তার বদলে ওঁরা সকলে মিলে যদি আলাদা একটা দল গড়ে রাখতেন, তা হলে ডেফিনিটলি একটা ফোর্স থাকত। আমি অবশ্য ওই মতবাদ অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

দীপ্তি বললেন, ওদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দেশের স্বাধীনতা আনা। সেই জন্যই এখন। আর ওদের আলাদা কোনও অস্তিত্বের দরকার নেই।

সেইটাই তো ভুল হয়েছে। স্বাধীনতা চেয়েছিল ওরা-কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর কী প্রোগ্রাম হবে-তার কিছুই ঠিক ছিল না। তার মানেই আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল- কোনও দিনই ওরা ভাবেনি যে, সত্যিই একদিন স্বাধীনতা আসবে।

কংগ্রেসেরও তো প্রোগ্রাম ছিল না।

কংগ্রেস চট করে সেটা তৈরি করে নিতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কংগ্রেস দেশের মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। টেররিস্টদের মধ্যে যারা মারা গেছে-লোকে তাদের ছবি বাঁধিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখে। যারা বেঁচে আছে, তাদের কথা কেউ মনেও রাখেনি।

তুমি ওদের টেররিস্ট বল কেন? ওটা তো ব্রিটিশদের দেওয়া নাম।

ওই হল। অন্য নাম দাও আর যাই দাও, আর একটা স্যাড ব্যাপারও আছে। ওদের মধ্যে অনেকে হিন্দু মহাসভা কিংবা এই ধরনের কমুনাল পার্টিতেও যোগ দিয়েছে। কেউ তো মার্কসবাদ পড়েনি ভালো করে। শুধু ইমোশান দিয়ে কি আর...

সূর্য চুপ করে স্বামী-স্ত্রীর মত বিনিময় শুনছিল। ওঁদের কথার মধ্যে তর্কের ঝুঁজ নেই-যেন পরস্পরের মতামতের স্বাধীনতা আগে থেকেই স্বীকৃত।

একটু বাদে শংকরবাবু বললেন, তা হলে সূর্য তুমি এখন কী করতে চাও? কিছু একটা কাজটাজ করতে হবে তো!

সূর্য বিনীত ভাবে বলল, হ্যাঁ, কিছু তো করতেই হবে। সেই জন্যই তো আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

শংকরবাবু তৃপ্ত হলেন। আর একজন পথভ্রষ্টকে তিনি পথ দেখাবেন। এই তো দেশের কাজ। তিনি দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, সূর্যকে দিয়ে অনেক ভালো কাজ করানো যাবে! কী বলো! যাক, ব্যস্ততার কিছু নেই, আস্তে আস্তে ভেবেচিন্তে তোমার জন্য ঠিক করা যাবে কিছু একটা কাজ। কলকাতায় তোমাদের সেই বাড়িটা এখনও আছে তো?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে আমার সঙ্গে। আমি সব সময় না থাকলেও দীপ্তি তো আছেই, ও সাহায্য করবে তোমায়। তবে দাড়িটাড়িগুলো কামিয়ে ফেলো, কী রকম যেন বিদঘুঁটে দেখাচ্ছে তোমায়।

আর কিছুক্ষণ কথা বলে শংকরবাবু উঠলেন স্নান করার জন্য। তারপর সূর্যর সঙ্গে তিনি খেতে বসবেন। শংকরবাবুকে কথা বলার উৎসাহে পেয়ে বসেছে। গায়ে তেল মাখতে মাখতেও তিনি কথা বলতে লাগলেন সূর্যর সঙ্গে। তারপর তিনি বাথরুমে ঢুকে যেতেই দীপ্তি বললেন, সূর্য, তুমি বোসো, আমি আসছি।

সূর্যও উঠে দাঁড়াল।

দীপ্তি অবাক হয়ে বললেন, এ কী উঠছ কেন? বোসো, তুমি তো এখানে খেয়ে যাবে।

সূর্য এক পা এগিয়ে গেল দীপ্তির দিকে। এখন তার মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চোখদুটি অত্যন্ত চঞ্চল।

দীপ্তি এবার হুকুম করার ভঙ্গিতে বললেন, বললাম না তোমাকে বসতে? কোথায় যাচ্ছ?

সূর্য তবু এগিয়ে আসতে লাগল দীপ্তির দিকে। যেন আকস্মিক কোনও আঘাত সামলাচ্ছেন, এই ভাবে দীপ্তি মুখের সামনে একটা হাত তুললেন। তিনি আঘাতেরই প্রত্যাশা করেছিলেন বোধহয়, কিন্তু সূর্য তার একেবারে মুখোমুখি এসে চুপ করে পঁড়াল।

এই মুহূর্তটার জন্য কি দু'জনেই অপেক্ষা করে ছিল না? এতক্ষণ অন্য সমস্ত কথাই কি দূরাগত অর্থহীন শব্দের মতন নয়? অনেক দিন পর দু'জনে মুখোমুখি। দু'জনের দৃষ্টির কাছে সমস্ত ভাষা পরাজিত হয়ে যায়। কোথাও যেন কিছু একটা ঝনঝন করে ভেঙে যাচ্ছে।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে দীপ্তি আস্তে আস্তে দুঃখিত নরম গলায় বললেন, সূর্য, তুমি কেন এসেছ?

সূর্য বলল, আসবার কথা ছিল না, তাই না?

তুমি বলেছিলে, তোমার সঙ্গে আমার আর সারা জীবনে দেখা হবে না।

আমি বলেছিলাম? হয়তো। আমি কথা রাখিনি।

সূর্য, তুমি ফিরে যাও।

কোথায়? কোথায় ফিরে যাব? দীপ্তিদি, তুমিও কথা রাখোনি!

দীপ্তি আর কিছু না বলে দ্রুত চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। সূর্য ফিরে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসল। তারপর এমন ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল, যেন এটাই তার নিজের বাড়ি।

শংকরবাবু স্নান সেরে এসে বললেন, এসো সূর্য, চট করে খেয়ে নেওয়া যাক। সামান্য যা আছে–

সূর্য ভদ্রতা করেও আপত্তি জানাল না। হঠাৎ কারওর বাড়িতে উপস্থিত হবার পর ভাত খাবার আমন্ত্রণ পেলে মানুষ একবার অন্তত না বলে। সূর্য সঙ্গে সঙ্গে এসে খাবার। টেবিলে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

শংকরবাবু বললেন, হাতটাত ধোবে না?

না, ঠিক আছে।

নেমন্তন্নর দিন তুমি বাদ পড়ে গেছ, তোমাকে একদিন ভালো করে খাওয়াতে হবে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কোনও কাজ করতে চাও–কোনও একটা চাকরিটাকরির তো ব্যবস্থা করা যেতেই পারে, তা ছাড়া যদি পার্টির কাজে তোমার আগ্রহ থাকে–আমার। তো মনে হয়, পার্টির কাজেই অনেক বেশি থ্রিল আছে।

আমি কিছু একটা করতে চাই।

আচ্ছা, দু-এক দিন পরে ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

শংকরবাবুর মুখে বেশ একটা সন্তুষ্ট ভাব ফুটে ওঠে। মানুষের উপকার করার ক্ষমতা আয়ত্তে এলে চমৎকার আরাম পাওয়া যায়।

দীপ্তি নিজেই খাবার পরিবেশন করলেন। খুবই সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর খাদ্যসূচী। ভাত, নিম-বেগুন, ডাল, পেঁপেসেদ্ধ, ফুলকপির তরকারি এবং দই। মাছ-মাংস নেই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এখন নিরামিষাশী।

সাধারণ লোকে এখন মন্ত্রীদের জীবনযাত্রার বিলাসিতা নিয়ে অনেক রকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। বিরোধী দলগুলোর নীতিই হচ্ছে সরকারি দলের ক্ষমতাশীন ব্যক্তিদের চরিত্রহনন

করা। তাদের সুনির্দিষ্ট প্রচারে সাধারণ লোকের ধারণা, মন্ত্রীরা সবাই টাকা চুরি করে, বাড়িতে সোনারুপো চিবিয়ে খায় এবং ডিস্ট্রিক্ট ট্যুর প্রোগ্রামের সময় ডাকবাংলোতে মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে।

শংকরবাবু বললেন, মাছমাংস ছাড়া সূর্যর নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে। দীপ্তি, ওকে একটা ডিম ভেজে দাও না।

দীপ্তি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ডিম ভেজে দেব?

সূর্য ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, দিন।

নিরামিষাশীদের বাড়িতে ডিমও থাকে না। লোক দিয়ে দোকান থেকে ডিম আনিয়ে। ভেজে দিতে অনেক সময় লাগল, সূর্যর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বসেই আছে খাবার টেবিলে। ডাল দিয়ে ভাত মেখে বসে আছে ডিম ভাজার প্রতীক্ষায়। শংকরবাবু নিজের খাবার শেষ করেও বসে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যস্ত লোক, খাবার টেবিলে বেশি সময় নষ্ট করতে পারেন না। একটু বাদে তিনি ভদ্রতা করে বললেন, তুমি যদি কিছু না মনে করো, তা হলে আমি উঠি? আমাকে আবার এক্ষুনি বেরোতে হবে তো-তুমি লজ্জা কোরো না, ভালো করে খাও–

সূর্যর লজ্জা পাবার কোনও প্রশ্নই নেই। সে খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। দীপ্তির হাতের রান্না বলেই তার এই উপভোগ। হয়তো দীপ্তি নিজের হাতে রাঁধেননি, একজন ঠাকুর বা রাঁধুনি থাকাই সম্ভব, তবু তো পরিবেশন করছেন নিজে।

শংকরবাবু বললেন, দীপ্তি, আমার ব্যাগটা হলে গুছিয়ে দিয়ো। আমি ততক্ষণ নীচে গিয়ে কাগজপত্তরগুলো–

দীপ্তি বললেন, আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। আমিও তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।

তার স্বামী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যাবে? তুমি কী করতে যাবে- মাত্র এক দিনের তো প্রোগ্রাম।

না, আমিও ঘুরে আসব ঠিক করেছি। ও-দিকটায় কখনও যাইনি।

এমন কিছু জায়গা নয়। তুমি বরং সূর্যর সঙ্গে গল্পটল্প করো-এতদিন পরে এল-

সূর্য তো আবার আসবেই। আমি তোমার সঙ্গেই আজ যাব।

শংকরবাবু নীচে নেমে গেলেন। দীপ্তি সূর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য, তোমার আর কিছু লাগবে? আর একটু ভাত আর তরকারি নেবে?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, আপনি খাবেন না?

হ্যাঁ, এবার বসছি।

দীপ্তি খেতে বসেও বার বার নানা অজুহাতে তার পরিচারিকাকে ডেকে নানা রকম ফরমাশ করতে লাগলেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি সূর্যকে বেশি কথা বলার সুযোগ দিতে চান না।

সূর্য একদৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। তার বিমর্ষ মুখোনি দেখলে মনের কথা কিছুই বোঝা যায় না। যে-নারীটি তার সামনে বসে আছে, একসময় দিনের পর দিন সূর্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে থেকেছে। এমনও দিন গেছে, যখন চব্বিশ ঘণ্টাই তারা কাটিয়েছে এক ঘরে। ওই নারীর নগ্ন শরীরটিও তার চেনা- যে-শরীরে রয়েছে তার নিজস্ব প্রিয় আগুন কিংবা শান্তি কিংবা অমৃত। এখন তার সঙ্গে কথা বলতে হবে অল্প-চেনার মতন। অদূরে দেখা যায় দীপ্তির শয়নকক্ষ, দরজা খোলা, শুভ্র চাদর পাতা বিছানা-ওই বিছানায় এই নারী এখন অপর পুরুষের সঙ্গে শোয় প্রতি রাত্রে। এখন দীপ্তি তাকে এড়াবার জন্যই শুধু স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে রানাঘাট বা বনগাঁর মতন কোনও অকিঞ্চিৎকর জায়গায়।

সূর্য একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি হঠাৎ এসে পড়ায় তুমি খুব বিরক্ত হয়েছ, তাই না?

দীপ্তি শুকনো ভদ্রতার সুরে বললেন, না বিরক্ত কেন হব?

তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে–

তখন সেটাই একমাত্র পথ ছিল।

তুমি বলেছিলে, তুমি কখনও বিয়ে করবে না। যে-সব মেয়েরা বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে থাকে, তুমি কিছুতেই তাদের মতন হতে পারবে না।

জীবন বড় নিষ্ঠুর। মানুষ যা ভাবে, কিছুতেই তা শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক মেলে না। বড়মামা মারা গেছেন, তুমি শুনেছ বোধহয়!

ওঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল।

তবুশরীর ভালো ছিল যথেষ্ট। জলপাইগুড়ির ছেলেরা ওঁকে উত্ত্যক্ত করে মারত, তবু উনি একটুও ভেঙে পড়েননি, কিন্তু নিয়তি যে কখন কোন দিক দিয়ে ছোবল দেয়! ওঁকে সাপে কামড়েছিল।

সত্যেন গুহকে সূর্য বেশ পছন্দ করত। কিন্তু তার অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ শুনেও সে কোনও দুঃখ প্রকাশ করল না, চুপ করে রইল। মনে হয় যেন সে খুব অন্যমনস্ক।

দীপ্তি আবার বললেন, বড়মামার মৃত্যুর পর আমি আর কিছুতেই আশ্রমটাকে বাঁচাতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আশ্রমটাও ভেঙে যাবার পর আমি এই পৃথিবীতে একা হয়ে গেলাম। তখন কেউ আমাকে খুঁজতে আসেনি। আমি অন্ধের মতন। এ-দিক ওদিক হাতড়ে একজন কাউকে খুঁজেছি। দুঃখের সময় মেয়েরা কিছুতেই একা থাকতে পারে না।

কলকাতা ছেড়ে তুমি ওই আশ্রমে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন? ওটা কি তোমার জায়গা?

হ্যাঁ। আমি এ রকম কোনও একটা জায়গাতেই থাকতে চেয়েছিলাম। তা হলে আমি শান্তিতে থাকতে পারতাম। কিন্তু কেউ আমাকে থাকতে দিল না। মানুষের অনেক আশাই মিথ্যে হয়ে যায়।

এটাও মিথ্যে!

কোনটা?

এই যে তোমার এই বিয়ে-

দীপ্তি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, তোমাদের শংকরদা বার বার আমাকে স্নেহ করতেন। আমার অনেক বিপদআপদে উনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশ্রমটা উঠে যাবার পর আমি যখন একেবারে ভেঙে পড়েছিলাম, তখন উনিই আমাকে খুঁজে বার করেন, আমি ডাকিনি, উনি নিজেই গিয়ে আমাকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমনকী, আশ্রমটা আবার গড়ে দেবার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু তখন সেটা আর সম্ভব ছিল না। একা ওই আশ্রম চালানো যে আমার পক্ষে অসম্ভব তা বুঝে গিয়েছিলাম। উনিও বুঝেছিলেন, একটা কোনও কাজের মধ্যে ডুবে পড়তে পারলেই আমি আবার সুস্থ-স্বাভাবিক হতে পারব। তাই আমাকে এনে জুড়ে দিলেন এখানকার নারীমঙ্গল সমিতির সঙ্গে। তুমি তো জানোই, কোনও একটা কাজ ছাড়া আমি কিছুতেই ঠিক থাকতে পারি না। আর এ-দেশে কোনও একজন পুরুষ যদি একজন মেয়েকে কিছু সাহায্য করে, তা হলেই নানা রকম কথা ওঠে। ওই রকম কথা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আগেকার মতন আর অগ্রাহ্য করতে পারি না, সে জোর নেই তাই-দু'জনেই ঠিক করলাম, বিয়ে করাটাই-

সূর্য আবার সেই একই সুরে বলল, না, এটা মিথ্যে!

সূর্য, আমি এখন খুব ভালো আছি।

আমি ভালো নেই।

দীপ্তি একটু যেন কেঁপে উঠলেন। সূর্য তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে, কারণ সে স্পষ্ট বলতে পারে, আমি ভালো নেই। তিনি কথাটা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো বললে না, এত দিন কোথায় ছিলে?

সূর্য বলল, আমি কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবার পর সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে একটা আশ্রয় খুঁজেছি। গোয়ালিয়ারে একটা মেয়ের কাছে ছিলাম। আমার মায়ের নামে তার নাম। ভেবেছিলাম তাকে নিয়েই আর সবকিছু ভুলে থাকব, কিন্তু সে-ও আমাকে ছেড়ে গেল। তোমার কাছে ফিরে আসাই আমার নিয়তি।

তোমার সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি একটা কাজটাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নাও–এই দেশের কোনওনা-কোনও কাজের মধ্যে আমাদের থাকতেই হবে–আমরা দূরে গিয়ে কিছুতেই বেশি শান্তি পেতে পারি না–

দীপ্তিদি, চন্দননগরের সেই বাড়িটার কথা তোমার মনে আছে? যেখানে তোমাকে প্রথম আমি দেখেছিলাম?

কেন মনে থাকবে না?

সেখানে তোমাকে আমি বিবাহিতা মহিলা হিসেবেই জানতাম। আসলে সেটা ছিল মিথ্যে। তোমরা নকল স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকতে। সেই রকম এটাও মিথ্যে।

সূর্য, কী বলছ তুমি?

আমি ঠিকই বলছি।

তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি এবার ওঠো তো!

সূর্য টেবিলে একটা চাপড় মেরে কড়া গলায় বলল, না মিথ্যে মিথ্যে! আমি বলছি, এটাও মিথ্যে!

৮৬. গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা

হিমানী বললেন, তুই আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

বাদল এসে হাঁটু গেড়ে বসল খাটের পাশে। হিমানীর হাতের ওপর হাত রেখে বলল, মা, এই তো আমি তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আর এক মাসের মধ্যে আমরা অন্য বাড়িতে উঠে যাব। সূর্যদার বাড়িতে আর থাকব না।

বাড়ি খুঁজে পাবি?

হ্যাঁ, ঠিক পেয়ে যাব। আজ থেকেই খুঁজতে শুরু করছি।

বাদল আমি আর বেশি দিন বাঁচব না রে। শেষ ক'টা দিন আমাকে একটু শান্তি দে। আমার নিজের মনের মতন আলাদা একটা বাড়ি, নিজের সংসার সারা জীবনে কখনও পেলাম না। তুই এবার বিয়ে করবি না?

এখনও সময় হয়নি।

আর দেরি করিস না। আমাকে দেখে যেতে দে। আমিই এবার রেণুকে বলব। হারে, রেণুর মা নাকি ওর অন্য কোথায় বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে?

কে বলল তোমায়?

বিছানায় শুয়ে থাকলেও অনেক কথাই আমার কানে আসে। কিন্তু রেণু লক্ষ্মী মেয়ে, ও কক্ষনও অন্য কোথাও বিয়ে করতে রাজি হবে না। রেণু ওই সুয্যিটার সঙ্গে এত মেলামেশা করে কেন? তুই বারণ করতে পারিস না? আজই বারণ করে দিবি।

আচ্ছা।

হিমানী আপন মনেই বলতে লাগলেন, কতদিন মেয়ে-জামাইকে ডাকতে পারিনি। নিজের একটা বাড়ি, সেখানে মেয়ে-জামাই আসবে, নাতি-নাতনি, ছেলে-ছেলের বউ থাকবে পাশে–মানুষ এইটুকু সুখ চায়, আমি তাও পেলাম না।

মা, এবার তুমি সব পাবে।

আলাদা সংসার হলে তুই খরচ চালাতে পারবি?

পারব। দুটো টিউশানি নিয়েছি!

বাদল মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হিমানীর মুখের রংটা যেন কেমন বদলে গেছে। ঠিক ফ্যাকাশে নেই আর, বরং খানিকটা অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। কোনও সন্দেহ নেই মৃত্যু খুব কাছে এসে গেছে। আগে মায়ের গুরুতর অসুখের সময়ও বাদলেও একথা মনে হয়নি, কিন্তু এখন সে চিনতে পারছে মৃত্যুর ছায়া। মৃত্যু পথযাত্রীকে যে-কোনও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়, এতে কোনও পাপ নেই। ভোগ করার জন্য যে বেঁচে থাকবে না, তার জন্য স্তোকবাক্যই তো যথেষ্ট।

মনের অনেক অনেক ভেতরে যেখানে কোনও প্রশ্ন পৌঁছোয় না, সেখানে বাদল টের পেয়ে গেছে যে তার মা-বাবা দুজনেই আর বেশিদিন থাকবেন না। কিছু দিনের মধ্যেই সে একা হয়ে যাবে। এই উপলব্ধি তাকে বিষণ্ণ করে না, বরং যেন একটা স্বস্তি দেয়। সে কি সন্ন্যাসীর মতন একা হয়ে যেতেই চাইছে না? রেণুও সেখানে নেই, তাই সে একাকীত্ব এত বিশাল। নিজেও সে অনুভবের মধ্যে বিশাল হয়ে ওঠে, অহংকারীর মতন উঁচু করে

মাথা, একাকীত্বে সে স্রষ্টা হতে পারে। বাদলের সাজপোশাকে কোনও আড়ম্বর নেই, চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার মতন মানুষ, তবু সাংসারিক বন্ধন কেটে যাবার উপক্রম হওয়ায় সে মনে মনে গিয়ে দাঁড়ায় এক আদিগন্ত নির্জনতার মধ্যে, তার চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায়, কিছুই চাইবার কিংবা ত্যাগ করার নেই বলে সে অত্যন্ত শক্তিমান মনে করে নিজেকে। অসুস্থ মায়ের খাটের পাশে বসে বাদল হঠাৎ আপন মনে একটু হাসে।

রেণুর সঙ্গে দেখা হয় পরদিন সকালবেলা। বাদল তখন বেরোচ্ছিল, সিঁড়িতে পা দিয়েছে, নীচে দেখল রেণুকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়াল। বিদ্যুৎচমকের মতন একটা কথা তার মনে আসে। রেণুদের বাড়িতে সে বহু বার রেণুকে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে। রেণুর কথা ভাবলেই একটা সিঁড়িতে-দাঁড়ানো মূর্তির ছবি তার চোখে ভাসে। কখনও ফ্রক পরা, কখনও শাড়ি। সিঁড়ির ওপর থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে উড়ে এসেছে তার কাছে। আজ রেণু নীচে দাঁড়ানো, সে সিঁড়ির ওপরে। এর কি কোনও তাৎপর্য আছে? কিছুই না, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার-তবু এইসব নিয়েই বাদল চিন্তা করে।

রেণু জিজ্ঞেস করল, তুমি বেরোচ্ছ?

বাদল বলল, হ্যাঁ।

খুব জরুরি কোনও কাজ আছে?

হ্যাঁ, একটু।

বাদল কি আগে বহু বার বলেনি যে রেণুর সঙ্গে দেখা হলে পৃথিবীতে তার আর কোনও কাজ থাকে না। তা ছাড়া সে এমন কী কাজের মানুষ, যাতে তার জরুরি কাজ থাকবে? তবু এ-কথা সে কেন বলল, নিজেই জানে না।

এই সময় ওপরের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল। বাদল দেখল সূর্যদা নেমে আসছে। সে পথ দেবার জন্য একটু দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

রেণু সূর্যকে জিজ্ঞেস করল, আপনিও এক্ষুনি বেরোচ্ছেন?

সূর্য বলল, হ্যাঁ।

একটু দাঁড়ান না, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারি কথা আছে।

আমার সঙ্গে আবার কী কথা?

দশ মিনিট সময় দিতে পারবেন না?

রেণু বাদলকে থাকবার জন্য বলেনি, সূর্যকেই একটু অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছে। এজন্য কি বাদল দুঃখিত হবে? বাদল জানে, রেণু বিশেষ কিছু চিন্তা করে কথা বলে না। যত রাজ্যের চিন্তা শুধু বাদলেরই মাথায়।

বাদল একবার ভাবল, রেণুকে সে বলবে, তুমি আমার সঙ্গে বড়রাস্তা পর্যন্ত চলো, যেতে যেতে তোমার সঙ্গে কথা বলব। শুধু বড়রাস্তা কেন, বাদল রেণুকে সঙ্গে নিয়েই যেতে পারে তার জরুরি কাজে, অর্থাৎ ডাক্তারখানায় কিংবা পার্কে কিংবা চায়ের দোকানে। এই ভাবে সে রেণুকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সূর্যদার কাছ থেকে। সে তো পারেই। সে একদিন দেখেছিল, রেণু সূর্যদার বাহু চেপে ধরে মিনতি করছে। রেণু ছেলেমানুষ, সে সূর্যদাকে ভালো করতে চায়। রেণুকে কি ঠিক সময় সাবধান করে দেওয়া উচিত নয়?

বাদল রেণুকে কিছুই বলল না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সূর্যদার দিকে। হঠাৎ সে দারুণ চমকে উঠল। সূর্যদার মুখের রংটাও বদলে গেছে না? অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল, ঠিক যেমন বাদল তার মায়ের মুখের রং বদলাতে দেখেছে! না, না, না, এই দুজনের মধ্যে কোনও মিল থাকতেই পারে না। সূর্যদা দীপ্তিদির সন্ধান পেয়ে গেছে, তাই উত্তেজনায় তার মুখচোখ অন্য রকম, বাদল তাই ভুল দেখেছে।

বাদল সূর্যকে কিছুই বলল না। সূর্য একদিন খুব অপমান করার পর বাদল তার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছে। সে হালকা গলায় রেণুকে বলল, তুমি গল্প করো, আমি তা হলে বেরোচ্ছি, অ্যাঁ?

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সে। রেণু তার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে এল।

রেণু সূর্যকে বলল, আপনি আপনার ঘরে চলুন।

রেণুর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, তার কথা আদেশের মতন। সে যা ভালো বোঝে, সেটাই জোর দিয়ে বলে। অন্য কে কী ভাবল না ভাবল, গ্রাহ্যই করে না।

সূর্য খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা বিরক্ত ভাবে বলল, কেন।

রেণুর হাতে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট, সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার জন্য। একটা জামা এনেছি, চলুন একবার পরে দেখবেন, আপনাকে ঠিক ফিট করেছে কি না।

জামা? আমার জন্য? কেন?

আমি কদিন ধরেই আপনার একটা জামা কেনার কথা ভাবছিলাম।

তুমি আমার জামা নিয়ে ভাবছিলে?

আপনি সব সময় এই রকম একটা বিচ্ছিরি, নোংরা জামা পরে থাকেন কেন? আপনার বুঝি আর জামা নেই? আমি যে কদিন এসেছি, এই একটাই জামা দেখেছি।

দরকার হলে আমি কি জামা কিনতে পারি না! তোমার কাছ থেকে নেব কেন?

কেন, আমি দিলে নেওয়া যায় না? পরে দেখুন ঠিক হয়েছে কিনা, না হলে আজই বদলে আনব।

আমার সময় নেই।

রেণু সূর্যর হাত ধরে টান দিয়ে ধমকের সুরে বলল, একটা জামা পরে দেখারও সময় নেই? আসুন আমার সঙ্গে। এই দাড়িগোঁফের জঞ্জালও কেটে ফেলতে হবে আজ।

রেণুর পথটাই ঠিক। সূর্য যদি রেণুর কথা শুনে ওপরে উঠে আসত, তবে তার জীবন অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু তার মুখের রং বদলে গেছে, সে চলে যাবেই। সে রেণুর কাধ আঁকড়ে ধরে নিষ্ঠুরের মতন বলল, দেখো খুকি, তুমি আর এ রকম কক্ষনও করবে না! আমি তোমার জন্য নয়!

স্বচ্ছ দিঘির জলে একটা বিরাট পাথর পড়েছে যেন। রেণু কেঁপে উঠে বলল, এ কী বলছেন আপনি?

আমি তোমার জন্য নই।

কে আবার কার জন্য?

আমার নিয়তি ঠিক হয়ে গেছে। তুমি আমার চোখের সামনে কখনও আর এসো না, তা হলে তোমাকে আমি ধ্বংস করে ফেলব।

রেণুর কাঁধটা সূর্য প্রায় খামচে ধরে আছে। রেণু শান্ত গলায় বলল, আপনি আমায় ছেড়ে দিন, আপনি পাগল হয়ে গেছেন।

সূর্য তবু রেণুকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, আমি চাই না, আমি আর কারোকে চাই না, আমার কাছে কক্ষনও আসবে না–

রেণুর হাত থেকে জামার প্যাকেটটা নিয়ে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিঁড়ির নীচে। চিররঞ্জন ঠিক সেই সময় বাড়িতে ঢুকছিলেন, জামাটা আর একটু হলে তার গায়ে লাগত। এই

দৃশ্যের মধ্যে এসে পড়ে তিনি চোরের মতন সংকুচিত হয়ে দাঁড়ালেন। লজ্জায়, রাগে কেঁদে ফেলল রেণু। সেদিকে আর না তাকিয়ে সূর্য হনহন করে বেরিয়ে গেল।

বরানগরের বাড়িতে গেটের সামনে দাঁড়াতেই একজন পুলিশ সূর্যকে জানাল যে শংকরবাবু বা দীপ্তি কেউই বাড়িতে নেই। সূর্য প্রত্যেক দিনই আসে বলে প্রহরীরা তাকে। চিনে গেছে। তারা এ কথা বলল, যে পি. এ. বাবু অবশ্য আছেন, সূর্য ইচ্ছে করলে বসতে পারে।

সূর্য ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। মন্ত্রীমশাই কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই, কিন্তু দীপ্তি স্কুল ছুটি হলে ফিরবেনই। দীপ্তি কিছুতেই তাকে একা কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না।

একসময় রাখাল চট্টরাজ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, আরে, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসে বসুন!

তার মালিকের সঙ্গে সূর্যর কী সম্পর্ক তা রাখাল চট্টরাজ এখনও ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু যেহেতু সূর্য দোতলায় উঠে যায়, তাই তাকে একটু খাতির দেখাতেই হয়।

সূর্য বলল, না, আমি এখানেই ঠিক আছি।

আপনার কি শরীর অসুস্থ নাকি?

না।

মুখচোখ কী রকম যেন দেখাচ্ছে। চা-টা কিছু খাবেন?

না।

রাখাল চট্টরাজ একটা দুর্বোধ্য মুখভঙ্গি করে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। সূর্য সম্পর্কে তার কৌতূহল বাড়ছে। লোকটা আলাপ করতে গেলেও একটা-আধটার বেশি কথা বলে না।

সরকারি গাড়িতে শংকরবাবু দীপ্তিকে সঙ্গে নিয়েই ফিরলেন। সূর্যকে দেখে বললেন, কতক্ষণ এসেছ। শোনো, তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করেছি। দীপ্তি, তুমি সূর্যকে নিয়ে ওপরে যাও, আমি নীচে কাগজপত্তরগুলো একটু দেখে আসছি।

দীপ্তি বললেন, তোমাকে এখন আর কাগজপত্র দেখতে হবে না। ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে চলো।

আমি তো ক্লান্ত হইনি।

একঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করলে, তারপর এক্ষুনি ফিরে এসে কাজ নিয়ে আর বসতে হবে না। আবার তো বিকেলেই বেরোতে হবে।

শংকরবাবু হেসে বললেন, ঠিক আছে, চলো তা হলে, সূর্যর সঙ্গেই কাজের কথাটা সেরে ফেলা যাক।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি নিচু গলায় সূর্যকে বললেন, সি. ডি. পি.-তে একটা ভালো কাজ খালি আছে, তুমি নেবে?

সূর্য জিজ্ঞেস করল, সি. ডি. পি. কী?

কমুইনিটি ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট। মাইনে ভালোই, কাজটাও খারাপ না।

চাকরি?

তোমার বুঝি চাকরি করতে ইচ্ছে করে না? স্বাধীন দেশের সরকারি কাজটাও এক হিসেবে দেশেরই সেবা করা।

শংকরদা–

কিছু বলতে গিয়েও সূর্য থেমে গেল। শংকরবাবু একটুক্ষণ উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী, বলো?

আপনি কি সুখী?

তার মানে?

আপনি কি সত্যিই ভাবছেন, আপনি দেশের জন্য কিছু করতে পারছেন?

একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

আমি তো সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে চলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এখানে পর পর কয়েক দিন এসে আমার কী রকম খটকা লাগছে। আমাদের আমলের লোকেরা সত্যি কী করছে দেশের জন্য? তারা তো কেউ ভণ্ড ছিল না।

আমার যতটা সাধ্য আমি তা করছি। এক একটা রাতে আমার ঘুম আসে না। দীপ্তি জানে, আমি মাঝরাত্রে জেগে উঠে বসে থাকি। আমি ভাবি, এই দেশের এত সমস্যা, ভাষার সমস্যা, ধর্মের সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মানুষকে দু'বেলা দুটো খেতে দেওয়াকী করে এর সমাধান হবে–তবু আমাদের যার যতটুকু সাধ্য–

শংকরবাবুর মুখে একটা আন্তরিক দুঃখের ছায়া পড়ে, কিন্তু সূর্যর মুখে স্পষ্ট বিদ্রূপ।

শংকরদা এটা কি স্বাধীন দেশ? এ-দেশের মানুষ কী পেয়েছে?

আরে, আস্তে আস্তে সব হবে। এটা একটা শিশু রাষ্ট্র, মাত্র ছ' বছর বয়স।

যুদ্ধে যে-সব দেশ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, যেমন জার্মানি, জাপান, চিনতারা এই কয়েক বছরেই–

আমাদের দেশটার সমস্যা আরও অনেক জটিল।

কথা বলতে বলতে ওরা দোতলার বারান্দায় এসে বসে। শংকরবাবু বিশ্রাম নেবার ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পা ছড়িয়ে দিয়েছেন। দীপ্তি তিনটি গেলাসে লেবুর শরবত বানাচ্ছেন! সূর্য দীপ্তির দিকে একবারও তাকায়নি, সে তীব্র চোখে চেয়ে আছে শংকরবাবু দিকে। সে আবার বলল, শংকরদা, সেই দিনের কথা আপনার মনে। আছে? খিদিরপুরে সিয়াজুল তারিখ সাহেবের দোকানঘরে বসে আপনি আমাকে বিদ্রূপ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি অ্যাকশনে যেতে ভয় পাব কিনা? আমি ভয় পাইনি। আমি এখনও তৈরি আছি, আপনি আমাকে আবার অ্যাকশনে পাঠান।

শংকরবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন তুমি কি স্বপ্নের ঘোরে আছ। নাকি? সেসব দিন কবে চুকেবুকে গেছে। এখন অ্যাকশন বলতে কী বোঝাচ্ছ তুমি? এখন কি খুনোখুনির সময়? এখন দেশ গড়ার সময়।

না, এখন ভাঙার সময়।

কী ভাঙবে?

কুমিরের বাসা। যে-সব কুমিররা দেশের সবকিছু গিলে গিলে খাচ্ছে, তাদের বাসাগুলো আগে চুরমার করে দিতে হবে!

এসব সস্তা কথা। অ্যাকচুয়াল কাজ হাতে নিয়ে আমরা দেখছি...

আপনারা কোনও কাজই হাতে নেননি। আপনারা শুধু পারমিটের কারবার করছেন।

দীপ্তি মৃদু গলায় বললেন, সূর্য, তুমি বড্ড জোরে কথা বলছ। চঁচামেচি করলেই সবকিছুর সমাধান হয় না। তা ছাড়া তুমি তো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে না, তুমি তো সব ছেড়ে দিয়েছিলে।

তা হলে শংকরদারও ছেড়ে দেওয়া উচিত।

শংকরদা হাত উঁচু করে দীপ্তিকে থামার ইঙ্গিত করে বললেন, শোনেনা সূর্য, গণতন্ত্রে পার্টিই প্রধান। পার্টিকে শক্ত না করতে পারলে কোনও কাজই করা যায় না। তুমি একবার পার্টিতে ঢুকে দেখো, সবাইকে সামলে কাজ করা কত শক্ত। বিধানবাবু পর্যন্ত সব সময় পার্টিকে সামলাতে পারেন না। যাই হোক, তুমি কী কাজ করতে চাও সেটা বলো। তোমার জন্য আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

আমি ফাইটার। আমি লড়াই করতে চাই।

কী মুশকিল, এখন কার সঙ্গে লড়াই করবে? হাওয়ার সঙ্গে? পুরনো সেসব কথা মাথা থেকে একেবারে তাড়িয়ে দাও! সে-আমলে দু'চারটে খুনোখুনি করে আমরা দেশের কী উপকার করতে পেরেছি?

জানি, এই কথাই এখন আপনারা বলবেন। সেই জন্যই হরদা, ব্রজগোপালদা, যোগানন্দ– এদের নামও কেউ আজকাল উচ্চারণ করে না। ওরা জীবন নষ্ট করেছে।

তুমি এখনও তোমার জীবনটা অন্তত ঠিক করতে পারো চাকরি নিয়ে?

তা হলে কী করতে চাও? বেশ তো গ্রামে যাও না–

শংকরদা, আপনি হাতের আঙুল কেটে একসময় প্রতিজ্ঞা করেননি?

দীপ্তি আবার বাধা দিয়ে বললেন, এসব এখন থাক।

শংকরবাবু প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, আহা কী বলতে চায়, বলুক না। ছেলেটা আজ বড্ড রেগে আছে।

সূর্য হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর সে একটা দুঃসাহসিক কাজ করল। সিগারেট ধরিয়ে দূরের অ্যাশট্রেতে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলার ছলে উঠে গিয়ে দীপ্তির কাঁধে হাত রাখল।

দু'-এক মুহূর্তের জন্য। দীপ্তি একেবারে শিউরে উঠলেন। শংকরবাবুর মুখটা তখন অন্য দিকে ফেরানো ছিল, তিনি কিছুই টের পেলেন না।

দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে সে কোন অতর্কিতে উঠে এসে দীপ্তিকে স্পর্শ করে, তা ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো এই বিশাল দেশটির মর্ম সে এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না বলেই দীপ্তিকে ছুঁয়ে সে বাস্তবে ফিরে আসে। শংকরবাবু এই দেশ এবং দীপ্তি নামক এই নারী-দু'জনের ব্যাপারেই বেশ নিশ্চিন্ত এবং তৃপ্ত-আর সূর্যর চোখে বিশাল মরুভূমির মতন অতৃপ্তি হা হা করে জ্বলে।

শংকরবাবু একটা হাই তুলে বললেন, আজ বিকেলেই নদিয়ায় যেতে হবে। কৃষ্ণনগরে একটা কনফারেন্স আছে কাল সকালে।

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন।

তুমি যাবে? তুমি গিয়ে কী করবে?

এমনিই যাব।

জরুরি সব সরকারি কাজ, তার মধ্যে তুমি, মানে তোমারই ভালো লাগবে না।

দীপ্তি মাথা নেড়ে বললেন, না, তা হয় না। আমাদের ওখানে তিন-চার দিন থাকতে হতে পারে।

নীচে থেকে একজন পরিচারক এসে শংকরবাবুর হাতে একটা স্লিপ দিল। দু'জন এম. এল. এ. এসেছেন দেখা করতে, এঁদের বসিয়ে রাখা যায় না। শংকরবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে গেলেন।

শংকরবাবু যাবার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীর ভাবে তিনি বললেন, সূর্য, তুমি রাজনীতি নিয়ে আর আলোচনা কোরো না। ওসব তোমার জন্য নয়। তোমার মাথা গরম। তুমি তো ওসব ছেড়েই দিয়েছিলে।

হ্যাঁ দিয়েছিলাম।

তা হলে আবার...

এখানে কয়েক দিন এসে আবার বুঝতে পারলাম তো, কী সব কাণ্ড কারখানা চলছে।

তা হলে এখানে আর না আসাই ভালো–

এখানে আসব না? আমি কোথায় যাব।

তা তুমিই জানো।

তুমি আমাকে এখানে আসতে বারণ করছ?

সূর্য, আমরা শান্তিতে আছি, কেন তুমি তা ভেঙে দিতে চাও।

হ্যাঁ, আমি ভেঙে দিতেই এসেছি। সবাই সব কিছু পাবে, আর আমি বুঝি কিছুই পাব না? আর আমি আমার অধিকার ছাড়ব না।

কী তোমার অধিকার?

আমি তোমাকে চাই, অথবা শংকরদাকে চাই। তোমরা একসঙ্গে কিছুতেই থাকতে পারবে না। কিছুতেই না।

এসব কী বলছ পাগলের মতন?

মোটেই পাগলের মতন নয়। আমরা হরদার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দেশের জন্য প্রাণ দেব। রাইটার্স বিল্ডিংসয়ের গদিতে বসে বাবুগিরি করার তো কথা ছিল না! একসময় আমি ভেবেছিলাম, দেশের স্বাধীনতা এলেই আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, স্বাধীনতা আজও আসেনি, নানা চক্রান্তের জালে মানুষকে আরও বেঁধে ফেলা হচ্ছে। আমি শংকরদাকে ওই গদি থেকে টেনে নামাব।

তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ। তুমি কিছুই পারবে না। আমার স্বামী সত্যিই খাঁটি লোক, তিনি তার মতন এ-দেশের উন্নতির জন্যই কাজ করে যেতে চান। তিনি যে। তোমার সঙ্গে এতটা ভালো ব্যবহার করছেন...

ভালো ব্যবহার নয়, দয়া করছেন, কৃপা করছেন। উনি তোমাকে কেন কেড়ে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে?

কেড়ে তো নেননি? আমি স্বেচ্ছায়–

সূর্য চিৎকার করে উঠল, দীপ্তিদি–।

তারপর চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ। তার সেই চিৎকার নিশ্চয়ই নীচতলা থেকে শুনতে পাওয়া গেছে। তবু শংকরবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে এলেন না।

সূর্য চোখ খুলে ধীর স্বরে বলল, তোমার স্বামী যদি এইসব মন্ত্রিত্ব ফন্ত্রিত্ব ছেড়েছুঁড়ে না দেন, তা হলে ওঁকে আমি খুন করব। নিশ্চিত খুন করব–এ-বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহ রেখো না।

দীপ্তি কেঁপে উঠলেন। কয়েক পা এগিয়ে এসে ব্যাকুল ভাবে বললেন, তুমি এসব কী বলছ? সূর্য, আমার দিকে তাকাও–

দীপ্তি ভয় পেয়েছেন। সূর্যকে তিনি ভালো ভাবেই চেনেন। সে একটা গোঁয়ার, এ রকম কিছু করে ফেলা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। দীপ্তি সূর্যর পিঠে হাত রাখলেন।

সামান্য একটা ছোঁয়ায় কী হয় মানুষের? শান্ত শরীরে হঠাৎ কেন মনে হয় এত লক্ষ লক্ষ স্নায়ু সত্যিই ছিল। এত শান্তি, এত আকাঙ্ক্ষা, এত অতৃপ্তি। নদীর ওপরে পড়েছে জ্যোস্নার আলো, যেন সেইখানে কেউ ডাক দিয়েছে।

সূর্য সেই হাতটা ধরে ফেলে বলল, ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি মাত্র একটা শর্তে–যদি তোমাকে ফিরিয়ে দেয় আমার কাছে। আমাকেও তো কিছু পেতে হবে। সবাই সবকিছু পাচ্ছে, আর আমি কিছু পাব না?

দীপ্তি হাতটা আবার সরিয়ে নিলেন। বললেন, তা হয় না।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আমি একটা সামান্য মেয়ে, তার জন্য তুমি এ রকম করছ কেন? তুমি তো ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই পেতে পারো।

আমি তোমাকেই চাই।

আমি কেউই না।–

দীপ্তি নিজেকে কঠোর করে বললেন, সূর্য, তুমি এ বাড়িতে আর এসো না। আমি বলছি, তুমি কক্ষনও আসবে না।

আমি আসবই!

না, আসবে না। পাহারাদারদের বলে দিলে তোমাকে আর ঢুকতেই দেবে না ওরা। সেটা কি তোমার পক্ষে খুব সম্মানজনক হবে?

ভিখিরির আবার মানসম্মান কী। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি আসবই, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

আমরা এখান থেকে চলে যাব। কলকাতাতেই থাকব না।

তুমি যেখানেই যাও–

না। আমি মিনতি করছি, এ রকম কোরো না।

বললাম না, আমি আর আমার অধিকার ছাড়ব না।

তোমার কোনও অধিকার নেই।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সূর্য দীপ্তির থুতনিটা ধরে উঁচু করে বলল, আমার চোখের দিকে তাকাও, তাকিয়ে বলো তো, কোনও অধিকার নেই? একদিন তুমি বলোনি যে তুমি আমাকে ভালোবাসো? বলোনি, যে তোমার আর আমার জীবন এক হয়ে গেছে? তুমি আমার বুকে মাথা রাখোনি? তুমি বলোনি, মাঝ রাত্রে আমার ঘুমন্ত মাথার পাশে এসে বসে থাকতে তোমার ইচ্ছে করে? তবে তুমি কেন আমার জন্য অপেক্ষা করলে না?

দীপ্তি আর কথা বলতে পারলেন না। সূর্যর উন্মাদের মতন দৃষ্টিও সহ্য করতে পারলেন না তিনি। মুখ ফেরালেন। চোখ দিয়ে অজস্রধারে জল পড়তে লাগল। এই অশ্রুময় মুখের কোনও উপমা নেই।

সূর্য দীপ্তির কোমরের দিকে হাত বাড়াল। মুহূর্তের মধ্যে সে বোধহয় দীপ্তিকে আঁকড়ে এনে বুকে চেপে ধরত। ওই শরীরের রমণীটি তার জীবনসর্বস্ব। জিভ দিয়ে ওই মুখের অশ্রু মুছে নেবার জন্য তার এক জীবনব্যাপী সাধ। তবু এই সময়েই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ওঠে। সূর্যকে সরে যেতে হয়। চাপা গলায় সে বলে, আমি নষ্ট হয়ে যাব, আমি কুকুরের মতন মার খেয়ে পালাব–আর তোমরা এখানে আরামে থাকবে–শান্তিতে থাকবে তা আমি সহ্য করব ভেবেছ? কিছুতেই না।

দীপ্তি চোখের জল মুছে ফেলার কোনও চেষ্টা করলেন না। তার স্বামী এসে তাকে। দেখতে পেলেন সেই অবস্থায়। ঈষৎ ঠাট্টার সুরে তিনি বললেন, কী, সূর্য বুঝি তোমাকে পুরনো সব কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে?

যেন হাসির কথা, এই ভাবে তিনি শুকনো গলায় হাসলেন এর পরে।

সূর্য শংকরবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, এই দয়ালু, উদার, পরোপকারী, দেশের সেবকটিকে আমি খুন করব। নিশ্চিত খুন করব। এ দীপ্তিদিকে ছুঁয়েছে। আমার কথা জানার পরেও ছুঁয়েছে। এই লোকটি তার মাথার পেছনে দেশ নামক একটা ছবি টাঙিয়ে রাখে সব সময়। দেশ মানে ভণ্ডামি, দেশ মানে অহংকারে সুড়সুড়ি–এসব আমি জেনে গেছি।

৮৭. কৃষ্ণনগর শহরের রাস্তা

কৃষ্ণনগর শহরের রাস্তা দিয়ে জোরে জোরে হাঁটছে সূর্য। অনেক রাত হয়ে গেছে। রাস্তায় মানুষজন খুব কম, এক-আধটা পানের দোকানের সামনে অলস লোকের জটলা দেখা যায়। তাদের দেখলেই সূর্য এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, সার্কিট হাউসটা কোথায়?!

লোকেরা হাত তুলে রাস্তা নির্দেশ করে, তবু সূর্যর দিকভ্রম হয়। কিছুদূর গিয়ে আবার কারোকে জিজ্ঞেস করলে, সে সম্পূর্ণ উলটো দিক দেখায়। কিছুক্ষণ বাদে সূর্য একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে গেল। রিকশাওয়ালা এত রাত্রে ভাড়া যেতে চায় না, তাকে অনুনয়বিনয় করতে লাগল, মোড়ের মাথা থেকে দু'-চার জন লোক সেই কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে এসে তারাও রিকশাওয়ালাকে বলল, আরে ভাই নিয়ে যাও না, উনি বলছেন। যখন বিশেষ দরকার–।

বিশাল মাঠের মধ্যে সার্কিট হাউস, বেশ খানিকটা দূরে গেট। এখন সেই গেট বন্ধ, সেখানে পাহারা দিচ্ছে শান্ত্রী। সে সাইকেল রিকশাকে কিছুতেই গেট দিয়ে ঢুকতে দেবে না। সেখানে একটা বচসা বেধে গেল। সার্কিট হাউসের বাইরের সিঁড়িতে বসে থাকা দু'জন সেপাইও ছুটে এল সেদিকে।

সারাদিন বহু স্মারকলিপি, বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কমিটি স্থাপন এবং দুটি জনসভা সেরে মন্ত্রী শংকর বসু খুব ক্লান্ত হয়ে এই একটু। আগে

ঘুমিয়েছেন। মাথার কাছে এক কাপ দুধ ঢাকা রয়েছে, ভোরবেলা উঠে তিনি ঠান্ডা দুধ খান। ঘুমের মধ্যেও চিন্তাক্লিষ্ট তার মুখভঙ্গি।

দীপ্তি জেগেই ছিলেন। ঘুম আসছিল না কিছুতেই, তিনি যেন উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন কিছুর অপেক্ষায়। তার হৃৎস্পন্দন এখন দ্রুত, হাতের তালুতে জ্বালা জ্বালা করছে। দীপ্তি ঘুমন্ত স্বামীর পাশ থেকে উঠে পড়লেন। একটা পাতলা শাল জড়িয়ে নিয়ে বসবার ঘর পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়।

সামনের বাগানে ফুটে আছে একঝাড় চন্দ্রমল্লিকা। বিরাট বিরাট আকাশিরা গাছগুলির চিকন পাতায় হাওয়ার সরসর শব্দ শোনা যায়। পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। চরাচরে। সেই জ্যোৎস্না পড়েছে দীপ্তির মুখে। তার মুখোনি বিবর্ণ।

দীপ্তি তাকালেন গেটের দিকে। ওখানে কী হচ্ছে তিনি খুব ভালো ভাবেই জানেন। তবু তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, রামরতন, কী হয়েছে? ওখানে গোলমাল হচ্ছে কেন?

রামরতন এসে জানাল যে সাইকেল রিকশা চেপে একজন আদমি এত রাত্রে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। সে বলছে, সাহেবের সঙ্গে তার জরুরি দরকার। বোধহয় মাতোয়ালা টাতোয়ালা হবে।

দীপ্তি বললেন, এখন দেখা হবে না, ওকে চলে যেতে বলো।

দূর থেকে সূর্য ডেকে উঠল, দীপ্তিদি–

দীপ্তি আবার বললেন, ওকে চলে যেতে বলল। বলল, কাল সকালে আসতে–

এইকথা বলার পর দীপ্তির মুখখানা কুঁকড়ে গেল। চোখ বুজে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার চোখ খুলে দেখলেন, রামরতন এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। তিনি বললেন, না, না, রামরতন, তাড়িয়ে দিয়ো না, ওকে ভেতরে আসতে দাও।

গেট খোলা পেয়ে সূর্য সাইকেল রিকশা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে চলে এল বারান্দার কাছে। তারপর উত্তেজিত অভিযোগের সুরে বলল, তুমি আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে বারণ করেছিলে?

সেই উত্তেজনা দীপ্তিকে স্পর্শ করল না। তিনি নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য, তুমি কেন এসেছ?

জ্যোৎস্নায় দীপ্তির হালকা ছায়া পড়েছে সিঁড়িতে। সূর্য সেই ছায়াতে দাঁড়িয়ে। তার দীর্ঘ শরীর দীপ্তির চোখের সামনে থেকে দূরের বাগানটা আড়াল করে দেয়।

সূর্য বলল, আমি থাকতে পারলাম না। ট্রেন খুব লেট ছিল, তাই আমার এত দেরি হল।

দীপ্তি দেখলেন রামরতন অদূরে দাঁড়িয়ে, তার সন্দেহ মেটেনি, সে সরু চোখে দেখছে। সূর্যকে। দীপ্তি অত্যন্ত সংকুচিত বোধ করলেন। চাকরবাকর-দেহরক্ষী-পাহারাদার এরা তার সম্পর্কে কী ভাবছে কে জানে। তিনি আড়ষ্ট ভাবে বললেন, ওঁর সঙ্গে যদি তোমার দরকার থাকে–উনি তো রাত্রে আর উঠবেন না, সকালবেলা আসতে পারো কিংবা বসবার ঘরের সোফায় যদি রাতটা কাটাতে চাও...

তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি এখন শুতে যাব।

এক্ষুনি? একটু দাঁড়াও–

দীপ্তি অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে রামরতন, তুমি শুতে যাও–। তিনি সেদিকেই কিছুক্ষণ চেয়ে রামরতনের চলে যাওয়া দেখলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত ম্লান গলায় বললেন, সূর্য, তুমি আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো। আমি একটা সামান্য মেয়ে। আমার কিছুই নেই। আমার মনের জোর ছিল না, আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, আমি হেরে গেছি। আমি একেবারেই হেরে গেছি। তুমি আমার ওপর রাগ করতে

পারো, আমাকে ঘেন্নাও করতে পারো, কিন্তু তুমি নিজেকে নষ্ট কোরো না। তোমার শক্তি আছে, তুমি এখনও অনেক কিছু পারবে।

সূর্য বলল, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, চলো ওই মাঠের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি।

তা হয় না।

কেন? তুমি তোমার স্বামীকে ভয় পাও?

ওর সঙ্গে আমার ভয়ের সম্পর্ক নয়!

তা হলে?

তুমি কিছুই বুঝতে পারো না! তুমি কি ভাবো, তুমি যা চাও, তাই হবে? তোমার ভালোর জন্যই আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি।

তুমি আমার ভালো চেয়ে চেয়েই আমার সর্বনাশ করেছ।

কী বললে?

কত দিন তোমাকে দেখিনি, কত দিন যে তোমার আঙুলগুলোতে চুমু খাইনি।

দীপ্তি দু'কানে হাত চাপা দিলেন। তার সারা মুখটা কাঁপছে। অতি কষ্টে কান্না সামলে তিনি বললেন, ছিঃ, ওসব বোলো না! কেন আমাকে কষ্ট দিতে চাও? আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে। তুমি যাও–

সূর্য এগিয়ে এসে দীপ্তির একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল, আমি কোথাও যাব না। এবার আমাকে অত সহজে তাড়াতে পারবে না।

দীপ্তি ত্রাসের সঙ্গে চাপা গলায় বললেন, ছাড়ো আমাকে, শিগগির ছাড়ো!

আমি তোমাকে এক্ষুনি নিয়ে চলে যাব।

এ ভাবে তুমিও বাঁচতে পারবে না, আমিও বাঁচতে পারব না!

দীপ্তিদি, আমার কোথাও আর যাবার জায়গা নেই। আমি তো তোমার কাছ থেকে অনেক দূরেই চলে গিয়েছিলাম। কোনও জায়গায় আমি শান্তি পাইনি। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমার জীবনটা কি এই রকম ভাবে নষ্ট হবে? তোমার কথা চিন্তা করলেই একমাত্র আনন্দ পাই, আমার আবার ভালো ভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে তোমাকে পেলে আবার আমি অনেক কাজ করতে পারব, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারব।

লক্ষ্মীটি হাত ছাড়ো–

না।

তোমার পায়ে পড়ি, সূর্য, আমাকে ছেড়ে দাও। এখানে অনেক মানুষজন আছে। আমি যদি ওদের বলতাম তোমাকে ঢুকতে না দিতে?

তুমি তা পারতে?

আমি তা পারি না বলেই কি তুমি জোর করবে?

জোর করব না। তুমি আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে এসো। এক্ষুনি। সামনেই রাস্তা খোলা আছে। আবার আমাদের নতুন জীবন শুরু হোক।

ভুল করি আর ঠিক করি, আমার বিয়ে হয়ে গেছে অন্য একজনের সঙ্গে।

এটা নকল বিয়ে। সেই যে রকম চন্দননগরে–

না, না, এটা তা নয়।

দীপ্তিদি, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে কোনও দিন ভালোবাসোনি? আমাকে কখনও চাওনি?

হাত ছাড়ো, বলছি–

সূর্য হাতটা ছেড়ে দিতেই দীপ্তি কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। জ্যোৎস্নাটা সরে গেল তার মুখ থেকে। শাড়িটা ঠিক করার জন্য তিনি আঁচল সমেত বাঁ হাতটা একবার তুললেন। সেই আবছা অন্ধকারে এক মুহূর্তের জন্য আঁচল-ছড়ানো বাঁ হাত সমেত তার সম্পূর্ণ দেহটা ভারতের মানচিত্রের মতন মনে হয় যেন। সূর্যর চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

দীপ্তি কঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমি যদি সত্যি কথাটা বলি, তারপর তুমি এখান থেকে চলে যাবে বলো? কথা দাও?

আগে বলো। সত্যি কথাটা বলো–

সূর্য, তোমাকে আমি কখনও ভালোবাসিনি। তোমাকে আমি কখনওই চাইনি। আমি খুব খারাপ–

কথাটা শেষ করেই দীপ্তি দ্রুত ঢুকে যাচ্ছিলেন ভেতরে, সূর্য দৌড়ে এল সে-দিকে। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দীপ্তি দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করেও পারলেন না, সূর্য জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দীপ্তির শরীর তখন কান্নায় দুলে দুলে উঠছে, তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে না দাঁড়ালে পড়েই যেতেন।

সূর্য তার পিঠে হাত দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওই কথাটা আর একবার বলো–

দীপ্তি কান্না থামাতে পারলেন না। সেই অবস্থাতেই বললেন, ও এক্ষুনি জেগে উঠবে।

উঠুক।

সবই আমার দোষ। আমি তোমাকেও নষ্ট করলাম।

এখনও সবকিছু করার সময় আছে।

দীপ্তি ভেজা মুখখানা ফেরালেন। তারপর হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়ে বললেন, আমি মরে গেলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যায়, তাই না?

না। এই বিয়ে ভেঙে দিয়ে এক্ষুনি যদি আমরা এখান থেকে চলে যাই, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে।

বিয়ে ভাঙা যায় না। সমাজ থেকে পালিয়ে পালিয়ে কিছুতেই আমি বাঁচতে পারব না। আজ থেকে কুড়ি-তিরিশ বছর বাদে হয়তো এসবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে, কিংবা অন্য কোনও দেশে, কিন্তু আমাদের নিয়তি অন্য রকম। আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না– এটা আমার শেষ কথা।

তা হলে আমার কথাও শুনে রাখো, আমি তোমাকে আর শংকরদাকে কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে দেব না। আমি ত্যাগ জানি না।

সূর্য, শান্ত হও! একটু চিন্তা করে দেখো। শুধু রাগারাগি করলেই সব পাওয়া যায় না!

আমি শান্ত হতে পারছি না।

তুমি ভালো হয়ে ওঠো, তোমার এসব পাগলামি সেরে যাক। তোমার একটা সুখী জীবন দেখলে পৃথিবীতে আমার চেয়ে আর কেউ বেশি সুখী হবে না।

আমার সব সুখ তোমার কাছে জমা আছে।

সূর্য, তুমি শুধু শুধু আমাকে বেশি মূল্য দিচ্ছ। আমার যে কিছুই নেই।

তোমার কী আছে তা আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি, দশ হাজার শংকর বোসও ততটা ভালো বাসতে পারবে না। আমি তোমাকে চাই আমরা। একটা পাহাড়ের ওপর বাড়ি করে থাকব, অনেক উঁচু পাহাড়, মেঘ এসে লাগবে তোমার...

এইসময় শংকর বসুর শয়নকক্ষে খুট করে একটা শব্দ হল। দীপ্তির পিঠে তখনও সূর্যর হাত, তিনি বিদ্যুৎগতিতে সরে যেতে চাইলেন। সূর্য তবু তাঁকে সবলে ধরে রইল।

দীপ্তি আকুল ভাবে বললেন, কী করছ কী, ছাড়ো, ও জেগে উঠেছে। সূর্য কোনও কথা না বলে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

দীপ্তি নিচু হয়ে সূর্যর পা ছোঁয়ার চেষ্টা করে বললেন, আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমার কেউ না, কোনও দিনই আমি তোমার কাছে যাব না–

সূর্য চেয়েছিল, সেই মুহূর্তেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাক। শংকরবাবু মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে এসে দেখবেন তার স্ত্রী পরপুরুষের আলিঙ্গনে। সূর্যর এজন্য কোনও লজ্জা নেই। সে শংকর বসুকে স্পষ্ট বলবে, এই নারী আমার। তুমি এই দেশ নাও, যত ইচ্ছে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নাও, কিন্তু এই নারীকে পাবে না। কিন্তু দীপ্তি যখন বললেন, কোনও দিনই আমি তোমার কাছে যাব না, তখন তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যা সূর্যকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। তার যুক্তিহীন উত্তেজিত হৃদয়ও যেন অনুভব করতে পারে যে এরপরে আর কোনও জোর চলে না। সূর্য হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দীপ্তির দিকে তাকাল আর একবার। মনে হল, এই মুখ তার অচেনা। বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সূর্য দীপ্তিকে এবার ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে ডাকল, শংকরদা–

ড্রয়িং রুমের পর বিরাট ডাইনিং রুম, তার ডান দিকে শোবার ঘর। সেই ঘরের দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন শংকর বসু। পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই শুয়েছিলেন, সেই অবস্থায় উঠে

এসেছেন, চুল অবিন্যস্ত, এখন তাঁকে নিজের বয়সের চেয়েও বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে। চোখে লেগে আছে ঘুম, চিবুকের কাছে শ্রান্তি।

তিনি বললেন, কে ওখানে? সূর্য?

সূর্য উত্তর দেবার আগেই দীপ্তি তাঁর স্বামীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, সূর্য হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে–

শংকরবাবু মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে হাই তুলে বললেন, কী ব্যাপার, সূর্য? হঠাৎ চলে এলে যে?

সূর্য বলল, আমি তো বলেই ছিলাম আমি আপনাদের সঙ্গে আসব। আপনারা নিয়ে এলেন না, তাই আমি নিজেই এলাম।

এখানে তো আমাদের অনেক কাজ। তুমি এখানে কী করবে? আমরা তো আর। প্রমোদ ভ্রমণে আসিনি।

আপনার সঙ্গেও আমার অনেক কাজের কথা আছে।

সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তা বলে এখানে–

শংকরবাবু হঠাৎ হাসলেন। দীপ্তির দিকে ফিরে বললেন, সূর্য বুঝি তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে? আমাকে ডাকলে না কেন?

দীপ্তি কোনও উত্তর দিলেন না।

শংকরবাবু সেই রকম হাসিমুখেই সূর্যকে বললেন, দীপ্তির সঙ্গে যদি তোমার আলাদা কিছু বলার থাকে, তুমি অনায়াসেই তা বলতে পারো, আই ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু এত রাত্রে, এই রকম জায়গায়–ব্যাপারটা ভালো দেখায় না–

সূর্য চুপ করে রইল।

শংকর বসু ডাইনিং রুমের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সূর্যকে বললেন, বোসো, এখানে এসে বোসো। দীপ্তি তুমি–

দীপ্তি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন। বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে।

শংকরবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, একটা সিগারেট দাও। আছে?

সূর্য পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করল। দু'জনেই ধরাল সিগারেট। শংকরবাবু থুতনিতে বাঁ হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বললেন, সূর্য, তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নেই। বড় হয়ে উঠতে শেখো। ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা তো করলেই হয় না। সবকিছুর দায়িত্ব নিতে হয়। দীপ্তিকে যে তুমি শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ, এতে তোমার কী লাভ?

এসব যুক্তিতর্কের কথা। সূর্য যুক্তিতর্ক কিছুই বোঝে না। সে বকুনি খাওয়া গোঁয়ার বালকের মতোই গুম হয়ে রইল।

শংকরবাবু আবার শুরু করলেন, তোমার আর দীপ্তির মধ্যে কী হয়েছিল, আমি তা জানি। আমাকে ও সব বলেছে। স্বাধীনতার ঠিক আগে সবাই যখন ছত্রভঙ্গ, বিশেষত তোমাদের মতন যাদের কোনও পার্টি ছিল না, তাদের নিজস্ব কোনও দাঁড়াবার জায়গাও ছিল না– সেই সময় তোমরা কয়েক জন কাছাকাছি এসেছিলে। তোমার তখন বয়স কম–তাই তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে দীপ্তিকে। দীপ্তি সত্যিই মানুষকে শান্তি দিতে পারে– শুধু ওর রূপ নয়, চরিত্রটাই অসাধারণ। তার ফলে তোমার দিক থেকে খানিকটা ইনফ্যাচুয়েশন হয়েছিল। তুমি হয়তো তাকে লাভ বলে ভেবেছিলে, কিন্তু আমি ইনফ্যাচুয়েশনই বলব। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো এটা কেটে যাবার কথা। তুমি কি চিরশিশু হয়ে থাকতে চাইছ নাকি! তোমার মতন বয়সে আমি প্রেম-ভালোবাসা টাসার কথা চিন্তা করারই সময় পাইনি। দীপ্তিকে আমি বহুকাল ধরে চিনি–কোনও দিন অন্য রকম কিছু ভাবিনি–এখন বুঝতে

পারছি, প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে পরস্পরকে বুঝতে পারাই বড় কথা। আমরা দু'জনকে যে রকম...

সূর্য অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলল, শংকরদা, আগস্ট আন্দোলনের সময় আমি নিজের হাতে তিন জন মানুষকে খুন করেছিলাম। কেন করেছিলাম?

শংকরবাবু একটু চমকে গিয়ে বললেন, হঠাৎ একথা কেন?

এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল।

ওসব পুরনো কথা এখন একেবারে ভুলে যাও। ওসব আর মনে স্থান দিয়ো না।

আমার দোষ এই, আমি কোনও পুরনো কথাই ভুলতে পারি না। তার বদলে কি আমি কিছুই পাব না?

তোমাকে তো কত বার বললাম, একটা কোনও কাজ নিতে। আমি তো রাজিই আছি।

আমি চাকরি করব, আর আপনি মন্ত্রিত্ব করবেন?

মন্ত্রিত্বটা বুঝি খুব আরামের! নাঃ, তোমার দেখছি মাথাটা এখনও গরম হয়ে আছে।

শংকরবাবু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, দীপ্তি!

দীপ্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে শংকরবাবু বললেন, তোমার এই আদরের ছোট ভাইটি দেখছি সব সময় রেগে টং হয়ে আছে। একে নিয়ে কী করা যায় বলো তো!

সূর্য দীপ্তির দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলল, দীপ্তিদি, তুমি এখানে একটাও কথা বলবে না!

শংকরবাবু বললেন, আরে এ কী! সূর্য, তুমি আমার স্ত্রীকে এখনও দিদি বলে ডাকো, অথচ সম্মান দিয়ে কথা বলো না, এটা ঠিক না। ব্যবহার ট্যাবহার একটু ঠিক করো। যাক

শোনো, অনেক রাত হয়েছে, এখন আর কথাবার্তা বলে লাভ নেই। এসেই যখন পড়েছ, তখন রাতটা কাটিয়ে যাও এখানে। দীপ্তি তুমি ওর একটা শোওয়ার ব্যবস্থা করে দাও উত্তরের ঘরটা বোধহয় খালি আছে।

সূর্য বলল, আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করার দরকার নেই।

শংকরবাবু বললেন, দরকার নেই মানে? তুমি ঘুমোবে না? আমাদের তো ঘুমোতেই হবে।

দীপ্তিও খুব কোমল গলায় বললেন, সূর্য, এবার শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গেছে, প্রায় একটা।

দীপ্তির কণ্ঠস্বর এখন স্বাভাবিক। একটু আগে তিনি যে ব্যাকুল ভাবে কেঁদেছিলেন, তার কোনও চিহ্নই নেই। এই সংযমের জন্য তার মুখখানা যে রক্তশূন্য হয়ে গেছে, সূর্য। তা লক্ষই করল না।

শংকরবাবু উঠে এসে সূর্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, আরে চলো, চলো, আবার কাল সকালে কথা হবে। দীপ্তি, দেখো তো বিছানা পাতা আছে কিনা।

শংকরবাবু সূর্যকে ধরে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। দীপ্তি ঘরের মধ্যে ঢুকে ঠিকঠাক করে দিলেন বিছানার চাদর বালিশ। বেরিয়ে এসে বললেন, যদি রাত্তিরে তোমার জলতেষ্টা পায়-এই ডাইনিং রুমে জল আছে।

যে কারণেই হোক, সূর্য আর আপত্তি করল না। ঘরে ঢুকে সে খাটের ওপর বসল। সেখান থেকে সে দেখল, শংকরবাবু আর দীপ্তিদি ঢুকে গেলেন তাদের ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সূর্যর শরীরটা জ্বলছে তখন, হাতদুটো শক্ত হয়ে গেছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত। তার মুখটা দেখলে এখন চেনাই যায় না। অন্তত দশ জন মানুষের সারা জীবনের রাগ সে অনুভব করছে এই মুহূর্তে। যে-নারীকে পেলে সে পূর্বজীবনের সবকিছু ভুলতে পারে, যে-

নারীর জন্য সে আবার সব কোমলতা, দয়া মায়া, ফিরে পেতে পারে-সেই নারী আজ তারই চোখের সামনে অপর পুরুষের সঙ্গে শয়নকক্ষে চলে গেল।

ক্রোধ মানুষকে অসহায় করে দেয়। সূর্য নিশ্চল হয়ে বসে রইল সেখানে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে শুনতে চাইল, ও-ঘর থেকে কোনও শব্দ আসে কিনা। ও-ঘরের আলো নিবে গেছে, কোনও শব্দ নেই।

সূর্য সেখানে কতক্ষণ বসে আছে, তার খেয়াল নেই। দরজা খোলা, সে খরচক্ষে চেয়ে আছে দরজার দিকে। তার মনে হচ্ছে, যে-কোনও সময় দরজার কাছে দীপ্তিদির চুম্বকময় শরীরখানি দেখতে পাবে। সূর্য ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা দীপ্তিদি কি তা দেখতে আসবে না, দীপ্তিদি যে বলেছিল, সূর্যর ঘুমন্ত মুখের পাশে তার বসে থাকার খুব সাধ ছিল। সে কি মিথ্যে? আজ এত কাছে-সেই জন্যই কি সূর্য এ-ঘরে শুতে আসার জন্য সহজে রাজি হয়নি? এই বিছানায় আছে দীপ্তিদির হাতের স্পর্শ...

কত অনুপল, পল, দণ্ড, প্রহর কেটে গেল সূর্য জানে না। বাইরে ঝিমঝিম করছে রাত। কোথাও একটাও শব্দ নেই। সূর্যর কানে এসে লাগছে নৈঃশব্দের অসহ্য শব্দ।

পৃথিবীতে আর সবাই ঘুমন্ত। শুধু সে একা জেগে আছে। সবাই সব পুরনো কথা ভুলে। যেতে পারে, শুধু সে পারে না। তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে হাজরা রোডের একখানা ঘর, সেখানে সে আর দীপ্তিদিবাইরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দীপ্তিদি তার বুকের মধ্যে ছটফট করতে করতে বলেছিলেন, সূর্য, তুমি আমাকে নাও, তুমি আমাকে নাও, আরও জোরে চেপে ধরো-তারপর মনে পড়ল যোগানন্দর কথা, সে বলেছিল, এবার সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে ভালো করে বাঁচব বুঝলি, তোর বোনের বাড়িতে গিয়ে ভালো করে খাব-

এই সময় যোগানন্দর কথা মনে পড়ায় সূর্য নিজেই একটু অবাক হয়। যোগানন্দর মৃত মুখোনি তার চোখের সামনে ভাসে। সমস্ত মৃত সহকর্মীদের জন্য শোক অনুভব করে সে। ব্রজগোপালদা বলেছিলেন, যে ভাবেই হোক বিশ্বাসঘাতক যোগানন্দকে খুঁজে বার

করতেই হবে। সূর্য খুঁজে বার করেছিল। তার স্ত্রীর কাছ থেকে যোগানন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যোগানন্দর সঙ্গে কি আজকের শংকর বসুরও মিল নেই?

সূর্য উঠে দাঁড়াল। সে বুঝে গেছে, কেউ আসবে না। এক-একদিন নিস্তব্ধতার মধ্যেই বোঝা যায়, এর মধ্যে কোনও সম্ভাবনা নেই। সূর্য কি এখন চলে যেতে পারে এখান থেকে? সেও কি অন্য রকম ভাবে বাঁচতে পারে? অন্য রকম কী ভাবে বাঁচা যায়, সে জানে না, এখন তার আর কিছুই মনে পড়ছে না। আর কোনও দিকে রাস্তা নেই।

সূর্য পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল শংকর বসুর ঘরের দরজার সামনে। চোরের মতন কান পেতে শুনতে চাইল কোনও শব্দ। কিছুই নেই। এখনও সূর্য ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তার ফিরে যাবার সাধ্য নেই। সে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল দরজায়।

ভেতর থেকে শংকর বসু বললেন, কে?

আমি সূর্য, দরজা খুলুন।

কী চাই?

শিগগির দরজা খুলুন।

আঃ, কী চাও এখন? যাও, ঘুমোও–

শিগগির দরজা খুলুন।

শংকর বসু ভীরু মানুষ নন। তিনি দরজা খুলে বিরক্ত মুখে দাঁড়ালেন। আগেকার সব ভদ্রতার চিহ্ন মুছে গেছে।

সূর্য উঁকি দিয়ে ভেতরে দীপ্তিকে একবার দেখবার চেষ্টা করল তৃষ্ণার্তের মতন। শংকরবাবু দরজা আড়াল করে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আবার কী হল? একটু শান্তিতে ঘুমোতেও দেবে না?

আপনি বাইরে আসুন, আপনার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

শংকরবাবু এবার প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, এসব কী পাগলামি হচ্ছে? তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। যত সব ন্যাকামি।

শংকর বসু ধমক দিয়ে একটু ভুল করলেন। ধমকে ভয় পাবার ছেলে তো এ নয়। সূর্য শংকর বসুর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাইরে বার করে এনে ভয়ংকর মুখ করে বলল, আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

সূর্য, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। তুমি আমার বন্ধু হিসেবে কিংবা দীপ্তির ছোট ভাই হিসেবে যত বার ইচ্ছে আমাদের বাড়িতে আসতে পারো কিন্তু এ রকম যদি করো–

আমি আর কোনও দিন আসব না। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দীপ্তি উঠে এসেছেন। দু'জনের মাঝখানে হাত রেখে বললেন, এ কী! সূর্য এ কী করছ? ছেড়ে দাও। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

সূর্য তার সেই অস্বাভাবিক হিংস্র মুখটা দীপ্তিকে দেখিয়ে বলল, তুমি এর মধ্যে এসো না। তোমার সঙ্গে আর আমার কোনও দরকার নেই। কিন্তু আমি একেও এখানে থাকতে দেব না।

শংকরবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, এ তো একেবারে পাগল হয়ে গেছে। এখন একে আটকে রাখা ছাড়া–

সূর্য শংকরবাবুর কথা শেষ করতে দিল না। তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে দৌড় করিয়ে সোজা নিয়ে এল বাইরে। দীপ্তি চেঁচিয়ে উঠলেন, রামরতন, রামরতন– তারপরই নিজের মুখে হাত চাপা দিলেন। তিনিও ছুটে এলেন বাইরে।

সূর্য ততক্ষণে শংকরবাবুকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। শংকরবাবু প্রাণপণে চাঁচাচ্ছেন ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। তিনি দুর্বল মানুষ না হলেও সূর্যর গায়ে এখন অসুরের মতন। শক্তি। সে শংকরবাবুকে কোথায় নিয়ে যাবে জানে না, নিজে কোথায় যাবে তাও জানে না, শুধু জানে দীপ্তিদির কাছ থেকে এই লোকটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। সে দূরে সরে যাবে, এই লোকটাকেও এখানে রেখে যেতে পারবে না। সে একা সবকিছু ছাড়বে কেন। সেপাই সান্ত্রীরা জেগে উঠেছে, সূর্যর ভ্রূক্ষেপ নেই।

শংকরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

সূর্য বলল, চুপ! আমি যদি গ্রামে গিয়ে মাটি কোপাবার কাজ করি, আপনাকেও তাই। করতে হবে।

সেই সময় রামরতন পেছন থেকে জাপটে ধরল সূর্যকে। সূর্য যন্ত্র-মানুষের মতন প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। রামরতন এত জোরে আছড়ে পড়ল যে তার নাকটা ঘষটে গিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল গলগল করে। নিজের রক্ত-দর্শনে রামরতন দিশেহারা হয়ে যায়। সেই অবসরে একটু আলগা পেয়ে শংকর বসু ছুটতে লাগলেন। ফুলবাগানের দিকে।

সূর্য বাঘের মতন তাড়া করে গেল তার দিকে। ফুলবাগান লন্ডভন্ড করে সে যখন শংকর বসুকে প্রায় ধরে ফেলেছে, তিনি মাটিতে বসে পড়ে চিৎকার করলেন, মেরো না, আমাকে মেরো না-ভয়ে তার মুখ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন।

রামরতনের প্রথম গুলিই সূর্যর পিঠে লাগে। কিন্তু সূর্য যেন টেরই পায়নি। তখনও সে শংকরবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, মারব না, উঠে আসুন।

সেইটাই সূর্যর শেষ কথা। রামরতনের দ্বিতীয় গুলি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য পড়ে গেল মাটিতে। কয়েকবার উলটেপালটেই তার শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

রামরতন ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। শংকরবাবু বিহ্বল ভাবে একবার তার দিকে আর একবার সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর ঠাস করে রামরতনের গালে এক থাপ্পড় মেরে বললেন, উল্লুক, একী করলি?

দীপ্তি ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, সূর্য গুলি করেছে! তোমার লেগেছে?

শংকরবাবু বললেন, না। ওই দেখো।

দীপ্তি নিচু হয়ে সূর্যর গায়ে হাত দিয়ে বলল, এ কী, ও উঠছে না কেন? অজ্ঞান হয়ে গেছে?

শংকরবাবু বললেন, সব শেষ।

দীপ্তিকে যেন কেউ চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা ভাবে টানল। তিনি সূর্যর বুকের ওপর হাতটা রাখলেন, আর একটাও কথা বলতে পারলেন না। সেই সময় তার চোখে কান্না এল না। সমস্ত শরীরের মধ্যে এলেমেলো গরম হাওয়া ঘুরছে। একটা চিন্তাই তার মাথায় গেঁথে গেল, আমি কেন জন্মেছিলাম? এই ব্যর্থ ভিতু জীবন নিয়ে আমি কী করব?

শংকরবাবু বিহ্বল ভাবটা হঠাৎ কাটিয়ে উঠলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে বললেন, দারুণ কেলেংকারি হয়ে যাবে। আমার মান-সম্মান-খবরের কাগজে যদি...দীপ্তি, শিগগির ওঠো, ঘরে যাও, সূর্যর সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়নি, ও জোর করে এখানে ঢুকে আমাকে মারতে এসেছিল, থানায় খবর দাও, এই রামরতন, দৌড়ে যাও যে রিকশায় করে এসেছিল, সেই রিকশাওয়ালাকে ধর, সে সাক্ষী দেবে-এই তোমরা কেউ ওর বডি এখন ছোঁবে না-

শংকরবাবু দীপ্তিকে ধরে তুললেন। তারপর সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, ছেলেটা একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল, চলো, তুমি শুয়ে পড়বে চলো-। তোমার যতটা কষ্ট হচ্ছে, আমারও তার চেয়ে কম নয়...

দীপ্তিকে ধরে ধরে তিনি নিয়ে গেলেন ভেতরে। কয়েকটা ফুলগাছ দলিত করে সূর্যর দেহটা পড়ে রইল সেখানে। রক্তের গন্ধ পেয়ে একটা কুকুর কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছিল, দু'জন সেপাই সেটাকে তাড়াচ্ছে।

দূরে একটা রাতচরা পাখি হঠাৎ অলৌকিক ভাবে ডেকে ওঠে। আরও দূরে শোনা যায় একটি শিশুর কান্না। হাওয়ায় বড় বড় গাছগুলি থেকে টুপটাপ করে পাতা ঝরে। নির্জন রাস্তায় ভয় তাড়াবার জন্য একজন লোক জুতোর শব্দ তুলে ও গান গাইতে গাইতে যায়। গির্জায় ঘণ্টা বাজে। বোঝা যায়, জীবন ঠিক বয়ে চলেছে।

সূর্যর মুখখানা আকাশের দিকে ফেরানো। ফিকে জ্যোৎস্নাতেও স্পষ্ট দেখা যায়, এখনও সেখানে রাগ আর অভিমানের আঁকাবাঁকা রেখা পড়ে আছে। আর কোনও দিন মুছবে না।

৮৮. পাহাড়ে দ্রুত উঠতে নেই

পাহাড়ে দ্রুত উঠতে নেই, সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়, তবু আমি জেদ করে তাড়াতাড়িই উঠেছিলাম। জলাপাহাড়ের ওপরটাতে কোনও দিন ওঠা হয়নি, আজ উঠবই। ঘোড়া নিইনি। কয়েক দিন ঘোড়ায় চড়ে দেখেছি, ভালো লাগে না, জোরে ঘোড়া ছোটাতে না পারলে আনন্দ নেই।

বিশ্রাম নেবার জন্য একটা কচ্ছপের পিঠের মতন পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরাতেই চোখে পড়ে শ্বাসরোধকারী দৃশ্য। বহু নীচে উপত্যকায় আমার সিগারেটের ধোঁয়ার মতনই হালকা কিন্তু বিপুল পরিমাণে ধোঁয়ার মতন মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছে, যেন জীবন্ত। পুরু সবুজ গালিচার মতন অরণ্য মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যায়, আবার যখন দৃশ্যমান হয়, তখন মনে হয়, সবকিছুই যেন অপরূপ ভালোবাসার মতন স্তব্ধ হয়ে আছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করি, জমাট মেঘের আড়াল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা জেগে উঠেছে কিনা। জাগেনি। অথচ মাথার ওপরে আকাশ এত নীল।

পথ ঘুরে গেছে নীচে। অনেক নীচে কয়েকটি ঘোড়ার পিঠে দুটি রমণী ও একজন পুরুষ। এত দূর থেকেও চিনতে অসুবিধে হয় না।

সিগারেটটা শেষ করে আমি আবার উঠতে শুরু করি। একটা লজেন্স পুরে দিই মুখে। টক-মিষ্টি স্বাদটা ভালো লাগে। আজ সবকিছুই ভালো লাগছে। আজ আমি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারি। এই সমূহ প্রকৃতির মধ্যে এত নিবিড় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এমন অসম্ভব মায়া জেগে ওঠে যে, ইচ্ছে হয় নিজের জীবনটাকে নিজেই আদর করি।

অথচ আমি ভেবেছিলাম, প্রকৃতির কাছে আমার কোনও সান্ত্বনা নেই। এর রূপও আমাকে মুগ্ধ করতে পারবে না। এই আকাশ ও পটভূমিকার গম্ভীর পাহাড়-এ-সবই তো পুরনো। উপত্যকার অরণ্য কিংবা খেলনার শহর অথবা এই সঞ্চরমান মেঘ এসবই তো বহুকালের পুরনো দৃশ্য। যা পুরনো, তা আমাকে আনন্দ দেবে কী করে! তবু এই জলাপাহাড়ে এসে যুক্তি হার মেনে যায়। ভালো যে লাগছে, প্রকৃতির মধ্যে এসে প্রায়। অতিপ্রাকৃত ভালোলাগা, অস্বীকার করি কী করে?

দার্জিলিংয়ে না আসতেও পারতাম এই সময়ে। যেমন, মানুষ হয়ে না জন্মাতেও পারতাম, কিংবা অন্য কোনও বাবা-মায়ের সংসারে, অন্য রকম মানুষ হয়ে, আর এক রকম কাহিনীর মধ্যে জীবনটা কাটতে পারত। আমার পুরী যাবার কথা ছিল। হঠাৎ দার্জিলিং চলে আসা।

না, আসলে এই রকম নির্জনে, নিজের কাছেও সত্যি কথাটা প্রকাশ করতে দ্বিধা হয়। রেণুরা দার্জিলিং বেড়াতে আসছে শুনেই কি আমি পুরী যাওয়ার পরিকল্পনাটা বদলাইনি? আমি আজ মনে মনে বলেছিলাম, রেণুরা যাচ্ছে তো কী হয়েছে। আর কেউ কি দার্জিলিং যেতে পারে না? কাকে এই কথাটা বোঝাচ্ছিলাম, আমাকে তো কেউ দার্জিলিং আসতে বারণ করেনি! এই এক রকমের লুকোচুরি খেলা। আমি রেণুকে এড়িয়ে যাই, আবার দূর থেকে ওকে দেখি। রেণুকে আমার ঠিকানা জানাই না, অথচ ইউনিভার্সিটির ছুটির পর দূর থেকে রেণুকে একঝলক দেখে নেবার জন্য ছটফট করি। আমার এই ছেলেমানুষিতে

আমিই অনেক সময় ভ্রুকুটি করেছি কিংবা হেসেছি। একই শরীরের মধ্যে আমি ছেলেমানুষ এবং সমালোচক। এ রকম হয় না বুঝি?

একটা পাথরের গায়ে কারা যেন নাম লিখে গেছে। কয়েকটি নাম বেশ টাটকা, পার্থ প্লাস ব্রততী; মিনা প্লাস শীতল; ঝুমু, কুমু, ঝরনা এবং খোকন; একজন লিখেছে স্বপ্ন আমি তোমাকে-। তারপর একটি অসভ্য শব্দ। খড়ির লেখা, আমি ওই শব্দটা হাত দিয়ে মুছে ফেললাম। যে লিখেছে সে বোকা, ওই শব্দটা এত প্রকট ভাবে বলার তো দরকার নেই। শুধু আমি তোমাকে বললেই তো সব কিছু বোঝা যায়। পাথরটার সামনে একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট, পুরনো খবরের কাগজ ও একটি মেয়েদের চুলের কাটা পড়ে আছে, যেন একটা গল্প। আমি চুলের কাটাটা তুলে নিলাম, মনে হয়। রুপোর তৈরি কিংবা জার্মান সিলভারেরও হতে পারে। আসল রুপো না জার্মান সিলভার-এ-সমস্যার মীমাংসা করার বদলে অনেক সহজ কাটাটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। আমি তাই দিলাম, অনেক দূরে, উপত্যকার দিকে, কোনও পাহাড়ি মেয়ে একদিন ওইটা কুড়িয়ে পেয়ে খুশি হবে হয়তো, আমি দেখতে পেলাম সেই মেয়েটির উৎফুল্ল মুখ। কাটাটা হাতে নেওয়ার ফলে আমার হাতে কী একটা মিষ্টি গন্ধ লেগে গেছে, আমি পাচ্ছি। যেন, কিংবা কল্পনা।

আজ যে এখানে আর কোনও লোকজন নেই, এটা একটা বেশ ভালো ব্যাপার। বেশি লোকজন থাকলে একটুও আরাম পেতাম না। একা থাকা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। মায়ের মৃত্যুর পর আমার আর কোনও বন্ধন নেই। এবার বিদেশে যাবলুকিয়ে চুরিয়ে নয়, বিমানবন্দরে সবাই আমাকে বিদায় জানাতে আসবে। অসংখ্য রুমাল উড়বে, বিদায়, বিদায়।

বাবা হরিদ্বারে থাকেন। আমৃত্যু ওইখানেই থাকতে চান। সেটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। কলকাতায় থাকার আর তো কোনও যুক্তি নেই। একমাত্র আকর্ষণ ছিল বাড়িটা। বাবা ভেবেছিলেন, সূর্যদার অবর্তমানে ওই বাড়িটা আমাদের হয়ে যাবে। তার মতন সংসারে ব্যর্থ মানুষেরও ওইটুকু বিষয়বুদ্ধি থাকে। মৃত্যুর আগে মা এই বিশ্বাস নিয়েই গেছেন যে, তার স্বামী ও পুত্রের একটা নিজস্ব বাড়ি হয়েছে। মা খুশি মনেই গেছেন, কিন্তু বাবাকে

নিরাশ হতে হয়েছে। সূর্যদা ব্যবসা করার ঝোঁকে তার বন্ধুদের প্ররোচনায় মাত্র দশ হাজার টাকায় বাড়িটা বন্ধক দিয়েছিল। আমার তো মনে হয়, ভালোই করেছিল। সর্বস্ব উড়িয়ে দেবার নেশায় পেয়ে বসেছিল সূর্যদাকে, যে তার জীবনটাকে ওই রকম ভাবে খরচ করে দিতে পারে, সে কেন এ বাড়িটাকে রাখতে যাবে? এতেই সূর্যদাকে মানিয়েছে। কিন্তু বাবা ওই বন্ধকের খবর জানতে পেরেও আশা করেছিলেন, দশ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে বাড়িটা পেয়ে যাবেন। কিন্তু কোন অধিকারে বাবা সূর্যদার উত্তরাধিকারী হবেন? বাবা এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে গিয়ে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

বাড়িটা ছেড়ে আসার পরও দু-এক দিন ওই বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটেছি। সেই সময় মনের মধ্যে যে এক রকম দুঃখ দুঃখ ভাব হয়, সেটা আসলে আরামদায়ক। না হলে স্বেচ্ছায় ওই দিকে যাওয়া কেন?

আমি পাহাড় শিখরে উঠব। আর কত দূর?

আমাকে উঁচুতে উঠতে হবে। যে-জায়গায় আছি, তার চেয়েও উঁচুতে। যেখানেই যাই, মনে হয়, আরও দূরে কোথাও আরও সুন্দর জায়গা আছে। এই জীবনের বদলে অন্য রকম জীবন।

অশ্বারোহীরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আমি দ্রুত পা চালালাম। তবু বাধা পড়ে। এই সুন্দর ঘাসফুলটা ছিঁড়ব না? পাহাড় শিখরে যারা দ্রুত উঠতে চায়, তারা কি কখনও কয়েক মুহূর্ত থেমে একটা ফুলের গন্ধ নিতে চায় না? এই প্রশ্নটা আমাকে একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়।

সেখানে, সেই ফুলটার সামনে দাঁড়াতেই অকস্মাৎ মনে হয়, এত নির্জন জায়গায় আমি জীবনে কখনও আসিনি। এই পাহাড়, আকাশ, মেঘরাশি ও অরণ্য কী অদ্ভুত নিস্তব্ধ। হয়ে আছে। দূরের শহরের কোনও আওয়াজ এখানে এসে পৌঁছোচ্ছে না। এখানে আমাকে কেউ দেখছে না, এখানে ক্ষমা চাওয়া যায়।

আমি হাত জোড় করে বললাম, হে দশ দিক, আমি ক্ষমা চাইছি। হে দশ দিক, আমাকে ক্ষমা করো।

কীসের জন্য ক্ষমা? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি? দোষ না করলে বুঝি ক্ষমা চাওয়া যায় না? এই বিরাট সুন্দরের কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে? এই পৃথিবীতে জন্মেছি অথচ তার এই বিপুল রূপরাশির যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি আমি, এ জন্যও তো ক্ষমা চাইতে হয়।

একটু পরে, একজন অশ্বারোহিণী চিৎকার করে ডাকল, বাদলদা-

আমার প্রথম ইচ্ছে হল, সাড়া না দিয়ে তরতর করে আরও ওপর দিকে উঠে যাওয়া। কিংবা লুকিয়ে পড়া। এখানে লুকোবার অনেক জায়গা আছে। তবু আমি তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে সাড়া দিলাম, এই যে

বোধহয় শুনতে পায়নি, আবার ডাকল, বাদলদা–

আমি আরও জোরে বললাম, রেণু, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আয়-

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি ঠিকই তবু আমার চিত্ত খুব চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। যেন এটা ঠিক সেই জায়গা নয়, যেখানে দাঁড়িয়ে সত্যের সম্মুখীন হওয়া যায়। এখনও লুকিয়ে পড়ার সময় আছে।

অংশু, অংশুর স্ত্রী আর রেণু আমার কাছাকাছি এসে পৌঁছোল অল্পক্ষণের মধ্যেই। আমি ছুটে গিয়ে সহিসের মতন রেণুর ঘোড়ার জিন ধরে থামালাম।

অংশু বলল, কী রে বাদলা, এখানে একা একা কী করছিস? পদ্য লিখছিস?

আমি বললাম, তোরা কবে এসেছিস রে অংশু?

এটা মিথ্যে কথা। রেণুরা কবে দার্জিলিংয়ে এসেছে আর কোথায় উঠেছে, সবই আমি জানি। তবু এ রকম মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অংশু বলল, লাস্ট শনিবার। তুই কোথায় উঠেছিস?

রেণু বলল, তোমাকে তো আমরা অনেক আগেই দেখতে পেয়েছি। কতক্ষণ ধরে ডাকছি, শুনতে পাওনি?

আমি বললাম, শুনতে পেলে কি দাঁড়াতাম না?

অংশুর স্ত্রী হাঁপিয়ে গেছে। এই শীতের মধ্যেও তার মুখে অল্প অল্প ঘাম। সে বলল, কী উৎকট শখ বাপু তোমাদের। শুধু শুধু এতটা ওঠার কোনও মানে হয়?

আমি তাকে বললাম, অলকা, তুমি নামবে না? ঘোড়া থেকে নেমে একটু জিরিয়ে নাও।

অলকা বলল, এবার ফেরো। আপনিও ফিরবেন তো আমাদের সঙ্গে?

না, আমি আর একটু থাকব।

অংশু বলল, আর এখানে থেকে কী করবি? আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের বাড়িটা দেখিসনি তো।

আমি এখানে আর একটু থাকব। তোরাও থাক না।

অলকা বলল, আমি তো বাবা আর একটুও দেরি করতে পারব না। আমার বাচ্চা দুটোকে বাড়িতে রেখে এসেছি।

অংশুও তার স্ত্রীর সঙ্গে একমত। আমি জানতাম অংশু আর থাকতে চাইবে না, সেই জন্যই ওকে থাকতে বলছিলাম। রেণুর দিকে ফিরে বললাম, আমি শেষ পর্যন্ত যাব।

রেণু জিজ্ঞেস করল, আমি যাব না?

অংশু বলল, না, না, খুকি, তুই চল আমাদের সঙ্গে। আবার একদিন আসা যাবে' খন।

আমি বললাম, অংশু, তোরা যা–আমি রেণুকে পৌঁছে দেব।

রেণু বলল, আমিও শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফিরব না।

অংশু রেণুর দাদা হলেও সে রেণুকে ভয় পায়। রেণুর জেদকে সবাই ভয় পায়। রেণুকে জোর করে কোনও কথা কেউ বলতে পারে না। অংশু অপ্রসন্ন ভাবে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু ও জানে, আমাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই, সেই জন্য রেণুকে বলল, বেশি দেরি করিস না কিন্তু–।

ওরা ফিরে গেল। রেণুর ঘোড়াটাও দিয়ে দিলাম ওদের সঙ্গে। নীচে নামবার সময় বেশি পরিশ্রম নেই। ওরা দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম সেইখানে। তারপর বললাম, চল–

কয়েক পা নিঃশব্দে হাঁটার পর রেণু জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন আছ?

ভালো। আর তুই?

ভালো। এখনও রাগ আছে?

কীসের রাগ?

রাগ নেই? আমার কিন্তু এখনও খুব রাগ আছে তোমার ওপরে। তুমি এ রকম অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছ কেন? আমার মোটেই এসব পছন্দ হয় না।

তা হলে কেন এলি আমার সঙ্গে। এখনও ফিরে যেতে পারিস।

আমি ফিরে যাব?

যেতে পারিস। আমি খানিকটা রাস্তা এগিয়ে দেব।

তুমি আমাকে আর চাও না!

এ-কথার মানে কী?

আমাকে তোমার আর ভালো লাগে না?

রেণু, এ রকম প্রশ্ন আমাকে করা চলে না।

তুমি উত্তর দেবে না?

শোন রেণু, পৃথিবীতে যত সত্য আছে, তার চেয়েও বড় সত্য এই যে, আমি শুধু তোকেই চাই। সারা জীবনের মতন এটা ঠিক হয়ে গেছে। আমি তোকে পাব কি পাব না, তুই আমাকে অগ্রাহ্য করিস কিংবা ভুলে যাস–এসব কিছুর ওপরেই আমার চাওয়াটা নির্ভর করে না।

তা হলে আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছ কেন এক বছর ধরে? আমি ভেবেছিলাম, তুমি প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলেছ।

ওই যে বললাম, আমার দিকটা সারা জীবনের মতন ঠিক হয়ে গেছে। তোর দিকটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি বলেই দূরে সরে গিয়েছিলাম।

আমার দিকটায় তুমি অন্য রকম কী বুঝলে? আমি বুঝি খারাপ?

রেণু, তুই কখনও খারাপ হতে পারিস না। আমি তোর অযোগ্য বোধহয়, সব সময়েই আমার এই কথাটা মনে হয়–

রেণু একটু থমকে দাঁড়াল, তার মুখে হালকা মেঘের ছায়া। না ছায়া নয়, এখন সত্যিকারের মেঘ ঘিরে আছে আমাদের। আমরা পরস্পরের কাছে একটুক্ষণের জন্য

অস্পষ্ট হয়ে যাই। সেই মেঘের মধ্যেই রেণু তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি আমার হাত ছুঁয়ে আবার প্রতিজ্ঞা করো, আর কোনও দিন এ রকম কথা ভাববে না।

আমি রেণুর হাতটা নিজের মুঠোয় নিলাম। বড় ঠান্ডা, জিজ্ঞেস করলাম, তোর শীত করছে?

রেণু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না।

রেণু শাড়ির ওপরে একটা লাল রঙের স্টোল পরে আছে। আমার গায়ে ওভারকোট, সেই প্রভাস জামাইবাবুর যে কোটটা নিয়ে আমার বিদেশে যাবার কথা ছিল। আমি কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলাম।

রেণু বলল, আমরা অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি। তুমি সাড়া দাওনি, তুমি যদি শেষ পর্যন্ত সাড়া না দিতে কিংবা কোথাও লুকিয়ে পড়তে তা হলে সারা জীবনে আর কখনও আমার মুখ দেখতে পেতে না।

কেন পালাব কেন?

তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছ কেন?

একটু আগে আমি বললাম যে পৃথিবীর সব সত্যেরও চেয়েও বড় সত্য এই যে আমি রেণুকে চাই। তবু আমি রেণুর কাছ থেকে পালাতে চাইছিলাম, এটাও ঠিক। এবং এখন আমি তাকে মিথ্যে কথা বলছি। আমি মুখে হাত দিয়ে চোখ দুটো ভালো করে রগড়ে নিলাম। দেখতে চাইলাম যেন। এখানে আমিই দাঁড়িয়ে আছি কিংবা অন্য কেউ।

মেঘটা সরে গেছে। ঝট করে এক ফালি রোদ এসে গায়ে পড়ল। কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনেকার জমাট মেঘও পাতলা হতে শুরু করেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে এই মেঘ ও রৌদ্রের খেলাটাই বড় মজার। আমি কোটটা ফাঁক করে বললাম, এটা বেশ ঢলঢলে আছে, তুই এর মধ্যে চলে আয়, তা হলে আর শীত করবে না।

রেণু বলল, ওই তো আমরা সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় প্রায় এসে গেছি, চলো ওই পর্যন্ত আগে যাই।

রেণুর হাত ধরে আমি ছুটতে ছুটতে চলে এলাম সেখানে। এখন আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গেও ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কত উচ্চতা এখানে? সাত হাজার কি সাড়ে সাত হাজার ফিট? তবু মনে হচ্ছে যেন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। সমস্ত দুনিয়াটা আমাদের পদানত।

রেণু শীতে রীতিমতন কাঁপছে। আমি ওকে নিয়ে এলাম আমার কোটের মধ্যে। পকেটে হাত দিয়েও থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রেণু, আর একটা সিগারেট খেতে পারি?

ঠিক যেন সেই কলেজ জীবনের মতন আমি রেণুর সামনে সিগারেট খেতে ভয় পাচ্ছি। রেণুও সেটা বুঝতে পেরে একটু হাসল। তাপর বলল, আচ্ছা খাও!

আমি সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলাম রেণুর চুলের মধ্যে। আস্তে আস্তে ধোঁয়াগুলো ওর গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ভেদ করে বেরোচ্ছে।

রেণু জিজ্ঞেস করল, চুলে গন্ধ হয়ে যাবে না?

আমি বললাম, হোক।

পুনরায় ধোঁয়া ছেড়ে আমি বললাম, এই এক বছর তোর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে খুব ভালো করেছি। তাই তো এত সুন্দর জায়গায় তোকে ফিরে পেলাম।

ফিরে পাওয়ার কথাটা খুব হালকা শোনায়। যেন এটা ঠিক আমার ভাষা নয়। আমি একটু লজ্জিত ভাবে আবার বলি, তোকে এত কাছে পেলাম।

আমার মা তোমাকে বকেছিলেন, তাই না?

সে কিছু না। মাসিমা আমাকে ভালোবাসেন। শুধু ওঁর মনে একটু ভয় ঢুকেছিল।

তুমি কেন আমাকে বলোনি? সেই জন্যই তুমি আমাদের বাড়িতে আর আসতে না, আমি টেলিফোন করলে কিংবা তোমাদের বাড়িতে গেলে তুমি আমাকে এড়িয়ে গেছ- তুমি আমাকে অনেক কিছুই বলোনি।

রেণুকে চুপ করাবার জন্য আমি ওর থুতনিটা উঁচু করে ধরলাম, তারপর ওর ঠোঁটে ছোঁয়ালাম ঠোঁট। রেণু প্রথমে মুখটা সরিয়ে নিচ্ছিল, আবার এগিয়ে এল, আমি ওকে এক কল্পান্ত সময় নিয়ে চুমু খেলাম। যেন ওর ঠোঁটটা গলে গলে যাচ্ছে আমার ঠোঁটের মধ্যে। আমার জিভটা ওর জিভটাকে খুঁজে বার করে আলিঙ্গন করে রইল। এর আগে রেণুকে জোরজার করে বা তাড়াহুড়ো করে কয়েক বার চুমু খেয়েছি বটে, কিন্তু এটাই আসলে আমাদের জীবনের প্রথম চুম্বন।

চুম্বন মুক্ত হবার পর রেণু দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মাথা রেখে বলল, আর কখনও পালিয়ে যেয়ো না।

আমার ওষ্ঠের সুস্বাদ উপভোগ করার জন্য আমি একটুক্ষণ চুপ করে থাকি। একটু একটুও দুঃখও হয়। জীবনের কত সুন্দর সময় নষ্ট হয়ে গেছে। রেণু আমাকে পালিয়ে যাবার কথা বলে, আমার ইচ্ছে হয় ওকে আমার শরীরের মধ্যে একেবারে মিশিয়ে দিতে।

আমি বললাম, রেণু, আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে তোকে দেখতে?

দেখতে পাচ্ছ না?

কী জানি, মনে হচ্ছে, কখনও তোকে দেখিনি। তুই এত নতুন হয়ে উঠলি কী করে?

আমি সেই রকমই আছি।

তোকে সম্পূর্ণ দেখতে চাই।

দেখো না।

জামাকাপড় ছাড়া।

রেণু মুখ সরিয়ে বলল, এই শীতের মধ্যে? তুমি কি পাগল? আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

আমি এই শীতের মধ্যে সমস্ত জামাকাপড় খুলে এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমার এত আনন্দ হচ্ছে। আমি এখন সব পারি।

না, লক্ষ্মীটি এ রকম কথা বোলো না! আমার কী রকম গা শিরশির করছে।

তা হলে তোর বুকে মাথা রাখি?

আচ্ছা রাখো!

আমি রেণুর স্টোল ও শাড়ির আঁচল সরিয়ে ওর বুক খুঁজে বার করলাম। আমার রূপপিপাসু চোখ শরীরের রূপের মধ্যে বেশি আনন্দ পায়। নদী, ফুল, পর্বত শিখরের চেয়েও এই সদ্য-যুবতী রমণীর স্তনদ্বয়কে আমার বেশি আকর্ষণীয় সুন্দর বলতে দ্বিধা নেই। যে-প্রকৃতির দৃশ্য দেখে একটু আগে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ হয় না। ব্লাউজ সরিয়ে রেণুর গোলাপি আভাময় দুই বুকের দিকে আমি কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ একবার মনে হয়, রেণুর বুকে যেন একটা জল রঙের মাছ আঁকা আছে। কীসের যেন সাংকেতিক চিহ্ন। দৃষ্টিবিভ্রম হয় আমার, তবু সেই চিহ্নটা আবার দেখি, সেটার মানে বোঝার চেষ্টা করি। তারপর সেখানে মুখটা রেখে গরম গরম নিশ্বাস ফেলে রেণুর শীত তাড়িয়ে দিই। মনে হয়, পৃথিবীতে এই আমার একমাত্র আশ্রয়।

সেখানে মুখ রেখেই আমি ফিসফিস করে বললাম, রেণু, সূর্যদার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই।

রেণু চমকে উঠল। আমার মুখটা জোর করে তুলে ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, আর ওকথা এক বারও উচ্চারণ কোরো না।

আমি ওর আঙুলটা সরিয়ে বললাম, না, বলতে হবে। এই তো শ্রেষ্ঠ জায়গা এইসব কথা বলার। তুই ভেবেছিলি–

রেণু আমাকে বাধা দিয়ে বলল, আমি ভুল ভেবেছিলাম। তুমি আমাকে শুধরে দিতে পারোনি? একটা কথাও না বলে চলে গেলে–

সূর্যদার আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনে রেণু এমন আঘাত পেয়েছিল যে আমাকে বলে উঠেছিল, তুমি কেন সূর্যদাকে দীপ্তিদিদের সন্ধান দিলে? ওখানে যদি না যেত–

রেণু সত্যিই ভুল করেছিল। আমি সূর্যদাকে দীপ্তিদির বিষয়ে একটাও কথা বলিনি কখনও। দীপ্তিদি একজন মন্ত্রীর স্ত্রী, একথা সূর্যদা কোনও না কোনও উপায়ে ঠিকই জেনে যেত। সেই ভাবেই জেনেছে। এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই।

তবু একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ আমাকে সব সময় খোঁচা দিয়েছে। আমি সূর্যদাকে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অন্তত একবার ভেবেছিলাম, সূর্যদাকে আমিই বলে দেব দীপ্তিদির কথা। সে-সময়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না। বাড়িতে অশান্তি, মায়ের অসুখ, অনিচ্ছুক চাকরি-জীবন–তার ওপরে আবার রেণুর মা আমাকে ডেকে বারণ করে দিয়েছিলেন রেণুর সঙ্গে মিশতেতখন আমার মনে হয়েছিল, সবাই সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। তার ওপর সূর্যদার মতি পরিবর্তনের জন্য রেণু এগিয়ে গেল, সূর্যদার গায়ে হাত রাখল–তখন আমার সব রাগ পড়েছিল সূর্যদার ওপরে, আমি ভেবেছিলাম, যে-খবরের কাগজে দীপ্তিদি আর শংকর বোসের ছবি বেরিয়েছে, সেই কাগজখানা সূর্যদার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলব, এই নাও, এই দেখো তোমার নিয়তি! শুধু আমি কষ্ট পাব কেন সূর্যদাও পাক।

কিন্তু কাগজটা আমি দিইনি শেষ পর্যন্ত, ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, তবু যে মনে এসেছিল সেই কথাটা-রেণু বোধহয় আমার মুখ দেখে সেটা পড়ে ফেলেছিল। এ জন্য রেণুর অভিযোগ শোনার পর অনেক দিন আমি নিজেকে দায়ী করেছিলাম, চিন্তারও তো একটা পাপ আছে। কিন্তু আজ, এই প্রকৃতি ও রেণুর নগ্ন বুকের সামনে এসে মুহূর্তে আমার উপলব্ধি হয়, শুধু একটা চিন্তার জন্য মানুষ মরে না। তা ছাড়া, মৃতদের থেকে জীবিতরা

অনেক বেশি মনোযোগের যোগ্য।

রেণু আমার অন্যমনস্ক মুখখানা নিজের করতলে নেয়। তারপর বলে, এবার আমি তোমার বুকে একটু মাথা রাখি?

আমার একটু লজ্জা করে। আমার বুকে লোম আছে, রেণু তা দেখবে। আমি ওকে সামান্য বাধা দিতে যাই। রেণু হাসল। তারপর বলল, আমার থিয়েটার করা তোমার। পছন্দ হয়নি। সে কথা তখন বলনি কেন? বারণ করলে কি আমি যেতাম ওখানে? তুমি কেন নিজেকে লুকোও?

আমি রেণুর বুকে আবার হাত রাখলাম যেন প্রতিজ্ঞা করছি কিছু একটা। তবু মনে হয়, মাঝখানে একটা দেওয়াল উঠে গেল। রেণু এখনও অনেক দূরে-ওর কাছেও আমি সব কথা বলতে পারি না। সত্যি নিজেকে লুকোতে হয়। কেন?

ও নিজেই আমার জামার বোতাম খোলে। আমার লোমশ বুকে ওর মুখখানা চেপে ধরে। ওর পিঠের ওপর হাত রেখে আমার মনে হয়, রেণুর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। রেণু কি কঁদছে?

সেটা দেখা গেল না। হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। বেশ তো রোদ উঠেছিল, এখন আর একটুও রোদের চিহ্ন নেই, মেঘে সব দিক ঢেকে গেছে-তবে তো এই বৃষ্টি সহজে থামবে না। যেটাকে আমি দেওয়াল ভেবেছিলাম, সেটা আসলে মেঘ-আমাদের মাঝখানে কখন আবার এসে গেছে। রেণুর হাত ধরে আমি নীচের দিকে ছুট লাগালাম।

রেণুরা উঠেছে বিষ্ণুদের বাড়িতে। বিষ্ণুদের কেউ অনেককাল আর এদিকে আসে না, বাড়িটা খালিই পড়ে থাকে। সে বাড়ির জানলার রঙিন কাঁচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেক বছর আগে বিষ্ণুর সঙ্গে আমার এই বাড়িতে আসবার কথা ছিল, বাবা আসতে দেননি। পাতলা অভিমানে মনটা ভিজে যায়। সারা শরীর আগেই বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে।

রেণু বলল, বাড়ির মধ্যে আসবে না?

আমি রাজি হলাম না। এক্ষুনি অংশুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। রেণুর সৌরভটা অনেকক্ষণ ধরে লালন করতে চাই। অংশু বড় বাজে কথা বলে।

আমি বললাম, তুই আয় না আমাদের হোটেলে! আমি তোকে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে চলে যাব।

রেণু উজ্জ্বল মুখে বলল, বেশ হয় তা হলে না? তোমার ঘরটা কি রাস্তার দিকে না পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়ের দিকে জানলা আছে একটা। সেখানে তোর জন্য আমি ম্যাজিকে একটা স্বর্গের দৃশ্য এনে দিতে পারি।

কিন্তু আমার শাড়িটা যে একেবারে ভিজে গেছে? শাড়ি বদলে আসব? তুমি চলে যাও, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি। আমাকে ঢুকতে দেবে?

তোকে কেউ কখনও কোথাও আটকাতে পেরেছে? তোর কথা শোনেনি, এমন কেউ আছে?

রেণু হাসল। দরজায় হেলান দিয়ে বলল, একজন ছিল। না, দু'জন। সূর্যদা আর তুমি। তোমরা দুজনে একই রকম।

সূর্যদার সঙ্গে আমার কোনওই মিল নেই। আর কেউ কখনও বলেনি একথা, শুধু রেণুই বলল আমরা দুজনে এক রকম। হোটেলের ঘরে ফিরে এই কথাটাই আমার মাথায় ঘুরতে লাগল। সূর্যদা আর আমি যদি একসঙ্গে কোনও কাজে নামতে পারতাম! আমার অনেক আশা ছিল, সূর্যদা কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নিল না।

রেণুর জন্যই সূর্যদার কথা আজ নতুন করে মনে পড়ে। সূর্যদার মৃত্যুর পর বেশ আলোড়ন হয়েছিল। একজন মন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টায় চারদিকে বেশ সাড়া পড়ে যায়। অনেকে বলেছিল, সূর্যদা আর সি পি আই-এর মেম্বার। সেই পার্টি থেকে আবার প্রতিবাদ করা হয়। শংকর বোসকে সূর্যদা পিস্তল হাতে নিয়ে বাংলোর মাঠে তাড়া করেছিল, এই দৃশ্যটা সূর্যদার চরিত্রের সঙ্গে মানায় বটে তবু আমরা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। সূর্যদা খুনজখমের লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত কারণে যারা খুন করে তারা খুনি, সূর্যদা সে-চরিত্রের নয়। বড়দিও বিশ্বাস করেনি। বড়দি বলেছিল, বেয়াল্লিশ সালে যে-সময় সূর্যদা আশ্রয় নিয়েছিল ওদের বাড়িতে, সেই সময়ই বড়দি ওর পিস্তলটা সরিয়ে নেয়। সূর্যদা তো আর কোনও দিন সেটার খোঁজ করেনি। সেটা বহু দিন পড়েছিল বড়দির কাছে, বছর তিনেক আগে বড়দি সেটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। সূর্যদার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছিল বড়দি–হঠাৎ বুড়ি হয়ে গেল। আমি দীপ্তিদিকেও দোষ। দিতে পারি না। হঠাৎ একটা আগুনের গোলা ছুটে এলে সবাই ছুটে বাঁচবার চেষ্টা করে। দীপ্তিদিও বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিংবা, তিনি তাঁর নিজস্ব উপায়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সূর্যদাকে। যে ভালোবাসা দূরে ঠেলে দেয় তার দহন অনেক বেশি। শুনেছি, দীপ্তিদিকে এখন বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপ্তিদি এখন বুঝতে পারবেন, শুধু মৃত্যু নয়, অনেক সময় বেঁচে থাকাও কত মর্মহীন। সূর্যদার চেয়ে দীপ্তিদির জন্য আমার বেশি কষ্ট হয়।

রেণু আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবে। কতক্ষণ পর সেই আধ ঘণ্টা শেষ হবে। আমি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। জানলার ঠিক নীচেই পাহাড়িদের একটা বস্তি। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে খেলা করছে সেখানে। একটা কুকুর তাদের পাশে পাশে এমন। ভাবে ঘুরছে, যেন সে বলতে চায়, আমায় খেলাতে নিচ্ছ না কেন? বৃষ্টির জল নানা ধারায়

গড়িয়ে পড়ছে। রোদ উঠে গেছে আবার। অলৌকিক দৃশ্যের মতন জেগে ওঠে দূরের পাহাড়। রেললাইন ঝকঝক করছে, দুটি তরুণী মেয়ে ঠিক লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে, মুখে তারা শব্দ করছে ঝিকঝিক ঝিকঝিক।

হঠাৎ মনে পড়ল, মৃত্যুর আগে বড়বাবু বলেছিলেন, দেখে গেলাম। একটা বিরাট বৈচিত্র্যময় জীবন কাটিয়ে এসে তিনি শেষ মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন তার উপলব্ধি। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রেণুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার মনে হয়, বড়বাবু ঠিকই বলেছিলেন, দেখে যাওয়া ছাড়া আর কী!